# অল দি কিংস মেন

রবার্ট পেন ওয়ারেন

# অল দি কিংস মেন

# অল দি কিংস মেন

মূল

রবার্ট পেন ওয়ারেন

অনুবাদ

কবীর চৌধুরী



বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ২৬৮৫

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯২

বাংলা সংস্করণের প্রকাশক
বশীর আলহেলাল
পরিচালক
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
পল্ গ্যামারেলো আইটুথ ডিজাইন

মূল্য
একশত টাকা

---

ALL THE KING'S MEN. Bengali translation of Robert Penn Warren's All The King's Men' by Kabir Chowdhury. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Bengali edition December 1992.
Price : Taka one hundred only.

ISBN 984-07-2694-3

জাস্টিন ও ডেভিড মিচেল ক্লে –কে

# ভূমিকা

একটি অসাধারণ উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপারটা একটু বিস্ময়কর এবং কিছুটা দুর্ভাগ্যজনকও বটে যে রবার্ট পেন ওয়ারেনের অল দি কিংস মেন নিয়ে এ যাবৎ তেমন ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা হয় নি। অল দি কিংস মেন-কে হয়ত মেলভিলের মোবি ডিক কিংবা ফকনারের দি সাউন্ড এ্যান্ড দি ফিউরি-র সমমানের বলা যাবে না, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা হেমিংওয়ের এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস কিংবা স্কট ফিটজিরাল্ডের দি গ্রেট গ্যাটসবির-র সঙ্গে এক সারিতে স্থান পাবার যোগ্যতা রাখে।

উপন্যাসটি বহুমাত্রিক। এর নানা স্তর আমাদের চোখে ধরা পড়ে। রাজনীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, উচ্চ আদর্শবাদ বনাম নির্মম বাস্তবতা, কামনা-বাসনার সর্বপ্লাবী স্রোতধারা, মানবচরিত্রের দুর্গম জটিল অলিগলি, পুরুষকার ও নিয়তির টানাপোড়েন, স্থান ও কাল এবং অতীত ও বর্তমান মানুষের জীবনকে কি রকম অপ্রতিরোধ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার নিপুণ চিত্র পরিবেশিত হয়েছে এই উপন্যাসে। আমরা এখানে কতিপয় অবিস্মরণীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, এদের কেউ কেউ উপন্যাসে ঘটমান বর্তমানকালের, কেউ কেউ কিছুটা দূর-অতীতের। বর্তমানের চরিত্রাবলীর মধ্যে আমাদের গভীরভাবে আলোড়িত করে উইলি স্টার্ক ও জ্যাক বার্ডেন। এ দুজনই কেন্দ্রীয় চরিত্র, অদ্ভুতভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। উপন্যাসটি মূলতঃ এই দু'জনেরই কাহিনী। আমরা আরো পাই এ্যাডাম স্ট্যান্টন ও এ্যান স্ট্যান্টনকে, ভাই-বোন, আর স্যাডি বার্ক ও বিচারপতি আরউইনকে। আর অতীতের চরিত্রাবলীর মধ্যে আমরা পাই কাস মেস্টার্ন ও গিলবার্ট মেস্টার্নকে, দুই ভাই, এবং স্বামী-স্ত্রী ডানকান ট্রাইস ও এ্যানাবেল ট্রাইসকে। এরা ছাড়াও আরো অনেকে আছে, তাদেরও ভোলা যায় না, যেমন সুগার-বয় কিংবা লুসি স্টার্ক, কিন্তু তাদের রূপায়ণ কিছুটা মোটা দাগে। শিল্পীর তুলির সূক্ষ্ম কারুকাজ সেখানে ততো উজ্জ্বল নয়। কিন্তু শুধু চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায় নয়, পটভূমি নির্মাণে, কাহিনীর গঠনশৈলীতে, ভাষা ব্যবহারে, কাহিনীর গভীরে দার্শনিক চিন্তার নিপুণ মিশ্রণে লেখকের প্রতিভাদীপ্ত ক্ষমতার স্বাক্ষর স্পষ্ট। এই উপন্যাসের কাহিনী কখনোই সরলরেখায় এগিয়ে যায় না। কালের দিক থেকে পরের ঘটনাবলী আগে বর্ণিত হয়, আগের ঘটনাবলীর কথা তুলে ধরা হয় পরে, এবং বর্তমানের উপর অতীতের অভিঘাত কোন্ পথে পড়ে, কিভাবে পড়ে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কি, বিভিন্ন ঘটনা ও তার পরিবেশ চরিত্রসমূহের মনোজগতে কি পরিবর্তন নিয়ে আসে, এবং কিভাবে, লেখক

তা অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। এবং এটা তিনি করেছেন গতানুগতিক ফ্ল্যাশ-ব্যাকের আঙ্গিকে নয়।

অল দি কিংস মেন-এর গঠনকাঠামো বা স্ট্রাকচার স্পষ্টতঃই জটিল, কিন্তু এই জটিল কাঠামোটি কাহিনীর গূঢ় ব্যঞ্জনার সঙ্গে সুসমঞ্জস। কাঠামো ও কাহিনী পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে, পাঠকের হৃদয়ে আলোড়ন জাগায়, তাকে একই সঙ্গে আনন্দ দেয় ও ভাবিয়ে তোলে। কাহিনী কিভাবে এগিয়ে যায় ও আবার পেছনে ফিরে আসে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। উপন্যাস যখন শুরু হয়, প্রথম অধ্যায় দিয়ে, তখন সময় হচ্ছে ১৯৩৬ সাল, উইলি স্টার্ক তখন গভর্নর। আমরা তখনই তাকে দেখি তার চরিত্রের একাধিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। সে সাধারণ মানুষের খুব কাছে আসতে পারে, তার মধ্যে একটা সহজ সরল অমায়িকভাব আছে, জনতার মনস্তত্ব সে খুব ভালো বোঝে, স্থান-কাল-পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সে চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে। কিন্তু শুধু এটুকুই নয়, এই প্রথম অধ্যায়েই আমরা দেখি যে উইলি স্টার্ক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সতর্ক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক রাজনীতিবিদ, রাজনীতির অঙ্গনের সব রকম ফন্দিফিকির তার নখদর্পণে, বিরোধীপক্ষকে নস্যাত করার ব্যাপারে সে যেমন দৃঢ়সঙ্কল্প তেমনি নির্মম ও আপোসহীন।

শুধু উইলি স্টার্ক নয়, এই প্রথম অধ্যায়েই আমরা দেখি উপন্যাসের আরেকটি প্রধান চরিত্র, জ্যাক বার্ডেনকে। গভর্নর স্টার্কের খুব কাছের মানুষ এই জ্যাক বার্ডেন। ঐতিহ্যবাহী অভিজাত পরিবারের সন্তান। তার পূর্ব-পুরুষদের নামেই এই উপন্যাসের ঘটনাবলীর অন্যতম পটভূমি বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এর নামকরণ হয়েছে। বিচারপতি আরউইনের ঘনিষ্ঠজন জ্যাক বার্ডেন, তার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও শ্লেষের সম্পর্কে বাঁধা। কতোখানি ঘনিষ্ঠ সেটা জ্যাক বার্ডেন নিজে জানতে পারে উপন্যাসের প্রায় শেষ দিকে। রাজনীতির টানাপোড়েনে গভর্নর স্টার্ক কর্তৃক জ্যাকের উপরই দায়িত্ব অর্পিত হয় আরউইনের অতীত খুঁড়ে তার দুর্বলতা, ত্রুটিবিচ্যুতি, তার কোন অসদাচরণের প্রমাণ তুলে আনার। এই সূত্রেই জ্যাক বার্ডেনের মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা, কিভাবে তার শৈশব-কৈশোর, প্রথম যৌবন কেটেছিলো বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এ। আর তার মনে পড়ে কিভাবে ১৯২২ সালে প্রথমবারের মতো তার দেখা হয়েছিল উইলি স্টার্কের সঙ্গে।

অল দি কিংস মেন উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় ১৯৩৬ সাল দিয়ে শুরু হবার পর পরবর্তী দু'অধ্যায়ে আমরা ১৯২২ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর বিবরণ পাই। উইলি স্টার্কের বিকাশ, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উত্তরণ, তার আদর্শবাদ ও বাস্তবতাজ্ঞান, তার আকর্ষণীয় দিকসমূহ এবং যেসব দিক তত আকর্ষণীয় নয় সেসবের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। কিন্তু তারপর চতুর্থ অধ্যায়

আবার আমাদের নিয়ে যায় আরো পেছনের সময়ে, জ্যাক বার্ডেন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্র, ১৯১৮ থেকে ১৯২১-এর মধ্যকার কোন একটা সময়ে। জ্যাক বার্ডেন পরবর্তী সময়ে যে রকম আচরণ করে, যেসব কাজ করে, তা সে কেন করে এখানে তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তারপর পঞ্চম অধ্যায় আবার শুরু হয় প্রথম অধ্যায় যেখানে শুরু হয়েছিলো সেখান থেকে।

বস্তুতঃপক্ষে প্রথম থেকে শেষাবধি উপন্যাসটি প্রায়ই অতীতের কাছে ফিরে যায়। অতীত কিভাবে বর্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করে তা সারাক্ষণ আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ বেশ জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়। জীবনে কোন কিছুই খুব সরল নয়, বিশেষ করে কিছু কিছু মানুষের চরিত্র ও কার্যাবলী। তাদের কাজের পেছনে যেসব উদ্দেশ্য থাকে অনেক সময়ই তার সহজ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের কাঠামোগত জটিলতা যেন এই ধারণাটিই তুলে ধরে। সেই সঙ্গে চরিত্র ও ঘটনাবলীর মধ্যেও তা একটা বিশেষ গাঢ়তা এনে দেয়।

অল দি কিংস মেন-এর লেখক রবার্ট পেন ওয়ারেন-এর জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকির গুথরিতে, ১৯০৫ সালে। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী, মা স্কুল-শিক্ষিকা। রবার্ট ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র।

স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি কলেজ জীবন শুরু করেন ন্যাশভিলের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে ঠিক করেছিলেন বিজ্ঞানী হবেন, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্লাস তাঁর ভালো লাগলো না। তার জায়গায় তাঁকে আকর্ষণ করলো ইংরেজির ক্লাস, বিশেষ করে সেকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক জন ক্রো র‍্যানসমের ক্লাস। পেন ওয়ারেন ছাত্রাবস্থাতেই একটি তরুণ উৎসাহী সাহিত্যিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সহপাঠী এ্যালেন টেটের প্রেরণায়, পরবর্তী সময়ে যিনি মার্কিন সাহিত্যের আরেক দিকপাল হয়ে ওঠেন, পেন ওয়ারেন কবিতার অঙ্গনে প্রবেশ করেন। পরে তিনি কবিতা উপন্যাস ছোটগল্পসহ সাহিত্যের নানা শাখায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর মতো সার্থক সব্যসাচী লেখক মার্কিন সাহিত্যভুবনে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় আরেকজন নেই। দশটি উপন্যাসের রচয়িতা পেন ওয়ারেন তেরটি কাব্যগ্রন্থেরও লেখক। তিনিই একমাত্র মার্কিন সাহিত্যিক যাঁর কবিতা ও উপন্যাস উভয়ই পুলিটজার পুরস্কার লাভ করেছে। ছোট গল্পকার, জীবনীগ্রন্থের লেখক এবং নাট্যকার হিসেবেও তাঁর অবদান ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। তা ছাড়া বহু আলোকসঞ্চারী প্রবন্ধ দ্বারা তিনি সাহিত্যতত্ত্বের অঙ্গনকেও সমৃদ্ধ করেছেন।

[দশ]

ভ্যান্ডারবিল্টের পর পেন ওয়ারেন পড়ালেখা করেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, বার্কলেতে। ১৯২৭ সালে সেখান থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন, তারপর চলে যান ইয়েল- এ। ১৯২৮ সালে তিনি রোড্স্ স্কলার হয়ে বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, এবং ১৯৩০- এ সেখান থেকে লাভ করেন বি. লিট. ডিগ্রী।

বিলেত থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শুরু হয় রবার্ট পেন ওয়ারেনের দীর্ঘ ও অত্যন্ত সফল শিক্ষকতার জীবন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথমে মেমফিসের একটি কলেজে ইংরেজির সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজে যোগ দেন। সে বছরই বিয়ে করেন এমা ব্রেসিয়াকে, যার সঙ্গে তাঁর বাগদান সম্পন্ন হয়েছিলো পাঁচ বছর আগে ১৯২৫ সালে। ১৯৩১- এ তিনি মেমফিস ছেড়ে ভ্যান্ডারবিল্টে যান। সেখানে তিন বছর অধ্যাপনার পর যোগ দেন লুইসিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। রবার্ট পেন ওয়ারেন যখন সেখানে কর্মরত তখনই হিউই লং যুক্তরাষ্ট্রের ওই অঙ্গরাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। পেন ওয়ারেন তাঁকে দেখেছেন ক্ষমতার দ্বন্দ্বক্রীড়ায় অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে অংশ নিতে। অত্যন্ত কাছে থেকে তিনি এটা দেখেছেন এবং ওই সময়ের নানা বিপরীতমুখী ঘটনা ও আবেগের টানাপোড়েনের দৃশ্য নিঃসন্দেহে তাঁর শিল্পীমানসকে উজ্জীবিত করেছিলো। অল দি কিংস মেন- এর উইলি স্টার্ক এবং বাস্তব জীবনের হিউই লং- এর মধ্যে ব্যাপক সাদৃশ্য বহু সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লুইসিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময়ই রবার্ট পেন ওয়ারেন ১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে অল দি কিংস মেন রচনার পরিকল্পনা করেন। তাঁর ওই সময়ের কবিতাবলীতে ক্ষমতা, গণতন্ত্র, সততা-শোভনতা প্রভৃতি বিষয় যে তাঁর চেতনাকে কত গভীরভাবে অধিকার করে রেখেছিলো তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে।

সেই সময় লুইসিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন আমেরিকার একজন অত্যন্ত খ্যাতিমান ও বিদগ্ধ শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক সম্পাদক, সঙ্কলন প্রস্তুতকারক এবং সাহিত্য সমালোচক। তিনি হলেন ক্লিন্থ ব্রুকস্। পেন ওয়ারেন এবং ক্লিন্থ ব্রুকস্ একযোগে কয়েকটি পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, যা সাহিত্যের পঠনপাঠনে দিকনির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, এখনো রাখছে, যেমন এ্যান এ্যাপ্রোচ টু লিটারেচর (১৯৩৬), আন্ডারস্ট্যান্ডিং পোয়েট্রি ( ১৯৩৮), আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফিকশন (১৯৪৩) এবং মডার্ন রেটরিক, উইথ রীডিংস ( ১৯৪৯)। এ ছাড়াও সৃজনশীল সাহিত্যের অঙ্গনে এই সময়ে প্রকাশিত হয় পেন ওয়ারেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ থার্টিসিক্স পোয়েমস (১৯৩৫) এবং প্রথম উপন্যাস নাইট রাইডার (১৯৩৯)। ১৯৩৯-৪০ সালটি তিনি কাটান ইতালীতে, গুগেনহাইম ফেলোশিপ নিয়ে,

এবং সেখানে বসে তিনি প্রাউড ফ্লেশ নামে একটি কাব্যনাটক রচনা করেন, যাকে নির্দ্বিধায় অল দি কিংস মেন- এর পূর্বসূরী বিবেচনা করা চলে। প্রাউড ফ্লেশ- এর কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং অল দি কিংস মেন- এর উইলি স্টার্কের মধ্যে সাদৃশ্য কোনো পাঠকেরই দৃষ্টি এড়ায় না।

১৯৪২- এ পেন ওয়ারেন এলএসইউ ত্যাগ করে ইংরেজির প্রফেসরের পদ নিয়ে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে কাটালেন সাত বছর, তারপর যোগ দিলেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রথমে প্রফেসর অব প্লে-রাইটিং হিসেবে, পরে ইংরেজির প্রফেসররূপে। আরো পরে ১৯৭৩ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি প্রফেসর এমেরিটাস হন।

মিনেসোটা এবং ইয়েলে কাজ করার সময় সাহিত্যের নানা অঙ্গনে তাঁর উন্নতমানের সৃষ্টিকর্ম অব্যাহত থাকে। বহু সম্মান, স্বীকৃতি এবং পুরস্কার পেতে থাকেন তিনি। ১৯৪৪- এ তিনি নিযুক্ত হন কনসালট্যান্ট ইন পোয়েট্রি টু দি লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, ১৯৪৬- এ লাভ করেন কথাসাহিত্যের জন্য পুলিটজার পুরস্কার (অল দি কিংস মেন), ১৯৫৭-তে কবিতার জন্য ( প্রমিসেস ঃ পোয়েমস ১৯৫৪ — ৫৬)। সাহিত্যের অঙ্গনে সার্বিক অবদানের জন্য ১৯৭০ সালে তিনি লাভ করেন ন্যাশানাল মেডেল ফর লিটারেচর, এবং ১৯৮০ সালে পঁচাত্তর বছর বয়সে ভূষিত হন যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নাগরিকদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান মেডেল অব ফ্রীডম- এ।

অল দি কিংস মেন এমন একটি উপন্যাস যা একাধিকবার পড়া যায়। বস্তুতঃপক্ষে পড়া দরকার। তাহলেই উপন্যাসটির অসাধারণ গুণাবলী পাঠকের চেতনায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। বাংলা অনুবাদে আমি মূলের রস অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি সে-রায় দেবেন সুধী পাঠককুল। অনুবাদ করার সময় আমি মাঝে মাঝে কিছু কিছু অংশ আমার স্ত্রী মেহের কবীর ও কন্যা শাহীন মাহমুদকে পড়ে শুনিয়েছি। তাদের উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য এই সুবিশাল গ্রন্থ অনুবাদে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

**কবীর চৌধুরী**
"ঝরোকা"
গুলশান, ঢাকা
ডিসেম্বর, ১৯৯২

## প্রথম অধ্যায়

### মেসন সিটি

ওখানে পৌঁছুতে হলে আপনাকে রাজধানী শহর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে বেরিয়ে যাওয়া মহাসড়ক ৫৮ ধরতে হবে। বেশ ভালো মহাসড়ক সেটা, আর নতুন। অন্ততঃ যেদিন অমরা ওই পথে গিয়েছিলাম, সেদিন নতুন ছিলো। মহাসড়কের উপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিন, দেখবেন মাইলের পর মাইল সোজা চলে গেছে। আর ঠিক মাঝখান দিয়ে কালো রেখা টানা সেই সড়ক এগিয়ে আসছে আপনার দিকে, আসছে তো আসছেই, কালো, মসৃণ, সাদার উপর আলকাতরার ঔজ্জ্বল্যে কালো রেখাটি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, গাড়ির চাকার শব্দের সঙ্গে মিশে সেটা কেবলই এগিয়ে আসছে আপনার দিকে। আর আপনি যদি ওই রেখার উপর থেকে চোখ সরিয়ে না নেন, যদি সজোরে কয়েকবার গভীর নিঃশ্বাস না টানেন, আপনার ঘাড়ের পেছনে যদি শক্ত হাতে চাপড় না মারেন, তবে অবধারিতভাবে আপনি নিজেকে সম্মোহিত করে ফেলবেন, এবং শুধু সেই মুহূর্তেই আপনি সম্বিত ফিরে পাবেন যখন দেখবেন যে আপনার গাড়ির সামনের চাকা সাদা সড়কের কাঁধের উপর দিয়ে বাঁকা হয়ে পাশের কাদামাটিতে উঠে পড়েছে। তখন আপনি হ্যাঁচকা টানে তাকে রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু পারবেন না, কারণ সড়ক সেখানে উঁচু হয়ে রয়েছে। তারপর আপনার গাড়িটি যখন গোত্তা মেরে ডুব দিতে শুরু করবে তখন হয়ত আপনি চেষ্টা করবেন সামনে ঝুঁকে, হাত বাড়িয়ে, চাবি ঘুরিয়ে, গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে। আর তখন, মাইল খানেক দূরে, তুলার ক্ষেতে কাজ করতে থাকা কোনো নিগ্রো চোখ তুলে তাকাবে, তীব্র গন্ধময় আর্সেনিক-সবুজ সারি সারি কার্পাস গাছের উপর দিয়ে, আকাশের হিংস্র ধাতব কম্পমান নীলের উপর দিয়ে, দেখবে ছোট একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উপর পানে উঠে যাচ্ছে, আর সে বলে উঠবে, হা ভগবান, গেলো আরেকটা! আর তখন তার পাশের সারিতে দাঁড়ানো আরেকটি নিগ্রো বলবে, হা ভগবান! তারপর প্রথম নিগ্রোটি খিক খিক করে হেসে আবার তার

কাস্তে উঁচু করে ধরবে, আর তার কাস্তের উপর সূর্যের আলো জ্বল জ্বল করে ঝলসে উঠবে। অতঃপর কয়েকদিন বাদে সহাসড়ক বিভাগ থেকে কয়েকজন কর্মচারী আসবে, সড়কের কাঁধের উপর ওই কালো কাদামাটির জায়গাটা তারা চিহ্নিত করবে, সেখানে একটা ধাতব চৌকো বস্তু বসাবে, সাদা রঙ করা, তার গায়ে আঁকা থাকবে কালো রঙের মানুষের মাথার খুলি আর কোণাকুণি করে আঁকা দুটি হাড়। একটি ধাতব দণ্ড দিয়ে তারা ওই চৌকো চিহ্নটি কাদামাটির মধ্যে পুঁতে দেবে। এবং আরো পরে পাশের আগাছার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে প্রেমকুঞ্জলতা ওই দণ্ডটিকে জড়িয়ে ধরে ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে থাকবে।

কিন্তু যদি আপনি ঠিক সময়ে জেগে ওঠেন আর সড়কের কাঁধের উপর দিয়ে চাকা তুলে না দেন তাহলে আপনি ওই উজ্জ্বলতার মধ্যে শাঁ শাঁ শব্দ তুলে এগিয়ে যাবেন। মাঝে মধ্যে ওই উজ্জ্বলতার ভেতর থেকে আপনার দিকে সোজা এগিয়ে আসবে অন্য একটি গাড়ি, তারপর স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন তাঁর নিজ হাতে এক টানে কোনো টিনের ছাদ খসিয়ে নিচ্ছেন ওই রকম তীক্ষ্ণ কর্কশ একটা শব্দ তুলে সেই গাড়ি আপনার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবে। সামনে অনেক দূরে যেখানে তুলার ক্ষেতগুলি দিগন্তরেখায় আলোর মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে মিশেছে সেখানে সড়কটি জলাশয়ের মতো ঝিলমিল করবে, যেন জলপ্লাবিত হয়ে গেছে। আপনি তীব্র বেগে সেদিকে এগিয়ে যাবেন, কিন্তু সারাক্ষণ তা সামনেই থেকে যাবে, ওই ঝলমলে জলপ্লাবিত স্থানটি, মরীচিকার মতো। ধাতব দণ্ডের উপর বসানো নর-করোটি আর কোণাকুণি অস্থি অঙ্কিত ধাতব চৌকো চিহ্নিত স্থানের পাশ দিয়ে আপনি ছুটে যাবেন তীব্র গতিতে। কারণ এটা হচ্ছে সেই দেশ যেখানে ভেতর-জ্বলা ইঞ্জিন তার সর্বশক্তি নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। যেখানে সব পুরুষই বার্নি ওল্ডফিল্ড, যেখানে মেয়েরা অর্গান্তি আর বাতিস্তা আর আইলেটের এম্ব্রয়ডারি পরিধান করে, প্যান্টি পরে না আবহাওয়ার জন্যে। তাদের ছোট ছোট মুখ আপনার বুক গুঁড়িয়ে দেবে। গাড়ির হাওয়া যখন কপালের উপর থেকে তাদের চুল উড়িয়ে দেয় তখন আপনি সেখানে দেখতে পান ছোট মিষ্টি ঘামের ফোঁটা জড়াজড়ি করে রয়েছে। ওরা গড়ির আসনে বসে তাদের ছোট পিঠ বাঁকিয়ে, ড্যাশবোর্ডের দিকে ঝুঁকে, বাঁকা দু' হাঁটু উঁচু করে, কিন্তু খুব কাছকাছি নয়, যেন হুড-ভেন্টিলেটর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস, অবশ্য তাকে যদি ঠাণ্ডা বলা চলে, পাওয়া যায়। এটা সেই দেশ যেখানে পেট্রল, জ্বলন্ত ব্রেক-ব্যান্ড আর রেড আই-এর গন্ধ চর্চিত চন্দনের চাইতেও মিষ্টি লাগে। যেখানে আট সিলিন্ডারের ওই বস্তুগুলি লাল পাহাড়ের কোণা ঘুরে প্রচণ্ড গর্জন তুলে ছুটে আসে, আর দু'পাশে ছড়িয়ে দেয় ফেনার মতো সুর্কী আর কঙ্কর। তারপর ওই

বস্তুগুলি যখন সমতলে নেমে নতুন সড়কে পড়বে — তখন ঈশ্বর যেন বৃদ্ধ নাবিককে রক্ষা করেন!

৫৮ নম্বর ধরে আপনি আরো এগিয়ে যান, দেখবেন অঞ্চলের অন্যরূপ। সমতল এলাকা আর বিশাল তুলাক্ষেতগুলি এবার অন্তর্হিত হয়েছে। বড়ো বড়ো বাড়ি, সতেজ ওক গাছ, তুলাক্ষেতগুলির পাশে সব এক রকম দেখতে সাদা চুনকাম করা ঝুপড়ির সারি, পার্শ্ববর্তী তুলাক্ষেত থেকে প্রায় দরজা পর্যন্ত এসে পড়া তুলার গাছ, দোরগোড়ায় বসা নিগ্রো শিশু আঙ্গুল চুষতে চুষতে সামনে দিয়ে আপনার গাড়িকে হু-উ-শ করে ছুটে যেতে দেখছে — এসব দৃশ্য এখন পেছনে পড়ে রয়েছে। তার জায়গায় এখন অনুচ্চ লাল পাহাড়ের মালা, সারি সারি বেড়ার গা ঘেঁষে কালোজামের ঝোপ, নিচের দিকে ব্ল্যাকজ্যাকের ঝাড়, আর মাঝে মাঝে দু'একটি জায়গায় দ্বিতীয় দফায় গজানো পাইন গাছগুলি পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, অবশ্য যদি না ইতোমধ্যে ভেড়ার খাবার ঘাসের জন্য তাদের পুড়িয়ে ফেলা হয়ে থাকে, আর যদি পুড়িয়ে ফেলা হয়ে থাকে তাহলে চোখে পড়বে শুধু তাদের কালো কালো কাণ্ডগুলি। খণ্ড খণ্ড তুলার ক্ষেত এখন যেন পাহাড়ী ভূমির গায়ে আটকে আছে, তাদের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নালার মতো জলধারা। আর শষ্যের ফলাগুলি ঝুলে আছে শক্ত হয়ে, তাদের গায়ে দেখা যাচ্ছে টান টান হলুদ রেখার দাগ।

অনেক কাল আগে এখানে পাইন গাছের অরণ্য ছিলো কিন্তু এখন আর নেই। হারামজাদারা এখানে ঢুকে পড়ে কলকারখানা বসিয়েছে, সরু গেজ রেল লাইন পেতেছে, খাদ্য সরবরাহ করার জন্য কোম্পানির লোকজনকে সংগঠিত করেছে, দিনে এক ডলার করে দিয়েছে, আর ওই এক ডলারের জন্য তামাম বন-বাদাড় থেকে মানুষের দঙ্গল হুড়মুড় করে ওখানে এসে হাজির হয়েছে। কোথা থেকে যে ওরা এলো একমাত্র ভগবানই বলতে পারবেন। ওরা এলো গাড়িতে চেপে, গাড়ির উপরে কোনো রকমে খাট, বিছানাপত্র, দেয়াল-আলমারি বেঁধে ছেঁদে, পাঁচ পাঁচটা বাচ্চা জড়াজড়ি করে, সামনের আসনে টুপি মাথায় দাঁতে মিশি লাগানো বয়োজ্যেষ্ঠা এক মহিলা, তার স্তনে মুখ গুঁজে রয়েছে আরেকটা বাচ্চা। তারপর সুউচ্চ গানের সুর তুলে করাত চলতে থাকে, কমিসারির কেরাণী খাতায় লিখে রেখে গুড়-মুড়ি আর অন্যান্য খাবার দাবার সরবরাহ করে। এবং ইয়াংকি ডলার ও কনফেডারেট নির্বুদ্ধিতা একযোগে চার বছরের ভ্রাতৃযুদ্ধের ক্ষতগুলি অনেকখানি মুছে আনে। সব চমৎকার চলছিলো, প্রায় বিয়ের উৎসবের মতো। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেলো যে কোথাও আর পাইন গাছের চিহ্নমাত্র নেই। তখন ওরা কলকারখানাগুলি ফালা ফালা

করে ফেললো। সরু গেজ লাইনগুলির উপর ঘাস গজিয়ে সেসব ঢাকা পড়লো। রসদ যোগাবার দোকানগুলি থেকে লোকজন জ্বালানির জন্য সব কাঠ খুলে নিলো। প্রতিদিন এক ডলারের ব্যবস্থা আর থাকলো না। তখন আঙ্গুলে হীরার আংটি আর গায়ে দামী পোশাক চড়ানো বড়ো বড়ো লোকগুলি সেখান থেকে চলে গেলো, কিন্তু কিছু মানুষ, সাধারণ মানুষ, পড়ে রইলো। লাল মাটির ভেতর দিয়ে তারা নালাগুলিকে আরো গভীর হয়ে বয়ে যেতে দেখলো, আর ওই মানুষদের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ, তাদের উত্তরাধিকারী ও সম্পত্তির খবরদারী করা লোকজন, কমবেশি হাজার চারেক লোক, মেসন সিটিতে থেকে গেলো।

৫৮ নম্বর ধরে আপনি তুলা পরিষ্কার করার যন্ত্র, বিদ্যুৎ-স্টেশন, নিগ্রোদের ঝুপড়ি ইত্যাদি পার হয়ে, রেলপথ পার হয়ে, একটা রাস্তার উপরে এসে পড়বেন। সেখানে অনেকগুলি ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পাবেন। এক সময় এগুলি ছিল সাদা রঙ করা। আপনি বারান্দায় দেখবেন বিষণ্ণ লতাপাতার ঝাড়, টিনের ছাদের উপরও লতিয়ে উঠেছে, গরমের দাপটে আঙিনার গাছের পাতা নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, আর আপনার আশি অশ্বশক্তির ভাল্ব-ইন-হেড (কিংবা তাকে যাই বলুন না কেন) চল্লিশ মাইল বেগে চলতে গিয়ে যে মোলায়েম ফিসফিস শব্দ করতে থাকে তাকে ছাপিয়ে সবুজ লতাপাতার মধ্য থেকে শুনতে পাবেন গ্রীষ্মের জুলাই মাসের মাছিদের ভনভনানি।

প্রায় তিন বছর আগে ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মে আমি যখন মেসন সিটিতে যাই তখন ওই ছিলো তার অবস্থা। আমি ছিলাম প্রথম গাড়িতে, ক্যাডিলাকে, কর্তার সঙ্গে। সেখানে আরো ছিলো মিঃ ডাফি, কর্তা-গিন্নী, তাদের পুত্র, আর সুগার-বয়। আমাদের গাড়ির মতো প্রশান্ত রমণীয়তা ছিলো না দ্বিতীয় গাড়িটার। ওটা দেখে শবদেহ বহনকারী শকট আর সমুদ্র-জাহাজের মাঝামাঝি কোনো সঙ্কর যানের কথা মনে হতে পারতো। তাই বলে মফস্বল ক্লাবে গাড়ি রাখার জায়গায় কেউ এটা দেখতে পেলে লজ্জায় আপনার গাল লাল হয়ে উঠবার কোনো কারণ ছিলো না। ওই দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলো কয়েকজন সাংবাদিক, একজন ফটোগ্রাফার, আর কর্তার সেক্রেটারী স্যাডি বার্ক। স্যাডির দায়িত্ব ছিলো যথাস্থানে পৌঁছুবার পর ওরা সবাই যেন নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার মতো অপ্রমত্ত অবস্থায় থাকে সেটা সুনিশ্চিত করা।

ক্যাডিলাক চালাচ্ছিলো সুগার-বয়। আর ওকে লক্ষ করা ছিলো একটা রীতিমত আনন্দময় অভিজ্ঞতা। কিংবা তাই হতো, যদি একটা দামী দু'টনী যন্ত্র আশি মাইল বেগে ছুটে যাবার সময় তিনবার ওলট-পালট খাবার পর তার চেহারা কি রকম হয়

সে-দৃশ্য থেকে আপনি আপনার কল্পনাকে সরিয়ে এনে সুগার-বয়-এর উপর অখণ্ড মনোযোগ অর্পণ করতে পারতেন, যদি তার পেশীর সমন্বয়, তার খোদ শয়তানের মতো কৌতুকবোধ, খণ্ড-মুহূর্তের উপর অবিশ্বাস্য আধিপত্য সহকারে খড়ের গাদা বহন করা খচ্চরের গাড়ির পাশ কাটিয়ে, সামনের দিক থেকে ছুটে আসা পেট্রল ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁচিয়ে, এক চুল দূর দিয়ে, তার বেরিয়ে যাবার কেরামতি আপনি লক্ষ করতে পারতেন। ট্রাকচালকের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া তখন প্রায় থেমে যাবার অবস্থা। কিন্তু কর্তা এসব ভালোবাসতেন। তিনি সব সময় সুগার-বয়ের সঙ্গে সামনের আসনে বসতেন, চোখ রাখতেন গাড়ির স্পিডোমিটারের উপর, তাকাতেন সামনের রাস্তার দিকে, তারপর খচ্চরের নাক আর পেট্রল ট্রাকের মাঝখান দিয়ে মাত্র এক চুল ফাঁক রেখে তাঁর গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর সুগার-বয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে দাঁত বের করে হেসে উঠতেন। আর সুগার-বয়ের মাথা তখন এপাশ-ওপাশ নড়তে শুরু করতো। যখনই তার ভেতর কথার ঢেউ উঠতো, আর সে তা প্রকাশ করতে সক্ষম হতো না, তখনই অবধারিতভাবে এই ব্যাপারটা ঘটতো। সে কোনো রকমে শুরু করতো, হা-হা-হা, তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মাছি মারার ফ্লিটের ফোয়ারার মতো থুতু ছিটকে বেরুত।

হা - হা - হা — রাম — জাদা দেখেছিলো যে আমি আ - আ - আ - , এইখানে থুতুতে সে উইন্ডশিল্ডের ভেতরটা ভিজিয়ে ফেলতো, আ - আ - আসছি !

সুগার-বয়ের মুখে কথা ফুটতো না কিন্তু একসেলেরেটারে পা রেখে সে নিজেকে চমৎকার প্রকাশ করতে পারতো। হাইস্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সে কিছুতেই পুরস্কার পেতো না কিন্তু সুগার-বয়ের সঙ্গে কেউ তর্কে নামার কথাই ভাবতো না। যে তাকে চিনতো, বগলের নিচে টিউমারের মতো দেখতে তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী . ৩৮ স্পেশাল পিস্তল নিয়ে তার কেরামতি যে একবার দেখেছে, ওরকম কেউ সুগার-বয়ের সঙ্গে বিতর্কে নামার কথা কখনো ভাবতো না।

সুগার-বয়ের নাম শুনে আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে সে নিগ্রো। কিন্তু তা নয়। সে ছিলো আইরিশ, তবে ভিন্ন রকমের। লম্বায় পাঁচ ফুট দুই, বয়স সাতাশ-আটাশের বেশি নয়, কিন্তু ইতোমধ্যে মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। সুগারবয় সবসময় লাল টাই পরতো, আর চেইন দিয়ে গলায় ঝোলাতো ছোট্ট একটা রোমান ক্যাথলিক মেডেল। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম সেটা যেন সেন্ট ক্রিস্টোফারের মেডেল হয়, আর সেন্ট ক্রিস্টোফার যেন তাঁর দায়িত্বপালনে সতত সজাগ থাকেন। ওর আসল নাম ও'শীন, কিন্তু সারাক্ষণ চিনি খেতো বলে সবাই

তাকে সুগার বয় ডাকতো। কোনো রেস্তোঁরায় ঢুকলেই ও সবগুলো চিনির কিউব তুলে নিতো। তার পকেট সারাক্ষণ চিনির টুকরায় ভর্তি থাকতো। আর যখন সে হা করে চিনির ডেলা তার মুখে ছুঁড়ে দিতো তখনই তার মুখে দেখতে পেতেন ধূসর কাপড়ের সুতা জাতীয় জিনিস, আপনার পকেটে যা প্রায় সর্বদা খসে পড়ে থাকে, আর দেখতে পেতেন সিগারেটের তামাকের খণ্ডাংশ। আকাঁবাঁকা কালো দাঁতের উপর দিয়ে ও তার মুখের মধ্যে চিনির টুকরা ছুঁড়ে দিতো, তারপর সেটা চুষতে আরম্ভ করলেই আপনি তার সরু মরমীয়া আইরিশ গাল দুটিকে ভেতর দিকে চুপসে যেতে দেখতেন। তখন তাকে ঠিক আইরিশ রূপকথার একটা বামন ভূতের মতো দেখাতো।

সুগার–বয়ের সঙ্গে সামনের আসনে বসে কর্তা স্পিডোমিটারের দিকে তাকাচ্ছিলেন। পাশে পুত্র টম। ওর বয়স তখন আঠারো কিংবা উনিশ, ঠিক কতো ভুলে গেছি, তবে দেখলে আরো বড় মনে হতো। এমনিতে যে খুব বিশাল তা নয়, কিন্তু গড়নটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো। কাঁধের উপর মাথাটা বসানো একজন প্রাপ্তবয়স্কের মতো, কিশোরের মাথা যেমন ল্যাকপ্যাক করে, সবসময় বকের মতো লম্বা গলা উঁচিয়ে থাকে, ওকে সেরকম দেখাতো না। ও ছিলো তার হাইস্কুল ফুটবল টীমের বীর নায়ক, গত শরৎ মৌসুমে ঐ রাজ্যের তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে সব চাইতে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ওই সময় সংবাদপত্রে ওকে নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছিলো। কারণ ও সত্যিই ছিলো খুব ভালো। আর সেকথা ও নিজেও জানতো। তার সুদর্শন বাদামী মুখমণ্ডল, ধীরে সুস্থে উদ্ধত ভঙ্গিতে চুয়িংগাম চিবুনো চোয়ালের হাড়ের ওঠা–নামা, আধবোজা নীল চোখে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সবাইকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করা, কিংবা গোটা হাভাতে দুনিয়াটাকেই অবলোকন করা — এসবের দিকে এক পলক তাকালেই আপনি অনুভব করবেন যে সবাই যে তাকে নিয়ে পাগল, সেটা সে বেশ বুঝতো। কিন্তু সেদিন ও যখন উইলি স্টার্কের সঙ্গে সামনের আসনে বসেছিলো, উইলি স্টার্কই বস্, তখন আমি ওর মুখ দেখতে পাই নি। আমার মনে হয়েছিলো যে ওর মাথা, তার গড়ন, কাঁধের উপর তার অবস্থানের ঢং, সব হুবহু তার বাবার মতো।

মিসেস স্টার্ক — লুসি স্টার্ক — কর্তার স্ত্রী, টাইনি ডাফি, আর আমি বসেছিলাম পেছনের আসনে। লুসি বসেছিলো টাইনি আর আমার মাঝখানে। সমাবেশটা খুব মিষ্টি মধুর ছিলো না। প্রথমতঃ, গরমের কারণে পরিবেশ মোটেই আলাপচারিতার অনুকূল ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ, আমি প্রায় সারাক্ষণ খড়ের গাদার গাড়ি আর পেট্রল ট্রাকের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলাম। তৃতীয়তঃ, ডাফি আর লুসি

স্টার্কের মধ্যে কোনো কালেই ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য ছিলো না। তাই ডাফি আর আমার মাঝখানে বসে লুসি নিজের ভাবনাতে ডুবে ছিল। আর, আমার ধারণা, তার ভাববার বিষয়ও ছিলো অনেক কিছু। যেমন, সে যখন অল্পবয়স্কা এক তরুণী, মেসন সিটি স্কুলে সবে প্রথম বছরের মতো শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছে, তারপর সে যখন বিয়ে করল লালমুখো গ্রাম্য এক খামার বালককে, যে ছেলের বড়ো বড়ো দুটি হাত নড়তো ধীর গতিতে, যার ঘন কালচে–বাদামী চুলের গুচ্ছ তার কপালের উপর ঝুলে পড়তো (সংবাদপত্রে উইলির আরো হাজারো ছবির সঙ্গে আপনি এখনও বিয়ের সময়কার সেই ছবি দেখতে পাবেন), লুসির দিকে অপলক চোখে তাকাবার সময় যে চোখে তখন ফুটে উঠতো একটা পশুসুলভ আনুগত্য আর বিস্ময়ের ভাব — সেই সময় থেকে আজ অবধি যা যা ঘটেছে তার কথা লুসি ভাবতে পারতো। তীব্র গতিতে ছুটে চলা ক্যাডিলাকে বসে লুসির ভাববার মতো অনেক কিছুই ছিলো, কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে।

যেখানে এক কালের সাদা ছোট ছোট বাড়ি ছিলো সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে আমরা নগর চত্বরে এসে পৌঁছুলাম। তখন শনিবারের অপরাহ্ন বেলা। জায়গাটা লোকজনে পূর্ণ। ঘাসের চত্বরের চারপাশে মালপত্রের গাড়ি আর ঠাসাঠাসি ক্রেট। চত্বরের মাঝখানে আদালত ভবন, লাল ইটের বাক্সমতো একটা বাড়ি। তার উপর দিয়ে প্রকৃতির বহু ঝড়ঝাপ্টা গেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই। গৃহযুদ্ধেরও আগের সময়কার এই ভবন। রঙ করা দরকার। ভবনের চারপাশে ঘড়ি বসানো একটা ছোট টাওয়ার আছে। দ্বিতীয় বার ভালো করে তাকাবার পর বোঝা যায় যে ঘড়ির মুখগুলি আসল নয়, এঁকে রাখা হয়েছে মাত্র। সব ঘড়িতেই দেখা যাবে পাঁচটা বেজে রয়েছে। এক সময় তিন–লহরী অলঙ্কারের দোকানগুলির সামনে আঁকা বিশালাকার ঘড়িতে যেমন আটটা–সতেরো বেজে থাকতে দেখা যেতো এগুলি সেরকম নয়। কেনা–বেচা করতে আসা জনতার ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম, আর সুগার–বয় গাড়ির হর্নে চাপ দিতে দিতে, এপাশ–ওপাশ তার মাথা নাড়াতে নাড়াতে, বলে উঠলো, হা - হা - হা - রাম - জাদারা, আর তার মুখ থেকে ছুটলো থুতুর ফোয়ারা।

আমরা ড্রাগস্টোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই টম গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। তারপর সুগার–বয় ঘুরে দরজার কাছে আসবার আগেই কর্তা নেমে পড়লেন। আমি বেরিয়ে লুসি স্টার্ককে নামতে সাহায্য করলাম। গরম আর তন্ময়তার গভীরতা থেকে একটুক্ষণের জন্য বেরিয়ে এসে সে আমাকে ধন্যবাদ জানালো। এক মুহূর্ত ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে লুসি কোমরের কাছে স্কার্টটা সামান্য টেনে ঠিকঠাক করে

নিলো। নিঃসন্দেহে খামার–বালক উইলি স্টার্কের হৃদয় জয় করার সময় যে অবস্থা ছিলো এখন তার শরীরের ওই অঞ্চলে ওর চাইতে কিঞ্চিৎ অধিক মেদ জমেছে।

মিঃ ডাফিও তার মস্ত শরীর নিয়ে ক্যাডিলাক থেকে বেরিয়ে এলেন। এরপর আমরা সবাই গিয়ে ড্রাগস্টোরে ঢুকলাম। কর্তা লুসি স্টার্কের জন্য দরজা খুলে ধরলেন, প্রথমে লুসি ঢুকলো, তারপর কর্তা, তারপর এক এক করে আমরা সবাই। দোকানে তখন অনেক লোক। ওভার–অল পরা পুরুষরা সার বেঁধে সোডা ফাউন্টেনের সামনে দাঁড়িয়ে, যেখানে নানা হাবিজাবি ঝলমলে জিনিস সাজানো। তার সামনে কাউন্টারের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মহিলাদের দল, আর বাচ্চারা এক হাতে মায়ের স্কার্ট ধরে, অন্য হাতে আইসক্রীম নিয়ে নিজেদের ভেজা ভেজা নাক উঁচু করে বড়োদের জগতের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে দেখছে। ওদের চোখগুলি একেবারে মার্বেলের মতো। কর্তা সোডা ফাউন্টেনের সামনে দাঁড়ানো অন্যান্য খদ্দেরদের পেছনে বিনীতভাবে গিয়ে দাঁড়ালেন। টুপিটা হাতে ধরা, ঘামে ভেজা একগুচ্ছ চুল কপালের উপর ঝুলে পড়েছে। হয়তো মিনিটখানেক তিনি ওইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন. তারপর আইসক্রীম পরিবেশনরত মেয়েটি হঠাৎ তাঁকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ওর চেহারা এমন হলো যেন গীর্জার মধ্যে তার কোমরবন্ধনী ছিঁড়ে একটা অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেছে। যে আইসক্রীম সে পরিবেশন করতে যাচ্ছিলো সেটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে মেয়েটি ঊর্ধশ্বাসে দোকানের পেছন দিকে ছুটে গেলো। গাঢ় সবুজ পোশাকের নিচে তার নিতম্ব নেচে উঠলো।

এর এক সেকেণ্ড পরেই ভিড় ঠেলে, উঁচু করে হাত নাড়তে নাড়তে, লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, ছোটখাট টাক–মাথাওয়ালা একটি মানুষ দোকানের পেছন দিক থেকে এগিয়ে এলো। তার গায়ের সাদা কোটটা বেশ ময়লা, গেল সপ্তাহের ধোবার কাপড়ের সঙ্গে সেটা কাচতে দিতে হতো। লোকটি 'আরে এ যে উইলি!' বলে চেঁচিয়ে কর্তার দিকে ছুটে গেলো। কর্তাও তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দু'পা এগিয়ে এলেন, আর সাদা কোট পরা মানুষটা তখন একজন নিমজ্জমান ব্যক্তির মতো কর্তার হাত আঁকড়ে ধরলো। সে উইলির সঙ্গে করমর্দন করলো না, অন্তত: সাধারণ মানদণ্ড অনুযায়ী তাকে করমর্দন বলা চলে না। সে বরং ঝুলে রইলো কর্তার হাত ধরে, নিজের গোটা শরীরে কয়েকটা মোচড় দিলো, আর মুখ দিয়ে গলগল করে উচ্চারণ করতে থাকলো ওই পবিত্র শব্দটি : উইলি! তারপর, আক্রমণটা কেটে গেলে, একটু ভদ্র দূরত্বে দাঁড়িয়ে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকা জনতাকে উদ্দেশ্য করে সে ঘোষণা করলো, আরে, কী কাণ্ড! শোনো সবাই। এ যে উইলি!

ঘোষণাটা ছিলো সম্পূর্ণ বাহুল্য। চারপাশের জড়ো হওয়া লোকগুলির দিকে এক পলক তাকালেই আপনি বুঝতে পারতেন যে, তিন বছর বয়সের উর্ধের কোনো নাগরিক যদি পামবীচ স্যুট পরা শক্ত সমর্থ ওই মানুষটিকে উইলি স্টার্ক বলে না চিনে থাকে, তাহলে সে অবধারিতভাবে জড়বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সোডা ফাউন্টেনের ঠিক উপরে টানানো প্রমাণ সাইজের চাইতে ছয়গুণ বড়ো বিরাটাকার ছবিটির দিকে চোখ তুলে তাকালেই সে দেখতে পেতো ওই একই মুখ, বড়ো বড়ো চোখ, ছবির চোখে একটা ঘুমঘুম অন্তর্মুখী ভাবের ইঙ্গিত রয়েছে (পামবীচ স্যুট পরা লোকটির চোখে এখন আর সে ভাব নেই, কিন্তু আমি এক সময় তা দেখেছি ), চিবুক আর চোখের নিচে চামড়া শিথিল হয়ে থলির মতো একটু ঝুলে পড়তে শুরু করেছে, মাংসল ঠোঁট, এখনো ঝুলে পড়ে নি, কিন্তু ভালো করে লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে একটা ঠোঁট আরেকটার উপর এক জোড়া ইটের মতো চেপে বসেছে, আর অনুচ্চ চৌকোমতো কপালের উপর ঝুলে রয়েছে একগুচ্ছ চুল। ছবির নিচে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে ঃ "আমার অনুধ্যান হচ্ছে মানুষের হৃদয়", তারপরে স্বাক্ষর, উইলি স্টার্ক। হাজার জায়গায় আমি এই ছবি দেখেছি। ক্লাবঘর থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত।

কে একজন পেছনের ভিড়ের মধ্য থেকে চিৎকার করে উঠলেন, হাই উইলি। কর্তা হাত উঁচু করে অচেনা ভক্তের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। তারপর কর্তার চোখ পড়লো সোডা ফাউন্টেনের একেবারে পেছনের দিকে দাঁড়ানো একটি মানুষের উপর। লম্বা, দড়ি পাকানো রুক্ষ শরীর, ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, ঝলসানো হরিণের মাংসের মতো মুখের ত্বক। পরনে জিনের পাৎলুন। জেনারেল ফরেস্টের অশ্বারোহী সৈনিকদের ছবিতে যে রকম মুখ দেখা যায় সেই রকম মুখে এক জোড়া গোঁফ ঝুলে আছে। কর্তা হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। চামড়া-মুখোর দিক থেকে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না। হয়তো তার ছেঁড়া জুতো দিয়ে মেঝেতে সে একটা পা ঘষলো, কণ্ঠার নিচের ডিমটি দু'একবার ওঠানামা করলো। পুরানো ঘোড়ার জিন বাইরে রোদবৃষ্টির মধ্যে ফেলে রাখলে তার আসনের যে চেহারা হয় লোকটির মুখ হয়ে উঠেছিলো সেই রকম। ওই মুখের মধ্যে এখন তার চোখ দুটি দেখা গেলো সজাগ ও সতর্ক। কিন্তু কর্তা কাছে আসতেই সে কনুইর কাছ থেকে তার হাত বাড়িয়ে দিলো, মনে হল হাতটা যেন বুড়ো চামড়া-মুখোর নয় , স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটা কাজ করে যাচ্ছে।

আর তখন কর্তা সেই হাতের সঙ্গে নিজের হাত মেলালেন।

কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন চলছে সব, মালাকিয়া? ওর কণ্ঠনালীর হাড় বার দুই ওঠানামা করলো। তার যে হাতটা বাতাসে ঝুলছিলো, যেন কেউ তার মালিক

নয়, কর্তা সেটা ধরে নাড়া দিলেন। চামড়া-মুখো বললো, চলে যাচ্ছে একরকম।

তোমার ছেলে কেমন আছে?

বুড়ো চামড়া-মুখো জানালো, তেমন ভালো না।

অসুখে ভুগছে?

না, জেলে আছে।

কর্তা বললেন, কি কাণ্ড! ভালো ভালো ছেলেগুলোকে ওরা এখানে জেলে পুরছে, কি করছে ওরা এসব?

বুড়ো চামড়া-মুখো বললো, ও ভালো ছেলে। ব্যাপারটা ছিলো সোজা সরল মারামারির, কিন্তু ও বেচারা একটা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়ে যায়।

তাই?

ও কোনো অন্যায় বা কারচুপি করে নি। দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে মাত্র। লোকটাকে ও ছুরি মারে, তারপর লোকটা মরে যায়।

কর্তা বললেন, বিতিকিচ্ছি ব্যাপার! বিচার হয়েছে?

এখনও হয় নি।

কর্তা আবার বললেন, বিতিকিচ্ছি ব্যাপার।

চামড়া-মুখো বললো, আমার কোন অভিযোগ নেই। সহজ সরল একটা মারামারির ব্যাপার ছিলো ওটা।

কর্তা বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় বেশ ভালো লাগছে। ছেলেকে বলো যেন মুষড়ে না পড়ে।

না, ও কোনো অভিযোগ করছে না।

কর্তা তখন ঘুরে আমাদের দিকে তাকাতে শুরু করেছিলেন, আমরা যারা চোখ-ধাঁধাঁনো রোদে একশো মাইল পার হয়ে এসে এখন এমনভাবে সোডা ফাউন্টেনটাকে দেখছিলাম যেন সেটা একটা মরীচিকা। কিন্তু তখনই লোকটি বললো, উইলি।

উঁ? কর্তা জবাব দিলেন।

সোডা ফাউন্টেনের উপরে লাগানো প্রমাণসাইজের চাইতে ছয়গুণ বড়ো ছবিটার দিকে তার মাথা তুলে লোকটি মন্তব্য করলো, তোমার ছবি, উইলি, ওটাতে তোমার প্রতি সুবিচার করা হয় নি।

কর্তা মাথা একপাশে হেলিয়ে চোখ কুঁচকে ছবিটা পর্যবেক্ষণ করে বললেন, সত্যিই হয় নি। তবে ওরা যখন ওই ছবিটা তোলে তখন আমার অবস্থা ভালো ছিলো না। আমি যেন সদ্য একটা কঠিন অসুখ থেকে উঠেছি। আইনসভায় ঢুকে ওই ব্যাটাদের মাথায় কিছু কাণ্ডজ্ঞান ঠুসে দেয়া যে কি কঠিন ব্যাপার তা আর কহতব্য

নয়। রোগভোগের চাইতেও মানুষের অবস্থা বেশি খারাপ করে দেয়।

ততক্ষণে মানুষের ভিড় বেড়ে উঠেছিলো। বাইরের রাস্তা থেকে লোক ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছিলো। পেছনের ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে বললো, ওখানে ঢুকে পড়ো, উইলি। ব্যাটাদের আচ্ছা করে ধোলাই দাও ।

দেবো, দেবো। উইলি এবার সাদা কোট পরা ছোট খাট মানুষটির দিকে ফিরে বললো, ডক্, দোহাই তোমার, আমাদের কয়েকটা কোক দাও।

ডক্ যেভাবে সোডা ফাউন্টেনের ওপাশে যাবার জন্য চেষ্টা করলো সেটা দেখে মনে হচ্ছিলো তার বোধহয় উত্তেজনায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কোণা ঘুরবার সময় তার কোটের পেছনটা পালের মতো বাতাসে সোজা উপরে উঠে গেলো, নিজের হাতে কোক পরিবেশন করার জন্য সে সবুজ পোশাক পরা কাজের মেয়েদু'টিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। তারপর প্রথম গ্লাসটি ভর্তি করে কর্তাকে দিলে তিনি সেটা তাঁর স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন। ডক্ পরের গ্লাসটি ঠিক করতে করতে বললো, বলেই চললো, "এই আপ্যায়ন দোকানের পক্ষ থেকে, উইলি। আমাদের পক্ষ থেকে, উইলি।"

একটার পর একটা দিতে গিয়ে সে প্রায় পাঁচটা বেশি দিয়ে ফেললো।

ততক্ষণে দরজার বাইরে ভিড় বাড়তে বাড়তে মাঝরাস্তা অবধি জমে গেছে। জালের মধ্য দিয়ে আবছা ঘরের ভেতরে কিছু দেখার জন্য মানুষ যেমন করে তেমনিভাবে বাইরের দিকের জালের দরজার উপর মানুষের মুখ চেপে বসে আছে। বাইরে তখন লোকজন চিৎকার করছে, "ভাষণ, উইলি, ভাষণ শুনতে চাই আমরা।"

সোডা ফাউন্টেনের নিকেল–মোড়ানো একটা মুখে হাত রেখে ডক্ মুগ্ধ দৃষ্টিতে কর্তার কোক খাওয়া দেখছিলো, তাঁর কণ্ঠনালী দিয়ে কোকের প্রতিটি ফোঁটা কিভাবে নেমে যাচ্ছে সে দৃশ্যের উপর থেকে সে চোখ ফেরাতে পারছিলো না। কর্তা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাই গড ! আমি তো ভাষণ দিতে আসি নি, ডক্। আমি এসেছি আমার বুড়ো বাপকে দেখতে।"

বাইরে তখনো চিৎকার চলছে, "স্পীচ, উইলি, স্পীচ !"

কর্তা মার্বেলের কাউন্টারের উপর তাঁর গ্লাস নামিয়ে রাখলেন।

প্রবল আনন্দ উচ্ছ্বাসের পর যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিলো তা নিয়ে ডক্ আবার বললো, এই আপ্যায়ন আমার পক্ষ থেকে, উইলি।

ধন্যবাদ, ডক্।

কর্তা দরজার দিকে অগ্রসর হলেন, তারপর পেছনে তাকিয়ে বললেন, ডক্, তুমি বরং দোকানে বসে এখন চটপট বেশ কিছু এ্যাস্পিরিন বিক্রি করে তোমার

তব্যের পয়সা উসুল করে নাও।

এর পর তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, জনতা পেছনে সরে জায়গা করে দিলো, আর আমরা এক এক করে তাঁর পেছন পেছন চললাম।

মিঃ ডাফি সামনে পা চালিয়ে কর্তার পাশে গিয়ে জানতে চাইলো তিনি সত্যিই ভাষণ দিচ্ছেন কিনা, কিন্তু কর্তা তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি রাস্তার মধ্য দিয়ে একেবারে জনতার ভেতরে ঢুকে গেলেন, যেন সেখানে কোন লোকজনই নেই। লাল লম্বা মুখের মানুষগুলো সতর্ক চোখ মেলে দেখছিলো, সজাগ, বন্য দৃষ্টি, ঝোপের মধ্য থেকে যেন লক্ষ করছে সব কিছু, কোথাও কোনো শব্দ নেই। কর্তার পথ থেকে জনতা নিঃশব্দে সরে দাঁড়ালো, আর আমরা যারা ক্যাডিলাকে ছিলাম এবং অন্যরা যারা দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলো তারা সবাই তাঁর পেছন পেছন চললাম। তারপর আবার জনতা পেছন দিকে ভিড় করে জমে গেলো।

কর্তা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা মানুষ যখন কোনো একটা ভাবনায় ডুবে গিয়ে মাথা নিচু করে একা একা হাঁটতে থাকে কর্তা ঠিক সেই ভাবে মাথা সামান্য নিচু করে হেঁটে চললেন। টুপিটা হাতে ধরে থাকার জন্য তাঁর চুল কপালের উপর ঝুলে পড়েছে। আমি সেটা ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, কারণ আমি এক বার কি দু'বার তাঁকে সজোরে দ্রুত তাঁর মাথা ঝাঁকাতে দেখেছি, একা একা হাঁটার সময় কপালের উপর চুলের গুচ্ছ ঢলে পড়লে তিনি সর্বদা এটা করতেন, মুখে লাগাম চড়াবার পর একটা ঘোড়া নিজেকে খুব প্রাণবন্ত মনে করে যেভাবে ঝাঁকুনি দেয় ঠিক সেই ভাবে। তিনি সোজা রাস্তা পেরিয়ে ঘাসের চত্বর অতিক্রম করে কোর্টভবনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। সিঁড়ি ভেঙে কেউ তাঁকে অনুসরণ করলো না। একেবারে উপরে উঠে তিনি ধীরে ধীরে ঘুরে জনতার দিকে মুখ ফেরালেন। তিনি তাদের দিকে তাকালেন, নিজের বড়ো বড়ো চোখদু'টি একটু মিট মিট করলেন, যেন এই মাত্র আদালত–ভবনের অন্ধকার হলঘর থেকে বাইরের খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এবং এখন আলোর সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। তিনি চোখ মিটমিট করলেন, তাঁর চুল নেমে এসেছে কপালের উপর, তাঁর পাম–বীচ কোটের বগলের নিচে ঘামের ভেজা দাগ দেখা যাচ্ছে। তারপর তিনি তাঁর মাথাটা একবার সজোরে নাড়লেন, আর অকস্মাৎ তাঁর চোখ আরো বড়ো দেখাল, যেন আলো তাঁর গোটা মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আর তাঁর চোখে তখন আপনি লক্ষ করলেন তীব্র এক দ্যুতি।

আমি মনে মনে বললাম, এবার আসছে। আপনি তাঁর চোখ দুটিকে হঠাৎ

ওইভাবে বিস্ফারিত হতে দেখবেন, আপনার মনে হবে তাঁর ভেতরে যেন কিছু একটা ঘটেছে, আর তারপরই আপনি দেখবেন ওই দ্যুতি, আপনি বুঝতে পারবেন যে, তাঁর ভেতরে একটা কিছু ঘটে গেছে, আর তখন ভাববেন, হ্যাঁ, এবার আসছে। ওই রকমই হয়েছে সর্বদা। প্রথমে চোখ বড়ো হয়ে ওঠা, তারপর দ্যুতি, পেটের ভেতরে যেন একটা শীতল চাপ, কেউ যেন সেখানে একটা কিছু ধরে রেখেছে, অন্ধকারের মধ্যে, আপনার একান্ত সত্তা যেটা, শীতল রাবারের দস্তানা পরা শীতল হাতে চেপে ধরে আছে। ব্যাপারটা ঠিক এই রকম, আপনি অনেক রাতে ঘরে ফিরেছেন, দরজার নিচ দিয়ে টেলিগ্রামের হলুদ খামটা দেখা যাচ্ছে, আপনি নিচু হয়ে সেটা তুলে নিয়েছেন কিন্তু এখনো তা খুলছেন না, এক মুহূর্ত সময় নিচ্ছেন আপনি, ঠিক সেই মুহূর্তের মতো এই ব্যাপারটা। খাম হাতে আপনি হলঘরে দাঁড়িয়ে আছেন, অনুভব করছেন যে একটা চোখ আপনাকে লক্ষ করছে, একটা বিশাল চোখ মাইলের পর মাইল দূর থেকে, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, ঘরবাড়ি আর দেয়ালের মধ্য দিয়ে, আপনার কাপড়জামা আর চামড়া ভেদ করে আপনাকে দেখছে, আপনি গুটিসুটি পাকিয়ে পড়ে আছেন, অন্ধকারের মধ্যে, সেই অন্ধকারই আপনি, আপনার মধ্যে, আপনার নিজের মধ্যে যে ছোট্ট বিষণ্ণ ভেজাভেজা ভ্রূণ আপনি বয়ে বেড়ান তার মতো, তাকে লক্ষ করছে ওই চোখ। খামের মধ্যে কি আছে চোখটা তা জানে, ও আপনাকে লক্ষ করছে কখন খাম খুলবেন, কখন জানবেন তার মধ্যে কি আছে। কিন্তু অন্ধকারের সুদূর গভীরে যে-আপনি, যে ভেজাভেজা বিষণ্ণ ছোট্ট ভ্রূণ শুয়ে আছে, সেও তার বিষণ্ণ ছোট্ট মুখ উঁচু করে আছে, তার চোখ দৃষ্টিহীন, আপনার ভেতরে সে শিরশির করে কেঁপে ওঠে, খামের মধ্যে কি আছে সে তা জানতে চায় না। সে অন্ধকারে না-জানার মধ্যে শুয়ে থাকতে চায়, তার অজ্ঞানতার উষ্ণতার মধ্যে থাকতে চায় সে। মানুষের চরম অন্বিষ্ট হচ্ছে জ্ঞান কিন্তু একটা জিনিস সে জানতে পারে না। তার জ্ঞান তাকে রক্ষা করবে, নাকি তাকে নিধন করবে, তা সে জানতে পারে না। সে হত হবে ঠিকই, কিন্তু যে-জ্ঞান সে লাভ করেছে সেই জ্ঞানের জন্য সে নিহত হচ্ছে কিনা, নাকি যে-জ্ঞান সে লাভ করতে পারেনি তার জন্য সে নিহত হচ্ছে, সে-জ্ঞানটুকু লাভ করতে পারলেই সে রক্ষা পেতো, এটা সে জানতে পারে না। আপনার পেটের মধ্যে একটা শৈত্য অনুভব করেন আপনি, কিন্তু খামটা আপনি খোলেন, খুলতেই হয়, কারণ মানুষের চরম অন্বিষ্টই হচ্ছে জ্ঞান।

কর্তা ওখানে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখদুটি বিস্ফারিত, দ্যুতিময়, জনতার মধ্যে এক বিন্দু শব্দ নেই। স্কোয়্যারের কাটালপা গাছে, অনেক উপরের দিকে, একটা খাপছাড়া উন্মাদ গ্রীষ্মের মাছি ভনভন করে ঘুরছিলো, তারপর সেই শব্দও

এক সময় থেমে গেলো, তখন আর কিছু নেই, শুধু প্রতীক্ষা। এবার কর্তা এক ধাপ এগিয়ে এলেন, কোমল পায়ে, সহজ ভঙিতে।

আমি কোনো ভাষণ দেবো না, কর্তা বললেন, তারপর হাসলেন। কিন্তু চোখ দু'টি তখনো বিস্ফারিত, তখনো দ্যুতিময়।

তিনি বললেন, আমি এখানে কোন ভাষণ দেবার জন্য আসি নি। আমি এসেছি আমার বুড়ো বাবাকে দেখতে, তাঁর বাড়িতে কিছু মুখে দেবার মতো এখনো আছে কিনা সেটা দেখতে। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলবো, বাবা, তুমি যে ভাজা শুয়োরের মাংসের এতো গাল-গল্প করেছিলে, গত শীতে সারাক্ষণ যে খাবারের কথা তুমি আমাদের এতো শুনিয়েছো — কর্তা এসব বলছিলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর তখন ভিন্ন রকম, একটু নাকি সুর, ওই লাল পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষ যেভাবে কথা বলে সেই রকম, মাঝখানে ছোট্ট ভাঙন দিয়ে, এক টানা সুরে। তিনি বলছিলেন, আমি বলবো, বাবা, ওই খাবারের কি হলো?

কিন্তু সেই দ্যুতি তখনো চোখে রয়েছে, আর আমি মনে মনে বললাম, এবার বোধহয় আসছে। হয়তো এখনও বেশি দেরি হয়ে যায় নি। বলা শক্ত। হঠাৎ হয়তো সেটা এসে পড়বে, হয়তো তিনি বলে উঠবেন।

কিন্তু তিনি বলছিলেন, কাজেই, আমি এখানে তোমাদের সামনে কোনো বক্তৃতা-ভাষণ দিতে আসি নি। এবার তাঁর পুরানো গলায়, তাঁর নিজের গলায়। কিংবা সেটাই কি আসলে তাঁর গলা? কোন্‌টা তাঁর সত্যিকার গলা, অতগুলি কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন্‌টা? ধন্দের মধ্যে পড়বেন আপনি।

তিনি বলছিলেন, আমি তোমাদের কাছে বলতে আসি নি যে আমাকে কিছু দাও। না, ভোটও চাইছি না আমি। বাইবেলে আছে, তিনটি জিনিস কখনো তৃপ্ত হয় না, হ্যাঁ, চারটে জিনিস, কখনো বলে না যথেষ্ট হয়েছে — এখানে তাঁর গলার স্বর অন্য রকম হলো — কবর, বন্ধ্যা গর্ভ, অতৃপ্ত মাটি যা জলে পূর্ণ হয় না, আর আগুন কখনো বলে না — যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সলোমন আরেকটা ছোট্ট জিনিস যোগ করে তাঁর তালিকাটি পূর্ণ করতে পারতেন। তিনি রাজনীতিবিদ্‌দের কথাটা যোগ করতে পারতেন, যারা নিরন্তর বলতে থাকে, দাও, আমাকে দাও।

এখন তিনি সহজভাবে শরীরটা একটু পেছনে ঠেলে দিয়েছেন। মাথাটা একপাশে হেলিয়ে চোখ মিটমিট করলেন, হাসলেন, তারপর বললেন, সেই প্রাচীন যুগে যদি রাজনীতিবিদ্‌রা থাকতো তা হলে আমাদের মতো তারাও নিশ্চয়ই বলতো, দাও, দাও, আমাকে দাও। কিন্তু আজ আমি রাজনীতিবিদ্‌ নই। আমি আজ ছুটিতে এসেছি। আজ আমি তোমাদেরকে আমার জন্য ভোট দিতে পর্যন্ত বলবো না।

নির্জলা সত্যি কথা যদি বলি, তোমাদেরকে আমার সে কথা বলতেই হবে না। না, আজ না। ওই যে বড়ো বাড়িটা, সামনের বারান্দার দিকে দোতলা সমান উঁচু সাদা স্তম্ভ, সেখানে আমার একটু কাজ আছে এখনো, ওই যেখানে প্রাতরাশের জন্য পীচের আইসক্রীম পরিবেশিত হয়। কতিপয় রাজনীতিবিদ আমাকে যে ওখান থেকে খেদিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চান না তা নয়। জানো — এইখানে তিনি একটু সামনের দিকে ঝুঁকলেন, যেন ওদের কাছে কোনো গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছেন — জানো, আমি কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে কোনোক্রমেই বন্ধুত্ব করতে পারি না। ভারী মজার কিন্তু। যত চেষ্টাই করি না কেন, কিছুতেই কিছু হয় না। আমি খুব বিনয় দেখিয়েছি, বলেছি প্লীজ, কিন্তু প্লীজ-এ কোনো কাজ হয় নি। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাকে আরো কিছুকাল ওদের বরদাস্ত করতে হবে। তোমরা করেছো। আমার হাত থেকে রেহাই পাবার আগে পর্যন্ত করতে হবে। অতএব উত্তম হবে তোমরা যদি হাসি মুখে সেটা সহ্য করো। ফোঁড়ার চাইতে তা খারাপ নয়, কি বলো?

তিনি থামলেন, চারপাশে তাকালেন, ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে সোজা ওদের উপর চোখ রাখলেন। মনে হলো তিনি এক জায়গায় একটি মুখ লক্ষ করলেন, এক খণ্ডিত-মুহূর্তের জন্য সেখানে তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে রইলো, তারপর একটু দূরে অন্য একটি মুখের উপর সরে গেলো তা। আবার হাসলেন তিনি, চোখ মিটমিট করলেন, তারপর বললেন, হুঁ? কি ব্যাপার? বেড়াল জিভ নিয়ে পালিয়েছে নাকি?

জনতার ভেতর থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, লেজে ফোঁড়া উঠেছে!

উইলি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বললো, যা ছেলে! তা হলে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো!

কে একজন হেসে উঠল।

উইলি আবার চিৎকার করে বললো, তোমার মতো ক্ষুদে একরত্তি একটা প্রাণীর বেলাতেও ঈশ্বর যে তাঁর অপরিসীম দয়ায় একটা পশ্চাদ্দেশ ও একটা সম্মুখদেশ দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকাজ সম্পন্ন করেছেন সেজন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

কে একজন জনতার মধ্য থেকে চেঁচিয়ে বললো, সাবাশ, উইলি, বেড়ে বলেছো।

তারপর তারা হাসতে শুরু করলো।

কর্তা তাঁর ডান হাত নিজের মাথা সমান উঁচু করে সামনে প্রসারিত করে ধরলেন, হাতের তালু রাখলেন নিচের দিকে, তারপর তাদের হাসি আর শীসের ধ্বনি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, না, আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু চাইবার জন্য এখানে আসি নি। ভোট কিংবা অন্য কিছু। মনে হচ্ছে, তার

জন্য পরে আসবো। যদি ওই বড়ো বাড়িটায় পীচ আইসক্রীমের প্রাতরাশ উপভোগ করতে থাকি তাহলে আসবো। কিন্তু তোমরা সবাই আমাকে ভোট দেবে আমি সেটা প্রত্যাশা করি না। বাঃ, তোমরা সবাই যদি গিয়ে উইলির জন্য ভোট দাও তাহলে, ঘোড়ার ডিম, তোমরা তর্ক-বিতর্ক করবে কি নিয়ে? আবহাওয়ার কথা ছাড়া তো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, আর আবহাওয়ার উপর তো ভোট দেয়া চলে না।

তিনি বললেন, না। আর এবার তাঁর অন্য কণ্ঠস্বর। প্রশান্ত, সহজ, ধীর-গতি, যেন দূর থেকে তা আসছে। তিনি বললেন, আজ আমি এখানে কিছু চাইতে আসি নি। আমি আজ ছুটি নিয়েছি, নিজের বাড়িতে এসেছি শুধু। একটা মানুষ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তাকে যেতে হয়। সে অচেনা খাটে অন্ধকারে শয্যা গ্রহণ করে, আর সেখানে গাছের ডালের বাতাস ভিন্ন রকম। সে রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়, চোখের সামনে কতো মুখ দেখে, কিন্তু সেসব মুখের কোনো নাম নেই। যেসব কণ্ঠস্বর সে শোনে তা অনেক কাল আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় যেসব কণ্ঠস্বর সে কানের মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলো সেসব নয়। যেসব স্বর সে শোনে তা বড়ো উচ্চগ্রামের। সেগুলি এতো উচ্চকণ্ঠ যে তার কানে যেসব কণ্ঠস্বর সে বয়ে নিয়ে এসেছিলো, অনেক কাল ধরে সেসব আর সে শুনতে পায় না। কিন্তু একটা মুহূর্ত আসে যখন সব শান্ত, নীরব, তখন অনেক কাল আগের নিজের কানের মধ্যে বয়ে নিয়ে আসা কণ্ঠস্বরগুলি সে আবার শুনতে পায়। তারা কি বলে তা সে বুঝতে পারে। তারা বলে, ফিরে এসো। তারা বলে, খোকা, ফিরে আয়। আর তখন সে ফিরে আসে।

তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হলো। কোনো স্বর যেমন সচরাচর ধীর নিচু লয়ে পৌঁছে থেমে যায় তেমনভাবে নয়। স্কোয়্যার আর কোর্টভবনের সামনের জনতাকে যে নীরবতা আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, ঘাসের চত্বরের উপর ভিড় করা মানুষের মাথার উপর দিয়ে উঠে যাওয়া কাটাল্‌পা গাছদুটির চারপাশে গ্রীষ্মের মাছিকূলের ভনভনানি যে নীরবতাকে আরো গাঢ় করে তুলেছিলো, এক মুহূর্ত আগে সেই নীরবতার মধ্যে জেগে ছিলো তাঁর কণ্ঠস্বর, শোনা যাচ্ছিলো শব্দের পর শব্দ। তারপর হঠাৎ দেখা গেলো তা আর নেই। আছে শুধু গ্রীষ্মের মাছির শব্দ, সেই শব্দ যেন আপনার মাথার মধ্যে, আপনি যে-যন্ত্র, যে-কলকব্জা আর নাট-বল্টু, এ যেন তারই ঘূর্ণনের শব্দ, আপনি যাই বলুন না কেন, ওরা নিজেরা তাদের সুবিবেচনা মতো না থামলে সে-শব্দ কিছুতেই থামবে না।

ওখানে তিনি আধ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলেন, কোনো কথা না বলে, একটুও না নড়ে। সামনে মানুষের ভিড়ও যেন দেখতে পাচ্ছিলেন না। তারপর হঠাৎ যেন তাদের আবিষ্কার করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, অতএব-সে ফিরে

আসে। যখন সে অর্ধ-দিবসের ছুটি পায়। আর সে বলে, এই যে ভাইরা, কেমন আছো তোমরা? আর আমি তাই বলছি।

এই কথাই তিনি বলেছিলেন। হাসি মুখে তিনি নিচের দিকে তাকালেন, জনতার দিকে তাকাতে তাকাতে তার মাথা এক পাশ থেকে অন্য পাশে ঘোরালেন, মনে হলো এক জায়গায় একটা মুখের উপর তার চোখ একটুক্ষণ থামলো, তারপর সেখান থেকে সরে গিয়ে আরেকটা মুখের উপর গিয়ে থামলো একটুক্ষণের জন্য।

তারপর তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি যেন এই মাত্র পেছনের অন্ধকার-ধূসর হলঘর থেকে বিশাল খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে উন্মুক্ত জায়গায় এসে পড়েছেন, সিঁড়ি ভেঙ্গে একা হেঁটে চলেছেন, তাঁর সামনে কেউ নেই, কেউ তাঁকে দেখছে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেখানে তাঁর আপন বাহিনী, লুসি স্টার্ক আর আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম সোজা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, এমনভাবে যেন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে, খুব ভালোভাবে চেনেনও না আমাদের, তারপর সোজা হাঁটতে থাকলেন। তিনি সোজা জনতার দিকে এগিয়ে গেলেন যেন কোনো মানুষ নেই সেখানে। জনতা একটু পেছনে সরে তাঁকে পথ করে দিলো, ওদের চোখ তাঁর উপর স্থির নিবদ্ধ, আর আমরা, তাঁর বাকী দলবল, তাঁকে অনুসরণ করলাম। জনতা আবার আমাদের পেছনে ঘন হয়ে জমাট বাঁধলো।

এখন লোকজন হাততালি দিতে আর চিৎকার করতে শুরু করেছে। একজন কেউ চেঁচিয়ে উঠলো, হাই, উইলি!

কর্তা লোকজনের মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা পেরিয়ে ক্যাডিলাকে উঠে তাঁর আসনে বসলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে উঠলাম। ফটোগ্রাফার ও অন্যান্যরা তাদের গাড়িতে উঠলো। সুগার-বয় গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আস্তে রাস্তায় নামলো। লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি সরে গেলো না, এত ঠাসাঠাসি করে ছিলো যে পারলো না দ্রুত সরে যেতে। আমরা যখন আস্তে আস্তে ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছিলাম তখন গাড়ির ঠিক বাইরেই মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছিলো, ফুট খানেকের বেশি দূরে নয়. ওরা দেখছিলো আমাদের। একেবারে সোজাসুজি। লাল লম্বা অথবা বাদামী কোঁচকানো মুখে বসানো চোখগুলি গাড়ির ভেতরে বসা আমাদের দেখতে লাগলো।

সুগার-বয় ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছে। তার ভেতরে শব্দ জমে উঠতে শুরু করেছিলো। চালকের আয়নায় আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর ঠোঁট নড়ছে। 'হা - হা - হা - রাম - জাদা', বলে উঠলো সে, আর ছিটকে থুতু ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে।

কর্তা এখন নিজের মনের মধ্যে ডুবে গেছেন।

সুগার–বয় বললো, হা – হা –হা– রাম – জাদা। হর্ন বাজালো সে, কিন্তু ততক্ষণে স্কোয়্যার থেকে আমরা বেরিয়ে একটা পার্শ্ব–সড়কে পড়েছি, এখানে কোনো মানুষ নেই। শহরের বাইরের সীমানায় ইটের স্কুল–বাড়িটা পেরুবার সময় আমরা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে যাচ্ছিলাম। স্কুলবাড়িটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরানো দিনের কথা মনে পড়লো। প্রায় চৌদ্দ বছর আগে ১৯২২ সালে এইখানে উইলির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। উইলি তখন বিশেষ কিছু না, মেসন কাউন্টির কাউন্টি ট্রেজারার, ওই স্কুল ভবন বানাবার জন্য একটা বণ্ড ছাড়ার ব্যাপারে শহরে কথাবার্তা বলতে এসেছেন। আমার মনে পড়লো কিভাবে স্লেডের বিলিয়ার্ড খেলার পেছনের ঘরে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। স্লেড বীয়ার বিক্রী করেছিলো। আমরা একটা টেবিলের চারপাশে বসেছিলাম, টেবিলের উপরটা মার্বেলের, পায়াগুলিতে তারের কাজ। সেই সময় ড্রাগস্টোরে এই রকম টেবিলই থাকতো। তরুণ বয়সে আপনি আপনার হাইস্কুলের বান্ধবীকে আইসক্রীম খওয়াবার জন্য এই রকম জায়গাতেই নিয়ে এসে টেবিলের নিচে হাঁটু দিয়ে যখন একে অপরকে স্পর্শ করতেন তখন টেবিলের পায়ার তারের কাজ বেশ বিঘ্ন ঘটাতো।

আমরা ছিলাম চার জন। টাইনি ডাফিও ছিলো সেখানে। তখনই সে ততটা বড় যতটা পরে হয়ে উঠবে। সে যে কি চীজ, সেটা বোঝার জন্য আপনার কোনো সঙ্কেতের দরকার হতো না। আবহাওয়া ঠিক থাকলে ওর চোখের সাদা অংশ লক্ষ করবার আগেই আপনি বুঝে ফেলতে পারতেন যে ও সিটিহলের একটা বাজে মানুষ। ভুঁড়ি আছে, কোমরের কাছে বেল্টের ঠিক উপর দিয়ে সার্ট ঘামে ভেজা. মুখটা পনীরের মতো, শুধু রঙটা বিস্কুটের , আর সোনা বাঁধানো দাঁতে এক গাল হাসি। ও ছিলো ট্যাক্স এসেসর, শোলার ঋজু শক্ত টুপি মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া। টুপিতে ডোরাকাটা ব্যান্ড।

আর ছিলো এলেক্স মিশেল। মেসন কাউন্টির এক গেঁয়ো ছেলে কিন্তু দ্রুত সব কিছু রপ্ত করে ফেলেছিলো। এত দ্রুত যে ডেপুটি শেরিফের পদ লাভ করে। কিন্তু বেশি দিন ওই পদে থাকতে পারে নি। ও এখন কিছুই না। বেআইনী টাকা আদায় করতে গিয়ে এক আড্ডাখানায় জনৈক হুল্লুড়ে পিয়ানো–বাদকের ছুরির আঘাতে তার অবস্থা কাহিল হয়। এলেক্স ছিলো, আগেই বলেছি, মেসন কাউন্টির ছেলে।

ডাফি আর আমি স্লেডের আস্তানায় পেছনের ঘরে বসে এলেক্সের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি ভাবছিলাম যে ওর সঙ্গে একটা পেশা সংক্রান্ত কাজ করতে পারবো। আমি তখন সাংবাদিকতা করি। এলেক্স একটা খবর জানে যেটা

আমি জানতে চাই। ডাফি ছিলো আমার বন্ধু। সে তাকে আসতে বলেছে। সে অন্ততঃ জানতো যে ওই সময় জো হ্যারিসনের দলকে সমর্থন দানকারী ক্রনিক্‌ল্‌ পত্রিকায় আমি চাকরি করছি। জো হ্যারিসন তখন গভর্নর। আর ডাফি ছিলো জো হ্যারিসনের লোক।

তাই, সেই ১৯২২ সালের জুন কিংবা জুলাই মাসের এক গরমের সকালে, আমি স্লেডের আস্তনায় এলেক্সের আসার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। স্লেডের আস্তানার পেছনের ঘরে বসে আমি শুনছিলাম নীরবতার শব্দ। স্লেডের আস্তানার মতো কোনো জায়গায় আপনি যদি মধ্য-প্রভাতে গিয়ে উপস্থিত হন, আর আপনিই যদি হন প্রথম ব্যক্তি, তা হলে তার তুলনায় মাঝ-রাতের কোন ফিউনারেল পার্লারকেও আপনার মনে হবে প্রচণ্ড শব্দমুখর, মনে হবে আপনার কান ফেটে যাচ্ছে। আপনি সেখানে বসে বসে ভাববেন, আহ্‌, কাল রাতে কি চমৎকার ছিল এ জায়গাটা, কি ভাইয়াচারি, হো হো করে কি হাসি আর হৈ-হুল্লোড়, আর এখন আপনি মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখবেন দুটি সমান্তরাল ভেজা ভেজা ঝাঁটার দাগ, ম্রিয়মান বুড়ো নিগ্রো পরিচারকটি ভোরে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে, আর সাধারণ পরিবেশটা এমন মনে হবে যেন আপনি এখন ওখানে বসে আছেন স্রষ্টার চরম নৈঃশব্দের মধ্যে, আর এবার দান চালবার পালা সৃষ্টিকর্তার। তাই আমি সেখানে ওই নীরবতার মধ্যে বসে ছিলাম (দুতিন গ্লাস গলায় ঢালবার আগে সকালের দিকে ডাফির মুখে কখনোই বিশেষ কথা ফুটতো না), আর আমার টিস্যুগুলি ভেঙে পড়ার শব্দ শুনছিলাম, আর শুনছিলাম আমার সঙ্গীর মাংসল দেহ-নিঃসৃত স্বেদবিন্দুগুলির কোমল ভদ্র শব্দ করে ফেটে যাবার শব্দ।

এলেক্স তার সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে এসেছিলো। আমি বুঝলাম যে ওর সঙ্গে আমার কথাবার্তা বিশেষ সুবিধার হবে না। আমার কাজটা ছিলো একটু সূক্ষ্ম ও গোপন ধরনের, অপরিচিত কোনো মানুষের সামনে বলার যোগ্য নয়। আমার মনে হলো সেটা বুঝেই এলেক্স তার একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। খুব সম্ভব তাই। নিজের নবিশী ভঙ্গিতে এলেক্স ওই রকমই ছিল। একটু বেশি সতর্ক। সে যাই হোক, তার সঙ্গে ছিলেন কর্তা।

তফাৎ শুধু এইটুকু যে তখনো তিনি কর্তা হন নি। সাধারণ মানুষের স্থূল চোখে নয়। বিমূর্ত ও অজাগতিক দিক থেকে তিনি কর্তাই ছিলেন, কিন্তু আমি কি ভাবে সে কথা জানবো? নিয়তি এগিয়ে এলো দরজা দিয়ে, পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ভারী বুক, পায়ের দিকটায় একটু খাটো, পরনে সাত-পঞ্চাশের সিয়ারসাকার স্যুট, প্যান্টের ঝুল বেশি লম্বা হয়ে যাওয়ায় উঁচু কালো জুতো জোড়ার উপর ভাঁজ

পড়ে নেমে গেছে, জুতোর গায়ে বুরুশ চালালে ভালো হতো, সান-ডে স্কুল সুপ্যারিন্টেন্ডেন্টের পোশাকের মতো উঁচু শক্ত কলার, নীল ডোরা-কাটা টাই গলায় বাঁধা, আপনি ঠিক জানেন যে গত বড়দিনের সময় তার স্ত্রী তাকে এটা উপহার দিয়েছিলো, আর কার্ডসহ সে এটা সযত্নে টিসু কাগজে মুড়ে তুলে রেখেছিলো (প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছ থেকে ডার্লিং উইলিকে, শুভ বড়দিন), তুলে রেখেছিলো শহরে আসবার দিন পরবার জন্য, আর তার মাথায় রয়েছে একটা ধূসর রঙের ফেল্ট হ্যাট যার ব্যান্ডের মধ্য দিয়ে ঘামের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিয়তি এগিয়ে আসে ঠিক ওই ভাবে, কিন্তু আপনি তা জানবেন কেমন করে? এলেক্স মিশেলের পেছন পেছন নিয়তি এগিয়ে আসে। মিশেল ছ'ফুট দুই ইঞ্চি, চমৎকার শরীরের গড়ন, কিংবা বলা যায়, ওই পিয়ানো-বাদকের হাতে ঘায়েল হবার আগে পর্যন্ত তাই ছিল, শক্ত সমর্থ, আগুনে পোড়া তামাটে মুখ, মুখের উপরের চঞ্চল ছোট ছোট বাদামী চোখ তার ধ্রুপদী ঊর্ধাঙ্গের সঙ্গে বেমানান। এলেক্স মিশেলের পেছন পেছন বিনয়ী ভঙ্গিতে হেঁটে এলো নিয়তি। আর এলেক্স কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো টেবিলের কাছে, যদিও সেই ভঙ্গির ফাঁকিটুকু কারো চোখ এড়ালো না।

এলেক্স আমার সাথে করমর্দন করলো, সুসম্ভাষণ জানালো, কাঁধে চাপড় মারলো, তার ওই শক্ত হাতের চাপে কাঠবাদাম ভাঙতে পারা যেতো, মিঃ ডাফির প্রতি যথাযোগ্য সৌজন্য দেখালো, আর মিঃ ডাফি চেয়ার থেকে না উঠে তার হাত বাড়িয়ে দিলো। তারপর, যেন পরে মনে পড়েছে এমনি ভাবে, তার পেছন পেছন আসা সঙ্গীর দিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এলেক্স বললো, ভদ্রমহোদয়গণ, এ হল উইলি স্টার্ক, মেসন সিটির লোক, আমার দেশের মানুষ। উইলি আর আমি একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। হ্যাঁ, উইলি ছিলো বই-এর পোকা, আর টিচার্স পেট্, মাস্টারনীর প্রিয়পাত্র। তাই না, উইলি? বলেই এলেক্স নিজের মধুর রসবোধে উল্লসিত হয়ে ঘোড়ার মতো শব্দ করে হেসে উঠলো আর মাস্টারনীর প্রিয়পাত্রের পাঁজরে একটা খোঁচা মারলো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, ও এখনো টিচার্স পেট্, তাই না উইলি, তাই না?

ডাফি আর আমার দিকে তাকিয়ে সে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো, করতে করতে আবার তার উল্লাস উথলে উঠলো, উল্লসিত হ্রেষার মতো তার হাসিতে স্লেডের পেছন দিকের ঘরটি গমগম করতে লাগলো ঃ উইলি — উইলি — ও এক স্কুল-টিচারকে বিয়ে করেছে।

ব্যাপারটা এলেক্সের কাছে অসম্ভব মজার মনে হলো। ওদিকে উইলি পরিচয় পর্বের সৌজন্যমাফিক প্রথাগুলি সম্পন্ন করতে না পেরে, ঝোড়ো হাওয়ার

সামনে মাথা ঈষৎ নত করে, চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো। পুরানো ধূসর টুপি হাতে ধরা, টুপির বাইরের দিকের ব্যান্ডের উপর দিক ঘামে ভিজে গেছে। শক্ত গেঁয়ো কলারের উপর দিয়ে তার বড়োসড়ো মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না।

এলেক্স একই রকম স্ফূর্তির সুরে আবার বললো, হ্যাঁ — হ্যাঁ — ও এক স্কুল টিচারকে বিয়ে করেছে!

মিঃ ডাফির অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানবুদ্ধি ছিলো যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলায় সক্ষম। মিঃ ডাফি বললো, আমি শুনেছি স্কুল-টিচাররাও নাকি ওই একই জায়গায় তৈরি হয়। মন্তব্যটি করে মিঃ ডাফি তার ঠোঁটটা ফাঁক করলো, সোনার দাঁত ঝিকমিক করে উঠলো, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ নির্গত হলো না। কারণ মিঃ ডাফির আত্মবিশ্বাস ছিলো প্রচুর, তার স্টাইল ছিলো কোনো একটা চটুল ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক মন্তব্য করার পর নিজে চুপ করে থেকে রসিকতাটির নিজস্ব মাহাত্ম্যের জোরে জনগণকে তার প্রশংসা করার সুযোগ দেওয়া।

এলেক্স উদারভাবে সেই প্রশংসার যোগান দিলো। আমি আমার মুখে ছোট্ট একটু রুগ্ন হাসির রেখা ফুটিয়ে তুললাম। উইলির মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না।

এলেক্সের যখন আবার কথা বলার মতো অবস্থা হলো তখন সে বললো, গড্। গড্, মিঃ ডাফি। আপনার জুড়ি নেই! সত্যি! এলেক্স আবার শিক্ষয়িত্রীর প্রিয়পাত্রের পাঁজরে একটা খোঁচা মেরে তাকে একটু প্রাণচঞ্চল করার প্রয়াস পেলো। কোনো ফল না হওয়ায় উইলির পাঁজরে আরেকটা খোঁচা দিয়ে এলেক্স এবার সরাসরি জানতে চাইলো, কি, মিঃ ডাফির কোনো জুড়ি নেই, তাই না?

মিঃ ডাফির দিকে সরল চোখে তাকিয়ে, যেন বেশ বিচার-বিবেচনা করে, আবেগহীন গলায় উইলি জবাব দিলো, হ্যাঁ, মিঃ ডাফির কোনো জুড়ি নেই। মিঃ ডাফির ভ্রূযুগলের উপর একটা ছোট মেঘ জমতে শুরু করেছিলো। একটু দেরিতে হলেও এবং ভঙ্গির মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও ওই স্বীকৃতি লাভের পর সেই মেঘ উড়ে যায়, সেখানে আর কোনো রকম বিদ্বেষের চিহ্ন থাকলো না।

এলেক্সের প্রচণ্ড ফূর্তির জন্য এতক্ষণ উইলির পরিচয়পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে পারে নি। উইলি এবার ক্ষণিক শান্ত পরিবেশের সুযোগ নিয়ে সেটা সমাপ্ত করলো। সে তার পুরানো ধূসর টুপিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে বদল করলো, দু'পা এগিয়ে টেবিলের সামনে পৌঁছুলো, তারপর গম্ভীর মুখে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। এদিকে এলেক্স বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে ওই অপরিচিত ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে দেবার পর থেকে সেতুর নিচ দিয়ে এত জল গড়িয়েছে যে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম উইলি

আমার পুরো জীবনকালের কোনো চেনা মানুষ নয়। আমি নিশ্চয়ই তার প্রসারিত হাতের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম, তাকে লক্ষ করেছিলাম শূন্য দৃষ্টিতে, কিন্তু তখনও উইলি নির্বিকার, তার মুখ ভাবলেশহীন, অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে তাই মনে হলো। আর সে হাত বাড়িয়েই রইলো। আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। পুরানোকালীন সৌজন্যে আমি হার মানতে চাইলাম না। আমি চেয়ার পেছনে ঠেলে দিয়ে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালাম, পুরোপুরি, তারপর ওর দিকে হাত প্রসারিত করে দিলাম। বেশ ভালো আকৃতির হাত ওর। প্রথমে মনে হবে একটু কোমল ধাঁচের, হাতের তালু ভেজা ভেজা, কোনো কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের মানুষের ক্ষেত্রে অবশ্য এটাতে কেউ কিছু মনে করে না, কিন্তু তার পরেই আপনি তার হাতের সুদৃঢ় অবকাঠামোটি আবিষ্কার করবেন। ওই হাত একটি খামার বালকের হাতের মতো, অল্প কিছু কাল আগেও যেন সে লাঙল চালিয়েছে, তারপর চৌরাস্তার মোড়ের দোকানে গিয়ে কাজ নিয়েছে। উইলি ভদ্রভাবে আমার হাতে তিনবার চাপ দিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে খুশী হলাম, মিঃ বার্ডেন। এমনভাবে সে কথাক'টি উচ্চারণ করলো যেন মুখস্থ করে এসেছে। তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টিপলো, এবং আমি হলফ্ করে বলতে পারতাম একথা। কিন্তু তারপরই তার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারলাম না। প্রায় বারো বছর পরে, যখন উইলির ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গটি আমার বিরল অলস মুহূর্তগুলির অন্যতম বিচার বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলো, আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, বস্, স্লেডের আস্তানার পেছনের ঘরে আমাদের যেদিন প্রথম দেখা হয় সেদিনের কথা আপনার মনে আছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁর মনে আছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু ছিলো না, কারণ কর্তার স্মরণশক্তি ছিলো সার্কাসের হাতীর মতো, কে তাকে চীনাবাদাম খেতে দিয়েছিলো আর কে তার শুঁড়ে নস্যি গুঁজে দিয়েছিলো সেকথা সে কখনো ভুলে যেতো না, কোনো কিছুই ও কখনো ভুলতো না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা যখন হাত মিলিয়েছিলাম সেকথা আপনার মনে আছে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, কর্তা, আপনি কি তখন আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছিলেন?

শোনো, ছেলে — কর্তা তাঁর হাতের সুরার গ্লাসটি নাড়াচাড়া করলেন, রেজিস হোটেলের দামী খাটের কাপড়ের উপর তাঁর ত্রিশ ডলারের অর্ডারী জুতোর গোড়ালি

তুলে দিলেন, তারপর পিতার মতো সস্নেহ ভঙ্গিতে আমাকে লক্ষ করে বললেন, শোনো, ছেলে, ওটা একটা রহস্য।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মনে নেই?

অবশ্যই মনে আছে।

তা হলে?

ধরো, ওই সময় আমার চোখে কিছু পড়েছিলো?

বাঃ, তাহলে কিছু একটা তখন আপনার চোখে পড়েছিলো, মিটে গেলো ব্যাপারটা।

ধরো, আমার চোখে কিছু পড়ে নি।

তাহলে আপনি চোখ টিপেছিলেন, কারণ আপনার মনে হয়েছিলো যে ওই জমায়েতের গোটা সুর ও আবহ সম্পর্কে আমাদের দু'জনের মতের মধ্যে একটা মিল আছে। হ্যাঁ, তাই।

হতে পারে। আমার ছেলেবেলার স্কুল সহপাঠী এলেক্স যে একটা জঘন্য ব্যক্তি সেটা কোনো গোপন কথা নয়। আর হোঁৎকা টাইনি ডাফিও যে একটা হতচ্ছাড়া গর্দভ তাও কোনো গোপন কথা নয়।

আমি সায় দিয়ে বললাম, ও একটা কুত্তার বাচ্চা।

কর্তা হাসিমুখে আমার সঙ্গে একমত হলেন। বললেন, তবে ও কাজের লোক, ওকে দিয়ে কি করাতে হবে সেটা যদি তুমি ঠিক মতো জানো।

আমি বললাম, হ্যাঁ। আশা করি আপনি তা জানেন। আপনি তাকে লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর বানিয়েছেন।

কর্তা মাথা নাড়লেন। নিশ্চয়ই। আর কোনো একজনকে তো লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর বানাতেই হতো।

হ্যাঁ, টাইনি ডাফিকে।

অবশ্যই। টাইনি ডাফিকে। টাইনির ক্ষেত্রে মজা এইখানে যে, কেউ তাকে বিশ্বাস করে না, এবং এটা তুমি জানো। তুমি এমন কাউকে নিলে যাকে কেউ হয়তো বিশ্বাস করে, তারপর রাত জেগে তুমি দুশ্চিন্তা করতে থাকো সেই লোকটি কি তুমি। টাইনিকে বেছে নাও, তাহলে আর তোমার রাতের ঘুম নষ্ট হবে না। ওর পেচ্ছাবে যেন এ্যালবুমিন জমে না ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখলেই তুমি নিশ্চিন্ত।

কর্তা, সেদিন স্লেডের আস্তানায় আপনি কি আমায় চোখ টিপেছিলেন?

শোনো, ছেলে, একথা যদি আমি তোমাকে বলে দিই তা হলে তো তোমার চিন্তাভাবনা করার কিছুই থাকবে না।

কাজেই ওকথা আর আমার কখনো জানা হয় নি।

কিন্তু সেদিন সকালে উইলিকে আমি টাইনি ডাফির সঙ্গে হাত মেলাতে দেখেছিলাম, তাকে ও চোখ টেপে নি। সে মিঃ ডাফির সামনে দাঁড়িয়েছিলো, এবং ওই মহান ব্যক্তিটি চেয়ার থেকে না উঠেই শেষ পর্যন্ত যখন তার হাত বাড়িয়ে দিলো, এমন একটা ভঙ্গিতে যেন পোপ চুমু খাবার জন্য তার ভক্তের দিকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল এগিয়ে দিচ্ছেন, তখন উইলি সেই হাত ধরে তাতে তিনবার চাপ দিলো। মনে হলো মেসন সিটিতে ওটাই প্রচলিত রীতি।

এলেক্স আসন গ্রহণ করলো, আর উইলি ততক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকলো, যেন বসবার জন্য আমন্ত্রণের আপেক্ষায় রয়েছে, দাঁড়িয়েই থাকলো যতক্ষণ পর্যন্ত না এলেক্স পা দিয়ে ওর দিকে চতুর্থ চেয়ারটি কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে দিয়ে বললো, বসো, উইলি ।

উইলি চেয়ারে বসে মার্বেল পাথরে ঢাকা টেবিলের উপর তার ধূসর ফেল্ট হ্যাটটি রাখলো। চারপাশ কুঁচকে টেবিলের উপর সেটা তরঙ্গের মতো ঝুলে পড়লো। তার হ্যাট আর নীল ডোরাকাটা টাই-এর ওপাশে উইলি নিজের দু'হাত কোলের উপর রেখে চুপ করে বসে থাকলো।

স্লেড সামনের দিক থেকে এ ঘরে এসে বললো, বীয়ার দিতে বলি?

মিঃ ডাফি হুকুম দিলো, হ্যাঁ, সবাইকে।

উইলি বললো, আমার জন্য নয়, অনেক ধন্যবাদ।

মিঃ ডাফি তার হীরার আংটি-শোভিত হাত নেড়ে আবার হুকুম দিলো, সবাইকে।

উইলি আবার বললো, আমার জন্য নয়, অনেক ধন্যবাদ।

মিঃ ডাফি একটু অবাক হলো। তার মুখে আনন্দের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। সে মুখ ঘুরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে উইলির দিকে তাকালো, কিন্তু উইলিকে দেখে মনে হলো না যে, সে এই ঘটনার কোনো রকম তাৎপর্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন। তার হ্যাট আর টাই-এর পেছনে তাকে দেখা গেলো সে নিজের ছোট্ট চেয়ারটিতে সোজা পিঠ টান করে বসে আছে। মিঃ ডাফি এবার স্লেডের দিকে তাকিয়ে উইলির দিকে মাথা নেড়ে বললো, অ' — ওকে একটা বীয়ার দাও।

অঙ্কের নামতা পড়ার সময় যেটুকু আবেগ আনা যায় গলায় সে রকম নিরুত্তাপ নিস্পৃহ গলায় উইলি বললো, না, ধন্যবাদ।

মিঃ ডাফি জিজ্ঞাসা করলো, খুব বেশি কড়া মনে হয় নাকি?

না, কিন্তু নেবো না আমি, ধন্যবাদ।

এলেক্স বললো, বোধহয় স্কুল শিক্ষিকা ওকে সুরা জাতীয় কিছু পান করতে দেন না।

উইলি ঠাণ্ডা গলায় জানালো, সত্যি বলতে কি লুসি মদ খাওয়া পছন্দ করে না।

মিঃ ডাফি বললো, না জানলে খারাপ লাগবার প্রশ্নই আসবে না।

এলেক্স স্লেডকে বললো, একটা বীয়ার দাও ওকে।

যেন বিষয়টা মিটে গেছে এমনি গলায় মিঃ ডাফি আরেকবার নির্দেশ দিলো, সবাইকে দাও।

স্লেড এলেক্সের দিকে তাকালো, সে মিঃ ডাফির দিকে, আর মিঃ ডাফি উইলির দিকে। তারপর স্লেড কতকটা নিরাসক্তির সঙ্গে তার হাতের তোয়ালে দিয়ে একটা উড়ন্ত মাছি তাড়িয়ে বললো, যারা বীয়ার খেতে চায় আমি তাদের পরিবেশন করি। কাউকে আমি জোর করে বীয়ার খাওয়াই না।

সম্ভবতঃ ওই মুহূর্তেই স্লেডের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। জীবন কেমন বিস্ময়কর আর পরিবর্তনশীল, ইস্পাতের মধ্যে স্ফটিকটি চূর্ণ হবার পূর্বক্ষণে গিয়ে পৌঁছায়। ব্যাঙের মাথায় মণি ঝলমল করে ওঠে, আর উইলো গাছের পাতা নড়ে কি নড়ে না, ওই রকম মৃদু মন্দ বাতাসের মতো মুহূর্তাবলীর অর্থ বয়ে চলে।

যাই হোক, যখন মদ্যপান বিরোধী আইন প্রত্যাহৃত হলো, আর ডাক বিভাগের লোকদের মদ বিক্রির লাইসেন্সের দরখাস্তগুলি ম্যাক-ট্রাক দিয়ে সিটি হলে নিয়ে আসতে হলো তখন স্লেড একটা লাইসেন্স পেলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে লাইসেন্স পেয়ে যায়, আর চমৎকার জায়গায়। আরামপ্রদ চামড়ার আসনের চেয়ার আর গোলাকার বার-এর ব্যবস্থা করলো সে। চিরকাল যে-স্লেডের পকেটে ঘরভাড়া আর ব্যবসা রক্ষার জন্য চাঁদা দেবার পর এক পয়সাও থাকতো না, এখন সে দাঁড়িয়ে থাকে উজ্জ্বল ক্রোমিয়ামের চাকচিক্যের মধ্যে, নিরাভরণা রমণীদের ম্যুরাল ছবির ছায়ার নিচে, তার চারিদিকে রঙের প্রলেপ দেয়া আয়নার সমারোহ, তার পরনে নীল ডবল-ব্রেস্টেড স্যুট, যেটুকু চুল এখনো অবশিষ্ট আছে তা চাঁদির উপর লেপ্টে আঁচড়ানো। সাদা কোট পরা যে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেগুলি গরল পরিবেশন করছে স্লেড এখন তাদের উপর এক চোখ নিবদ্ধ রাখে। আর অন্য চোখ দিয়ে লক্ষ করে ক্যাশ রেজিস্টারের সামনে বসা সোনালী চুলের তরুণীটিকে, যে জানে যে রাত দুটোয় সবগুলি বাতি নিভে যাবার পরও, খদ্দেরদের স্নায়ুকে তৃপ্তি দেবার জন্য গায়ক-বাদকদের তিন জনের দলটির সঙ্গীত পরিবেশন থেমে যাবার পরও, তার ডিউটি শেষ হয়ে যাবে না।

কি করে স্লেড অত তাড়াতাড়ি লাইসেন্স পেলো? ব্যবসায়ী মহলের চাঁই

ব্যক্তিদের অনেকে যখন ওই মোড়ের জায়গাটার জন্য চেষ্টা করছিলো, তখন স্লেড কিভাবে তার বন্দোবস্ত পেলো? চামড়ার চেয়ার আর অর্কেস্ট্রার ব্যবস্থা করার মতো অত টাকাই বা তার কোথা থেকে আসলো? স্লেড কোনো দিন আমাকে সে তথ্য জানায় নি, তবে আমার মনে হয় যে তার সততার পুরস্কার সে পেয়েছিলো।

সে যাই হোক, সেদিন বীয়ার সম্পর্কে স্লেডের নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলে বিষয়টা সেখানেই চাপা পড়ে যায়। জবাই করার আগে ষাঁড়কে মরণাঘাত করলে তার চেহারা যেমন হয় টাইনি ডাফি ওই রকম মুখ করে একবার স্লেডের দিকে তাকালো, তারপরই সচেতন হয়ে আত্মমর্যাদার মুখোশটি পরে ফেললো। এলেক্স বিদ্রূপোক্তি করার শেষ বিলাসিতাটুকুর সুযোগ নিয়ে বললো, দেখ, ওর জন্য হয়তো কমলালেবুর সবরত পাওয়া যেতে পারে। তারপর, ওর ফূর্তির রেশ মিলিয়ে গেলে, স্লেড জানালো, হ্যাঁ, মনে হয় যাবে। যদি ও চায়।

উইলি বলল, হ্যাঁ, কমলালেবুর সরবত নিতে পারি আমি।

বীয়ার এলো, কমলার রসও এলো, কমলার রসের বোতলটিতে দুটো স্ট্র বসানো। পূর্ববর্তী সংলাপ চলার গোটা সময় জুড়ে উইলি তার কোলের উপর নিজের হাত দুটি সুন্দর করে ধরে রেখেছিলো, এবার দু'হাত সেখান থেকে তুলে বোতলটা নিজের দিকে টেনে নিলো। টেবিল থেকে বোতল সম্পূর্ণ না উঠিয়ে সে ওটাকে নিজের দিকে সামান্য কাৎ করলো, তারপর স্ট্রতে ঠোঁট লাগালো। একটু মাংসল ঠোঁট, কিন্তু শিথিল নয়। না, শিথিল নয়। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে সে রকমই মনে হতো। আপনার হয়তো মনে হবে যে তার মুখটা ছোট ছেলের মতো, এখনো পাকা গড়ন পায় নি, ওই মুহূর্তে বোতলের উপর একটু ঝুঁকে পড়া, মুখে স্ট্র ধরা ঈষৎ কুঞ্চিত ঠোঁটে তাকে সেরকমই দেখাচ্ছিলো। কিন্তু একটু বেশিক্ষণ ওখানে কাটালেই আপনি একটা ভিন্ন জিনিস দেখতে পেতেন। আপনি লক্ষ করতেন যে মাংসল হলেও তার ঠোঁট বেশ ঘন-সন্নদ্ধ। তার মুখটাও ঈষৎ মাংসল, কিন্তু চামড়া পাতলা, আর মুখে ছোট ছোট দাগ। চোখ দুটি বড় বড় আর বাদামী, আর তার পাতলা চামড়ার দাগওয়ালা পুরু মুখমণ্ডলের মধ্যে বসানো (প্রথমে পুরুই মনে হবে, পরে অবশ্য আপনি মত পাল্টাবেন) চোখ দিয়ে সে আপনার দিকে তাকায় সরাসরি., ওর কপালের উপর এঁকে বেঁকে নেমে এসেছে গাঢ় বাদামী অবিন্যস্ত ঘন চুল। কপাল খুব উঁচু নয়, আর চুল ঈষৎ ভেজা ভেজা। ওই ছিলো লিটল উইলি। গ্রাম থেকে আসা, মেসন সিটি থেকে আগত, বড়োদিনের টাই গলায় বাঁধা কাজিন উইলি। আপনি হয়তো তাকে নিয়ে পার্কে যেতে চাইবেন, তাকে রাজহাঁস দেখাবেন সেখানে। এলেক্স ডাফির দিকে একটু ঝুঁকে অন্তরঙ্গ সুরে বললো, উইলি রাজনীতি করে।

ডাফির মুখে কৌতূহলের ক্ষীণ একটা তরঙ্গ জেগে উঠলো, তারপরই তার মুখের বিশাল তেলতেলে শূন্যতার মধ্যে সেটা মিলিয়ে গেলো। উইলির দিকে সে দৃকপাতও করলো না।

এলেক্স আরেকটু ঝুঁকে, পাশে মাথা হেলিয়ে উইলিকে দেখিয়ে বললো, হ্যাঁ, ও রাজনীতি করে। মেসন সিটিতে।

মিঃ ডাফি তার বিশাল মাথাটির এক-চতুর্থাংশ ঘুরিয়ে তার ফিকে-নীল দুটি চোখ যেন বহু দূর থেকে, উইলির উপর ন্যস্ত করলো। মেসন সিটির উল্লেখ তার মনে দাগ কাটে নি, কিন্তু উইলি যে যে-কোনো জায়গায়, এমন কি মেসন সিটিতেও, যেখানে, কোনো সন্দেহ নেই, শুয়োরের দল পোস্ট অফিসের বেড়ায় ঘষে ঘষে গা চুলকোয়, সেখানেও তার এই রাজনীতি করার ব্যাপারটা কতিপয় সমস্যার জন্ম দেয় এবং ক্ষণিকের জন্য হলেও সেটা কিছুটা মনোযোগ দাবী করে। না, কোনো সমস্যা নেই। এই সিদ্ধান্ত করে ডাফি তার সমাধান করে ফেলে। উইলি রাজনীতিতে নেই। মেসন সিটিতে নেই, অন্য কোথাও নেই। ডাফি উইলির দিক তাকিয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলো যে উইলি রাজনীতিতে নেই। নির্ভেজাল ব্যঙ্গের সুরে সে বললো, তাই? ওর মুখের অবিশ্বাসের রেখায় কোনো অস্পষ্টতা ছিলো না।

না, আমি ডাফিকে খুব দোষ দিই না। ডাফি মুখোমুখি হয়েছিলো রহস্যের সেই প্রান্তরেখার, যেখানে আমাদের সব হিসেব মুখ থুবড়ে পড়ে, যেখানে কালের স্রোতধারা অনন্তের বালিতে হারিয়ে যায়, যেখানে টেস্ট টিউবের ফর্মুলা ব্যর্থ হয়, যেখানে সর্বনাশ আর অন্ধকার রাত রাজত্ব করে, আর যেখানে আমরা বায়বীয় স্বপ্নের মধ্যে হাসির শব্দ শুনি। কিন্তু সে তা জানতো না, আর সেজন্যই সে বলেছিলো, তাই?

এলেক্স প্রতিধ্বনি করলো, তাই এলেক্সের গলায় ব্যঙ্গ ছিলো না। তারপর সে যোগ করলো, মেসন সিটিতে। উইলি সেখানকার কাউন্টি ট্রেজারার। তাই না, উইলি?

উইলি জানালো, হ্যাঁ, কাউন্টি ট্রেজারার।

মাই গড, বললো ডাফি, কেউ যখন আবিষ্কার করে যে সে বালির উপর ঘর বেঁধেছে আর বাস করছে মায়ামরীচিকার মধ্যে তখন তার যে অবস্থা হয় ডাফির সেই অবস্থা হলো।

এলেক্স আবার বললো, হ্যাঁ, উইলি মেসন কাউন্টির পক্ষ থেকে এখানে কাজে এসেছে, তাই না, উইলি?

উইলি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

এলেক্স বিশদ করলো, ও একটা বণ্ড ইস্যু করার ব্যাপারে এসেছে। ওরা একটা স্কুল ভবন নির্মাণ করবে, তার জন্য বণ্ড ছাড়া দরকার।

ডাফির ঠোঁট নড়ে উঠলো, তার সোনাবাঁধানো দাঁতের ঝিলিক আপনি দেখতে পেলেন, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুলো না।

কিন্তু ঘটনাটা ছিলো সত্য। উইলি যথার্থই কাউন্টি ট্রেজারার ছিলো এবং অনেক কাল আগে, সেই দিন, স্কুলভবন নির্মাণের জন্য বন্ড ইস্যু করার ব্যাপার নিয়েই সে শহরে এসেছিলো। এবং বন্ড ইস্যু হয়, স্কুলভবন নির্মিত হয়, এবং তারও বারো-তেরো বছর পরে কর্তাকে নিয়ে কালো বিরাট ক্যাডিলাক ওই স্কুলভবনের পাশ দিয়ে তীরের মতো বেরিয়ে যায়, এবং তখন সুগার-বয় সত্যিই তার পায়ের চাপ বাড়িয়ে দেয়, আর আমরা এগিয়ে চলি, তখনো ৫৮ নম্বর মহাসড়কের প্রায় নতুন অংশ দিয়ে।

আমরা মাইলখানেক পেরিয়ে গেলাম। এর মধ্যে কেউ কোনো কথা বলে নি। তারপর কর্তা সামনের আসন থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জ্যাক, মালাকিয়ার ছেলে আর ওই খুনের ঘটনা সম্পর্কে একটু খোঁজ নিও। ভুলো না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নাম কি?

বাঃ, আমি কেমন করে জানবো? তবে ছেলেটি ভালো ।

আমি বললাম, আমি মালাকিয়ার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।

কর্তা বললেন, মালাকিয়া উইন।

আমি নোট বই বার করে লিখে নিলাম। লিখলাম, স্ট্যাবিং, ছুরিকাঘাত।

খোঁজ নাও কখন বিচার শুরু হচ্ছে, একজন ভালো উকিলের ব্যবস্থা কর, মানে, সত্যিকার ভালো, যে কি করতে হবে জানে, আর তাকে যে ভালো ভাবে মোকদ্দমাটা চালাতে হবে সেটা যেন সে বোঝে সেদিকে খেয়াল রেখো, তবে ঢোক-ঢাল পিটিয়ে নিজের নাম জাহির করতে চায় এমন উকিল নিযুক্ত করো না।

আমি বললাম, এ্যালবার্ট ইভান্স। সে পারবে।

কর্তা বললেন, খুব তেল দেয় চুলে। পেছনে টেনে চুল আঁচড়ায়, শেষ পর্যন্ত মাথাটা বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর কালো বলের মতো চকচকে দেখায়। না, আর কাউকে নাও। তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে?

ঠিক আছে। আমি নোট বই-এ লিখে নিলাম, আব্রাহাম লিঙ্কন টাইপ। এবিষয়ে নিজেকে আমার আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমি লিখে নিলাম শুধু অভ্যাসের বশে। ছ'বছরে আপনি প্রচুর অভ্যাসের দাস হয়ে উঠতে পারেন, ওই

সময়ের মধ্যে অনেকগুলি ছোট কালো নোটবই আপনি ভর্তি করে ফেলতে পারেন, আর ভর্তি হয়ে যাবার পর আপনি সেগুলি একটা সেফটি-ডেপসিট বক্সে রেখে দিতে পারেন। ওগুলি যেখানে-সেখানে ফেলে রাখবার মতো জিনিস নয়। এমন লোক আছে যারা এগুলো সোনার দরে পরম আগ্রহে হস্তগত করতে চাইতো। অবশ্য কেউ তা করতে পারে নি। আমার কখনো টাকার অতটা চরম প্রয়োজন পড়ে নি। কিন্তু ওই নোট বইগুলি সযত্নে রক্ষা করা আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। ওই তমসাচ্ছন্ন বনাঞ্চল আর কালের বিশাল গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার সময় একটা নষ্ট যকৃত ছাড়াও আপনার অন্য কিছু একটা জিনিসও নিয়ে আসা প্রয়োজন। এবং এক্ষেত্রে তা ওই কালো নোটবইগুলিই হতে পারে। সেফটি-ডেপসিট বক্সে ওগুলি সযত্নে পড়ে আছে। আপনার দিনের পর দিনের কাজ, আপনার হাতের কাজ, অন্ধকারে একটা ছোট্ট বাক্সে আরাম করে শুয়ে আছে। আর পৃথিবীর বিশাল অক্ষরেখা ঘুরে চলেছে।

কর্তা বললেন, তুমি বেছে নাও, তবে নিজেকে আড়ালে রেখো। তোমার কোনো এক স্যাঙাতকে দিয়ে কাজটা করাও, আর তাকেও ঠিকমতো বেছে নিও।

আমি জানালাম, বুঝেছি। কারণ উনি কি চান সেটা আমি ঠিক মতোই বুঝেছিলাম।

কর্তা যখন মাথা ঘুরিয়ে মহাসড়ক আর সুগার-বয়ের স্পিডোমিটারের প্রতি মনোযোগ দিতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই ডাফি গলা ঝেড়ে বলে উঠলো, বস্।

কি?

কে খুন হয়েছিলো আপনি জানেন?

না। এবং আমার জানার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রফেট পলের মহাপূজনীয়া সতীসাধ্বী মাসী হলেও কিছু এসে যায় না।

মিঃ ডাফি আবার গলা পরিষ্কার করলো। বয়স হয়ে যাবার পর গলায় শ্লেষ্মা ও মাথায় কোনো ভাবনা এলে সে সব সময় এটা করতো। ডাফি শুরু করলো, আমি কাগজে দেখেছিলাম। যখন ঘটনাটা ঘটে তখন খবরটার উপর আমার চোখ পড়েছিলো। যে মারা যায় সে এই অঞ্চলের এক ডাক্তারের ছেলে। ভদ্রলোকের নাম আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু একজন ডাক্তার তিনি। কাগজে তাই লিখেছিলো। আর —

কর্তার মাথার পেছন লক্ষ করে ডাফি বলে চলেছিলো। মনে হচ্ছিলো কর্তার কানে কিছুই যাচ্ছিলো না। ডাফি আরেক বার গলা ঝেড়ে বললো, তো, আমার ধারণা ডাক্তার এই এলাকার একজন কেউকেটা লোক। গ্রামাঞ্চলের ডাক্তারের

মার্যাদা কি রকম আপনি জানেন। আর উইনির ছেলেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে আপনি জড়িত, এটা কোনো রকমে জানাজানি হয়ে গেলে আপনার জন্যে ভালো হবে না। রাজনীতি কি তা তো আপনি জানেন।

তো —

কর্তা হঠাৎ এত দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে মিঃ ডাফির দিকে তাকালেন যে এক মুহূর্তের জন্য কিছুই স্পষ্ট দেখা গেলো না। মনে হলো তাঁর মাথার পেছনের দিকে চুলের মধ্য দিয়ে, বড়ো বড়ো বাদামী চোখ বিস্ফারিত করে তিনি ডাফিকে দেখছেন। সব যেন মিলেমিশে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু আমি কি বলতে চাইছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। ওই রকমই ছিলেন বস্। দেখে মনে হতো তিনি বুঝি ধীরগতি, আস্তে নড়াচড়া করেন, তাঁর বসার এমন একটা শিথিল ভঙ্গি ছিলো যেন নিজের মধ্যে ডুবে গেছেন, চোখ দুটি মিটমিট করছে খাঁচার মধ্যে বন্দী কোন প্যাঁচার মতো। তারপর হঠাৎ এক সময় তিনি নড়ে উঠতেন। হয়তো একটা মাছি বিরক্ত করছিলো, খপ্ করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন। সেলুনে পড়ে থাকা এক নিঃশেষিত মুষ্টিযোদ্ধাকে আমি এরকম করতে দেখেছি। সে বাজী রাখতো যে আঙ্গুল দিয়ে মাছি ধরে ফেলবে। আর ধরতে পারতোও লোকটা। কর্তাও পারতেন। কিংবা আপনি কিছু একটা তাঁকে বলছেন, দেখে মনে হচ্ছে কিছুই তিনি শুনছেন না, এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে তিনি আপনার দিকে ফিরে তাকাবেন। এখন ঠিক ওই ভাবে কর্তা ডাফির দিকে ফিরে, এক মুহূর্ত তাকে স্থির দৃষ্টিতে দেখে, গাঢ় গলায় শুধু বললেন, যীসাস্! তারপর বললেন, টাইনি, তুমি কিছু জানো না। প্রথমতঃ, আমি মালাকিয়া উইনকে জীবনভর চিনি, ওর ছেলেটা ভালো ছেলে, ও কাকে খুন করেছে তা নিয়ে আমার কিছু এসে যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ওটা ছিলো কোন রকম কারচুপি ছাড়া একটা নির্ভেজাল মারামারি, বেচারা একটা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে যখন বিচার শুরু হয় তখন খুনের দায়ে অভিযুক্তের পক্ষেই মানুষের সহানুভূতির দাঁড়িপাল্লা ভারী হতে থাকে। অন্য লোকটার মৃত্যুকে তারা একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করতে থাকে। তৃতীয়তঃ তুমি যদি তোমার কানে গোঁজা তুলাটা খুলে ফেলতে তাহলে শুনতে পেতে যে আমি ওকে ওর একজন সাঙ্যাতের মাধ্যমে উকীল লাগাতে বলেছি এবং এমন একজন উকীল যে প্রচারণা চায় না। ওই উকীল জানবে না। আসলে কেউই জানবে না, কে তাকে নিযুক্ত করেছে। হয়তো স্বয়ং পোপই করেছেন। কে বলতে পারে? তাছাড়া সে কিরকম টাকা পাচ্ছে সেটা ছাড়া আর কিছুই সে জানতে চাইবে না। এবার বুঝেছো, নাকি আরো বিশদ করতে হবে?

ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে মিঃ ডাফি বললো, বুঝেছি।

কিন্তু ততক্ষণে কর্তার কান অন্যদিকে। তিনি আবার মহাসড়ক আর স্পিডোমিটারের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। সুগার-বয়কে লক্ষ করে কর্তা বললেন, কি ব্যাপার, তোমার কি মনে হয় প্রকৃতির শোভা দেখার জন্য আমরা খুব ব্যস্ত? এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে আমাদের।

আপনি নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারেন যে সুগার-বয় তখন গাড়ির অতিরিক্ত চূড়ান্ত গতিবেগটাও বাড়িয়ে দিলো।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। আধ-মাইল খানেক যাবার পর আমরা অন্য রাস্তা নিলাম। ঘর্ঘর শব্দ তুলে, কাঁকরের চারপাশে নুড়ি ছিটিয়ে, আমরা এগিয়ে গেলাম। পেছনের গাড়ির জন্য রেখে গেলাম সুস্পষ্ট ধূলিরেখা।

তারপর আমরা বাড়িটা দেখলাম।

বাড়িটা একটু উঁচুতে, বেশ বড়ো। বাক্স-মতো, দোতলা, সমকোণী চতুর্ভুজাকৃতি, প্রাচীন, রঙহীন, টিনের ছাদ, তাও রঙ করা নয়, তবে নতুন টিন বলে সেখানে সূর্যের আলো ঝলসে উঠেছে, এখনো টিনে মরচে পড়ে নি তাই, আর দু'পাশে দুটো বড়ো চিমনী। আমরা গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম। রাস্তার কাছেই বাড়ির আঙিনা, খুব বড়ো নয়, চারপাশে শক্ত তারের বেড়া, আর মেহেদীর ঝাড়জাতীয় গাছ, সেখানে লালচে আইসক্রীমের মতো ফুল ফুটে আছে, আঙিনার এক পাশে গরমের মধ্যে ওই জায়গাটা খুব শীতল দেখাচ্ছে, আর একটা ওক্ গাছ, গর্ব করার মতো খুব একটা কিছু নয়, একটা পাশ শুকিয়ে যাচ্ছে, বাড়ির সামনে ওই ওক্, আর অন্য এক দিকে গোটা দুই ম্যাগনোলিয়া, তার পাতাগুলি দেখতে মরচে-পড়া টিনের মতো। আঙিনায় বিশেষ ঘাস ছিলো না। ম্যাগনোলিয়া গাছ দুটির নিচে ধুলোর মধ্যে পাঁচ-ছ'টা মুরগী হুটোপুটি করে কক্-কক্ শব্দ করছিলো। সামনের বারান্দায় একটা বড়ো সাদা কুকুর শুয়ে আছে। বারান্দাটা যেভাবে বাক্সমতো বাড়িটার মধ্যে জুড়ে দেয়া হয়েছে তাতে মনে হচ্ছিলো যেন এটার কথা গোড়ায় ভাবা হয় নি, পরে মনে পড়েছে।

গ্রামাঞ্চলে পড়ন্ত বেলায় গাড়ি নিয়ে হুশ করে পার হয়ে যাবার সময় যে রকম খামারবাড়ি সচরাচর আপনার চোখে পড়ে, গাছের নিচে মুরগী, ঘুমন্ত কুকুর, আপনি নিশ্চিত জানেন যে বাড়িতে এখন শুধু একজন মহিলাই আছেন, তিনি বাসন-কোসন ধুয়ে, রান্নাঘর ঝাঁট দিয়ে, আধঘন্টার জন্য বিছানায় গড়াতে গেছেন, পরনের পোশাক খুলে রেখেছেন, জুতো ছুঁড়ে ফেলেছেন পা থেকে, এখন ছায়া ছায়া ঘরটায় চোখ বন্ধ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, এখনো ঘামে ভেজা একগুচ্ছ চুল কপালের

উপর লেপ্টে আছে, মহিলা শুয়ে শুয়ে ঘরের চারপাশে উড়ে বেড়ানো মাছির গুঞ্জন ধ্বনি শোনেন, তারপর বাইরের রাস্তায় আপনার গাড়ির আওয়াজ বেড়ে উঠতেই কান পেতে সেটা শোনেন, তারপর গাড়িটা দূরে সরে গিয়ে সে-আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই আবার তিনি মাছির গুঞ্জন শুনতে থাকেন, এটা ছিল সেই ধরনের বাড়ি।

কর্তার যখন অবস্থা ফিরে যায়, তখন ভোরে বিছানা ছেড়ে ওঠার পেছনে এক ডলার রোজগার করাটা আর কোন কারণই নয়, তখন তিনি কেন এই বাড়িটাকে রঙ করান নি এ নিয়ে আমি এক সময় খুব ভেবেছি। তারপর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে কর্তাই বিষয়টি সব চাইতে ভালো জানেন। ধরা যাক, তিনি বাড়িটা নতুন রঙ করালেন। তখন কি হবে? রাস্তার ধারের এক পড়শী তার পাশের জনকে বলবে, দেখেছো, বুড়ো স্টার্ক তার বাড়িটা কেমন রঙ করিয়েছে? চাল দেখাচ্ছে, হ্যাঁ! সারা জীবন ওই হালেই বেশ ছিলো, কোনো অসুবিধা হয় নি, কিন্তু এখন যেই ছেলে রাজধানীতে গিয়ে কেউকেটা হয়েছে, এখন আর এতে চলছে না। এরপর দেখবে বাড়ির ভেতরে তিনি শৌচকর্ম করবেন। (বস্তুতঃপক্ষে বৃদ্ধ স্টার্ক এখন তাই করছেন, কারণ কর্তা বাড়ির মধ্যে বাথরুম আর সার্বক্ষণিক জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। একটা ছোট স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে জল পাম্প করে আনা হতো। কিন্তু বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় রাস্তা থেকে তো আর কমোড চোখে দেখা যায় না। ওটা চোখে গিয়ে ধাক্কা মারে না, কিংবা ছুটে গিয়ে পায়ে কামড় বসায় না। আর ভোটার যা জানে না তা নিয়ে সে অস্থির হয় না।)

যাই হোক, ও যদি বাড়িটা রঙ করাতো তাহলে সেদিন উইলি আর তার বুড়ো বাবা বারান্দার সিঁড়িতে যখন বসেছিলো, তার পাশে লুসি স্টার্ক আর ওদের ছেলে, আর বুড়ো সাদা কুকুরটা, সেদিন যেমন চমৎকার ছবির মতো দেখাচ্ছিলো সেরকম দেখাতো না।

এতক্ষণে বুড়োকে সামনের সিঁড়িতে দেখা গেলো। গোটা দুই লাঙলের আংটা দিয়ে সামনের গেটটা লাগানো ছিলো, ওটা টানলেই একটা শব্দ হতো, আর সেই শব্দ শুনে বোঝা যেতো যে একজন কেউ এসেছে, এখন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। আর তাই বুড়ো দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। সিঁড়ির কাছে এসে বুড়ো থামলো, খুব বেশি লম্বা নয়, পরনে সরু নীল জিনের প্যান্ট আর নীল সার্ট, বারবার ধোয়ার ফলে রঙ হাল্কা ফিকে হয়ে গেছে, ইলাস্টিক ব্যান্ড দেওয়া যে ধরনের রেডিমেড বো-টাই বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেরকম একটা বো-টাই গলায় বাঁধা। আমরা কাছে এগিয়ে আসতেই তার মুখ দেখতে পেলাম, বাদামী, রেখাবহুল, হাড়ের উপর চামড়া আর মাংস পাৎলা হয়ে গেছে, হাড় থেকে নিচের দিকে ঝুলে গিয়ে বুড়ো মানুষের

মুখে যে সহিষ্ণুতার ছাপ দেখা যায় সেই ছাপ দেখা যাচ্ছে। সরু, ডিমের মতো প্যাৎলা করোটির উপর সাদা চুল লেপ্টে আঁচড়ানো, এখনো ভেজা ভেজা, যেন শেষ মুহূর্তে বুড়ো নিজেকে ছিমছাম করে নিয়েছে, গাড়ির শব্দ শোনার পর ভেজা ব্রাশ দিয়ে চুলটা দ্রুত ঠিক করে নিয়েছে। ওর মুখের বাদামী চামড়ার ভাঁজের মধ্যখানে দেখা গেলো শান্ত দুটি নীল চোখ। ওই নীলও মলিন, ফ্যাকাশে, জ্বলে যাওয়া সার্টের নীল রঙের মতোই। কোনো গোঁফ–দাড়ি নেই। মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে অল্পখানিক আগে দাড়ি কামিয়েছে, দু'এক জায়গায় কেটে গেছে, শুকনো বাদামী চামড়ার ভাঁজে এখনো রক্তের ফোঁটা জমে আছে।

সিঁড়িতে ও দাঁড়িয়ে ছিলো, স্থির হয়ে, দেখে মনে হতে পারতো যে আমরা আসিই নি, শহরে ফিরে গেছি।

তখন কর্তা তার কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এই যে বাবা, কেমন আছো?

চলে যাচ্ছে। বুড়ো পুত্রের সাথে করমর্দন করলো, বরং বলা যায়, মেসন সিটির ড্রাগস্টোরে এই চামড়া–মুখো বুড়ো যেভাবে তার কনুই–র কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কর্তার সাথে তার করমর্দন করতে দিয়েছিলো, কর্তার বাবাও এখন সেই রকমই করল।

লুসি স্টার্ক বুড়োর কাছে গেলো, কোনো কথা না বলে তার বাঁ গালে চুমু খেলো, বুড়োও কোনো কথা বললো না, যখন চুমু খেলো তখনও না। শুধু লুসির কাঁধের উপর দিয়ে নিজের ডান বাহু একটু বাড়িয়ে দিলো, ঠিক আলিঙ্গন নয়, বাহুটা শুধু রাখলো সেখানে। এবার ওর গিটপাকানো, ঈষৎ বাঁকানো বৃদ্ধ বাদামী হাত স্পষ্ট চোখে পড়লো, কব্জির হাড়ের তুলনায় হাতটা যেন বেশি বড়ো। বুড়ো ওই হাত দিয়ে তার কাঁধে দু'তিনটা ক্লান্ত, হাল্কা, ক্ষমা চাওয়ার মতো চাপড় দিলো, তারপর সেই হাত সরে গেলো, নীল জীনের প্যান্টের পায়ের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়লো, আর লুসি স্টার্ক পেছনে চলে এলো, তখন নাতিউচ্চ কণ্ঠে বুড়ো বললো, কেমন আছো, লুসি?

লুসি বললো, কেমন আছো, বাবা? বুড়োর হাত একটু নড়ে উঠলো, মনে হলো প্রসারিত হয়ে লুসিকে আবার মৃদু চাপড় দেবার জন্য তা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু না, দিলো না।

আমার মনে হয় দেবার দরকার ছিলো না। লুসি যা জানতো, তা লুসিকে বলার দরকার ছিলো না। বহু দিন আগে বৃদ্ধের স্ত্রী মারা গিয়েছিলো, অনেক দিন ধরে বাড়িতে কোনো রমণী নেই, সেই সময় উইলি স্টার্ককে বিয়ে করে ও এই বাড়িতে আসে, রাতের পর রাত বৃদ্ধের সঙ্গে আগুনের চুল্লীর পাশে বসে কাটিয়েছে। ওদের

দুজনের ক্ষেত্রেই কিছু একটা ছিলো যা একই ধরনের, তারা সেটা জানতো। বুড়ো স্টার্ক আর লুসি স্টার্কের মধ্যে, যে লুসি স্টার্ক ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো উইলি স্টার্ককে। ওরা দুজন যখন চুপচাপ আগুনের পাশে বসে থাকতো তখন দোতলায় নিজের ঘরে উইলি তার আইনের বই-র উপর মুখ গুঁজে এক মনে পড়ছে। মুখের চেহারায় গভীর মগ্নতা, ঈষৎ বিভ্রান্তি, কপালের উপর একগুচ্ছ চুল ঝুলে পড়েছে, সে তাদের সঙ্গে নিচে আগুনের পাশে বসে নেই, সে রয়েছে উপরে তার নিজের ঘরে, কিন্তু না, সে ওই ঘরেও নেই, কিন্তু আছে একটা কুঠুরীতে, তার নিজের ভেতরে, যেখানে কোনো অন্ধকার স্যাৎসেঁতে গুদামঘরে বিশাল এক আলুর মতো একটা কিছু, সবার অলক্ষ্যে, ধীরে ধীরে, যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফুলে উঠছিলো, বেড়ে উঠছিলো একটু একটু করে। বুড়ো আর লুসির মধ্যে যে মিল ছিলো তা হলো আগুনের পাশে এক শব্দহীন নীরবতার বিশ্বের মিল, যে-বিশ্ব অনায়াসে নিজের মধ্যে শুষে নিতে পারতো তাদের প্রতিদিনকার চলাফেরা ও কাজকর্ম, তাদের যাপিত ও অনাগত সকল দিবস, তাদের সমগ্র জীবন, যার জন্য তারা তৈরি হয়েছে। তাই ওরা দুজন তাদের সেই চেতনার ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়ে ওখানে নীরবে বসে থাকতো, দুজনের জীবনের তাল-লয়-গতি, ওঠাপড়া ও বিরতির ছন্দের মধ্যে ডুবে গিয়ে। আর তাদের পাশে আগুনের চুল্লীতে তখন কাঠের টুকরো গুঁড়িয়ে যেতো, শব্দ উঠতো হিস্ হিস্ করে। এখনও তাদের মধ্যে ছিলো সেই একই জিনিস, এটা কেউ কখনো ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ওদের মধ্যে আরো একটা জায়গায় মিল ছিলো, তারা দুজনেই জানতো যে এক সময় তাদের যে জিনিসটা ছিলো এখন আর তা তাদের নেই, এখন উইলি স্টার্ক আর তাদের নেই, একসময় যদিও সে তাদের ছিলো।

কর্তা মিঃ ডাফিকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। মিঃ ডাফি মিঃ স্টার্কের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত, ইয়েস, স্যার, তারপর দ্বিতীয় গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসা দলের সবার সঙ্গে বাবাকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কর্তা বললেন, জ্যাক বার্ডেনের কথা তো তোমার মনে আছে, তাই না?

বুড়ো বললো, হ্যাঁ, আছে। আমরা হাত মিলালাম।

আমরা সবাই বসবার ঘরে গিয়ে কয়েকটা গাব্দাগোব্দা গদীমোড়া চেয়ারে বসলাম। একটা তীব্র ভ্যাপসা গন্ধ নাকে লাগলো। কয়েকজন বসলাম সোজা শক্ত কাঠের চেয়ারে। কর্তা আর তাঁর বাবা সেগুলি রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসেছিলেন। ঘরের পশ্চিম দিকের জানালার উপরের শিক থেকে লেসের পর্দা ঝুলছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন মাছ ধরার জাল, মেরামতির জন্য অপেক্ষা করছে, একদা-সাদা পর্দার

রঙ এখন হলদেটে, আর জানালা দিয়ে ভেতরে আসা সূর্যালোকে আমরা অজস্র ধূলিকণাকে ভেসে বেড়াতে দেখলাম। আমরা গদীমোড়া অথবা কাঠের চেয়ারে বসে, উরু এধার-ওধার করে, মেঝের রঙহীন তক্তা কিংবা মেঝের মাঝখানে যে লিনোলিয়ামের মাদুর পাতা তার নকশার দিকে তাকিয়ে থাকলাম মুখ নিচু করে, যেন আমরা সবাই একটা শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে এসেছি, আর আমাদের সবার কাছে যেন মৃত ব্যক্তির কিছু টাকা পাওনা আছে। লিনোলিয়ামের মাদুরটা নতুন, রঙ এখনো উজ্জ্বল, লাল, বাদামী আর মসৃণ নীল, চকচকে পালিশ করা, ভ্যাপসা গন্ধ, আর সময়ের ধীর তরঙ্গ বহু কাল ধরে দিনের পর দিন যেন এই ঘরে এসে প্রবেশ করেছে, একটা ভূমিবন্দী সাগরে প্রবেশ করার মতো, যেখানে মাছ মরে যায়, জিভে লেগে থাকে তেতো স্বাদ, সেই পরিবেশের মধ্যে ওই মাদুরকে মনে হলো একটা উদ্ধত ভাসমান জ্যামিতিক দ্বীপ। মনে হলো কর্তা আর মিঃ ডাফি আর স্যাডি বার্ক আর ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিকরা, আমরা সবাই, লিনোলিয়ামের যে মাদুরের উপর ঘন হয়ে বসে আছি তা এবার কোনো যাদুমন্ত্রে মেঝে থেকে উঁচু হয়ে উঠে আমাদের সবাইকে তার মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে, ঘরের মধ্যে একবার পরীক্ষামূলকভাবে ঘুরে, হুশ্ করে দরজাপথে কিংবা ছাদ ফুঁড়ে গালিভারের ভাসমান দ্বীপ অথবা আরব্য রজনীর কার্পেটের মতো উড়ে চলে যাবে সেই জায়গায় যা তার ও আমাদের প্রকৃত স্থান, আর বুড়ো স্টার্ককে রেখে যাবে এই জায়গায়, যেন কিছুই ঘটে নি, খুব পরিচ্ছন্ন, গালে ক্ষুরের কাটা দাগ, মাথার সাদা চুল লেপ্টে আঁচড়ানো, টেবিলের উপর বিশাল বাইবেল, ল্যাম্প, আর চমৎকার বাঁধানো এ্যালবাম, দেয়ালে টাঙানো বড়ো ক্রেয়নের এক প্রতিকৃতি, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, চোখের দৃষ্টি শূন্য এবং সর্বগ্রাসী।

তারপর মেঝের তক্তার উপর দিয়ে তার পুরানো টেনিস জুতো পরা পা ঘষটাতে ঘষটাতে নিগ্রো রমণীটি একটা ট্রের উপর জগভর্তি জল ও তিনটি গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলো। লুসি স্টার্ক একটা গ্লাস হাতে তুলে নিলো, স্যাডি বার্ক আরেকটা, আর আমরা তৃতীয় গ্লাসটি এক হাত থেকে অন্য হাতে চালান করে দিতে থাকলাম।

এক সময় ফটোগ্রাফার তার হাতের ঘড়ির দিকে চোরা চোখে তাকিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, গভর্নর —

কি ?

আমি বলছিলাম কি, যদি আপনার আর মিসেস স্টার্কের খানিক বিশ্রাম হয়ে গিয়ে থাকে — বসে বসেই মিসেস স্টার্কের উদ্দেশে বাউ করলো, একেবারে সোজা কোমর থেকে, রীতিমত দর্শনীয় ব্যাপার, মনে হলো এই প্রচণ্ড গরমের দিনের পক্ষে একটু বেশি পান করে ফেলেছে, হয়তো আসনেই চৈতন্য হারিয়ে ঢলে পড়বে —

মানে, আমি বলছিলাম কি, যদি আপনারা সবাই —

কর্তা উঠে দাঁড়ালেন, হাসিমুখে বললেন, ঠিক আছে। কি বলতে চাও বুঝেছি। তারপর তিনি জিজ্ঞাসু নয়নে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

লুসি স্টার্কও উঠে পড়লো।

কর্তা বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বললেন, সব প্রস্তুত, বাবা। তখন বুড়ো মানুষটিও উঠে দাঁড়ালো।

কর্তা সবার আগে পথ দেখিয়ে সামনের বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন, আর আমরা শোভাযাত্রার মতো সারি বেঁধে তাঁর পেছন পেছন চললাম। ফটোগ্রাফার দ্বিতীয় গাড়িতে গিয়ে তার ত্রিপদ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম নামিয়ে সিঁড়ির দিকে মুখ করে সব সাজালো। কর্তা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ মিটমিট করছেন, হাসছেন, যেন আধো ঘুমে, ঘুমের মধ্যে তিনি কি স্বপ্ন দেখতে যাচ্ছেন সেটা যেন তাঁর জানা।

ফটোগ্রাফার বললো, প্রথমে আপনার ছবি নেবো, গভর্নর। আমরা বাকী সবাই ক্যামেরার আওতার বাইরে পোর্চ থেকে সরে গেলাম।

ফটোগ্রাফার কালো কাপড়ের নিচে মাথা লুকালো, তারপরই মাথায় একটা আইডিয়া খেলে যেতেই দ্রুত মাথা বার করে বললো, কুকুর, ওই কুকুরটা সঙ্গে নিন, গভর্নর। কুকুরটার মাথায় হাত বুলাতে থাকুন। ঠিক ওইখানে, ওই সিঁড়ির উপর। চমৎকার হবে। পাগল হয়ে যাবে সবাই। আপনি কুকুরটাকে আদর করছেন, সে আপনার গা বেয়ে উঠতে চাইছে, আপনাকে দেশের বাড়িতে ফিরে আসতে দেখে সে ভীষণ খুশী হয়েছে। বুঝেছেন? পাগল হয়ে যাবে সবাই।

কর্তা বললেন, ঠিক বলেছো, পাগল হয়ে যাবে সবাই।

তিনি বয়োবৃদ্ধ সাদা কুকুরটার দিকে তাকালেন। ক্যাডিলাকটা গেটের মধ্যে ঢোকার পর থেকে ওই কুকুর তার দেহের একটি পেশীও নাড়ে নি, জরাজীর্ণ কম্বলের মতো বারান্দার একপাশে স্থির হয়ে শুয়ে ছিলো। কর্তা বললেন, এ্যাই, বাক্! আঙ্গুল নাড়ালেন তিনি।

কিন্তু কুকুরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না।

টম স্টার্ক ওকে উৎসাহিত করার জন্য পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে একটু খোঁচাল। কোনো ফল হলো না।

বুড়ো স্টার্ক জানালো, বাকের বয়স হয়ে গেছে। আগের মতো চটপটে নেই আর। তারপর বুড়ো সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেহ বাঁকিয়ে নিচু হলো, তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল পুরানো মরচে পড়া গোলাঘরের দরজা খুলবার সময় যে রকম শব্দ হয়

এখনই যেন আমরা সেরকম একটা শব্দ শুনতে পাবো। প্রত্যাশাবর্জিত গলায় বুড়ো তাকে ফুসলালো, এই, বাক, এই বাক্। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে কর্তার মুখের উপর চোখ রেখে বললো, যদি পেটে খিদে থাকতো — নিজের মাথা নাড়লো বুড়ো। যদি খিদে থাকতো তা হলে ভুলিয়ে ভালিয়ে আনা যেতো, কিন্তু এখন আর খিদে পায় না। দাঁত খারাপ হয়ে গেছে।

কর্তা আমার দিকে তাকালেন, আর আমাকে কেন বেতন দিয়ে পোষা হয় সেটা আমার জানা ছিলো।

ধরেই নেয়া হয়েছিলো যে আমি অনেক কাজ করবো, বহু ধরনের কাজ করবো। তার মধ্যে একটা হলো পনেরো বছর বয়সী একশ ত্রিশ পাউন্ড ওজনের সাদা রোমশ কুকুরটাকে গ্রীষ্মের অপরাহ্নে আমি কোলে তুলে নেবো, তারপর কুকুরটা যখন কর্তার চোখের গভীরে দৃষ্টিপাত করবে তখন তার বিশ্বস্ত চোখেমুখে এক অনির্বচনীয় শান্তির অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলবো। একটা ঠেলাগাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার মতো নিজেকে প্রস্তুত করে আমি বাকের সামনের দু'পা ধরে টান দিলাম। কাজ হলো না। এক মুহূর্তের জন্য তার শরীরের সামনের দিকটা আমি উঁচু করলাম, তখন সে এক ঝলক নিঃশ্বাস ছাড়লো আর আমি এক ঝলক নিঃশ্বাস নিলাম। বাকের এক ঝলক নিঃশ্বাসই ছিলো যথেষ্ট। মনে হলো যেন শকুনের বাসা থেকে ওই নিঃশ্বাস ভেসে এসেছে। আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেলো। বাক্ ধপ করে বারান্দার তক্তার উপর পড়ে গেলো। যে মরু–ভালুকের রোমের কম্বলের মতো তাকে দেখাতো সেই কম্বলের মতোই নিশ্চল হয়ে রইলো বাক্।

তখন টম স্টার্ক আর সাংবাদিকদের মধ্য থেকে একজন এসে তার লেজের দিকটা ধরে ধাক্কা দিলো, আর আমি টানতে লাগলাম সামনের দিকটা ধরে, নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখে, আর এইভাবে আমরা তাকে সাত ফুট দূরে দাঁড়ানো কর্তার কাছে টেনে নিয়ে এলাম। কর্তা তাঁর শরীর টান টান করলেন, আমরা বাকের সামনের দিকটা উঁচু করলাম, আর তখনই ওর এক ঝলক নিঃশ্বাস গিয়ে লাগলো কর্তার নাকে।

এক ঝলকই ছিলো যথেষ্ট।

কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে কর্তা জানতে চাইলেন, দোহাই তোমার, বাবা, ওকে তোমরা কি খাওয়াচ্ছো?

বুড়ো স্টার্ক বললো, ও কিছুই খেতে চায় না।

ও যে সুগন্ধী ফুল খায় না সেটা স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি। কর্তা থুতু ফেললেন মাটিতে।

ফটোগ্রাফার মন্তব্য করলো, ও পড়ে গেছে, কারণ ওর পেছনের পায়ে কোনো জোর নেই। ওকে উঁচু করে তোলার পর আমাদের খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে।

কর্তা তীব্র স্বরে বলে উঠলেন, আমাদের? আমাদের? আমাদের মানে কি? আমাদের বলতে কি বোঝাচ্ছো তুমি? এসো, এগিয়ে এসে তুমি ওকে চুমু খাও একটা। ওর এক নিঃশ্বাসে দুধ জমে দই হয়ে যাবে, পাইন গাছের বাকল খসে পড়বে। আমাদের! যত্তোসব!

কর্তা সজোরে বড়ো করে নিঃশ্বাস নিলেন, আর আমরা আরেকবার চেষ্টা করলাম। কাজ হলো না। বাকের শরীরে কিছু ছিলো না। ছ'সাত বার চেষ্টা করলাম আমরা, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। অবশেষে কর্তা সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন আর আমরা বাক্‌কে টেনে তাঁর কাছে এনে ওর বিশ্বস্ত মাথাটি কর্তার জানুর উপর স্থাপন করলাম। কর্তা বাকের মাথায় হাত দিয়ে ফটোগ্রাফারের যন্ত্রটির দিকে তাকালেন। ফটোগ্রাফার ছবি তুলে বললো, উঃ, সবাই একেবারে পাগল হয়ে যাবে। আর কর্তা বললেন, হ্যাঁ, পাগল হয়ে যাবে।

কর্তা বাকের মাথায় হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত সেখানে বসে থাকলেন, তারপর বললেন, কুকুর হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড়ো বন্ধু। বাক্, কতোদিনকার বাক্, ওর চাইতে বড়ো বন্ধু আমি আর কাউকে পাই নি। কর্তা বিশাল দানবটির মাথা চুলকে দিলেন। হ্যাঁ, গুড ওল্ড বাক্, ওর চাইতে বড়ো কোন বন্ধু আমি কখনো পাই নি। কর্তা উঠে দাঁড়ালেন, এতো ত্বরিত গতিতে যে তাঁর জানুর উপর থেকে বাকের মাথা গড়িয়ে পড়ে গেলো। কর্তা বললেন, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, ওর গায়ের গন্ধ অন্যদের চাইতে এক রত্তিও ভালো নয়।

একজন সাংবাদিক জানতে চাইলো, একথা কি লিখতে পারি, বস্?

অবশ্যই। ওর গন্ধ আর সব কুকুরের মতোই।

এর পর আমরা বাক্‌কে সিঁড়ির উপর থেকে সরিয়ে নিলাম আর ফটোগ্রাফার তার কর্তব্য পালনে লেগে গেলো। কর্তা আর তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্ভাব্য সকল রকম কম্বিনেশনের অনেকগুলি ছবি তুললো সে। তারপর নিজের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে সে বললো, গভর্নর, আপনাকে নিয়ে আমরা উপরের ঘরের একটা ছবি তুলতে চাই। ছেলেবেলায় আপনি যে ঘরে থাকতেন। সবাই পাগল হয়ে যাবে ওই ছবি দেখে।

হ্যাঁ, কর্তা বললেন, পাগল হয়ে যাবে। এই আইডিয়াটা ছিলো আমার। পাগল ঠিকই হয়ে যাবে। কর্তা একটা পুরানো স্কুল পাঠ্যবই হাতে নিয়ে ওখানে বসে আছেন। বাচ্চাদের জন্য একটা উত্তম দৃষ্টান্ত হবে। অতএব আমরা সবাই উপরে

গেলাম।

ছোট্ট ঘর, নিরাভরণ তক্তার মেঝে, বিবর্ণ দেয়াল, এক সময় হলুদ রঙ করা ছিলো কিন্তু এখন রঙ চটে গেছে, যেখানে এখনো সামান্য রঙ আছে সেই অংশগুলি কাঠের গায়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ঘরে একটা বড়ো কাঠের খাট আছে, মাথার দিকটা উঁচু, পায়ের দিকটা ঈষৎ অসমান্তরাল, খাটের উপর সাদা বেড-কভার পাতা। একটা টেবিল রয়েছে — পাইন কাঠের — আর গোটা দুই সোজা শক্ত চেয়ার, আর একটা স্টোভ — টিনের স্টোভ, মানুষ যাকে ট্র্যাশ-বার্নার বলে, রীতিমত মরচে পড়া অবস্থায় এখন — আর স্টোভের ওপাশে দেয়াল ঘেঁষে দুটি বাড়িতেতৈরি বই-এর তাক, বইপত্রে ঠাসা। একটাতে ইংরেজী, ভূগোল, বীজগণিত আর ওই জাতীয় বই, অপরটিতে একগাদা মোটা মোটা পুরানো আইনের বই।

কর্তা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভালো করে চারপাশটা একবার দেখলেন, আর আমরা সবাই দরজার কাছে একপাল ভেড়ার মতো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। কর্তা তারপর বললেন, কী কাণ্ড! ওই সাদা বুড়ো দৈত্যটাকে খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিলেই হুবহু সেই পুরনো দিনের ঘরের মতো দেখতে হয়ে যাবে। আমি খাটের দিকে তাকালাম। চীনামাটির চায়ের পেয়ালা-পিরিচ ইত্যাদি সেখানে নেই। একমাত্র ওই জিনিসগুলিই গরহাজির। অর ওই কিশোরটি নেই, গাব্দাগোব্দা চেহারা, মুখে ছোট ছোট হলদেটে দাগ, কপালের উপর একগুচ্ছ রুক্ষ চুল ঝুলে পড়েছে, কয়লা-তেলের বাতির আলোতে — তখন নিশ্চয়ই ওই রকম লম্ফই ছিল — মাথা নিচু করে টেবিলে পড়াশুনা করছে, হাতে একটা পেন্সিল ধরা, প্রায়ই সেটা কামড়েছিলো নিশ্চয়ই, কারণ তাতে দাঁতের দাগ, আর ওদিকে স্টোভের আগুন কমে আসছে, বাড়ির উত্তর দিকে জোরে বাতাস ঝাপ্টা দিচ্ছে, হাজার মাইল দূরের ডাকোটা থেকে সেই বাতাস বরফ-শীতল প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে আসছে, বাতাসের নিচে তুষারের চাপে সেই সব প্রান্তর শক্ত মসৃণ মুক্তোর মতো দেখায়, অন্ধকারে সেগুলি ঝকমক করে, ওই বাতাস সজোরে ছুটে আসছে নদীর তলদেশের উপর দিয়ে, পাহাড়ের ভেতর দিয়ে, যেখানে এক সময় সারি সারি পাইন গাছ দাঁড়িয়েছিলো, একদা বাতাসের ঝাপ্টায় কঁকিয়ে উঠেছিলো, কিন্তু এখন বাতাসের বেগ স্তিমিত করার জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ঘরের উত্তর দিকের জানালার শার্সী থেকে বাতাসের ঝাপ্টায় ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে, তার ফাঁক দিয়ে গলে আসা ক্ষীণ বায়ু-স্রোতে কয়লা-তেলের লম্ফের শিখা বেঁকে যাচ্ছে, কাঁপছে থির থির করে, কিন্তু কিশোরটি মুখ তুলছে না। মাঝে মাঝে দাঁতে পেন্সিল কামড়ে মুখ গুঁজে সে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে, কাপড়জামা খুলে, আন্ডারওয়্যার

পরে, বিছানায় ঢুকে পড়ে। ঠাণ্ডা চাদরে গা শিরশির করে ওঠে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে সে কাঁপতে থাকে। হাজার মাইল দূর থেকে বাতাস ছুটে আসে, বাড়ির গায়ে আছড়ে পড়ে, শাসী ঘড়ঘড় করে ওঠে, আর কিশোরটির ভেতর কি একটা বাড়ে, কুণ্ডলী পাকায়, দানা বাঁধে, শেষে এমন হয় যে সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখে, আর তার মাথার ভেতর রক্ত দপদপ করে একটা ফাঁপা আওয়াজ তুলে দ্রিম দ্রিম বাজতে থাকে, তার মাথা যেন বাইরের আঁধারের মতোই বিশাল এক গুহা। তার নিজের ভেতরের বিশাল জিনিসটার নাম সে জানে না। হয়তো তার কোনো নাম নেই।

ঘরের ভেতর দুটি জিনিসই ছিলো অনুপস্থিত, কিশোর আর ওই পাত্রটি। নইলে সব ছিলো নিখুঁত।

কর্তা বলছিলেন, হ্যাঁ, ওটা ঠিকই নেই। কিন্তু আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই। আগের দিনের মানুষরা যেমন বলতেন, তলা দিয়ে পানি গেলে শরীরে শ্লেষ্মা জমে, হয়ত ঠিকই বলতেন, তবে তার ফলে আইনের বিদ্যা শিক্ষার কাজটা যে অনেক সুখকর হতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আর তাহলে এত সময়ও অপচয় করতে হতো না।

কর্তা ধীরে সুস্থে কাজ করতেন। কতবার আমরা স্নানঘরের দরজার দু'পাশে অবস্থান নিয়ে রাজ্যের কতো সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কর্তা ভেতরে, আর আমি দরজার বাইরে চেয়ারে বসে, আমার হাঁটুর উপর কালো ছোট নোট বইটি খোলা, আর পাগলের মতো টেলিফোনের নিরন্তর ধ্বনি।

কিন্তু ফটোগ্রাফার তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কর্তাকে টেবিলে বসালো, হাতে ধরিয়ে দিলো বহুল-ব্যবহৃত একটি বই, কর্তা বই-এর মধ্যে মুখ' গুঁজলেন, আর ফ্লাশ বাল্ব জ্বলে উঠলো। হয়ে গেলো একটা ছবি। আবার পাঁচ-ছ'টা তোলা হলো, কর্তা স্টোভের পাশে চেয়ারে বসে আছেন, হাঁটুর উপর ধরে আছেন একটা পুরানো আইনের বই। আরো কি সব যে তোলা হলো তা ঈশ্বরই জানেন।

ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ঐতিহাসিক দলিল তৈরির কাজে ওদের ব্যস্ত রেখে আমি আলগোছে নিচে নেমে এলাম।

সিঁড়ির নিচের ধাপে পৌঁছে আমি বসবার ঘর থেকে ভেসে আসা গলার আওয়াজ শুনলাম। নিশ্চয়ই বুড়ো স্টার্ক, লুসি স্টার্ক, স্যাডি বার্ক আর টম কথা বলছে। আমি পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পেছনের বারান্দায় চলে গেলাম। রান্নাঘরে নিগ্রো পরিচারিকাটি টুকটাক কাজ করে চলেছে, আপন মনে গুণগুণ করে ধর্মসঙ্গীত গাইছে। আমি পেছনের আঙিনা পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম। আঙিনায় ঘাস নেই। শরতের বৃষ্টি নামলে সেখানে দেখা যাবে একটা বুনো পাইন গাছ, আর কিছুই না,

গুঁড়ির কাছে মুরগীর পায়ের দাগ। কিন্তু এখন শুধুই ধুলো। গেটের কাছে একটা বুনো জাম গাছ ছিলো। তার পাশ দিয়ে পেছনের জায়গাটায় যাবার সময় মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা জামের উপর আমার পা পড়ে পুটুস পুটুস শব্দ হলো।

আমি এক সারি কৌণিক আকারের মুরগীর খুপরীর পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। কাঠের তক্তা চিরে এমনভাবে খুপরীগুলি বানানো হয়েছে যেন বৃষ্টির জল ভেতরে না যায়। আমি গোলাঘর আর আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হলাম। আস্তাবলে দুটি প্রাচীন কিন্তু সক্ষম খচ্চর নিজেদের প্রজাতির চিরন্তন লজ্জা নিয়ে মাথা নিচু করে একটা বড়ো লোহার পাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওই রকম পাত্রে এক সময় গুড় জ্বাল দেয়া হতো। এখন সেটা জলাধার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার পাশে একটা পাইপ বসান হয়েছে, পাইপের মুখে কল লাগানো, এটা হলো কর্তা যেসব আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু করেছেন তার একটা, রাস্তা থেকে যা দেখা যায় না।

আমি আস্তাবলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম, কাঠের আস্তাবল, কিন্তু মজবুত টিনের ছাদ, এগিয়ে গিয়ে বেড়ার উপর দেহভার ঈষৎ ন্যস্ত করে সামনের দিকে, জমি যেখানে উঁচু হয়ে উঠেছে খানিকটা, সেদিকে, দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম। গোলাঘরের পেছন দিকের জমিতে জলের নালা, মাঝে মাঝে কাঠখড়ময়লা জমে জলের প্রবাহ একটু বন্ধ হয়ে গেছে। শ'খানেক গজ দূরে, চড়াইর পাদদেশে, এক টুকরো বনানী, ওক্ জাতীয় গাছপালা। মাটি এখানে নিশ্চয়ই ভেজা ভেজা, জলসিক্ত, কারণ গাছগুলির গুঁড়ির কাছের, চারপাশের, ঘাস আর আগাছা প্রাণবন্ত, আর তার রঙে গ্রীষ্মাঞ্চলের সবুজের সমারোহ। এই জায়গার ওপারে যে বিরাণ প্রান্তর তার পাশে এই সুবজকে মনে হচ্ছিলো অস্বাভাবিক। ওখানে আমি গোটা দুই শুয়োর দেখলাম, পাশ ফিরে অলসভাবে মাটিতে শুয়ে আছে, যেন মাটির ভেতর থেকে দুটো বিশাল ধূসর ফোঁড়া ফুটে বেরিয়েছে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। আমি বেড়ার উপর ঝুঁকে দূরে পশ্চিমের দিকে তাকালাম, সেখানে সূর্যাস্তের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। গরমের দিনে সূর্যাস্তের সময় আস্তাবলের পাশে যে শুকনো পরিষ্কার চুনার গন্ধ পাওয়া যায় সেই গন্ধ আমি নাক ভরে টেনে নিলাম । আমার প্রয়োজন পড়লে ওরা ঠিক খুঁজে বার করতে পারবে। কখন সেই প্রয়োজন পড়বে সে-সম্পর্কে অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না। কর্তা তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে রাতটা বোধহয় এখানেই কাটাবেন। তাঁর বাবার বাড়িতে। ফটোগ্রাফার, স্যাডি, আর সাংবাদিকরা শহরে ফিরে যাবে। মিঃ ডাফি সম্ভবতঃ মেসন সিটির কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবেন। কিংবা তিনি আর আমি হয়তো কর্তার বাবার এখানেই থেকে যাবো। তবে ডাফি আর আমাকে যদি এক

বিছানায় দেয় তাহলে আমি সোজা মেসন সিটির দিকে হাঁটতে শুরু করবো। আর বাকী থাকলো সুগার-বয়। কিন্তু এসব ভাবনা আমি বাদ দিলাম। ওরা যা খুশী করুক, আমার কিচ্ছু এসে যায় না।

আমি বেড়ার উপর আরেকটু ঝুঁকলাম। ফলে আমার পাছার দিকটা টান টান হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের পকেটে রাখা পাঁইট বোতলটা আমার বাম কটিদেশের উপর চেপে বসলো। এক মিনিট চুপচাপ ভাবলাম আমি, সপ্রশংস চোখে সূর্যাস্তের বর্ণবিভা দেখলাম, নাকে টেনে নিলাম চুনার গন্ধমাখা শুষ্ক পরিষ্কার বাতাস, তারপর পকেট থেকে বোতলটা টেনে বার করলাম। এক চুমুক গলায় ঢেলে আবার সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। সূর্যাস্তের বর্ণবিভা কখন আমার পেটের মধ্যে বিস্ফোরিত হয় তার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম আমি। এবং বিস্ফোরণটা ঘটলো।

গোলাঘরের দিকে আসার গেটটা যে একজন কেউ খুললো এবং তারপর বন্ধ করলো আমি সে শব্দ শুনলেও পেছন ফিরে তাকালাম না। যদি না তাকাই তাহলে কেউ যে মরচে-ধরা কব্জায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে গেট খুলেছিলো সেটা আর সত্য হবে না। এ একটা আশ্চর্য নীতি। কলেজে পড়ার সময় আমি একটা বই-তে এর সাক্ষাৎ পাই। তারপর থেকে আমি যক্ষের মতো এটা আঁকড়ে ধরেছি। জীবনে আমার সকল সাফল্যের মূলে হলো এই নীতি। আজ আমি যেখানে এসে পৌঁছেছি তা ওই নীতিরই জন্য। আপনি যা জানেন না তা আপনার কোনো ক্ষতি করতে অসমর্থ, কারণ তা অবাস্তব। কলেজে পড়ার সময় আমার বই-এ ওরা এর নাম দিয়েছিলো ভাববাদ। আমি ভাববাদী হয়ে যাই। সে সময় আমি এক মহা কট্টর ভাববাদীতে পরিণত হই। আপনি যদি ভাববাদী হন তাহলে আপনি কি করছেন বা আপনার চারপাশে কি ঘটছে তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ সেসব তো আর বাস্তব নয়।

কোমল ধুলার উপর পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এলো। আমি চোখ তুললাম না। তারপর বেড়ার তারে একটু শব্দ হতে এবং তাকে আরেকটু ঝুঁকে যেতে দেখে আমি বুঝলাম যে কেউ আরেকজন এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, বেড়ার উপর ভর দিয়ে সূর্যাস্তের শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছে। 'ক' মহোদয় আর আমি উভয়ে মিনিট দুই এক সঙ্গে সেই শোভা দেখলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। তার নিঃশ্বাসের শব্দ না পেলে এখানে আমার সাথে যে আর কেউ আছে সেটা আমি বুঝতেই পারতাম না।

তারপর মিঃ 'ক' যখন তারের উপর থেকে নিজের শরীরের ভার তুলে নিলেন তখন তারটা নড়ে উঠলো। তারপর একটা হাত আমার বাম কটিদেশের উপর মৃদু চাপড় মারলো, আর একটা কণ্ঠস্বর বললো, আমাকে একটুখানি দাও।

কর্তার কণ্ঠস্বর।

আমি বললাম, তুলে নিন। কোথায় আছে তা তো আপনি জানেন।

কর্তা আমার কোটের পেছন দিকের কাপড় তুলে বোতলটা টেনে বার করলেন। গলায় ঢালার ঢকঢক শব্দ শুনলাম আমি। বেড়ার গায়ে হেলান দিতেই আবার তারটা নড়ে উঠলো।

আমি জানতাম যে তুমি এখানে আসবে।

তিক্ততাবর্জিত গলায় আমি জবাব দিলাম, আর আপনার একটু সুরাপানের ইচ্ছা হয়েছিলো।

কর্তা বললেন, হ্যাঁ। বাবা মদ খাওয়া পছন্দ করে না। কখনো করে নি।

আমি চোখ তুলে তাঁকে দেখলাম। এমনভাবে বেড়ার গায়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছেন যে তাতে তারের খুব উপকার হচ্ছিলো না, দু'হাতে ধরা ছিপিআঁটা বোতল, দু'টি বাহু তারের উপর ন্যস্ত।

আমি বললাম, এক সময় লুসিও পছন্দ করতো না। সব কিছুই পাল্টে যায়। কথাটা বলে বোতলের মুখ খুলে তিনি আরেক চুমুক খেলেন, মুখটা বন্ধ করলেন, তারপর বললেন, কিন্তু লুসি, আমি জানি না লুসি পাল্টেছে কিনা কিংবা পাল্টায়নি। এখন ও মদ খাওয়া পছন্দ করে, কি করে না, আমি জানি না। নিজে কখনো ছোঁয় না। তবে এটা যে মানুষের স্নায়ুকে কিছুটা প্রসারিত করে তা বোধহয় ও বোঝে।

আমি হেসে উঠে তাঁকে বললাম, আপনার কোনো স্নায়ুই নেই।

আমি পুরোপুরি একটা স্নায়ুর পুঁটুলী, বলেই তিনি দাঁত দেখিয়ে হাসলেন।

আমরা দুজনই বেড়ার গায়ে ঝুঁকে দূরে শেষ বিকালের আলোর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম কেমন করে সেটা চড়াইর নিচের দিকের ঝোপঝাড়কে রাঙিয়ে দিচ্ছে। কর্তা তাঁর মাথা আরেকটু সামনে ঝুঁকিয়ে ঠোঁটের আগায় একটা বড় থুতুর গোলা জমতে দিলেন, তারপর নিজের দু'বাহুর মধ্য দিয়ে বেড়ার ঠিক ওধারেই নিচে শুয়োরগুলোর জন্য যে জলাধার ছিলো তার মধ্যে আলগোছে টুপ করে ফেলে দিলেন। জলাধার এখন শুকনো, তার মধ্যে কিছু ভুট্টার লাল দানা আর আজেবাজে জিনিস পড়ে আছে, জলাধারের পাশের মাটিতেও সেই সব ছড়ানো।

কর্তা বললেন, এখানে বিশেষ কিছুই বদলায় না।

এই মন্তব্যের কোনো উত্তর দেয়ার দায় ছিল না আমার, আর তাই কোনো জবাব দিলাম না।

কর্তা বললেন, আমি কম করে হলেও, বিভিন্ন সময়ে, ওখানে দশ হাজার গ্যালন ফ্যান আর জাউ, তরল, আধা তরল, পশু-খাবার ঢেলেছি।

পাত্রটির মধ্যে তিনি আরেকটা থুতুর গোলা ফেললেন।

কম করে হলেও আমি পাঁচশো শুয়োরকে ওই পাত্র থেকে খাইয়েছি। আর এখনও আমি সেই একই কাজ করে যাচ্ছি। ওর মধ্যে ফ্যান–জাউ ইত্যাদি ঢেলে চলেছি।

আমি বললাম, তো ওই পশু–খাবার খেয়েই তো ওরা জীবন ধারণ করে, তাই না?

উনি একথার কোনো জবাব দিলেন না।

ওদিকের গেটের কব্জায় আবার শব্দ হতেই আমি ঘুরে তাকালাম। এখন আর না তাকাবার কোনো কারণ ছিল না। স্যাডি বার্ক। সাদা অক্সফোর্ড জুতো পরে ধুলোর মধ্য দিয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে সে এগিয়ে আসছিলো। খুব ব্যস্ত–সমস্ত, মনে হচ্ছিলো তার নীল ডোরাকাটা কাপড়ের স্কার্ট বুঝি ওর দ্রুততার ফলে এখনি ফেঁসে যাবে। কর্তা ঘুরে দাঁড়ালেন, হাতের বোতলের দিকে তাকালেন, তারপর সেটা আমার কাছে চালান করে দিলেন। স্যাডি যখন ফুট দশেকের মধ্যে এলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

ও সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব না দিয়ে কাছে এলো। ছুটে আসার ফলে ও হাঁফাচ্ছিলো। ওর মুখে বসন্তের চিহ্নের মতো অল্প অল্প দাগ, ঘামে ভিজে গেছে মুখ, সেই মুখে এখন আলো পড়েছে, খাটো কালো চুল এলোমেলো, যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, ওর বড়ো বড়ো গাঢ় কালো প্রখর দ্যুতিময় চোখদুটি যেন সূর্যালোকের মধ্যে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কর্তা আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? কোনো রকমে দম নিয়ে স্যাডি বলল, জাজ্ আরউইন।

কি?

কর্তা তখনো অলসভাবে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু স্যাডিকে এমনভাবে দেখছেন যেন ও এখনই পিস্তল বার করবে, আর কর্তা বিদ্যুৎগতিতে কিভাবে তার মোকাবেলা করবেন সেকথা ভাবছেন।

ম্যাট্‌লক্ ফোন করেছে — শহর থেকে — দূর পাল্লার ফোন — বললো যে আজকের অপরাহ্নের কাগজে বেরিয়েছে —

কর্তা বললেন, তা সবটা খোলাসা করে বলে ফেলো। বলো।

ড্যাম্ ইট্, বলবো। একটু দম নিতে দিন। সুস্থ হই একটু, তখন সব খোলাসা করেই বলবো, আর আপনি যদি —

ঃ এই মুহূর্তে তো অনেকখানি দম তুমি খামোখাই নষ্ট করছো।

কর্তার গলার স্বর খুব কোমল। ওই কণ্ঠস্বর আপনাকে বিড়ালের পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দেবার কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্যাডি খেঁকিয়ে উঠলো, দমটা আমার, কেউ সেটা কিনে নেয় নি। আপনাকে একটা কথা বলার জন্য আমি পড়ি কি মরি করে ছুটে আসি, আর আপনি শুধু বলতে থাকেন, খোলাসা করে বলো, খোলাসা করে বলো। একটু দম নেবার আগেই। আগে সুস্থ হই, সুস্থির হই, তখন বলবো —

কর্তা বেড়ার গায়ে শরীর আরেকটু হেলিয়ে বললেন, তোমার কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে না যে দম ফুরিয়ে গিয়ে তুমি খুব একটা হয়রান হয়েছো।

দাঁত বার করে কর্তা হাসলেন।

ঃ আপনি ভাবছেন এটা খুব একটা হাসির ব্যাপার, তাই না? খুব হাসির, এ্যাঁ?

কর্তা একথার কোন জবাব দিলেন না। তারের উপর নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে ঝুঁকে থাকলেন যেন সামনে সারা দিন পড়ে রয়েছে, কোনো কাজ নেই, তাঁর মুখের হাসি লেগেই থাকলো। আমি অতীতে লক্ষ করেছি কর্তার মুখের ওই হাসি স্যাডির মেজাজকে মোটেই শান্ত করতো না। ঘটনা এখনও সেই একই ধারায় অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হলো।

অতএব আমি ভদ্রভাবে ওদের দু'জনের উপর থেকে চোখ সরিয়ে শুয়োরের এলাকার ওধারে পড়ন্ত বেলার শোভা আর বিষণ্ন নিসর্গের সৌন্দর্য উপভোগে আবার মনোনিবেশ করলাম। অবশ্য এ আমি ভালো ভাবেই জানতাম যে ওদের মন যদি অন্য কোনো ভাবনায় মশগুল হয়ে থাকে তাহলে দু'জনের একজনও আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। ক্ষমতা, সিংহাসন, প্রভুত্ব সব চারপাশে জমে আসতে পারে, কিন্তু স্যাডির যদি মন চায়, তাহলে সব সে অতি সহজে ছেড়ে ছুঁড়ে চলে আসতে পারে। কর্তার মধ্যেও এই মনোভাবের ঘাটতি ছিলো না। মাঝে মাঝে ওরা দু'জন প্রায় বিনা কারণে এই রকম কাণ্ড শুরু করে দিতো, কর্তা গা এলিয়ে দিয়ে হাসতেন, স্যাডিকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন, শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াতো যে স্যাডির বড়ো বড়ো কালো উজ্জ্বল চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হতো, তার মাথার জট থেকে একগুচ্ছ কালো চুল আলগা হয়ে মুখের উপর ঝুলে পড়তো, আর হাতের পিঠ দিয়ে স্যাডিকে ওই চুল পেছনে ঠেলে দিতে হতো বারবার। ক্ষেপে গেলে স্যাডি অনেক কথা বলতো, কিন্তু কর্তা বিশেষ কিছু বলতেন না। ওর দিকে তাকিয়ে শুধু হাসতেন। মনে হয় ওকে ক্ষ্যাপাতে, নিজে নিরুত্তাপ থেকে ওর ক্ষিপ্ত মূর্তি দেখতে, তিনি মজা পেতেন। একবার স্যাডি তাঁকে চড় পর্যন্ত মেরেছিলো বেশ জোরে, কিন্তু তখনো তিনি তার দিকে ওই রকম ভাবেই তাকিয়ে ছিলেন, যেন ও একটি হুলো

নাচের মেয়ে, তাঁর জন্য একটা নাচের আইটেম পরিবেশন করছে। হ্যাঁ, ওকে ক্ষেপিয়ে তিনি সত্যিই মজা পেতেন, যতক্ষণ না তাঁর খুব স্পর্শকাতর কোনো জায়গায় ঘা লাগতো। একমাত্র স্যাডিই সে সব খবর রাখতো। আর একমাত্র তারই সাহস হতো। এবং তখনই আসল খেলা শুরু হতো। সেখানে আর কেউ উপস্থিত আছে কিনা তা নিয়ে ওরা এক বিন্দু মাথা ঘামাতো না। আমার উপস্থিতি তো ধর্তব্যের মধ্যেই ছিলো না। সঙ্কোচ বা সৌজন্যবোধ থেকে আমার মুখ ঘুরিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। দীর্ঘ কাল ধরে আমি একটা ফার্ণিচারে পরিণত হয়েছিলাম, কিন্তু তবু ঠাকুরমার কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়া শোভন আচরণমালার কিছু ছিটেফোঁটা মাঝে মধ্যে আমার ভেতর জেগে উঠতো, আর তখন আমার কৌতূহল পরাজিত হতো। আমি অবশ্যই এক খণ্ড ফার্ণিচার — দু'পেয়ে, আর মাইনেধারী — তবু আমি সূর্যাস্তের দিকেই চোখ ফেরালাম।

স্যাডি বলছিলো, ওঃ, খুব মজার মনে হচ্ছে, কিন্তু কথাটা যখন বলবো তখন আর ব্যাপারটা এতো মজার মনে হবে না। স্যাডি থামলো, তারপর বললো, জাজ্ আরউইন ক্যালাহানের পক্ষে নেমেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো, হয়তো সেকেণ্ড তিনেকের জন্য, যদিও সময়টা মনে হলো এক সপ্তাহ, শুধু শোনা গেলো একটা শোকার্ত ঘুঘুর ডাক। নিচে শুয়োরের আস্তানার পাশের গাছে বসে থাকা ঘুঘুটি বার দুই তার নিজের আর আমার হৃদয় ভেঙে দেবার প্রয়াস পেলো।

তারপর আমি কর্তার গলা পেলাম, হারামজাদা !

স্যাডি ব্যাখ্যা করলো, বিকালের কাগজে বেরিয়েছে জাজের সমর্থনের খবর। ম্যাট্লক্ ফোন করেছে। আপনাকে জানাবার জন্যে।

ঃ মিথ্যেবাদী, দু'মুখো শয়তান !

তিনি বেড়ার গা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আমি বুঝলাম যে আমাদের ঘরোয়া আসর এবার ভেঙে যাবে। গেলোও।

ঃ এসো।

কর্তা টিলার উপর দিয়ে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করলেন। তাঁর পাশাপাশি ছুটতে গিয়ে স্যাডির সূতী কাপড়ের স্কার্ট বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিলো। আমি আস্তে আস্তে ওদের পেছন পেছন চললাম। আমরা যখন গেটের পাশে জামগাছটার কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম, যেখানে মাটিতে পড়ে থাকা জাম পায়ের তলায় পুটুসপুটুস শব্দে ফেটে যায়, তখন কর্তা স্যাডিকে উদ্দেশ করে বললেন, ওদের চলে যেতে বল।

স্যাডি জানালো, টাইনি ঠিক করেছিলো এখানে খেয়ে যাবে। তারপর সুগার-বয়

ওকে গাড়ি করে মেসন সিটিতে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবে, যেন ও আটটার ট্রেন ধরে শহরে ফিরতে পারে। আপনিই বলেছিলেন।

ঃ এখন 'না' বলছি। সব্বাইকে যেতে বল এখান থেকে।

স্যাডি বললো, সানন্দে।

কথাটা মন থেকে বললো বলেই আমার বিশ্বাস।

সে ঝটিতি সবাইকে বিদায় দিলো। কাঁকরের রাস্তা দিয়ে সবেগে ওদের গাড়ি বেরিয়ে গেলো, গাড়ির জানালা দিয়ে মানবশরীরের কিছু মাংসল অংশ দৃশ্যমান হলো, তারপর রাত্রির প্রশান্তি নেমে এলো আমাদের উপর। আমি বাড়ির অন্য পাশে চলে গেলাম। সেখানে তার আর পিপার পাতলা কাঠ দিয়ে তৈরি একটা দোলনা ঝুলছিলো, একদিক একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, অন্যদিক একটা ওক্ গাছের সঙ্গে। আমি আমার কোট খুলে খুঁটির গায়ে ঝুলিয়ে দিলাম, আর বোতলটা যেন শোবার পর আমার কোমরের হাড় ভেঙ্গে না ফেলে সেজন্য সেটা বের করে কোটের পাশ-পকেটে রেখে দিলাম। তারপর ঝুল-দোলনায় উঠে পড়লাম।

কর্তা আঙিনার অন্যধারে জোরে জোরে পায়চারি করছিলেন। সেখানে সবুজ গাছগাছালি, আর পায়ের নিচে ধূলিধূসরিত ঘাস। তো এটা ওঁর মাথাব্যথা, যেভাবে খুশী সেভাবে মোকাবেলা করবেন। আমি নির্বিকারভাবে দোলনায় শুয়ে রইলাম। শুয়ে শুয়ে আমি ওকের পাতাগুলির নিচের দিকটা লক্ষ্য করলাম, শুকনো, ঈষৎ বাদামী, আর কেমন ধুলো-মাখা সবুজ-সবুজ, কয়েকটা পাতার গায়ে দেখলাম মরচে-পড়া ক্ষয়ে যাওয়া দাগ। এগুলিই খুব শীঘ্র ডাল থেকে খসে পড়বে, বাতাসের দমকে নয়, আপনা থেকেই তন্তুগুলি শিথিল হয়ে পড়বে, কোনো এক উজ্জ্বল সূর্যালোকিত মধ্যদিনে, বাতাস তখন এতো নিষ্কম্প যে তা সূক্ষ্ম দাঁতের ব্যথার মতো শিরশির করতে থাকে, কিংবা আপনার বুকের মধ্যে সেই যন্ত্রণার মতো যখন আপনি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আলো বদলাবার জন্য অপেক্ষা করছেন, আর অতীতে এক সময় সবকিছু কি রকম ছিলো তা হঠাৎ আপনার মনে পড়ে যায়, আর ভাবেন যা ঘটে গেছে তা যদি না ঘটতো তা হলে কি হতে পারতো।

তারপর পত্রপল্লব দেখতে দেখতে আমি গোলাঘরের দিক থেকে ভেসে আসা একটা শুকনো তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আবার সেই শব্দ শোনা গেলো। তখন ব্যাপারটা আমি বুঝলাম। বাড়ির ওই দিকে সুগার-বয় তার .৩৮ স্পেশাল পিস্তল দিয়ে খেলতে শুরু করেছে। গাছের গুঁড়ি জাতীয় কিছুর উপর সে একটা টিনের কৌটা বা বোতল বসাবে, তারপর পিস্তলের নলের দিকটা বাঁ হাতে ধরে, সেফটি অন করে, উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করবে, দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতে

থাকবে, সরু পশ্চাদ্দেশ, ঢোলা নীল সার্জের প্যান্ট, খাটো গাব্দাগোব্দা পা, মাথার টাকের উপর পড়ন্ত বিকালের আলো সামান্য ঝলমল করবে, স্বল্প ক'গোছা চুলে আলো পড়ে রজতশুভ্র দেখাবে। তারপর অকস্মাৎ সে হাঁটা থামিয়ে চোখের পলকে ডান হাতে পিস্তলটা নিয়ে, এবার বাটের দিক ধরে, ঘুরে দাঁড়াবে — সবগুলি কাজ এক সঙ্গে করবে, অসম্ভব দ্রুতগতিতে যেন তার ভেতরে কিছু একটা বিস্ফোরিত হয়ে গেছে, আর তখুনি পিস্তলটা গর্জে উঠবে, টিনের কৌটাটা সশব্দে গড়িয়ে পড়বে তার জায়গা থেকে, কিংবা বোতলটা শতধা হয়ে ফোয়াবার মতো ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে। আর তখন সুগার–বয় বলে উঠবে, হা – হা – হা – রাম – জাদা, তার মাথাটা নড়তে থাকবে এপাশ-ওপাশ, আর ঠোঁট দিয়ে ছিটকে বেরুবে থুতুর ফোয়ারা।

একটা তীব্র কর্কশ আওয়াজ, তারপর বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ। তার মানে প্রথম চেষ্টাতেই ও সফল হয়েছে, এবং এখন ফিরে গিয়ে নতুন করে টার্গেট সাজাচ্ছে। খানিকক্ষণ পর আবার একটা শব্দ, আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। এক সময় শোনা গেলো খুব দ্রুত, পর পর, দুটো শব্দ। তার মানে সুগার–বয় প্রথম প্রয়াসে ব্যর্থ হয়েছে, সফল হয়েছে দ্বিতীয় বারে।

আমার নিশ্চয়ই তন্দ্রা এসেছিল। জেগে উঠতেই দেখি কর্তা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, বলছেন, খাবার সময় হয়েছে।

সবাই ভেতরে গিয়ে খেয়ে নিলাম।

টেবিলের এক মাথায় বসেছেন বুড়ো বাবা, অন্য মাথায় লুসি। মুখের উপর থেকে ঘামে ভেজা চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে লুসি টেবিলের উপর শেষ মুহূর্তের সতর্ক চোখ বুলিয়ে নিলো, লক্ষ্য করলো কিছু বাদ পড়েছে কিনা, একজন সেনাপতি যেভাবে তাঁর সেনাবাহিনী পরিদর্শন করে ঠিক সেই ভাবে। এইখানেই লুসি ছিলো তার আপন ভুবনে। দীর্ঘ কাল সে এখান থেকে অনুপস্থিত ছিলো, কিন্তু অতি সহজে সে নিজেকে আবার ফিরে পেয়েছে।

টেবিলের চারপাশের চোয়ালগুলো তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছিলো। লুসি নিজে বিশেষ কিছু খাচ্ছিলো না, কোনো প্লেট খালি কিনা সেদিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলো, তার মুখ প্রশান্ত মসৃণ হয়ে উঠেছে। একটি জাহাজের প্রধান প্রকৌশলী যখন রাতের বেলা ইঞ্জিন ঘরে গিয়ে দেখেন যে বিশাল হুইলটা প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে, পিস্টনগুলি ওঠা–নামা করছে, ইস্পাতের যন্ত্রাংশগুলি ব্যালে নাচের মতো ছন্দময় ভঙিতে কাজ করে যাচ্ছে, বৈদ্যুতিক আলোর ছটায় সমস্ত জায়গাটা স্বয়ং ঈশ্বরের মাথার ভেতরকার জিনিসপত্রের মতো গুণগুণ করছে, ঝিলিক দিচ্ছে, গান গাইছে,

আর জাহাজটা তারার আলোয় উজ্জ্বল কাঁচের মতো স্বচ্ছ সমুদ্রের বুক চিরে বাইশ নট্ বেগে এগিয়ে চলেছে, তখন তাঁর মুখে যে-ভাব ফুটে ওঠে লুসির মুখেও ঠিক সেইরকম গভীর তৃপ্তি ও সুখের ভাব ফুটে উঠেছিলো।

তো, টেবিলের চারপাশের চোয়ালগুলো তাদের কাজ করে চললো আর লুসি বসে বসে তা দেখলো পরম তৃপ্তির সঙ্গে।

গর্তের মধ্যে যেভাবে ভেজা কংক্রিট ঢেলে দেয়া হয় আমি সেইভাবে চকোলেট আইসক্রীমের শেষ চামচটা কোনোরকমে আমার গলার মধ্যে ঠুসে দিলাম। আর তখনই, কর্তা, সুশৃঙ্খল ও জবরদস্ত খানেওয়ালা, শেষ গ্রাসটি মুখে দিয়ে মাথা তুললেন, ন্যাপকিন দিয়ে মুখের নিচের দিকটা মুছলেন, তারপর বললেন, মনে হচ্ছে জ্যাক, সুগার-বয় আর আমাকে এবার মহাসড়কের উপর কিছু নৈশবায়ু সেবন করতে হবে।

লুসি স্টার্ক দ্রুত চোখ তুলে কর্তাকে একবার দেখে নিয়েই অন্যদিকে তাকালো, তারপর লবণের পাত্রটা হাত দিয়ে সোজা করলো। প্রথমে আপনার মনে হবে যে রাতের খাবার পর কোনো স্বামী যখন বলে যে সে একটুক্ষণের জন্য বাজারের দিকে যাচ্ছে তখন তার স্ত্রী তার দিকে যেভাবে তাকায় এ-ও বুঝি সেই রকম চাউনী। তারপর আপনি বুঝবেন যে, না, এটা ঠিক তা নয়। এর মধ্যে নেই কোনো প্রশ্ন, অথবা প্রতিবাদ, অথবা ভর্ৎসনা, অথবা আদেশ, অথবা আত্ম-করুণা, অথবা প্যানপ্যানানি, অথবা বুঝেছি-আর-তুমি-আমাকে-ভালোবাসো-নার অভিব্যক্তি। এর মধ্যে কিছুই নেই, আর তাই এটি হয়ে দাঁড়ায় খুবই উল্লেখযোগ্য। একটা অসামান্য কৃতিত্বের ব্যাপার। যে কোনো খাঁটি উপলব্ধিই একটা অসামান্য কৃতিত্বের ব্যাপার। বিশ্বাস না হয়, কোনো এক সময় চেষ্টা করে দেখবেন।

বুড়ো স্টার্ক কর্তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি ভেবেছিলাম . . . আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আজকের রাতটা এখানে থাকবে।

ও কি বলতে চাইছে সেটা বুঝতে অসুবিধা ছিলো না। ছেলে ঘরে ফেরে, আর মা-বাবা তাকে গেঁথে ফেলে। বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ছেলেকে তারা কিছুই বলতে চায় না। তারা শুধু চায় যে ছেলে একটা চেয়ার টেনে ঘণ্টা দুই বসে থাকুক, তারপর ওই একই ছাদের নিচে ঘুমুতে যাক। এটা ভালোবাসা নয়। আমি বলছি না যে ভালোবাসা বলে কোনো জিনিস নেই। আমি শুধু বলছি যে ভালোবাসার চাইতে আলাদা একটা জিনিস আছে যেটা ভালোবাসার নামে চলে। এটা হয়তো ঠিক যে আমি যে জিনিসের কথা বলছি সেটা না থাকলে কোনো ভালোবাসাই থাকতো না। কিন্তু এই জিনিসটা স্বয়ন্তরভাবে ভালোবাসা নয়। এটা

এক ধরনের রক্তের লোভ, আর এটাই মানুষের নিয়তি। সুখী পশুকুল থেকে এটাই মানুষকে স্বতন্ত্র করে। আপনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখনই আপনার বাবা ও মা নিজেদের কিছু একটা হারিয়ে ফেলেন এবং সেটা ফিরে পাবার জন্য তারা প্রাণান্ত চেষ্টা করতে থাকেন, আর সেই বস্তুটি হলেন আপনি। তাঁরা জানেন যে আপনার সবটুকু তাঁরা কখনোই ফিরে পাবেন না, কিন্তু যতোটা নিতে পারেন, তাঁরা নেবেনই। পুরনো খানদানী পরিবারগুলো গাছের ছায়ায় যে বনভোজন জাতীয় পুনর্মিলনীর খানাদানা করে থাকে সেটা আর কিছুই নয়, এ্যাকোরিয়ামে গিয়ে অক্টোপাসের জলাধারে ডুব দেয়ার মতো ব্যাপার মাত্র। যাই হোক, সে রাতে অন্ততঃ আমার এরকমই মনে হয়েছিলো।

তো, বুড়ো স্টার্কের কণ্ঠার ডিমের মতো হাড়টি বার দুই ওঠা-নামা করলো, তারপর সে তার ঝাপসা, বিষণ্ণ, নীল, বুড়ো চোখ দুটি কর্তার মুখের উপর ন্যস্ত করলো, তারই নিজের অস্থিমজ্জামাংস, যদিও দেখে সে কথা বোঝার উপায় নেই, এবং তারপর সে তার বঁড়শী ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু কোনো ফল হলো না। উইলির ক্ষেত্রে হলো না।

ঃ না। আমাকে যেতে হবে। বুড়ো আবার শুরু করলো, আমি ভেবেছিলাম — তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, অবশ্য যদি কাজ থাকে —

কর্তা বললেন, না, কোনো কাজ নয়, বরং আনন্দের জন্যই যাওয়া। অন্ততঃ বিষয়টা ফয়সালা হবার আগে সেরকম ক'রে তোলাই আমার উদ্দেশ্য। কর্তা হেসে টেবিল থেকে উঠে পড়লেন, স্ত্রীর বাম গালে সশব্দে একটা চুমু খেলেন, ছেলেদের কাঁধে বাবারা যেরকম করে চাপড় মারে সেই রকম একটা চাপড় মারলেন পুত্রের পিঠে, (এর মধ্যে সর্বদা যেমন একটু ক্ষমা চাওয়ার ভাব থাকে, সবার ক্ষেত্রেই, এমন কি কর্তার ক্ষেত্রেও, তিনি যখন টম স্টার্কের পিঠে চাপড় মারলেন তখন তার মধ্যেও ওই রকম ক্ষমা চাওয়ার ভবটি ছিলো, আর তা খুব অসঙ্গতও ছিলো না, কারণ টম সত্যিই ছিলো একটা উদ্ধত হারামজাদা, এই মুহূর্তে বাবা যখন তার পিঠে চাপড় মারলেন তখন সে মুখ তুলেও তাকালো না)। তারপর কর্তা বললেন, অপেক্ষা করে থেকো না, বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সুগার-বয় আর আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। মহাসড়কের উপর আমাকেও যে নৈশবায়ু সেবন করতে হবে সে-খবর আমি এই এখনই প্রথম পেলাম। কিন্তু কর্তার কাছ থেকে আগাম সতর্কবাণী সচরাচর এই রকমই পাওয়া যেতো। আর আমার সেটা ভালো করেই জানা ছিলো।

আমি ক্যাডিলাকের কাছে গিয়ে পৌছুতে পৌছুতে কর্তা সামনে, চালকের

আসনের পাশে, বসে পড়েছেন। কাজেই আমি পেছনের আসনে বসে মোড় ঘুরবার সময় এক পাশ থেকে অন্য পাশে সজোরে নিক্ষিপ্ত হবার অভিজ্ঞতার জন্য নিজের আত্মাকে প্রস্তুত করে নিলাম। সুগার–বয় চালকের আসনে বসে, গাড়ির স্টার্টার ছুঁয়ে, একটা শব্দ করতে শুরু করলো, কো – কো – কো —— যেন কোনো জলাভূমির পাশে রাত্রিবেলা একটা প্যাঁচা ডেকে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যথেষ্ট সময় পেলে আর থুতু না ছিটোতে শুরু করলে সে জিজ্ঞেস করতো, কোথায় যাবো? কিন্তু কর্তা তার প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করলেন না, বললেন, বার্ডেন্‌স্‌ ল্যান্ডিং।

তাহলে ওখানেই যাচ্ছি আমরা। বার্ডেন্‌স্‌ ল্যান্ডিং–এ। তো আমার সেটা অনুমান করা উচিত ছিলো।

মেসন সিটি থেকে একশো ত্রিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে হল বার্ডেন্স ল্যান্ডিং। একশো ত্রিশকে দুই দিয়ে গুণ করলে হয় দু'শো ষাট। রাত প্রায় ন'টা, আকাশে তারা উঠেছে, নিচু জায়গাগুলিতে কুয়াশা জমে উঠতে শুরু করেছে। আজ রাতে কখন ঘুমোতে যাবো, সকাল বেলা কখন বিছানা ছেড়ে উঠে পেট পুরে প্রাতরাশ খাবো, তারপর রাজধানীর পথে যাত্রা করবো তা শুধু ভগবানই জানেন।

আমি আসনে গা ঢেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। গাড়ির নিচে চারিদিকে কাঁকর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগলো, তারপর এক সময় কাঁকর ছড়ানো বন্ধ হলো, গাড়ির পেছনটা একদিকে হেলে পড়লো, আর তারপরই আমরা পাকা সড়কে উঠে আসল যাত্রা শুরু করলাম।

আমরা সবেগে সড়কের উপর দিয়ে ছুটে যাবো, তারার আলোয় কুয়াশাচ্ছন্ন কালো মাঠ আর ছোট ছোট বনানীর মধ্যবর্তী সড়কের অংশগুলি ঝাপসা দেখাবে। রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে মাঝেমাঝে কুয়াশার মধ্য থেকে একেকটা গোলাঘরকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে, বন্যা প্রতিরোধের জন্য নির্মিত বাঁধ ভেঙে জলস্রোতের মধ্যে একেকটা বাড়ি যেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক সেই রকম মনে হবে ওই গোলাঘরগুলিকে। রাস্তার খুব কাছে, হয়তো কুয়াশার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে, একটা গরু দাঁড়িয়ে থাকবে, শিং দুটি ভেজা ভেজা, তারার আলোয় শিং–এর মধ্যে ফুটে উঠবে মুক্তোর দ্যুতি, চোখ–ধাঁধানো আলোর করিডরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট কালো গোলার মতো আমাদের গাড়ি যখন ছুটে যাবে তখন গরুটা আমাদের দিকে তাকাবে। আমরা অবশ্য ওই আলোর করিডরের মধ্যে কখনোই ঢুকে পড়তে পারবো না, কারণ আমাদের সামনের অন্ধকারকে তা সারাক্ষণই দুভাগে ভাগ করে দিতে থাকবে। গরুটা কুয়াশার মধ্যে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে কালো গোলা আর আলোর দিকে তাকাবে, তারপর মাথা না ঘুরিয়েই এক মুহূর্ত আগে যেখানে কালো

একটা গোলা আর চোখ-ধাঁধানো আলো ছিলো সেদিকে তাকাবে, তার ভঙ্গীর মধ্যে দেখা যাবে ঈশ্বর কিংবা নিয়তির মতো দূরবর্তী, বিশাল, বিদ্বেষহীন ঔদাসীন্য, কিংবা আমার মতো, যদি ওইখানে কুয়াশার মধ্যে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঠ আর ছোট ছোট বনানীর মধ্য দিয়ে তীরের মতো ছুটে যাওয়া কালো অস্পষ্ট একটা গোলা আর চোখ-ধাঁধানো আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

কিন্তু আমি অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম না, আমার হাঁটু জড়িয়ে কুয়াশা ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিলোও না, আমার মাথার ভেতরেও নৈঃশব্দ টিকটিক করে বাজতেও থাকে নি। আমি তো গাড়িতে চড়ে বার্ডেন্‌স্ ল্যান্ডিং-এ ফিরে চলেছি, আমার পরিবারের মানুষদের নামে যে জায়গার নামকরণ হয়েছে, যে জায়গায় আমি জন্মগ্রহণ করেছি, বড়ো হয়ে উঠেছি।

কোনো একটা শহরে পৌঁছুনো পর্যন্ত আমরা প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হয়ে এগিয়ে যাবো। তারপর এক সময় রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে বাড়ির সারি, গাছের ছায়ার নিচে বাড়ির বাতিগুলো নিভতে শুরু করেছে তখন, তারপর আমরা গিয়ে পড়বো শহরের প্রধান সড়কে, যেখানে সিনেমা হলের দরজায় উজ্জ্বল অলো জ্বলবে, বাল্বের গায়ে পোকারা ধাক্কা খাবে, ধাক্কা খেয়ে ফুটপাথের উপর আছড়ে পড়বে, তারপর কোনো পথচারী তাদের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে, তাদের জুতোর তলায় কুড়মুড় শব্দ উঠবে। ক্লাব ঘরের সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলি চোখ তুলে তাকিয়ে বিশাল কালো গাড়িটাকে রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখবে, আর ওদের মধ্যে একজন রাস্তার শানের উপর থুতু ফেলে বলে উঠবে, হারামজাদা, ব্যাটা ভাবছে খুব একটা কেউকেটা হয়েছে! আর লোকটা মনে মনে ভাববে ওই রকম বিশাল শবদেহবহনকারী গাড়ির মতো, মায়ের বুকের মতো, নরম স্প্রিংয় যুক্ত, প্রায় নিঃশব্দে পঁচাত্তর মাইল বেগে ছুটতে সক্ষম ইঞ্জিনবিশিষ্ট বিরাট কালো গাড়িটার ভেতরে যদি সে থাকতো, অন্ধকারের বুক চিরে সে নিজে যদি কোথাও যেতে পারতো। তো আমি ঠিকই কোথাও যাচ্ছিলাম। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম বার্ডেন্‌স্ ল্যান্ডিং-এ।

আমরা উপসাগরের পাশ দিয়ে নতুন ব্যুলভার ধরে বার্ডেন্‌স্ ল্যান্ডিং-এ প্রবেশ করবো। সেখানে বাতাসে থাকবে লবণাক্ত গন্ধ, একটু মেছো-মেছো, বিষণ্ন, জোয়ার-ভাঁটা অঞ্চলের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধমাখানো, কিন্তু নিঃসন্দেহে তাজা। ততক্ষণে প্রায় দুপুররাত হয়ে গেছে, বিপণী এলাকার আলো নিভে গেছে, আর বিপণী এলাকা এবং ছোট বাড়িগুলি ছাড়িয়ে উপসাগরের তীর ধরে দেখা যাবে অন্য ধরনের বাড়ি। ম্যাগনোলিয়া আর ওক্ গাছের ওপারে গাছগাছালির অন্ধকার পার হয়ে ওই

বাড়িগুলির সাদা ঝকঝকে দেয়াল দেখা যাবে, চোখে পড়বে জানালার টানা টানা শার্সী, দিনের বেলায় সাদা দেয়ালের প্রেক্ষাপটে শার্সীগুলি মনে হবে সবুজ রঙের। জানালার ওপারে ঘরের মধ্যে লোকজন ঘুমিয়ে থাকবে, গায়ের উপর একটা চাদর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না তাদের পরনে। ওই রকম জানালার ওপাশে আমি অনেক অনেক রাত কাটিয়েছি, সেই বাচ্চা কাল থেকে, যখন আমি বিছানা ভিজিয়ে ফেলতাম তখন থেকে। আমার জন্ম হয় ওই রকম জানালার ওপাশের একটি ঘরে। আর ওই রকম একটি ঘরে আজ রাতে আমার মা শুয়ে আছেন, পরনে লেসদেয়া রাতের কামিজ, বাচ্চা মেয়ের মতো কোমল মসৃণ মুখ, শুধু চোখ আর মুখের কোণে ছোট ছোট রেখা, তবে ছায়ার মধ্যে তা চোখেই পড়বে না, একটা নিরাভরণ হাত বেরিয়ে আছে চাদরের তলা থেকে, বয়সের চিহ্নওয়ালা, ভঙ্গুর-দেখতে, তীক্ষ্ণ একটি হাত, নখে রঙ। থিওডোর মারেলও সেখানে শুয়ে থাকবে, এডোনয়েডের জন্য নিঃশ্বাসের সময় মৃদু এক ধরনের শব্দ শোনা যাবে, তার মুখে সুন্দর সোনালী-সাদা গোঁফ। তা সবই রীতিমত বৈধ ব্যাপার, মায়ের বিয়ে হয়েছে থিওডোর মারেলের সঙ্গে। আমার সৎ পিতা সে, মায়ের চাইতে বয়সে বেশ ছোট, তার গোল মাথায় চমৎকার হলুদাভ চুলের সম্ভার। তো সে-ই আমার প্রথম সৎ পিতা নয়।

আরো এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে স্ট্যান্টনদের বাড়ি, সতেজ ম্যাগনোলিয়া আর ওক্ বৃক্ষমালার ওধারে বাড়িটা, এখন তালাবন্ধ, জানালার ওপাশে কেউ নেই, এ্যান আর এ্যাডাম এখন শহরে থাকে, বড়ো হয়ে গেছে তারা, আমার সঙ্গে আর মাছ ধরতে যায় না, আর ওদের বাবা তো দেহত্যাগ করেছেন। এই বাড়িগুলির সারি পেরিয়ে, আরো পরে, যেখান থেকে খোলা প্রান্তর শুরু হয়েছে, সেখানে দেখা যাবে বিচারপতি আরউইনের বাড়ি। সেখানে পৌঁছুবার আগে আমাদের গাড়ি থামবে না। বিচারপতির সঙ্গে আমরা একটু সাক্ষাৎ করবো।

আমি বললাম, বস্।

কর্তা মাথা ঘুরালেন, হেডলাইটের উজ্জ্বলতার পশ্চাদপটে তাঁর মাথার পুরুষ্টু কালো আকার আমার চোখে পড়লো।

ঃ ওঁকে কি বলবেন আপনি?

ঃ বাপু হে, সেটা কি আগে থেকে কখনো জানা যায়?

তারপরই নিজেকে সংশোধন করে তিনি বললেন, হয়তো ওকে আমি কিছুই বলব না। ওকে কিছু আমার বলার আছে কিনা আমি জানি না। আমি শুধু ওকে একটু ভালো করে দেখতে চাই।

আমি বললাম, বিচারপতি খুব সহজে ভয় পাবেন না।

তাঁর চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। খাড়া পিঠ, দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়া থেকে নেমে, বাড়ির বেড়ার গায়ে ঘোড়ার লাগাম ঝুলিয়ে দিয়ে, হাতে পানামা হ্যাটটা নিয়ে, কাঁকর ছাওয়া পথ পেরিয়ে বারান্দায় উঠে যাচ্ছেন, রুক্ষ লালচে চুল উঁচু মাথার উপর কেশরের মতো ফেঁপে আছে, ঈষৎ বাঁকানো লালচে নাক মুখ থেকে আগ্রাসী ভঙ্গীতে বের হয়ে এসেছে, উজ্জ্বল কঠিন–দেখতে চোখের হলুদ মণি দুটি পোখরাজের মতো জ্বলছে। না, আমার মনে হলো না যে তিনি সহজে ভয় পাবেন। অবশ্য এটা আমি প্রায় বিশ বছর আগের কথা বলছি। পিঠ হয়তো এখন আর ওই রকম খাড়া নেই (এসব ব্যাপার এতো ধীরগতিতে ঘটে যে নিজেরই নজরে পড়ে না), হলুদ চোখ দুটি হয়তো সম্প্রতি একটু জলো হয়ে এসেছে, তবু আমার মনে হলো না যে বিচারপতি সহজে ভয় পাবেন। ওই একটা ব্যাপারে আমি বাজী ধরতে পারতাম ঃ জজ সাহেব ভয় পাবেন না। যদি পান তাহলে আমি হতাশ হবো।

কর্তা বললেন, না, আমি ওকে সহজে ভয় খাওয়াতে পারবো বলে মনে করি না। আমি শুধু ওকে দেখতে চাই।

আমি সোজা হয়ে বসলাম এবং টের পাবার আগেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, যদি ভেবে থাকেন যে ওঁকে সহজে ভয় দেখাতে পারবেন তাহলে আপনি পাগল ছাড়া আর কিছু নন।

আহ, অত অস্থির হচ্ছ কেন? বলেই কর্তা হাসলেন। আমি ওঁর মুখ দেখতে পেলাম না। হেডলাইটের প্রখর উজ্জ্বলতার পশ্চাদপটে শুধু একটা আবছা কালো বৃত্তের মতো জিনিস দেখলাম। সেখান থেকে হাসির শব্দ বেরিয়ে আসছে।

কর্তা আবার বললেন, তোমাকে যেমন বলেছি তাই। আমি ওকে দেখতে চাই।

তাঁকে দেখার জন্য চমৎকার সময় বেছে নিয়েছেন আর খুব অল্প দূরত্বই পাড়ি দিচ্ছেন! আমার মধ্যে এখন বিরক্তি ছাড়া আর কোনো বোধ কাজ করছিলো না। আমি আবার আমার আসনে গা এলিয়ে দিলাম। ওটাই আমার যথার্থ স্থান। তারপর বললাম, তো ওঁকে কোনো এক সময় রাজধানীতে ডেকে পাঠাচ্ছেন না কেন?

ঃ কোনো এক সময় তো এখন নয়।

ঃ কিন্তু আপনি নিজে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে একটা কাণ্ড ঘটাচ্ছেন বটে!

কর্তা বললেন, তোমার ধারণা এতে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে, এ্যাঁ?

ঃ আপনি তো গভর্নর। তাই তো বলে লোকে।

ঃ হ্যাঁ, জ্যাক, আমি গভর্নর। আর গভর্নরদের নিয়ে মুশকিল কোথায় জানো? ওরা ভাবে যে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে। কিন্তু একটা কথা শোনো, মানুষের করার যোগ্য, মানুষের করণীয়, এমন একটা কাজও নেই যা মানুষ তার

মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে করতে পারে। তুমি কি একটা, একটা জিনিসের কথা, ভাবতে পারো যেটা করতে চাও আর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সেটা করতে পারো? মানুষকে ওই ভাবে গড়াই হয় নি।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

আর আমি যখন প্রেসিডেন্ট হবো, তখন যদি আমার কারো সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয় তাহলে আমি সোজা তার কাছে চলে যাবো, গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবো।

অবশ্যই, আমি বললাম। অবশ্যই যাবেন, রাত দুপুরেই যাবেন, শুধু আশা করি আমাকে বাড়িতে রেখে যাবেন যেন আমি ঘুমুতে পারি।

কক্ষনো না। আমি যখন প্রেসিডেন্ট হবো তখন তোমাকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাবো। তোমাকে আর সুগার-বয়কে হোয়াইট হাউসে রাখবো, যেন সব সময় হাতের কাছে পেতে পারি। সুগার–বয় পেছনের হলঘরে তার পিস্তল রেঞ্জ বানাতে পারবে, তার ক্যাডি হিসাবে কাজ করার জন্য দু'জন কংগ্রেসম্যান দেয়া হবে তাকে, ওরা তার টিনের কৌটোটৌটো সাজিয়ে দেবে, আর তুমি একেবারে সামনের বড়ো দরজা দিয়ে তোমার মেয়ে–বন্ধুদের নিয়ে আসতে পারবে, মন্ত্রীসভার একজন সদস্য তাদের কোট ধরবে, চুলের কাঁটা পড়ে গেলে তুলে দেবে। এ কাজের জন্য মন্ত্রীসভার একজন বিশেষ সদস্য নিয়োজিত থাকবে। তার পদবী হবে জ্যাক বার্ডেনের বেডচেম্বারের সেক্রেটারি। তার কাজ হবে টেলিফোন নম্বরগুলি সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখা, আর ওই মেয়েরা গোলাপী সিল্কের এটা–ওটা রাতে ফেলে রেখে গেলে সেসব সঠিক ঠিকানায় পোঁছে দেওয়া। টাইনির দেহের গড়নটা ঠিক আছে, অতএব ওর একটা ছোট্ট অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করবো আমি, তারপর ওকে সিল্কের প্যান্ট পরিয়ে মাথায় পাগড়ী চড়িয়ে হাতে টিনের তলোয়ার দিয়ে তোমার শোবার ঘরের বাইরে একটা টুলে বসিয়ে রাখবো। ওই হবে তোমার বেডচেম্বারের সেক্রেটারি। এ্যাঁ? কেমন হবে বলো তো?

কর্তা সামনের আসন থেকে ঘুরে হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুতে চাপড় মারলেন। তাঁকে বেশ খানিকটা দূরে হাত প্রসারিত করতে হয়েছিলো, ক্যাডিলাকের সামনের আসন থেকে আমার হাঁটু বেশ খানিকটা দূরে, আমি গা এলিয়ে বসে না থাকলেও দূরত্বটা অনেকখানি হতো। আমি বললাম, ইতিহাসে আপনি অমর হয়ে থাকবেন।

কি বলো, থাকবো না?

কর্তা হাসতে শুরু করলেন, আবার আলোকিত রাস্তার দিকে চোখ ফেরালেন, আর হাসতেই থাকলেন।

আমরা একটা ছোট শহরে পড়লাম। পেট্রলের দোকান থেকে সুগার-বয় কিছু তেল নিলো, খাবারের দোকান থেকে কর্তা আর আমার জন্য দুটো কোক নিয়ে এলো, তারপর আমরা এগিয়ে চললাম।

বার্ডেন্স্ ল্যান্ডিং-এ পৌঁছুনোর আগে কর্তা আর একটা কথাও বললেন না। পৌঁছুবার পর শুধু বললেন, জ্যাক, ওই বাড়িতে কেমন করে যেতে হবে সুগার-বয়কে দেখিয়ে দিও। এখানে তো তোমার বন্ধুদের বাস।

হ্যাঁ, এখানে আমার বন্ধুদেরই বাস। কিংবা বলা যেতে পারে, এক সময় ছিলো। এ্যাডাম আর এ্যান স্ট্যান্টন এখানেই থাকতো, ওই সাদা বাড়িতে। ওখানেই বাস করতেন তাদের বিপত্নীক পিতা। গভর্ণর স্ট্যান্টন। আমার বন্ধু ছিলো ওরা। এ্যান আর এ্যাডাম। এ্যাডাম আর আমি মেক্সিকো উপসাগরের ওই এলাকা নৌকায় চষে বেড়িয়েছি, মাছ ধরেছি ওখানে। এ্যান থাকতো আমাদের সঙ্গে, বড়ো বড়ো চোখ, প্রশান্ত মুখ, রোগা শরীর, চুপচাপ বসে থাকতো, একটা কথাও বলতো না। এ্যাডাম আর আমি কতো শিকার করেছি, গোটা অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করেছি, আমাদের চাইতে বছর চারেকের ছোট সরু সরু পায়ের মেয়েটি, এ্যান, আমাদের সাথে সাথে ঘুরতো। স্ট্যান্টনদের সময় অথবা আমাদের বাড়িতে, আগুনের পাশে বসে, আমরা খেলনা নিয়ে খেলতাম কিংবা বই পড়তাম, আর এ্যান আমাদের কাছে বসে থাকতো। তারপর অনেক দিন পরে এ্যান আর ছোট্ট মেয়েটি রইলো না। সে বড়ো হয়ে উঠলো আর আমি গভীরভাবে তার প্রেমে পড়লাম। তখন আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে বেঁচে আছি। ওই স্বপ্নের মধ্যে আমার হৃদয় যেন ফেটে চুরমার হয়ে যাবে, মনে হলো গোটা দুনিয়াটা আছে তার মধ্যে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সেটা ফুলে ফুলে উঠছে, বেরিয়ে এসে গোটা দুনিয়াই হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু সে বছরের গ্রীষ্মকাল শেষ হলো। সময় বয়ে গেলো। আমরা এক সময় যা ঘটবে বলে এতো নিশ্চিত ছিলাম তা ঘটলো না। আর তাই এ্যান এখন শহরে বাস করছে, বয়স হয়ে যাওয়া অনূঢ়া এক মহিলা, এবং যদিও এখনো তাকে বেশ সুন্দরী দেখায়, কাপড়জামায় তাকে চমৎকার মানায়, তবু তার হাসি একটু ঠুনকো হয়ে উঠেছে, মুখে কেমন একটা টান টান ভাব, যেন কিছু একটা মনে করতে চেষ্টা করছে। কি মনে করতে চেষ্টা করছে এ্যান? তো, আমার তা ভাবার দরকার নেই। আমি বেশ ভালো স্মরণ করতে পারি, কিন্তু আমি এখন এটি নিয়ে ভাবতে চাই না। মানুষ যদি কোনো কিছু মনে রাখতে না পারতো তাহলে নিখুঁত ভাবে সুখী হয়ে উঠতো। আমি এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়েছিলাম, এবং আমার ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে যদি আমি একটি মাত্র জিনিস শিখে থাকি তাহলে সেটা হলো এই সত্যটি।

আমরা উপসাগরের দিকে মুখ ফেরানো সারি সারি বাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাবো। এই সেই জায়গা যেখানে একসময় আমার সাথীরা বাস করতো। এ্যান, যে এখন অনূঢ়া, বয়স হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে, পুরোপুরি না হলেও প্রায় তাই। এ্যাডাম, যে এখন প্রখ্যাত শৈল্য চিকিৎসক, সে একবার খুব ভালো ব্যবহার করেছিলো আমার সঙ্গে, কিন্তু আর আমার সঙ্গে সে মাছ ধরতে যায় না। আর বিচারপতি আরউইন, একেবারে শেষের বাড়িটি যার, আমাদের পরিবারের বিশিষ্ট বন্ধু, যিনি শিকারে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, যিনি আমাকে বন্দুক চালাতে শিখিয়েছেন, ঘোড়ায় চড়তে শিখিয়েছেন, নিজের বাড়ির মস্ত বড়ো পড়ার ঘরে মোটা মোটা চামড়া বাঁধানো বই থেকে ইতিহাসের কাহিনী পড়ে শুনিয়েছেন। এলিস বার্ডেন চলে যাবার পর আমার মা আর যাদের বিয়ে করেন, যারা এলিস বার্ডেনের বাড়িতে এসে বাস করতে থাকে, তাদের সবার তুলনায় বিচারপতি আরউইনই আমার কাছে হয়ে উঠেছিলেন অনেক বেশি বাবার মতো। বিচারপতি ছিলেন সত্যিকার একজন মানুষ।

অতএব শহরের মধ্য দিয়ে যে রাস্তায় আমার সাথীরা থাকে কিংবা একদা থাকতো সুগার–বয়কে আমি সেখানে যাবার পথ বাৎলে দিলাম। আমরা শহরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলাম, টেলিগ্রাফের খুঁটির মাথা ছাড়া আর কোথাও এখন আলো জ্বলছে না। আমরা যে রোড ধরে, যেখানে ম্যাগনোলিয়া আর সবুজ ওক্ গাছের পেছনে সাদা হাড়ের মতো বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে এগিয়ে চললাম।

রাতের বেলা আপনি একটা ছোট শহরের ভেতর দিয়ে চলেছেন, এক সময় যে শহরে আপনি বাস করতেন, আপনার মনে হবে আপনি বোধহয় নিজেকে দেখতে পাবেন, খাটো প্যান্ট পরে রাস্তার মোড়ে আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে, আর আলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে বাতির কাছে ঘুর ঘুর করা পোকাগুলি চৈতন্য হারিয়ে ফুটপাথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে। আপনি আশা করছেন যে ওই ছেলেটিকে আপনি রাস্তার বাতির নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন, বেশ রাত হয়ে গেছে, আপনার ইচ্ছা হবে তাকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে শুয়ে পড়ার কথা বলতে, নইলে বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটবে। কিংবা আপনি হয়তো বাড়িতেই শুয়ে আছেন, গভীর ঘুমে অচৈতন্য, স্বপ্ন পর্যন্ত দেখছেন না, আর যতো কিছু ঘটনা ঘটে গেছে বলে মনে হচ্ছে তার কিছুই সত্যি সত্যি ঘটে নি। কিন্তু তাহলে ভূতের মতো শহরের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই বিশাল কালো ক্যাডিলাকের পেছনের আসনে যে লোকটি বসে আছে সে ব্যাটাচ্ছেলে কে? কেন? সে–ই তো জ্যাক বার্ডেন। ছোট্ট জ্যাক বার্ডেনকে আপনার মনে পড়ে না? বিকালের দিকে নৌকো নিয়ে উপসাগরে

মাছ ধরতে যেতো, বাড়ি ফিরে রাতের খাবার খেয়ে সুন্দরী মাকে চুমু খেয়ে শুভরাত্রি জানাতো, প্রার্থনা করতো, তারপর সাড়ে ন'টায় শুয়ে পড়তো। ওহ, আপনি এলিস বার্ডেনের ছেলের কথা বলছেন? হ্যাঁ, ওই যে ঐ এলিস, যে টেক্সাস না আরকানস'-র মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিলো, বড়ো বড়ো চোখ, রোগা মুখ, যে এখন তার নতুন স্বামীকে নিয়ে বার্ডেনদের পুরানো বাড়িটায় থাকে। এলিস বার্ডেনের কি হলো? কি জানি? আমি জানি না। বহু বছর ধরে এদিককার কেউই তার কোন খবর জানে না। লোকটা ভারী অদ্ভুত ছিলো। নইলে ওই রকম রূপসী মেয়েকে কেউ এভাবে ফেলে রেখে চলে যায়? হয়তো ওই মেয়ে যা চেয়েছিলো সে তাকে সেটা দিতে পারে নি। কিন্তু একটা ছেলে তো দিয়েছিলো। ওই জ্যাক বার্ডেনকে। হ্যাঁ!

রাতের বেলায় আপনি শহরে ঢোকেন, আর এই সব কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

আমরা রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছুলাম, আর ওক গাছের শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম হাড়ের মতো শ্বেতশুভ্র বাড়িটি।

বললাম, এই যে।

কর্তা বললেন, এখানে, বাইরেই রাখো। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আলো জ্বলছে। ব্যাটা এখনো শুয়ে পড়ে নি। তুমি যাও, গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলো যে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

যদি না খোলেন?

খুলবে। না খুললে তুমি ওকে দিয়ে খোলাবে। তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখি কিসের জন্যে?

আমি গাড়ি থেকে নেমে, গেট দিয়ে ঢুকে, কালো গাছগাছালির তলা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। পেছনে কর্তার পায়ের শব্দ পেলাম। আমরা উভয়েই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম, আমার ঠিক পেছনেই কর্তা।

তিনি একপাশে সরে দাঁড়ালেন আর আমি পর্দা সরিয়ে দরজায় ঘা দিলাম একবার। তারপর আরেকবার। দরজার পাশের কাঁচ দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে আমি হলঘরের একটা দরজা খুলে যেতে দেখলাম। আমার মনে পড়লো, ওখানেই লাইব্রেরি ছিলো। তারপর হলঘরের আলো জ্বলে উঠলো। উনি দরজার দিকে এগিয়ে এলেন। কাঁচের মধ্য দিয়ে আমি দেখলাম উনি তালা খুলতে চেষ্টা করছেন।

কে?

শুভ সন্ধ্যা, জাজ্।

তিনি অন্ধকারের দিকে চোখ মিটমিট করে তাকালেন, আমার মুখ দেখতে চেষ্টা করলেন।

আমি বললাম, আমি জ্যাক বার্ডেন।

আরে, জ্যাক! কী কাণ্ড! ভাবতেই পারি নি আমি।

তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন, এসো।

এমনকি আমাকে দেখে খুশী পর্যন্ত হয়েছেন বলে মনে হলো।

আমি করমর্দন করে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। সেখানে পাশের অনুজ্জ্বল আলোয় ঈষৎ জীর্ণ হয়ে যাওয়া সোনালী ফ্রেমে মোড়া দেয়ালে ঝোলানো আয়নাগুলি ঝলমল করছিলো।

উনি হলুদ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, জ্যাক, তোমার জন্য কি করতে পারি? অন্য কিছু বদল হলেও তাঁর চোখ দুটির বিশেষ পরিবর্তন হয় নি।

ইয়ে — আমি শুরু করলাম। কিভাবে শেষ করবো জানি না। ইয়ে — ভাবলাম, আপনি জেগে আছেন কিনা দেখি। একটু কথা বলতাম তাহলে —

নিশ্চয়ই, জ্যাক, এসো, ভেতরে এসো। আশা করি কোনো বিপদে পড়ো নি? দাঁড়াও, আগে দরজাটা বন্ধ করি। তারপর —

তিনি দরজা বন্ধ করতে গেলেন। সত্তুর বছর বয়স হলেও তাঁর হৃদযন্ত্রটি নিশ্চয়ই বেশ ভালো অবস্থায় ছিলো, নইলে তখনই তিনি হার্টফেল্ করে মারা পড়তেন। কারণ দরজার ঠিক ওপাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্তা। এতক্ষণ একটি শব্দও করেন নি।

কিন্তু জাজ্ মারা পড়েন নি। তাঁর মুখের চেহারারও কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। কিন্তু আমি টের পেলাম যে তাঁর শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে। কোনো এক রাতে আপনি দরজা বন্ধ করেতে গিয়ে যদি কাউকে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতেন তাহলে আপনিও চমকে উঠতেন।

কর্তা সহজ ভঙ্গিতে হাসিমুখে টুপিটা মাথা থেকে খুলে ঘরে ঢুকলেন, এমনভাবে যেন তাঁকে আমত্রণ জানানো হয়েছে, যদিও তাঁকে জানানো হয় নি, তারপর বললেন, না, জ্যাক কোনো বিপদে পড়ে নি। অন্ততঃ আমার জানা মতে। আর আমিও কোনো বিপদে পড়ি নি।

বিচারপতি এবার আমাকে দেখছিলেন। কঠিন শীতল কর্কশ গলায় যেন একটা পুরানো গ্রামোফানে একটা পুরানো রেকর্ড বাজছে, তিনি আমাকে লক্ষ্য করে সেই ভাবে বললেন, মাফ কোরো। তোমার যাবতীয় প্রয়োজন যে খুব ভালোভাবে মেটাবার ব্যবস্থা আছে আমি মুহূর্তের জন্য সেকথা ভুলে গিয়েছিলাম।

কর্তা বললেন, তা জ্যাকের চলে যাচ্ছে।

এবং আপনি, স্যার — বিচারপতি কর্তার দিকে ফিরে তাঁর হলুদ চোখ দুটি

ঈষৎ নিচু করে, কারণ কর্তার চাইতে একমাথা লম্বা ছিলেন তিনি, আমি দেখলাম তাঁর চোয়ালের মাংসপেশী কাঁপছে, লালচে রেখাঙ্কিত দীর্ঘ চিবুকের নিচে মাংসপেশী দানা বেঁধে উঠছে — বিচারপতি বললেন, স্যার, আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান?

কর্তা জবাব দিলেন, নাহ্, কিছু বলতে চাই বলে তো মনে হয় না। অন্ততঃ এক্ষুণি না।

বিচারপতি বললেন, বেশ — সেক্ষেত্রে —

কর্তা বাধা দিলেন, কিন্তু বলার মতো কিছু একটা গড়ে উঠবে না এমন কথা তো কেউ বলতে পারে না। তবে, তার আগে, একটু বসতে পারলে ভালো হতো না?

সেক্ষেত্রে — বিচারপতি আবার শুরু করলেন, পুরানো রেকর্ডে সেই পুরানো পিন, মানবিক কণ্ঠ নয়, ঠাণ্ডা টিনের উপর যেন র‍্যাদা চালাচ্ছে কেউ — সেক্ষেত্রে, আমি বলছিলাম যে, আমি ঘুমুতে যাচ্ছিলাম।

কর্তা বললেন, ওহ্, এখন তো সবে সন্ধ্যা রাত। কথাটা বলে তিনি ধীরে সুস্থে আরউইনকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। বিচারপতির পরনে পুরানোকালীন একটা ভেলভেটের জ্যাকেট, ট্যাক্সেডো প্যান্ট, কড়া ইস্ত্রীর শার্ট, কলার আর টাই খুলে ফেলেছেন, ঠিক কণ্ঠার নিচে কলারের সোনালী বোতাম ঝিকমিক করছে।

পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত করে কর্তা বললেন, তো শোবার আগে যদি আরেকটু অপেক্ষা করেন, আপনার চমৎকার নৈশভোজ হজম করার জন্য যদি একটু সময় দেন, তাহলে রাতের ঘুমটা ভালো হবে।

বলেই তিনি হলঘরের মধ্য দিয়ে যেখানে আলো জ্বলছিলো সেই লাইব্রেরির দরজার দিকে সোজা হাঁটতে শুরু করলেন।

বিচারপতি আরউইন কর্তার পিঠের দিকে তাকালেন, তাঁর পামবীচ কোট কাঁধের কাছে কুঁচকে গেছে, গরমের দরুন বগলের তলায় ঘামের দাগ পড়েছে। বিচারপতির হলুদ চোখ যেন তাঁর মুখ থেকে ফেটে বেরিয়ে আসবে, রক্ত জমে উঠে তাঁর মুখের চেহারা হলো কশাইর দোকানে বাছুরের যকৃতের রঙের মতো। তিনিও হলঘরের মধ্য দিয়ে কর্তাকে অনুসরণ করলেন।

আর আমি অনুসরণ করলাম ওদের উভয়কে।

আমি ঘরে ঢুকে দেখি কর্তা এর মধ্যে পুরু গদীমোড়া চামড়ার বড় আরাম কেদারায় বসে পড়েছেন। আমি দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে ছাদ অবধি বই-এর তাক উঠে গেছে, তাকগুলি চামড়া বাঁধাই বই-এ পূর্ণ, অধিকাংশই আইনের, উপর দিকে ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেছে, ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে বাসি

পনীরের গন্ধের মতো একটা গুমোট গন্ধ। এই ঘর একটুও বদলায় নি। ওই গন্ধ এখনো আমার নাকে লেগে রয়েছে। কতো অপরাহ্ন আমি এখানে কাটিয়েছি, একা একা বই পড়েছি, কিংবা বিচারপতি আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন, চুল্লীর আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দ হয়েছে, আর এক কোণায় পুরানো আমলের বিরাট ঘড়িটা টিক টিক করে বেজে চলেছে। দেয়ালে পিরানেসির বড়ো বড়ো ইস্পাতের খোদাই করা কাজ, ভারী ফ্রেমে বাঁধানো, টাইবার নদী, কলোসিয়াম, কয়েকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির। আর একটা তাক ও দেরাজের উপর কয়েকটা ঘোড়ার চাবুক, এবং কয়েকটা রুপার কাপ। কাপগুলি বিচারপতি পুরস্কার পেয়েছেন বন্দুক ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায়, আর তাঁর কুকুররা কুকুরের দৌড় প্রতিযোগিতায়। দরজার অন্য পাশে ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকের র‍্যাক, টেবিলের উপরকার বড়ো পিতলের রিডিং ল্যাম্পের আলো তার উপর পড়ে নি, কিন্তু ওখানকার প্রতিটি বন্দুক আমার চেনা, এখনো ওদের স্পর্শ আমার হাতে লেগে রয়েছে।

বিচারপতি বসলেন না। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি কর্তার দিকে তাকালেন। বসেছেন লাল কার্পেটের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে। বিচারপতি কোনো কথা বললেন না। তাঁর লম্বাটে মাথার পাশে যদি একটা ছোট্ট কাঁচের জানালা থাকতো, যে মাথার ঘন, লাল, কেশরের মতো চুল এখন পাৎলা ও ঈষৎ বিবর্ণ হয়ে এসেছে, তাহলে আপনি ওই মাথার ভেতরে দেখতে পেতেন, আপনি জানেন সে-কথা, চাকা, স্প্রিং, কব্জা, নাট-বল্টু, স্ক্রু ইত্যাদি চমৎকারভাবে কাজ করে চলেছে, সযত্নে দেখাশোনা করা সুন্দর কতকগুলি যন্ত্রপাতির মতো সেগুলি ঝকঝক করছে। কিন্তু কেউ হয়তো ভুল বোতামটা টিপে দিয়েছে। হয়তো একটা কিছু ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত, অথবা স্প্রিং ঘুরতে ঘুরতে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত, ওটা চলতেই থাকবে, আর কিছুই হয়তো ঘটবে না।

কিন্তু কর্তা কথা বলে উঠলেন। টেবিলের উপরে রাখা রুপার ট্রেতে একটা বোতল, এক জগ জল, একটা রুপার গামলা, দুটি ব্যবহৃত ও তিন-চারটি অব্যবহৃত গ্লাসের দিকে মাথা হেলিয়ে কর্তা বললেন, তো বিচারপতি, জ্যাক যদি ওখান থেকে আমাকে এক গ্লাস পানীয় ঢেলে দেয় তাহলে, আমার বিশ্বাস, আপনি কিছু মনে করবেন না, কি বলেন? দক্ষিণ অঞ্চলের আতিথেয়তা, এ্যাঁ?

বিচারপতি আরউইন তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, জ্যাক, তোমার ডিউটির মধ্যে যে খিদমৎগারের কাজটাও পড়ে সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি, অবশ্য আমার যদি ভুল হয়ে থাকে —

ওই মুহূর্তে আমি ওঁর মুখে কষে একটা চড় বসাতে পারতাম। ওঁর সুশ্রী, ঈগল

নাকওয়ালা, শক্ত হাড়ের, লাল চামড়ার বৃদ্ধ মুখে, যে মুখে চোখ দুটি মোটেই বৃদ্ধ নয়, বরং কঠিনওউজ্জ্বল, তবে গভীরতাহীন, যে দিকে তাকানোই মনে হয় একটা অপমান, সেই মুখে আমি তখন বেদম এক চড় কষাতে পারতাম। কিন্তু কর্তা হেসে উঠলেন। তাঁর মুখেও আমি চড় মারতে পারতাম। আমি ওদের দুজনকে পনীরের গন্ধমাখা ওই ঘরে একা ফেলে রেখে, অনন্ত কালের জন্য, বেরিয়ে যেতে পারতাম, সব ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমি তার কিছুই করলাম না। হয় তো ভালোই হয়েছে, কারণ আপনি সব চাইতে বেশি করে যেসব জিনিস ছেড়ে ছুঁড়ে চলে আসতে চান সেসব জিনিসের কাছ থেকেই সত্যি সত্যি চলে আসা যায় না।

আঃ, বাজে বকবেন না।

কর্তা কথা ক'টি বলে হাসি বন্ধ করলেন, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বোতল থেকে একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে তাতে জল মেশালেন, তারপর হাসিমুখে বিচারপতির দিকে তাকিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার দিকে গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, এই যে, জ্যাক, ধরো। খাও।

গ্লাসটা যে নিলাম সে কথা বলতে পারব না, বরং ওটা আমার হাতে গুঁজে দেয়া হলো, আর আমি ওটা হাতে ধরে, মুখে না দিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকলাম, আর বিচারপতি আরউইনকে লক্ষ্য করে কর্তাকে বলতে শুনলাম, মাঝে মাঝে জ্যাক আমাকে পানীয় ঢেলে দেয়, মাঝে মাঝে আমি ওকে ঢেলে দিই, আর — কর্তা আবার টেবিলের কাছে ফিরে গেলেন — মাঝে মাঝে আমি নিজেই নিজের পানীয় ঢেলে নিই।

তিনি গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন, জল মেশালেন, তারপর বিচাপতির দিকে তাকিয়ে এক ধরনের কমিক ধূর্ততার হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হোক বা নাই হোক। এর পর যোগ করলেন, যদি আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তাহলে, বুঝলেন বিচারপতি, অনেক জিনিস কখনো পাওয়াই যেতো না। আর আমি একজন ধৈর্যহীন মানুষ, খুবই ধৈর্যহীন, বিচারপতি। আর তাই, বিচারপতি, আমি ভদ্দরলোক নই।

আরউইন বললেন, সত্যি? ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি সমস্ত দৃশ্যটা খুঁটিয়ে দেখলেন।

আর দেয়ালের পাশে আমার অবস্থান থেকে আমি দেখতে লাগলাম ওদের দুজনকে। মনে মনে বললাম, জাহান্নামে যাক ওরা, জাহান্নামে যাক ওরা দুজনই। ওরা ওইভাবে কথা বলতে শুরু করলে ওদের দুজনকেই আমার জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

হ্যাঁ, কর্তা বলে চললেন, আপনি একজন ভদ্রলোক, আর তাই আপনি কখনো

অধৈর্য হন না। আপনার পানীয়ের জন্যও না। এই যে, এই মুহূর্তে আপনি আপনার পানীয়ের জন্য অধৈর্য হচ্ছেন না, অথচ এই সুরা আপনার পয়সায় কেনা। কিন্তু আপনি আপনার পানীয় পাবেন, বিচারপতি। আসুন, নিন এক গ্লাস। আমার সঙ্গে এক পাত্র পান করুন, বিচারপতি।

বিচারপতি আরউইন উত্তরে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। ঘরের মাঝখানে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কর্তা সহাস্যে বললেন, আসুন, খান একটু। তারপর আবার তিনি বড়ো চেয়ারটায় বসে লাল কার্পেটের উপর তাঁর পা দুটি ছড়িয়ে দিলেন।

বিচারপতি নিজের জন্য সুরা ঢেলে নিলেন না। তিনি বসলেনও না।

কর্তা তাঁর চেয়ারে বসে ওঁর দিকে চোখ তুলে বললেন, আপনার কাছে কি গতকালের বিকালের কাগজখানা হবে? এখানে আছে কোথাও?

আগুনের চুল্লীর পাশে অন্য একটা চেয়ারের উপর কাগজটা পড়ে ছিলো। বিচারপতির কলার আর টাই পড়ে ছিলো তার উপর, আর চেয়ারের পেছনে ঝোলানো ছিলো তাঁর সাদা জ্যাকেটটা। আমি দেখলাম বিচারপতির দৃষ্টি একবার বিদ্যুৎগতিতে সেদিকে ধাবিত হলো, তারপর তা ফিরে এলো কর্তার মুখের উপর।

বিচারপতি বললেন, হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি, আছে।

আজ সারাদিন গ্রামাঞ্চলের দিকে ছোটাছুটি করতে গিয়ে কাগজ দেখার সময়ই পাই নি। আপনার কাগজটা একটু দেখলে কিছু মনে করবেন না তো?

বিচারপতি আরউইন জানালেন, বিন্দুমাত্র না। ঠাণ্ডা টিনের উপর র‍্যাদা ঘষার সেই পুরানো আওয়াজটা হলো। — কিন্তু একটা বিষয়ে আমি সহজেই আপনার কৌতূহল নিবারণ করতে পারি। কাগজে সিনেট নমিনেশনের জন্য ক্যালাহানের প্রতি আমার সমর্থনের খবরটা বেরিয়েছে। অবশ্য সেটাই যদি আপনার কৌতূহলের বিষয় হয়ে থাকে।

আমি কথাটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম, বিচারপতি, আমাকে একজন বলেছিলো, কিন্তু আপনি তো জানেন, গুজবের সহস্র মুখ, আর খবরের কাগজের লোকেরা খুব বাড়িয়ে বলে, সেখানে সত্য থাকে না।

না, এক্ষেত্রে কিছুই বাড়িয়ে বলা হয় নি।

আপনার মুখ থেকে শুধু আমি শুনতে চেয়েছিলাম। আপনার নিজের রূপালী মুখ থেকে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে সোজা দাঁড়িয়ে বিচারপতি বললেন, এখন তো শুনলেন। তাহলে, তাড়াহুড়ো না করে, — আবার রক্ত জমে উঠে ওঁর মুখ বাছুরের যকৃতের

রঙ ধারণ করলো — আপনি আপনার পানীয় শেষ করলে —

তাই তো, ধন্যবাদ, বিচারপতি।

কর্তার কণ্ঠস্বরে যেন মধু ঝরে পড়লো। তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি আরেক গ্লাস নেবো। চেয়ার থেকে উঠে তিনি বোতলের দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর ঢালাঢালির কাজটা শেষ করে বললেন, ধন্যবাদ।

গ্লাসের নতুন পানীয় নিয়ে চামড়ার চেয়ারটায় ফিরে এসে কর্তা বললেন, হ্যাঁ, বিচারপতি, আপনাকে আমি কথাটা বলতে শুনেছি, কিন্তু আমি আপনাকে আরেকটা কথা বলতে শুনতে চাই। আপনি কি সুনিশ্চিত যে আপনি প্রার্থনার সময় এই ব্যাপারটা ঈশ্বরকে জানিয়েছেন? বলুন?

বিচারপতি বললেন, আমি নিজের সঙ্গে তার বোঝাপড়া করে নিয়েছি।

কর্তা হাতের গ্লাসটা ঘোরাতে ঘোরাতে যেন কি একটা রোমন্থন করছেন এমনভাবে বললেন, তো আমার যদি ঠিক মনে পড়ে, রাজধানীতে এ বিষয়ে যখন আমাদের আলাপ হয় তখন আমার লোক মাস্টার্সকে আপনি বেশ উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন।

বিচারপতি তীব্র কণ্ঠে বললেন, আমি কোনো কমিটমেন্ট করি নি। আমার বিবেকের কাছে ছাড়া আমি অন্য কারো কাছে কোনো কমিটমেন্ট করি নি।

অত্যন্ত সহজ গলায় কর্তা বললেন, বিচারপতি, দীর্ঘ দিন ধরে আপনি রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন — তিনি হাতের গ্লাস থেকে এক চুমুক পান করলেন — আর আপনার বিবেকও সে কাজ করেছে।

তীক্ষ্ণ গলায় বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, কি বললেন?

আহ্, যেতে দিন!

কর্তা হেসে উঠে বললেন, কিন্তু মাস্টার্সের উপর আপনি হঠাৎ বিরূপ হলেন কি জন্যে?

ওর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য আমার নজরে এসেছে।

মানে, আপনার জন্য কেউ একজন কিছু নোংরা ব্যাপার সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে, এই তো?

যদি সেভাবে বলতে চান তো বলতে পারেন।

কর্তা বললেন, নোংরা একটা ভারী মজার জিনিস। ভেবে দেখুন তো, ঈশ্বরের এই সবুজ ধরণীতে, জলের তলা বাদ দিলে, নোংরা ছাড়া একটা জিনিসও নেই। নোংরা আছে বলেই ঘাস গজায়। অসম্ভব উত্তপ্ত হয়ে ওঠা এক টুকরা নোংরা ছাড়া হীরা আর কি জিনিস? এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একমুঠো নোংরা তুলে নিয়ে তাতে ফুঁ

দিয়ে আপনাকে আর আমাকে আর জর্জ ওয়াশিংটনকে আর জ্ঞানগম্যি ও উপলব্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন মানবজাতিকে তৈরি করেছেন। নোংরাটা নিয়ে আপনি কি করেন তার উপরই সব নির্ভর করে। কি, ঠিক বলেছি?

অনেক উঁচুতে যেখানে তাঁর মাথা ছিলো, যেখানে টেবিলের উপরকার আলোর রশ্মি পৌঁছুচ্ছিলো না, সেখান থেকে বিচারপতি বললেন, তাই বলে মাস্টার্সকে যে আমার কাছে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলে মনে হয় না সে-সত্যটা পাল্টে যায় না।

ওকে দায়িত্বশীল হতেই হবে, নইলে আমি ওর ঘাড় মটকে দেবো!

ওখানেই তো গোলমাল। মাস্টার্স 'আপনার' কাছে দায়িত্বশীল থাকবে।

কর্তা আলোর নিচে তাঁর মুখ তুলে ধরে, নিয়তি-শাসিত বিষণ্ণতার সঙ্গে মাথা নেড়ে, ঈষৎ দুঃখভরে স্বীকার করলেন, সে কথা সত্যি। আমার প্রতি দায়িত্বশীল হবে মাস্টার্স। এখানে আমি নিরুপায়। কিন্তু ক্যালাহান — ক্যালাহানের কথা ধরুন — আমার কেমন মনে হচ্ছে যে সে দায়িত্বশীল থাকবে 'আপনার' কাছে, অল্টা পাওয়ারের কাছে, তার মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত আরো কার কার কাছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তাহলে তফাৎটা কোথায়?

হ্যাঁ?

ইয়ে —

নিকুচি করি আপনার ইয়ের!

কর্তা বিদ্যুৎগতিতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর অন্তর্নিহিত বিস্ফোরণ শক্তির তাড়নায়, যার ফলে তিনি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নিজের মুঠোয় মাছি ধরে ফেলতেন, অথবা চকিতে মাথা ঘুরিয়ে চোখ বিস্ফারিত করে আপনার দিকে তাকাতেন, সেই ভাবে তিনি চোখের পলকে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, লাল কার্পেটের বুকে তাঁর জুতোর গোড়ালী চেপে বসলো, তাঁর গ্লাস থেকে খানিকটা সুরা চলকে তাঁর পামবীচ প্যান্টের উপর পড়লো। কর্তা বললেন, তফাৎটা কোথায় সেটা আমিই আপনাকে বলে দিচ্ছি, বিচারপতি। মাস্টার্সকে আমি তরিয়ে দিতে পারবো, ক্যালাহানকে আপনি পারবেন না।

বিচারপতি তাঁর উচ্চতা থেকেই বললেন, আমাকে ওই ঝুঁকি নিতে হবে।

ঝুঁকি?

কর্তা হেসে উঠলেন, তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, আপনার, বিচারপতি, শুধু একটাই ঝুঁকি আছে, তার বেশি নেই। এই স্টেটে আপনি গত চল্লিশ বছর ধরে সঠিক অনুমান করে এসেছেন। এই ঘরে আপনি আরামে বসে থেকেছেন, আপনার নিগ্রো পরিচারকের দল আপনার পানীয় ঢেলে দিয়েছে, আর আপনি সঠিক অনুমান

করে গেছেন। আপনি এখানে বসে বসে আপন মনে হেসেছেন, আর বাকী সবাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিবারাত্র পরিশ্রম করেছে, আর যখনই আপনার কিছু দরকার হয়েছে আপনি হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়েছেন। হ্যাঁ, হাঁস শিকার অথবা কর্পোরেশন ল' থেকে যখন খানিকটা ছুটি নিয়েছেন তখন আপনি এ্যাটর্নী জেনারেল হিসাবে কিছুদিন কাজ করেছেন। কিংবা বিচারপতির খেলা খেলেছেন। এখন অনেক দিন ধরে আপনি বিচারপতি। সে পদে আর না থাকাটা আপনার কেমন লাগবে?

বিচারপতি আরউইন ঘরের মাঝখানে সোজা দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, কোনো মানুষ, কোনো মানুষ, আমার উপর চাপ প্রয়োগ করে আমাকে ভয় খাওয়াতে পারে নি। কোনো দিন পারে নি।

আমি কখনো সে চেষ্টা করি নি। এখন পর্যন্ত করি নি। এখনও করছি না। আপনি বলছেন যে কেউ একজন মাস্টার্স সম্পর্কে আপনাকে কিছু নোংরা তথ্য সরবরাহ করেছে। বেশ, ধরুন, আমি যদি ক্যালাহান সম্পর্কে আপনাকে কিছু নোংরা তথ্য দিই? — আহ, বাধা দেবেন না। অত অস্থির হচ্ছেন কেন? — কর্তা হাত তুলে বললেন, আমি এখন পর্যন্ত কোনো খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করি নি, কিন্তু করতে পারি, আর আমি যদি গোয়ালঘরের পেছনে গিয়ে কোদাল চালাই, সেখান থেকে খানিক সুগন্ধি দ্রব্য এনে আপনার বিবেকের নাকের তলায় ধরি, তাহলে আপনার বিবেক আপনাকে কি করতে বলবে তা কি আপনি জানেন? সেটা আপনাকে ক্যালাহানকে প্রদত্ত আপনার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে বলবে। তারপর মরা কুকুরের উপর যেভাবে নীল ডুমো মাছির দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেইভাবে সংবাদপত্রের লোকেরা আপনার এখানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, আর ওদেরকে আপনার বিবেক ও আপনার সম্পর্কে সব খুলে বলতে পারবেন। মাস্টার্সকে আপনার সমর্থনও করতে হবে না। আপনি আর আপনার বিবেক পরস্পরের বাহুলগ্ন হয়ে চলে যেতে পারবেন, পরস্পরকে আপনারা কতো ভালোবাসেন, একে অন্যকে সেই কথা শুনিয়ে চমৎকার সময় অতিবাহিত করতে পারবেন।

চোখের পলক না ফেলে বিচারপতি বললেন, আমি ক্যালাহানকে সমর্থন দিয়েছি।

কর্তা যেন কিছু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, আমি সম্ভবতঃ কিছু নোংরা আপনাকে দিতে পারবো। ক্যালাহান অনেক দিন ধরেই খেলছে, আর মাঠে নামলে কাদা লাগবেই, আর বাচ্চা ছেলেরা গোয়াল এলাকায় খালি পায়ে যাবেই।

চোখ ছোট করে, নিজের মাথা এক পাশে হেলিয়ে মুখ উঁচু করে তিনি বিচারপতি আরউইনের মুখ দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো যে ঘরের কোণার দিকে পুরানো আমলের বিরাট ঘড়িটার বয়স কমছে না। ওটা একটা টিক্ শব্দ করছে, আর কূয়ার মধ্যে পাথর পড়ার মতো ঝুপ্ করে সেটা আমার মাথার মধ্যে পড়ছে, সেখান থেকে ছোট ছোট ঢেউ বৃত্তাকারে ছড়িয়ে গিয়ে একসময় থেমে যাচ্ছে, তারপর টিক্ শব্দটি অন্ধকারের অতলে ডুবে যাচ্ছে। কিছু সময়ের জন্য, দীর্ঘ নয়, স্বল্পও নয়, সেটা সময়ও না হতে পারে, আর কিছুই ঘটছে না, তারপর আবার কূয়ার ভেতরে টিক্ শব্দ করে আরেকটা পাথর পড়বে, আবার ঢেউ উঠবে, তারপর থেমে যাবে।

কর্তা বিচারপতির মুখের অনুধ্যান বন্ধ করলেন। সে মুখে কিছুই ফুটে ওঠে নি। কর্তা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, কাঁধ কুঁচকে, হাতের গ্লাস ঠোঁটে তুলে নিলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, বিচারপতি, আপনার যেমন অভিরুচি। কিন্তু, জানেন, আরেকটা পথও আছে। কেউ হয়তো ক্যালাহানকে অন্য কারো সম্পর্কে এক ঝুড়ি নোংরা সরবরাহ করলো, আর অকস্মাৎ ক্যালাহানের বিবেক গজিয়ে উঠলো, আর সে তখন নিজেই তার সমর্থককে প্রত্যাখ্যান করলো। জানেন তো, এই বিবেকের ব্যাপারটা একবার শুরু হলে কোথায় যে থামবে কিছুই বলা যায় না, আর একবার যদি আপনি খুঁড়তে শুরু করেন —

আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো, স্যার, যদি — বিচারপতি আরউইন বড়ো চেয়ারটার দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুখের রঙ এখন আর বাছুরের যকৃতের রঙের মতো নেই, অনেক আগেই সে স্তর পার হয়ে গেছে। এখন তার খড়গ নাসিকার তলা থেকে সাদা রেখা টান টান হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। বিচারপতি বললেন, আমি বাধিত হব স্যার, দয়া করে আপনি ওই চেয়ার থেকে উঠে পড়লে, এবং এক্ষুণি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে।

কর্তা চেয়ারের পেছন থেকে তাঁর মাথাও তুললেন না। মুখে মাধুর্য ও বিশ্বাস ফুটিয়ে তিনি বিচারপতিকে দেখলেন, তারপর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছিলে, জ্যাক। বিচারপতি সহজে ভয় পান না।

আরউইন বললেন, গেট আউট।

উচ্চ কণ্ঠে নয়।

কর্তা মৃদু বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, এই বুড়ো হাড় আর চটপট নড়াচড়া করতে পারে না। কিন্তু আমার কর্তব্য আমি পালনের চেষ্টা করেছি, এবার উঠবো।

তিনি বিচারপতির সামনে দাঁড়িয়ে, চোখ কুঁচকে, আবার নিজের মাথা একপাশে হেলিয়ে, তাঁকে ভালো করে দেখলেন, যেন কোনো চাষী ঘোড়া কিনবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমি পেছনের বই-এর তাকের উপর গ্লাস নামিয়ে রাখলাম। লক্ষ্য করলাম যে সেই প্রথম এক চুমুক খাবার পর আমি আর তা স্পর্শ করি নি। মনে মনে বললাম, জাহান্নামে যাক। থাকুক পড়ে। কাল সকালে কোনো নিগ্রো পরিচারকের ভোগে লাগবে।

তারপর, শেষ পর্যন্ত তিনি যেন ঘোড়াটা না কেনাই ঠিক করলেন এমনি ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে, দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে হলো বিচারপতি যেন মানুষই না, এমনকি ঘোড়াও না, যেন বাড়ির একটা কোণ অথবা একটা গাছ। কর্তা ধীর সহজ পদক্ষেপে লাল কার্পেটের উপর দিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো না করে।

একটি কি দুটি মুহূর্তের জন্য বিচারপতির মাথা পর্যন্ত নড়লো না, তারপরই তিনি বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে কর্তাকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখলেন। ল্যাম্পের আলোর বৃত্তের বাইরে ছায়ার মধ্যে তাঁর চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো।

কর্তা দরজার হাতলে হাত রাখলেন, দরজা খুললেন, তারপর হাতলে হাত রাখা অবস্থাতেই পেছনে তাকিয়ে বললেন, তো বিচারপতি, আমি ক্রোধের চাইতে বেশি বেদনাতেই বিদায় নিচ্ছি। আর, আপনার বিবেকের পক্ষে যদি ক্যালাহানকে হজম করে ফেলা সম্ভব হয় তাহলে আমাকে জানাবেন। অবশ্যই — কর্তা হেসে ফেললেন, একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো জ্যাক।

আমি নড়তে শুরু করার আগেই বিচারপতি আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে প্রচণ্ড বিদ্রূপের স্মিত হাসি হেসে বললেন, মিঃ বার্ডেন, আপনাকে আপনার নিয়োগকর্তা ডাকছেন।

দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে আমি বললাম, আমি এখনো কানে শ্রবণযন্ত্র লাগাই নি। আর মনে মনে বললাম, তুমি একটা নচ্ছার, জ্যাক। তুমি খুব একটা বাহাদুর ছেলে, জ্যাক।

আমি যখন প্রায় দোরগোড়ায় তখন আরউইন বললেন, শোনো, আমি এ সপ্তাহেই তোমার মায়ের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছি। ওঁকে কি বলবো যে তুমি এখনো তোমার কাজ পছন্দ করছো?

আঃ, কেন ক্ষান্ত দিচ্ছেন না উনি? দেয়ার লক্ষণও নেই। আবার তাঁর ঠোঁট বাঁকা হলো।

তাই আমি জবাব দিলাম, আপনার যা ইচ্ছা তাই বলবেন, বিচারপতি। কিন্তু আমি যদি আপনি হতাম তাহলে আজকের এই সাক্ষাৎ পর্বের কথা প্রচার করে

বেড়াতাম না। আপনার মত পাল্টালে কেউ হয়তো মনে করবে যে আপনি কর্তার সঙ্গে একটা গোপন রাজনৈতিক আঁতাত করে ফেলেছেন। রাতের অন্ধকারে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘর পেরিয়ে বাইরে চলে গেলাম। হলঘরের দরজা খোলাই থাকলো, কিন্তু তারের দরজাটা সশব্দে ঠেলে দিলাম আমি।

জাহান্নামে যান উনি। আমাকে কেন রেহাই দিলেন না একটুও?

কিন্তু জজ ভয় পান নি।

আমরা উপসাগর পিছনে রেখে, নাক থেকে জোয়ার-ভাঁটা অঞ্চলের নোনতা, বিষণ্ন, মিষ্টি মিষ্টি মেছো গন্ধ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, আবার উত্তরের দিকে চললাম। মাঠের মাটির কাছে, কুয়াশা এখন আগের চাইতে ঘন, আর সেই কুয়াশা সড়কের উপর উঠে এসে গাড়ির হেডলাইটের আলো স্তিমিত করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সামনের অন্ধকারের ভেতর থেকে এক জোড়া চোখ আমাদের দিকে তাকিয়ে জ্বলতে লাগলো। আমি বুঝলাম ওগুলো গরুর চোখ — বেচারা আদরের গরু, পরম কষ্টসহিষ্ণু, অচঞ্চল, ধৈর্যশীল, মহাসড়কের কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আপন মনে জাবর কাটছে, কিন্তু তার চোখ দুটি অন্ধকারের ভেতর থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে জ্বলছিলো যে মনে হলো ওর খুলির ভেতরে আছে শুধু রক্তের মতো জ্বলন্ত গলিত ধাতু, আর আমরা তার খুলির ভেতরকার সেই রক্তাক্ত উত্তপ্ত ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তারপর গাড়ির আলোয় আমরা শেষ মুহূর্তে একেবারে চোখের সামনে দেখতে পেলাম তার নিখুঁত আকৃতি, সে যে কী নিশ্চিত ছিলো আমরা তা বুঝলাম, তার ওই অসুন্দর জটপাকানো মাথার ভেতরে একমুঠো জমাটবাঁধা বাজে হলদেটে বস্তু ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু আমরা তার পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় সেখানে একটা কিছু ঘটে গেলো। আমরাই হলাম গরুটির শীতল মস্তিষ্কের ভেতরে ধীরে ধীরে ঘটে যাওয়া সেই একটা কিছু। গরুটি যদি জ্যাকি বার্ডেনের মতো একজন কট্টর আইডিয়ালিস্ট হতো তাহলে সে এই কথাই বলতো।

কর্তা বললেন, তাহলে, জ্যাকি, তোমাকে তো কাজটা করতে হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যালাহান?

না, আরউইন।

আমি বললাম, আরউইন সম্পর্কে কিছু পাবেন বলে মনে হয় না।

তুমি খুঁজে বার করবে।

এরপর আবার বিশ মাইল এবং আঠারো মিনিট আমাদের অগ্রযাত্রা চললো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। জলাভূমির ভেতর থেকে, সুতোর মতো সাইপ্রাস বৃক্ষরাজির অন্ধকারের মধ্য থেকে, কুয়াশার এক্টোপ্লাসমিক আঙ্গুলগুলি এগিয়ে এসে আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সক্ষম হলো না। জংলী জলাভূমি থেকে একটা ইঁদুর

জাতীয় প্রাণী বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হতে শুরু করলো, পার হয়েও যেতো, কিন্তু সুগার–বয়ের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পেরে উঠলো না। সুগার–বয় চাকাটা আলগোছে একটু বাঁয়ে ঠেলে দিলো, সামান্য এক রত্তি। কোনো রকম ঝাঁকুনি বা কম্পন বোঝা গেলো না, শুধু সামনের বাঁ দিকের ফোল্ডারের তলায় কিছু একটা থপ্ করে লাগলো, আর সুগার--বয় বললো, হা – হা – হা – রাম – জাদা। ওই ক্যাডিলাক দিয়ে সুগার–বয় সুঁচে সুতো পরাতে পারতো।

প্রায় আঠারো মিনিট আর বিশ মাইলের মাথায় আমি বললাম, কিন্তু নির্বাচনের তারিখের আগে যদি আমি কিছু খুঁজে বার করতে না পারি?

কর্তা বললেন, নিকুচি করি তোমার নির্বাচনের। মাস্টার্সকে আমি পার করে দেবো। অতি সহজে। কিন্তু দশ বছর লাগলেও তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে।

আরো পাঁচ মাইল পেরুলাম আমরা। তারপর আমি আবার বললাম, কিন্তু পাবার মতো যদি কিছুই না থাকে?

কিছু না কিছু সব সময় থাকে।

হয়তো বিচারপতির ক্ষেত্রে নেই।

মানুষ গর্ভে আসে পাপের মধ্যে, জন্ম নেয় দুর্নীতির ভেতর, জন্ম মুহূর্তের দুর্গন্ধ থেকে শুরু করে নিঃশেষ হয় শবদেহের কাপড়ের দুর্গন্ধের মধ্যে। কিছু না কিছু সব সময়ই থাকে।

আরো দু'মাইল গেলো, তারপর তিনি বললেন, দেখো, কোথাও কোনো ফাঁক থাকে না যেন।

এসব অনেক কাল আগের কথা। মাস্টার্স আজ মরে ভূত হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিন কর্তার কথাই ঠিক হয়েছিলো। ও সিনেটে গিয়েছিলো। আর ক্যালাহান এখনো বেঁচে আছে কিন্তু নিশ্চয়ই ভাবছে যে মরে গেলেই ভালো হতো, কারণ তার সৌভাগ্যের দীপ বহু আগেই নিভে গিয়েছিলো, কিন্তু মৃত্যু ঐ সৌভাগ্যের অন্তর্গত ছিলো না। এ্যাডাম স্ট্যান্টনও আজ মৃত, যার সঙ্গে এক সময় আমি মাছ ধরতে গেছি, যে আমার সঙ্গে আর এ্যান স্ট্যান্টনের সঙ্গে রোদে গরম বালির উপর শুয়ে থেকেছে। বিচারপতি আরউইনও বেঁচে নেই, যিনি ধূসর ভেজা শীতের সকালে জংলী জোলো লম্বা ঘাসের গুচ্ছের মাঝখান থেকে একদা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেছিলেন, ওই হাঁসটাকে, জ্যাক, তোমার আরো খানিক দূর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হতো। হাঁস শিকারের ওটাই নিয়ম, বুঝলে ছেলে? আর কর্তা, যিনি আমাকে বলেছিলেন, দেখো, কোথাও কোনো ফাঁক থাকে না যেন, তিনিও আজ বেঁচে নেই।

তা লিটল জ্যাকি কোনো ফাঁক রাখে নি।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

এর আগের বার আমি মেসন সিটিতে গিয়েছিলাম নতুন কংক্রিটের রাস্তা প্রায় জ্বালিয়ে দিয়ে, বিশাল কালো এক ক্যাডিলাকে চড়ে, কর্তা আর তাঁর দলবলের সঙ্গে। সে অনেক কাল আগের কথা, প্রায় তিন বছর, এখন ১৯৩৯ সাল, কিন্তু আমার মনে হয় যেন অনন্ত কাল আগের কথা। একেবারে প্রথম বার আমি ওখানে যাই অবশ্য আরো অনেক অনেক আগে, ১৯২২ সালে, আমার মডেল-টি ছ্যাকড়া গাড়ি নিয়ে, ধূসর ধুলায় পিছলে যেতে যেতে মরীয়া হয়ে স্টিয়ারিং আঁকড়ে থাকতে থাকতে। আমার পেছনে এক মাইল ধরে ধুলোর মেঘ ফুলে ফেঁপে উঠেছিলো, কার্পাসগাছের পাতার উপর পড়ে তাদের রঙ ধূসর করে তুলেছিলো। কঙ্করময় কোনো অংশ পার হবার সময় ঝাঁকুনি সামলে নেয়ার জন্য এমনভাবে আমি আমার চোয়াল চেপে ধরেছিলাম যে মনে হচ্ছিলো এখনই বুঝি দাঁতের এনামেল খসে বেরিয়ে আসবে। কর্তার প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হবে ঃ তাঁর সঙ্গে বার হলে আপনি অন্ততঃ শান্তিতে বেড়াতে যেতে পারবেন, অক্ষত অটুট দাঁত নিয়ে। কিন্তু আমার প্রথম মেসন সিটি যাত্রা সম্পর্কে সেকথা বলা যাবে না।

ক্রনিক্‌ল্‌ কাগজের ব্যবস্থাপক-সম্পাদক আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, জ্যাক, তোমার গাড়ি নিয়ে মেসন সিটিতে যাও, গিয়ে খোঁজ নাও এই স্টার্ক লোকটা কে। ও কি নিজেকে যীশু খ্রীস্ট ভেবেছে? যীশুর মতো সে কি ওখানকার কোর্ট-হাউস থেকে অর্থ-ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দিতে চায়?

আমি বললাম, ও একজন স্কুল-শিক্ষিকাকে বিয়ে করেছে।

জিম ম্যাডিসন, ক্রনিক্‌লের ব্যবস্থাপক-সম্পাদক, বললেন, সেই জন্যই বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওর ধারণা কি ও-ই সর্বপ্রথম একজন স্কুল-শিক্ষিকার সঙ্গে সহবাস করেছে?

আমি জানালাম, বন্ড ইস্যুটা ছিলো স্কুলভবন তৈরির জন্য। আমার মনে হয় লুসি সেই উদ্দেশ্যেই তার কিছুটা রাখতে চেয়েছিলো।

লুসি আবার কে?

লুসি-ই সেই স্কুল-শিক্ষিকা।

সম্পাদক গজগজ করে বললেন, ওকে আর বেশি দিন স্কুলশিক্ষিকা থাকতে হবে না। এই রকমভাবে চললে মেসন কাউন্টির বেতনের খাতা থেকে তার নাম নিশ্চিত কাটা পড়বে। মেসন কাউন্টিকে যদি আমি চিনে থাকি।

আমি বললাম, লুসি মদ খাওয়াও পছন্দ করে না।

সম্পাদক খেঁকিয়ে উঠলেন, ওর সঙ্গে বিছানায় কে শোয়? তুমি, না ওই লোকটা? লুসির এতো খবর তুমি রাখো কেমন করে?

উইলি আমাকে যতটুকু বলেছে ততটুকু খবরই শুধু আমি রাখি।

উইলিটা আবার কে, বাবা?

উইলি হচ্ছে ক্রিসমাস টাই পরা সেই ব্যক্তি। গ্রামাঞ্চলের উইলি ভাই। উইলি স্টার্ক, টিচার্স পেট্, শিক্ষিকার প্রিয়পাত্র। মাস দুই আগে স্লেডের আস্তানার পেছনের ঘরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, সে-ই আমাকে বলেছে যে লুসি মদ খাওয়া পছন্দ করে না। আমার অনুমান, লুসি চুরি করাও পছন্দ করে না।

জিম ম্যাডিসন বললেন, যদি উইলির বর্তমান কর্মকাণ্ডের পেছনে লুসি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সে উইলির কাউন্টি ট্রেজারার পদে থাকাটাও পছন্দ করছে না। মেসন কাউন্টিতে ওরা কিভাবে কাজ কারবার চালায় তা কি ও জানে না?

এখানে যেভাবে চালায় ওখানেও সেই ভাবেই চালায়।

হাঃ!

জিম ম্যাডিসন একটা লম্বা সিগার চিবুচ্ছিলেন, এখন শুধু তার ছোট্ট গোড়াটুকু অবশিষ্ট আছে। চুষতে চুষতে ছোট হয়ে যাওয়া থুতুতে ভিজে উজ্জ্বল দুর্গন্ধময় সিগারের শেষাংশ মুখের কোণা থেকে বার করে তিনি মনোযোগ দিয়ে একবার সেটা খেলেন, তারপর হাত প্রসারিত করে, ক্রনিক্‌লের নোংরা চারতলা ভবনের মধ্যে মোহন এক মরুদ্যানের মতো ফুটে ওঠা গাঢ় সবুজ কার্পেটের উপর যে বড়ো তামার পিকদানিটা বসানো ছিলো তার মধ্যে টুপ্ করে তা ফেলে দিলেন। সেটাকে পড়তে দেখলেন তিনি, তারপর বললেন, হাঃ, কিন্তু তুমি এখন এই জায়গাটা ছেড়ে ওই জায়গাটায় যাও।

অতএব আমি আমার মডেল টি. নিয়ে চোয়াল চেপে স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরে মেসন সিটির দিকে রওনা হলাম। সে অনেক অনেক কাল আগের কথা।

পড়ন্ত বেলার প্রথম দিকে আমি মেসন সিটিতে পৌঁছে মেসন সিটি কাফেতে ঢুকলাম। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়দের জন্য এখানে বাড়িতে রান্না করা খাবার পরিবেশিত হয়। চত্বরের দিকে মুখ করা কাফেতে ঢুকে আমি এক হাতে ভাজা

শুয়োরের মাংস, আলু ভর্তা ও সব্জী দিয়ে আহার সম্পন্ন করি, আর অন্য হাত দিয়ে পাশে রাখা মিষ্টির দখল নেবার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত সাত আটটা মাছি তাড়াতে থাকি।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আমি ছায়ার নিচে শুয়ে থাকা কুকুরগুলির দিকে এগিয়ে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমি ঘোড়ার জিন ও অন্যান্য সাজসজ্জা তৈরির দোকানের সামনে এসে পৌঁছুলাম। দোকানের সামনে একটা আসনই খালি ছিলো। সেই আসনে বসে অন্যদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমি ওদের দলভুক্ত হয়ে গেলাম। আমি ছিলাম কনিষ্ঠ সদস্য, অন্যদের চাইতে অন্ততঃ বছর চল্লিশ ছোট। সবাই চুপচাপ। আমার মনে হলো এই ভাবে বসে থাকতে থাকতে আমার স্ফীত হাতের পিঠে ওদের মতোই হলুদ দাগ ফুটে উঠবে, তবু কারো মুখে কোনো কথা ফুটবে না। মেসন সিটির মতো শহরে ঘোড়ার সাজসরঞ্জামের দোকানের সামনের বেঞ্চি হলো সেই স্থান — অন্ততঃ কুড়ি বছর আগে ওখানে কংক্রিটের সড়ক নির্মিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাই ছিলো — যেখানে সময় তার নিজের পায়ে জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়, পড়ে গিয়ে আর ওঠার চেষ্টা করে না, বৃদ্ধ এক কুকুরের মতো শুয়েই থাকে। এটা হচ্ছে সেই স্থান যেখানে আপনি বসে বসে কখন রাত নামবে, কখন আপনার ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য অপেক্ষা করেন। এটা হচ্ছে সেই স্থান যার দিকে শেষকৃত্যের স্থানীয় দোকানদার গভীর প্রত্যয় নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে যে যতদিন পর্যন্ত তার জন্যে এই সব অপেক্ষা করে আছে ততদিন তাকে উপোস করতে হবে না। কিন্তু এখানে যদি আপনি অগাস্টের শেষ দিকের কোনো মধ্যঅপরাহ্নে বুড়োদের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসে থাকেন তাহলে আপনার মনে হবে যে এখানে কখনোই কিছু ঘটবে না, এমনকি আপনার নিজের শেষকৃত্যও। এদিকে উত্তপ্ত সূর্যের রশ্মি আপনার উপর পড়তে থাকবে, উজ্জ্বল ধুলোর মধ্যে ছায়া পর্যন্ত নিশ্চল, সেদিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আপনার মনে হবে ধূলিকণাগুলি যেন স্ফটিকের মতো জ্বলছে। লাঠির উপর তাদের হলদেটে যকৃত রঙের হাত বাঁকা করে ধরে রেখে বুড়োরা ওখানে বসে বসে একধরনের বিকৃত দার্শনিক বাষ্প ছাড়তে থাকে, যার কল্যাণে আপনার যাবতীয় ধ্যান ধারণা বদলে যায়, সময় ও গতি থেমে পড়ে। এটা নাক দিয়ে ইথার শোঁকার মতো, সব কিছুই যেন মিষ্টি মিষ্টি, বিষণ্ন, দূরবর্তী। আপনি ওখানে প্রবীণ দেবতাদের মধ্যে বসে আছেন, এক হাঁপানি–আক্রান্ত বৃদ্ধের গলার ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই আপনার বিরক্তি উৎপাদনের জন্য, বসে বসে আপনি অপেক্ষা করছেন কখন ওরা তাদের অলিম্পীয় অবস্থান আর রৌদ্রোজ্জ্বল নিরাসক্তির মধ্য থেকে মানবিক তাড়নার জালে এখনো জড়িয়ে থাকা

মানুষজনের কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে নিজেদের অসূয়াবর্জিত শ্লেষপূর্ণ প্রাজ্ঞ মন্তব্যাদি করবে। জানো, আমি সিম সন্ডার্সকে দেখেছি, একটা নতুন গোলাঘর বানিয়েছে ও।

তারপর — হ্যাঁ, কেউ কেউ মনে করে যে ওটা টাকায় গড়া।

তারপর — হ্যাঁ!

আমি বসে রইলাম আর অপেক্ষা করতে থাকলাম। আর ওদের মধ্যে একজন কথাটা বললো, আরেকজন মুখের ভেতরকার তামাকের গোল্লাটা এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরিয়ে একটু ঝুঁকে তার উত্তর দিলো এবং শেষ ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ! আবার আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, আমার ভূমিকা আমি ঠিক বুঝে নিয়েছিলাম, তারপর একটু সময় যখন কেটে গেলো তখন আমি বললাম, শুনছি এখানে নাকি একটা নতুন স্কুলভবন তৈরি হবে। তারপর আমি অপেক্ষা করে থাকলাম, আমার কথাগুলি বাতাসে মিলিয়ে গেলো, আমি যেন মুখই খুলি নি। এর পর ওদের একজন তার মুখের তামাক নিচের শুকনো মাটিতে ফেলে তার হাতের লাঠির প্রান্তদেশ দিয়ে তা স্পর্শ করে বললো, হ্যাঁ, সেখানে স্টীম হীটিং-এর ব্যবস্থা করবে বলে শুনলাম।

দু'নম্বর মন্তব্য করলো ; বাচ্চাগুলোর তাহলে নিউমোনিয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তিন নম্বর ঃ হ্যাঁ।

আর চার নম্বর ঃ না, ঠিকমতো বানালে হবে না।

আমি চত্বরের ওপাশে আদালত ভবনের টাওয়ারের গায়ে আঁকা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করলাম, তারপর বললাম, তো বানাচ্ছে না কেন? কে বাধা দিচ্ছে?

এক নম্বর ঃ স্টার্ক। ওই ব্যাটা স্টার্ক।

দু'নম্বর ঃ হ্যাঁ, ওই উইলি স্টার্ক।

তিন নম্বর ঃ খুব বাড় বেড়েছে ওর। কোর্ট হাউসে ঢুকে ভাবছে খুব একটা কেউ কেটা হয়েছে।

আর চার নম্বর ঃ হ্যাঁ!

আমি একটু চুপ করে থাকলাম, তারপর বললাম, ওরা বলছিলো, সে চায় যেন কমের দিকের দরপত্রটা গ্রহণ করা হয়।

এক নম্বর ঃ হ্যাঁ, সেটাই তার ইচ্ছা, যেন এক গাদা নিগ্রো এসে এখানে জুটতে পারে।

দু'নম্বর ঃ শ্বেতাঙ্গগুলি যেন বেকার হয়ে পড়ে কাজ না পেয়ে।

তিন নম্বর ঃ তুমি একটা নিগারের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে চাইবে? বিশেষ

করে সে যদি ভিন্ন অঞ্চলের নিগার হয়? তা সেটা স্কুলভবন বা অন্য যা কিছু বানাবার জন্যই হোক?

এবং চতুর্থ জন ঃ আর সাদাদের তো কাজ দরকার।

আর প্রথম জন ঃ হ্যাঁ!

আমি মনে মনে বললাম, হ্যাঁ, তাহলে এই হলো কিস্‌সা। মেসন কাউন্টি হলো একটা অশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ চাষী শ্রমিকের এলাকা, যেখানকার লোক নিগ্রোদের দেখতে পারে না, অন্ততঃ ভিন্ন অঞ্চলের নিগ্রোদের, আর নিজেদের মধ্যে খুব বেশি নিগ্রো অধিবাসী তাদের নেইই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কম ডাকটা নিলে তারা কতো টাকা বাঁচাতে পারবে?

এক নম্বর ঃ কিছুই না। ওতে করে এখানে নিগ্রোদের আমদানী করার খরচও উঠবে না।

দু' নম্বর বললো, সাদাদের বেকার করে দেবে ওরা।

আমি একটা শোভন সময় পর্যন্ত চুপচাপ বসে থেকে, তারপর উঠে পড়ে বললাম, যেতে হবে এবার। শুভ অপরাহ্ন, ভদ্রমহোদয়গণ।

বুড়োদের একজন আমার দিকে এমনভাবে মুখ তুলে তাকালো যেন আমি এইমাত্র ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো, তা তুমি কি কর, ছোকরা?

কিছুই না।

অসুস্থ শরীর?

না, আমার উচ্চাভিলাষ নেই, তাই।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি ভাবলাম, ওই উক্তিটি একশো ভাগ সত্য।

আমি এটাও ভাবলাম যে ইতোমধ্যে যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি, এবার আদালতভবনে গিয়ে যেভাবে একজন সাংবাদিক তার কাহিনী সংগ্রহ করে সেই ভাবে আমার কাহিনী সংগ্রহ করতে হবে। এই ভাবে ঘোড়ার সরঞ্জামের দোকানের সামনে আড্ডা দিয়ে কোনো সাংবাদিক তার কাহিনী সংগ্রহ করে না। এভাবে সংগৃহীত কোনো খবর আপনি খবরের কাগজের পাতায় তুলে দিতে পারেন না। অতএব আমি কোর্ট-হাউসের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কোর্ট হাউসের ভিতরে বড়ো হলঘরটা ছিলো শূন্য, ছায়াছায়া, পায়ের নিচে কালো তৈলাক্ত মেঝে এবড়োখেবড়ো, ঘরের বাতাস শুষ্ক, ধুলোময়, তার নৈঃশব্দের মধ্যে আপনার মনে হবে আপনি যেন বিগত পঁচাত্তর বছর ধরে এখানে যতো কথা বলা হয়েছে, উচ্চ কণ্ঠে আর নিচু গলায়, যতো ফিসফিস গুজগুজ চলেছে, সব যেন

এখনো বাতাসে ঝুলে রয়েছে, আর আপনি যেন এখন তা নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজের ভেতর টেনে নিচ্ছেন। তো আমি হলঘর পেরিয়ে অন্য একটা ঘরে কয়েকজন লোককে বসে থাকতে দেখলাম। দরজার বাইরে একটা টিনের সাইনফলক, অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তবু পড়া যায়, তাতে লেখা ঃ শেরিফ।

আমি ঘরে ঢুকলাম। তিনজন লোক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। টেবিলের উপর একটা বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে, কিন্তু বিশেষ কাজ দিচ্ছে না। আমি মুখ তিনটিকে সম্ভাষণ জানালাম। সব চাইতে বড়ো মুখটি, গোল এবং লাল, তার পদযুগল টেবিলের উপর তুলে দেয়া, হাত দুটি পেটের উপর জড়ো করা, আমার সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিলো।

আমি পকেট থেকে আমার কার্ড বের করে ওর হাতে দিলাম। সে কার্ডটা হাতে নিয়ে হাতটা দূরে প্রসারিত করে প্রায় এক মিনিট ধরে কার্ডটা দেখলো, তার বোধহয় আশঙ্কা হচ্ছিলো কার্ডটা তার চোখে হঠাৎ থুতু ছুঁড়ে মারবে। তারপর সে কার্ডটা উল্টে এক মিনিট ধরে ওই দিকটা দেখে সুনিশ্চিত হলো যে সেখানে কিছু লেখা নেই। অতঃপর সে কার্ডসহ তার হাত আবার নিজের পেটের উপর, স্বস্থানে, স্থাপন করে আমার দিকে তাকালো। বললো, একটা প্রতিবেদন তৈরি করতে এসেছেন?

ঠিক ধরেছেন।

কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?

স্কুল-ভবন নিয়ে কি হচ্ছে সেটা দেখতে।

অন্যের চরকায় তেল দেবার জন্য আপনি প্রতিবেদন তৈরি করতে এসেছেন?

আমি প্রফুল্ল মুখে উত্তর দিলাম, ঠিক ধরেছেন, তবে কাগজের আপিসে আমার কর্তার ধারণা অন্য রকম।

সেটা ওনারও কোন ব্যাপার না।

আমি বললাম, না, কিন্তু এসেই যখন পড়েছি তখন ব্যাপারটা কি বলেই ফেলুন না?

এটা আমার কোনো ব্যাপার নয়। আমি এখানকার শেরিফ।

তো, শেরিফ, ব্যাপারটা তাহলে কার?

যারা দেখছে তাদের। যদি না আজেবাজে লোক অহেতুক নাক গলাতে শুরু করে।

তারা কারা?

শেরিফ জানালো, কমিশনাররা। কাউন্টি কমিশনাররা। মেসন কাউন্টির ভোটদাতারা যাদের ভোট দিয়ে নির্বাচন করেছে, তাদের হয়ে সব দেখাশোনা করার

জন্য। কোনো উটকো লোকের ফোঁপরদালালী ওরা সহ্য করে না।

অবশ্যই। তো কমিশনাররা — কারা এই কমিশনার?

শেরিফের ক্ষুদে সজাগ চোখ দুটি আমার দিকে তাকিয়ে বার দুই পিটপিট করলো, তারপর সে বললো, পুলিশের উচিত বাউণ্ডুলেপনার জন্য তোমাকে হাজতে পুরে রাখা।

আমি বললাম, আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই। তখন আমার পত্রিকা ক্রনিকল্ আমার কেসটা নিয়ে লেখার জন্য আরেক জন সাংবাদিক পাঠাবে, আর পুলিশ তাকেও হাজতে পোরার পর ক্রনিকল্ পরের কেসটা কাভার করার জন্য অপর এক জনকে পাঠাবে। এবং কিছুদিন পর সবাইকে যখন হাজতে পুরে রাখবেন তখন হয়তো বিষয়টা কাগজে উঠবে।

শেরিফ যেমন গা এলিয়ে বসেছিলো তেমনি বসে থাকলো, তার বড়ো গোল মুখের মধ্যে ক্ষুদে চোখ দুটি পিটপিট করলো, মনে হলো আমি যেন কোনো কথাই বলি নি, অথবা আমি যেন ওখানে নেই-ই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কমিশনার কারা? না কি তাঁরা সব আত্মগোপন করে আছেন?

শেরিফ তার বড়ো গোল মাথাটা কাঁধের উপর থেকে ঘুরিয়ে সামনে বসা একজনকে দেখিয়ে বললো, একজন এইখানেই বসে আছে। শেরিফের মাথাটা নিজের জায়গায় ফিরে গেলে সে আমার কার্ডটা আঙ্গুল থেকে ফেলে দিলো, পাখার মৃদু বাতাসে ভাসতে ভাসতে সেটা মেঝের উপর এসে পড়লো, শেরিফের ক্ষুদে চোখ দুটি আবার পিটপিট করলো, তারপর সে যেন নাড়া খাওয়া জলের তলায় আবার ডুবে গেলো। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, এবার অন্য কেউ দেখুক।

আমি দেখিয়ে দেয়া লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি একজন কমিশনার?

বৈশিষ্ট্যহীন গতানুগতিক একটি মানুষ, পরনে সাদা শার্ট, রেডিমেড কাল বো' টাই, সাসপেন্ডার দিয়ে আটকানো জিনের প্যান্ট। কোমরের উপর থেকে শহর, তলা থেকে গ্রাম। দু'জায়গার ভোটই পাওয়া যায়।

সে উত্তর দিলো, হ্যাঁ।

ওর পাশে বসে ছিলো কেন্নোর মতো এক বুড়ো, টাক মাথা, গুল্লি পাকানো, মুখের চেহারা এমন যে আয়নায় একবার দেখার পর দ্বিতীয় বার নিজের মুখই আর মনে করতে পারা যায় না, সেই ধরনের লোক যে হোমরাচোমরারা বসার পর চেয়ার খালি থাকলে সেখানে গিয়ে বসে, আর তোষামোদী মন্তব্য করে আলাপের মধ্যে ঢুকে যাবার প্রয়াস পায়। এখন বললো, উনিই হচ্ছেন কমিশনারদের মধ্যে প্রধান

ব্যক্তি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি চেয়ারম্যান?

হ্যাঁ।

আপনার নামটা জানতে পারি কি?

সেটা গোপনীয় কিছু নয়। ডল্‌ফ্‌ পিল্‌স্‌বেরি।

আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিঃ পিল্‌স্‌বেরি। ও এমনভাবে আমার হাত ধরলো যেন আমি তার দিকে একটা অতিব্যবহারে জীর্ণ ছেঁড়া চটি জুতো এগিয়ে দিয়েছি।

আমি বললাম, মিঃ পিল্‌স্‌বেরি, স্কুলভবনের কন্ট্রাক্টের পরিস্থিতি কি সেটা জানবার মতো উপযুক্ত অবস্থানে আছেন আপনি। সঠিক পরিস্থিতি যেন জনসাধারণ জানে সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চয়ই উৎসাহী।

মিঃ পিল্‌স্‌বেরি বললো, কোনো পরিস্থিতি নেই।

হয়তো নেই কিন্তু এ নিয়ে বেশ কথা উঠেছে।

কোনো পরিস্থিতি নেই। বোর্ড মিলিত হয়েছে এবং একটা ডাক গ্রহণ করেছে। জে. এইচ. মুরের দরপত্র।

মুরের ডাকটাই কি কম ছিলো?

ঠিক তা নয়।

তার মানে সেটা কম ছিলো না।

হয়ে —

মিঃ পিল্‌স্‌বেরির মুখে ছায়া ঘনিয়ে এলো, যেন তার পেটে গ্যাসের ব্যথা উঠেছে। পিল্‌স্‌বেরি বললো, তো আপনি যদি ওভাবে বলতে চান বলতে পারেন।

হ্যাঁ, এভাবেই বলতে চাই আমি।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ থেকে ছায়া সরে গেলো, সে চকিতে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলো, যেন কেউ তাকে পিন দিয়ে খোঁচা দিয়েছে। বললো, ওভাবে কথা বলবেন না। যা কিছু করা হয়েছে সবই আইনসঙ্গতভাবে। কার ডাক নিতে হবে কিংবা হবে না, সে সম্পর্কে বোর্ডকে কেউ কোনো নির্দেশ দিতে পারে না। যে কেউ একজন আজেবাজে ছোট্ট একটা রেট দেবে আর বোর্ডকে সেটা গ্রহণ করতেই হবে? আজ্ঞে না! বোর্ড তার ডাকই নেবে যে কাজটা ঠিকমতো করতে পারবে।

তো আজেবাজে ছোট্ট রেটটা কে দিয়েছিলো?

মিঃ পিল্‌স্‌বেরি, যেন একটা অপ্রীতিকর স্মৃতি মনে পড়েছে সেই ভাবে, বিরস মুখে বললো, জেফার্স।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জেফার্স কন্স্ট্রাকশান?

হ্যাঁ।

তো জেফার্স কন্স্ট্রাকশানের অপরাধটা কি?

বোর্ড তাকেই কাজ দেবে যে সেটা ঠিকমতো করতে পারবে। এখানে আর কারো নাক গলাবার দরকার নেই।

আমি কাগজ পেন্সিল বার করে লিখলাম, তারপর মিঃ পিল্স্বেরিকে লক্ষ্য করে বললাম, শুনুন, এটা কেমন হয়? আমি পড়ে গেলাম ঃ "মেসন কাউন্টির বোর্ড অব কাউন্টি কমিশনারস-এর চেয়ারম্যান মিঃ পিল্স্বেরি জানালেন যে মেসন কাউন্টি স্কুল নির্মাণের জন্য জে. এইচ. মুরের ডাক গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও তা নিম্নতম ডাক ছিলো না, কারণ বোর্ড এমন একজনকে কাজটা দিতে চেয়েছে 'যে কাজটা ঠিকমতো করতে পারবে।' জেফার্স কন্স্ট্রাকশান কোম্পানি প্রদত্ত নিম্ন দরপত্রটি নামঞ্জুর হয় বলে মিঃ পিল্স্বেরি জানান। মিঃ পিল্স্বেরি আরো জানান — "

মিঃ পিলসবেরি এবার তার চেয়ারে একেবারে খাড়া হয়ে বসলো, এতো দ্রুততার সঙ্গে যে মনে হলো এবার আর পিন নয়, আগুনের ছ্যাঁকা খেয়েছে, তারপর বললো, দেখুন, আমি — আমি কিছু জানাই নি। আপনি লিখেছেন, তারপর দাবী করছেন যে আমি এসব বলেছি। আমি —

শেরিফ এবার নিজের বিশাল দেহটা নাড়ালো, তারপর স্থির চোখে মিঃ পিল্স্বেরিকে লক্ষ্য করে বললো, ডল্ফ্, ব্যাটাচ্ছেলেকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলো।

ডল্ফ্ বললো, আমি কিছু জানাই নি। এবার আপনি বেরোন এখান থেকে।

আমি কাগজটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নিশ্চয়ই। কিন্তু মিঃ স্টার্ককে কোথায় পাবো দয়া করে বলবেন কি?

শেরিফ বোমার মতো ফেটে পড়লো, টেবিলের উপর থেকে সজোরে নিজের পাদুটো মাটিতে নামালো, সোজা হয়ে চেয়ারে বসলো, এমনভাবে আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালো যেন এখনই তার স্ট্রোক হবে, তারপর কোনরকমে বললো, আমি জানতাম। আমি জানতাম যে এর পেছনে নির্ঘাত স্টার্ক আছে, ওই ব্যাটা স্টার্ক।

আমি প্রশ্ন করলাম, তো স্টার্কের অপরাধ কি?

শেরিফ চিৎকার করে উঠলো, যীসাস গড্! তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না। অবরুদ্ধ কথার চাপে তার সারা মুখ রক্তবর্ণ হয়ে গেলো।

মিঃ ডলফ পিল্‌স্‌বেরি বললো, তার খুব বাড় বেড়েছে, বুঝলেন? কোর্ট-হাউসে ঢুকেছে, আর খুব বাড় বেড়ে গেছে। ভাবছে —

টেকো, জটপাকানো মাথার, ছোট্ট বৃদ্ধটি যোগান দিলো, ও একটা নিগ্রো-প্রেমিক।

হঠাৎ মিঃ পিল্‌স্‌বেরির যেন চোখ খুলে গেছে এমনি ভঙ্গিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো। আর ইনি — আমি বাজী রেখে বলতে পারি — ইনিও একজন নিগ্রো-প্রেমিক — বাজী রেখে বলতে পারি আমি —

উঁহুঁ, এটা বিকোবে না। আমার পছন্দ ভ্যানিলা। কিন্তু কথাটা যখন তুললেন তখন জিজ্ঞাসা করি, এর সঙ্গে নিগ্রো-প্রীতির সম্পর্কটা কি?

নিমজ্জমান ব্যক্তির কাঠের টুকরো ধরার মতো মিঃ পিল্‌স্‌বেরি এবার চেঁচিয়ে উঠলো, সেটাই তো আসল কথা। জেফার্স কন্‌স্ট্রাকশান হলো —

শেরিফ তাকে গর্জন করে থামিয়ে দিলো, ডল্‌ফ্‌, তুমি চুপ করবে! ওকে বেরিয়ে যেতে বলো এক্ষুণি।

মিঃ পিল্‌স্‌বেরি বাধ্য ভাবে, কিন্তু তেমন জোরের সঙ্গে নয়, আমাকে বললো, বেরিয়ে যান আপনি।

নিশ্চয়।

আমি বার হয়ে হলঘর ধরে এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে ভাবলাম, এরা কেউ বাস্তব জগতের নয়, একজনও না। কিন্তু আমি জানতাম যে এরা বাস্তব জগতেরই। আপনি একটা অপরিচিত জায়গায় এসে উপস্থিত হন, মেসন সিটির মতো কোনো শহরে, ওদের কাউকে সত্যি বলে মনে হবে না, কিন্তু ওরা খুবই সত্যি। আপনি ঠিক জানেন যে বাচ্চা বয়সে এরা নালার জলে পা ডুবিয়ে হেঁটেছে, আরেকটু বড়ো হয়ে সূর্যাস্তের সময় বাড়ির পেছনের বেড়ায় হেলান দিয়ে মাঠ-ঘাট-প্রান্তর ছাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, নিজেদের ভেতরে কি ঘটছে তা কিছুই উপলব্ধি করে নি, তারা কি সুখী না দুঃখী, তার পর যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলো তখন স্ত্রীর সঙ্গে শুয়েছে, বাচ্চাদের কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়েছে, ভোর বেলায় কাজে বেরিয়ে গেছে, কি চায় তা ওরা জানে না কিন্তু যা করছে তার যুক্তি ঠিকই পেয়েছে, আর ভালো কাজই করতে চেয়েছে তারা, কারণ তাদের কাজের পক্ষে সুযুক্তির অভাব তাদের কখনো হতো না, তারপর বুড়ো হবার পর কোনো কাজের জন্য কোনো যুক্তিই যখন তারা আর খুঁজে পেলো না, তখন তারা ঘোড়ার সাজসরঞ্জামের দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে থাকতে শুরু করলো, অন্যান্য মানুষ যে কারণে কথা বলে সে কারণে কথাবার্তা বলতে থাকলো, কিন্তু সে কারণগুলি কি তা আর তাদের মনে নেই।

তারপর কোনো এক সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে, ঠিক আলো ফুটবার আগে, তারা ছাদের দিকে তাকাবে, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাবে না, কারণ ল্যাম্পটা তারা মুড়ে দিয়েছে খবরের কাগজে, আর বিছানায় তাদের পাশের মুখগুলি তারা আর চিনতে পারবে না, কারণ ঘরটা ধূঁয়ো কিংবা কুয়াশায় ভরে গেছে, আর তার দরুন তাদের চোখ এবং গলা এখন জ্বালা করছে। ওহ্, তারা ঠিকই বাস্তব, আর আপনার কাছে যে বাস্তব মনে হয় না তার কারণ হয়তো এই যে, আপনি নিজেই খুব বাস্তব নন।

কিন্তু হলঘরের অন্য প্রান্তের একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আরেকটা টিনের ফলক যখন আমি দেখলাম তখন বুঝলাম যে এবার আমি মেসন সিটির এক সদস্যবিশিষ্ট কুষ্ঠ কলোনিতে পৌঁছে গেছি।

তার ঘরে কুষ্ঠরোগীটি তখন একা বসে আছে, কিছু করছে না। তার সঙ্গে বসে গল্প করা বা আড্ডা দেবার মতো কেউ ছিলো না।

আমি হ্যালো বলতে সে চোখ তুলে তাকালো, তার ভাব দেখে মনে হলো, আমি যেন কোনো ভৌতিক জগত থেকে এসেছি, কথা বলেছি কোনো অচিন দেশের ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে সে কোনো উত্তর দিলো না। সে যেন বিশ বছর ধরে এক নির্জন পরিত্যক্ত দ্বীপে বাস করেছে, তারপর হঠাৎ একদিন তীরে এসে জাহাজ ভিড়েছে, লোকজন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে সে কে, কিন্তু সে একটি কথাও বলতে পারছে না, কারণ ততদিনে তার জিভে মরচে পড়ে গেছে।

না, উইলির অবস্থা অতটা খারাপ হয় নি। কারণ অবশেষে সে হ্যালো বলতে সক্ষম হলো আর কয়েকমাস আগে স্লেডের আস্তানায় যে আমাদের দেখা হয়েছিলো সেকথাও তার মনে পড়লো। আমি কি চাই জিজ্ঞাসা করলো। আমার উত্তর শুনে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো, যতোটা আনন্দিত তার চাইতে বেশি সতৃষ্ণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলো কেন জানতে চাই।

আমি বললাম, সম্পাদক আমাকে এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছেন। কেন তা শুধু ভগবানই জানেন। হয়তো এটা নিউজ, খবর, তাই।

মনে হলো উত্তরটা তাকে সন্তুষ্ট করেছে। তাই আমি ওকে আর বললাম না যে আমার কর্তা ম্যানেজিং এডিটরকে ছাড়িয়ে তারো উপরে আরো অনেক কারণ আছে, কিন্তু সে-স্তরে শুধু হাল্কা স্বচ্ছ মায়াময় ডানার ঝিলিমিলি, দেবদূতদের অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি, আমার মতো খানাখন্দের গভীরে নিম্নাঞ্চলে কাজ করা মানুষ তার কোনো খোঁজ রাখে না।

উইলি বললো, হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটা খবর বলে আমিও মনে করি।

এখানে ঘটছেটা কি বলুন তো?

তা আপনাকে বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

আমাকে সে সব খুলে বললো। বলা যখন শেষ করলো তখন প্রায় রাত এগারোটা বাজে। লুসি স্টার্কও সঙ্গে ছিলো। বাচ্চাকে সে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। আমরা কথা বলছিলাম উইলির বাবার বাড়ির বসবার ঘরে বসে। আমাকে রাতটা ওখানেই কাটাতে অনুরোধ করেছিলো সে। লুসি আর সে সাধারণত গরমের সময়টা এখানেই কাটাতো, কিন্তু এবার শহরে ঘর নিয়ে থাকার বদলে শীতকালটাও এখানেই থাকবে, কারণ লুসিকে বরখাস্ত করা হয়েছে, আগামী বছরে আর তার শিক্ষকতার কাজ থাকবে না, কাজেই টাকা খরচ করে শহরে ভাড়া দিয়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই। শহরে না থাকার আরেকটা কারণও সম্ভবতঃ ছিলো। আসন্ন পুনর্নিবাচনে উইলির জেতার সম্ভাবনা কোনো স্মৃতিসৌধে খোদাই করা পাথরের সিংহের গায়ে খুঁটে খুঁটে একটা পোকার জীবনধারণের সম্ভাবনার চাইতে কিছুমাত্র বেশি ছিলো না। উইলি আমাকে জানায় যে সে তার চাকুরিটা বোর্ড অব কাউন্টি কমিশনার্স-এর চেয়ারম্যান মিঃ পিল্‌স্‌বেরির জন্যই পেয়েছিলো। বৈবাহিক কিংবা অন্য কোনো একটি সূত্রে পিল্‌স্‌বেরি ছিলো উইলির বাবার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তাছাড়া অপর যে ব্যক্তি ট্রেজারার হতে চেয়েছিলো তার সঙ্গে কি একটা কারণে পিল্‌স্‌বেরির ঝগড়া হয়। পিল্‌স্‌বেরিই, বলতে গেলে, গোটা কাউন্টিটা চালায়। সে আর শেরিফ। আর এখন উইলি স্টার্ককে পিল্‌স্‌বেরি সহ্য করতে পারে না। অতএব উইলি নিষ্ক্রমণের পথে, এবং লুসি ইতোমধ্যেই নিষ্ক্রান্ত।

লুসি বসবার ঘরে বসে টেবিলের উপরে রাখা ল্যাম্পের আলোয় সেলাই করছিলো। ওই টেবিলের উপরে ধরা ছিলো বড়ো বাইবেলটা আর বর্ণাঢ্য বাঁধাই করা ফটোর এ্যালবাম। লুসি বললো, আমাকে আর শিক্ষকতা করতে না দিলে আমার কিছুই এসে যাবে না। আমি ছ'বছর পড়িয়েছি, যখন টমি পেটে ছিলো সে টার্মটা নিয়ে, এবং ওই সময়ের মধ্যে কেউ আমার কাজে কোনো ত্রুটি খুঁজে পায় নি, আর এখন আমাকে চিঠি দিয়েছে, আমার কাজ নিয়ে নাকি অভিযোগ আছে, আমি নাকি সহযোগিতার মনোভাব দেখাই না।

সে সেলাইটা তুলে দাঁত দিয়ে সুতো কাটলো, মেয়েরা যেমন করে, যেটা দেখে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে যখন ঝুঁকে বসলো তখন তার বাদামী চুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পিঙ্গল আভা ঝলমল করে উঠলো। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত মেসন সিটি বিউটি শপের মহিলা মার্সেল প্রক্রিয়ায় তার কোঁকড়াবার চিম্‌টা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সেই চুলের আভা পুরোপুরি জ্বালিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় নি। এখনো

আভা থাকলেও লুসির চুল নিয়ে যা করা হয়েছে তা রীতিমত দুঃখজনক। লুসি দেখতে এখনো অল্পবয়সী মেয়ের মতো, বয়স প্রায় পঁচিশ হলেও সেরকম দেখায় না, চমৎকার সরু কোমর, সন্তোষজনক ও পরিমিত কটিদেশ থেকে উর্ধাঙ্গ সোজা উপরে উঠে এসেছে, চেয়ারের সামনে সুন্দর ছোটখাটো পা দুটি একটার উপর একটা তুলে সে বসে আছে, মুখটা বাচ্চা-বাচ্চা, কোমল, স্নিগ্ধ, আয়ত গাঢ়-বাদামী দুটি চোখ, পুরানো বসতবাড়ির বেড়ার চারপাশে প্রস্ফুটিত লাইলাক কুঞ্জের মধ্যে বাগানের গেটে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে যে চোখের দিকে তাকিয়ে আপনার ইচ্ছা হয় মনের যাবতীয় গোপন কথা উজাড় করে ঢেলে দিতে। কিন্তু তার চুল ঘাড় বরাবর ছোট করে ছাঁটা, সে-যুগে যা করা হতো, এবং খুবই খারাপ হয়েছে সে কাজটা, কারণ তার ছিলো সেই ধরনের মুখ যার প্রয়োজন দীর্ঘ উজ্জ্বল গোছা গোছা চুলের সম্ভার, তুষারশুভ্র বালিসের চারপাশে সে চুল ছড়িয়ে পড়ে থাকলেই সব চাইতে সুন্দর মানাতো। নিধনযজ্ঞ চালাবার আগে তার যে প্রচুর চুল ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।

আলোর বৃত্ত থেকে মাথা তুলে লুসি বললো, আমার কিছু এসে যাবে না। কেউ কিছু টাকা চুরি করতে পারবে সেই উদ্দেশ্যে যারা স্কুল বানায় তাদের স্কুলে আমি পড়াতে চাই না। আর ওই ধরনের অসৎ লোকদের সঙ্গে ভাইয়াচারি করে উইলিও ট্রেজারার হতে চায় না।

উইলি গোমড়া মুখে বললো, আমি নির্বাচনে দাঁড়াবো। কেউ আমাকে দাঁড়ানো থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

লুসি তাকে বললো, সারাক্ষণ যখন তোমাকে আর শহরে থাকতে হচ্ছে না তখন তুমি বরং তোমার আইনের বইগুলি পড়ায় বেশি সময় দিতে পারবে।

উইলি সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের উপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে আবার বললো, আমি নির্বাচনে দাঁড়াবো।

কথাটা আবার বললো সে, যেন লুসি কিংবা আমাকে নয়। বিশাল বিস্তৃত মধুর বাতাসকে উদ্দেশ করে বলছে, কিংবা স্বয়ং ঈশ্বরকে।

হ্যাঁ, যদি একটা ভোটও না পাই, তবু আমি দাঁড়াচ্ছি।

তো যথাসময়ে উইলি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলো, এবং একটার বেশি ভোট সে পায়, তবে খুব বেশি নয়, এবং ওই দফায় মিঃ পিল্‌সবেরি আর তার স্যাঙাতরা বিজয়ী হয়। উইলির বিরুদ্ধে যে দাঁড়িয়েছিলো সে চাকুরিতে অধিষ্ঠিত হবার আগেই জে. এইচ. মুরের নামে অগ্রিম পেমেন্টের চেক প্রায় সই করে দিয়েছিলো, আর জে. এইচ. মুরই স্কুল-ভবনটি নির্মাণ করে। কিন্তু, না, পরের কাহিনীটা আগেই বলে

ফেলছি আমি।

উইলি আমাক যে গল্প বলল — তা এই রকম ঃ জেফার্স কন্সট্রাকশান কোম্পানীর দর ছিল কম। একশো বিয়াল্লিশ হাজার ডলারের। মুরের দর ছিলো একশো পঁয়ষট্টি হাজার। এর মাঝামাঝি আরো দুটো ডাক ছিলো। উইলি যখন মুরের দর সম্পর্কে হৈ চৈ করতে শুরু করলো তখন পিল্‌স্‌বেরি নিগ্রো প্রসঙ্গটি সামনে নিয়ে এলো। জেফার্স ছিলো রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের একজন বড়ো ঠিকাদার, তার শ্রমিকদের মধ্যে ছিলো বেশ কিছু নিগ্রো রাজমিস্ত্রী, যোগানদার ও ছুতোর। পিল্‌স্‌বেরি এই বলে চেঁচামেচি শুরু করলো যে জেফার্সকে কাজ দিলে সে এখানে একগাদা নিগ্রো নিয়ে আসবে — আর মেসন কাউন্টি, আমি আগেই বলেছি, ছিলো একটা অশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ চাষী-শ্রমিকের অঞ্চল — আর তার চাইতেও যা খারাপ, দক্ষ শ্রমিক হবার কারণে, যে রকম দক্ষ লোক জেফার্স মেসন সিটিতে পাবে না, ওই নিগ্রোদের কেউ কেউ শ্বেতাঙ্গদের চাইতে বেশি বেতন পাবে। পিল্‌স্‌বেরি সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুললো।

সে এতোটা সাফল্যের সাথে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুললো যে জনগণ কয়েকটা জিনিস লক্ষ করলো না। জেফার্স আর মুরের মধ্যবর্তী যে আগের দুটো ডাক ছিলো, পিল্‌স্‌বেরির এক শ্যালকের যে ইটের ভাঁটা আছে, এবং তার মধ্যে যে মুরের একটা অংশ আছে এবং অল্প কিছু কাল আগে একটি রাষ্ট্রীয় নির্মাণ কাজের সময় জনৈক বিল্ডিং ইন্সপেক্টর যে ওই ভাঁটার ইট ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তা নিয়ে যে মামলা হয়, এবং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে এবারও স্কুলভবন বানাবার সময় ওই ভাঁটার ইটই ব্যবহার করা হবে — এসব বিষয় মানুষ লক্ষ করলো না। মুর আর পিল্‌স্‌বেরির শ্যালকের ভাঁটাখানায় তারা শস্তা শ্রম ব্যবহার করতো, সরকারী কারাগারের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের কাজে লাগাতো। গোটা সিস্টেমের সঙ্গে ওই শ্যালকপ্রবরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। বস্তুতঃপক্ষে, সে যোগসূত্র যে কতো সুদৃঢ় ছিলো তা আমি পরে আবিষ্কার করি ; কারণ সরকারী নির্মাণ কাজের সময় ওই ইট নিয়ে আপত্তি-করা বিল্ডিং ইন্সপেক্টরকে তার চাকুরি হারাতে হয়, যদিও লোকটি সত্যিই সৎ ছিলো নাকি ঠিকমতো সব খবরাখবর জানতো না সে কথা আমি বলতে পারবো না।

পিল্‌স্‌বেরি এবং শেরিফকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে উইলি বিশেষ সুবিধা করতে পারলো না। পিল্‌স্‌বেরি-বিরোধী একটা দল অবশ্য ছিলো, কিন্তু তা ছিলো খুবই নগণ্য, এবং উইলি তাদের সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম হলো না। তখন উইলি রাস্তায় লোক ধরে ধরে তাদের আসল পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো। আপনি তখন দেখতে

পেতেন উইলি তার সিয়ারসাকার স্যুটে পরে কোনো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক হাতে একটা পুরানো খাম, অন্য হাতে পেন্সিল, গরমে ঘামতে ঘামতে সে অঙ্ক কষে সবাইকে বোঝাতে চাইছে কেন সে ব্যাপারটা নিয়ে এতো হৈ চৈ করছে।। কিন্তু আপনি যখন কথা বলেন নিচু গলায়, ধৈর্যের সঙ্গে, মানুষকে রোদের মধ্যে থামিয়ে তাদের দিয়ে অঙ্ক কষান তখন মানুষ আপনার কথা শোনে না। তখন উইলি চেষ্টা করলো মেসন কাউন্টি মেসেঞ্জার পত্রিকায় তার বক্তব্য প্রকাশ করতে, কিন্তু তারা তাকে পাত্তা দিলো না। তখন উইলি দরপত্রগুলি সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ ও মতামতসহ একটা দীর্ঘ প্রতিবেদন লিখে তা হ্যান্ডবিল আকারে ছাপাতে চেষ্টা করলো। মেসেঞ্জার পত্রিকার খুচরা ছাপাখানা বিভাগে যখন সে কাজটি নিয়ে গেলো তখন তারা তা গ্রহণ করলো না। অগত্যা উইলি শহরে গিয়ে সেখান থেকে ওটা ছাপিয়ে এনে দুটি ছোকরাকে পয়সা দিয়ে নিয়োগ করে বাড়ি বাড়ি ওই হ্যান্ডবিল পৌছে দিতে লাগলো। একটি ছেলের পরিবারের লোকজন ব্যাপারটা জানতে পেরেই ছেলেটিকে ওই কাজ আর করতে দিলো না। অন্য ছেলেটি যখন নিরস্ত হলো না তখন গুণ্ডা লাগিয়ে তাকে পেটানো হলো।

তখন উইলি নিজের হাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হ্যান্ডবিল বিতরণের কাজ তুলে নিলো। স্কুলের ছেলেরা যে ধরনের ব্যাগ ব্যবহার করে ওই ধরনের ব্যাগে হ্যান্ডবিলগুলি পুরে উইলি গৃহস্থের বাড়ির দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতো, গৃহিণী এসে দরজা খুললে মাথার টুপি তুলে তাকে অভিবাদন করতো কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই গৃহিণী দরজা খুলতো না। ভেতর দিকে জানালার পর্দার কাছে একটা খসখস শব্দ উঠতো কিন্তু কেউ আসতো না। তখন উইলি দরজার তলা দিয়ে হ্যান্ডবিলটা ঠেলে দিয়ে পরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতো। এইভাবে মেসন সিটি শেষ করে সে গেলো টাইরিতে, তারপর কাউন্টির অন্যান্য এলাকায়, সর্বত্র সে একই ভাবে তার হ্যান্ডবিলগুলি বিলি করলো, এবং তারপর গেলো রাস্তার মোড়ের ছাউনিগুলিতে।

কিন্তু নির্বাচনী মহলকে সে ঘায়েল করতে পারলো না। তার বিপক্ষে যে দাঁড়িয়েছিলো সে নির্বাচিত হলো, জে. এইচ. মুর স্কুলভবন তৈরি করলো, এবং ভবনের রঙ্ শুকোবার আগেই তার মেরামতির প্রয়োজন দেখা দিলো। উইলি বেকার হলো আর অন্যদিকে, নিশ্চিতভাবে, পিল্‌স্‌বেরি আর তার বন্ধুরা জে. এইচ. মুরের কাছ থেকে বেশ কিছু আর্থিক ফায়দা লুটে নিলো এবং সবাই দ্রুত সব ব্যাপারটা ভুলে গেলো। অন্ততঃ বছর তিনেকের জন্য ভুলে থাকলো, তারপর তাদের দুর্ভাগ্যের পালা শুরু হলো।

ইত্যবসরে উইলি তার বাবার খামারে ফিরে আসে, কাজকর্মে সাহায্য করে,

নিজের হাতে ঘরগেরস্থালির কাজ করতে থাকে। তার পুরানো গাড়িতে চড়ে সে আবার এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে, এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যেতে শুরু করলো, সঙ্গে তার পেটেন্ট করা ফিকস–ইট–হাউসহোল্ড কিট, বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে মাথার টুপি খুলে গৃহিণীকে অভিবাদন করে সে কিভাবে একটা পাত্র সারাতে হয় সেটা তাকে দেখিয়ে দিলো। আর রাত্রিবেলা নিজের ঘরে বসে পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে আইনের বই পড়লো, তৈরি হলো ওকালতি পরীক্ষার জন্য। কিন্তু তার আগে, সেদিন রাতে, ওদের বসবার ঘরে বসে কথা বলছিলাম আমি আর উইলি আর লুসি। উইলি বলছিলো, ওরা আমাকে পিষে মারতে চেয়েছিলো। ভেবেছিলো যা বলবে তাই আমি করবো। আমি যেন একটা কেঁচো। ওরা পিষে মারতে চেয়েছিলো আমাকে।

আর লুসি, কোলের উপর তার সেলাইটা নামিয়ে রেখে বলেছিলো, কিন্তু, মণি, তুমি তো আর ওদের কোনো ব্যাপারেই থাকতে চাও নি। ওরা কিরকম অসৎ আর জোচ্চোর সেটা জানার পর তো তুমি আর ওদের কোন কিছুতে থাকতে চাও না।

চেয়ারে নিজের ভারী শরীরটা নেড়েচেড়ে গোমড়া মুখে উইলি পুনরাবৃত্তি করলো, ওরা আমাকে পিষে মারতে চেয়েছিলো, যেন আমি একটা কেঁচো।

ওর দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে লুসি বলেছিলো, উইলি, তোমাকে পিষে মারতে না চাইলেও ওরা তো জোচ্চোর থাকতোই।

লুসির কথা উইলির কানে গেলো না।

লুসি তখন আবার বললো, পরম ধৈর্যের সঙ্গে, যেভাবে স্কুলে সে বাচ্চাদের ইঙ্গিত–উৎসাহ দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতো সেই ভাবে, কিন্তু তারা তো জোচ্চোর থাকতোই, থাকতো না?

সে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো আর ওই মুখটি, মনে হলো, তার কাছ থেকে আর আমার কাছ থেকে আর ওই ঘরের কাছ থেকে, দূরে সরে যাচ্ছে। ওর কানে যেন লুসির কথা পৌঁছুচ্ছে না, যেন অন্য কোনো কণ্ঠস্বর সে শুনছে, হয়তো কোনো সঙ্কেত, যা আসছে বাড়ির বাইরে থেকে, জানালার ওপারের অন্ধকারের ভেতর থেকে।

থাকতো না? লুসি আবার জিজ্ঞাসা করলো, তাকে টেনে আনলো ঘরের ভেতর, টেবিলের ওপরে রাখা ল্যাম্পের কোমল আলোর বৃত্তের মধ্যে, যেখানে ধরা ছিলো বিশাল বাইবেল আর বর্ণাঢ্য বাঁধাই করা এ্যালবামখানা। চীনামাটির ল্যাম্পের গাঁয়ে আঁকা ছিলো একগুচ্ছ ভায়োলেট ফুল।

আবার লুসি জিজ্ঞাসা করলো, থাকতো না?

এবং ও উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ টের পেলাম যে আমি কান পেতে শুনছি বাইরে অন্ধকার ঘাসের বুকে পাগলের মতো ডাকতে থাকা ঝিঁঝি পোকার একটানা শব্দ।

এবার উইলি বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা জোচ্চোর তো থাকতোই। সে তার চেয়ারে এমনভাবে নড়ে উঠে কথাটা বললো যেন নিজের চিন্তাধারায় বাধা পড়ার ফলে বিরক্ত হয়েছে।

তারপর আবার সে তার নিজের ভাবনার গভীরে ডুবে গেলো।

লুসি পাখির মতো একটা প্রত্যয়ী ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে আমার দিকে তাকালো যেন আমার কাছে সে একটা কিছু প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছে। তার মুখে আলোর বৃত্তের বাইরের ভিন্ন একটা আভা ফুটে উঠেছে। ইচ্ছে করলে আমি ভাবতে পারতাম যে ওই কোমল আভার উৎস তার নিজেরই মুখ, যেন তার অস্থিমজ্জামাংসের ভেতর থেকে ওই মৃদু, অনির্বাণ, স্নিগ্ধ ফসফরাসের মতো দ্যুতি উৎসারিত হচ্ছে।

তো লুসি ছিলো একজন রমণী, আর যেভাবে রমণীরা অপূর্ব হয়ে ওঠে সেই একই ভাবে সেও অপূর্ব হয়ে উঠেছিলো। সে আমার দিকে এমন একটা ভাব করে তাকালো যেন বলতে চাইছে, দেখলে তো, আমি তো তোমাকে বলেইছিলাম, ব্যাপারটা হলো এই।

আর উইলি ওখানে চুপচাপ বসে থাকলো। মনে হলো তার মুখ আবার দূরে চলে গেছে, যা ঠিক দূরত্ব নয়, বরং বলা যেতে পারে তার নিজেরই অন্তর্লীন সত্তার কাছে।

এখন লুসি মুখ নিচু করে কাপড়ের দিকে তাকিয়ে সেলাই করতে করতে আমার সঙ্গে কথা বলছে। একটু পরেই উইলি উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করলো। সামনের দিকের চুলের একটা গুচ্ছ তার চোখের উপর ঝুলে পড়েছে। উইলি পায়চারী করে যেতে লাগলো, আর লুসি আর আমি কথা বলতে থাকলাম।

এই ভাবে ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি একজন পায়চারী করতে থাকলে সেটা খুব স্বস্তিকর হয় না।

অবশেষে লুসি তার সেলাইর উপর থেকে মুখ তুলে ডাকলো, মণি —

উইলি পায়চারী থামিয়ে চোখের উপর ঝুলন্ত চুলসহ তার মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লুসির দিকে তাকালো, যেন একটা বদমেজাজী ঘোড়াকে বেড়ার ভেতর কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে, মাথাটা একটু নিচু করে কানের দু'পাশের কেশর সামনে ঝাঁকিয়ে চতুর বুনো চোখ মেলে ওই ঘোড়া আপনাকে তার দিকে লাগাম

হাতে এগিয়ে আসতে লক্ষ করছে আর ছুট লাগাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

লুসি বললো, একটু স্থির হয়ে বসো, মণি। তুমি আমাকে নার্ভাস করে দিচ্ছো। তুমি এক্কেবারে টমির মতো, একটুও স্থির থাকতে পারো না। বলেই লুসি হেসে ফেললো, আর উইলিও মুখে এক ধরনের লাজুক হাসি ফুটিয়ে কাছে এসে বসে পড়লো।

চমৎকার মেয়ে লুসি। তার মতো মেয়েকে বউ হিসাবে পাওয়া একটা পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু শেরিফ আর ডল্‌ফ্ পিল্‌স্‌বেরিকে যে সে পেয়েছিলো তাও ছিলো তার সৌভাগ্য। অবশ্য সেসময় উইলি জানতে পারে নি যে ওরা ছিলো তার সৌভাগ্য। কিংবা তার অস্তিত্বের অত্যাবশ্যক অংশটি হয়তো একথা আগাগোড়াই জানতো, কিন্তু সে খবর তার অন্যান্য অগুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির কাছে তখনো পৌঁছায় নি। অথবা এটাও সম্ভব যে উইলি স্টার্কের মতো মানুষরা ভাগ্যের বৃত্তের বাইরে জন্মগ্রহণ করে, ভালো বা মন্দ, এবং আমি–আপনার মতো মানুষরা, যাদের ক্ষেত্রে ভাগ্যই প্রধান নিয়ন্তা, উইলিদের ক্ষেত্রে ভাগ্য সেজাতীয় কোনো ভূমিকা পালন করে না, মাতৃগর্ভে প্রথম পা ছোঁড়ার মুহূর্ত থেকেই তারা যা তারা তাই–ই, তখন থেকে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আর ব্যাপারটা যদি তাই হয়, তাহলে তাদের জীবন–ইতিহাস হচ্ছে তারা যথার্থ কি সেটা আবিষ্কারের একটি প্রক্রিয়া মাত্র, আমি–আপনার মতো যারা ভাগ্যের সন্তান, ভাগ্য যাদের তৈরি করে, সেটা আবিষ্কার করা নয়। এবং সেক্ষেত্রে লুসি উইলির ভাগ্য নয়। তার অ–ভাগ্যও নয়। যে-প্রক্রিয়া ও পরিবেশের মধ্যে সত্যিকার উইলি গড়ে উঠছিলো লুসি সেটা আবিষ্কারের একটা অংশ মাত্র।

কিন্তু, স্থূলভাবে বলতে চাইলে, শেরিফ আর পিল্‌স্‌বেরি ছিলো উইলির সৌভাগ্য। সেদিন রাতে ওর বাবার বসবার ঘরে আমি এটা উপলব্ধি করি নি, পরে শহরে ফিরে এসে জিম ম্যাডিসনকে যখন আমার প্রতিবেদন দিই তখনো না। তো উইলি ক্রনিক্‌লের পাতায় জাহাজের জ্বলন্ত ডেকের উপর দাঁড়ানো বীর বালকের ভূমিকায় আবির্ভূত হতে শুরু করলো, অন্যায়ের প্রতিরোধে অকুতোভয়, কর্তব্য যখন ফিসফিস করে বলে 'তোমাকে করতেই হবে', তখন যে অসঙ্কোচে বলে 'আমি পারবো'। ক্রনিকল কাউন্টির আদালতগুলিতে যে ব্যাপক দুর্নীতি, জালিয়াতি, জোচ্চুরি চলছিলো, সমস্ত রাজ্য জুড়ে, তার কাহিনী একের পর এক প্রকাশ করে চললো। সমস্ত মানচিত্রের বিরুদ্ধে ক্রনিকল ঘৃণা ও তিরস্কারের আঙ্গুল তুলে ধরলো। আর তখন জিম ম্যাডিসনের টেবিলের ওপরে উচ্চতর স্তরে যেসব কারণ ও যুক্তি

কাজ করে আমি তার তাৎপর্য কিছুটা বুঝতে শুরু করি, সেখানে সঞ্চরমান মায়াবী রেশমী ডানার দ্যুতি তখন আমার চোখে পড়ে, আমি শুনতে পাই ওই উচ্চস্তরে ক্ষীণ বাঁশির মতো দেবদূতদের ফিসফিস কণ্ঠস্বর। সংক্ষেপে তা হল এই ঃ রাজ্যের সরকারী যন্ত্রে যে মধুর ঐক্য ও সুষমা ছিলো তা এখন অতীতের বস্তু, এবং ক্রনিক্‌ল্ এখন বিরোধী ও বিক্ষুব্ধদের পক্ষে, আর ওই যন্ত্রের কাউন্টি অবকাঠামোকে তুলোধুনো করে দিতে সে বদ্ধপরিকর। সেখান থেকেই সে শুরু করেছে, একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে, মঞ্চ সাজাচ্ছে, আসল খেলার জন্য পেছনের পর্দা তৈরি করছে। কাজটা যতো কঠিন হতে পারতো ততো কঠিন হয় নি। সাধারণতঃ কাউন্টি কোর্টহাউসের মফস্বলের ক্ষুদে কর্মকর্তারা ভীষণ ধূর্ত হয়, শয়তানীর সব কলকব্জা থেকে তাদের নখদর্পণে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে কোনোরকম যথার্থ বিরোধিতা ছাড়া তাদের কীর্তিকলাপ চালিয়ে যাবার ফলে তারা জীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। সতর্ক এবং সাবধান হবার কোনো তাগিদই তারা অনুভব করে নি। ফলে ক্রনিক্‌ল চমৎকারভাবে তার কাজ করতে সক্ষম হলো।

মেসন কাউন্টি হয়ে দাঁড়ালো এক্সিবিট নম্বর ওয়ান। উইলির কারণে। কদর্য কাহিনীর মধ্যে সে একটা নাটকীয়তার স্পর্শ নিয়ে এলো। রুদ্ধবাক সৎ মানুষদের প্রতীকী মুখপাত্র হয়ে উঠলো উইলি। আর মেসন কাউন্টির নির্বাচনে যখন উইলি হেরে গেলো তখন ক্রনিক্‌ল তার ছবি ছাপালো, ছবির নিচে লিখলো ঃ সে বিশ্বাস। ঘাতকতা করে নি। নির্বাচনের পর, উইলি যখন পরাজিত, আমি মেসন সিটিতে গেলে উইলি আমাকে একটি বিবৃতি লিখে দিয়েছিলো। ক্রনিক্‌ল তার ছবির নিচে ওই বিবৃতি ছেপে দিলো। বিবৃতিটি ছিলো এই রকম ঃ

"কোনো সন্দেহ নেই, কাণ্ডটা তারা ঘটিয়েছে, এবং খুবই নিপুণতার সঙ্গে। আমি তাদের নৈপুণ্যের প্রশংসা করি। এখন আমি আমার বাবার খামারে ফিরে যাচ্ছি, সেখানে গরুর দুধ দুইবো, এবং আরো বেশ কিছু আইনের বইপুঁথি পড়বো। আমার মনে হচ্ছে আমার সেটা দরকার হবে। তবে মেসন কাউন্টির জনগণের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। সময় সব কিছু প্রকাশ করবে।"

উইলির কি বলবার আছে আমি সেটা জানবার জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু আমাকে খামারে যেতে হয় নি। মেসন সিটির রাস্তাতেই ওর সাথে আমার দেখা হয়ে যায়। বেড়া বাঁধতে গিয়ে তার টানার যন্ত্রটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, আর তাই নতুন একটা কেনার জন্য সে শহরে এসেছিলো। তার মাথায় ছিলো কালো পশমের টুপী আর পরনে ঢোলা আলখাল্লা, অনেকটা ঝুলে পড়েছে, যেন একটা বাচ্চা ছেলে দোলনায় দাঁড়িয়ে মুখ তুলে হাসছে।

আমরা ড্রাগস্টোরে গিয়ে কোক খেলাম। সোডা ফাউন্টেনের সামনে দাঁড়িয়ে উইলির জীর্ণ টুপীর পাশে আমার প্যাড রেখে আমি তার হাতে পেন্সিল গুঁজে দিলাম। সে জিভ দিয়ে পেন্সিলের মাথা ভিজিয়ে নিলো, তার চোখ দুটি চকচক করে উঠলো, যেন স্লেটের উপর সে অঙ্ক করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তারপর কাউন্টারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। তার আলখাল্লা আবার নিচু হয়ে ঝুলে পড়লো আর উইলি বড়ো গোল গোল অক্ষরে তার বিবৃতিটি লিখে দিলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লুসি কেমন আছে?

খুব ভালো। ওখানে বেশ ভালো আছে লুসি। বাবার একজন সঙ্গী হয়েছে। তারও ভালো লাগছে।

আমি বললাম, বাঃ, খুব ভালো।

আমার দিকে না তাকিয়ে, ওপাশের বড়ো আয়নায় নিজের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে উইলি বললো, আমিও ভালো আছি। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আমি ওখানেই বেশ আছি।

আবার সে আয়নায় নিজেকে দেখলো। ভরাট মাংসল মুখ কিন্তু সে মুখের চামড়া পাতলা, মুখে ছোট ছোট দাগ, মাথার সামনের দিকে ঝাঁকড়া চুলের গোছা। তার মুখ প্রশান্ত। সে মুখে একটা নিষ্কলুষ স্নিগ্ধতা আছে, যেন একটি লোক শেষ টিলাটা পার হয়ে তার চোখের সামনে দীর্ঘ প্রসারিত সোজা রাস্তাটি লক্ষ করছে, কোথায় যাচ্ছে তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

যদি এমন কথা বলা যায় যে উইলির মতো মানুষ ভাগ্যের জগতে বাস করে, তা হলে বলতে হয় যে ডল্ফ্ পিল্স্বেরি আর শেরিফই ছিলো তার ভাগ্য। তারা উইলিকে ধরাশায়ী করে জে. এইচ. মুরকে দিয়ে স্কুলভবনটি বানায়। জে. এইচ. মুর যে ভাঁটির ইট ব্যবহার করে তার মালিক ছিলো পিল্স্বেরির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বড়ো বাক্সের মতো একটা স্কুলভবন নির্মিত হলো, হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের সময় পালাবার জন্য দুদিকে দুটি পথ রাখা হলো। সাইলোর মতো নয়। কর্ক-স্ক্রুর আকারে, কোনো সুড়ঙ্গ বানানো হলো না যার মধ্য দিয়ে বাচ্চারা গড়িয়ে হুড়হুড় করে বেরিয়ে যেতে পারে। তার জায়গায় দালানের বাইরের দিকে লাগিয়ে দেওয়া হলো লোহার সিঁড়ি।

স্কুলভবনে কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটে নি। শুধু অগ্নিকাণ্ডের একটা মহড়া হয়।

ভবনটি নির্মিত হবার দু'বছর পরে কাণ্ডটি ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের মহড়া শুরু হবার পর দোতলার বাচ্চারা নির্ধারিত নিষ্ক্রমণ পথ ব্যবহার করতে শুরু করে। পশ্চিম প্রান্তের প্রথম যে ছাত্রের দল নামতে শুরু করে তারা ছিলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে,

তারা খুব দ্রুত নামতে পারিছলো না। তাদের একেবারে পেছন পেছন এলো বড়ো ছেলেমেয়েদের দল, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। বাচ্চাদের কারণে গতিপথ রুদ্ধ হওয়ায় সিঁড়ি আর উপরের লোহার পাটাতনে ছেলেমেয়ের ভীড়ে প্রচণ্ড ঠাসাঠাসির অবস্থা সৃষ্ট হয়। তো প্রথমে দেয়ালের কিছু অংশ খসে পড়লো, আর যে যেসব কব্জা আর পাত দিয়ে দেয়ালের গায়ে সিঁড়ি সাঁটানো ছিলো সেসব আলগা হয়ে গেলো, সমস্ত জিনিসটা ধ্বসে পড়লো, বাচ্চারা ছিটকে পড়ে গেলো চতুর্দিকে।

ঘটনাস্থলেই তিনটি বাচ্চা মারা গেলো। ওরা নিচের কংক্রিটের উপরে গিয়ে পড়েছিলো। প্রায় জন বারোর হাত পা বিশ্রীভাবে ভেঙ্গে যায়, পরে তাদের কয়েকজন আর কখনোই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে নি।

ঘটনাটি উইলির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে। অবশ্য উইলি নিজে থেকে কোনো চেষ্টা নেয় নি। তার দরকারই পড়ে নি। মানুষ ঘটনার মর্মার্থ ঠিকই বুঝে নিয়েছিলো। শহরে নিহত শিশু তিনটির যে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান হয় উইলি তাতে যোগ দেয়। সে সবিনয়ে পেছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিলো। কিন্তু নিহত বাচ্চাদের একজনের বৃদ্ধ পিতা মিঃ সানডিন তাকে দেখতে পেয়ে ভীড় ঠেলে তার কাছে এগিয়ে যান। তখনো কবরে ভালো করে মাটি দেয়া শেষ হয় নি। তিনি উইলির হাত ধরে মাথার উপর উঁচু করে তুলে চিৎকার করে বলে উঠলেন, ওহ্ ভগবান, অন্যায়কে আমি মেনে নিয়েছিলাম, একজন সৎ লোকের বিরুদ্ধে আমি ভোট দিয়েছিলাম, তার শাস্তি আমি পেয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হলো। কয়েকজন মহিলা কাঁদতে শুরু করলো। তারপর একে একে অন্যরা এগিয়ে এসে উইলির হাত আঁকড়ে ধরলো। দেখতে দেখতে সমাবেশে কারো চোখ আর শুষ্ক থাকলো না। উইলিরও না।

এটা ছিলো উইলির সৌভাগ্য। তবে সর্বোত্তম সৌভাগ্য তাদের কপালেই জোটে যাদের তা দরকার হয় না।

এর পর মেসন কাউন্টি তার হাতের মুঠোয় চলে এলো। শহরে সবগুলি খবরের কাগজে তার ছবি উঠলো। কিন্তু উইলি কোনো পদপ্রার্থী হলো না। সে তার বাবার খামারে কাজ করতে থাকলো আর রাত জেগে আইনের বই-এর পাঠ চালিয়ে গেলো। রাজনীতির অঙ্গনে শুধু একটাই কাজ করলো সে। প্রাইমারি নির্বাচনে পিল্‌স্‌বেরির দীর্ঘদিনের স্যাঙাত যে কংগ্রেসম্যান দাঁড়িয়েছিলো তার প্রতিপক্ষের সমর্থনে উইলি কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিলো। তার বক্তৃতা খুব একটা ভালো হয় নি, অন্ততঃ আমি যেগুলো শুনেছি সেগুলো তেমন সুবিধার হয় নি। কিন্তু বক্তৃতা ভালো হবার দরকার ছিলো না। মানুষ তার কথা শুনতে আসেনি। তারা ভীড় করে

এসেছিলো উইলিকে দেখতে, তাকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে, আর পিল্‌স্‌বেরির লোকের বিরুদ্ধে ভোট দিতে।

তারপর হঠাৎ একদিন উইলি জেগে উঠে দেখলো যে সে গভর্নরের জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে। মানে, সে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে অংশগ্রহণ করছে। আমাদের স্টেটে সেটা করা আর গভর্নরের জন্য দাঁড়ানো ছিলো একই কথা।

অবশ্য প্রাইমারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে তেমন অসাধারণ কৃতিত্বের কিছু ছিলো না। নির্ধারিত ফী জমা দেবার মতো অর্থ যোগাড় করতে পারলে যে কোনো ব্যক্তিই নির্বাচনে দাঁড়াতে পারতো এবং ব্যালট পেপারে নিজের নাম মুদ্রিত দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারতো। কিন্তু উইলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিলো একটু আলাদা।

সে সময় রাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে দু'টি প্রধান দল ছিলো, জো হ্যারিসনের দল আর ম্যাকমারফির দল। কিছু কাল আগে গভর্নর ছিলো হ্যারিসন, তারপর আসে ম্যাকমারফি, এখন ম্যাকমারফি আবার পদটি ধরে রাখতে চাইছে। হ্যারিসন ছিলো শহরের মানুষ, তার সমর্থন প্রায় সর্বাংশে আসতো শহরের মানুষদের কাছ থেকে। ম্যাকমারফি ঠিক মফস্বলের গেঁয়ো মানুষ ছিলো না, জন্মেছিলো ডুবোয়ভিলে, বড়োও হয় সেখানে, আর ডুবোয়ভিল ছিলো বেশ মাঝারি আকারের জায়গা, জনসংখ্যা নব্বুই হাজারের মতো, তবে ম্যাকমারফির পেছনে ছিলো গ্রামাঞ্চল ও ছোট শহরগুলির মানুষের জোরালো সমর্থন। সে চাতুর্যের সঙ্গে ওদের আঞ্চলিক বাচনভঙ্গী ব্যবহার করতো। বহুলাংশে তার নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিও ছিলো তাই। এবার নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। এবং ওই পরিস্থিতিই উইলিকে ঘটনার মধ্যে টেনে নিয়ে এলো।

হ্যারিসন গোষ্ঠীর একজনের মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলে গেলো যে একটা ডামি বা পুতুলপ্রার্থী দাঁড় করালে ম্যাকমারফির কিছু ভোট কেটে নেয়া যায়। অবশ্য, ঈশ্বর জানেন, এটা খুব একটা নতুন ভাবনা নয়। এক্ষেত্রে এমন একজনকে দাঁড় করাতে হবে গ্রামীণ মফস্বল অঞ্চলে যার জোরালো আকর্ষণ আছে। কাজেই উইলি। সে স্টেটের উত্তর দিকটায় বেশ কার্যকর হবে। উইলির সঙ্গে কোনো সমঝোতা বা ডীল হয় নি। সেটা আপনার থেকেই গড়ে ওঠে। রাজধানী শহর থেকে ডোরাকাটা চমৎকার প্যান্ট পরা কয়েকজন ভদ্রলোক সুন্দর একটা গাড়িতে চড়ে মেসন সিটিতে উইলির সঙ্গে দেখা করতে এলো। তাদের একজন ছিলো মিঃ ডাফি, টাইনি ডাফি। সেদিন স্লেডের বীয়ারের দোকানের পেছনের বসবার ঘরে যখন ডাফি আর উইলির প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখনকার ডাফির চাইতে বর্তমানের ডাফি দেখতে অনেক বেশি ভারিক্কী ও মর্যাদাসম্পন্ন। রাজধানী থেকে আসা ভদ্রলোকরা উইলিকে বোঝালো যে

সে-ই রাজ্যের ত্রাণকর্তা। আমার মনে হয় সাধারণতঃ মানুষের যে একটা স্বাভাবিক সন্দেহ ও সাবধানতা থাকে উইলিরও তা ছিলো, কিন্তু আপনি যা শুনতে চান লোকে যখন তা বেশ জোরের সঙ্গে বলে তখন ওই সন্দেহ-সাবধানতা দ্রুত উবে যায়। উপরন্তু, এখানে ঈশ্বরের একটা ছোট্ট ব্যাপার ছিলো। লোকেরা বলতো যে স্কুলভবনের ব্যাপারটায় ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেছিলেন। বলতো যে ঈশ্বর উইলির পক্ষে নেমেছিলেন। ঈশ্বর উইলির অবস্থানের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। উইলি এমনিতে যে খুব একটা ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলো তা নয়, কিন্তু স্কুলবাড়ির ব্যাপারটা তার মনে একটা ধারণা জাগিয়ে তুলেছিলো — এবং স্থানীয় বহু লোকও তাই মনে করতো — যে ঈশ্বর বা নিয়তি বা নির্ভেজাল সৌভাগ্যের সঙ্গে উইলির একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। আপনি তাকে যে নামেই ডাকুন কিচ্ছু এসে যায় না। আপনি গীর্জার যান বা না যান, তাতেও কিছু এসে যায় না। এবং যেহেতু ঈশ্বরের কর্মপদ্ধতি রহস্যময় সেইহেতু তিনি যে তাঁর ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত কতিপয় ডোরাকাটা প্যান্ট পরা, গাড়িতে চড়ে আসা, স্থূলদেহ মানুষকে ব্যবহার করবেন সেটা উইলিকে বিস্মিত করলো না। ঈশ্বর উইলিকে আহ্বান করেছেন, এবং সেই আহ্বান নিয়ে সাইকেলে চড়ে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের এক ডাক-পিওনের পরিবর্তে দামী পোশাক পরে ক্যাডিলাকে চড়ে টাইনি ডাফি এসেছে, এই যা। উইলি শুধু সই করে রসিদ দিয়ে চিঠিটা গ্রহণ করলো।

উইলি তৈরি ছিলো। এখন সে একজন আইনজীবী। কিছু কাল ধরেই তাই। কাউন্টি ট্রেজারারের পদে নির্বাচনে হেরে যাবার পর সে খামারের কাজকর্ম ও তার ফিক্স-ইট-হাউসহোল্ডের বাক্স ফিরি করে বেড়াবার শেষে বাকী যে সময় হাতে থাকতো তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আইনের গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যয় করেছিলো। সে গরমের দিনে অনেক রাত পর্যন্ত নিজের ঘরে বসে বই-এর পাতায় চোখ লাগিয়ে এক মনে পড়ে যেতো, তার চোখ ঘুমে ভেঙে আসতো কিন্তু সে ক্ষান্ত দিতো না, আর বাইরের পোকাগুলো জানালার পর্দার গায়ে এসে ধাক্কা দিতো, তার টেবিলের উপর যে তেলের প্রদীপ মৃদু শব্দ করে জ্বলতো তার শিখায় আত্মাহুতি দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতো। অথবা শীতের রাতে তার মরচে পড়া শস্তা স্টোভের আগুন নিভে যাবার পরও, যখন বাড়ির উত্তর দিকে হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে আসা বাতাস প্রবল বেগে ধাক্কা দিতো, উইলির ঘরটা কাঁপিয়ে তুলতো, তখনো সে বই-এর উপর মুখ গুঁজে একমনে পড়ে চলতো। বহু আগে, লুসির সঙ্গে দেখা হবারও অনেক আগে, পার্শ্ববর্তী মার্স্টন কাউন্টির ব্যাপ্টিস্ট কলেজে সে এক বছর পড়েছিলো। ওই কলেজ আসলে একটা ফাঁপানো গ্রেড স্কুলের চাইতে বেশি কিছু ছিলো না, তবু

ওখানেই সে বড়ো বড়ো কেতাবে লেখা বড়ো বড়ো নামগুলি শোনে। কিন্তু অর্থাভাবের কারণে ওই নামগুলি মাথায় নিয়েই তাকে কলেজ ছাড়তে হয়। তারপর যুদ্ধ শুরু হলে সে যুদ্ধে যায়, ওকলাহোমার এক ক্যাম্পে দিনের পর দিন কাটায়, ভাবে যে সে প্রবঞ্চিত হয়েছে, একটা সুযোগ হারিয়েছে। তারপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তার বাবার ওখানে কাজ করতে থাকে সে, আর রাতের বেলায় পড়তে থাকে বই-এর পর বই, শুধু আইনের বই নয়, যে বই হাতের কাছে পেয়েছে তাই। দেশের ইতিহাসটা জানতে চেয়েছে সে। কলেজের একটা পাঠ্যবই ছিলো তার কাছে। একটা বড়ো মোটা বই। বহু বছর পরে ওই বইটা আমাকে দেখিয়ে সে বলেছিলো, জানো, আমি এই বই-র প্রায় প্রতিটি শব্দ মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। প্রতিটি নাম আমি তোমাকে বলতে পারতাম। প্রতিটি তারিখ।

তারপর পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বইটাতে আরেকটা খোঁচা মেরে সে বলেছিলো, আর যে ব্যাটা ওই বই লিখেছিলো সে কিচ্ছু জানে না। আমি বাজী রেখে বলতে পারি সব কিছু তখন যেমন ছিলো এখনো তেমনই আছে। একগাদা লোক কামড়া-কামড়ি করছে।

কিন্তু বড় বড় নামগুলিও ছিলো। কাপড়ে বাঁধাই একটা বড়ো নোটবই ছিলো তার। বই-এ পড়া চমৎকার কিছু বাণী, ভাবনা, আর আদর্শের কথা সে ওখানে লিখে রাখতো। অনেক কাল পরে সে ওই নোটবই-ও আমাকে দেখিয়েছিলো। আমি আনমনে তার পাতা উল্টেছি, দেখেছি এমারসন, মেকলে, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন আর শেকস্পীয়রের উদ্ধৃতি, ওর গোটা গোটা বালকের হস্তাক্ষরে লেখা। ওই নোটবই দেখিয়ে একই রকম অমায়িক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে আমাকে বলেছিলো, জানো, সেই সময় আমি ভাবতাম জানবার মতো যা কিছু আছে সব বুঝি ওই সব লেখকরা জানে। আমি ঠিক করেছিলাম তার একটা বড়ো অংশ আমিও আয়ত্ত করবো। মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে হলেও তাই করবো আমি।

সে হেসে ফেললো, তারপর যোগ করলো, হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম আমি বুঝি মস্ত একটা কেউকেটা।

উইলি সব কিছু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা আয়ত্ত করতে পারলো তা হলো কিছু আইনের জ্ঞান। প্রথমে আবির্ভূত হলো লুসি, তারপর বাচ্চা টম, সেই সঙ্গে কাজ, তারও পরে কোর্টহাউস, কিন্তু শেষ অবধি আইনের জ্ঞান সে ঠিকই লাভ করলো। টাইরির এক বৃদ্ধ আইনজীবী তাকে খুব সাহায্য করেছিলো, বই ধার দিয়েছিলো, তার বহু জিজ্ঞাসার উত্তর যুগিয়েছিলো। ওই ভাবে কেটে যায় তিন বছর। সে যদি কেনো রকমে পরীক্ষায় পাস করতে চাইতো তাহলে এর চাইতে

অনেক অল্প সময়েই তা করতে পারত। তখনকার দিনে, বস্তুতঃপক্ষে, এখনকার দিনেও, আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য খুব একটা ধীশক্তির দরকার হয় না। সে সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উইলি একবার আমাকে বলেছিলো, আমি সত্যি বোকা ছিলাম। আমি ভাবতাম যে ওই সব জিনিস বুঝি সত্যিই শেখা দরকার। আমি ভাবতাম ওরা যথার্থই চায় যে তুমি আইনটা ভালো করে শেখো। কিন্তু, যাচ্ছেলে, পরীক্ষা দিতে বসে প্রশ্নপত্রের দিকে তাকিয়েই আমি প্রায় হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। কী কষ্ট করে আমি রাতের পর রাত ওই বইগুলি পড়েছি, আর এখন ওরা এই সব তুচ্ছ আজেবাজে প্রশ্ন দিয়েছে আমাকে ! বানান করতে জানলে একটা নিগ্রো ক্ষেতমজুরও এগুলির উত্তর দিতে পারতো। আমার পরিচিত উকীলদের আমার আরেকটু ভালো করে লক্ষ করা উচিত ছিলো, তা হলেই আমি বুঝতাম যে একটা হাবাও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হতো। কিন্তু, না, আমি আইনের জ্ঞান ভালো করে রপ্ত করার জন্য ক্ষেপে গিয়েছিলাম।

সে হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে কঠিন শীতল ভঙ্গিতে পরের কথাক'টি বললো। দীর্ঘ রাত জেগে, বাজে একটা স্টোভের পাশে বসে, সে যখন নিজের ঘরে আইনের বই পড়তো কিংবা অগাস্টের অন্ধকার রাতে জানালার পর্দায় আলোর পোকার হুমড়ি খেয়ে পড়ার কোমল শব্দ শুনতো, এই শীতল কঠিন ভঙ্গি ছিলো সেই সময়কার। সে বললো, তো, কিছু আইনের জ্ঞান আমি ঠিকই রপ্ত করি। আমার তাড়া ছিলো না। আমি স্থির করেছিলাম যে আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবো।

ধৈর্য ধরে সে অপেক্ষা করে ছিলো। টাইরির বৃদ্ধ উকীলের কাছে যেসব বই ছিলো সে সেগুলি সব পড়ে ফেললো। তারপর জমিতে কাজ করে কিংবা সাংসারিক দ্রব্যসামগ্রী মেরামতির জন্য পেটেন্ট করা যন্ত্রপাতি ফিরি করে সে যে টাকা রোজগার করলো তা দিয়ে ডাকযোগে নতুন আইনের বই কিনলো. তারপর যখন সময় হলো তখন সে তার ভালো স্যুটটা গায়ে চড়ালো, নীল সার্জের, পাছার কাছটায় চকচকে হয়ে গেছে, তারপর ট্রেন ধরে পরীক্ষা দেবার জন্য শহরে গেলো। সে অপেক্ষা করেছিলো, এবং এখন সে সত্যি সত্যি জানে বইগুলিতে কি আছে।

আর এখন সে একজন আইনজীবী। এখন তার আলখাল্লা পেরেকের মাথায় ঝুলে থাকতে পারে, তার যে-ঘাম সে ওখানে ঝরিয়েছে সেই ঘামের শেষ বিন্দু এখন তার মধ্যে জমে শক্ত কাঠ হয়ে উঠতে পারে। সে মেসন সিটিতে একটি দোকানের উপর একখানা ঘর ভাড়া নিলো, সেটাকে তার আপিস বানালো, আর অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে তার কাছে লোক আসার জন্য অপেক্ষা করলো। ওই সিঁড়ি ছিলো এতো অন্ধকার যে অনুভব করে করে উঠতে হতো, আর তার গন্ধ, বিশ বছর ধরে গুদামে

পড়ে থাকা ট্রাঙ্কের ভেতরে যেমন গন্ধ হয় ওই সিঁড়িপথের গন্ধ ছিলো সেই রকম। কিন্তু এখন সে একজন উকীল, আর এই উকীল হতে অনেক দিন লেগেছে তার। কারণ সে তার নিজের হিসেব মতো, নিজের মতো করে, উকীল হতে চেয়েছিলো। কিন্তু সে-পর্ব এখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু, কে জানে, হয়তো বড়ো বেশি সময় নিয়েছে সে। যদি কোনো কিছু করতে আপনি বড়ো বেশি সময় নেন তাহলে হয়তো আপনার ভেতরে কিছু একটা ঘটে যায়, আপনি আপনার সর্বস্ব নিয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটি হয়ে যান, আর কিছুই না, কারণ আপনি তার জন্য বড্ড বেশি মূল্য দিয়ে ফেলেছেন, আপনার আকাঙ্ক্ষায়, আপনার প্রতীক্ষায়, আপনার প্রাপ্তিতে। আর এত সবের পরে কিনা আপনাকে ওরা ওই সব তুচ্ছ বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে!

কিন্তু এখন চাওয়া আর অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে। উইলি চুল ছেঁটেছে, নতুন টুপী মাথায় দিয়েছে, হাতে নিয়েছে নতুন ব্রীফকেস, তার মধ্যে তার বক্তৃতার প্রতিলিপি (নিজের হাতে সে ওই বক্তৃতা লিখেছে, হাত পা নেড়ে লুসির সামনে পরিবেশন করেছে, যেন হাইস্কুলের বক্তৃতা প্রতিযোগিতার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে), আর তার সঙ্গে আছে একগাদা নতুন বন্ধু, তাদের নীল চিবুক ঝুলে পড়েছে, পাণ্ডুর তীক্ষ্ণ নাক তাদের, উইলির পিঠ চাপড়ে দেয় তারা, আর আছে তার নির্বাচনী অভিযানের ম্যানেজার টাইনি ডাফি, যে উইলিকে একটা ঝলমলে হৃদ্যতার সঙ্গে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে, বলবে, এই যে, উইলি স্টার্কের সঙ্গে পরিচিত হ'ন, এই স্টেটের আগামী গভর্ণর। আর উইলি বিশপের গাম্ভীর্য নিয়ে তার হাত বাড়িয়ে দেবে। সে চক্রান্তের এক রত্তিও বুঝতে পারে নি।

আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি কেমন করে সে ও রকম হতে পারলো। সে যদি মেসন কাউন্টিতে কোনো পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াতো তাহলে কক্ষনো এরকম হতো না। তখন সমস্ত ব্যাপারটা সে কঠিন বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতো, নিজের সম্ভাবনা সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করতে পারতো। কিংবা সে যদি নিজের তাগিদে, নিজে থেকে, গভর্ণর পদের জন্য প্রাইমারিতে দাঁড়াতো তাহলেও সে পরিস্থিতির একটা বাস্তব চিত্র দেখতো। কিন্তু এটা তো ছিলো ভিন্ন জিনিস। সে যে ডাক পেয়েছে। সে তো স্পৃষ্ট। তার কাছে আহ্বান এসেছে। এবং এর ফলে সে কিছুটা ত্রস্তও। টাইনি ডাফি আর তার বন্ধুদের দিকে এক নজর তাকিয়েই সে যে বুঝতে পারে নি এর মধ্যে একটা চক্রান্ত আছে, এটা রীতিমত অবিশ্বাস্য। কিন্তু, পরে ভেবে দেখে, আমার মনে হয়েছে যে এটা অবিশ্বাস্য নয়। কারণ টাইনি ডাফির যে কণ্ঠস্বর তাকে আহ্বান করে নিয়ে এসেছে তা আর কিছুই নয়, তার নিজের ভেতরকার একটা নিশ্চয়তা, একটা

অন্ধ তাগিদ, সেই বস্ত যা তাকে তার ঘরে রাতের পর রাত জাগিয়ে রেখেছে, যার তাড়নায় সে চোখ থেকে ঘষে ঘষে ঘুম মুছে ফেলেছে, তার বড়ো খাতায় চমৎকার সব বাণী আর আদর্শের কথা টুকে রেখেছে, কিংবা একটা হিংস্র, প্রায় শারীরিক, তীব্রতা নিয়ে পুরানো আইনের বই-এর হলুদ পাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে। রাত্রির অন্ধকার থেকে কোনো কণ্ঠস্বর একজন সন্তকে আহ্বান করলে তার পক্ষে সে আহ্বান অস্বীকার করা যতোখানি কঠিন হতো উইলির পক্ষেও টাইনি ডাফির আহ্বান অস্বীকার করা ততখানিই কঠিন ছিলো।

আসলে পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিলো না। সে যে শুধু ওই আহ্বান শুনেই মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলো তাই নয়। তার অভীষ্ট পদের মাহাত্ম্য এবং ঔজ্জ্বল্যও তাকে মোহাচ্ছন্ন করেছিলো। ওই আলোর তীব্র দ্যুতি তাকে অন্ধ করে ফেলেছিলো। মনে রাখতে হবে যে সে সবে মাত্র অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। দিনের পর দিন সে খামারে কাজ করেছে, নিজের পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কোনো মানুষ দেখে নি (তাদের সঙ্গেও সে এমনভাবে মিশেছে যেন তারাও পুরোপুরি বাস্তব জগতের নয়), রাত কাটিয়েছে নিজের ঘরে বই-এর উপর মুখ গুঁজে, আর তার ভেতরকার প্রয়াস, অন্বেষণ, প্রতীক্ষা তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। তাই ওই আলোর দ্যুতি যে তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো সেটা খুব বিস্ময়ের বিষয় নয়।

তবে মানবচরিত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তার ঠিকই ছিলো। কাউন্টি কোর্টহাউসে কাজ করে সে একটা জিনিস শিখেছিলো। (কোর্টহাউসের চাকুরি তার চলে যায়, সে কথা সত্য, কিন্তু মানব চরিত্র সম্পর্কে তার অজ্ঞতার জন্য সেটা ঘটে নি। হয়তো এর মূলে ছিলো সাধারণভাবে মানবচরিত্র ও স্বভাব সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নয়, বরং তার নিজের বিশেষ চরিত্র ও স্বভাব সম্পর্কে একটা উপলব্ধি, একটা জিনিস যা ন্যায়-অন্যায়ের চাইতে গভীর। সে অজ্ঞতার জন্য শহীদ হয় নি, শুধু ন্যায়ের জন্য সে শহীদ হয় নি, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ছাড়িয়ে নিজের সম্পর্কে একটা উপলব্ধি ও জ্ঞানের জন্যও সে শহীদ হয়ে ছিলো।) মানব চরিত্র সম্পর্কে তার কিছু জ্ঞান ছিলো। কিন্তু এখন সেই জ্ঞান ও তার নিজের মধ্যে অন্য কিছু একটা এসে দাঁড়িয়েছিলো। এক দিক থেকে সে মানবচরিত্রকে তোষামোদ করে চললো। সে ধরে নিলো যে তার অভীষ্ট পদের মাহাত্ম্য ও ঔজ্জ্বল্য তার মতো আর সবাইকেও মুগ্ধ করেছে, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, আর তাই শুধু উজ্জ্বল উচ্চকিত ভাষায় কথা বললে এবং সেই ধারাতে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করলে মানুষ তার কথা শুনবে। অতএব সেই ভাবেই তার বক্তৃতা-ভাষণ তৈরি হলো। সেটা ছিলো এক অদ্ভুত মিশ্রণ, একদিকে তথ্য ও সংখ্যার সমারোহ (তার ট্যাক্স নীতি, তার সড়ক নির্মাণের কর্মসূচী), আর অন্যদিকে

মহত অনুভূতি ও আদর্শের কথা (কালের যাত্রায় কিছুটা মলিন হয়ে যাওয়া, গোটা গোটা হাতে তার বিরাট খাতাটিতে টুকে রাখা, উইলির ছেলেবেলাকার উদ্ধৃতিসমূহের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি)।

উইলি একটা ভালো সেকেন্ডহ্যান্ড মোটরগাড়ি কিনেছিলো। আঠারো কিস্তিতে দাম শোধ করতে হবে। সেই গাড়িতে চড়ে সে ঘুরে বেড়ালো। গ্রামাঞ্চলে বেড়ার গায়ে, টেলিফোনের খুঁটিতে, খামার বাড়ির দেয়ালে সে তার মুখচ্ছবি দেখলো। তারপর সে উপস্থিত হলো শহরে। প্রথমে ডাকঘরে গিয়ে খোঁজ নিলো লুসির কোন চিঠি এসেছে কিনা, তারপর স্থানীয় রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে কথা বললো, এবং অনেকের সঙ্গে করমর্দন করলো (খুব একটা সাফল্যের সঙ্গে নয়, কারণ ঢালাই প্রতিশ্রুতি দানের চাইতে সে আদর্শ ও নীতির কথাই বেশি বললো), তারপর সে একটি হোটেল কক্ষে ঢুকে (ভাড়া দু'ডলার, স্নানঘর নেই) তার বক্তৃতার চূড়ান্ত সংস্কারের কাজে গভীর মনোনিবেশ করলো। সে ক্রমাগত তার বক্তৃতা পালিশ ও সংশোধন করতে লাগলো। সে যেন ওটাকে দ্বিতীয় গেটিসবার্গ ভাষণে পরিণত করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিলো। তারপর ওটাকে বাড়িয়ে, কমিয়ে, কাটছাঁট করার পর সে হয়তো উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী শুরু করতো। পায়চারী করছে তো করছেই, তারপর এক সময় সে তার বক্তৃতা আরম্ভ করে দিতো। আপনি পাশের ঘরে থাকলে তার পায়চারী আর বক্তৃতার শব্দ শুনতে পেতেন, তারপর এক সময় সে শব্দ থেমে যেতো, তখন বুঝবেন যে এবার সে তার অঙ্গভঙ্গিকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুরস্ত করে নিচ্ছে।

আর কখনো কখনো আমিই থাকতাম পাশের ঘরে, কারণ তার নির্বাচনী অভিযান সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য ক্রনিক্‌ল্‌ থেকে আমাকেই পাঠানো হয়। আমি আমার বিছানায় জামা কাপড় পরা অবস্থাতে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম, খাটের মাঝখানটা ভ্রাম্যমান অন্যান্য মানুষের দেহভারে ঝুলে গেছে, শুয়ে শুয়ে আমি ছাদের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তাম, অলস চোখে দেখতাম কেমন করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী শিথিল গতিতে ছাদের দিকে উঠে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন একটা জলপ্রপাতের উল্টো করা ধীরগতি ছায়াছবি দেখছি আমি, কিংবা মিশরীয়রা যেমন ভাবতো যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখ থেকে একটা পাণ্ডুর অনিশ্চিত আত্মা উত্থিত হয়ে ঊর্ধে মিলিয়ে যায়, তেমনি প্যান্ট কোট পরা সমান্তরালভাবে পড়ে থাকা আমার মৃত্তিকার দেহপিঞ্জর থেকেও ওই রকম কিছু একটা উঠে যাচ্ছে। আমি শুয়ে শুয়ে আমার মুখ থেকে ধোঁয়ার নিঃসরণ দেখতাম, কোনো আবেগ–অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করতো না,

তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতাম, যেন আমার কোনো অতীত নেই, কোনো ভবিষ্যত নেই, আর তারপর হঠাৎ পাশের ঘরে উইলি আবার পায়চারী করতে শুরু করে দিতো। পায়চারী করছে আর বিড়বিড় করছে।

এ একটা তিরস্কার, একটা উদ্ধত অপমান, একটা হাসির কারণ, আর কান্নার বিষয়। আপনি সব জানতেন, আর সেই জ্ঞান নিয়ে আপনি পাশের ঘরে শুয়ে আছেন, শুনতে পাচ্ছেন সে কিভাবে গভর্নর হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, আর বালিশের ওয়ার মুখের মধ্যে ঠুসে উদ্গত হাসিকে পিষে মারতে ইচ্ছা হতো আপনার। বেচারা বুদ্ধু হারামজাদাটা আর তার বক্তৃতা! কিন্তু দেয়ালের ওধারে কণ্ঠস্বর চলতেই থাকতো, আর পায়চারীর শব্দ, যেন একটা ভারী পশু তার ভারী মাথাটা দোলাতে দোলাতে কোনো তালাবদ্ধ ঘরে অথবা খাঁচায় এপাশ থেকে ওপাশে ক্রমাগত হাঁটছে, বেরুবার একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, হাল ছেড়ে দিচ্ছে না কিছুতেই, একটা বন্য অপোষহীন নিশ্চয়তার সঙ্গে বিশ্বাস করছে যে কোথাও না কোথাও একটা তক্তা বা একটা হুড়কা বা একটা ছিটকিনি আলগা হয়ে আছে, হয়তো এই মুহূর্তে নয়, কিন্তু কোনো এক সময়ে। আর ওই শব্দ শুনতে শনুতে আপনার মনেও মুহূর্তের জন্য সন্দেহ হবে, ওই হুড়কা অথবা তক্তা কি সত্যিই টিকে থাকতে পারবে? কিংবা ওই পায়ের শব্দ অন্তহীনভাবে চলতেই থাকবে, যেন কোনো একটা যন্ত্র তা, মানুষ নয়, জন্তুও নয়, যেন হামানদিস্তার মতো তা আপনাকে পায়ের নিচে দলছে, কিংবা একটা বিরাট চৌবাচ্চার মধ্যে কয়েকটা পিস্টন ক্রমাগত ওঠানামা করছে, আর চৌবাচ্চার মধ্যে যে বস্তুটা পড়ে আছে তা হচ্ছেন আপনি। তবে চৌবাচ্চার মধ্যের বস্তুটা যে আপনি, কিংবা আপনি নন, তা নিয়ে পিস্টনগুলির কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বলে আর কিছুই থাকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি চলতেই থাকবে। আর অনেকক্ষণ পরে হয়তো মেশিনটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাবে, কিংবা কেউ হয়তো সুইচ টিপে তা বন্ধ করে দেবে।

অতঃপর, যেহেতু আপনি এক ছায়াচ্ছন্ন ঘরে অচেনা বিছানায় শুয়ে শেষ বিকেলে অলসভাবে আপনার মুখ-নিঃসৃত ধোঁয়াকে উপর দিকে ভেসে যেতে দেখতে চান আর কোনো বিষয় নিয়েই আপনি ভাবতে চান না, কি আপনি ছিলেন কিংবা কি আপনি হতে যাচ্ছেন, আর যেহেতু ওই পা, ওই পশু, ওই পিস্টনগুলি, ওই বুদ্ধু কিছুতেই থামছে না, সেই হেতু আপনি হঠাৎ বিছানায় উঠে বসবেন এবং আপনার ইচ্ছা হবে প্রচণ্ড শাপ-শাপান্ত করতে। কিন্তু করবেন না। কারণ যন্ত্রণা আর অপূর্ণতার একটা অনুভূতি নিয়ে আপনি ভাবতে শুরু করবেন, ভেতরে ওই বস্তুটা কি যা পদযুগলকে থামতে দিচ্ছে না। হয়তো সে সত্যিই বুদ্ধু, হয়তো সে

গভর্নর হবে না, হয়তো লুসি ছাড়া কেউই তার বক্তৃতা শুনবে না , কিন্তু পদযুগল থামবে না।

কেউ বক্তৃতাগুলিতে কান দিলো না, আমিও দিই নি । জঘন্য বক্তৃতা ছিলো সেগুলি। স্টেটকে কিভাবে চালাতে হবে সে সম্পর্কে অজস্র তথ্য আর সংখ্যায় পূর্ণ। সে বলতো, 'এখন, বন্ধুগণ, আপনারা যদি এক মিনিট একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনেন, আমি আপনাদের হিসাব করে দেখিয়ে দিচ্ছি —', সে গলা ঝেড়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে সেদিকে তাকাতো, আর শ্রোতাদের আসনে মানুষ আরেকটু গা এলিয়ে বসতো এবং পকেটছুরি দিয়ে তাদের নখ পরিষ্কার করতে আরম্ভ করতো। উইলি সাধারণতঃ যেভাবে উত্তেজিত হয়ে আপনার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতো, আপনার দিকে ঝুঁকে উজ্জ্বল দ্যুতিময় চোখে তার মতামত দিতো, যেন প্রতিটি উক্তি তার সুগভীর বিশ্বাস থেকে উৎসারিত, সেই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে যদি সে বক্তৃতামঞ্চ থেকে তার ভাষণ দিতো তাহলে হয়তো সে নির্বাচকদের তার স্বপক্ষে টানতে পারতো। কিন্তু, না, সে তার মহান সুউচ্চ নিয়তির ধারণা অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করতে থাকলো।

যতক্ষণ পর্যন্ত উইলি তার স্থানীয় এলাকায় নির্বাচনী বক্তৃতাগুলি দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত খুব বেশি কিছু এসে যায় নি। স্কুলভবনের কাহিনীর রেশ তখনো মানুষের মনে কিছুটা কাজ করছিলো। উইলি হলো ঈশ্বরের দলে, আর ঈশ্বর সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ঈশ্বর তা বুঝিয়ে দেবার জন্যই অগ্নি নিষ্কাশনটা ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু উইলি যখন রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এসে উপস্থিত হলো তখনই গণ্ডগোল দেখা দিতে আরম্ভ করলো। আর সে যখন কোনো একটা মোটামুটি বড়ো শহরে এসে উপস্থিত হলো তখনই সে আবিষ্কার করলো যে ঈশ্বর কোনো একটি বিষয়ের পক্ষে আছে, নাকি বিপক্ষে আছে, তা নিয়ে লোকজন বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়।

কি ঘটছে সেটা উইলি বুঝতে পারিছলো, কিন্তু কেন, তা বুঝতে পারছিলো না। তার মুখ ঈষৎ শীর্ণ হলো, চমড়া মাংসের উপর আরেকটু টেনে বসলো, কিন্তু তাকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখালো না। যদিও কারো পক্ষে যদি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া সঙ্গত হতো তাহলে সেই লোক ছিলো উইলি। কিন্তু তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখালো না। এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তাকে দেখে মনে হলো সে যেন একটা জাগ্রত স্বপ্নের মধ্যে আছে। যখন সে হেঁটে বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে উঠতো তখন তার মুখকে মনে হতো পূত-পবিত্র । কঠিন রোগভোগের পর সুস্থ হয়ে উঠলে মানুষের মুখে যে রকম প্রশান্তি দেখা যায় তার মুখে সেই রকম প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠতো।

কিন্তু তার রোগমুক্তি ঘটে নি। তার হয়েছিলো সুকঠিন রাজনৈতিক রক্তাল্পতার অসুখ।

ভুলটা কোথায় হচ্ছে তা উইলি ধরতে পারছিলো না। একটা মানুষের যখন ভীষণ শীত করতে থাকে, সে যখন মনে করে অকস্মাৎ বুঝি ঋতুর পরিবর্তন ঘটেছে, আর অবাক হয়ে ভাবে অন্যরা কেন তার মতো হি হি করে কাঁপছে না, তার অবস্থা হলো ওই রকম। হয়তো সামান্য একটু মানবিক উষ্ণতার লোভেই সে, বক্তৃতা ও হাত মেলাবার পালা সাঙ্গ হবার পর, অনেক রাতে আমার ঘরে আসতে শুরু করেছিলো। আমি ঘুমুবার আগে আমার শেষ সুরার পাত্রে চুমুক দিতাম আর উইলি বিশেষ কোনো কথাবার্তা না বলে চুপচাপ বসে থাকতো। কিন্তু একবার এর ব্যতিক্রম ঘটে। মরিসটাউনে। সেখানে সত্যিই ব্যাপারটা ছিলো বরফ-শীতল। সেদিন উইলি আমার ঘরে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর অকস্মাৎ আমাকে প্রশ্ন করে, জ্যাক, সব কি রকম চলছে বলে তোমার মনে হয়?

এ জাতীয় প্রশ্ন ভারী বিব্রতকর। যেমন, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যে আমার স্ত্রী সতী রমণী? কিংবা, আপনি কি জানতেন যে আমি ইহুদী?

আপনি কি উত্তর দেবেন, সত্যি কথা বলবেন, না মিথ্যা, সেজন্য এ জাতীয় প্রশ্ন বিব্রতকর নয়। কেউ যে এরকম প্রশ্ন করছে সেটাই বিব্রতকর। যাই হোক, আমি উইলির প্রশ্নের জবাবে বললাম, চমৎকার। আমার মনে হয় সব কিছু চমৎকার চলছে।

তাই মনে হয় তোমার? সত্যি?

অবশ্যই।

সে মিনিট খানেক ভাবলো, তারপর আমার কথাটা যেন মেনে নিলো, তারপর সে বললো, আজ রাত্রে, মনে হলো, ওরা আমার বক্তৃতা তেমন মনোযোগ দিয়ে শোনে নি। আমি যখন আমার ট্যাক্স কর্মসূচী ব্যাখ্যা করছিলাম তখন অন্ততঃ শোনে নি।

তুমি হয়তো ওদের বড্ড বেশি বলতে চেষ্টা করছো। এর ফলে ওদের মস্তিষ্কের কোষগুলি গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ট্যাক্স সম্পর্কে শুনতে চাওয়া তো ওদের পক্ষে স্বাভাবিক।

তুমি বড্ড বেশি বলো। শোনো, ওদের শুধু বলো যে ধুমসো মাতব্বরগুলোকে তুমি শায়েস্তা করবে। ট্যাক্স-ফ্যাক্সের কথা ভুলে যাও।

আমাদের দরকার একটা সুষম ট্যাক্স প্রোগ্রাম। ঠিক এই মুহূর্তে রাজ্যের মোট আয়ের সঙ্গে আয়-করের আনুপাতিক হার যদি লক্ষ করো —

আমি বাধা দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, ওই বক্তৃতা আমি শুনেছি, কিন্তু এ নিয়ে ওদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কেন বুঝতে পারছো না? তুমি ওদের কাঁদাও, হাসাও, ওরা যেন ভাবে তুমি ওদের একজন অক্ষম বন্ধু, ক্রমাগত ভুল করছো, কিংবা ওরা যেন তোমাকে স্বয়ং ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান মনে করে। কিংবা ওদের ক্ষেপিয়ে তোলো। এমন কি তোমার বিরুদ্ধেও ক্ষেপিয়ে তোলো। শুধু ওদের একটা ধাক্কা দাও। কিভাবে, কিংবা কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। তা হলেই ওরা তোমাকে ভালোবাসবে, আবার ফিরে আসবে তোমার কাছে। নরম জায়গা বেছে নিয়ে ওদের চিমটি কাটো। ওরা বেঁচে নেই, ওদের বেশির ভাগই নেই, বিশ বছর ধরে ওরা বেঁচে নেই। বউদের দাঁত পড়ে গেছে, শরীরে আকার–আকৃতি বলে কিছু অবশিষ্ট নেই, ওই মানুষগুলো ঈশ্বরেও বিশ্বাস করে না। তাই তোমাকেই ওদের একটা কিছু দিতে হবে যা ওদের নাড়িয়ে দেবে, জাগিয়ে তুলবে, ওরা যে বেঁচে আছে তা মনে করিয়ে দেবে। মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য। ওই জন্যই তো তারা আসে। তোমার যা খুশি তাই বলো। কিন্তু দোহাই যীশুর, ওদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করো না।

আমি ক্লান্ত হয়ে শয্যায় এলিয়ে পড়লাম। উইলি আমার কথাটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিজের মনে নাড়াচাড়া করলো। সে চুপ করে বসে রইলো, একটুও নড়লো না, তার মুখ দেখালো পবিত্র ও প্রশান্ত। কিন্তু আমার মনে হলো ভালো করে কান পাতলে আমি ওর মাথার মধ্যে সেই পদচারণার শব্দ শুনতে পাবো, কিছু একটা যেন সেখানে তালাবন্ধ হয়ে আছে, ক্রমাগত পায়চারী করছে এপাশ থেকে ওপাশে। তারপর এক সময় গম্ভীর মুখে সে বললো, হ্যাঁ, আমি জানি যে কেউ কেউ একথা বলে।

আমি হঠাৎ ওর উপর চটে গেলাম। বললাম, আচ্ছা, তুমি তো দুধের শিশু নও। মেসন সিটির কোর্টহাউসে চাকুরি করার সময় তুমি তো সারাক্ষণ বোবা কালা হয়ে বসেছিলে না। হলোই বা পিল্‌স্‌বেরির কল্যাণে তুমি সে চাকুরি পেয়েছিলে।

সে মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ, আমিও ওই রকম একটা কথা শুনেছি।

আমি বললাম, এসব কথা বেরিয়ে পড়ে। এটা কোনো গোপন কথা নয়।

এবার সে জানতে চাইলো, তুমি কি মনে কর যে সেটা সত্য?

আমি প্রতিধ্বনি করলাম, সত্য?

আমি নিজেকেই প্রায় প্রশ্নটা করে ফেলেছিলাম। আমি বললাম, বারে! আমি সেকথা বলতে পারবো না, তবে তার অনেক প্রমাণ তো আছে।

আরো এক মিনিট সে চুপ করে বসে থাকলো, তারপর উঠে পড়ে আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলো। একটু পরেই শুরু হলো তার পায়চারী।

আমি জামাকাপড় খুলে শুয়ে পড়লাম কিন্তু পায়চারী চলতে থাকলো। আমি, সবজান্তা মহাপ্রাজ্ঞ মানুষটা, শুয়ে শুয়ে, পাশের ঘরের পায়চারীর শব্দ শুনতে শুনতে বললাম, কাল রাতে স্কিডমোরের জনসভায় কী জাতীয় রসিকতা করে সে জনগণকে হাসাবে, হারামজাদা এখন সে কথা ভাবছে।

সবজান্তা প্রাজ্ঞ মানুষটা ভুল করে নি। আমাদের ভোটপ্রার্থীটি স্কিডমোরে ঠিকই রসিকতা করেছিলো, কিন্তু সে রসিকতা শুনে কেউ হাসে নি।

কিন্তু ওই স্কিডমোরেই একটা ব্যাপার ঘটে। উইলির বক্তৃতার শেষে, লোকজনের কচকচানি আর গায়ের গন্ধ আর ভীড়ের মধ্যে মানুষ আপনার দিকে যেভাবে তাকায় সেই দৃষ্টি থেকে পালিয়ে এসে একটা গ্রীক কাফেতে বসে কফি খেতে খেতে আমি আমার স্নায়ুকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় স্যাডি বার্ক সেখানে এসে ঢুকলো। সে চোখ বুলিয়ে সমস্ত জায়গাটা একবার দেখলো, আমাকে লক্ষ করলো, তারপর আমার মুখোমুখি একটা বুথে বসলো।

স্যাডি হলো উইলির নতুন বন্ধুদের একজন। তবে আমি ওকে চিনি অনেক কাল আগে থেকে। লোকে বলে সে উইলির চাইতেও অনেক বেশি ভালো বন্ধু জনৈক সেন্‌-সেন্‌ পাকেটের। স্থূলদেহ পাকেট, শরীরের দিক থেকেও, রাজনৈতিক দিক থেকেও, নিঃশ্বাসে সুগন্ধের জন্য যে সব সময় সেন্‌-সেন্‌ চিবুতো। পাকেট এক সময় জো হ্যারিসনের বন্ধু ছিলো (হয়তো এখনো আছে)। কারো কারো ধারণা, উইলিকে ডামি বা ফালতু হিসাবে নির্বাচনে দাঁড় করাবার চমৎকার বুদ্ধিটা প্রথমে সেন্‌-সেন্‌ পাকেটের মাথাতেই আসে। সেন্‌-সেন্‌ দেখতে খারাপ ছিলো না কিন্তু স্যাডি তার তুলনায় ছিলো অনেক বেশি ভালো। স্যাডিকে অবশ্য লোকে সুন্দরী বলতো না, অন্ততঃ যেসব বিচারক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় মিস ওরেগণ আর মিস নিউ জার্সি নির্বাচন করে থাকেন তারা বলতো না। স্যাডির দেহের গড়ন ছিলো খুবই সন্তোষজনক কিন্তু সে খুব বাজে জামাকাপড় পরতো, আর তার ভাবভঙ্গি ছিলো খুবই বেমানান, আকস্মিক ও রুক্ষ। ফলে তার দেহবল্লরীর সৌন্দর্যের কথা মানুষ ভুলে যেতো। তারা চুল ছিলো কুচকুচে কালো, ওই চুল সে অদ্ভুতভাবে ছেঁটে রাখতো, নানা দিকে বিদ্যুতের মতো তা ছড়িয়ে পড়তো। মুখের কাটছাঁট ছিলো ভারী সুন্দর, ভালো করে দৃষ্টিপাত করলে আপনি তা লক্ষ করতেন, কিন্তু আপনি তা করতেন না, কারণ তার মুখমণ্ডল ছিলো দাগে ভর্তি কিন্তু তার চোখদুটি ছিলো বিস্ময়কর, কালো কোমল মখমলের মতো।

তবে স্যাডি যে সেন্‌-সেনের জন্য অতিরিক্ত ভালো ছিলো সেটা তার সুন্দর চেহারার জন্য নয়। সেটা এই জন্য যে সেন্‌-সেন্‌ ছিলো একটা অকথ্য নিচ ব্যক্তি।

প্রথমে হয়তো তার সুদর্শন চেহারার জন্যই স্যাডি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিলো, পরে সেই তাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে নোংরা টাকা কামাবার ফন্দী ফিকির বাৎলে দেয়। স্যাডি ছিলো খুবই চালাক মেয়ে। বহু ঘাটের জল খেয়ে কঠিন মূল্য দিয়ে সে অনেক কিছু শিখেছে।

স্যাডি সেবার স্টার্কের দলবলের সঙ্গে স্কিডমোরে এসেছিলো. সেক্রেটারি জাতীয় একটা অস্পষ্ট পদ দিয়ে তাকে স্টার্কের প্রধান কার্যালয়ের কর্মী–দলভুক্ত করা হয়েছিলো (সম্ভবতঃ সেন্‌–সেনের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করার জন্য)। বস্তুতঃপক্ষে তাকে প্রায় সবখানেই দেখা যেতো, নানা প্রয়োজনীয় বিধি–ব্যবস্থার তদারকি করতো সে, স্থানীয় প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে উইলিকে পূর্বাহ্নে অবহিত করে রাখতো।

তো সেদিন সে ওই গ্রীক রেস্তোরাঁয় তার স্বভাবসুলভ দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো, আমাকে দেখলো ভালো করে, তারপর বললো, তোমার সঙ্গে বসতে পারি?

আমি উত্তর দেবার আগেই সে বসে পড়লো।

আমি পুরুষালী বীর্যবত্তার সঙ্গে উত্তর দিলাম, দাঁড়াতে, বসতে, কিংবা শুতে পারো, যেমন তোমার অভিরুচি।

ও তার গভীর কালো মখমল কোমল চোখ মেলে আমাকে খুঁটিয়ে দেখলো, তার দাগভর্তি মুখে চোখ দুটি জ্বলজ্বল করলো, তারপর সে তার মাথা নেড়ে বললো, না, ধন্যবাদ। আমার পছন্দ ভিটামিনযুক্ত জিনিস।

আমি জানতে চাইলাম, তার মানে তুমি আমাকে সুদর্শন মনে কর না?

কেউ সুদর্শন কিনা তা নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই না। তবে কাউকে দেখে ঠোঙা ছিঁড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া স্প্যাঘেটির কথা মনে পড়ে এমন কোনো লোকের প্রতি আমি কখনো আকৃষ্ট হই নি। আছে শুধু কনুই আর শুকনো ঠন্‌ঠন্‌ শব্দ।

ঠিক আছে, আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলাম। মর্যাদার সঙ্গে। কিন্তু ভিটামিনের কথা যখন তুললেই তখন একটা কথা বলো। তুমি কি মনে করো যে তোমার ক্যান্ডিডেট উইলির কোনো ভিটামিন আছে? তার নির্বাচনী এলাকার মানুষের জন্য?

স্যাডি উপরের দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ফিসফিস করে বললো, হা ভগবান!

আমি বললাম, বেশ। তাহলে রাজধানীতে তোমার কর্তাব্যক্তিদের তুমি কখন জানিয়ে দেবে যে কাজ কিছুই এগুচ্ছে না, এসব করে কোনো ফায়দাই হবে না?

কি বলছো তুমি? কিছুই এগুচ্ছে না? ওরা আপটনে বিরাট বারবেকিউ

প্রীতিভোজ আর র‍্যালির পরিকল্পনা করেছে। ডাফি বলেছে আমাকে।

স্যাডি, তুমি বেশ জানো যে তাহলে ওদেরকে পাহাড়ের মতো বিশাল রোমশ হাতী জবাই করে তার মাংস পরিবেশন করতে হবে, রুটির উপর লেটুসের পরিবর্তে দশ ডলারের নোট বসিয়ে দিতে হবে। কেন তুমি মাতব্বর লোকগুলোকে জানিয়ে দিচ্ছো না যে এসব করে কোনো ফায়দা হবে না?

তোমার মাথায় কে এই তথ্যটা ঢোকালো?

শোনো স্যাডি, আমরা দুজন অনেক দিনের বন্ধু। কাকুর কাছে তোমার মিথ্যা কথা বলার দরকার নেই। আমিও যা জানি তার সবটুকু কাগজে লিখি না, কিন্তু আমি এটা জানি যে তোমরা তার বক্তৃতায় মুগ্ধ বলে সে নির্বাচনে আসে নি।

কী সাংঘাতিক, তাই না?

আমি বললাম, আমি জানি যে এটা একটা চক্রান্ত। সাজানো ব্যাপার। উইলি ছাড়া সবাই তা জানে।

ও স্বীকার করলো, হ্যাঁ, তাই।

তাহলে ওদের কখন বলবে যে এসব করে কোনো লাভ নেই, অনর্থক ওরা অর্থের অপচয় করছে? উইলি একটা ভোটও খসিয়ে আনতে পারবে না।

ও বললো, অনেক আগেই আমার এটা করা উচিত ছিলো।

এবার কখন করবে?

তাহলে শোনো। এসব শুরু করবার আগেই আমি ওদের বলেছিলাম যে এতে কোনো কাজ হবে না। কিন্তু স্যাডির কথায় ওরা কর্ণপাত করে নি। ওই মোটা মাথাগুলো —

হঠাৎ তার গোলাকার, বড্ড বেশি লাল, ঈষৎ স্ফূরিত, নিচের ঠোঁট ফাঁক করে সে মুখভর্তি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো।

আমি বললাম, তুমি কেন ওদের জানিয়ে দিচ্ছো না যে ওরা যা করছে তাতে কোন ফায়দা হবে না? কেন তুমি ওই বুদ্ধুটাকে তার যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দিচ্ছো না?

ও তার মাথা দ্রুত একপাশে সরালো, যেন চোখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া আড়াল করতে চাইছে, তারপর বিরক্ত গলায় বললো, ওই মোটা মাথাওয়ালাগুলো আরো বেশি টাকা খরচ করলে আমি খুশী হতাম। বুদ্ধুটা আরেকটু চালাক হলে ভালো লাগতো আমার, ওদের কাছ থেকে আরেকটু বেশি করে টাকার মলম গায়ে মাখিয়ে নিতে পারলে পরের মারটায় একটু কম ব্যথা পেতো সে। এখন শুধু হয়রানিই সার হবে। সেটাই হয়তো ভালো। অজ্ঞানতাই সুখ।

পরিচারিকা কফির পেয়ালা নিয়ে এলো। স্যাডি নিশ্চয়ই ঢুকবার মুখে, আমাকে দেখবার আগেই, অর্ডার দিয়ে এসেছিলো। এখন সে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলো, তারপর সিগারেটে একটা লম্বা টান দিলো। সিগারেটের টুকরোটা কফির পেয়ালায় সজোরে পিষে, আমার দিকে না তাকিয়ে সেদিকে চোখ রেখে সে বললো, জানো, ওকে যদি কেউ বলেও, ও যদি জানেও যে তাঁকে বেকুব বানানো হয়েছে, তবু আমার মনে হয় সে অবিচলভাবে চালিয়ে যাবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, সে ওই বক্তৃতাগুলি দিতে থাকবে।

উঃ, কী সাংঘাতিক সব বক্তৃতা, তাই না?

হ্যাঁ।

বেকুব কোথাকার!

আমরা এক সঙ্গে হেঁটে হোটেলে ফিরলাম। তারপর, আপটনের আগে স্যাডির সঙ্গে দু'একবার কুশল বিনিময় ছাড়া আর আমার দেখা হয় নি। আপটনের আগে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় নি। আমি শহরে ফিরে যাই। সপ্তাহ খানেকের জন্য উইলিকে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা ও উদ্যমের হাতে সমর্পণ করি। তবে খবর পেয়েছি এর মধ্যে। তারপর প্রীতিভোজের আগের দিন আমি আপটনের উদ্দেশ্যে ট্রেনে চেপে বসলাম।

স্টেটের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে আপটনের অবস্থান। গ্রামীণ চাষী ভোটের কেন্দ্রস্থল। ঝোপজঙ্গল বনবাদাড় থেকে ওই বারবেকিউ ভোজ অনুষ্ঠানে মানুষের ভীড় করে আসার কথা। আপটনের সামান্য উত্তরে ছিলো একটা ছোট্ট কয়লা খনি অঞ্চল। সেখানে বেশ কিছু শ্রমিক কোম্পানীর তৈরি ঝুপড়িতে বাস করতো, আর ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাতো যেন পরের এক সপ্তাহের কাজ তারা পায়। বারবেকিউর সাফল্যের জন্য জায়গাটা ছিলো চমৎকার। ঝুপড়িতে বাস করা লোকগুলি এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিলো যে একটু ভালো খাবারের জন্য ওরা পনেরো মাইল হাঁটতেও রাজী ছিলো, অবশ্য যদি তখনো তাদের দেহে সেই শক্তি থাকতো, আর খাবারটা যদি বিনি পয়সায় পাওয়া যেতো।

আমি যে লোকাল ট্রেনে যাচ্ছিলাম সেটা টিম টিম করতে করতে, মাঝে মাঝে থেমে, হাই তুলতে তুলতে, কার্পাস অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলো। একটা সাইডিং-এ আমরা আধঘণ্টার জন্য থামলাম, অপেক্ষা করলাম কিছু একটার জন্য, আর আমার চোখে পড়লো দূরের ঝিলমিল করা আদিগন্ত প্রসারিত সারি সারি কার্পাস গাছ, তাদের মধ্যে মাঝারি দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুড়ে যাওয়া গাছের বেঁটে কালো গুঁড়ি। তারপর, শেষ বিকালের দিকে, গাড়ি গিয়ে ঢুকলো কর্তিত পাইন

গাছ আর বাঁশঝাড়ের এলাকায়। কোনো একটা হলুদ, বাক্সমতো, স্টেশনের পাশে গাড়ি থামলে দেখা যেতো যে রঙহীন বাড়িগুলি একপাশে ঝুলে রয়েছে, আরেকটু দূরে গলি ছাড়িয়ে আমি দেখতে পেতাম বাজার অঞ্চল, আর গাড়ী যখন আবার চলতে শুরু করতো তখন আমার চোখে পড়তো বাড়িগুলির পেছনের আঙিনা, তার চারপাশে তক্তা অথবা তারের বেড়া, যেন বাইরের ঝোপঝাড় আর উন্মুক্ত প্রান্তরের আগ্রাসন কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখছে, একটু সুযোগ পেলেই তারা সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ে বাড়িগুলিকে গিলে ফেলবে। বাড়িগুলি দেখে মনে হয় না যে ওখানে তাদের শেকড় আছে, যেন অস্থায়ী বাসের জন্য হেলাফেলা করে সেগুলি তোলা হয়েছে, পরিত্যক্ত হবার জন্য প্রস্তুত। দড়িতে কয়েকটা কাপড় ঝুলছে, কিন্তু মানুষ সেগুলিও ওই ভাবেই ফেলে রেখে চলে যাবে। দড়ি থেকে তুলবার সময় নেই। এখুনি আঁধার নামবে। খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে তাদের।

কিন্তু গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় একটি রমণী কোনো একটা বাড়ির পেছনের দরজায় এসে দাঁড়ায় — বোঝা যায় যে একটি রমণী-শরীর, কিন্তু তার মুখ দেখা যায় না — হাতে একটা পাত্র ধরা, ওই পাত্র থেকে সে বাইরে জল ছুঁড়ে দেয়, আর তখুনি আলোর মধ্যে হঠাৎ একটা ছেঁড়াখোঁড়া রূপালী ঝলকানি আপনার চোখে পড়ে। তারপর রমণী বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। বাড়ির মধ্যে যা আছে তার কাছে চলে যায়। নিরাভরণ মাটির উপর বাড়ির মেঝেটা পাতলা, বাইরে যা কিছু আছে তার বিরুদ্ধে দেয়ালগুলি আর ছাদও পাতলা, কিন্তু রমণী যে গোপনতার ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করেছে দেয়ালের মধ্য দিয়ে তা আর আপনি দেখতে পান না।

গাড়ি এগিয়ে চলে, এখন তার গতি দ্রুততর, আর রমণী এখন ওইখানে, ওই বাড়িতে, যেখানে সে থাকবে। সে থেকে যাবে ওইখানে। আর অকস্মাৎ আপনার মনে হবে আপনিই যেন ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন, আর যেখানেই আপনি যান না কেন আপনাকে খুব জোরে ছুটতে হবে, কারণ এখুনি আঁধার হয়ে আসবে। ট্রেন এখন বেশ জোরে চলছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বাতাসের একটা কঠিন দম-আটকানো ঘনত্ব কেটে কেটে তাকে চলতে হচ্ছে। চিনির শিরার মধ্যে যেন একটা বান্ মাছ সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে কিংবা ট্রেনটা যেন মৃত্তিকার একটা দুর্মর ক্রমবর্ধমান চৌম্বকশক্তির বিরুদ্ধে আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে ছুটে যাচ্ছে। আপনার মনে এজাতীয় চিন্তার উদয় হয় ঃ মাটি যদি হঠাৎ নিজেকে একটু নাড়ায়, ঘুমন্ত কুকুরের গায়ের চামড়া মাঝে মাঝে হঠাৎ যে রকম কেঁপে ওঠে, তাহলেই ট্রেনটা হুড়মুড় করে এক ধারে হেলে পড়বে, ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া আর শেষ মরণ-নিঃশ্বাস বেরুবে আর কোথাও একটা উল্টে পড়া চাকা কোনো বিশাল স্বপ্নিল তন্ময়তা নিয়ে ধীরে ধীরে

ঘুরতে থাকবে।

কিন্তু কিছুই ঘটে না, আর আপনার মনে পড়ে যে ওই রমণী একবারও চোখ তুলে গাড়ির দিকে তাকায় নি। আপনি তার কথা ভুলে যান, আর ট্রেন এখন বেশ জোরে যাচ্ছে, একটা ছোট সেতু পেরুবার সময়ও জোরে জোরে ছুটছে। ছোট দুই তীরের মাঝখানে আপনার চোখে পড়ে আকাশের নিচে বিলীয়মান আলোয় স্বচ্ছ গম্ভীর ধাতব জলের অকম্পিত দ্যুতি। আপনার চোখে পড়ে একটা ঈষৎ হেলে পড়া উইলো গাছের কাছে নালার মুখের দিকে জলের মধ্যে একটা গরু দাঁড়িয়ে আছে। আর, বলা নেই কওয়া নেই, অকস্মাৎ আপনার কান্না পাবে। কিন্তু ট্রেন তখন দ্রুত ছুটে চলেছে, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনি টের পাবেন যে আপনার ওই অনুভূতিও ছিনতাই হয়ে গেছে।

মূর্খ! বেকুবের হদ্দ! আপনি কি ভাবছেন যে আপনি গরুর দুগ্ধ দোহন করতে চান?

না, তা চান না।

আর তারপরই আপটনে পৌঁছে যান।

আপটনে পৌঁছে রাস্তার লোকজনের ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমার ছোট্ট ব্যাগ আর টাইপরাইটার হাতে নিয়ে আমি হোটেলের দিকে অগ্রসর হলাম। মফস্বলের মানুষের আশ্চর্যরকম লজ্জাহীন, অলস, পূর্ণ দৃষ্টিতে ওরা আমাকে লক্ষ করলো, প্রায় ওদের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমার জন্য ওরা পথ ছেড়ে দিলো না, গলির মধ্যে যেমন কোনো গরু আপনার গাড়ির রেডিয়েটর তার একেবারে পাঁজরে গিয়ে ধাক্কা দেবার আগে অবধি পথ থেকে সরে যায় না সেই রকম। হোটেলে আমি একটা স্যান্ডউইচ খেয়ে নিজের ঘরে গেলাম, পাখা চালালাম, এক জগ বরফজল ঘরে আনিয়ে নিলাম, তারপর জুতো আর শার্ট খুলে একটা বই হাতে নিয়ে চেয়ারে বসলাম।

সাড়ে দশটার সময় আমার দরজায় একটা টোকা পড়তে আমি চেঁচিয়ে ভেতরে আসতে বললাম। আর উইলি এসে ঘরে ঢুকলো।

কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

ও বললো, সারা বিকেল এখানেই ছিলাম।

স্থানীয় গণ্যমান্য সবার সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য ডাফি তোমাকে সর্বত্র টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে, তাই না?

বিষণ্ন মুখে সে বললো, হ্যাঁ।

তার কণ্ঠস্বর লক্ষ করে আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। জিজ্ঞাসা

করলাম, কি হয়েছে? এখানকার লোকজন তোমার সঙ্গে ভালোভাবে কথাবার্তা বলছে না?

না, না, ওরা ভালোভাবেই কথাবার্তা বলেছে।

উইলি এগিয়ে এসে লেখার টেবিলটার পাশের চেয়ারে বসলো। ওখানে একটা ট্রেতে ছিলো আমার মদের বোতল, কয়েকটা গ্লাস ও জলভর্তি একটা জগ। সে একটা গ্লাসে জল ঢেলে খেলো, তারপর আবার বললো, না, ওরা কথাবার্তা ঠিকই বলেছে।

আমি আবার ওর দিকে তাকালাম। মুখ আগের চাইতেও শীর্ণ হয়েছে, চামড়া আরো টান টান হয়েছে, ছোট ছোট দাগভর্তি মুখে সেই চামড়া মনে হলো যেন প্রায় স্বচ্ছ। সে নিশ্চল হয়ে সেখানে বসে রইলো, আমার দিকে কোনো মনোযোগই দিলো না, যেন আপন মনে কোনো একটা জিনিস বার বার খতিয়ে দেখছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাকে কামড়াচ্ছে কি?

এক মুহূর্তের জন্য তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না, যেন সে আমার কথা শোনেই নি, তারপর সে যখন আমার দিকে মুখ ফেরালো তখন মনে হলো যে তার ওই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমার প্রশ্নের কোনো যোগসূত্রই নেই। ওর মাথার মধ্যে যা চলছিলো সেখান থেকে ওই প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে, আমি কি বলেছি না বলেছি সেজন্য কিছু হয় নি।

সে বললো, কাউকে গভর্ণর হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

কি বললে?

আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। এই পর্যায়ে এসে উইলির কাছ থেকে এরকম একটা কথা শুনবো আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। শেষ শহরে যে-নির্বাচনী সভা হয় (আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না) সেখানে নিশ্চয়ই তার অভ্যর্থনা ছিল খুব শীতল আর তার ফলেই সে এবার জেগে উঠেছে।

উইলি আবার বললো, কাউকে গভর্ণর হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। এখন আর আমি সেই পাতলা চমড়ার ছেলেমানুষি মুখ দেখতে পেলাম না, তার তলায় আমার চোখে পড়লো আরেকটা মুখ, যেন প্রথম মুখটা ছিলো একটা কাঁচের মুখোশ। আর দ্বিতীয় মুখটার দিকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ দেখলাম তার পুরুষ্টু ঠোঁট দুটি, একটার উপর আরেকটা চেপে বসেছে, দেখে আপনার রাজমিস্ত্রীর কাজের কথা মনে পড়বে, আমি আরো দেখলাম যেখানে তার চিবুকের হাড় এসে যুক্ত হয়েছে সেখানে দু'গালের মাংসপেশী দড়ির মতো পাকিয়ে আছে।

একটু দেরি করেই আমি জবাব দিলাম, তো ভোট এখনও গোণা হয় নি।

সে নিজের মনের ভাবনাগুলি যেন আবারো খতিয়ে দেখলো। তারপর বললো, অস্বীকার করবো না যে আমি হতে চেয়েছিলাম। তোমার কাছে আমি মিথ্যে কথা বলবো না।

আমার দিকে সামনে ঝুঁকে সে কথাগুলি বললো এমনভাবে যেন যা আমি ইতোমধ্যে একশো ভাগ বিশ্বাস করে বসে আছি সে তাই আমাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বে। সে বললো, সত্যি আমি চেয়েছিলাম। সেই চাওয়ার তীব্রতায় আমি না ঘুমিয়ে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতাম।

বড়ো বড়ো হাত দিয়ে সে নিজের হাঁটু আঁকড়ে ধরলো। আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলি মট মট শব্দ করে উঠলো।

সে বললো, জানো, একটা মানুষ বিছানায় শুয়ে শুয়ে কোনো জিনিস এমন তীব্রতার সঙ্গে চাইতে পারে, সে চাওয়ায় নিজেকে এমন পূর্ণ করে তুলতে পারে যে শেষে সে যে কি চায় তাই পরিষ্কার ভুলে যায়। প্রথম যৌবনে তীব্র যৌনতাবোধে আক্রান্ত হলে যেমন হয় কতকটা সেই রকম। তুমি রাতের বেলায় এমন তীব্রভাবে কিছু একটা কামনা করো যে মনে হয় তুমি বুঝি পাগল হয়ে যাবে ; অথচ ওই কামনার তীব্রতায় শেষ পর্যন্ত কি যে তুমি চাইছো সেটাই তুমি ভুলে যাও। এটা হচ্ছে তোমার একেবারে ভেতরকার একটা জিনিস — উইলি আমার দিকে ঝুঁকে বসলো, তার দু'চোখ রাখলো আমার মুখের উপর, ঘামের রেখাভরা নিজের নীল শার্টের সামনের দিকটা সে খামচে ধরলো, যেন বোতামগুলি ছিঁড়ে ফেলে তার বুকের ভেতরটা সে আমার সামনে মেলে ধরবে।

কিন্তু তারপরই সে তার চেয়ারে শিথিল হয়ে বসে আমার মুখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকালো, কিন্তু তার দৃষ্টি দেখে মনে হলো সেখানে কোনো দেয়ালই নেই। ওই দিকে তাকিয়েই সে বললো, কিন্তু চাইলেই কোনো জিনিস সত্য হয়ে ওঠে না। আর এটা বুঝবার জন্য চিরজীবী হবার দরকার করে না।

কথাটা এতো সত্য যে তার সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করলাম না ।

ও তার নিজের ভাবনায় এমনই ডুবে ছিলো যে আমার নীরবতা সে লক্ষ করলো বলে মনে হলো না। কিন্তু প্রায় মিনিট খানেক পরে সে তার তন্ময়তার ঘোর থেকে বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কিন্তু ভালো গভর্ণর হতে পারতাম। সত্যি —

সে নিজের হাঁটুতে সজোরে চাপড় মেরে বললো, সত্যি, ওদের অনেকের চাইতে অনেক বেশি ভালো গভর্নর হতাম আমি। শোনো — আবার সে আমার দিকে ঝুঁকে বললো, এই স্টেটের যা দরকার তা হলো একটা ভালো ট্যাক্স কর্মসূচী। স্টেট থেকে যেসব কয়লা অঞ্চল লীজ দেয়া হয়েছে তার রেট বাড়ানো উচিত। আর, একবার শহর ছেড়ে তুমি গ্রামাঞ্চলে যাও, দেখবে যে সেখানে একটাও ভদ্র রাস্তা নেই। তাছাড়া কতিপয় বিভাগকে একত্রিত করে আমি স্টেটের বেশ কিছু টাকা বাঁচাতে পারতাম। তারপর স্কুলগুলির কথা ভাবো — আমাকে দেখো, আমি আমার সারা জীবনে একদিনের জন্যও একটা ভালো স্কুলে পড়তে পারি নি, যা কিছু শিখেছি সব নিজে নিজে, নিজে থেকে, অথচ এই স্টেটে এরকম অবস্থা হবার তো কোন কারণ নেই —

এসব কথা আমি আগেই শুনেছি। বক্তৃতামঞ্চে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে তার পূত-পবিত্র মুখ নিয়ে সে এসব কথা বলেছে, আর কেউ তাতে এক বিন্দু কান দেয় নি। সে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলো যে আমিও কোনো কান দিচ্ছি না। অকস্মাৎ সে চুপ করে গেলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে মেঝে অতিক্রম করে অন্য দিকে গেলো, আবার ফিরে এলো, তার মাথা সামান্য সামনে ঝোঁকানো, সামনের দিকের চুলের গোছা ভ্রূর উপর এসে পড়েছে। সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো, কিন্তু ওসব কাজ তো করা দরকার, দরকার না?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। আর আমি মিথ্যা বলি নি।

সে বললো, কিন্তু ওরা কান দেবে না। জাহান্নামে যাক হারামজাদারা! আমার বক্তৃতা শুনতে আসবে, তারপর আমার কথায় কান দেবে না। একটা কথাও শুনবে না। এসব নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই তাদের। জাহান্নামে যাক। কাদায় লুটোপুটি খাওয়ারই যোগ্য ওরা। কিচ্ছু শুনবে না ওরা।

আমি সায় দিলাম, হ্যাঁ, কিচ্ছু ওরা শুনবে না।

ও রুক্ষ গলায় বললো, এবং আমি গভর্ণর হবো না। এবং ওরা যা পাবার যোগ্য তাই পাবে।

তারপর সে যোগ করলো, হারামজাদারা!

আমি বললাম, তো, তুমি কি চাও? তোমার হাত ধরে তোমাকে আমি সান্ত্বনা দেবো?

হঠাৎ আমি ওর উপর ভীষণ চটে গেলাম। আমার কাছে কেন এসেছে ও? আমি কি করবো বলে সে আশা করছে? কেন সে ভাবলো যে এই স্টেটের কি দরকার আমি সেসব কথা শুনতে চাই? বাঃ, আমি তো জানি সেসব কথা. সব্বাই

জানে। সেগুলো তো গোপন কথা নয়। এই স্টেটের যা দরকার তা হলো একটা ভালো সুন্দর সরকার। কিন্তু কে সেটা দেবে? আর কেউ না দিলেও কার সেজন্য মাথাব্যথা হয়, কিংবা কখনো হয়েছিলো? ও তার জন্য আমার কাছে কেন কাঁদতে বসলো? কিংবা সে যে কী ভীষণ ভাবে গভর্নর হতে চেয়েছিলো, সেজন্য কতো বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে, সে ইতিহাসই বা সে আমাকে শোনাতে এলো কেন? আমি আমার সমগ্র সত্তা নিয়ে হঠাৎ তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠি, আর সেজন্যই, সে কি আশা করে যে আমি ওর হাত ধরে তাকে সান্ত্বনা দেবো, ওই রকম নিষ্ঠুরভাবে তাকে সে-প্রশ্ন করি।

ও ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকালো, আমাকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিলো, আমার মুখের ভাব লক্ষ করলো, কিন্তু তাকে দেখে ক্রুদ্ধ মনে হলো না। এটা আমাকে অবাক করলো। আমি তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম, এতটা ক্ষেপিয়ে যেন সে এইসব ছেড়েছুড়ে চলে যায়। বেশ খানিকক্ষণ পর সে মাথা নেড়ে বললো, না, জ্যাক, আমি তোমার কাছে সহানুভূতি চাই নি। যাই ঘটুক না কেন, আমি তোমার কাছে কিংবা কারো কাছেই সহানুভূতি চাইছি না।

সে গা ঝাড়া দিলো, বেশ জোরে, জল থেকে উঠে আসা কিংবা ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়ানো একটা কুকুরের মতো। সে আবার বললো, এবং এখন সে ঠিক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলো না, হ্যাঁ, আমি এই দিব্যি করে বলছি, দুনিয়ার কারো কাছ থেকে আমি সহানুভূতি চাই না, এখন চাইছি না, কখনো চাইবো না।

মনে হলো একটা কিছুর মীমাংসা হয়ে গেছে। অতএব সে আবার বসলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করবে? ও বললো, ভাবতে হবে আমাকে। জানি না। আমাকে ভাবতে হবে। বুদ্ধুর দল, আমি যদি আমার কথাগুলো ওদের মন দিয়ে শোনাতে পারতাম!

ঠিক ওই সময় স্যাডি এসে ঘরে ঢুকলো। বরং সে দরজায় টোকা দিলো, আমি চেঁচিয়ে আসতে বললাম, আর সে প্রবেশ করলো।

সে বললো, এই যে, তারপর গোটা দৃশ্যের উপর একবার চোখ বুলিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমার টেবিলের উপরে রাখা সুরার বোতলের দিকে তাকিয়ে স্যাডি বললো, একটু পানাহার করলে কেমন হয়?

আমি বললাম, ঠিক আছে।

কিন্তু স্পষ্টতঃই আমি আমার গলায় প্রয়োজনীয় খুশীর আমেজটি লাগাতে পারি নি।

কিংবা সে বাতাসের গন্ধ থেকে টের পেয়েছিলো যে কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে,

আর এসব বুঝবার ক্ষমতা যদি কারো থেকে থাকে তবে সে হলো স্যাডি।

যাই হোক, সে মাঝপথে থেমে জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার?

আমি সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিলাম না। সে অস্থির দ্রুত পায়ে টেবিলের কাছে চলে এলো। সব সময়ই তার চলাফেরা ছিলো ওইরকম। পরনে একটা আকারহীন বেমানান নীল সামার-স্যুট। দেখলেই মনে হয় সে একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড কাপড়ের দোকানে ঢুকে, চোখ বন্ধ করে, একটা পোশাকের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছে, ওটা নেবো আমি।

সে হাত বাড়িয়ে আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিলো, নিজের হাতের উল্টো পিঠে সেটা বার দুই ঠুকলো, তারপর তার উজ্জ্বল চোখ দুটি আমার মুখের উপর স্থাপন করলো।

আমি বললাম, কিছু না। শুধু এই যে, উইলি বলছে ও গভর্ণর হচ্ছে না।

আমার দিকে তাকিয়ে স্যাডি বললো, তাহলে তুমি একে বলে দিয়েছো।

আমি বললাম, যা তা বলো না ! আমি কাউকে কখনো কিছু বলি না ! আমি শুধু শুনে যাই।

সে কব্জির একটা বিশ্রী হ্যাঁচকা টানে দেশলাইর কাঠি বার করে উইলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কে তোমাকে বলেছে?

তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে উইলি জানতে চাইলো, আমাকে কি বলেছে?

স্যাডি বুঝতে পারলো যে সে ভুল করে ফেলেছে। এ জাতীয় ভুল স্যাডি বার্ক সচরাচর করে না। আপনি কি জানেন সে সেটা জেনে নিতো, নিজে কি জানে তা ঘুণাক্ষরেও আপনাকে জানতে দিতো না, আর এই করেই সে বস্তির কুঁড়েঘর থেকে দুনিয়ার এতো দূর অবধি উঠে এসেছে। সে কখনো বুক চিতিয়ে মুখোমুখি আক্রমণ করতো না। তার কায়দা ছিলো অন্যরকম। আপনি অসতর্ক হয়ে ভারসাম্য হারাবেন, আর স্যাডি তখুনি লম্বা একটা সীসার দণ্ড দিয়ে আপনাকে আঘাত করবে। কিন্তু এবার সে সামনাসামনি আক্রমণ করেছে। স্যাডি বার্কের ভেতরে, অনেক দূরে কোথাও, একটা ধারণা ছিলো যে আমি হয়তো উইলিকে বলে দেবো। অথবা আর কেউ উইলিকে বলে দেবে, আর তাই স্যাডি বার্ককে কিছু বলতে হবে না। অথবা এতো সুনির্ধারিত কিছু নয়। গভীর অন্ধকারে উইলির ধারণাটা আর উইলি যা জানে না সেই ধারণাটা শুধু ভেসে বেড়াচ্ছিলো, ঘূর্ণির টানে দুটো কুটো যেভাবে নদীর গভীরে তলিয়ে গিয়ে অন্ধকারে ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে সেই ভাবে শুধু ঘুরছিলো। কিন্তু জিনিসটা ছিলোই। সর্বক্ষণ।

আর তাই, সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে, না জেনে, কিংবা নিজের অজ্ঞাত কোনো

ইচ্ছা বা ভয়ের তাগিদে সে এবার মুখোমুখি আক্রমণ করে বসেছিলো। এবং ওখানে দাঁড়িয়ে, আগুন না-ধারানো সিগারেটটা তার বলিষ্ঠ আঙুলে মোচড়াতে মোচড়াতে সে ব্যাপারটা বুঝলো। ততক্ষণে ফোঁকরের মধ্যে পয়সা ঢোকানো হয়ে গেছে, আর উইলির দিকে তাকিয়ে আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে মেশিনের মধ্যে চাকা, কলকব্জা, চেরীফল আর লেবু ঘুরতে শুরু করেছে।

উইলি জিজ্ঞাসা করলো, আমাকে কি বলেছে?

আবার।

সে লঘু সুরে জবাব দিলো, তুমি যে গভর্ণর হচ্ছো না সেই কথা।

বলেই স্যাডি আমার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করলো। বোধহয় তার জীবনে ওই একবারই স্যাডি কারো কাছে এস. ও. এস. সাহায্যবার্তা পাঠিয়েছিলো।

কিন্তু সমস্যাটা তার। তাকেই সমাধান করতে দিলাম আমি।

স্যাডি একপাশে সরে এলো, আমার মদের বোতলের ছিপি খুলে একপাত্র পানীয় ঢেলে নিলো, এবং কোনোরকম ভদ্রমহিলাসুলভ গলা খাঁকারি না দিয়ে তা গলাধঃকরণ করলো। আর উইলি সারাক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে রইলো।

উইলি জিজ্ঞাসা করলো, আমাকে কি বলেছে?

স্যাডি কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

আর ওই একইভাবে স্যাডির দিকে তাকিয়ে, মৃত্যু আর ট্যাক্সের মতো গলায়, উইলি আবার জিজ্ঞাসা করলো, আমাকে কি বলেছে?

এবার স্যাডি যেন ক্ষেপে গেলো। সে কোনো দিকে না তাকিয়ে তার হাতের গ্লাস সজোরে ট্রের উপর নামিয়ে রাখলো। গ্লাসটা ঝনঝন শব্দ করে উঠলো। স্যাডি চেঁচিয়ে বললো, নিকুচি করি তোমার! বোকা, বুদ্ধু, বেকুবের হদ্দ!

উইলি সেই একই রকম গলায় বললো, ঠিক আছে।

প্রতিপক্ষ দিশেহারা হয়ে যেখানে সেখানে আঘাত করতে শুরু করলে মুষ্টিযোদ্ধা যে রকম একাগ্রভাবে প্রত্যাঘাত করে উইলি সেইভাবে জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপারটা কি?

ঠিক আছে। শোনো, বুদ্ধুর রাজা। তোমাকে নিয়ে ওরা খেলেছে।

ত্রিশ সেকেন্ড ধরে উইলি এক দৃষ্টিতে তাকে দেখলো, উইলির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই। আমি কান পেতে ওই শব্দ শুনলাম।

তারপর সে বললো, খেলেছে?

হ্যাঁ! আবু কি ভাবে যে খেলেছে!

স্যাডি তার দিকে ঝুঁকে বসলো। মনে হলো তার চোখ দু'টিতে একটা তীব্র প্রতিহিংসামূলক জয়ের আলো জ্বলছে, গলায় বাজছে সেই একই রকম সুর। স্যাডি বললো, অন্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য ওরা তোমাকে একটা পুতুল সাজিয়েছে। আর তুমি নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছো। হ্যাঁ, তুমি নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছো, কারণ তুমি ভেবেছো যে তুমি হলে ঈশ্বরের শ্বেতশুভ্র কচি মেষ — এইখানে স্যাডি একটু থেমে মুখ বাঁকিয়ে করুণ তাচ্ছিল্যভরা সুরে বার দুই ব্যা ব্যা করলো, তারপর আবার বললো, হ্যাঁ, তুমি ভেবেছিলে যে তুমি ঈশ্বরের পবিত্র মেষ, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কি জানো তুমি আসলে কি?

সে থামলো, যেন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলো, কিন্তু উইলি কোনো কথা না বলে তার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলো।

স্যাডি বললো, তুমি হলে পাঁঠা। বলির পাঁঠা। তুমি হলে ঝোপের মধ্যেকার ভেড়া। একটা বোকাস্য বোকা। কারণ তুমি নিজেকে ওদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে দিয়েছো, অথচ সেজন্য নিজে কিছু পাও নি। তোমার বিপর্যয়ের মূল্য হিসেবে ওরা হয়তো কিছু টাকা পয়সা তোমাকে দিতো, কিন্তু তোমার মতো বেকুবকে তাও দিতে হয় নি। তুমি আপনাতে আপনি এতোই পরিপূর্ণ ছিলে, নিজেকে এতোই যীশু খ্রীস্টের মতো ভেবেছিলে, যে তুমি আর কিছুই চাও নি, মঞ্চে উঠে পেছনের দু'পায়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু বক্তৃতা করতে চেয়েছিলে। বন্ধুরা আমার — স্যাডি মুখ বাঁকিয়ে জঘন্য ভঙ্গিতে ভাঁড়ের ভঙ্গি নকল করলো — বন্ধুরা আমার, এই স্টেটের যা দরকার তা হলো পাঁচ পয়সা দামের একটা ভালো চুরুট। ওহ্ ভগবান!

স্যাডি বন্য কৃত্রিম হাসিতে ফেটে পড়লো। হঠাৎ তার হাসিতে বাধা পড়লো। উইলি জিজ্ঞাসা করলো, কিন্তু কেন?

সে এক দৃষ্টিতে স্যাডিকে দেখছিলো, তার নিঃশ্বাস পড়ছিলো জোরে জোরে, কিন্তু এ ছাড়া তার মধ্যে অন্য কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিলো না। উইলি জিজ্ঞাসা করলো, কেন ওরা এরকম করলো? আমার সঙ্গে কেন?

স্যাডি আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললো, ওহ্, ভগবান! বুদ্ধুর কথা শোনো। তিনি জানতে চাইছেন কেন!

তারপর সে আবার এক ঝটকায় ওর দিকে ঘুরে ঝুঁকে পড়ে বললো, শোনো, তোমার মোটা মাথায় জিনিসটা ঢোকে কিনা দেখো। ওরা তোমাকে দিয়ে ম্যাকমারফির ভোটে ফাটল ধরাতে চেয়েছিলো। বুঝলে কিছু? নাকি গোটা ছবিটা আঁকতে হবে? বলো, এবার তোমার নিরেট মস্তিষ্কে কিছু প্রবেশ করলো?

ও ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকালো, ঠোঁট ভেজালো, তারপর বললো, একথা

কি সত্য?

ছাদের দিকে চোখ তুলে স্যাডি প্রার্থনার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলো, ওহ্ ভগবান, ও জানতে চায় একথা কি সত্য!

উইলি আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, একথা কি সত্য?

আমি বললাম, ওরা তো তাই বলেছে আমাকে।

এতক্ষণে সে চোট খেলো। না, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তার মুখ দেখে মনে হলো সে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করছে, কিংবা এখুনি কান্নায় ফেটে পড়বে। কিন্তু দুটোর কোনোটাই সে করলো না। হাত বাড়িয়ে সে টেবিলের উপর থেকে বোতল তুলে নিয়ে একটা গ্লাসে অনেকখানি পানীয় ঢাললো, তারপর নির্জলা তার গলায় ঢেলে দিলো। একজন আইরিশকে মাটিতে শুইয়ে ফেলার মতো যথেষ্ট ছিলো ওই মাত্রা।

আমি বললাম, এই, আস্তে। তুমি এতে অভ্যস্ত নও।

স্যাডি ট্রে–সহ বোতলটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বললো, উনি অনেক কিছুতেই অভ্যস্ত নন। তিনি যে গভর্ণর হতে যাচ্ছেন না সেই ধারণাতেও তিনি অভ্যস্ত নন। কি, অভ্যস্ত তুমি? উইলি?

উইলি বোতল হাতে তুলে নিলো এবং আবার আগের মতো করলো।

স্যাডি জানতে চাইলো, অভ্যস্ত তুমি?

এখন আর তার মধ্যে ছোটো ছেলেকে মিনতি করার ভঙ্গি নেই।

উইলি মুখ তুলে ওকে দেখলো। এখন উইলির মুখে রক্তোচ্ছ্বাস, অবিন্যস্ত চুলের গুচ্ছ কপালের উপর ঝুলে পড়েছে, সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। উইলি বললো, ছিলাম না, আগে। কিন্তু এখন হয়েছি।

স্যাডি জিজ্ঞাসা করলো, কি ছিলে না?

অভ্যস্ত ছিলাম না।

বোতলটা ওর দিকে আবার ঠেলে দিয়ে সশব্দে হেসে উঠে স্যাডি বললো, চটপট অভ্যস্ত হয়ে যাও।

সে বোতলটা হাতে নিলো, গ্লাসে মদ ঢাললো, পান করলো, তারপর সন্তর্পণে গ্লাস নামিয়ে রেখে বললো, না, আমি অভ্যস্ত হবো না।

স্যাডি আবার হেসে উঠলো, বন্য ও কৃত্রিম হাসি, তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে ওর কথার প্রতিধ্বনি করলো, তিনি বলছেন যে তিনি অভ্যস্ত হবেন না। ওহ্, ভগবান।

স্যাডি আবার হেসে উঠলো।

উইলি তার চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকলো, এখন আর গা এলিয়ে নয়, তার মুখে বড়ো বড়ো ঘামের বিন্দু দেখা দিতে শুরু করেছে, বিন্দুগুলি ওর চকচকে মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু তার কোনো খেয়াল নেই। মুখের স্বেদবিন্দু সে মুছলো না, চেয়ারে চুপ করে বসে থেকে স্যাডির হাসির দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর হঠাৎ সে তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি ভাবলাম ও বুঝি স্যাডির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। স্যাডিও নিশ্চয় তাই ভেবেছিলো, কারণ তার হাসি বন্ধ হয়ে যায়। তীক্ষ্ণ উচ্চগ্রামে উঠবার ঠিক মাঝপথে। কিন্তু উইলি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না। সে তার দিকে তাকালো না। গোটা ঘরের চারপাশে সে একবার চোখ বুলালো, তারপর নিজের সামনে হাত দুটো উঁচু করে প্রসারিত করলো, যেন কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে। তারপর সে বললো, আমি ওদের খুন করবো ! আমি ওদের খুন করে ফেলবো !

স্যাডি তার দিকে ঝুঁকে তার বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, আহ্, বসো তো।

ওর পা দুটি খুব দৃঢ় অবস্থায় ছিলো না। সে পড়ে গেলো, তার চেয়ারে।

বসে বসে ঘামতে ঘামতে সে আবার বললো, আমি ওদের খুন করবো।

স্যাডি স্পষ্ট করে বললো, তুমি ওসব কিছুই করবে না। তুমি গভর্ণর হবে না, না হবার জন্য কোনো টাকাপয়সা পাবে না, আর তুমি ওদের খুনও করবে না, ওদের নয়, অন্য কাউকেও নয়, আর কেন করবে না তা জানো ?

সে আবার বললো, আমি ওদের খুন করবো।

স্যাডি তার দিকে ঝুঁকে বললো, শোনো, কেন করবে না তা বলছি। কারণ তুমি একটা বুদ্ধু। একটা পুতপুতে নির্বীর্য গ্রাম্য বুদ্ধু। তুমি হলে —

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি কি খেলা খেলছো জানি না। এতে আমার কোনো উৎসাহ নেই। কিন্তু এখানে বসে বসে আমাকে এসব দেখতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

স্যাডি তার মুখও ফেরালো না। আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। আমি শেষ পর্যন্ত শুনলাম, সে উইলির বোকামির বিশদ সংজ্ঞা দিচ্ছে। আমার মনে হলো ও-কাজটা করতে হলে যে কোনো লোকেরই প্রচুর সময় লাগবে।

সেদিন রাতে আপটনের অনেক কিছু আমার দেখা হয়ে যায়। পিকচার প্যালেস থেকে রাতের শেষ ছায়াছবি দেখে আমি লোকজনদের বেরিয়ে আসতে দেখলাম। চাঁদের আলোয় আমি সমাধি-ক্ষেত্রের প্রবেশপথ আর স্কুলভবনের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। আমি নালার উপরকার সেতুর রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে জলের বুকে থুতু ফেললাম। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে আমি হোটেলে ফিরলাম।

আমার ঘরের দরজা খুলে দেখি স্যাডি লেখার টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে ধূমপান করছে। ঘরের বাতাস এতো ঘন যেন তাকে ছুরি দিয়ে কাটা যাবে। টেবিলের উপর রাখা ল্যাম্পের আলোয় আমি দেখলাম স্যাডিকে ঘিরে একরাশ নীল ধোঁয়া ভাসছে আর কুণ্ডলী পাকিয়ে উপর দিকে উড়ে যাচ্ছে। আমার মনে হলো আমি যেন একটা একোয়েরিয়ামের মধ্যে ওকে দেখছি। ট্যাঙ্কভর্তি বাসনধোয়া সাবানগোলা জলের মধ্যে ও ডুবে বসে আছে। টেবিলের উপরে মদের বোতলটা শূন্য।

একটি কি দুটি মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো উইলি বোধহয় চলে গেছে। তারপরই বস্তুটি আমার চোখে পড়লো।

আমার বিছানার উপর পড়ে আছে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আমি বললাম, সব কিছু শান্ত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ।

বিছানার কাছে এগিয়ে এসে আমি বস্তুটি পর্যবেক্ষণ করলাম। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কোট উপরে উঠে এসে বগলের নিচে চাপা পড়েছে, হাত দুটি বুকের উপর আড়াআড়ি করে স্থাপিত, বেল্টের ভেতর থেকে শার্ট উঠে এসেছে, নিচের দুটো বোতাম খুলে গেছে, তাঁর ফাঁক দিয়ে ঈষৎ খোলা পেটের সাদা ত্রিকোণ অংশ দেখা যাচ্ছে, কয়েকটা রুক্ষ কালো কেশও চোখে পড়ছে, প্রতিটি নিয়মিত মাপা নিঃশ্বাস বেরুবার সময় ওর নিচের মিষ্টি পুরু ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভারী চমৎকার সব কিছু।

স্যাডি বললো, কিছুক্ষণ খুব হৈচৈ করেছিলো। সে কি কি করবে সব বললো আমাকে। বিরাট বিরাট কাজ করবে ও। প্রেসিডেন্ট হবে। খালি হাতে ওই লোকগুলোকে সে খুন করবে। ওহ্ ভগবান!

স্যাডি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো, তারপর সেই ধোঁয়া মুখের দিকে ফিরে আসার উপক্রম করতেই হিংস্রভাবে তার ডান হাতের ঝাপটা দিয়ে তা দূরে সরিয়ে দিলো, তারপর কড়া সুরে, অকস্মাৎ এক বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়ের ভঙ্গিতে, তৃপ্ত গলায়, ঠাকুরমার মতো করে বললো, তবে আমি ওকে শান্ত করেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ও কি বারবেকিউতে যাচ্ছে?

স্যাডি খেঁকিয়ে উঠলো, তার আমি কি জানি? প্রীতিভোজের মতো ওরকম তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে কোনো কথা বলে নি। না, না, তার কারবার আরো অনেক বড়ো

বিষয় নিয়ে। কিন্তু — স্যাডি সিগারেটে টান দিলো, ধোঁয়া ছাড়লো, ধোঁয়া তাড়ালো, তারপর বললো, কিন্তু আমি ওকে শান্ত করি।

মনে হচ্ছে বেদম একটা ঘুষি মেরেছো।

না, ঘুষি মারি নি। যেখানে ওর জান্ সেইখানে আঘাত করেছি। ও যে কতখানি বুদ্ধু শেষ পর্যন্ত ওই কথাটা ওর মাথায় ঢোকাতে পেরেছি। আর তাতেই ও শান্ত হয়।

আমি টেবিলের দিকে অগ্রসর হতে হতে বললাম, হ্যাঁ, এখন যে শান্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চট করে এতটা শান্ত হয়ে যায় নি। প্রথমে একটু শান্ত হয়ে চেয়ারে বসে, নিজেকে সামলাবার জন্য বোতল আঁকড়ে ধরে, তারপর ঈশ্বর জানেন, কোন এক লুসিকে কথাটা কিভাবে বলবে তা নিয়ে খানিকক্ষণ আবোল-তাবোল বকতে থাকে।

লুসি হলো তার স্ত্রী।

কথা শুনে মনে হচ্ছিল ওর আয়া কিংবা মা। আদর করে ওর চোখের জল মুছিয়ে দেবে। তারপরই বলেছিলো যে ও এখনই নিজের ঘরে গিয়ে লুসিকে একটা চিঠি লিখবে। কিন্তু — স্যাডি বিছানার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললো, দরজা অবধিও সে যেতে পারে নি, ঘরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনোরকমে গিয়েছিলো, তারপর হুড়মুড় করে বিছানায় পড়ে যায়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানার কাছে গিয়ে নিচু হয়ে স্যাডি তাকে দেখলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ডাফি জানে?

ডাফির জানা না-জানা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

আমিও এবার বিছানার কাছে এগিয়ে গেলাম। আমি বললাম, মনে হচ্ছে ওকে এখানেই রাখতে হবে। ঠিক আছে, আমি ওর ঘরে ঘুমুবো।

নিচু হয়ে ঝুঁকে ওর ঘরের চাবির খোঁজে আমি তার পকেটে হাত ঢুকালাম। চাবি পাওয়া গেলো। তারপর আমি আমার টুথব্রাশ আর ব্যাগ থেকে পাজামা বার করে হাতে নিলাম।

স্যাডি তখনো বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলো। আমাকে লক্ষ করে সে বললো, তুমি অন্ততঃ হতভাগার জুতোজোড়া খুলে দিলে পারতে।

আমি বিছানার পাশে আমার হাতের জিনিস নামিয়ে রেখে তাই করলাম। তারপর আবার টুথব্রাশ ও পাজামা হাতে তুলে নিয়ে সুইচ টিপে বাতি নেভাবার জন্য টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। স্যাডি তখনো বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে আমাকে বললো, তুমি বরং মা-মণি লুসির কাছে ওই চিঠিটা লিখে দাও, আর জিজ্ঞেস করো কোন্ ঠিকানায় এই ধ্বংসাবশেষ পাঠাবো।

সুইচের উপর হাত রেখে আমি মুখ ঘুরিয়ে স্যাডিকে দেখলাম। ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে আছে সে, আমার দিক থেকে তার বাঁ হাতটা দেখা যাচ্ছে, তার দেহের পাশ দিয়ে সোজা নামানো, দু'আঙ্গুলের ডগায় একটা সিগারেট ধরা, সেখান থেকে ধোঁয়া ধীরে ধীরে উর্ধে উঠে যাচ্ছে, মাথাটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে কি একটা ভাবতে ভাবতে সে তার ঈষৎ স্ফূরিত চকচকে নিচের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

ওই হলো স্যাডি, বস্তির কুঁড়েঘর থেকে যে অনেক দূর উঠে এসেছে। সে অনেকদূর এসেছে কারণ সে জেতার জন্য খেলেছে, আর সে শুধু জেতার ইচ্ছা নিয়েই খেলে নি, সে জানতো যে জিততে হলে ঠিক সংখ্যাটির উপর টাকা ধরতে হবে, আর নিজের সংখ্যাটি না উঠলে পাশে দাঁড়ানো লোকটা তার দণ্ড দিয়ে সব টাকা তার দিকে টেনে নেবে, এবং তখন আপনার টাকা আর আপনার থাকলো না। সে অনেক কিছু দেখেছে, চোখে চোখ রেখে বহু পুরুষের সঙ্গে কথা বলেছে, তাদের কেউ কেউ ওকে পছন্দ করেছে, যারা করে নি তারাও স্যাডি কথা বলতে শুরু করলে মন দিয়ে তার কথা শুনেছে, অবশ্য ওরকম খুব বেশি ঘটে নি, কারণ ওর বড়ো কালো চোখ দিয়ে, সেই কালোটা কি উপর স্তরের কালো নাকি গভীরের কালো তা নিশ্চিত করে বলতে পারা ছিলো অসম্ভব, ও যখন ঘুরতে শুরু করার আগে চাকাটা লক্ষ করতো তখন তার ওই বড়ো কালো চোখ দুটি যেন ঠিক দেখছে সেটা কোথায় গিয়ে থামবে, কোন্ সংখ্যার উপর ছোট বলটি গিয়ে দাঁড়াবে। ওই পুরুষদের কেউ কেউ তাকে খুবই পছন্দ করতো, যেমন সেন্‌-সেন্‌। এটা আমি এক সময় বুঝতে পারতাম না। আমি দেখতাম ঢোলা বেমানান জামাকাপড় পরা একটা মেয়ে, মুখভর্তি দাগ, ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক, উজ্জ্বল প্রদীপের মতো একজোড়া চোখ আর একঝাঁক কালো চুল কানের কাছাকাছি এসে নির্দয়ভাবে ছাঁটা, যেন একটা মাংস-কাটা ছুরি দিয়ে ঘ্যাচ করে কেটে ফেলা হয়েছে।

তারপর এক সময়, অকস্মাৎ, আমি অন্য কিছু দেখলাম। আপনি দীর্ঘকাল আপনার আশেপাশে একটি মেয়েকে দেখে আসছেন, আপনার মনে হয়েছে সে কুশ্রী। তারপর হঠাৎ আপনার মনে হয়েছে, আচ্ছা, ওর ওই ঢোলা বেমানান জামাকাপড়ের নিচে ও সত্যি সত্যি কি রকম। তারপর, অকস্মাৎ, দাগভর্তি মুখোশের নিচে আরেকটা মুখ আপনি দেখতে পান, যেমুখ নম্র, নিষ্কলুষ, বিশ্বাসপ্রবণ, যা আপনাকে মুখোশটা ওঠাতে বলছে। একজন বৃদ্ধ যেন তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ, এক মুহূর্তের জন্য, ত্রিশ বছর আগে দেখা একটি মুখ দেখতে পেলো। শুধু এক্ষেত্রে আমি বহুদিন আগে দেখা একটি মুখ মনে পড়ার কথা বলছি না, আমি

বলছি যেমুখ আমি কখনো দেখি নি সেই মুখ অকস্মাৎ আবিস্কার করার কথা। এ অতীত নয়, ভবিষ্যত। ভারী ওলটপালট করে দেয়া একটা ব্যাপার। সাময়িকভাবে। আমি চেষ্টা চালিয়েছিলাম, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

স্যাডি আমার মুখের উপর হেসে উঠে বলেছিলো, আমার নিজের কিছু ব্যবস্থা আছে এবং যতদিন পর্যন্ত তা আছে আমি সেই অনুযায়ী চলতে চাই।

সে সব ব্যবস্থা কি আমি তা জানতাম না। এসব মিঃ সেন্‌-সেন্‌ পাকেটের দৃশ্যপটে আবির্ভূত হবার আগের কথা। তখনো স্যাডি ঠিক সংখ্যাটি নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করার নিজস্ব ক্ষমতার পরিচয় তাকে দেয় নি।

ল্যাম্পের সুইচের উপর হাত রেখে আমি যখন স্যাডি বার্ককে দেখছিলাম তখন যে এসব কথা আমার মনে পড়ছিলো তা নয়। কিন্তু আমি এসব কথা এখানে বললাম এই জন্য যে, যে-স্যাডি বার্ক এই মুহূর্তে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে একটা অসাড় দেহের দিকে তাকিয়ে আছে, যাকে আমি সুইচের উপরে হাত রেখে দেখছিলাম, সে কোথা থেকে উঠে এসেছে, সে যে সরাসরি মুখোমুখি অসতর্কভাবে কাউকে আক্রমণ না করার জন্যই এতটা উঠতে পেরেছে, আর আজ রাতে যে সে ওই কাজটাই করে ফেলেছে তা যেন আপনি বুঝতে পারেন সেজন্যই এসব কথা এখানে বলা।

অন্ততঃ আমি ব্যাপারটা ওভাবেই দেখেছিলাম।

আমি বাতি নিভিয়ে দিলাম, স্যাডি আর আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে হলের দোরগোড়ায় পরস্পরকে শুভরাত্রি জানালাম।

পরদিন সকাল ন'টার দিকে স্যাডি আমার দরজায় ধাক্কা দিলো। একটা পুকুরের তলা থেকে কোনো খড়কুটো যেমন ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে আমি সেইভাবে আমার কর্দমাক্ত ঘুমের অতল থেকে সাঁতার কেটে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলাম। দরজার কাছে গিয়ে আমি বাইরে মাথা বের করে দিলাম।

কোনো রকম সৌজন্য ভদ্রতার প্রস্তুতিপর্বের তোয়াক্কা না করে ও বললো, শোনো, ডাফি মেলার ময়দানে যাচ্ছে, আমি ওর গাড়িতে যাবো। সেখানে বেশ কয়েকজন হোমরাচোমরার সঙ্গে ওর দহরম মহরম করতে হবে। ও চেয়েছিলো বুদ্ধুটা যেন বেশ সকালেই ওখানে গিয়ে জনগণের সঙ্গে একটু ভাইয়াচারি করে, কিন্তু আমি ডাফিকে বলে দিয়েছি যে সে তেমন সুস্থ নয়, একটু পরে যাবে।

আমি বললাম, আমি এর জন্য মাইনে পাই না, তবু ঠিক আছে, আমি ওকে পৌছে দিতে চেষ্টা করব।

সে পৌছাক বা না পৌছাক আমার কিচ্ছু এসে যায় না। তার জন্য আমার কান

কাটা যাবে না।

তবু আমি ওকে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করবো।

সে তোমার ইচ্ছা।

বেঢপ পোশাক পরা স্যাডি হলঘর পার হয়ে চলে গেলো।

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, দেখলাম আরেকটা কড়া দিন আসছে। দাড়ি কামিয়ে জামাকাপড় পরে আমি কফি খেতে গেলাম, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম। ভেতরে একটা শব্দ হলো, যেন পালকের পিপার মধ্য থেকে একটা বাদ্যযন্ত্র শুধু একবার গাঁক করে উঠলো। অতএব আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। গত রাতে দরজায় তালা লাগাই নি আমি।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে।

উইলি তখনো বিছানায়। একই জায়গায়। কোট বগলের নিচে কুঁচকে আছে, হাত দুটি বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখা, মুখ পাণ্ডুর ও নিষ্পাপ। আমি বিছানার কাছে এগিয়ে গেলাম। ও মাথা নাড়ালো না, কিন্তু এমনভাবে আমার দিকে চোখ ঘোরালো, মনে হলো কোটরের মধ্যে যেন চোখের মণি দুটি ঘোরাবার শব্দ শুনলাম আমি।

আমি বললাম, সুপ্রভাত।

সে একটুখানি মুখ ফাঁক করলো, জিভটা সামান্য বেরিয়ে এনে সন্তর্পণে ঠোঁট দুটি পরীক্ষা করে ভিজিয়ে নিলো। তারপর সে দুর্বলভাবে হাসলো, যেন দেখে নিচ্ছে কোনোকিছু ভেঙে বা ফেটে গেছে কিনা। যখন তেমন কিছু মনে হলো না তখন সে ফিস ফিস করে বললো, কাল রাতে আমি মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম, তাই না?

লোকে তো ঐ অবস্থাটাকে ওই নামেই অভিহিত করে।

জীবনে এই প্রথম এরকম হলো। আগে কখনো মাতাল হই নি। মাত্র একবার ছাড়া আমি মদ স্পর্শই করিনি কখনো।

জানি। লুসি মদ্যপান পছন্দ করে না।

আমার মনে হয় ওকে বুঝিয়ে বললে ও ব্যাপারটা বুঝবে। কেন আমি ওরকম করলাম তা ও উপলব্ধি করবে।

সে আবার ভাবনায় ডুবে গেলো।

কেমন বোধ করছো তুমি?

মেঝেতে পা ঝুলিয়ে সে উঠে বসে বললো, ভালো।

তার মোজাপরা পা দুটি মেঝেতে রেখে নিজের ভেতরকার যাবতীয় টানাপোড়েনের একটা হিসাব নিলো সে, তারপর বললো, হ্যাঁ, ভালো বোধ করছি

আমি।

প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে যাচ্ছো?

চেহারায় একটা সপ্রশ্ন ভঙ্গি ফুটিয়ে, বেশ পরিশ্রম করে, মাথাটা এমনভাবে ঘুরিয়ে সে আমার দিকে তাকালো যেন ওই জিজ্ঞাসার উত্তর আমার দেবার কথা। তারপর সে জানতে চাইলো, এ প্রশ্ন কেন করছো?

হয়ে, এর মধ্যে তো অনেক কিছু ঘটে গেছে।

হুঁ। আমি যাচ্ছি।

ডাফি আর স্যাডি চলে গেছে। ডাফি চায় তুমি গিয়ে সাধারণ লোকজনের সঙ্গে একটু মেলামেশা করো।

ঠিক আছে।

সে তার পায়ের কাছ থেকে ফুট দশেক দূরে মেঝের উপর একটি দাগের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, তারপর আবার জিভ দিয়ে কোমলভাবে ঠোঁট স্পর্শ করে বললো, খুব তেষ্টা পেয়েছে আমার।

আমি বললাম, তোমার ভেতরটা জলশূন্য হয়ে গেছে। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। তবে মদ ওভাবেই খেতে হয়। নইলে কোনো লাভ হয় না।

কিন্তু সে আমার কথা শুনছিলো না। জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে সে বাথরুমে ঢুকলো।

আমি জলের ঝাপটা, ঢোঁক ঢোঁক করে জল খাওয়া, আর জোরে নিশ্বাস নেবার শব্দ শুনলাম। নিশ্চয়ই সরাসরি কল থেকে জল খেলো। প্রায় এক মিনিট পর ওই শব্দ থেমে গেল। কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই। তারপর আবার একটা নতুন শব্দ শোনা গেলো। হ্যাঁ, এবার তার যন্ত্রণার উপশম হবে।

বাথরুমের দরজায় তাকে দেখা গেলো। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে বিষণ্ন তিরস্কারের ভঙ্গি, ঠাণ্ডা ঘামের ফোঁটা চিক চিক করছে তার মুখে।

আমি বললাম, আমার দিকে ওভাবে তাকাবার কোনো দরকার নেই। মদটা ভালোই ছিলো।

সতৃষ্ণ গলায় সে বললো, আমি বমি করেছি।

তো জিনিসটা তোমার প্রথম আবিষ্কার নয়। তাছাড়া এবার তুমি একটা বারবেকিউ করা বিরাট, গরম, রসালো, তাগড়া শুকর মাংসের টুকরো খেতে পারবে।

তার মুখ দেখে মনে হলো না যে কথাটা সে খুব মজাদার মনে করেছে। আমিও করিনি।

তবে কথাটা যে সে খুব বেশি অমজাদার মনে করেছে তাও তার মুখ দেখে মনে হলো না। একটা বোবা–কালার মতো দরজায় হাতল ধরে সে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর আবার বাথরুমে ঢুকে গেলো।

আমি চিৎকার করে বললাম, তোমার জন্য এক কাপ কফির অর্ডার দিচ্ছি। সেটা দেখতে দেখতে তোমাকে চাঙ্গা করে তুলবে।

কিন্তু, না, করলো না। সে কফিটা খেলো কিন্তু কোনো ফয়দা হল না তাতে।

তারপর সে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলো। আমি ওর কপালে ভেজা তোয়ালে চাপিয়ে দিতেই সে চোখ বুঁজলো। বুকের উপর সে তার দুটি হাত তুলে দিলো, তার মুখের দাগগুলিকে মনে হলো যেন পালিশ করা শ্বেত পাথরের উপর মরচে পড়া কয়েকটা দাগ।

সোয়া–এগারোটার দিকে হোটেলের ডেস্ক খবর দিলো যে দু'জন ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে এসেছেন, মিঃ স্টার্ককে তাঁরা মেলা প্রাঙ্গণে নিয়ে যাবেন। আমি ফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে উইলির দিকে তাকালাম। তার চোখ দুটি এখন খোলা, দৃষ্টি ছাদের উপর নিবদ্ধ।

আমি লবিতে গিয়ে স্থানীয় মাঝারি গোছের দুই নেতাকে ঠেকাবার চেষ্টা করলাম। খবরের কাগজে নাম ওঠার লোভে তারা এমনকি গভর্নরের শবাধার বহনকারী গাড়িটায় একসঙ্গে যেতে পর্যন্ত রাজী হতেন। আমি তাদের ঠেকালাম, বললাম যে মিঃ স্টার্কের শরীর তেমন ভালো নেই, আমিই তাঁকে ঘণ্টাখানেক পরে নিয়ে আসবো।

বারোটার সময় আমি আরেকবার কফি চিকিৎসা প্রক্রিয়ার সাহায্য নিলাম। কাজ হলো না। বরং, উল্টো কাজ হলো। ডাফি মেলা প্রাঙ্গণ থেকে ফোন করলো, ক্ষিপ্ত হয়ে জানতে চাইলো ব্যাপারটা কি। আমি তাকে বললাম সে যেন চালিয়ে যায়, হালুয়া রুটি বিতরণ করতে থাকে, আর প্রার্থনা করে যেন বেলা দুটো নাগাদ উইলি ওখানে পৌঁছে যেতে পারে।

ডাফি জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে?

আমি বললাম, আরে, বাবা, যতক্ষণ তুমি সেটা না জানতে পারছো ততক্ষণই তুমি খুশী থাকবে। বলেই আমি ফোন ছেড়ে দিলাম।

বেলা একটার দিকে, কফির সাহায্যে আরেকবার সুস্থ হবার চেষ্টা করে উইলি যখন ব্যর্থ হলো তখন আমি বললাম, শোনো, উইলি, তুমি ওখানে যেতে চাইছো কেন? এখানেই থাকো না কেন? বলে দাও যে তুমি অসুস্থ। যন্ত্রণার হাত থেকে কিছুটা রেহাই দাও নিজেকে। তারপর যদি —

না।

উইলি বিছানার এক কিনারে কোনো রকমে উঠে বসলো। অগ্নিশিখার মধ্যে প্রবেশ করার ঠিক আগে সত্যের জন্য জীবন বিসর্জনকারী কোনো মানুষের মুখ যেরকম দেখায় তার মুখ দেখালো সেই রকম মহীয়ান, নিষ্পাপ আর স্বচ্ছ।

আমি নীরস গলায় বললাম, তা তুমি যখন যাবার জন্য মরীয়া হয়ে আছো তাহলে আরেকটা মাত্র সুযোগ আছে তোমার।

কি, আরো কফি?

আমি বললাম, না। আমার স্যুটকেস খুলে তার ভেতর থেকে আমি আমার দ্বিতীয় বোতলটা বার করে, একটা পাত্রে খানিকটা ঢেলে ওর কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, পুরানো জামানার লোকদের মতে সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে বরফপানিতে দু'মাত্রা আবস্যা ঢেলে তার উপর একটুখানি রাই সর্ষে ছিটিয়ে সেটা গলাধঃকরণ করা। তবে অত সৌখিনতা আমরা করতে পারবো না। অন্ততঃ এই নিষেধাজ্ঞার কালে।

সে পানীয়টা গিলে ফেললো। এক মুহূর্ত পরম দুশ্চিন্তায় কাটিয়ে তারপর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। দশ মিনিট পর আমি এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করলাম। এর পর আমি ওকে জামাকাপড় খুলতে বলে বাথরুমে ওর স্নানের টবে ঠাণ্ডা জল ছেড়ে দিলাম। ও স্নান করতে থাকলো, আর আমি সেই অবসরে হোটেল ডেস্কে ফোন করে আমাদের জন্য একটা গাড়ি আনিয়ে দিতে বললাম। তারপর উইলির ঘরে গেলাম আমি। ওর কিছু পরিষ্কার জামাকাপড় এবং আরেকটা স্যুট আনতে হবে।

ফাঁকে ফাঁকে আমাকে আমার চিকিৎসা চালাবার সময় দিয়ে ও কোনোরকমে পোশাক পরে নিলো।

পোশাক পরার পর ও বিছানার পাশে চুপ করে বসলো, সারা গায়ে যেন লেবেল আঁটা ঃ সাবধান, এই দিক উপরে, কাঁচের জিনিস। কিন্তু আমি ওকে ঠিকই গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হলাম।

ওর দেরাজের উপরের ড্রয়ারে সে তার বক্তৃতাটা ফেলে এসেছিলো। ওটা আনার জন্য আমাকে আবার ফেরৎ যেতে হলো। ফিরে আসার পর উইলি বললো যে ওটা তার দরকার হতে পারে, হয়তো সব কিছু সে ভালো করে মনে করতে পারবে না, তখন কাগজ দেখে পড়ে দেবে।

আমি জবাবে একটা হাল্কা মন্তব্য করলাম কিন্তু ও কান দিলো না।

আসনে গা এলিয়ে ও চোখ বন্ধ করলো আর উঁচু-নিচু কাঁকরের পথ দিয়ে আমাদের গাড়ি মেলা প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে চললো।

আমি এক সময় সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে একটা কুঞ্জকাননের কাছে বেশ কিছু গাড়ি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। মেলার বাড়িঘর চোখে পড়লো আমার, আর নীল আকাশের পটভূমিতে একটি দণ্ডের গায়ে জড়ানো দেখা গেলো একটি মার্কিন পতাকা। কফি গুঁড়ো করবার যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়ে আমি বাজনার শব্দ শুনতে পেলাম। ডাফি জনতার হজমক্রিয়ায় সহায়তা করছিলো।

উইলি হাত বাড়িয়ে আমার ফ্লাস্কের উপর তার হাত রেখে বললো, দাও আমাকে।

আমি বললাম, ধীরে। তোমার অভ্যেস নেই, এর মধ্যে তুমি —

কিন্তু ইতিমধ্যে সে ফ্লাস্ক নিয়ে তার মুখে ঢালতে শুরু করেছে, কলকল শব্দ হচ্ছে একটা, কিছু বলতে চাইলেও সেই শব্দে আমার কণ্ঠস্বর ডুবে গিয়ে আমার সব প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো।

ফ্লাস্কটা যখন আমার হাতে ফেরৎ দিলো তখন সেটা কাৎ করে এক কোণে যতটুকু অবশিষ্ট দেখলাম তা দিয়ে হাইস্কুলের কোনো তরুণীরও এক চুমুক হতো না। কাজেই ওটা আর আমার পকেটে ঢোকাবার কোনো মানে হয়! আমি ছদ্ম বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলাম, তা আপনি কি সুনিশ্চিত যে এটা আপনি শেষ করে ফেলতে চান না?

কেমন আচ্ছন্নের মতো মাথা নেড়ে সে বললো, না, ধন্যবাদ। তারপর সে থরথর করে কেঁপে উঠলো, যেন হঠাৎ ভীষণ শীত করে উঠেছে।

কাজেই বাকিটুকু আমি গলায় ঢেলে খালি বোতলটা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। গাড়ির চালক ছেলেটিকে আমি বললাম, যতোটা কাছে সম্ভব গাড়ি নিয়ে চলো। তা সে বেশ কাছেই নিয়ে গেলো। আমি বেরিয়ে উইলিকে নামতে সাহায্য করে ওর ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। তারপর উইলি আর আমি পায়ে মাড়ানো বাদামী ঘাসের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলাম। আমাদের চারপাশে গিসগিস করা লোকজন যেন কেউ নয়, উইলির দৃষ্টি দূরের দিকচক্রবাল রেখার উপর ন্যস্ত, আর ব্যান্ডে বেজে চলেছে 'কেসি জোনস'-এর সুর।

মঞ্চের যে পাশে বাতাস বইছিলো আমি উইলিকে তার কাছে রেখে চলে এলাম। একটা অচেনা জায়গায় বাদামী ঘাসের উপর ও দাঁড়িয়ে আছে, সম্পূর্ণ একাকী, তার মুখে স্বপ্নভরা ছবি, মাথার উপর অগ্নিময় সূর্য ঝরে পড়ছে।

আমি ডাফিকে পেয়ে বললাম, হস্তান্তর করার জন্য আমি প্রস্তুত, তবে প্রাপ্তির রসিদ চাই।

ডাফি জানতে চাইলো, কি হয়েছে ওর? হারামজাদা তো মদ খায় না। মাতাল

হয়ে গেছে নাকি?

আমি বললাম, ও কখনো ওই দ্রব্য স্পর্শ করে না। ও আসলে দামাস্কাসের পথে চলে গিয়েছিলো, একটা বিশাল আলো দেখেছে ও, আর ওর চোখ অন্ধ হয়ে গেছে।

হয়েছেটা কি ওর?

তোমার পবিত্র গ্রন্থটা আরেকটু বেশি পড়া উচিত। এই মন্তব্যের পর আমি ডাফিকে আমাদের ক্যান্ডিডেটের কাছে নিয়ে গেলাম। একটা মর্মস্পর্শী পুনর্মিলন ঘটলো। কাজেই আমি নিঃশব্দে জনতার মধ্যে মিলিয়ে গেলাম।

প্রচণ্ড ভীড় হয়েছিলো। বাতাসে ভাজা মাংসের গন্ধ অবাক করা কাণ্ড ঘটাতে পারে। লোকজন এবার মঞ্চের সামনে জড়ো হতে শুরু করেছে, কেউ কেউ একেবারে সামনে উঠে এসেছে। মঞ্চের এক ধারে স্থানীয় ব্যান্ড বাজনা বাজিয়ে চলেছে। এখন ওরা 'স্বাগতম, স্বাগতম, দলের সবাই এখানে এখন'-এর সুর বাজাচ্ছিলো। আজ সকালে হোটেলে যে দু'জন স্থানীয় মাতব্বর গিয়েছিলো, যাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত বলে কিছু ছিলো না, তাদের মঞ্চের উপর দেখা গেলো। ওদের সঙ্গে আরেক জনকে দেখলাম। আমার ধারণা তিনি পাদ্রী, প্রার্থনা করার জন্য তাঁকে আনা হয়েছে। আর রয়েছে ডাফি। আর অবশ্যই উইলি। সে অল্প অল্প ঘামছিলো। মঞ্চের পেছন দিকে একসারি চেয়ারে ওরা বসে ছিলো, ওদের পেছনে রঙিন কাপড়ে সাজানো পশ্চাদপট, সামনে রঙিন কাপড়ে মোড়া একটা টেবিল, টেবিলের উপর বড় জগভর্তি জল আর গোটাদুই গ্লাস।

প্রথমে স্থানীয় দুই মাতব্বরের একজন উঠে দাঁড়িয়ে তার বন্ধু ও প্রতিবেশীবর্গকে সম্বোধন করলো, তারপর পাদ্রীকে জনতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। পাদ্রীর পরনে নীল সার্জের পোশাক। রুক্ষ শীর্ণ মুখ ঊর্ধে তুলে, প্রখর সূর্যালোকে চোখ কুঁচকে, তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করলেন। তারপর প্রথম স্থানীয় ব্যক্তি উঠে, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, দ্বিতীয় স্থানীয় ব্যক্তিকে পরিচয় করিয়ে দিলো। কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো এই দ্বিতীয় বক্তাই বুঝি আসল জিনিস, কারণ তার গড়ন দেখে মনে হলো যে গতি না থাকলেও তার টিকে থাকার ক্ষমতা আছে, কিন্তু একটু সময় যেতেই বোঝা গেলো যে প্রথম স্থানীয় বক্তা কিংবা পাদ্রী মহোদয় কিংবা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো সেও আসল জিনিস নয়। শুধু তার মধ্যে যে আসল বস্তুটি নেই সেটা স্বীকার করতে সে একটু বেশি সময় নিলো। এবার উইলির পালা।

এখন উইলি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। সম্পূর্ণ একা। সে শুরু করলো, বন্ধুরা

আমার —। সে তার শ্বেত পাথরের মতো মুখ বিপজ্জনকভাবে এপাশ থেকে ওপাশে নাড়ালো, তার বক্তৃতা লেখা কাগজটি বার করার জন্য কোটের দক্ষিণের পাশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলো।

সে হাতে ধরা কাগজের পাতাগুলি নাড়াচাড়া করলো, তার মুখে একটা আমুদে ভঙ্গি ফুটে উঠলো, যেন কাগজের লেখাগুলি কোনো বিদেশি ভাষায় রচিত, আর এই সময় কে যেন আমার কোটের হাতা ধরে টান দিলো। স্যাডি।

ও জিজ্ঞাসা করল, কি খবর?

জবাব দিলাম, এক নজর দেখে অনুমান করো।

স্যাডি মঞ্চের দিকে বেশ ভালো করে দেখে বললো, কেমন করে করলে?

কুকুরের রোম।

ও আবার মঞ্চের উপর দৃষ্টিপাত করলো, তারপর বললো, রোম না হাতী। গোটা কুকুরই ও গিলে খেয়ে ফেলেছে।

আমি উইলিকে ভালো করে লক্ষ করলাম।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে, দুলছে, মুখে কোনো কথা নেই, উপরে অগ্নিময় সূর্য জ্বলছে।

স্যাডি বললো, ও তো দড়ি ধরে ঝুলে আছে।

আমি জানালাম, সকাল থেকেই এইভাবে আছে। ভাগ্য ভালো যে দড়িগুলো আছে।

স্যাডি তখনো তার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

গত রাতে ও যখন আমার ঘরে অসাড় হয়ে পড়েছিলো তখন স্যাডি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে যেভাবে তাকিয়ে ছিলো এখনও তার চোখে প্রায় সেই দৃষ্টি। এ দৃষ্টি করুণার নয়, ঘৃণারও নয়। দুর্বোধ্য এই চাউনী, যেন কিছু ভাবছে, বিচার করছে। স্যাডি বললো, হয়তো ও জন্মেছেই দড়ির উপর।

ওর গলার সুরে মনে হলো সে বিষয়টার নিষ্পত্তি করে ফেলেছে। কিন্তু তারপরও সে ওই একই দৃষ্টিতে উইলির দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমাদের প্রার্থী তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো। যদিও টেবিলের গায়ে একটু ভর দিয়ে সে এতক্ষণে কথাও বলতে শুরু করেছিলো। দু'তিন রকম করে সে শ্রোতৃবর্গকে তার বন্ধু বলে সম্বোধন করেছে, বলেছে যে সে এখানে আসতে পেরে সবিশেষ আনন্দিত। এখন সে দু'হাত দিয়ে ধরে আছে তার বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি, মাথাটা একটু নামানো, গোলাঘর প্রাঙ্গণে কোনো শিংভাঙা গরুকে গোটা দুই হিংস্র কুকুর আক্রমণ করলে গরুটা যে রকম ভঙ্গি করে তার ভঙ্গি কতকটা সেই রকম।

সে দাঁড়িয়ে আছে উত্তপ্ত সূর্যের নিচে আর তার মুখ বেয়ে ঘামের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ করে। তারপর এক সময় সে আত্মস্থ হলো, মাথা উঁচু করলো।।

সে বললো, এখানে আমার একটা ভাষণ আছে। এই স্টেটের কি দরকার তার কথা বলা আছে এই ভাষণে। কিন্তু এই স্টেটের কি দরকার সে কথা তো আপনাদেরকে আমার বলার দরকার নেই। আপনারাই তো স্টেট। আপনাদের কি দরকার আপনারা তা জানেন। নিজদের প্যান্টের দিকে তাকিয়ে দেখুন। হাঁটুর কাছটা কি ফুটো? নিজেদের পেটের কাছে কান রেখে শুনুন। শূন্য পেট কি গুড়গুড় শব্দ করছে? আপনাদের শস্যের দিকে তাকান। রাস্তাঘাট এতো খারাপ যে বাজারে না নিয়ে যেতে পারার দরুন সেই শস্য কি কখনো ক্ষেতেই পচে গেছে? আপনাদের বাচ্চাদের দেখুন। ওদের জন্য কোনো স্কুল না থাকায় ওরা কি আপনাদের মতোই মূর্খ আর জঞ্জাল হয়ে বেড়ে উঠছে?

উইলি একটু থেমে জনতার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ মিটমিট করলো, তারপর বললো, না, আমি আপনাদের আমার ভাষণ পড়ে শোনাবো না। আমি যা বলতে পারবো আপনারা আপনাদের প্রয়োজনের কথা তার চাইতে অনেক বেশি ভালোভাবে জানেন। কিন্তু আমি আপনাদের একটা গল্প শোনাবো।

সে আবার থামলো, টেবিল ধরে নিজেকে একটু দৃঢ় করে নিলো, বুক ভরে একবার নিঃশ্বাস টানলো, ওদিকে দরদর করে তার ঘামের ফোঁটা পড়তে লাগলো।

আমি স্যাডির দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাটাচ্ছেলের মতলবটা কি?

স্যাডি একাগ্র চিত্তে তাকে দেখতে দেখতে বললো, আঃ, চুপ করো।

উইলি আবার শুরু করলো, খুব মজার গল্প এটা। হাসবার জন্য তৈরি হন আপনারা। সত্যি এটা খুব মজার গল্প। হাসতে হাসতে পেট ফাটিয়ে ফেলার জন্য তৈরি থাকুন। একটা মফস্বলের গাঁইয়া চাষার গল্প। ধরে নিতে পারেন, আপনাদের মতোই কোনো মূর্খ অশিক্ষিত গাঁইয়া চাষার গল্প। হ্যাঁ, আপনাদের মতো। উত্তরের এক খামারে, যে কোনো মায়ের ব্যাটার মতো, কাদামাটি আর নালা-ধোয়া রাস্তায় সে বড়ো হয়ে ওঠে। অমার্জিত অশিক্ষিত গাঁইয়া চাষা হওয়ার মানে কি সেটা সে খুব ভালো করে জানতো। সূর্য ওঠার আগে শয্যা ত্যাগ ক'রে পায়ের পাতায় গোবর মাখিয়ে, গরুকে খাইয়ে, দুধ দুইয়ে, সব কাজ তার শেষ করতে হবে নাস্তা খাবার আগেই। যেন সূর্য ওঠা নাগাদ ছ'মাইল পথ পায়ে হেঁটে সে তার এক কামরার রদ্দি স্কুলবাড়িতে গিয়ে পৌছুতে পারে। ঝড়ো হাওয়ায় পূর্ণ ওই ঝুপড়ি স্কুলভবনটির জন্য, নালা-ধৌত লালমাটির রাস্তা ভেঙে ওখানে পৌছুবার জন্য, কিংবা খচ্চরের গাড়িতে কোনো চাষির ওই পথে চলার সময় গাড়ির অক্ষদণ্ড ভেঙে মুখ থুবড়ে

পড়ার সুযোগের জন্য যে এখানকার মানুষকে কতো বড়ো অঙ্কের ট্যাক্স দিতে হয় তা সে জানতো।

হ্যাঁ, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় একজন শিক্ষাদীক্ষাহীন গ্রাম্য চাষা হবার অর্থ কী সেটা তার জানা ছিলো। সে বুঝেছিলো যে সে যদি কিছু করতে চায় তাহলে তার নিজেকেই সেটা করতে হবে। তাই সে রাত জেগে পড়াশোনা করলো, আইনের বই পড়লো, যেন, সম্ভব হলে, সে এই অবস্থাটা বদলাবার জন্য কিছু করতে পারে। কোনো স্কুল বা কলেজে গিয়ে সে আইন অধ্যয়ন করে নি। সারাদিন ক্ষেতে কঠিন পরিশ্রম করার পর সে রাতে নিজের ঘরে বসে আইনের বই পড়েছে। যেন সে ওই দুঃসহ অবস্থা খানিকটা বদলাতে পারে। তার নিজের জন্য এবং তার মতো অন্যান্য লোকজনের জন্য। আমি আপনাদের কাছে মিছে কথা বলবো না। প্রথমে সে অন্যান্য মূর্খ চাষা মানুষদের কথা ভাবে নি, কেমন করে তাদের জন্য সে বিস্ময়কর সব কাজ করবে সেকথা সে ভাবে নি। গোড়াতে সে নিজের কথাই ভেবেছিলো। কিন্তু তারপর মাঝপথে তার চেতনায় অন্য একটা জিনিস ধরা পড়লো। অন্যের জন্য না করে শুধু নিজের জন্য কিছু করা যায় না, কিংবা অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজের জন্যও কিছু করা যায় না, এটা সে বুঝলো । সব একত্রে করতে হবে, নইলে কিছুই হবে না। এ সত্যটা তার কাছে ধরা পড়লো।

এবং স্বয়ং ঈশ্বরের প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎশিখার মতো এই সত্য তার সামনে উদ্ভাসিত হলো তখনই যখন তার নিজের অঞ্চলে, তার কাউন্টিতে, একটা অসম্ভব করুণ দুর্ঘটনা ঘটলো। সেখানে প্রথমবারের মতো ইটের তৈরি স্কুলভবনটি ধ্বসে পড়ে দশ বারোটি ক্ষুদে শিক্ষার্থীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হলো, মৃত্যু ঘটলো। কারণ সেই স্কুলবাড়িটি বানানো হয়েছিলো রাজনীতি-পচা ইট দিয়ে। তো, আপনারা সে ইতিহাস জানেন। সে ওই স্কুলবাড়ির পেছনে ক্রিয়াশীল পচা ইটের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়েছিলো, কিন্তু ওই লড়াই-এ সে হেরে যায়। আর স্কুলবাড়িটি ধ্বসে পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সে ভাবতে শুরু করে। পরের বার অন্য রকম হবে।

এই সময় মানুষ তার বন্ধু হয়ে ওঠে, কারণ সে ওই পচা ইটের বিরুদ্ধে লড়েছিলো। শহরের কয়েকজন জননেতা এই খবর পায়, তারপর তারা একদিন বিশাল চমৎকার এক গাড়ি করে তার বাবার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়, তাকে অনুরোধ করে নির্বাচনে গভর্নরের জন্য দাঁড়াতে।

আমি স্যাডির বাহু আকর্ষণ করে বললাম, তোমার কি মনে হয় ও —

স্যাডি হিংস্রভাবে বললো, চুপ করো।

মঞ্চে উইলির পেছন দিকে বসা ডাফির দিকে তাকালাম আমি। ওকে কেমন

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখালো। লাল গোল মুখ, ঘামছে, মুখে দুর্ভাবনার ছাপ ফুটে উঠেছে।

উইলি তখন বলছিলো, ওহ্, ওরা তাকে তাই বলেছিলো, আর ওই মুখ্যু চাষাটি সব বিশ্বাস করেছিলো। সে নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে ছিলো, ভেবেছিলো কিছু পরিবর্তন হয় তো সে সাধন করতে পারবে। গভীর বিনয়ের সঙ্গে সে ভেবেছিলো সে হয়তো কিছু চেষ্টা করতে পারবে। সে তো ছিলো নিতান্ত মানবিক, একটা সাধারণ গেঁয়ো মানুষ, আপনাদের সবার মতো সেও বিশ্বাস করতো যে যদি ভেতরে সত্যিকার পদার্থ থাকে, কাজটি করার মতো উপযুক্ত চরিত্র থাকে, তাহলে অতি সাধারণ, অতি দরিদ্র একটি মানুষও গভর্নর হতে পারে। এর পর ডোরাকাটা প্যান্ট পরা লোকগুলি মুখ্যু চাষাটাকে দেখে দলে টেনে নিলো, বললো যে ম্যাকমারফির বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, মাথায় শুধু গোবরপোরা, আর জো হ্যারিসন হল শহুরে মানুষগুলোর হাতের পুতুল। তারা বললো যে তাদের খুব ইচ্ছা গাঁয়ের ওই লোকটা নির্বাচনে দাঁড়াক, মানুষকে একটা সৎ সরকার দেবার চেষ্টা করুক। ওই কথাই তারা ওকে বলেছিলো। কিন্তু —

এইখানে উইলি থামলো, তার ভাষণের পাণ্ডুলিপি ধরা ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে ধরলো, তারপর বললো, ওই লোকগুলো কারা ছিলো আপনারা জানেন? জো হ্যারিসনের ভাড়া করা পা-চাটার দল, ওদের উদ্দেশ্য ছিলো বুদ্ধু চাষাটাকে দাঁড় করিয়ে ম্যাকমারফির ভোটে ভাঙন ধরানো। আমি কি তা বুঝতে পেরেছিলাম? না, পারি নি। কারণ আমি শুধু শুনতে পেয়েছিলাম ওদের মিষ্টি মিষ্টি কথা। এবং এখনো, এই মুহূর্তেও, আমি সেকথা জানতে পারতাম না, যদি না ওই মহিলা, ওই যে ওখানে যাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন — আমি স্যাডির গায়ে কনুই দিয়ে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিলাম, বললাম, ভগ্নী, তোমার চাকুরি এবার গেলো।

উইলি ততক্ষণে স্যাডির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে চলেছে, যদি না ওই মহিলার মধ্যে ওদের নোংরা, কুৎসিত, পূতিগন্ধময় সত্যটা প্রকাশ করে দেবার মতো সততা ও শোভনতা থাকতো।

ডাফি এই সময় উঠে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একটু একটু করে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। সে মরীয়া হয়ে ব্যান্ডের দিকে তাকালো, যেন ওদের বাজাবার জন্য ইঙ্গিত করবে, তারপর জনতার দিকে তাকালো, যেন ওদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবে, কি বলবে সেটা ভাবছে। তারপর সে উইলির কাছে এসে তাকে কি একটা বললো।

কিন্তু যাই সে বলে থাকুক না কেন, তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই উইলি তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, এই যে! উইলি গর্জে উঠলো, এই যে! তার

ভাষণের পাণ্ডুলিপি আঁকড়ে ধরা ডান হাতটা নেড়ে সে বললো, এই যে দেখুন বিশ্বাসঘাতক জুডাস ইস্কারিয়টকে, দেখুন থুতু-চাটাকে।

পাণ্ডুলিপিটা আঁকড়ে ধরে, যেটা সে পড়ে নি, উইলি ডাফির সামনে তার ডান হাতটা সজোরে নাড়ালো। ডাফি তাকে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছিলো কিন্তু তাতে কোন কান না দিয়ে উইলি ডাফির অপসৃয়মান নাকের সামনে তার কাগজ নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে বললো, দেখুন আপনারা, ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তার দিকে।

ডাফি তখনো পিছু হটে যাচ্ছিলো। সে বাজনদারদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললো, বাজাও, বাজাও। জাতীয় সঙ্গীত বাজাও!

কিন্তু ওরা বাজালো না। তখন ডাফি আবার উইলির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, আর ঠিক সেই সময় উইলি আগের চাইতেও জোরে তার হাতে ধরা কাগজটা ডাফির নাকের সামনে উঁচিয়ে চিৎকার করে বললো, দেখুন ওর দিকে তাকিয়ে। জো হ্যারিসনের চামচাকে দেখুন!

ডাফি চেঁচিয়ে বললো, মিথ্যা কথা। উইলির প্রসারিত হাতের সামনে থেকে সে এক পা পিছনে সরে এলো।

উইলি কাজটা করতে চেয়েছিলো কিনা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু কাজটা সে করেছিলো। সে মঞ্চ থেকে ডাফিকে ঠিক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় নি। কিন্তু ডাফির নৃত্যলীলার সূত্রপাত সে ঘটিয়েছিলো। ডাফি টাল সামলাবার চেষ্টায় এক ধরনের সূক্ষ্ম নৃত্যভঙ্গিমায় পায়ের আঙ্গুলের উপর দেহের ভার রেখে মঞ্চের কিনার ঘেঁষে দু'টি হাত উপরে তুলে ঘোরাতে লাগলো, তার মুখটাকে মনে হলো একটা অবাক হয়ে যাওয়া ক্ষীরের পিঠা, মাঝখানে ফুটো, সেখানে পরে চিনির ডেলা বসানো হবে, ফুটোটা আর কিছুই নয়, ডাফির মুখ, এবং সে মুখে কোনো শব্দ নেই। বিশাল প্রান্তর জুড়ে ঘর্মাক্ত জনতার কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। তারা ডাফির নাচ দেখছিলো শুধু।

নাচতে নাচতে ডাফি মঞ্চ থেকে পড়ে গেলো। শেষ মুহূর্তে পতনটা একটু সামলে মঞ্চের নিচে আধশোয়া আধবসা একটা অবস্থান নিলো। মুখ তখনো খোলা। তখনো তার মধ্য দিয়ে কোনো শব্দ বেরুচ্ছে না, কারণ শব্দ করার মতো দম আর নেই।

এই সব ঘটে যাচ্ছে আর আমি কিনা ক্যামেরাবিহীন!

উইলি ওদিকে তাকায় নি পর্যন্ত। সে গলা তুলে বললো, শুয়োরটাকে ওখানে পড়ে থাকতে দিন। আপনারা, মুখ্যু চাষার দল, আপনারা আমার কথা শুনুন। হ্যাঁ,

আপনারাও মুখ্যু চাষা। ওরা আপনাদেরও হাজারবার বোকা বানিয়েছে, আমারই মতো। ওরা ভাবে আমরা আছিই সেজন্য। বোকা বনবার জন্য। তো এবার আমরা অন্যকে বোকা বানাবো। আমি এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। আপনারা জানেন কেন?

সে থামলো, বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে দ্রুত এক ঝটকায় মুখের ঘাম মুছে নিয়ে বললো, আমার তুচ্ছ অনুভূতিগুলি যে আহত হয়েছে সেজন্য নয়। সেগুলি আহত হয় নি। আমি জীবনে কখনো এত ভালো বোধ করি নি, কারণ এখন আমি সত্য কাথাটা জেনেছি। যা বহু আগেই আমার জানা উচিত ছিলো। মুখ্যু চাষা কিছু চাইলে তার নিজেকেই সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। কেউ চমৎকার মোটর গাড়িতে চড়ে এসে মিষ্টি কথা বলে তার জন্য সেটা করে দেবে না। আমি যখন আবার গভর্নরের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াবো তখন নিজের জোরেই দাঁড়াবো, আর তখন কাউকে রেহাই দেবো না। কিন্তু এখন আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। ম্যাকমারফির পক্ষে। তার সম্পর্কে আমি এযাবৎ যা বলেছি তার এক বর্ণও আমি মিথ্যা বলি নি, আবারও আমি তা বলবো, কিন্তু এখন আমি ম্যাকমারফির পক্ষে সারা স্টেট চষে বেড়াবো। আমি আর অন্যান্য মুখ্যু চাষারা সবাই মিলে জো হ্যারিসনের কবর রচনা করবো, তার অবস্থা এমন করে ছাড়বো যে সে এই স্টেটে আর কোনোদিন মুদ্দাফরাসের পদপ্রার্থীও হতে চাইবে না। তারপর আমরা দেখবো ম্যাকমারফি কি করেন। এইটে তার শেষ সুযোগ। এখন সময় এসেছে। সত্য কথা বলতে হবে, এবং আমি সে কথা বলবো। স্টেটের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সেকথা বলে বেড়াবো আমি, দরকার হলে চুরি-করা খচ্চরের পিঠে চড়ে। কারো সাধ্য নেই যে আমাকে বাধা দেয়। জো হ্যারিসন পারবে না, কোনো মানুষই পারবে না। কারণ আমি —

আমি স্যাডির দিকে ঝুঁকে বললাম, শোনো। আমি চললাম। এক্ষুণি টেলিফোন করতে হবে একটা। শহরে যাচ্ছি। টেলিফোনে খবরটা এক্ষুণি দিতে হবে। তুমি এখানে থাকো, আর দোহাই ঈশ্বরের, সব কিছু মনে রেখো।

সে বললো, ঠিক আছে, কিন্তু আমার কথা সে বিশেষ খেয়াল করলো না।

আমি বললাম, আর উইলিকে পাকড়াও করে শহরে নিয়ে এসো। ডাফি যে তোমাকে তার গাড়িতে নেবে না সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তুমি বুদ্ধুটাকে পাকড়াও করে —

বাধা দিয়ে স্যাডি বললো, বুদ্ধু! কী বলছো তুমি? তারপর বললো, তুমি যাও।

চলে গেলাম আমি। ভীড়ের মধ্য থেকে আমি বেরিয়ে এলাম। কানের পর্দায় দ্রিম দ্রিম করে বাজছে উইলির কণ্ঠস্বর, ওই শব্দে থিরথির করে কাঁপছে ওক্ গাছের

মরা পাতাগুলি। শেষ মুহূর্তে আমি একবার পেছন ফিরে তাকালাম। উইলি তার হাতের কাগজ উড়িয়ে দিয়েছে, সে-কাগজ একটা একটা করে এসে পড়ছে তার পায়ের চারপাশে, তার বুকের উপর, আর সে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে যে সত্য সুস্পষ্ট, তা কাগজে লিপিবদ্ধ করার দরকার করে না। ওই তো উইলিকে দেখা যাচ্ছে, পায়ের কাছে কাগজের তাড়া, একহাত উঁচু করে ধরা, কোটের হাতা প্রায় কনুই অবধি উঠে এসেছে, মুখ থ্যাঁতলানো বীটের মতো লাল, সেখানে ঘামের স্রোতধারা, কপালের উপরে চুলের গোছা ঝুলে পড়েছে, চোখ দু'টি বিস্ফারিত, জ্বলজ্বলে, আর তার পেছনে লাল-সাদা-নীল রঙের পতাকার সমারোহ, আর তার মাথার উপর ঈশ্বরের উজ্জ্বল তামাটে স্বচ্ছ দ্যুতিময় আকাশ।

আমি কাঁকর ছাওয়া পথ ধরে খানিকটা হেঁটে গিয়ে শহরের দিকে যাওয়া একটা ট্রাক থামিয়ে অনুরোধ করে তাতে চড়ে বসলাম।

সেদিন রাতে সব যখন শান্ত, যখন ডাফিকে নিয়ে ট্রেন তারাভরা আকাশের নিচে, পত্রপল্লবাচ্ছাদিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে, হুশ হুশ করে এগিয়ে যাচ্ছিলো (নিঃসন্দেহে ডাফি জো হ্যারিসনের কাছে সব ঘটনার রিপোর্ট দিতে যাচ্ছে), আর উইলি সুরার প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য কয়েক ঘণ্টা ধরে তার বিছানায় অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছিলো, আমি তখন আপটনের হোটেলে আমার ঘরে বসে টেবিলের উপরে রাখা সুরার বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে স্যাডিকে বলছিলাম, ওই যে পদার্থটা যা শিক ভেঙে ফেলেছিলো আর লাথি মেরে মেরে তক্তা আলগা করে দিয়েছিলো সেটা একটু খাবে নাকি?

ও জিজ্ঞাসা করলো, কি বললে?

ওর গ্লাসের সুরা ঢেলে দিতে দিতে আমি বললাম, ব্যাকরণের বিশুদ্ধ নিয়ম মেনে বলা আমার একথা তুমি বুঝবে না।

ও, হ্যাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি তো কলেজ যাওয়া মানুষ।

হ্যাঁ, আমি ব্যাকরণের সব নিয়ম মানা কলেজ যাওয়া মানুষ, কিন্তু সেখানে যা শেখার ছিলো তার সব আমি শিখি নি।

উইলি তার কথা রেখেছিলো। ম্যাকমারফির হয়ে সে সারা স্টেট চষে বেড়ায়। না, সে কোনো খচ্চর কেনে নি, চুরিও করে নি। তবে ধুলোবালি কাদামাটির মধ্য দিয়ে তার ভালো সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িটা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গাড়িটার অবস্থা কাহিল করে তুলেছিলো। বর্ষার সময় কাদার মধ্যে গাড়ি আটকে গেলে সে অপেক্ষা করে বসে থাকতো, কখন গোটা দুই খচ্চরের সাহায্যে কেউ তাকে টেনে তুলবে।

সে স্কুলবাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, বাজারের দোকান থেকে ধার করে আনা

বাক্সের উপরে উঠে, চাষির খামারের গাড়ির আসনে বসে, চৌরাস্তার দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাষণের পর ভাষণ দিয়েছে। বলেছে, বন্ধুগণ, বোকা চাষার দল, আমার সমগোত্রীয় মফস্বলের তুচ্ছ মুখ্যু মানুষেরা — সে সামনে ঝুঁকে পড়ে তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলেছে। ওইভাবে সম্বোধন করার পর সে একটু থেমেছে, শব্দগুলি যেন ওদের বুকে গিয়ে বিঁধে সেজন্য একটু অপেক্ষা করেছে। আর ওই নৈঃশব্দের মধ্যে জনতা চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ওইসব কথা শুনে, তারা জানতো যে লোকে তাদের সম্পর্কে এই জাতীয় অভীধাই প্রয়োগ করে, কিন্তু কেউ উঠে দাঁড়িয়ে সরাসরি তাদের মুখের উপর এসব কথা কখনো বলে নি। কিন্তু উইলি বলে যেতো, হ্যাঁ, মুখ বাঁকিয়ে সে বলতো, হ্যাঁ, আপনারা ঠিক তাই। আপনাদেরকে একথা বলার জন্য আপনারা আমার উপর ক্ষেপে উঠবেন না। আর ক্ষেপে উঠতে যদি চান তো উঠুন, কিন্তু আমি আপনাদের বলছি, আপনারা তাই। আর আমি, আমিও তাই। হ্যাঁ, আমিও অমার্জিত বোকা চাষা মানুষ। আমি একটা বুদ্ধু, কারণ ওই চমৎকার মোটর গাড়ি চড়া মানুষের মধুর বুলিতে আমি ধরা দিয়েছিলাম। চিনির চুষিকাঠি মুখে পুরে আমি কান্না বন্ধ করেছিলাম। আমার মতো বেকুব মফস্বলের মানুষটাকে ওরা ব্যবহার করতে চেয়েছিলো, ওদের উদ্দেশ্য ছিলো বেকুব মফস্বলের মানুষদের ভোটের মধ্যে ভাঙন ধরানো। কিন্তু আমি এখন আমার নিজস্ব পেছনের দু'পায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়েছি, সময় দিলে একটা কুকুরও যা শিখে নিয়ে করতে পারে। আমি শিখেছি। সময় লেগেছে আমার, কিন্তু আমি শিখেছি। আর এখন, এইখানে, আমার নিজের দুই পেছনের পায়ের উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি।

লোকজনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে উইলি জিজ্ঞাসা করতো, আর আপনাদের অবস্থা কি? আপনারা কি নিজেদের পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন? এখন পর্যন্ত অতটুকু কি আপনারা শিখতে পেরেছেন? মনে হয় কি যে পারবেন শিখতে?

ওরা পছন্দ করতো না এমন সব কথা সে ওদের শোনালো। এমন সব নামে সে ওদের সম্বোধন করলো যে নামে তারা সম্বোধিত হতে চাইতো না। কিন্তু সবসময়, প্রায় সবসময়ই, শেষপর্যন্ত তাদের চাঞ্চল্য আর ক্ষোভ মিলিয়ে যেতো। আর সে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, বিস্ফারিত চোখে, প্রখর সূর্যালোকে কিংবা গ্যাসোলিনের আলোর লাল শিখায় তার চকচকে মুখ তুলে তার কথা বলে যেতো। উইলি যখন বললো নিজেদের পেছনের দু'পায়ে দাঁড়াবার কথা, তখন তারা সেকথা মন দিয়ে শুনলো। সে তাদের বললো, যান, ভোট দিন। এবার ম্যাকমারফিকে ভোট দিন, কারণ আপনাদের ভোট দেবার মতো এখন একমাত্র সে-ই আছে। দলে দলে গিয়ে তার পক্ষে ভোট দিন, দেখিয়ে দিন আপনারা কি করতে পারেন। ভোট দিয়ে তাকে

নির্বাচিত করুন, তারপর সে যদি ঠিকমত কাজ করতে না পারে, অঙ্গীকার পূরণ করতে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তার চামড়া তুলে নিন। হ্যাঁ, কথা রাখতে না পারলে তার চামড়া তুলে নিন। আমার হাতে ছুরি তুলে দেবেন, আমিই সে কাজটা করবো।

সে ওদের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললো, এই যে বোকাসোকা চাষা মানুষের দল, আমার কথা শুনুন। চোখ দুটো তুলে ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট নির্জলা সত্যটা দেখুন। যদি আপনাদের নির্বোধ মস্তিষ্কে কিছু ঘিলু এখনো অবশিষ্ট থাকে, যদি এখনো সত্য দেখলে তা চিনবার ক্ষমতা আপনাদের থাকে। সত্য হচ্ছে এই, আপনারা বোকাসোকা চাষা মানুষের দল, আর নিজেরা না করলে অন্য কেউ এসে আপনাদের সাহায্য করবে না। এখন সবকিছু আপনাদের হাতে আর ঈশ্বরের হাতে, এবং ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে।

সে তাদেরকে এই সব কথা বললো। আর ওরা তার সামনে দাঁড়িয়ে শুনলো, ওভারঅলের স্ট্র্যাপের মধ্য দিয় বুড়ো আঙ্গুল ঢোকানো, মাথার টুপী সামনের দিকে টানা, তার নিচে চোখ কুঁচকে ওরা তাকে দেখছে, যেন উপত্যকার ওপারে কিংবা একটা ঝোপের মধ্যে কিছু একটা ওদের চোখে পড়েছে, দূরে বলে ভালো করে বুঝতে পারছে না সেটা কি, জিনিসটা নিয়ে মনের মধ্যে ওরা স্বস্তি পাচ্ছে না, কিংবা দূরে উপত্যকার ওপারে অথবা মাঠের ওধারে ঝোপের মধ্যে হঠাৎ কিছু একটাকে ওরা নড়ে উঠতে দেখেছে, এখনই ঝোপের মধ্য থেকে হুম করে বেরিয়ে আসবে, আর ওরা ওদের মুখের মধ্যে একপাশ থেকে আরেক পাশে তামাকের গোল্লা চিবিয়েই যাচ্ছে ধীর, একাগ্র, অপ্রতিহত গতিতে, একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মতো। এবং শুয়োরের কাছে মহাকাল কিছু নয়, ইতিহাসও নয়। ওরা তাকে লক্ষ করতে থাকলো, আর আপনি মন দিয়ে দেখলে দেখতে পেতেন যে কিছু একটা ঘটতে শুরু করেছে। ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, দেহভার এক পা থেকে আরেক পায়ের উপর পর্যন্ত বদল করছে না — চুপ করে থাকার একটা সহজাত প্রতিভা আছে ওদের, ওরা যখন শহরে আসে তখন আপনি ওদের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন, নড়ছে না, কথা বলছে না, অথবা তাদের কোনো একজনকে দেখবেন যে রাস্তার পাশে উবু হয়ে বসে আছে, দূরে পাহাড়ের ওপারে রাস্তা যেখানে টুপ করে নেমে গেছে সেদিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ — আর তাদের সামনের ওই লোকটার উপর থেকে তাদের আড় চোখের দৃষ্টি একটুও সরে আসছে না। চুপ করে থাকবার একটা প্রতিভা ওদের আছে। কিন্তু কখনো কখনো ওই নিশ্চুপতা ভেঙে পড়ে। অকস্মাৎ তা ছিঁড়ে যায়, খুব জোরে টানা একটা দড়ির মতো। ওদের একজন চুপচাপ বেঞ্চিতে বসে আছে, মন দিয়ে কি একটা শুনছে, তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে

উঠে দু'হাত উঁচু করে সে চেঁচিয়ে উঠলো, ওহ্ যীসাস্, আমি তাঁর নাম দেখেছি! কিংবা ওদের একজন হয়তো তার আগ্নেয়াস্ত্রের ঘোড়া টিপে দিলো, আর নিজের বন্দুকের শব্দে নিজেই অবাক হয়ে গেলো।

ওই যে উইলিকে দেখা যাচ্ছে। রোদে কিংবা গ্যাসোলিনের শিখার লাল আলোর মধ্যে। উইলি বলছে, আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন আমার প্রোগ্রাম কি। শুনুন, বোকাসোকা মফস্বলবাসীরা। আর কক্ষনো ভুলবেন না একথা। ওদেরকে মেরে লাশ বানিয়ে দিন। জো হ্যারিসনের চামড়া তুলে নিন। যে কেউ আপনাদের পথে দাঁড়াবে তারই ওই হাল করুন। ম্যাকমারফি অঙ্গীকার রক্ষা না করলে তারও একই অবস্থা করুন। আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিন, আমি নিজের হাতে সে কাজটা করবো। গোলাঘরের দরজায় আমি ওদের ঝুলিয়ে রাখবো। আর যখন মাছির ঝাঁক ভীড় করে আসবে, তখন কিন্তু চামর দুলিয়ে সেগুলি তাড়াতে যাবেন না!

উইলি-ই এসব কথা বলেছিলো। উইলি নামের লোকটা।

নির্বাচনে ম্যাকমারফির বিজয় হয়। আর ওই বিজয়ে উইলির একটা ভূমিকা ছিলো, কারণ যে সব অঞ্চলে উইলি প্রচার চালিয়েছিলো সেখানেই ম্যাকমারফির পক্ষে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ে। কিন্তু ওই গোটা সময়টাতে ম্যাকমারফি ঠিক উইলিকে বুঝে উঠতে পারে নি। প্রথম দিকে সে তাকে এড়িয়ে গেছে, কারণ উইলি তার সম্পর্কে বেশ কড়া কড়া কথা বলেছিলো। পরে যখন মনে হলো যে উইলির কথাবার্তায় কিছুটা কাজ হচ্ছে তখনো ম্যাকমারফি দোটানার মধ্যে ছিলো। শেষে উইলি তার নিজের পেছনের দু'পায়ে উঠে দাঁড়ায়, সবাইকে বলে যে ম্যাকমারফির লোকেরা উইলির প্রচারকার্যের খরচ মেটাতে চেয়েছে কিন্তু সে রাজী হয় নি, সে ম্যাকমারফির লোক নয়, যদিও সে সবাইকে বলেছে ওরা যেন ম্যাকমারফিকে ভোট দেয়। উইলির খরচ উইলি নিজেহে বহন করবে, সেজন্য যদি তাকে তার বাবার খামারের আরেকটা অংশ বন্ধক দিতে হয় তবু। হ্যাঁ, আর কেউ যদি তার দু'ডলার ভোট-কর দিতে না পারে আর তার কাছে এসে সোজাসুজি সে কথা বলে, তবে উইলিই তার হয়ে ওই দু'ডলার দিয়ে দেবে। সে যা বলে তা যে সে কতখানি বিশ্বাস করে সেটা এর মধ্য দিয়েই বোঝা যাবে।

ম্যাকমারফি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, আর উইলি মেসন সিটিতে ফিরে গিয়ে ওকালতি শুরু করলো। বছর খানেক সে মুরগী চুরি আর বেওয়ারিশ শুয়োর আর তুচ্ছ ঝগড়াঝাটির (যেগুলি ছিল মেসন কাউন্টির শনিবারের রাতের নাচের আনন্দমেলার অংশবিশেষ) মামলা করলো। তারপর একটা ঘটনা ঘটলো। রাজ্য সরকার একামালগী নদীর উপর একটা পুল বানাচ্ছিল। তার কিছু জিনিসপাতি ধ্বসে

পড়ে কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়, দু'তিন জন মারা যায়। শ্রমিকদের বেশ কিছু ছিলো মেসন কাউন্টির লোক, তারা উইলিকে তাদের উকীল নিযুক্ত করে। এই মামলার ফলে তার নাম কাগজে বেশ ছড়িয়ে পড়ে। এবং উইলি মামলায় জেতে। তারপর মেসন কাউন্টির ঠিক পশ্চিমে একামালগী কাউন্টিতে তেল আবিষ্কৃত হলো, এবং ওই অংশের একটা তেল কোম্পানী আর কয়েকজন স্বতন্ত্র লীজ-হোল্ডারের মধ্যে একটা মামলায় আবার উইলি জড়িয়ে পড়লো। উইলির দল জিতলো এবং জীবনে এই প্রথম বারের মতো উইলি বড়ো অঙ্কের টাকার মুখ দেখলো। এবং বেশ বড়ো অঙ্কের।

ওই গোটা সময়টায় উইলির সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। ১৯৩০ সালে উইলি ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে দাঁড়াবার ঘোষণা দেবার আগে বলতে গেলে তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। সে এক মহা হৈ চৈ ব্যাপার। বাচ্চার দল, চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড আর কেসীর আস্তানার পেছনের ঘরে শনিবারের রাত, এই সব মিলে এক অসম্ভব কাণ্ডের মতো। ধোঁয়া মিলিয়ে যাবার পর দেখা গেলো যে দেয়ালে একটা ছবিও আর ঝুলছে না। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বলেও আর কিছু নেই। আছে শুধু উইলি, তার চোখের উপরে চুল লুটিয়ে পড়েছে, ঘামে শার্ট লেপ্টে গেছে পেটের সঙ্গে, তার হাতে মাংস কাটার একটা ছুরি, রক্ত চাই বলে সে চেঁচাচ্ছে। ছবির পশ্চাদপটে, উচ্ছ্বসিত ফেনার মতো অশুভ সাদার ছোপ মাখানো এক ওল্টানো রক্তিম আকাশের নিচে উইলির দু'পাশে দেখা গেলো দু'জন মানুষকে, স্যাডি বার্ক আর দীর্ঘদেহী, ঈষৎ কুঁজো, বিষণ্ন বাদামী মুখের একটি লোক, আস্তে আস্তে কথা বলে, তার চোখ দুটি লোকে যাকে বলে স্বাপ্নিকের চোখ। ওই লোক হিউ মিলার। হার্ভার্ড ল' স্কুল থেকে পাস করা আইনবিদ, লাফায়েত এস্কাড্রিল, ক্রয় দ্যা গ্যে, পরিষ্কার হাত, নিষ্পাপ হৃদয়, কোনো রাজনৈতিক অতীত নেই তার। অনেক ক'বছর সে চুপ করে বসেছিলো, তারপর কোনো একজন (স্টার্ক উইলি) তার হাতে তুলে দেয় একটা বেস্‌বল ব্যাট, আর তার আঙ্গুল সেখানে জমে যায়। হিউ মিলার হলেন এ্যাটর্নি জেনারেল। আর স্যাডি বার্ক ছিলো শুধুই স্যাডি বার্ক।

অবশ্য পাহাড়ের ধার ঘেঁষে আরো কয়েকজন ছিলো। যেমন, জনাকয়েক ভদ্রলোক, এক সময় জো হ্যারিসনের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু যখন দেখলো যে রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে জো হ্যারিসন বলে আর কিছুই থাকবে না, তখন তারা নতুন বন্ধুর খোঁজে তৎপর হয়ে উঠে। আর সেই নতুন বন্ধু হলো উইলি। উইলির কাছে ছাড়া আর কোথাও তাদের যাবার জায়গা ছিলো না। তারা ভাবলো উইলির দলে ভিড়ে যাবে তারা, এই পথেই তাদের তরক্কী হবে। উইলিও তাদের দলে

নিয়ে নিলো। এর ফলে কিছু বাড়তি ভোটও সে পেলো। কিছুদিন পরে উইলি টাইনি ডাফিকেও সঙ্গে নিলো। সে হলো মহাসড়ক কমিশনার, এবং পরবর্তী সময়ে উইলির শেষ মেয়াদ কালে, লেফটেন্যান্ট গভর্নর। আমি অনেক সময় ভেবেছি উইলি ওকে কেন টানছে। কখনো কখনো বস্‌কে জিজ্ঞাসাও করেছি, ওই মোটামাথাটাকে কেন আপনি সঙ্গে রাখছেন? কর্তা কখনো কোনো কথা না বলে শুধু হেসেছেন। কখনো বলেছেন, আহ্ হাঁ, একজন কাউকে তো লেফটেন্যান্ট গভর্নর হতে হবে। আর ওদের সবার চেহারাই তো এক। কিন্তু কর্তা একবার বলেছিলেন, আমি ওকে সঙ্গে রেখেছি কারণ ও আমাকে একটা জিনিস মনে করিয়ে দেয়।

কি?

এমন একটা জিনিস যা আমি কখনো ভুলতে চাই না।

কি সেটা?

সেটা এই যে, যখন কেউ তোমার কাছে এসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তখন তার কথায় কান দিও না। এটা আমি কোনোদিন ভুলতে চাই না।

তা হলে এই হলো কথা। কিন্তু এইটেই কি সবটুকু? আমার মনে হলো আরো একটা কারণ আছে। টাইনি ডাফির সাফল্য যে কর্তারই কীর্তি সেজন্য তিনি এক ধরনের গর্ব অনুভব করতেন। তিনিই টাইনি ডাফিকে ধ্বংস করেছেন, তারপর তিনিই ভাঙা টুকরোগুলো জড়ো করে তাকে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি হিসাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন। টাইনির ঝলমলে ধরাচূড়া আর তার হীরার আংটির দিকে তাকিয়ে কর্তা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পেতেন, ভাবতেন যে এই সবই তো ফাঁপা, এই সবই তো ফাঁকি, কর্তা তাঁর কড়ে আঙ্গুলটা একটু হেলালেই টাইনি ডাফি ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাবে। একদিক থেকে, কর্তা টাইনির জন্য যে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন তার মধ্যেই নিহিত ছিলো টাইনির উপর কর্তার প্রতিশোধ, কারণ যতবার কর্তা টাইনির উপর তাঁর তন্দ্রালু চিন্তামগ্ন সুদূর দৃষ্টি ন্যস্ত করতেন ততবারই টাইনি নিঃসন্দেহে অনুভব করতো যে একটা শীতল হাত তার স্থূল কলজেটা খামচে ধরেছে, বুঝতো যে কর্তা তাঁর কড়ে আঙ্গুলটা সামান্য হেলালেই একরাশ ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। একদিক থেকে, টাইনির সাফল্য ছিলো কর্তার নিজের সাফল্যের চূড়ান্ত সূচক।

কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই? শেষে আমি ঠিক করলাম যে অন্যান্য কারণগুলোর পেছনে আরও একটা কারণ আছে। সেটা এই : এক উদ্ভটভাবে টাইনি ডাফি হয়ে উঠেছিলো উইলি স্টার্কের অপর একটি সত্তা। টাইনি ডাফির উপর উইলি স্টার্ক যে ঘৃণা তাচ্ছিল্য ও অপমান বর্ষণ করতো তা উইলি স্টার্কের একটি সত্তা এক অন্ধ

অন্তর্গত তাড়নায় উইলি স্টার্কের অন্য সত্তার উপর যা বর্ষণ করতো তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম অনেক দিন পরে, একেবারে অন্তিম লগ্নে।

কিন্তু এখন উইলি সবে মাত্র গভর্নর হয়েছে এবং পরে কি ঘটবে সে কথা কারো জানা ছিলো না।

এবং ইতোমধ্যে, নির্বাচনী প্রচারকাজ চলা কালে, আমি বেকার হয়ে পড়লাম।

আমার চাকুরি ছিলো ক্রনিকল্ পত্রিকায় রাজনৈতিক রিপোর্টিং করা। তা ছাড়া একটা কলামও লিখতাম। আমি ছিলাম বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত।

একদিন জিম ম্যাডিসন আমাকে ডেকে পাঠালো। তার টেবিলকে ঘিরে ছিলো গাঢ় সবুজ রঙের কার্পেট, ঘাসের চত্বরের মতো। জিম বললো, জ্যাক, এই ইলেকশানে ক্রনিকলের কি লাইন তা তুমি জানো।

আমি জবাব দিলাম, নিশ্চয়। প্রশাসক হিসাবে স্যাম ম্যাকমারফির অত্যুজ্জ্বল রেকর্ড ও রাজনীতিবিদ হিসাবে তার অসামান্য সততার জন্য ক্রনিকল্ তাকে নির্বাচিত করতে চায়।

ওর মুখে একটা অম্ল হাসি ফুটলো। সে বললো, ক্রনিকল্ স্যাম ম্যাকমারফিকে নির্বাচিত দেখতে চায়।

আমি বললাম, আমি দুঃখিত, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা এখন পারিবারিক পরিবেশে আছি। আমি মনে করেছিলাম আমি বুঝি আমার কলাম লিখছি।

ওর মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো। টেবিলের উপরে তার পেন্সিলটা নিয়ে খেলতে খেলতে সে বললো, তোমার ওই কলামের ব্যাপারেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

ঠিক আছে।

তুমি কি ওর মধ্যে আর একটু তেজ আনতে পারো না? এটা তো নির্বাচন, এপ্‌ওয়ার্থ লীগের সভা নয়।

ইলেকশন তো বটেই।

আরেকটু চাঙ্গা করা যায় না?

দেখ, স্যাম ম্যাকমারফির মতো লোককে নিয়ে যতটুকু করা যায় তা আমি করছি।

ও মিনিট খানেক চুপ করে ভাবলো, তারপর বললো, ওই স্টার্ক লোকটা তোমার বন্ধু বলেই যে তুমি —

আমি তীব্র কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললাম, ও আমার বন্ধু নয়। গত নির্বাচন আর এই নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে ওর সঙ্গে আমার একবারও দেখা হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে এই স্টেটের গভর্নর কে হলো বা না হলো তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তা সে যতো বড় কুত্তার বাচ্চাই হোক না কেন। কিন্তু আমি বেতন নিয়ে চাকুরি করি, আর স্যাম ম্যাকমারফি কি জিনিস সে সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা যতো দৃঢ়মূলই হোক না কেন আমার কলামে আমি তা দমিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি —

জিন ম্যাডিসন গম্ভীরভাবে বললো, তুমি তো ক্রনিক্‌লের লাইন জানো। তারপর সে তার থুতুভেজা, চকচকে চিবুনো সিগারের প্রান্তদেশটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো।

সেদিন খুব গরম পড়েছিল। বৈদ্যুতিক পাখা থেকে যে বাতাস আসছিলো তার সবটাই যাচ্ছিলো জিম ম্যাডিসনের দিকে, আমার দিকে নয়। আমার গলার মধ্যে আমি একটা টক টক পিত্ত ওঠা থুতুর ডেলা জমে উঠতে অনুভব করলাম, পেটের মধ্যে হজমের গোলমাল হলে অনেক সময় যে রকম হয়। আমার মাথাটা মনে হলো একটা শুকনো লাউয়ের খোলের মতো, তার মধ্যে গোটা দুই বীজ যেন শব্দ করে নড়ছে। আমি জিম ম্যাডিসনের দিকে তাকিয়ে শুধু বললাম, ঠিক আছে।

তার মানে?

তার মানে যা বললাম তাই।

বলেই আমি দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম ।

চুরুটের টুকরোটা ছাইদানিতে নামিয়ে জিম বললো, এই জ্যাক, শোনো, আমি —

আমি বললাম, আমি জানি। তোমার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, ছেলে প্রিন্সটনে পড়ছে।

কথাটা বলে আমি হাঁটতে থাকলাম।

দরজার বাইরে, হলঘরে, ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা ছিলো। আমি তার পাশে থেমে, ছোট্ট মোচার আকারের একটা পেয়ালা নিয়ে, ওরকম প্রায় দশ পেয়ালা বরফ-জল পান করলাম। গলার তেতো ভাবটা কেটে গেলো। আমি হলঘরে একটু দাঁড়ালাম। পেটভর্তি জল। মনে হলো আমার ভেতরে একটা ঠাণ্ডা বাল্ব নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

আমি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতে পারতাম, জেগে উঠে একটুও নড়াচড়া না করে জানালার ফুটো দিয়ে উষ্ণ গলিত-মাখন রঙের সূর্যালোকের ঘরে

ঢোকা দেখতে পারতাম, কারণ আমার হোটেলটা শহরের সব চাইতে ভালো হোটেল ছিলো না, আমার ঘরটাও ছিলো না হোটেলের সব চাইতে ভালো ঘর। নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার বুক ওঠা-নামা করতো, আর ঘামে ভেজা চাদর আমার খালি গায়ে লেগে থাকতো, কারণ গরমের সময় ওখানে ওভাবেই সবাই ঘুমায়। আমি শুনতে পেতাম অদূরে ট্রামের শব্দ, মোটর গাড়ির হর্ণের আওয়াজ, খুব বেশি জোরে নয় কিন্তু বিচিত্র এবং নিরন্তর, স্নায়ুর উপর এক ধরনের রুক্ষ ভাঙা ভাঙা বিচিত্র মিশ্র-ধ্বনির চাপ, আর মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম বাসনপত্রের ঝনঝনানি, কারণ আমার ঘরের ওপাশেই ছিলো হোটেলের রান্নার এলাকা। এবং কখনো কখনো সেদিক থেকে ভেসে আসতো কোনো নিগ্রো গলায় এককলি গানের সুর।

যতক্ষণ খুশি আমি শুয়ে থাকতে পারতাম, শুয়ে শুয়ে একটা মানুষ যেসব জিনিস চাইতে পারে তার ছবি একটার পর একটা মাথার মধ্যে এঁকে নিতে পারতাম, কফি, মেয়েমানুষ, অর্থ, মদ, সুনীল জল আর সাদা বেলাভূমি, তারপর একটা তাসের প্যাকেট থেকে একটা একটা করে তাস ফেলে দেবার মতো সেগুলি ধীরে ধীরে একটা একটা করে ফেলে দিতে পারতাম। হয়তো মানুষ যা চায় তা ওই তাসের মতোই। আপনি শুধু তাদের জন্যই তাদের চান না, যদিও আপনার তাই মনে হয়। আপনি একটা বিশেষ তাস চান বলেই সে-তাস চান না, বরং নিয়মকানুন ও মূল্যমানের একটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী সিস্টেম ও একটা বিশেষ কম্বিনেশনে যে তাস অর্থবহ তার একটা অংশ আপনার হাতে আছে বলেই আপনি ওই বিশেষ তাসটি চান। কিন্তু ধরুন, আপনি খেলার মধ্যে নেই। তখন আপনি যদি নিয়মকানুন সব জানেনও তবু ওই তাসের কোনো অর্থ থাকবে না আপনার কাছে। তখন সব তাসেরই এক চেহারা।

তো আমি শুয়ে থাকতে পারতাম সেখানে, যদিও আমি জানতাম যে আমি ঠিক উঠে পড়বো, উঠবার কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নয়, হঠাৎই নিজেকে আবিষ্কার করবো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি, যেমন আরো একটু পরে ঈষৎ চমকে উঠে আমি নিজেকে দেখবো যে কফি খাচ্ছি , টাকা ভাঙাচ্ছি, একটা মেয়েকে আদর করছি, মদ খাচ্ছি, জলে ভাসছি, হাসপাতালে বসে একা একা তাস খেলা কোনো স্মৃতি-হারানো এ্যামনেসিয়ার রোগীর মতো। উঠে পড়ে তাস হাতে তুলে নেবো ঠিকই। আরো পরে। কিন্তু আপাততঃ আমি শুয়ে থাকবো। আমি জানি যে আমার উঠবার সপক্ষে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আত্মার অন্ধকার রাত অতিক্রম করে কোনো সন্ত যেমন স্নিগ্ধ ক্লান্তি ও পবিত্র শূন্যতা অনুভব করে আমিও সেরকম অনুভূতি নিয়ে শুয়ে থাকবো। কারণ ঈশ্বর এবং নেতির মধ্যে একটি প্রগাঢ় মিল

আছে। কারণ আপনি ওদের দুজনের যে কোনো একজনের দিকে এক মুহূর্তের জন্য সোজা তাকান, চোখে চোখ রাখুন, দেখবেন যে মানুষের দেহ-মনের উপর তার তাৎক্ষণিক প্রভাব একই রকম।

কোনো কোনো রাতে আমি আবার বেশ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তাম। মাঝে মাঝে ঘুম একটা গুরুত্বপূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে। উঠে পড়তে পারেন বলে তো আপনি ঘুমিয়ে থাকেন না, বরং আপনি উঠে পড়েন, যেন আবার ঘুমুতে যেতে পারেন। সেজন্য শেষে এমন হয় যে দিনের কোনো এক সময় আপনি দেখেন যে আপনি হঠাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, অপেক্ষা করছেন, কান পেতে কিছু একটা শুনছেন। আপনি যেন একটি ছোট্ট বালক, রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন, ট্রেনে চড়ে চলে যাবার জন্য তৈরি, যে ট্রেন এখনো আসে নি। আপনি রেললাইন ধরে সামনে অনেক দূর অবধি দৃষ্টি মেলে দেন কিন্তু এখনো ছোট্ট কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আপনার চোখে পড়ে না। আপনি উসখুস করতে থাকেন, তারপর হঠাৎ আপনার উসখুসুনির মাঝপথে আপনি কান পেতে শুনতে থাকেন। না, এখনো কিচ্ছু শোনা যায় না। তখন রবিবাসরীয় ভালো জামাকাপড় নিয়েই আপনি গুঁড়ো কয়লার উপর হাঁটু মুড়ে বসেন, এজন্য মায়ের হাতে পিটুনি আর চুলটানা খেতে হবে, আপনি নিচু হয়ে রেললাইনের উপর কান পেতে ধরেন, আকাশের গায়ে ছোট্ট কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাবার আগেই লাইনের বুকে যে প্রথম শব্দহীন ফিসফিসানি জেগে ওঠে সেটা শুনতে চেষ্টা করেন। শেষে এমন হয় যে একটা বিশাল কালো ট্রেন ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে করতে, বজ্রের মতো আওয়াজ তুলে, আপনার দিকে সজোরে আসার বহু, বহু আগে, কালো কালো কামরাগুলি ক্ষণিকের জন্য আপনার সামনে এসে দাঁড়াবার বহু, বহু আগে, নিগ্রো কুলি তার কালো চকচকে মুখ নিয়ে আপনাকে সযত্নে সিঁড়ি দিয়ে উপরে তুলে দেবার বহু, বহু আগে আপনি রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

ওই রকম ঘুমের ভেতর আপনি স্বপ্ন দেখেন না, কিন্তু আপনার নিদ্রামগ্ন প্রতিটি মুহূর্তে ওই চেতনা আপনার মধ্যে কাজ করে, যেন আপনি নিদ্রারই এক সুদীর্ঘ স্বপ্ন দেখছেন, ওই ঘুমের মধ্যে আপনি ঘুমের স্বপ্ন দেখে চলেছেন, ঘুমুচ্ছেন আর ঘুমের স্বপ্ন দেখছেন, আর অন্তহীনভাবে এগিয়ে চলেছেন একেবারে অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রের পানে।

আমার বেকার জীবনে কিছুদিনের জন্য অবস্থাটা এই রকমই হয়েছিলো। এটা নতুন নয়। আগেও এরকম হয়েছে। দু'বার। আমি তার একটা নামও দিয়েছিলাম। মহানিদ্রা। তখনো আমি ইউনিভার্সিটি ছাড়ি নি, মার্কিন ইতিহাসের উপর আমার পি এইচ. ডি. থিসিস শেষ করার মাত্র অল্প কয়েক মাস বাকী। কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে

গিয়েছিলো। ওরা বলেছিলো যে ঠিক আছে। টেবিলের উপর টাইপরাইটারের পাশে টাইপ করা কাগজের তাড়া সুবিন্যস্তভাবে ধরা রয়েছে। কার্ডভর্তি বাক্সগুলি ঠিক জায়গায় রাখা আছে। সকালে বেশ বেলা করে উঠেই আমার চোখ পড়তো তাদের উপর, কাগজচাপার নিচে প্রথম পাতাটা একটু গোল হয়ে কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছে। রাতে খাবার পর যখন শুতে আসতাম তখনো আমার চোখ পড়তো ওই জিনিসগুলির উপর। শেষে, একদিন সকালে, অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে, আমি দরজা খুলে বেরিয়ে যাই, আর ফিরে আসি নি। ওই সব কিছু পড়ে থাকলো সেখানে। আর আরেকবার মহানিদ্রা এসেছিলো লয় যখন বিবাহবিচ্ছেদের আয়োজন শুরু করেছিলো আর আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, তার ঠিক আগে।

কিন্তু এবার কোন মার্কিন ইতিহাস ছিলো না, কোনো লয়-ও ছিলো না। তবু মহানিদ্রা এসেছিলো।

শেষ পর্যন্ত যখন উঠলাম তখন শুধু লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালাম। ছায়াছবি দেখলাম, শুঁড়িখানায় পড়ে থাকলাম, সাঁতার কাটলাম, কিংবা ক্লাবে গিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে থাকলাম, দুটি ঘামে-ভেজা হারামজাদাকে সূর্যালোকে ঝলসে ওঠা হাতের র‍্যাকেট দিয়ে একটা ছোট সাদা বলকে বেদম হাঁকড়াতে দেখলাম। খেলোয়াড়দের একজন হয়তো একটি তরুণী, তার হ্রস্ব সাদা স্কার্ট উড়ে উড়ে যাচ্ছে, কখনো কখনো তার বাদামী উরুর পাশে তা সেঁটে থাকছে, সূর্যালোকে ঝলসেও উঠছে মাঝে মাঝে।

ওই সময় আমি বারকয়েক এ্যাডাম স্ট্যান্টনের সঙ্গে দেখা করতে তার এ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এ ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে বড়ো হয়েছি। এখন সে একজন নামজাদা সার্জন, প্রচুর নামডাক তার, তার হাতে শরীরের নানা অংশ কাটাবার জন্য কতো লোক যে চেঁচামেচি করে তার ইয়ত্তা নেই, অতো লোকের দেহে ছুরি চালাবার মতো সময়ই হয় না তার, ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলের প্রফেসর, একটার পর একটা মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত, সেগুলি নানা বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়, নয়তো সে প্রায়শঃ নিউ ইয়র্ক আর বাল্টিমোর আর লণ্ডনে চলে যায়, সেখানে সম্মেলনে পেপার পড়ার জন্য। বিয়ে করে নি। বলে, সময় নেই। কোনো কিছুর জন্যই তার সময় নেই। কিন্তু আমাকে সে সময় দিয়েছিলো। আমি তার অগোছালো জীর্ণ এ্যাপার্টমেন্টে একটা জীর্ণ গদির চেয়ারে গিয়ে বসতাম। ঘরে স্তূপ করা কাগজপত্র, নিগ্রো কাজের মেয়েটি আসবাবপত্র মুছেছে, সেখানে ধুলোর ডোরাকাটা দাগ চোখে পড়ে। আমি একটু অবাক হয়ে ভাবতাম, এতো টাকা রোজগার করে, তবু এরকমভাবে থাকে কেন?

কিন্তু পরে আমি ব্যাপারটা বুঝলাম। যাদের দেহে সে অস্ত্রোপচার করে তাদের অনেকের কাছ থেকেই সে টাকা নেয় না। ডাক্তার মহলে ওকে ডাকা হতো সফ্‌টি বলে, বেশি বেশি কোমল। তারপর টাকা হাতে পাবার পরও অনেকেই নানা দুঃখকষ্টের কথা বলে তার কাছ থেকে তা হাতিয়ে নিতো। ওর এ্যাপার্টমেন্টে সত্যিকার দামী জিনিস একটাই ছিলো, একটা পিয়ানো, সত্যিই অমূল্য।

এ্যাডামের এ্যাপার্টমেন্টে আমি যতক্ষণ থাকতাম তার বেশির ভাগ সময়ই সে কাটাতো তার পিয়ানোর সামনে বসে। আমি শুনেছি ও বেশ ভালো বাজায়, কিন্তু সে বিষয়ে আমি কোনো কথা বলতে অপারগ। শুনতে আমার আপত্তি ছিলো না, যদি আসনটা ভালো ও আরামপ্রদ হতো। এ্যাডাম নিশ্চয়ই আমাকে কোনো না কোনো সময় বলতে শুনেছে যে সঙ্গীত আমার কাছে অর্থহীন, কিন্তু আমার মনে হয় সেকথা ও ভুলে গিয়েছিলো, কিংবা একথা যে কারো ক্ষেত্রেই সত্য হতে পারে তা সে বিশ্বাস করতে পারেনি। যাই হোক, ও আমার দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলতো, এই যে, হয়েছে কি, শোনো, ওহ্, ব্যাপারটা, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর অস্ফুট হয়ে মিলিয়ে যেতো এবং ব্যাপারট যে কী তা আর শেষ পর্যন্ত বলা হতো না। বাক্যটা ঝুলে থাকতো, ঘষায় ঘষায় ক্ষয়ে যাওয়া একখণ্ড দড়ির মতো বাতাসে ধীরে ধীরে পাক খেয়ে ঘুরতো। তারপর এ্যাডাম তার স্বচ্ছ, গাঢ়, বরফ–নীল, বিমূর্ত চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকাতো, রাত তিনটায় যে ধরনের চোখ আর যে ধরনের দৃষ্টি আপনার বিবেক অর্জন করে — আর তারপর আপনার বিবেকের মতো নয়, অন্যরকম করে, সে হাসতে শুরু করতো, খুব বেশি নয়, সামান্য, যেন পরীক্ষামূলকভাবে, প্রায় ক্ষমার হাসি, যা তার ঋজু মুখ আর চৌকো চিবুক থেকে তিরস্কারের আভাস মুছে ফেলতো, যেন সে বলতে চাইছে, শোনো, বন্ধু, আমি যদি তোমার দিকে ওভাবে তাকাই তো আমি নাচার, ওভাবেই যে আমি সব কিছু দেখি। তারপর হাসিটুকু মিলিয়ে যেতো, সে মুখ ফেরাতো পিয়ানোর দিকে, আর তার হাত নেমে আসতো পিয়ানোর উপর।

এক সময় সে সঙ্গীতের মধ্য থেকে উঠে এসে ঘরের আরেকটা জীর্ণ চেয়ারে বসতো। কিংবা, মনে করে আমার জন্য একপাত্র পানীয় এনে দিতো, কখনো কখনো হয়তো নিজেও একপাত্র নিতো, শীতের সূর্যালোকের চাইতে পাণ্ডুর, আর প্রায় সেই রকমই তেজী। আমরা ওখানে বসে থাকতাম, চুপচাপ, আস্তে আস্তে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি, ওর চোখ দুটিতে একটা শীতল নীল দ্যুতি, গায়ের তামাটে চামড়ার জন্য যে চোখ আরো বেশি নীল দেখায়, আর তার মুখের হাড়ের উপর তার চামড়া টান টান হয়ে আছে। ঠিক সেই সব দিনের মতো, যখন আমরা ছোট ছিলাম, বার্ডেন্স

ল্যান্ডিং–এ যখন মাছ ধরতে যেতাম আমরা। আমরা কড়া রোদের মধ্যে নৌকায় বসে থাকতাম, ঘন্টার পর ঘন্টা, একটি কথাও না বলে। কিংবা সাগরবেলায় শুয়ে থাকতাম। কিংবা একসঙ্গে ক্যাম্পিং–এ যেতাম, খাবার পর চুপচাপ শুয়ে থাকতাম, পাশে মশা তাড়াবার জন্য ছোট্ট একটু আগুন জ্বলছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই।

সম্ভবতঃ আমি ওর স্মৃতিতে বার্ডেন্স ল্যান্ডিং আর সেই সব দিনের কথা জাগিয়ে তুলতাম বলেই এ্যাডাম আমাকে খানিকটা সময় দেবার ব্যাপারে কিছু মনে করতো না। অবশ্য ও বিষয়ে সে কিছু বলতো না। কিন্তু একবার বলেছিলো। সে বলেছিলো তার চেয়ারে তার দীর্ঘ, সমর্থ, চঞ্চল আঙ্গুলগুলি দিয়ে হাতের হাল্কা সুরার গ্লাসটি ধীরে ধীরে ঘোরাতে ঘোরাতে সে তার গ্লাসের দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর মুখ তুলে সে আমাকে বলেছিলো, এক সময় আমাদের খুব ভালো দিন গেছে, তাই না? যখন আমরা ছোট ছিলাম।

হ্যাঁ।

তুমি, আমি আর এ্যান।

আমি বললাম, হ্যাঁ। এক মুহূর্ত আমি এ্যানের কথা ভাবলাম, তারপর প্রশ্ন করলাম, এখন কি তোমার দিন ভালো যাচ্ছে না?

ও আধ মিনিট ধরে প্রশ্নটা নিয়ে ভাবলো, যেন আমি ওকে সত্যিকার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, আর হয়তো সত্যিই ব্যাপারটা তাই ছিলো। তারপর সে বললো, তো, আমার মনে হয় না ও বিষয়টা আমি কখনো ভেবে দেখেছি। একটু থেমে আবার বললো, না, আমার মনে হয় না আমি ও বিষয়টা কখনো ভেবে দেখেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার দিন ভালো যাচ্ছে না? তুমি কি সব কিছু উপভোগ করছো না? এত বড়ো একটা কেউকেটা লোক তুমি। এই কেউকেটা হওয়াটা তুমি উপভোগ করছো না?

আমি ছাড়লাম না। আমি জানতাম যে কাউকে এ ধরনের প্রশ্ন করার কোনো অধিকার কারো নেই, অন্ততঃ আমার কানে আমার গলার যে–সুর এসে বাজছিলো সেই সুরে তো নয়ই, তবু আমি থামতে পারলাম না। আপনি একজনের সঙ্গে বড়ো হয়ে উঠেছেন, সে জীবনে সাফল্য অর্জন করেছে, একটা বিরাট কেউকেটা হয়ে উঠেছে, আর আপনার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, অথচ আপনার সঙ্গে সে চিরকাল যেরকম আচরণ করেছে এখনও সেই একই রকম আচরণ করছে, একটুও বদলায় নি। কিন্তু সেটাই আপনাকে ক্ষেপিয়ে তোলে, নিজেকে আপনি মনে মনে যতই গালমন্দ করুন না কেন, তার গায়ে আপনি তীব্র তীক্ষ্ণ হুল ফুটিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠেন। ব্যর্থতার মধ্যেও এক জাতীয় উন্নাসিকতা আছে। একটা ক্লাব

অথবা পুরানো দীর্ঘ ঐতিহ্যবাদী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর আপনার এক কালের বন্ধু যে এখন বিরাট কেউকেটা, অথচ আপনি কিছুই নন, শুঁড়িখানার পাশে ঘুরঘুর করা এক মাতাল মাত্র, অথচ আপনার বন্ধুর আচরণ সেই আগের মতো, একটুও মুখ বাঁকায় নি, কিংবা পুরানো বন্ধু আপনাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে খাবার জন্য, আলাপ করিয়ে দিয়েছে তার স্বচ্ছ চোখের সুন্দরী স্ত্রী আর স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তবে এ্যাডামের অগোছালো জীর্ণ এ্যাপার্টমেন্টে কোনো সুন্দরী স্ত্রী ছিলো না, কিন্তু সে তো বিরাট একটা কেউকেটা হয়েছে, আর তাই ওকে আমি ছাড়লাম না।

কিন্তু ও ব্যাপারটা ঠিক বুঝলো বলে মনে হলো না। সে শুধু তার শান্ত সরল নীল দৃষ্টি ফেরালো আমার দিকে, সে দৃষ্টি এখন ঈষৎ ছায়াচ্ছন্ন, কিছু একটা ভাবছে, তারপর বললো, আমি ও-বিষয়টা নিয়ে কখনো ভেবে দেখি নি। তারপরই তার মুখের ভাব হঠাৎ একটু বদলে গেলো। সাধারণতঃ তার মুখ দেখাতো সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, নির্ভুল একটা অস্ত্রোপচার করা ক্ষতের মতো, যেটা এখন ভালো করে সেরে গেছে, কোনো বিকৃতি নেই কোথাও কিন্তু এই মুহূর্তে সে হেসে উঠতেই তার মুখ অন্য রকম হয়ে গেলো।

কাজেই আমি যে অপকীর্তি করে ফেলেছি সেটা যথাসাধ্য শুধরে নেবার চেষ্টা করলাম, মিষ্টি গলায় বললাম, হ্যাঁ, যখন আমরা ছোট ছিলাম, তুমি আর এ্যান আর আমি, তখন খুব ভালো সময় কেটেছিলো আমাদের।

হ্যাঁ, যখন তারা ছোট ছিলো, এ্যাডাম স্ট্যান্টন, এ্যান স্ট্যান্টন আর জ্যাক বার্ডেন, সেই বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এ সমুদ্রের ধারে, তখন সত্যিই তারা খুব আনন্দে ছিলো। উপসাগরের কূলে মাঝে মধ্যে ঝড় ঘনিয়ে আসতো, আকাশ কালো হয়ে যেতো বৃষ্টিতে, পান গাছগুলি বাতাসে উথালপাথাল করতো, ঝুঁকে পড়তো বাতাসের গতিনির্ধারক যন্ত্রগুলির উপর, আর সেগুলি ছেঁড়াখোঁড়া, রাগী, স্ফীত শেষ আলোয় ভেজা টিনের মতো চকচক করতো, কিন্তু আমরা শীতে হি হি করে কাঁপতাম না, কিংবা সমুদ্র উপকূলে মারাও পড়তাম না, কারণ আমরা নিরাপদে অবস্থান করতাম সাদা একটা বাড়িতে, হয় ওদের বাড়িতে নয় আমাদের বাড়িতে, আর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সামুদ্রিক দেয়ালের ওপারে আমরা দেখতাম শুভ্র তরঙ্গমালার সফেন সমাবেশ। আর ওই ঘরেই, আমাদের পেছন দিকে বসে থাকতেন গভর্নর স্ট্যান্টন কিংবা মিঃ এলিস বার্ডেন, কিংবা উভয়েই, কারণ ওঁরা ছিলেন বিশেষ বন্ধু, কিংবা বিচারপতি আরউইন, তিনিও বন্ধু ছিলেন, আর গভর্নর স্ট্যান্টন কিংবা এলিস বার্ডেন কিংবা বিচারপতি আরউইনকে বিচলিত করার সাধ্য ছিলো না কোনো ঝড়ো হাওয়ারই।

তুমি আর এ্যান আর আমি, এ্যাডাম স্ট্যান্টন আমাকে বলেছিলো, আর আমিও তাকে তাই বলেছিলাম। তো একদিন সকালে আমি যখন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে সক্ষম হলাম, আমি এ্যানকে টেলিফোন করলাম, বললাম, বহু কাল তোমার কথা ভাবি নি, কিন্তু সেদিন রাতে এ্যাডামের সঙ্গে যখন দেখা হলো সে বললো যে আমরা যখন ছোট ছিলাম, তুমি আর সে আর আমি, আমাদের সেই ছেলেবেলার দিনগুলি ছিলো খুব আনন্দের। অতএব আমার সঙ্গে আজ ডিনার খেলে কেমন হয়? যদিও আমাদের তারুণ্য বহু দিন গত। আমরা এখন খুঁড়িয়ে হাঁটছি। তবু। সে রাজী হলো। অবশ্য সে মোটেই খুঁড়িয়ে হাঁটছিল না। কিন্তু কোনো মজা হয় নি সেদিন।

ও জানতে চাইলো আমি আজকাল কি করছি। আমি বললাম, কিচ্ছু না, একেবারে কিচ্ছু না, নগদ টাকা ফুরোবার অপেক্ষায় আছি শুধু। সে আমাকে বললো না যে আমার কিছু একটা করা উচিত। এমন কি তার মুখের মধ্যেও সেরকম ভাব ফুটে উঠলো না। এটা চাট্টিখানি কথা নয়। তো আমি জানতে চাইলাম সে আজকাল কি করছে, আর সে হেসে উঠে জবাব দিলো, কিচ্ছু না, একেবারে কিচ্ছু না। কিন্তু আমি জানতাম যে এটা মিছে কথা। সে সারাক্ষণ অনাথ, হাবা-গোবা, অন্ধ নিগ্রো প্রমুখের জন্য বিনি পয়সার সমাজসেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকতো। এবং তার দিকে তাকিয়ে আপনার মনে হতো এসবই একটা কিছুর নিছক অপচয়, আর সে জিনিসটা অর্থ নয়। অতএব আমি বললাম, আশা করি আনন্দদায়ক সঙ্গ পাচ্ছো।

সে জানালো, বিশেষ নয়।

আমি ভালো করে ওকে দেখলাম। যা দেখবো বলে জানতাম, যখন সে আমার মুখোমুখি না বসে অন্যত্র বসতো তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যা ইতিপূর্বে বহুবার দেখেছিলাম, তাই দেখলাম, আমি এ্যান স্ট্যান্টনকে দেখলাম, হয়তো খুব সুন্দরী এক রমণী নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে এ্যান স্ট্যান্টন। এ্যান স্ট্যান্টন ঃ গায়ের রঙে বাদামীর স্পর্শ, মুখে সোনালী আলোর আভা, এ্যাডামের মতো শ্যামলা নয়, চামড়ার নিচে একটা ঋজু সুস্পষ্ট কাঠামোর অস্তিত্ব বোঝা যায়, চামড়া হাড়ের উপর টান টান, এ্যাডামের মুখের মতো এখনেও কি একটা টানাপোড়েনের ইঙ্গিত চোখে পড়ে, যেন তার নির্মাতা কোমলতা আর শৈথিল্যের উপর কোনো উপাদান অযথা নষ্ট করতে চান নি, যেন বস্তুটিকে তিনি একটা পরিষ্কার বিশুদ্ধ শিল্পরূপ দিয়েছেন। ওর কালো চুল মসৃণভাবে আঁচড়ানো, প্রায় শক্ত করে, নিখুঁত সিঁথি। ওর নীল চোখ দিয়ে আপনাকে সে দেখে, এ্যাডামের চোখের মতোই, একই রকম সোজাসুজিভাবে, কিন্তু এ্যাডামের স্বচ্ছ, বিমূর্ত, বরফ–নীলের জায়গায় আপনি এখানে দেখতে পেতেন গাঢ়তর দ্বন্দ্বপীড়িত, কেমন জটিল একটা নীল। অন্ততঃ

কখনো কখনো। ওরা দুজনেই দেখতে ছিলো এক রকম। যমজ হতে পারতো তারা। এমনকি ওদের উভয়ের হাসিও ছিলো এক রকম। তবে এ্যানের ক্ষেত্রে মুখটা ছিলো একটু অন্যরকম। সেখানে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত অস্ত্রোপচারের পর চমৎকারভাবে সেরে যাওয়া কোনো ক্ষতের আভাস মাত্র ছিলো না। নির্মাতা এই বস্তুটির ক্ষেত্রে একটু বাড়তি উপাদানের বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। খুব বেশি নয়। কিন্তু তাই ছিলো যথেষ্ট।

ওই হলো এ্যান স্ট্যান্টন। এবং আমি যা দেখতে পাবো বলে জানতাম, তাই দেখলাম।

ও আমার সামনে বসে আছে, খুব সোজা হয়ে, তার ছোটো চৌকোমত কাঁধ আর সুন্দর গোলাকার ঘাড়ের দণ্ডের উপর তার মাথা উঁচু আর সোজা করে, একটু ছোটো কিন্তু গোল গোল সুন্দর হাতদুটি দু'পাশে সোজা নামানো, প্রায় গাণিতিক সুষমা নিয়ে। তার দিকে তাকিয়েই আমি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারলাম যে টেবিলের নিচে তার ছোট ছোট পা দুটিও নিখুঁতভাবে পাশাপাশি নামানো আছে, উরুর গায়ে উরু, হাঁটুর গায়ে হাঁটু, গোড়ালির গায়ে গোড়ালি সুবিন্যস্তভাবে স্থাপিত। বস্তুতঃপক্ষে তার মধ্যে একটা কিছু ছিলো যা ঈষৎ স্টাইলাইজ্ড, শেষ যুগের মিশরীয় রাজকুমারীদের ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তির মধ্যে যা দেখা যায় অনেকটা সেই রকম, যার মধ্যে মাধুর্য ও কোমলতার ঘাটতি না ঘটিয়েও সেই মাধুর্য ও কোমলতা একটা গাণিতিক আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ হয়ে যায়। এ্যান স্ট্যান্টন সব সময় আপনার দিকে সরাসরি তাকাতো, তবু আপনার মনে হতো তার দৃষ্টি যেন দূরে কিছু একটার উপর নিবদ্ধ। তার মাথা থাকতো সব সময় খাড়া আর উঁচু, আর আপনার মনে হতো সে যেন কোনো একটা কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য আপেক্ষা করে আছে, যে-স্বর আপনি শুনতে পাবেন না। সে সব সময় দাঁড়াতো পরিপাটি আর সোজা হয়ে, আর আপনার মনে হতো যে তার সব মাধুর্য ও কোমলতা একটা আইডিয়ার কঠোরতার মধ্যে ধরা, যা সংজ্ঞায়িত করা আপনার সাধ্যাতীত।

আমি বললাম, তুমি কি আইবুড়ো থাকার পরিকল্পনা করেছো নাকি?

সে হেসে উঠে বললো, আমি কিছুই পরিকল্পনা করি নি। বহুদিন আগেই আমি পরিকল্পনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

খাবার টেবিলগুলোর মধ্যবর্তী, রুমালের মতো ছোট্ট, ফাঁকা জায়গায় আমরা কিছুক্ষণ নাচলাম। টেবিলের উপর অর্ধভুক্ত স্প্যাঘেটির প্লেট, মুরগীর হাড় আর লাল মদের বোতল পড়ে রয়েছে। মিনিট পাঁচেকের মতো নাচের মধ্যে একটা নিজস্ব অর্থ পাওয়া গেলো, তারপরই মনে হলো যেন স্বপ্নের মধ্যে আমরা একটা জটিল ও

অশুভ কিছুর অভিনয় করে চলেছি, যার একটা অর্থ আছে বলে মনে হয় কিন্তু সেটা যে কি তা বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। তারপরই বাজনা থেমে গেলো, নাচ বন্ধ হলো, মনে হলো যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি, জেগে উঠে আর পালাতে পারা যাচ্ছে না বলে আনন্দিত, আবার দুঃখিতও, কারণ সমস্ত ব্যাপারটা যে কি ছিলো তা আর কোনোদিন জানা যাবে না।

তারও নিশ্চয়ই একই রকম অনুভূতি হয়েছিলো, কারণ আমি যখন, পরে, ওকে আবার নাচের জন্য আমন্ত্রণ জানালাম, সে বললো যে, না, ইচ্ছে করছে না, আমরা বরং কথা বলি। আমরা কথা বলেছিলাম। অনেক কথা। কিন্তু সেটাও নাচের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ছেলেবেলার দিনগুলো যে কী সুখের ছিলো তা নিয়ে অন্তহীন আলাপচারিতা চলতে পারে না।

আমি ওকে তার এ্যাপার্টমেন্ট ভবনে পৌছে দিলাম। এ্যাডামের আস্তানার চাইতে অনেক উঁচু স্তরের। গভর্নর স্ট্যান্টন তো খুব একটা নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ওকে পথে বসিয়ে যান নি। আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে এ্যান বললো, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থেকো, জ্যাক।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আবার আমার সঙ্গে খেতে আসবে তো?

ও জবাবে বললো, যখনই তুমি বলবে, জ্যাক, যখনই বলবে। তুমি তো জানো।

হ্যাঁ, আমি তা জানতাম।

এবং সে আমার সঙ্গে আবার ডিনার খেয়েছিলো। কয়েকবারই। শেষের বার সে বলেছিলো, সেদিন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, হুঁ। সে বললো, ও রকম ক'রো না।

কি রকম?

ওহ্, তুমি জানো কি রকম। উনি কেমন আছেন তাও কি তুমি জানতে চাও না?

উনি কেমন আছেন তা আমি জানি। উনি তাঁর ওই খুপরীর মধ্যে বসে আছেন চুপচাপ, নয় তো তাঁর ওই হাভাতেদের জন্য মিশানের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন, কিংবা রাস্তায় রাস্তায় বিলি করার জন্য তাঁর ওই অর্থহীন প্রচারপত্রগুলি লিখে যাচ্ছেন একের পর এক, বাইবেলের মার্ক ৪ ঃ ৬, আর জোব ৭ ঃ ৫, নাকের উপর তাঁর চশমা ঝুলে পড়েছে, তাঁর কালো কোটের কলারের উপর খুসকি ঝরে পড়ে ডাকোটা অঞ্চলের তুষার ঝড়ের মতো দেখাচ্ছে।

মিনিট খানেক এ্যান কোনো কথা বললো না। তারপর বললো, ওঁর সঙ্গে আমার পথে দেখা হয়। ভালো দেখাচ্ছিলো না ওঁকে। মনে হলো অসুস্থ। প্রথমে আমি চিনতে পারি নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁর ওই কাগজপত্রের জঞ্জাল কিছুটা গছিয়ে দিচ্ছিলেন বুঝি?

এ্যান বললো, হ্যাঁ। আমার দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিলেন। আমার তাড়া ছিলো, তাই আমি কোনো কিছু খেয়াল না করেই আমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারপর আমার মনে হলো তিনি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি প্রথমটায় তাঁকে চিনতে পারি নি।

ও একটু থামলো, তারপর বললো, এটা প্রায় দু'সপ্তাহ আগের কথা।

আমি জানালাম যে ওঁর সঙ্গে আমার প্রায় এক বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই।

এ্যান বললো, ওহ্, জ্যাক। এটা উচিত হচ্ছে না। তোমার ওঁকে দেখতে যাওয়া উচিত।

কিন্তু আমি ওঁকে কি বলবো? আর ঈশ্বর জানেন, ওঁরও আমাকে বলার কিছু নেই। কেউ তো তাঁকে ওই রকম জীবন যাপন করতে বাধ্য করে নি। নিজের আইনজীবীর দপ্তরটা ছেড়ে ছুড়ে চলে আসতেও কেউ তাঁকে বাধ্য করে নি। চলে আসার সময় দরজাটা বন্ধ করার তাগিদ পর্যন্ত তিনি অনুভব করেন নি।

কিন্তু, জ্যাক, তিনি —

তিনি যা করতে চান তাই করছেন। তাছাড়া একজন মহিলার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছেন না শুধু সেই কারণেই যদি তিনি এ ধরনের বোকামি করে থাকেন — বিশেষ করে আমার মায়ের মতো এক মহিলার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছেন না বলে — তা হলে কে কি করতে পারে। ওই মহিলার চাহিদা পূরণে যদি তিনি ব্যর্থ হন, তা সে চাহিদা যাই থাকুক না কেন, তাহলে —

এ্যান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, আহ্, ওরকম করে বলো না।

আমি বললাম, দেখ, তোমার বাবা এক সময় গভর্নর ছিলেন, বিশাল মেহগনি খাটে শুয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, দু'জন আকাশ-ছোঁয়া-ফী-নেয়া ডাক্তার তাঁর মৃত্যুকালীন চিকিৎসা করেছে, তাঁর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে নিজেদের মাথার মধ্যে হিসেব কষেছে কতো বিল উঠবে, আর তুমি আমার বাবাকে ভেবেছো একজন স্যুট-কোট পরিহিত যীশু খ্রীস্ট সদৃশ মানুষ, শুধু সেজন্য আমার সঙ্গে তোমার একজন প্রাজ্ঞ বৃদ্ধা মহিলার মতো কথা বলার চেষ্টা করার দরকার নেই। আমি তোমার পরিবার নিয়ে কোনো কথা বলি নি, আমি বলেছি আমার পরিবার সম্পর্কে, আর আমি যদি সরল নির্জলা সত্যটা দেখতে পাই তবে আমি নাচার। এবং তুমি যদি —

ঠিক আছে, এ নিয়ে তোমাকে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে হবে না। কারো

সঙ্গেই বলতে হবে না।

কথাটা সত্য।

এ্যান প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, সত্য? টেবিলক্লথের উপর তার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো। সে বললো, তুমি কেমন করে জানো যে এটা সত্য? তুমি এসম্পর্কে কিছু জানো না। ওরা যা করেছে তা কেন করেছে সে সম্পর্কে তুমি কিচ্ছু জানো না।

আমি যা সত্য তাই জানি। আমি আমার মাকে চিনি তুমিও চেনো । মা বাবাকে সব সময় দাবিয়ে রেখেছেন, আর বাবা মাকে সেটা করতে দিয়ে বেকুবির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

আহ, মনের মধ্যে অতটা তিক্ততা জমিয়ে রেখো না। সে হাত বাড়িয়ে আমার বাহু আঁকড়ে ধরলো, একটু নাড়া দিলো; তার আঙ্গুলগুলি আমার বাহুর উপর এতো জোরে চেপে বসলো যে আমি কোটের ভেতর দিয়েও তার তীব্র চাপ অনুভব করলাম।

আমি বললাম, আমার মধ্যে কোনো তিক্ততা নেই। ওঁরা কি করেছিলেন তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। এখন কি করছেন বা কেন করছেন, তা নিয়েও না।

তখনো এ্যান আমার বাহু ধরে আছে তবে আর অতো জোরে নয়। সে বললো, ওহ্, জ্যাক, তুমি কি ওদের সামান্য একটু ভালোবাসতে পারো না, কিংবা ক্ষমা করে দিতে, কিংবা ওদের সম্পর্কে একটুও না ভাবতে, কিংবা ওই রকম কিছু? এখন যেমন আছো তার চাইতে ভিন্ন রকম কিছু?

আমি বললাম, ওদের কথা না ভেবে আমি খুব সহজে আমার বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারি।

আমি লক্ষ করলাম যে ও খুব ধীরে ধীরে ওর মাথাটা এক পাশ থেকে আরেক পাশে নাড়লো। ওর চোখ দুটি অসম্ভব গাঢ়, নীল, আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, দাঁত দিয়ে ও তার নিচের ঠোঁট শক্ত করে চেপে ধরেছে। আমি আমার ডান হাত প্রসারিত করে আমার বাঁ বাহুর উপর থেকে তার হাতটা নামিয়ে করতল নিচের দিকে করে টেবিলের উপর রাখলাম, তারপর আমার হাত দিয়ে তার হাত ঢেকে দিয়ে বললাম, আমি দুঃখিত।

না, জ্যাক, তুমি দুঃখিত নও। সত্যি সত্যি দুঃখিত নও। তুমি কখনোই কোনো বিষয় নিয়ে দুঃখিত হও না। আনন্দিতও না। তুমি হলে — ওঃ, তুমি যে কী আমি জানি না।

আমি আবার বললাম, আমি দুঃখিত।

না। তুমি ভাবো যে তুমি দুঃখিত। কিংবা আনন্দিত। আসলে তুমি কোনোটাই হও না।

আমি যদি মনে করি আমি দুঃখিত তাহলে কার বলার অধিকার আছে যে আমি দুঃখিত নই?

আমি জোর গলায় ওই প্রশ্ন করলাম, কারণ তখন আমি কট্টর আইডিয়ালিস্ট। আগেই সে কথা বলেছি। আর আমি দুঃখিত কিংবা দুঃখিত না সেটা ঠিক করার জন্য কোনো গণভোটের আয়োজন করতে আমি রাজী ছিলাম না।

ও বললো, কথাটা শুনতে ঠিকই শোনায়, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কেন তা আমি জানি না — না, জানি — তুমি যদি কখনো দুঃখিত বা আনন্দিত না হয়ে থাকো, তবে পরের বার দুঃখিত হলে, না আনন্দিত হলে, তা জানবার তোমার কোনো উপায়ই থাকে না।

আমি বললাম, ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে আমি একটা কথা বলতে পারি কি? এখন আমার ভেতরে কিছু একটা ঘটছে যাকে আমি দুঃখবোধ বলতে চাই।

বলতে পারো, কিন্তু তুমি তা জানো না। সে আমার হাতের তলা থেকে তার হাত টেনে নিয়ে বললো, তুমি দুঃখিত বা আনন্দিত হতে শুরু করো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বোধ কোথাও গিয়ে পৌঁছায় না।

মানে, তুমি বলছো, একটা পোকা-ধরা কাঁচা আপেলের মতো, যেটা পাকবার আগেই টুপ করে গাছ থেকে ঝরে পড়ে?

ও হেসে উঠে জবাব দিলো, হ্যাঁ, পোকা-ধরা কাঁচা আপেলের মতোই।

আমি বললাম, তাহলে এখানে একটা পোকা-ধরা আপেলই দেখতে পাচ্ছো তুমি। আমি দুঃখিত।

আমি সত্যি দুঃখিত হয়েছিলাম, অন্তত আমার অভিধানে দুঃখিত বলতে যা বোঝায় তা হয়েছিলাম। সন্ধ্যাটা মাটি করে দেবার জন্য আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। তবে সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে মাটি করে দেবার মতো তেমন তাৎপর্যময় সন্ধ্যা সেটা কখনো হয়েই ওঠে নি।

আমি আর ওকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাই নি, অন্ততঃ আমার ওই কর্মহীন এবং নিদ্রামগ্ন থাকার কালে। আমি এ্যাডামকে খুঁজে বার করে তার ওখানে গিয়েছিলাম, তার পিয়ানো বাজানো শুনেছিলাম। আমি স্প্যাঘেটি আর লাল সুরার ওপাশে বসেছিলাম। এ্যান স্ট্যান্টনকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম। এ্যানের কথা শুনে আমি বস্তি অঞ্চলে গিয়ে আমার বাবার সঙ্গে দেখাও করেছিলাম। খুব দীর্ঘদেহী নয়, এক সময় শক্তসমর্থ ছিলেন, এখন ফোলা ফোলা মুখ ঝুলে পড়েছে, চুল সাদা,

নাকের উপর স্টীলের চশমা নেমে এসেছে, সরু কাঁধ, তার উপর সাদা খুসকির ঢল, বেমানান যত্নশীল পেটের টানে কাঁধ শিথিল হয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে, কালো স্যুটের ভেস্ট বেল্টের উপরে উঠে এসেছে, প্যান্টটা ঢোলা ঢোলা। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি যা দেখবো বলে ভেবেছিলাম তাই দেখেছি, কারণ ঘটনাগুলো ঘটে গিয়েছিলো এবং যা ঘটে গেছে তাকে আর কিছুই বদলাতে পারতো না। জলে ডোবা মানুষের মতো আমি ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলাম, আর লোকে যেমন বলে যে ডুবন্ত মানুষের চোখের সামনে দিয়ে তার সমস্ত অতীত মুহূর্তের মধ্যে ভেসে যায় আমার চোখের সামনে দিয়েও তা ওই রকম ভেসে গিয়েছিলো।

তো, আমি এখন আবার ঘুমুতে যেতে পারি। অন্ততঃ যতক্ষণ না আমার টাকা ফুরিয়ে যায়। রিপ ভ্যান উইনকল্ বনতে পারি আমি। শুধু আমার মতে রিপ্ ভ্যান উইনকলের কাহিনীটা সম্পূর্ণ ভুল। আপনি বহুকাল ঘুমিয়ে থাকতে পারেন, তারপর যখন জেগে উঠবেন তখন দেখবেন যে কিছুই বদলায় নি। যত দীর্ঘ কালই ঘুমোন না কেন দেখবেন সব সেই আগের মতোই আছে।

কিন্তু আমার খুব বেশি ঘুমানো হলো না। একটা চাকুরি পেয়ে যাই আমি। বরং বলা উচিত একটা চাকুরি আমাকে পেয়ে গেলো। একদিন সকালে টেলিফোনের শব্দে আমার ঘুম ভাঙলো। স্যাডি বার্কের ফোন। সে বললো, দশটার সময় ক্যাপিটলে উপস্থিত থেকো। বস্ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

কে?

বস্। কর্তা। উইলি স্টার্ক, গভর্নর স্টার্ক, নাকি তুমি কাগজ টাগজ পড়ো না।

পড়ি না। তবে চুল কাটার সময় নাপিতের দোকানে কথাটা শুনেছি।

ঠিকই শুনেছো। কর্তা দশটার সময় তোমাকে আসতে বলেছেন।

ও ফোন ছেড়ে দিলো।

আমি মনে মনে বললাম, তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকো তখন কিছু পরিবর্তন হয়তো সত্যিই ঘটে। তখন ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করি নি। এবং কালো ওক্ প্যানেলিং-এর বিরাট ঘরের মধ্য দিয়ে, লাল, কোমল দীর্ঘ কার্পেট মাড়িয়ে, দুপাশের শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের অকৃত্রিম তৈলচিত্র থেকে তাকিয়ে থাকা চোখের তলা দিয়ে আমি যখন ওই লোকটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, বেশি বয়স নয় তার, শ্মশ্রুমণ্ডিতও নয়, বড়ো বড়ো উঁচু জানালার পাশে তার টেবিলে বসে আছে, যখন সে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, তখনও আমি ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। আমি মনে মনে বলে উঠলাম, আরে, কি কাণ্ড, এ যে উইলি!

হ্যাঁ, সেই উইলি, যদিও আপটনের দিনগুলিতে যে মফস্বলী নীল সার্জের স্যুট

তার পরনে থাকতো এখন তার চাইতে ভিন্নতর কিছু তার গায়ে। তবু এখনো যেনতেনভাবে সে তার পোশাক গায়ে চড়িয়েছে, টাইটা শিথিল, এক পাশে একটু বাঁকা, গলার বোতাম খোলা, আর তার চুল কপালের উপর ঝুলে পড়েছে, ঠিক আগের দিনের মতো। এক সেকেন্ডের জন্য আমার মনে হলো তার মাংসল ঠোঁট দুটি যেন আগের চাইতে একটু বেশি চেপে বসেছে, কিন্তু সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হবার আগেই সে হাসিমুখে চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের এপাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তখন আমি আবারও ভাবলাম, এ যে সেই উইলি! ও হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, হ্যালো, জ্যাক।

কনগ্র্যাচুলেশনস।

শুনলাম ওরা তোমার চাকুরি খেয়ে নিয়েছে।

ভুল শুনেছেন। আমি নিজে ছেড়ে দিয়েছি।

বুদ্ধিমানের কাজ করেছো, কারণ ওদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া শেষ হবার পর তোমাকে বেতন দেবার সামর্থ আর ওদের থাকবে না। যে নিগ্রো পরিচারক ওদের থুতু ফেলার পাত্রগুলি পরিষ্কার করে তার বেতনও ওরা দিতে পারবে না।

আমার কথা যদি বলেন, তাহলে সেটা অতি উত্তম হবে।

চাকুরি চাই?

বিবেচনা করে দেখতে পারি।

মাসে তিনশো ডলার বেতন। আর ভ্রমণ খরচ। যখন ভ্রমণ করবে।

কার চাকুরি করবো? স্টেটের?

না, আমার।

আমি বললাম, আমার তো মনে হয় আপনাকেই আমার চাকুরি করতে হবে। গভর্নরের বেতন তো মাত্র পাঁচ হাজার।

ও হেসে উঠে বললো, ঠিক আছে, আমিই তাহলে তোমার চাকুরি করবো।

তখন আমার মনে পড়লো যে ও তার আইন ব্যবসায়ে প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছিলো।

আমি বললাম, তা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

উইলি বললো, চমৎকার। লুসি তোমাকে দেখতে চায়। কাল রাতে বাসায় এসো, খাবে আমাদের সঙ্গে।

মানে ম্যানশানে? গভর্নর প্রাসাদে?

তবে কোথায়? পর্যটন ভবনে? নাকি কোনো বোর্ডিং হাউসে? অবশ্যই ম্যানশানে।

হ্যাঁ। ম্যানশানে। ও আমার সঙ্গে সেই পুরানো দিনের মতোই ব্যবহার করবে, বাড়িতে খেতে ডাকবে, সুন্দরী স্ত্রী আর স্বাস্থ্যবান সন্তানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

ও তখন বলছিলো, জানো, ওখানে লুসি, টম আর আমি কী যে হৈ চৈ করি!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কি করতে হবে?

খাবে। সাড়ে ছ'টার দিকে আসবে আর পেট পুরে খাবে। কি কি খেতে চাও লুসিকে ফোন করে বলে দিও।

আমি জানতে চাইছিলাম আমার কাজটা কি হবে?

তা আমি কি করে বলবো? তবে একটা কিছু ঠিকই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ও মিথ্যা বলে নি।

## তৃতীয় অধ্যায়

যতবার আমি বাড়ি এসেছি, মাকে দেখেছি, ততবারই সেই একই ব্যাপার ঘটেছে। ঘটনাটা দেখে আমি অবাক হতাম যদিও সেই সঙ্গে এটাও জানতাম যে এরকমই ঘটবে। বাড়ি ফিরবার সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমি ফিরতাম যে মা আমার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভাবেন না, আমি শুধু আরেকজন পুরুষ মানুষ যাকে তিনি তাঁর চারপাশে দেখতে চান, মা ওই জাতীয় মহিলা যারা চায় যে সব সময় কিছু পুরুষ মানুষ তাদের ঘিরে থাকুক, তাদের অঙ্গুলিহেলনে চলুক। কিন্তু তাঁকে দেখামাত্র আমি এইসব কথা ভুলে যেতাম। অনেক সময়, দেখার আগেই। যাই হোক, এটা ভুলে যাবার পর আমি অবাক হয়ে ভাবতাম কেন আমরা দু'জন মিলেমিশে থাকতে পারি না। আমি অবাক হয়ে সেকথা ভাবতাম যদিও কি ঘটতে যাচ্ছে, কোন্ দৃশ্যের মধ্যে আমি পা দিচ্ছি, কি কথা আমি বলবো তাও আমি আগে থাকতেই জানতাম, এসব ইতোপূর্বেই ঘটে গেছে, কিংবা এসব ঘটা কখনো বন্ধই হয় নি, আর আমি প্রশস্ত, সাদা, উঁচু ছাদের হলঘরটিতে ঢুকতে থাকবো, গাঢ় বরফের মতো চকচকে মেঝের ওপরে আমার মাকে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবো, পেছনে ছায়াছায়া ঘরের এক প্রান্তে আগুনের চুল্লিটিকে জ্বলতে দেখবো, আর আমার মায়ের মুখে হঠাৎ একটা হাসি ফুটে উঠবে, নিষ্পাপ সুখের, বালিকার হাসির মতো। তারপর তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসবেন, তাঁর জুতোর হিলে দ্রুত, উত্তেজিত, ভঙ্গুর খটখট শব্দ উঠবে, গলায় জাগবে ভরাট হাসি, তিনি এগিয়ে এসে আমার সামনে থেমে তাঁর দু'হাত দিয়ে বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীর মধ্যে আমার কোটের একটুখানি খামচে ধরবেন, প্রায় শিশুর মতো, একই সঙ্গে দুর্বল ও জবরদস্তি দাবীর ঢং-এ, তারপর তাঁর মুখ তুলে ধরবেন আমার দিকে, একটু একপাশে করে, যেন তাঁর গালের উপর আমি প্রত্যাশিত চুম্বনটি স্থাপন করতে পারি। আমি দেখবো যে তাঁর গালের ত্বক মসৃণ, ঋজু, ঠাণ্ডা, আর চিরকাল তিনি যে সেন্ট ব্যবহার করেন সেই সেন্টের গন্ধ আমি টেনে নেবো আমার নিঃশ্বাসে। তাঁকে চুমু খাওয়ার সময় আমি দেখবো কি নিখুঁতভাবে তাঁর ভ্রূ তোলা, আমার দিকে ফেরানো তাঁর চোখের কোণায় আমি

দেখবো সূক্ষ্ম দাগ, লক্ষ করবো তাঁর চোখের পাতাগুলো কেমন কোঁকড়ানো আর ছায়াছায়া, দেখবো তাঁর নীল চোখের উপরে ওই পাতাগুলি কেমন কাঁপছে। ওঁর সামান্য বার করা উজ্জ্বল দুটি চোখ আমার পেছনে কোনো একটা বিন্দুর উপর স্থির নিবদ্ধ থাকবে।

চিরকাল এই রকমই হয়েছে — যখন আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছি, যখন আমি ক্যাম্প থেকে ফিরেছি, যখন আমি কলেজ থেকে ফিরেছি, যখন আমি আমার বিভিন্ন চাকুরি থেকে ফিরে এসেছি — আর সেবার ১৯৩৩ সালে, শীত আর বসন্তের সীমান্তবর্তী এক সময়ে, এক বর্ষণমুখর অপরাহ্নে আমি যখন দীর্ঘদিন পরে আবার বাড়ি ফিরে আসি তখনও। এবার প্রায় সাত–আট মাস আমি বাড়ি আসি নি। শেষবার গভর্নর স্টার্কের ওখানে আমার কাজ করা নিয়ে ঝগড়াটা বেধেছিলো। তবে, আগে হোক বা পরে হোক, একটা কিছু নিয়ে ঝগড়া বাধতোই। বছর আড়াই ধরে আমি উইলি স্টার্কের কাজ করছিলাম। এই সময়, সাধারণতঃ ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত উইলি স্টার্কে গিয়েই গড়াতো। তার নাম যদি উচ্চারিত নাও হতো, তবু সে দাঁড়িয়ে থাকতো আমাদের পেছনে, ছায়ার মতো। অবশ্য কি নিয়ে আমাদের ঝগড়া হতো সেটা তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আমাদের পেছনে সর্বদা আরো একটা ছায়া দাঁড়িয়ে থাকতো, উইলির ছায়ার চাইতেও দীর্ঘ, তার চাইতেও কালো। তবু আমি সব সময় ফিরে আসতাম, এবারও এসেছি। এই রকমই ছিলো ব্যাপারটা, আর প্রতিবারই মনে হতো যে সব কিছু মুছে ফেলে দিয়ে একেবারে নতুন করে আবার শুরু করবো, যদিও আমি জানতাম যে সব কিছু মুছে ফেলা যায় না।

মা বললেন, জিনিসপত্র গাড়িতেই রেখে দাও, ছোকরা নিয়ে আসবে, তারপর তাঁর ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে আমার বুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিলেন। মোটেই জোরে নয়, আমার ভারসাম্য তাতে নষ্ট হয় নি, কিন্তু আমি বসে পড়লাম, গা এলিয়ে দিলাম নরম সোফায়। আমার জন্য একটা পানীয় মেশাতে দেখলাম তাঁকে, তারপর একটু অজুহাতের মতো নিজের জন্যই খানিকটা নিলেন, খুবই সামান্য, কখনোই তিনি বেশি পান করতেন না। গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে তিনি আবার হেসে উঠলেন, আগের মতো চকিত ভরাট হাসি। বললেন, নাও, ধরো, তাঁর মুখে এমন একটা ভঙ্গি যেন তিনি অসম্ভব স্পেশাল কিছু পরিবেশন করছেন আমাকে, যেন ঈশ্বরের বিশাল সবুজ ধরণীতে এর সঙ্গে তুলনীয় আর কিছু কোথাও পাওয়া যাবে না।

দুনিয়ায় অনেক রকম সুরা আছে, এমনকি স্কচও, তবু আমি ওটা হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিলাম, আর আমারও মনে হলো যে ওটা সত্যিই বিশেষ কিছু।

অত্যন্ত সহজ সুন্দর ভঙ্গিতে মা সোফায় আমার পাশে বসলেন। একটা পাখি যেমন নড়েচড়ে উঠে, পাখা ছড়িয়ে, হাল্কাভাবে কোনো গাছের ডালে গিয়ে বসে ঠিক সেই রকম একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেলো তাঁর ভঙ্গিতে। তারপর তিনি তাঁর গ্লাসে চুমুক দিলেন, মাথাটা অল্প উচুঁ করলেন, যেন পানীয়টা তিরতির করে গলা বেয়ে নিচে নেমে যাবার সুযোগ করে দিচ্ছেন। একটা পা তুলে, মুড়ে, তার উপর বসেছেন, অন্য পা'টা ঝুলে আছে, ওই পায়ের ধূসর স্যুয়েডের জুতোর ছুঁচলো অগ্রভাগ সামান্য একটুখানি মেঝে ছুঁয়ে আছে, নর্তকীর নিখুঁত ভঙ্গি নিয়ে। সোজা কোমর থেকে পরিস্কারভাবে বেঁকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, ফলে গায়ের ধূসর পোশাকটা কুঁচকে গেছে। আগুনের আলোয় তাঁর মুখের ছোট ছোট সুবিন্যস্ত ডৌল আর ভাঁজগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো, আলো পড়ে দেহের একটা দিক উজ্জ্বল, অন্যদিক ছায়ায় ঘেরা, চোয়ালের হাড়ের নিচে দুদিকে ঈষৎ গর্তের মতো, একটা বুভুক্ষু স্বপ্নময় ভূতুড়ে হাতছানি যেন (বয়স হওয়ার পর যখন এসব জিনিস কিছুটা বুঝতে শিখেছি তখন আমার স্থির প্রত্যয় জন্মায় যে ওরা তাঁর চোয়ালের হাড়ের নিচের এই গর্তের ফাঁদেই ধরা পড়তো, মরতো), আরো দেখা যাচ্ছিলো উঁচু করে চূড়ার মতো সযত্নে বাঁধা চুলের সম্ভার। চুলগুলো হলদেটে, ধাতুর মতো, এখন সেখানে সাদার ছোপ লেগেছে, কিন্তু সেই সাদাও কেমন ধাতব, যেন গলানো ধাতু হলুদের সঙ্গে বুনে কুণ্ডলী পাকিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন প্রথম থেকেই এরকম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। এবং গোটা কাজটা খুবই মহার্ঘ। প্রত্যেকটা ডিটেল।

আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, পঞ্চান্ন হতে চলছে কিন্তু কেমন রেখেছে নিজেকে। এজন্য বাহাবা দিতেই হবে। আর অকস্মাৎ আমার নিজেকে বুড়ো মনে হলো, আমার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনকে মনে হলো যেন অনন্ত কাল ধরে বেঁচে আছি। হাঁ, মাকে বাহাবা দিতেই হবে।

তিনি কিচ্ছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, সেই দৃষ্টি নিয়ে যা সবসময়ই বলতো, তোমার কাছে একটা জিনিস আছে যা আমি চাই, যা আমার দরকার, যা আমাকে পেতেই হবে। আর তিনি মুখেও বলে ফেললেন, দেখ, তোমার জন্য আমার কাছে একটা জিনিস আছে, কি তা বলবো না, এখনও না, কিন্তু তোমার জন্য একটা জিনিস সত্যি আছে।

গালের সেই ছোট্ট গর্ত ঃ সেই বুভুক্ষার ব্যাপার। জ্বলজ্বলে চোখ ঃ সেই প্রতিশ্রুতির কারবার। এবং দুটোই একসঙ্গে। চমৎকার কৌশল একটা।

আমি শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা হাতে তুলে ধরলাম। মা হাত বাড়িয়ে সেটা

ধরলেন, তাঁর দৃষ্টি তখনো আমার মুখের উপর, তিনি ঝুঁকে পড়ে গ্লাসটা পাশের ছোট টেবিলে রেখে বললেন, তোকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

না, আমি ক্লান্ত নই। আমি অনুভব করলাম যে আমার ভেতরের জেদটা জেগে উঠছে।

হ্যাঁ, তুমি ক্লান্ত। মা আমার বাহু ধরে আমাকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করলেন। আমি প্রথমে নিজেকে ছেড়ে দিলাম না, শুধু তাঁকে টানতে দিলাম। খুব জোরে টানছিলেন না তিনি, তবে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন স্থির দৃষ্টিতে।

এক সময় আমি নিজেকে ছেড়ে দিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপরে গিয়ে পড়লাম। চিৎ হয়ে। আমার মাথা ওঁর কোলে। ঠিক যেমন করে পড়বো বলে আমি জানতাম। মা তার বাঁ হাত আমার বুকের উপর রাখলেন, বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে আমার শার্টের একটা বোতাম অনবরত ঘোরাতে লাগলেন, আর তাঁর ডান হাতটা স্থাপন করলেন আমার কপালের উপর। তারপর তিনি সেই হাত রাখলেন আমার চোখের উপর, আর ধীরে ধীরে হাতটা নিয়ে গেলেন আমার কপালের উপর। তাঁর হাত ছিলো সব সময়ই ঠাণ্ডা। জীবনে একেবারে প্রথম দিকে জানা যে সব জিনিসের স্মৃতি আমার আছে তার একটি হলো এই স্পর্শ।

অনেকক্ষণ তিনি কোনো কথা বললেন না, শুধু আমার চোখ আর কপালের উপর তাঁর হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি জানতাম যে এই রকমই হবে, জানতাম যে অতীতে এই রকমই হয়েছিলো, পরেও এই রকমই হবে। কিন্তু সময়ের ঠিক মধ্যিখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ তৈরি করবার কৌশল তাঁর জানা ছিলো। আর আমিও এ তথ্যটা জানতাম। সময়ই আমাকে ওই জ্ঞান দিয়েছে।

মা এরপর আবার বললেন, তুই বড় ক্লান্ত।

আমি ক্লান্ত ছিলাম না। আবার ছিলাম যে না, তাও নয়। আসলে আমার বর্তমান অবস্থার পেছনে ক্লান্তির কোনো ভূমিকা ছিলো না।

একটু চুপচাপ। তারপর আবার প্রশ্ন ঃ তোমাকে কি খুব খাটতে হচ্ছে, বাবা?

এই মাঝারি রকম।

আবার একটু চুপচাপ। তারপর ঃ ওই যে লোকটা, যার চাকুরি করছো তুমি —

তো কি হয়েছে তাতে?

আমার কপালের উপরে হাত বুলানো বন্ধ হয়ে গেলো। আমি বুঝলাম যে আমার কণ্ঠস্বরই তা বন্ধ করেছে।

মা বললেন, কিছু না। শুধু এই যে ওই লোকটার চাকুরি করার তোমার কোনো দরকার নেই। থিওডোর তোমাকে ভালো চাকুরি —

থিওডোরের যোগাড় করে দেয়া কোনো চাকুরি আমার চাই না। আমি উঠে বসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আপনি একটা গভীর নরম সোফায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন আর কেউ আপনার কপালের উপর হাত রেখে বসে আছে সে অবস্থায় আপনি কখনো উঠে বসার চেষ্টা করে দেখেছেন কি?

তাঁর হাত তখনো আমার কপালের উপর দৃঢ়ভাবে রাখা। তিনি আমার উপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, আহ্, ওরকম করো না। করো না। থিওডোর আমার স্বামী, তোমার সৎ-বাবা। ওভাবে বলো না তুমি। ও খুশী হয়ে —

আমি বললাম, দেখ, আমি তোমাকে বলে দিয়েছি যে —

কিন্তু তিনি শুধু বললেন, চুপ, চুপ, আর কোনো কথা নয়। আবার তাঁর হাত আমার চোখের উপর নেমে এলো, তারপর উঠে গেলো আমার কপালের দিকে।

তিনি আর কিছুই বললেন না, কিন্তু যা বলবার তা এর মধ্যেই বলে ফেলেছিলেন, সেই দ্বীপের খেলাটা আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে এখন। হয়তো সেটা করবার জন্যই কথাগুলো বলা। ওটা যে এখনো করতে পারেন শুধু তা প্রমাণ করার জন্য। যাই হোক না কেন, তিনি সেটা করেছেন, আবার নতুন করে, এবং খেলাটা সফল হয়েছিলো। সামনের দরজায় শব্দ না হওয়া পর্যন্ত। তারপরই হলঘরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো। বুঝলাম যে থিওডোর মুরেল এসেছেন। আমি আবার উঠে বসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এখনও, শেষ মুহূর্তটিতে, তিনি তাঁর করতল আমার কপালের উপর চেপে ধরলেন, থিওডোরের পদধ্বনি এই ঘরে এসে না পৌঁছুনো পর্যন্ত আমাকে তিনি উঠতে দিলেন না।

এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার কোট প্রায় ঘাড় অবধি উঠে এসেছে, টাই কানের কাছে। থিওডোরের দিকে তাকালাম আমি, সুন্দর সোনালী গোঁফ, আপেলের মতো গাল, গোলাকার করোটির উপর সুসজ্জিত অনুজ্জ্বল চুল, পেটের কাছটায় ঈষৎ মর্যাদার আভাস (এক্ষুণি প্রতিদিন ভোরে নিচু হয়ে মেঝে ছুঁয়ে একশোবার ব্যায়াম করতে শুরু কর, হারামজাদা, নইলে মিসেস মুরেলের আর তোকে পছন্দ হবে না, আর তখন তোর কি দশা হবে, হারামজাদা?), আর তার সোনালী সুন্দর গোঁফের নিচের ছিদ্রটা খুললে যে শব্দ বেরোয় তা কেমন ফ্যাসফেঁসে, আঠা আঠা, খুব গরম পায়েসের মতো।

আমার মা তাঁর উজ্জ্বল সাবলীল পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে তরুণ এক্সিকিউটিভের একেবারে মুখের সামনে থামলেন। কাঁধ সোজা, টান টান। তরুণ এক্সিকিউটিভ ডান বাহু দিয়ে তাঁর কাঁধ জড়িয়ে ধরলো, সোনালী সুন্দর গোঁফের নিচের ছিদ্রটি দিয়ে তাঁকে চুমু খেলো, আর মা তার হাত ধরে টেনে তাকে আমার

কাছে নিয়ে এলেন। থিওডোর বললো, এই যে, ওল্ড বয়, খুব ভালো লাগছে তোমাকে দেখে। তারপর, কি খবর? রাজনীতিবিদের কাজকর্ম চলছে কেমন?

আমি বললাম, চমৎকার। তবে আমি রাজনীতিবিদ নই। বেতনভোগী চাকুরে মাত্র।

ওহোঃ, আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। লোকে বলে তুমি আর গভর্নর হচ্ছো এই রকম। কথাটা বলে সে তার দুটি আঙ্গুল একত্রিত করে তুলে ধরলো যেন আমি তার প্রশংসা করতে পারি। সরু নয়, খুব পরিষ্কার, সযত্নে নিখুঁত সুন্দর করে নখ কাটা দুটি আঙ্গুল।

আমি বললাম, তুমি গভর্নরকে চেনো না। গভর্নর যদি কারো সঙ্গে এই রকম হন — এবার আমি আমার দুটি আঙ্গুল তুলে ধরলাম, খুব বেশি পরিষ্কার নয়, নখের পরিচর্যাও একেবারেই নিখুঁত নয় — তাহলে তিনি হলেন গভর্নর স্বয়ং। আর, মাঝে মাঝে, শুয়োরের গলায় ছুরি চালাবার সময় যদি কাউকে শুয়োরটা চেপে ধরার দরকার হয় তখন তিনি হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। ব্যস।

থিওডোর বললো, তা উনি যেভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে —

মা বললেন, তোমরা বসো তো। আমরা সবাই বসলাম, তিনি আমাদের হাতের পানীয়ের গ্লাস তুলে নিলেন, একটা আলো জ্বালালেন।

আমি চেয়ারে গা এলিয়ে দিতে দিতে বললাম, হ্যাঁ, তারপর বললাম, না।

দীর্ঘ ঘরটির মধ্য দিয়ে আমি আমার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম। সারা দুনিয়ায় এই ঘরটিই আমার সব চাইতে বেশি চেনা, মুখে যাই বলি না কেন সব সময় আমি এখানেই ফিরে এসেছি। ঘরে একটা নতুন আসবাব দেখলাম আমি। একটা উঁচু শেরাটন ব্রেক-ফ্রন্ট ডেস্ক। এখানে আগে একটা কিডনি ডেস্ক ছিলো। এখন নিশ্চয়ই চিলেকোঠায় তার জায়গা হয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাদুঘরটায়, আর আমরা বসে আছি এই প্রথম শ্রেণীর যাদুঘরে, আর লণ্ডনের বোম্যান এ্যান্ড হেথারফোর্ড লিমিটেডের হিসেবের খাতায় নিশ্চয়ই একটা মোটা টাকার অঙ্ক লেখা হয়ে গিয়েছে। এই ঘরে সব সময়, অবধারিতভাবে, একটা পরিবর্তন ঘটতো। যখনই আমি বাড়ি আসতাম তখনই চারিদিকে তাকাতাম, ভাবতাম এবার কি পরিবর্তন দেখবো আমি, কারণ এই ঘরের মধ্য দিয়ে বহু চমৎকার সৌখিন জিনিসের দীর্ঘ মিছিল পার হয়ে গেছে, ছোট্ট পিয়ানো, দেরাজ, টেবিল, চেয়ার, আগেরটার চাইতে পরেরটা অধিকতর সৌখিন, প্রতিটিই পালাক্রমে শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঢুকেছে চিলেকোঠায়, জায়গা করে দিয়েছে আরেকটা নতুন ত্রুটিহীন জিনিসের জন্য। এই ঘর আমার প্রথম স্মৃতির ঘর থেকে আজ অনেক দূর এসেছে, এগিয়ে যাচ্ছে কোনো

একটা আদর্শ নিখুঁত পূর্ণতার দিকে, যেটা আছে আমার মায়ের মাথায়, কিংবা নিউ ইয়র্ক, নয়তো নিউ অর্লিয়ন্স, নয় তো লণ্ডনের কোনো এক দোকানদারের মাথায়, আর এই ঘর হয়তো সেই আদর্শ নিখুঁত পূর্ণতা পাবে আমার মায়ের মৃত্যুর ঠিক আগে আগে, আর তিনি সেখানে বসে থাকবেন, এক পরিপাটি বৃদ্ধা মহিলা, উঁচু করে বাঁধা সাদা চুল, সুন্দর চোয়ালের হাড়ের উপরে রেশমের মতো ত্বক ঝুলে পড়েছে, নীল চোখ দুটি ক্রমাগত মিটমিট করছে, আর তিনি ওই আদর্শের পূর্ণতাকে অভিনন্দিত করার জন্য চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকবেন।

আসবাবপত্রের বদল হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষও বদল হয়। অনেক আগে এখানে ছিলো একজন শক্তসমর্থ বলিষ্ঠ মানুষ, খুব লম্বা নয়, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া অবিন্যস্ত কালো চুল, স্টীলের চশমা নাকের উপর, জামার বোতাম প্রায়ই ভুল লাগানো, সোনার চেনসহ বড়ো ঘড়ি, যেটা ধরে টানাটানি করতে আমি ভালোবাসতাম। তারপর তাকে আর দেখা গেলো না। আমার মা আমার মাথা বুকে চেপে ধরে বলেছিলেন, খোকা, তোর বাবা আর ফিরে আসবেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন? উনি কি মরে গেছেন? কবর দেয়া হবে কখন?

মা বলেছিলেন, না, মারা যান নি। চলে গিয়েছেন। তবে, খোকা, তুই মনে করতে পারিস যে তোর বাবা আর বেঁচে নেই।

উনি চলে গেলেন কেন?

কারণ তিনি মাকে ভালোবাসতেন না। সেজন্যই চলে গেছেন।

আমি তোমাকে ভালোবাসি, মা। আমি তোমাকে চিরকাল ভালোবাসবো।

হ্যাঁ, খোকা, তুই তোর মাকে চিরকাল ভালোবাসিস। তিনি আমাকে তাঁর বুকে আরো জোরে চেপে ধরেছিলেন।

তো পণ্ডিত এটর্নী প্রস্থান করলো। আমার বয়স তখন প্রায় ছয় বছরের মতো।

তারপর এলো ধনকুবের। শীর্ণ দেহ, হাড্ডিসর্বস্ব, টাক-মাথা, সিঁড়ি ভাঙবার সময় কষ্ট করে সশব্দে নিঃশ্বাস নিতো। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, ড্যাডি রস্ সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওরকম হাঁসফাঁস করে শব্দ করেন কেন?

আহ্, চুপ, খোকা, চুপ।

কেন করেন, মা?

ড্যাডি রসের শরীর ভালো নয়, তাই।

তারপর ধনকুবের মারা গেলো। তার অবস্থান ছিলো স্বল্পকালীন।

এর পর মা আমাকে কনেটিকাটের এক স্কুলে দিয়ে সাগর পাড়ি দিলেন।

ফিরবার সময় নিয়ে এলেন আরেকজন সাথী, দীর্ঘদেহী, ক্ষীণাঙ্গ, সাদা স্যুট পরেন সবসময়, লম্বা সরু চুরুট খান, ঠোঁটের উপর সরু কালো এক জোড়া গোঁফ। তিনি ছিলেন কাউন্ট, আর আমার মা হলেন কাউন্টেস। ঘরে লোকজনের মাঝে বসে কাউন্ট প্রচুর হাসতেন কিন্তু কথা বিশেষ বলতেন না। মানুষ ওর দিকে তাকাতো আড়চোখে কিন্তু সে তাদের দেখতো সরাসরি, আর তার নিখুঁত কালো গোঁফের নিচে দুনিয়ার শুভ্রতম দন্তপাটি দেখিয়ে সে হাসতো। কেউ না থাকলে সে সারা দিন বসে বসে পিয়ানো বাজাতো, তারপর এক সময় উঠে তার কালো বুট জুতো আর সাদা আঁটো পাৎলুন পরে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যেতো, লাফ দিয়ে তোরণ পার হতো, সমুদ্র তীর ধরে ছুটতো প্রচণ্ড বেগে, ঘোড়ার দুপাশে ফেনার মতো ঘাম জমে উঠতো, আর তার পাঁজর ওঠানামা করতো হাঁপরের মতো, যেন এক্ষুণি ফেটে যাবে। তারপর কাউন্ট বাড়িতে ফিরে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে পার্সিয়ান বেড়ালটা হাঁটুর উপর তুলে তার পিঠে সস্নেহ চাপড় দিতো, কাউন্টের হাত তেমন বড়ো ছিলো না, কিন্তু ওই হাতে জোর ছিলো সাংঘাতিক, ইচ্ছে করলে করমর্দনের সময় সে লোকের চোখে ভ্রূকুটি জাগিয়ে তুলতে পারতো। একবার আমি আমার মায়ের ডান বাহুতে, উপরের দিকে, চারটে নীলচে-কালো সমান্তরাল দাগ দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মা, দেখ, কি হয়েছে তোমার?

কিছু না, ব্যথা পেয়েছি। বলেই মা তাঁর হাতের উপর স্কার্ফ টেনে দিয়েছিলেন।

কাউন্টের নাম ছিলো কভেলি। লোকে ওকে বলতো কুত্তার বাচ্চা, কিন্তু সে যে দারুণ ঘোড়া চালায় সে কথাও স্বীকার করতো।

তারপর কাউন্টও বিদায় নিলো। আমার মন খারাপ হয়েছিলো, কারণ আমি ওকে পছন্দ করতাম। ও যখন ঘোড়া ছুটাতো আমার দেখতে খুব ভালো লাগতো।

এর পর বেশ কিছু কাল কেউ ছিলো না।

তারপর এলো তরুণ এক্সিকিউটিভ।

জন্মমুহূর্ত থেকেই সে তরুণ এক্সিকিউটিভ আর মৃত্যুদিন পর্যন্ত সে তাই থাকবে। তবে ঐ দিনের অনেক বাকী আছে কারণ এখন তার বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ, আর তেলের কোম্পানীতে তার দপ্তরে বসে সে এখন যে পরিশ্রম করছে তাতে তার শরীর দ্রুত ভেঙ্গে পড়ার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই।

তা, আমি ওদের সবার সঙ্গে এই ঘরে বসেছি, পণ্ডিত এটর্নী আর ধনকুবের আর কাউন্ট আর তরুণ এক্সিকিউটিভ, সবার সঙ্গে, ঘরের আসবাব সামগ্রীর পরিবর্তন লক্ষ করেছি। এখন আমি বসে বসে থিওডোরকে লক্ষ করলাম, নতুন শেরাটন ব্রেক-ফ্রন্ট ডেস্কটা দেখলাম, আর মনে মনে ভাবলাম কতটা স্থায়ী হবে

এরা ?

আমি ঘরে ফিরে এসেছিলাম। আমিই সেই বস্তু যা সর্বদা ফিরে আসে।

রাতভর সেদিন বৃষ্টি হয়েছিলো। আমি একটা বিশাল, চমৎকার, প্রাচীন পারিবারিক খাটে শুয়েছিলাম, অন্য কোনো এক পরিবার থেকে যেটা এখানে এসেছে (বহুকাল আগে আমার ঘরে মাদুর-পাতা মেঝের উপর একটা ছোট সাদা লোহার খাট ছিলো, আর ছিলো বিশাল, চমৎকার, মেহগনি কাঠের বার্ডেন পরিবারের প্রাচীন পারিবারিক খাট, যা আশানুরূপ চমৎকার বিবেচিত না হওয়ায় এক সময় আমার মায়ের ঘর থেকে চিলেকোঠায় স্থানান্তরিত হয়), আর আমি শুয়ে শুয়ে শুনেছিলাম প্রাণময় ওক্ গাছ আর ম্যাগনোলিয়ার পাতার উপর বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ। সকালে বৃষ্টি ধরে যায়, সূর্য ওঠে। আমি বাইরে বেরিয়ে কালো মাটির উপর জায়গায় জায়গায় জল জমে থাকতে দেখলাম, কাঁচের পাতের মতো স্বচ্ছ, চকচকে। বৃষ্টিতে ক্যামেলিয়ার গুচ্ছ থেকে ঝরে পড়ে সাদা, লাল, প্রবাল রঙের ফুলের পাপড়ি ওই কালো চকচকে উজ্জ্বল জলের উপর ভাসছিলো। কয়েকটা পাপড়ির চারপাশ উপর দিকে কুঁকড়ে গিয়েছিলো, সেগুলি উঁচু হয়ে ভাসছিলো নৌকোর মতো আর তার চারপাশে অন্য পাপড়িগুলি ভাসছিলো উল্টে গিয়ে. কয়েকটার উপর জল উঠে গিয়েছিলো, ডুবু ডুবু অবস্থা তাদের, যেন কোনো সুদূর সুখী দেশে একটা কার্নিভাল, গন্ডোলা আর নৌবহরের উপর কোনো যুদ্ধজাহাজ গোটা দুই কামান ছুঁড়ে এক আনন্দউচ্ছল ধ্বংস চালিয়েছে।

সিঁড়ির পাশেই ছিলো একটা বিশাল ক্যামেলিয়া গাছ। আমি ঝুঁকে আমার হাতের মুঠোয় কয়েকটা পাপড়ি তুলে নিলাম। কী ঠাণ্ডা জল। পাপড়িগুলি হাতে নিয়ে, ঘোরানো রাস্তা ধরে, আমি তোরণের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছে হাতের মুঠোয় পাপড়িগুলো চেপে ধরে উপসাগরের দিকে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইলাম। খড়কুটো পড়ে থাকা, সাদাটে, বালুকা অঞ্চলের ওপারে আমার চোখে পড়লো অসম্ভব উজ্জ্বল চকচকে জলরাশি।

কিন্তু দুপুরের আগেই আবার বৃষ্টি নামলো। স্পঞ্জের মতো আকাশ থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি ঝরলো টানা দুদিন। বিরতিহীন। সেদিন বিকালে, পরদিন সকালে, তার পরদিন বিকালে তরুণ এক্সিকিউটিভের বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে আমি বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে বেড়িয়েছিলাম। ফুসফুসের মধ্যে ওজোন বায়ু ভর্তি করার জন্য যারা না হেঁটে পারেন না, আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম না, কিন্তু ওই অবস্থায় আমার মনে হয়েছিলো যে হাঁটাটাই যথার্থ করণীয় কাজ। প্রথম দিন বিকালে আমি সমুদ্রতীর পর্যন্ত হেঁটে যাই, এগিয়ে যাই স্ট্যান্টনদের বাড়ি ছাড়িয়ে, ঝরা পাতার ওপারে

বাড়িটিকে মনে হলো শীতল আর ফাঁপা দেখতে, আরো এগিয়ে গিয়ে আমি উপস্থিত হই আরউইনদের বাড়িতে, সেখানে বিচারপতি আরউইন আমাকে চেয়ারে বসিয়ে আমার পায়ের কাছে চুল্লীর আগুন উসকে দিয়েছিলেন, তাঁর অতিউত্তম, সযত্নরক্ষিত, মেরীল্যান্ড সুরার বোতল খুলে আমার হাতে এক গ্লাস পানীয় তুলে দিয়ে পরের দিন রাতে আমাকে ওঁর সাথে নৈশাহারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি একটা ড্রিঙ্কের পরই উঠে পড়েছিলাম। তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে পৌঁছাই সেখানে আর কোনো বাড়িঘর নেই, শুধু কিছু ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম, একখানে একটা পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে আর খোলা প্রান্তরের বুকে মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা ঝুপড়ি।

পরদিন আমি উপসাগরের এ দিকটা ছাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে শহরের রাস্তাগুলির মধ্য দিয়ে উপসাগরের ওই দিকের অর্ধচন্দ্রাকৃতি জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছাই। এখানে পাইনকুঞ্জ একেবারে সাদা বালুর প্রান্তসীমা পর্যন্ত চলে এসেছে। আমি পাইন গাছগুলির ছায়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে তার তীক্ষ্ণ ছুঁচলো ঝরাপাতা পায়ে মাড়িয়ে সাদা বালুর বুকে এসে দাঁড়ালাম। একটা আধপোড়া কাঠের গুঁড়িমতো আমার চোখে পড়লো, ভিজে খুবই চকচকে কালো দেখাচ্ছে। তার গায়ে ভেজা ছাই আর ভেসে আসা কালো খড়কুটো লেগে আছে, সাদা বালুর জন্য আরো বেশি কালো দেখাচ্ছে। বোঝা গেলো লোকজন এখনো এখানে পিকনিক করতে আসে। হ্যাঁ, আমিও এখানে এসেছিলাম পিকনিকে। পিকনিক কি বস্তু তা আমি জানতাম।

অনেক কাল আগে, আমাদের ছেলেবেলায়, এ্যান আর এ্যাডাম আর আমি এখানে একবার এসেছিলাম, কিন্তু সেদিন বৃষ্টি ছিলো না। একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত ছিলো না। খুব গরম ছিলো সেদিন, আর সব কেমন নিশ্চল, নিস্তব্ধ। উপসাগরের উপর দিয়ে চোখ মেলে দিলে দেখা যেতো জলরাশি যেন উপর দিকে উঠে আলোর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, দিগন্তরেখা বলে যেন কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই। আমরা সাঁতার কাটলাম, বালির উপর শুয়ে খাওয়া-দাওয়া করলাম, মাছ ধরার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভাগ্য আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হলো না। ততক্ষণে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিলো, পাইন গাছগুলির ওপারে পশ্চিমের একটু অংশ ছাড়া সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে গিয়েছিলো, শুধু পশ্চিমের ওই অংশটুকু দিয়ে আলো ঝরে পড়ছিলো। জলরাশি সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ। আকাশের কালিমা যেন তাকে আরো কালো করে তুলেছে। হঠাৎ করেই। আর সাদা বেলাভূমির ওপাশের উপসাগরের অপর তীরের গাছের সারিও আর এখন সবুজ নয়, কালো দেখাচ্ছিলো। ওই দিকে, মাইল খানেক দূরে, নিস্তরঙ্গ জলরাশির উপর একটা প্রশান্ত তরণী দেখা গেলো, কালো

জলের উপর, আকাশের নিচে, কালো তরুশ্রেণীর প্রেক্ষাপটে ওই তরণীর তীক্ষ্ণ পালের শুভ্রত্ব হঠাৎ বুকের ভেতরে একটা মোচড় দিলো।

এ্যাডাম বললো, চলো, এবার ফেরা যাক। ঝড় উঠবে।

এ্যান বললো, দেরি আছে। এসো, আরেক বার সাঁতার কাটি।

এ্যাডাম ইতস্তত করলো, আকাশটা খুঁটিয়ে দেখলো, বললো, আর জলে না নামাই ভালো।

এ্যান ছাড়লো না। চলো না, বলে সে তার বাহু ধরে আকর্ষণ করলো, কিন্তু এ্যাডাম সাড়া দিলো না। তখনো তার চোখ আকাশের দিকে। তারপর হঠাৎ এ্যান ওর হাত ছেড়ে হেসে উঠে জলের দিকে দৌড়ুতে শুরু করলো। প্রথমে সরাসরি জলের দিকে না গিয়ে সে সৈকতের উপর দিয়ে কিছুক্ষণ ছুটলো। তার ছোট করে ছাঁটা চুল হাওয়ায় দুলে উঠলো। আমি ওকে ছুটে যেতে দেখলাম। বাহু দুটি পুরো ছড়িয়ে দেয় নি, কনুইর কাছে ঈষৎ বাঁকা করে রেখেছে, ওর পায়ের গতিভঙ্গি সাবলীল, সচ্ছন্দ, আবার একটু আড়ষ্টও, যেন তার শৈশবের দৌড়ুবার ভঙ্গি সে এখনো সম্পূর্ণ ভুলে যায় নি, আবার রমণীর দৌড়ুবার ভঙ্গিও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি আয়ত্ত করে নি। তার পা'দুটি সরু কটিদেশের নিচ থেকে একটু বেশি শিথিল হয়ে ঝুলে আছে, খানিকটা অনিশ্চিতভাবে, এখনো যেন পুরোপুরি গোলত্ব লাভ করেনি। ওকে দেখতে দেখতে আমার মনে হলো ওর পা বেশ লম্বা। এটা আগে লক্ষ করি নি।

কোনো শব্দের জন্য নয়, বরং এক ধরনের নৈঃশব্দের জন্যই আমি হঠাৎ এ্যাডামের দিকে ঘুরে তাকালাম। দেখলাম, সে এক দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ করছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে লাল হয়ে উঠলো, তারপর চকিতে আমার উপর থেকে সে তার চোখ সরিয়ে নিলো, যেন ভারী বিব্রত হয়েছে। তারপর কেমন ধরা গলায় বললো, চলো, কে আগে যেতে পারে দেখি, বলেই এ্যানের পেছন পেছন ছুটতে শুরু করলো। তার পায়ের আঘাতে উচ্ছ্রিত বালু আমার গায়ে এসে লাগলো।

ততক্ষণে এ্যান জলে নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করেছে। এ্যাডামও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জোরে জোরে সোজা তার পেছন পেছন এগিয়ে গেলো। আমি খানিকটা পেছনে পড়ে গেলাম। এ্যাডাম এ্যানকে ছাড়িয়ে চলে গেলো, যেতেই থাকলো। ও খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারতো। সে সাঁতার কাটতে চায় নি, কিন্তু এখন সে সাঁতার কাটবে, জোরে জোরে, সোজা সামনের দিকে, অনেক দূর।

আমি এ্যানের কাছে পৌঁছে আমার গতি কমালাম। বললাম, হ্যালো। সে এক মুহূর্তের জন্য তার মাথা উঁচু করে ধরলো, সিন্ধুঘোটকের অদ্ভুত আকর্ষণীয় ভঙ্গির কথা মনে পড়লো আমার, তারপর সে হেসে উঠে সোজা ডুব দিয়ে জল কেটে

সামনে এগিয়ে গেলো। চকিতের জন্য জলের উপর তার ছোট সরু গোড়ালি দুটি দেখা গেলো, পাশাপাশি, তারপরই সে তা জলের তলায় টেনে নিলো। আমি আবার তার পাশাপাশি পৌঁছুলাম। আবার সে ওই একই কীর্তি করলো। প্রতিবারই, তাকে ধরে ফেলতেই, সে মাথা উঁচু করে হেসে উঠতো, তারপরই আবার ডুব দিতো। পঞ্চম বার যখন আমি তাকে ধরে ফেললাম তখন সে আর ডুব দিলো না। শরীরে একটা চমৎকার হাল্কা মোচড় দিয়ে, নিজেকে উল্টে নিয়ে, সে চিৎ হয়ে জলের উপর ভাসতে লাগলো। হাত দুটি দু'পাশে ছড়ানো, চোখের দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। অতএব আমিও তাই করলাম। ওর কাছ থেকে পাঁচ ছ'ফুট দূরত্বে আমিও আকাশ দেখতে দেখতে ভাসতে লাগলাম।

আকাশ এখন আগের চাইতেও কালো। তার মধ্যে লাল আর সবুজের ছোপ। আঙ্গুরের রঙ পাল্টাবার বিশেষ এক পর্যায়ের মতো। তবু আকাশটাকে মনে হচ্ছিলো অনেক অনেক উঁচুতে। আমাদের ঠিক উপর দিয়ে একটা গাংচিল উড়ে গেলো, বহু উঁচু দিয়ে। আকাশের গায়ে তাকে দেখালো ওই সাদা পালের চাইতেও বেশি সাদা। যত দূর চোখ গেলো আমি গোটা আকাশ জুড়ে ওই গাংচিলটাকে উড়ে যেতে দেখলাম। আমি ভাবলাম, এ্যানও কি দেখেছে গাংচিলটা? আমি এ্যানের দিকে তাকালাম। ও চোখ বন্ধ করে আছে, তার হাত দুটি দু'পাশে ছড়ানো, জলের উপর মাথা ঘিরে তার কেশরাশি ভাসছে। মাথা পেছন দিকে ঠেলে দেয়া, চিবুক উঁচু করে তুলে ধরা, মুখ ভারী মসৃণ, যেন ঘুমিয়ে আছে। আমি জলের বুকে ভাসতে ভাসতে, দূরের কালো গাছগুলির প্রেক্ষাপটে, তার মুখের তীক্ষ্ণ প্রোফাইল দেখতে পেলাম।

আর তারপর, হঠাৎ, সে আমার দিক থেকে ঘুরে তীরের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করলো, যেন আমি ওখানে নেই-ই। সে ধীর গতিতে সাঁতার দিচ্ছিলো, একটু যেন বাধাগ্রস্ত, আবার আয়াসহীনও। স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা আয়াসহীন গতির অনুভূতি হয়, ঠিক সেই ভাবে তার সরু বাহু দুটি ধীর, প্রশান্ত, নিখুঁত সময় মেপে ওঠা-নামা করছিলো।

আমরা তীরে পৌঁছুবার আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিলো। বৃষ্টির বড়ো বড়ো, ভারী, মাপা, স্বতন্ত্র ফোঁটা জলের তখনো-উজ্জ্বল চকচকে শরীরে কাঁটার মতো বিঁধছিলো। তারপর প্রবল বেগে বৃষ্টির ঝাপটা শুরু হলো, উধাও হয়ে গেলো জলের বুকের নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি।

আমরা জল থেকে উঠে বালুর উপর দাঁড়ালাম। বৃষ্টি তখন আমাদের গায়ের উপর আছড়ে পড়ছে চাবুকের মতো। এ্যাডামকে সাঁতরে তীরের দিকে আসতে দেখলাম আমরা। এখনো অনেকটা দূরে। তার পেছনে, উপসাগরের ওই দিকটায়,

দক্ষিণে, কালো আকাশ দ্বিখণ্ডিত করে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো, সঙ্গে বাজের ক্রমাগত গুম গুম শব্দ। মাঝে মাঝে, মুহূর্তের জন্য, ঘন বৃষ্টির আড়ালে এ্যাডাম আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যাচ্ছিলো। এ্যান তার মাথা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে, প্রায় বিষণ্ন মুখে, এ্যাডামকে লক্ষ করছিলো। কাঁধ ঈষৎ কুঁজো, হাত দুটি নিজেকেই আলিঙ্গন করার ভঙ্গিতে অপুষ্ট স্তনের উপর আড়াআড়ি করে রাখা, দেখে মনে হচ্ছে এখুনি কাঁপতে শুরু করবে সে, হাঁটু দুটি একটু বাঁকিয়ে পরস্পরের সঙ্গে শক্ত করে লাগানো।

এ্যাডাম উঠে এলো, আমরা আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম, পায়ে দিলাম ভিজে চুপচুপ স্যান্ডেল, তারপর এগিয়ে গেলাম পাইনকুঞ্জের ভেতর দিয়ে। উপরের কালো ঘন মেঘপুঞ্জগুলি ফুলে ফুলে উঠছিলো, আর গাছের শাখাপ্রশাখাগুলির মধ্য থেকে মাঝে মাঝে একটা বিশ্রী কর্কশ ধ্বনি এসে বাজছিলো আমাদের কানে। তারপর গাড়ির কাছে পৌঁছুলাম আমরা, ফিরে এলাম বাড়িতে। ওই গ্রীষ্মে আমার বয়স ছিলো এগারো। এ্যাডামের বয়স ছিলো আমারই মতো, আর এ্যান ছিলো বছর চারেকের ছোট। এটা বিশ্বযুদ্ধের আগের কথা, বরং বলা উচিত, আমরা বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগের কথা।

ওই একটা পিকনিক যার কথা আমি কখনো ভুলি নি।

বোধহয় সেদিনই এ্যান আর এ্যাডামকে আমি স্বতন্ত্র ও পৃথক ব্যক্তিরূপে প্রথম দেখি, যাদের আচার-আচরণের ধরন বৈশিষ্ট্যময়, রহস্যে ঘেরা, আর গুরুত্বপূর্ণ। এবং হয়তো, আমিও সেদিনই প্রথম আমার নিজেকে একজন ব্যক্তিরূপে দেখতে পাই। কিন্তু আমি সে কথা বলছি না। যা ঘটেছিলো তা এই ঃ আমি আমার মাথার মধ্যে এমন একটা ছবি তুলে নিয়েছিলাম যা আর কোনো দিন সেখান থেকে অপসৃত হয় নি। আমরা জীবনে অনেক জিনিস দেখি, অনেক জিনিস মনে রাখি, কিন্তু সেটা আলাদা ব্যাপার। আমি যে-ধরনের ছবির কথা বলছি তা আমরা আমাদের মাথার মধ্যে খুব কম দেখতে পাই, সে-ধরনের ছবি কালের পথপরিক্রমায় ক্রমাগত উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে, তাদের বাস্তবতাকে ঝাপসা করার পরিবর্তে একটার পর একটা পর্দা তুলে ফেলে। তার মধ্যে প্রথমে যে অর্থ অস্পষ্টভাবে শুধু অনুমান করা গিয়েছিলো তাকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর করে তোলে। সম্ভবতঃ সর্বশেষ পর্দাটি কখনো অপসৃত হবে না। কারণ অত সময়ই পাওয়া যায় না, কিন্তু ছবির উজ্জ্বলতা ক্রমাগত বেড়ে চলবে, আর আমাদের এই প্রত্যয়ও বাড়তে থাকবে যে ওই ঔজ্জ্বল্যের একটা অর্থ আছে, তার একটা নিগূঢ় তাৎপর্য আছে, আর ওই ছবি ছাড়া আমাদের জীবন শুধু উত্তর-না-দেয়া চিঠিপত্রের সঙ্গে দেরাজের ড্রয়ারে ছুঁড়ে ফেলে রাখা স্পুলে

জড়ানো একটা পুরানো ফিল্মের মতো, আর কিছু না।

সেদিন আমার মাথার মধ্যে আমি যে ছবিটা তুলে নিয়েছিলাম তা হলো জলের বুকে এ্যানের মুখ, অত্যন্ত মসৃণ, চোখ দুটি বন্ধ, উপরে সবুজ-লালচে গাঢ় আকাশ, আর তার মধ্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা গাংচিল।

তার মানে আমি এটা বলছি না যে আমি সেই দিনই এ্যানের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। এ্যান তখন একটা বাচ্চা মেয়ে। সে ব্যাপারটা ঘটে আরো পরে। কিন্তু আমি যদি কখনো ওর সাথে প্রেমে নাও পড়তাম, কিংবা ওর সঙ্গে যদি আমার কখনো দেখা নাও হতো, কিংবা আমি যদি কখনো ওকে ঘৃণাও করতে শুরু করতাম তবুও ওই ছবিটা সেখানে থেকে যেতো। পরে একটা সময় এসেছিলো যখন এ্যানের প্রতি আর আমার ভালোবাসা অব্যাহত ছিলো না। এ্যান আমাকে বলে দিয়েছিলো যে সে আমাকে বিয়ে করবে না। তার কিছু কাল পরে আমি লয়-কে বিয়ে করি। লয় ছিলো এ্যানের চাইতে সুন্দরী, সেই ধরনের মেয়ে যাকে দেখার জন্য মানুষ রাস্তায় ঘুরে দাঁড়ায়। আর আমি প্রেমে পড়ে যাই লয়ের। কিন্তু ছবিটা সারাক্ষণই ছিলো ওখানে, এক একটা পর্দা খসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিলো, আর তার মধ্যে প্রতিশ্রুতি ছিলো যে ভবিষ্যতে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তো অনেক কাল পরে সেদিন বৃষ্টিঝরা প্রথম বসন্তের অপরাহ্ন বেলায় আমি যখন পাইন বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে সাদা বালুর উপর পড়ে থাকা আগুনে পোড়া কালো কাঠের গুঁড়িটা দেখলাম, কেউ পিকনিক করে গেছে সেখানে, তখন বাড়ি ছেড়ে কলেজে যাবার আগে ১৯১৫ সালের গ্রীষ্মকালে। এখানে আমাদের শেষ পিকনিকটার কথা আমার মনে পড়লো।

আমি অবশ্য সাংঘাতিক দূরের কোনো কলেজে যাই নি। আমি ভর্তি হই এখানকারই স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমার মা আমাকে বলেছিলেন, কেন তুমি অবুঝ হচ্ছো? কেন হার্ভার্ড বা প্রিন্সটনে যাচ্ছো না?

আরকানস'-র অনুন্নত অঞ্চল থেকে উঠে আসা কোনো মহিলার পক্ষে আমার মা ওই সময়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে আমাদের উন্নততর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করে ফেলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, না হয় উইলিয়ামস-এ যাও। শুনেছি ওটা বেশ পরিশীলিত, মার্জিত জায়গা ।

শোনো, মা, আমি তোমার পছন্দমতো স্কুলে গেছি। ওটা যে পরিশীলিত ও মার্জিত জায়গা ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মা আমার দিকে উজ্জ্বল মুখে তাকিয়ে ছিলেন। আমার একটা কথাও তার কানে যায় নি। তিনি বললেন, নইলে ভার্জিনিয়াতেও যেতে পারো। তোমার বাবা ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন।

তাহলে তো সেটা তোমার কাছে বিরাট কোনো সুপারিশ হবার কথা নয়। কথাটা বলেই আমার মনে হলো আমি বেশ ওস্তাদ হয়ে গেছি। ইদানীং মায়ের সঙ্গে যে কোনো বিতর্কে বাবার গৃহত্যাগের বিষয়টি নিয়ে আসা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু আমার কথা ওঁর কানেই যায় নি। তিনি নিজের কথার সূত্র ধরে বলে যান, তুমি যদি পূর্বাঞ্চলের কোথাও যাও তাহলে গরমের সময় এখানে আমাকে দেখতে আসা তোমার পক্ষে সহজ হবে।

এখন ওদিকে যুদ্ধ চলছে, মা।

সেটা শিগ্‌গীরই থেমে যাবে। তখন তোমার পক্ষে সহজ হবে।

হ্যাঁ, আমাদের স্টেট ইউনিভার্সিটির মতো অখ্যাত কোনো জায়গায় না গিয়ে আমি যে হার্ভার্ডে ভর্তি হয়েছি এটা লোকজনকে বলা তোমার পক্ষে অবশ্যই সহজ হবে। স্টেট ইউনিভার্সিটি তো দূরের কথা, সেটা যে কোন্ স্টেটে তার নামই হয়তো ওরা জানবে না।

শোনো, আমি শুধু চাই যে তুমি একটা ভালো জায়গায় যাও, যেখানে তুমি ভালো বন্ধুবান্ধব পাবে। আর, যেমন বলেছি, তাহলে গরমের ছুটিতে আমাকে দেখতে আসা তোমার পক্ষে সহজ হবে। এই তো।

(মা কিছু দিন ধরে আবার ইউরোপে যাবার কথা ভাবছিলেন, আর যুদ্ধের ব্যাপারটায় ভারী বিরক্ত বোধ করছিলেন। কাউন্ট অনেক দিন হলো চলে গেছে। যুদ্ধ শুরু হবার আগে আগেই সে বিদায় নেয়। এবং মা আবার ঠিকই সমুদ্র পাড়ি দিলেন, কিন্তু এবার আর কোনো কাউন্ট নিয়ে ফিরে এলেন না। হয়তো হিসেব করে দেখেন যে ওদের বিয়ে করাটা বড় বেশি ব্যয়সাপেক্ষ। তরুণ একিসকিউটিভের আগে আর তিনি বিয়ে করেন নি।)

তো, আমি ওঁকে বলে দিই যে আমি ভালো জায়গায় যেতে চাই না, ভালো বন্ধুবান্ধব চাই না, ইউরোপে যেতে রাজী নই, এবং ওঁর কাছ থেকে আর কোনো টাকা পয়সাও আমি নেবো না। টাকা পয়সা সম্পর্কে ওই শেষ অংশটুকু রাগের মাথায় মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। আমার মনে হয়েছিলো যে এরকম একটা কথা বলা খুব পুরুষালী ব্যাপার হবে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া যে এতো বড়ো হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি, আর তাই আমার ওই উক্তি প্রত্যাহার করে গোটা নাটকটা

আমি কিছুতেই নষ্ট করে দিতে পারলাম না। মা ওই কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর বিস্ময়ের কোনো সীমা-পরিসীমা রইলো না। আমার মনে হয় তিনি জীবনে কোনো পাৎলুনধারীর মুখ থেকে এরকম কথা শোনেন নি। তিনি আমাকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু আমার মেজাজ তখন তুঙ্গে, আমি কিছুতেই হেলবো না। এর পরের চার বছর আমি অন্ততঃ হাজার বার মনে মনে বলেছি, ওঃ, কি বোকামিই যে করেছি! রান্নাঘরে বয়-বেয়ারার কাজ করেছি, টাইপিস্টের কাজ করেছি, শেষ বছরে খণ্ড-কালীন সাংবাদিকের কাজও করেছি, আর মাঝে মাঝেই ভেবেছি যে কবে কোনো এক জায়গায় পড়েছিলাম যে নিজে খেটে নিজের টাকায় কলেজে পড়ার মধ্যে একটা পৌরুষ আছে, শুধু সেই জন্য আমি প্রায় পাঁচ হাজার ডলার হাতছাড়া হয়ে যেতে দিলাম? মা যে আমাকে একেবারেই কোনো টাকা পাঠান নি তা নয়। পাঠিয়েছেন। বড়োদিনের সময় পাঠিয়েছেন, আমার জন্মদিনে পাঠিয়েছেন আর আমি ওই টাকা দিয়ে ক'দিন বেদম ফূর্তি করেছি, তারপর সব টাকা ফুঁকে দিয়ে আবার আমি আমরা বাসন ধোয়া বা ওই জাতীয় কাজে ফিরে গেছি। সেনাবাহিনীতে আমি যোগ দিতে পারি নি। পায়ে খুঁত ছিলো বলে।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাঁর মধ্যে সে সম্পর্কে দেখা যায় প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা। তিনি ছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর কর্নেল। সারাটা সময় তাঁর চমৎকার কেটেছিলো। আগের দিকে যোগ দেয়াতে জার্মানদের লক্ষ করে কয়েক দফা লোহার গোল্লা ছোঁড়ার সুযোগ তিনি পান, তাদের পাল্টা জবাব থেকে তাঁকে আত্মরক্ষাও করতে হয় কয়েকবার। স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময় তিনি সুবিধা করতে পারেন নি। তখন তাঁকে ফ্লোরিডাতেই আটকা পড়ে থাকতে হয়। কিন্তু এবার তাঁর সুখের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে তিনি যে পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সীজারের অভিযানগুলির ম্যাপ এঁকেছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারায়, পাথর ও তীর প্রভৃতি ছোঁড়ার জন্য তিনি যে পুরানো দিনের যুদ্ধযন্ত্রাদির মডেল বানিয়েছেন, বারবার ঘা দিয়ে প্রাচীর ধূলিসাৎ করার জন্য তিনি যে মুষল জাতীয় জিনিস তৈরি করেছেন এসব বৃথা যায় নি। তো আমার ক্ষেত্রে এসব অবশ্যই বৃথা যায় নি, কারণ আমার ছেলেবেলায় ওই সব কর্মকাণ্ডে আমিই ছিলাম তাঁর সাহায্যকারী। আর ওঁর ওই সব ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রাদি ছিলো সত্যিই ভারী মজার এবং বিস্ময়কর। অন্ততঃ একটি ছোট ছেলের কাছে। তাছাড়া যুদ্ধও বৃথা যায় নি, কারণ সীজার যেখানে ভার্সিনজেটরিক্সকে পরাজিত করেছিলেন সেই এ্যালিস — সঁত-রেইন-ও তিনি

দেখতে গিয়েছিলেন। তারপর গ্রীষ্মের শেষে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মাথার মধ্যে ফশ্‌ আর সীজার আর পারশিং আর ভার্সিনজেটরিক্স আর ক্রিটাগনেতাস আর ভেরসাসিভেলোনাস আর লুডেনডর্ফ আর এডিথ কাভেল সব তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। ফিরে আসার পর, আমরা যেসব ছোট ছোট পুরানো দিনের যুদ্ধযন্ত্রাদি বানিয়ে ছিলাম তিনি সেগুলি বার করে তার ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে রাখেন। কিন্তু সবাই বলত যে তিনি যথার্থই একজন ভালো অফিসার ও সাহসী মানুষ ছিলেন। তার প্রমাণস্বরূপ একটি পদকও তিনি লাভ করেছিলেন।

আমি অনেক দিন বিচারপতির ওই বীর পরিচয় সম্পর্কে একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করেছিলাম। তখন বীরদের সম্পর্কে ওই রকম মনোভাব পোষণ করা ছিলো ফ্যাশান, আর আমি ওই ফ্যাশানের আবহাওয়াতেই বেড়ে উঠে ছিলাম। কিংবা ওই যে আমি খারাপ পায়ের জন্য যুদ্ধে যেতে পারি নি, এমন কি কলেজ জীবনে এস. এ. টি. সি.-তে পর্যন্ত যোগ দিতে পারি নি হয়তো সেজন্য এসব ব্যাপারে আমার মধ্যে একটা আঙ্গুর-ফল-টক জাতীয় মনোভাব গড়ে উঠেছিলো। আমি যদি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারতাম তাহলে হয়তো সব কিছু অন্য রকম হতো। বিচারপতি পদক পেয়েছিলেন, না পেলেও তিনি যে সত্যিই একজন সাহসী মানুষ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পদক পাবার আগেই তিনি তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। এর প্রমাণ তিনি পরেও দেন। যেমন, একবার তিনি একটা লোককে জেলে পাঠিয়েছিলেন, পরে লোকটা একদিন তাঁকে রাস্তার মাঝখানে থামিয়ে বলে যে সে তাঁকে এখুনি খুন করে ফেলবে। বিচারপতি হেসে ওঠেন, তারপর ঘুরে নিজের পথে চলতে শুরু করেন। লোকটা তখন পিস্তল বার করে বিচারপতির উদ্দেশে দু'তিন বার চিৎকার করে ডাক দেয়। অবশেষে বিচারপতি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে লোকটার হাতে পিস্তল আর সে-পিস্তল তাঁর দিকে তাক করা, তখন বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে, একটিও কথা না বলে, সোজা লোকটার দিকে হেঁটে আসেন, তারপর তার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নেন। যুদ্ধের সময় তিনি কি করেছিলেন তা অবশ্য আমি কখনো জানতে পারি নি।

সেদিন রাতে, আজ থেকে প্রায় বছর পনেরো আগে, মা, তরুণ এক্সিকিউটিভ আর আমি বিচারপতির বাড়িতে খেতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি আবার তাঁর ওই জঞ্জালগুলো বার করে এনেছিলেন। সেদিন প্যাটন দম্পতি আর তাদের কন্যা দুমঁদ-ও এসেছিলো। ওরা কাছেই থাকতো। আমার খাতিরেই ওদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিলো। উনি যে পাথর ছোঁড়ার প্রাচীন যুদ্ধ-যন্ত্রটা খুঁজে পেতে বার করে এনেছিলেন তাও, মনে হয়, আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য। নইলে উনি সাধারণতঃ

অতিথিদের জ্ঞান দানের জন্য বারুদ আবিষ্কারের আগের যুগের যুদ্ধ যন্ত্রাদিই দেখাতেন। খাওয়ার পুরো সময়টা ধরে শুধু পুরানো দিনের গল্প হলো। সেটাও আমার জন্য। কেউ অনেক দিন পর নিজের আদি জায়গায় ফিরে এলে মানুষ অবধারিতভাবে পুরানো দিনের গল্পে মশগুল হয়ে পড়ে। আজ আইসক্রীমের ঠিক আগে আগে আমাদের পুরানো দিনের গল্পটা ছেলেবেলায় ওঁর সঙ্গে মডেল বানাবার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। তখন তিনি উঠে লাইব্রেরিতে গেলেন এবং ফিরে এলেন প্রাচীন যুগের পাথর ছোঁড়ার যুদ্ধযন্ত্রের একটা মডেল হাতে নিয়ে, ইঞ্চি বিশেক লম্বা, তারপর নিজের মিষ্টান্নের পাত্র একপাশে ঠেলে দিয়ে যন্ত্রটা টেবিলের উপর বসালেন। তারপর একটা বাঁকানো ছোট্ট জিনিস দিয়ে গাড়ির পেছন দিকটা সামান্য গুটিয়ে তিনি ঘোড়াটা টানলেন, যেন নিজের আঙ্গুল দিয়ে ও-কাজটা করতে পারতেন না। এতসব করার পর দেখা গেলো যে ছুঁড়বার জন্য কোনো গুলী নেই। তখন তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে নিগ্রো পরিচারককে ডেকে একটা রুটি আনালেন। রুটিটা ভেঙে তিনি তার ভেতর থেকে একটু নরম অংশ বার করে সেটাকে গোল্লা পাকিয়ে গুলী বানাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু খুব ভালো হলো না। তখন তিনি সেটা একটু জলে ভিজিয়ে নিলেন যেন ঠিকমতো আটকে থাকে। গুলীটা গাড়িতে বসিয়ে তিনি বললেন, এইবার দেখ, এটা কাজ করে এইভাবে, বলেই তিনি ঘোড়াটা টিপলেন।

তো, কাজ ভালোই করেছিলো। জলে ভেজানোর ফলে গুলীটা বেশ ভারী হয়েছিলো, আর এতোদিন কেটে গেলেও যন্ত্রটার দাপট মোটেই কমে নি, কারণ মুহূর্তের মধ্যে আমরা ঝাড়বাতির ভেতরে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম, মিসেস প্যাটন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, তাঁর মুখ থেকে পেপারমিন্ট দেয়া আইসক্রীম ছিটকে বেরিয়ে তাঁর কালো ভেলভেটের পোশাকের উপর ছড়িয়ে গেলো, আর টুকরো টুকরো কাঁচ টেবিলক্লথ আর ক্যামেলিয়ার উপর ঝরে পড়লো। বিচারপতির গুলী একটা ইলেকট্রিক বাল্বের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে লেগেছিলো। ঝাড়বাতির মধ্য থেকে একটা স্ফটিকের গোলকও তিনি নিপুণভাবে খসিয়ে এনেছিলেন।

বিচারপতি মিসেস প্যাটনের কাছে অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, বলেছিলেন যে তিনি একজন নির্বোধ বৃদ্ধ, দ্বিতীয় শৈশবে ছেলেখেলায় মেতে আছেন, তারপর নিজের চেয়ারে সোজা টান টান হয়ে বসেছিলেন, যেন সবাই দেখতে পায় তাঁর বুক আর কাঁধ এখনো কি রকম সতেজ ও বলিষ্ঠ। মিসেস প্যাটন অভদ্র যুদ্ধযন্ত্রটির দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে তাকাতে আইসক্রীমটা শেষ করলেন। তারপর আমরা সবাই বিচারপতির লাইব্রেরি ঘরে গেলাম। এবার পরিবেশিত হবে কফি আর ব্র্যাণ্ডি।

কিন্তু আমি অল্প কিছুক্ষণের জন্য খাবার ঘরে থেকে গিয়েছিলাম। আমি একটু আগে বলেছি যে পাথর–ছোঁড়া যুদ্ধযন্ত্রটার দাপট কালের যাত্রার ফলে কমেনি, কিন্তু কথাটা আমি ঠিক বলি নি। তার সুযোগই পাওয়া যায় নি। আমি যন্ত্রটা ভালো করে দেখবার জন্য এগিয়ে যাই। বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্যের জন্য নয়, বরং ভাবালুতার প্রেরণায়। কিন্তু গিয়ে দেখলাম যে খুব যত্ন নিয়ে মডেলটা মেরামত করা হয়েছে, পুরানো তারের জায়গায় নতুন তার বসানো হয়েছে।

তারপরই, হঠাৎ, আমার চোখের সামনে বিচারপতি আরউইনের একটা ছবি ভেসে উঠলো। তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে চামড়ার সুতো, ইস্পাতের তার, সাঁড়াশী, কাঁচি, দড়ি ইত্যাদি টেবিলের উপর সাজিয়ে, তাঁর লালচে চুলভর্তি মাথা ঝুঁকিয়ে, রাতের পর রাত এই খেলনা যুদ্ধযন্ত্রগুলির যত্ন নিচ্ছেন। তাঁর হলুদ চোখজোড়া তাঁর হাতের কাজের উপর স্থির নিবদ্ধ। এবং আমার মাথার মধ্যে ওই ছবিটা দেখতে পেয়ে আমি বিষণ্ন ও বিব্রত বোধ করলাম। বহু বছর আগে আমি যখন বিচারপতিকে প্রথম ওই সব জিনিস বানাতে দেখি তখন আমার মধ্যে এ নিয়ে বিশেষ কোনো অনুভূতি জাগে নি । যে কোনো সুস্থ মনের মানুষ যে এসব জিনিস বানাতে চাইবেন, এ বিষয়ে বইপত্র পড়বেন, ম্যাপ আঁকবেন, মডেল তৈরি করবেন, সেটা আমার ওই অল্প বয়সে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিলো। এবং বিচারপতি যে এসব করেছেন সেটাও খুব সঙ্গত মনে হয়েছে। কিন্তু এখন আমার মাথার মধ্যে যে ছবি জেগে উঠলো সেটা ভিন্ন জিনিস। আমার মন খারাপ হয়ে গেলো, বিব্রত বোধ করলাম আমি, মনে হলো আমাকে যেন ঠকানো হয়েছে।

যাই হোক, আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে অতিথিদের সঙ্গে যোগ দিলাম। যাবার আগে ওই খাবার ঘরে, যুদ্ধযন্ত্রটার সঙ্গে, চিরকালের জন্য ফেলে রেখে গেলাম জ্যাক বার্ডেনের একটা অংশ।

ওরা কফি খাচ্ছিলেন। বিচারপতি ছাড়া আর সবাই। বিচারপতি একটা ব্র্যান্ডির বোতল খুলছিলেন। আমি ঢুকতেই তিনি চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি, আমাদের সেই পুরানো যন্ত্রটা দেখছিলে বুঝি? 'আমাদের' কথাটার উপর সামান্য একটু জোর দিলেন তিনি।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

এক মুহূর্তের জন্য তাঁর হলুদ চোখ যেন আমার অন্তর ভেদ করে গেলো। আমি বুঝলাম আমি যে বুঝে ফেলেছি সেটা তিনি ধরে ফেলেছেন। 'আমি ওটা ঠিক করে নিয়েছিলাম', বলেই তিনি এক অনুপম সহজ সরল অনাবিল হাসি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, এই তো সেদিন। বুঝতেই তো পারো, বুড়ো মানুষ, কিছু করার

নেই, কারো সঙ্গে কথা বলার নেই। সারাক্ষণ তো আইন আর ইতিহাস আর ডিকেন্স পড়া যায় না। কিংবা মাছ ধরা যায় না।

আমি দন্ত বিকশিত করে হাসলাম। আমাকে হাসতেই হয়, কিছু একটার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য, যদিও সেটা যে ঠিক কি তা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না। কিন্তু আমি এটাও বুঝলাম যে আমার ওই হাসি শস্তা হোটেলে পরিবেশিত ঠাণ্ডা ঝোলের চাইতে বেশি মন-কাড়া দেখায় নি।

আমি উঠে গিয়ে দুমঁদ মেয়েটির পাশে বসলাম। আমার কথা ভেবেই তাকে এখানে ডাকা হয়েছিলো। মেয়েটি সুশ্রী দেখতে, শরীরের বাঁধুনি চমৎকার, কিন্তু কিছু একটার অভাব আছে, বড়ো বেশি ভঙ্গুর আর উচ্ছ্বাসময়, চঞ্চল বাদামী চোখ দুটির পাতা তিরতির করে কাঁপিয়ে আপনাকে ফাঁসের মধ্যে বেঁধে ফেলতে ব্যস্ত, তারপর দশ বছর আগে তার মায়ের শেখানো ঢং-এ বললো, ওহ্, মিঃ বার্ডেন, আপনি তো পলিটিক্সে আছেন, তাই না? কী মজা! কোনো সন্দেহ নেই যে এই ভঙ্গি সে শিখেছে তার মায়ের কাছ থেকে। তো, বয়স তো ত্রিশ ছুঁই ছুঁই করছে, ওই শিক্ষার এখনো কোনো ফল হয় নি। তাই বলে চোখের পাতার ব্যস্ততা কিছুমাত্র কমে নি।

আমি বললাম, না, আমি পলিটিক্সে নেই। আমি শুধু চাকুরি করি।

আপনার চাকুরির কথা বলুন আমাকে, মিঃ বার্ডেন।

আমি একজন অফিস-বয়।

হুঁঃ! আমি শুনেছি আপনি একজন খুব ইম্পর্ট্যান্ট ব্যক্তি। লোকে বলে আপনার প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি। কী মজা, তাই না? প্রভাবশালী হওয়াটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, মিঃ বার্ডেন!

আমি বললাম, একটা নতুন খবর শুনলাম। তারপরই আমি আবিষ্কার করলাম যে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি হাঁটুর উপর কফির পেয়ালা ধরে মিস দুমুঁদের পাশে কাছাকাছি বসে আছি, এই ব্যাপারটা যেন হঠাৎ তাদের নজরে পড়েছে। এই হচ্ছে মানুষের নিয়তি। যখনই মিস দুমঁদের মতো কোনো মেয়ে আপনাকে পাকড়াও করে, আর মিস দুমঁদের মতো মেয়েদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতে হয় সেভাবে আমি কথা বলতে শুরু করি তখনই সবাই কান পেতে আমার কথা শুনতে থাকে। আমি বিচারপতির মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম, মনে হলো সেই হাসির মধ্যে একটা প্রতিশোধের আনন্দ মিশে আছে।

তিনি বললেন, ওর কথায় ভুলো না, মিস দুমঁদ। জ্যাক সত্যিই খুব প্রভাবশালী।

মিস দুমঁদ বললো, আমি জানতাম। উঃ, কী মজা!

আমি বললাম, বেশ, আমি খুব প্রভাবশালী। তো বলুন, কারাগারে আপনার

কোনো বন্ধু পচে মরছে কি? তার জন্য ক্ষমা যোগাড় করতে হবে? তারপরই আমি আপন মনে বললাম, কী চমৎকার তোমার আচার ব্যবহার, জ্যাক! যদি এ ধরনের একটা কথা বলতেই হয় তাহলে অন্ততঃ হাসিমুখে কথাটা বলতে পারতে। অতএব আমি হাসলাম।

বুড়ো মিঃ প্যাটন বললেন, তো সব কিছু চুকে যাবার আগে একটা মানুষকে ঠিকই জেলে যেতে হবে। রাজধানীতে যেসব কাণ্ড ঘটছে —

ওর স্ত্রী তাকে সতর্ক করে দিতে চেষ্টা করলেন, গলা নামিয়ে বললেন, জর্জ, কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না, কারণ মিঃ প্যাটন ছিলেন মোটাসোটা, খোলামেলা স্বভাবের মানুষ, প্রচুর টাকার মালিক, আর উচিত কথা পুরুষের মতো সোজাসুজি বলতে অভ্যস্ত।

তিনি বলে চললেন, আজ্ঞে, হ্যাঁ, ওখানে যতো সব পাগলামি কাণ্ড কারখানা চলছে। লোকটা তো গোটা স্টেটটা বিকিয়ে দিচ্ছে। এটা মাগ্না, ওটা মাগ্না, সেটা মাগ্না। সব হতচ্ছাড়াগুলো ভাবছে যে সারা দুনিয়াটাই বুঝি বিনি পয়সার ব্যাপার। কিন্তু আমি জানতে চাই, পয়সাটা আসবে কোত্থেকে? ওই লোকটা কি বলে, জ্যাক?

আমি বললাম, কখনো জিজ্ঞাসা করে দেখি নি।

মিঃ প্যাটন বললেন, জিজ্ঞাসা করো। আর কতো লুটপাট হচ্ছে সেটাও জিজ্ঞাসা করো। এতো টাকা-পয়সা বয়ে যাচ্ছে, আর কেউ তার ঝোলা ভরছে না, ওকথা বলো না আমাকে। তারপর ওকে যখন ইমপীচ করবে, ওর বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আনা হবে, তখন ও কী করবে সে কথাটাও জিজ্ঞাসা করো। ওকে বলো যে এই রাজ্যের একটা সংবিধান আছে, অন্ততঃ ও সেটাকে শিকেয় তোলার আগে পর্যন্ত ছিলো। ওকে বলো এই কথাটা।

বলবো, বলেই আমি হাসলাম। তারপর, উইলিকে কথাটা বললে তার চেহারা কি রকম দেখতে হবে সেটা ভেবে আমি আবারো হাসলাম।

বিচারপতি বললেন, জর্জ, তুমি একটা বুড়ো হাবড়া, মান্ধাতার আমলের লোক। এখন সরকারকে সেবামূলক অনেক কিছু করতে হয়। আমাদের কৈশোর-যৌবনে সেসব আমরা শুনিও নি। দুনিয়াটা বদলে যাচ্ছে, জর্জ।

হ্যাঁ, এতটাই বদলেছে যে এখন একটা লোক হুট করে এসে গোটা স্টেটটা পকেটে পুরে ফেলতে পারে। যদি আর ক'টা বছর যেতে দাও, তাহলে ও ব্যাটাকে আর কোনোদিন হটাতে পারবে না। স্টেটের অর্ধেক লোক হবে ওর বেতন-ভোগী, আর বাকী অর্ধেক লোক ভোট দিতে ভয় পাবে। মাস্তানী, ব্ল্যাকমেইল, ঈশ্বর জানেন

আরো কতো কি!

বিচারপতি বললেন, লোকটা কঠিন। খুব সতর্কভাবে, কঠোরতার সঙ্গে, সে এগিয়ে গেছে। তবে একটা নীতি সে খুব ভালোভাবে বুঝেছে ঃ ডিম না ভেঙে অমলেট বানানো যায় না। আর নজিরেরও একটা ব্যাপার আছে। লোকটা অনেকগুলি ডিম ভেঙেছে, অমলেটও সে এখন বানাতে পারে। তাছাড়া, ভুলে যেও না, এপর্যন্ত যতগুলি বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট তার পক্ষে রায় দিয়েছে।

হ্যাঁ, তার কোর্ট। আর্মস্ট্রঙ্গ আর ট্যালবটকে বসানোর পর। আর, যেসব বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু যেগুলি এখনো উত্থাপন করা হয় নি? যেগুলি উত্থাপন করতে মানুষ এখনো ভয় পাচ্ছে?

বিচারপতি শান্ত কণ্ঠে বললেন, অনেক কথা শোনা যাচ্ছে সেটা ঠিক, কিন্তু আমরা সত্যি সত্যি বিশেষ কিছু জানি না।

মিঃ প্যাটন তার মোটা উরু দুটির অবস্থান বদলে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, আমি জানি, ঐ লোকটা ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে স্টেটটাকে মেরে ফেলবে। এখান থেকে সব ব্যবসা বাণিজ্য তাড়িয়ে ছাড়বে। রাজ্যের কয়লা-জমির উপর রয়ালটি বাড়ানো, তেলের জমির উপর রয়ালটি বাড়ানো, আর —

বিচারপতি হেসে উঠলেন, হ্যাঁ, জর্জ। আর আমার উপর আচ্ছা করে আয়কর চাপিয়ে দিয়েছে। তোমার উপরও।

এবার তরুণ এক্সিকিউটিভ মুখ খুললো, কারণ তেলের পূত-পবিত্র নামটি এখন উচ্চারিত হয়েছে। সে বললো, তো তেলের পরিস্থিতিটা হচ্ছে, আমার বিবেচনায় —

মিস দুমঁদ পলিটিক্সের কথা তুলে নিঃসন্দেহে বাথানের দরজা হাট করে খুলে দিয়েছিলো। এখন শুধু পশুখুরের বজ্রধ্বনি আর ধুলোর ঝড়, আর আমি তার মাঝখানে খালি মাটির উপর বসে আছি। এই দৃশ্যের মধ্যে যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে তা কিছুক্ষণের জন্য আমার চেতনায় ধরা পড়ে নি। কিন্তু একটু পরে পড়লো। হাজার হোক, আমি তো ওই লোকটারই চাকুরি করি, যাকে একটা শয়তান, পাষণ্ড, পামররূপে চিত্রিত করা হচ্ছে। এইখানে একাজটা করা হচ্ছে, যা ছিলো, অন্ততঃ যা শুরু হয়েছিলো, একটা সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে। আমার হঠাৎ ব্যাপারটা খেয়াল হলো। তখুনি আমার মনে হলো যে ঘটনা যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তা একটু অদ্ভুত। তারপরই আমি উপলব্ধি করলাম যে, না, তেমন অদ্ভুত কিছু তো নয়। মিঃ প্যাটন, তরুণ এক্সিকিউটিভ, আর মিসেস প্যাটন, কারণ তিনিও ততক্ষণে আলোচনার মধ্যে প্রবল বেগে ঢুকে পড়েছিলেন, এমনকি বিচারপতিও, এঁরা সবাই

ধরে নিয়েছেন যে আমি উইলির চাকুরি করলেও আমার হৃদয় আছে এঁদেরই সঙ্গে। আমি হয়তো উইলির সঙ্গে থেকে একটু-আধটু ফয়দা লুটছি, কিংবা হয়তো অনেকই লুটছি, কিন্তু আমার হৃদয়-মন বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এই পড়ে আছে, আর আমার কাছ থেকে ওদের গোপন করার কিছুই নেই, আর ওরা এটাও জানতেন যে আমার মনে ওরা কষ্ট দিচ্ছেন না। ওরা হয়তো ঠিকই ভেবেছিলেন। হয়তো আমার হৃদয় বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এ পড়ে আছে। হয়তো ওরা আমার মনে কষ্ট দিচ্ছিলেন না। কিন্তু চুপচাপ এক ঘন্টা বসে বসে মিস দুমঁদের সূক্ষ্ম সেন্টের গন্ধ পান করার পর আমি আর নীরব থাকতে পারলাম না। ওদের আলোচনায় বাধা দিয়ে, হঠাৎ করে, আমি কি বলেছিলাম তা এখন ঠিক মনে নেই, কিন্তু যা বলেছিলাম তার সারমর্ম ছিলো এই রকম ঃ আচ্ছা, তাহলে কি সমস্ত ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায় না? যদি এই রাজ্যের সরকার দীর্ঘকাল ধরে এর লোকজনের জন্য কিচ্ছু না করে চুপচাপ বসে না থাকতো তাহলে কি উইলির পক্ষে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে শূন্য হাতে ওই কর্তা ব্যক্তিদের কুপোকাৎ করা সম্ভব হতো? আর বছরের পর বছর কিচ্ছু না করে যে সময় নষ্ট হয়েছে তা পুষিয়ে নিয়ে লোকজনের জন্য কিছু করার তাগিদে উইলিরই কি তাহলে এতগুলি শর্ট-কাট নেবার দরকার হতো? আমি তর্কের খাতিরে আপনাদের সামনে শুধু এই প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপন করতে চাই।

আধ মিনিট ধরে কোনো শব্দ হলো না। মনে হলো মিঃ প্যাটনের পাথর-সদৃশ মুখ একটা পতনোন্মুখ স্মৃতিস্তম্ভের মতো আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়লো, মিসেস প্যাটনের চিবুকের নিচের শিথিল মাংসপিণ্ড থরথর করে কেঁপে উঠলো, তরুণ এক্সিকিউটিভের গলা থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরুলো, আর বিচারপতি অনড় বসে থেকে একের পর এক সকলের মুখের উপর শুধু তাঁর হলুদ চোখ বুলিয়ে গেলেন, আর আমার মা কোলের উপর তাঁর হাত মোচড়াতে থাকলেন। তারপর মা বললেন, খোকা, আমার কোনো ধারণা ছিলো না যে তুমি ব্যাপারটাকে এই রকম চোখে দেখ!

মিঃ প্যাটন বললেন, মানে, ইয়ে, আমি একটুও ভাবি নি যে তুমি —

আমি বললাম, আমি কিন্তু বলি নি যে আমি বিষয়টাকে ওভাবে দেখি। আমি শুধু বিতর্কের জন্য একটা প্রস্তাবনা উপস্থিত করেছিলাম।

বিতর্ক! বিতর্ক! মিঃ প্যাটন আবার তাঁর পূর্বরূপে ফেটে পড়লেন। অতীতে এই রাজ্যের সরকার কি রকম ছিলো তাতে কিচ্ছু এসে যায় না। কিন্তু এরকম কোনোদিন ছিলো না। কেউ কখনো গোটা স্টেটটাকে নিজের পকেটে পুরতে চেষ্টা করে নি। কেউ কোনোদিন —

বিচারপতি তাঁর ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তোমার প্রস্তাবনাটা সত্যি

ভারী ইন্টারেস্টিং।

এবং এরপর, আমার মা ছাড়া, সবাই আবার আলোচনার মধ্যে ডুবে গেলো, আর আমার মা বসে বসে কোলের উপর ধীরে ধীরে তাঁর হাত মোচড়াতে থাকলেন, চুল্লীর আগুনে তাঁর হাতের মস্ত বড়ো হীরের আংটি থেকে দ্যুতি ঠিকরে বেরুতে লাগলো। ওই আংটি তিনি পণ্ডিত এটর্নী ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোনোদিন পাননি। সেদিন বিদায় নেবার আগে পর্যন্ত ওরা অব্যাহতভাবে তাদের আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলেন।

পরের দিন শেষ বিকালে আগুনের সামনে বসে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই মিস দুমঁদটা কে?

মিঃ অর্টনের বোনের মেয়ে। ভদ্রলোকের সবটাকা পয়সা এই মেয়ে পাবে।

তো, টাকা পয়সাটা পাওয়া পর্যন্ত একজন কারো অপেক্ষা করা উচিত, তারপর সে তাকে বিয়ে করে স্নানের টবে ডুবিয়ে মারতে পারবে।

আঃ, ওরকম করে বলে না।

ভেবো না, আমি ওকে ডুবিয়ে মারতে চাইলেও ওর টাকা পয়সা আমি চাই না। টাকা পয়সা সম্পর্কে আমি উৎসাহী নই। ইচ্ছা করলে আমি যে কোনোদিন অতি সহজে দশ হাজার টাকা বানাতে পারি। বিশ হাজারও। আমি —

শোনো, খোকা, মিঃ প্যাটন যে বললেন, ওই যে লোকগুলোর ওখানে তুমি চাকুরি করো, ওদের কোনো ঘুষ-টুষের কারবারে তুমি কখনো জড়িয়ে পড়ো না।

মিঃ প্যাটন কাকে ঘুষের কারবার বলে জানো? যখন অন্যরা —

ব্যাপারটা একই। শোনো, ওই লোকগুলো —

মা, তুমি যাদের ওই লোকগুলো ওই লোকগুলো বলছো তারা কি করে আমি জানি না। কারা কখন কি করে সেটা জানা থেকে আমি সব সময় নিজেকে খুব সযত্নে বিরত রাখি।

শোনো, খোকা, তুমি যেন কক্ষণো —

কক্ষণো কি ?

কক্ষণো কোনো কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়িও না।

আঃ, আমি তো শুধু এইটুকু বলেছি যে আমি চাইলে অতি সহজে দশ হাজার টাকা বানাতে পারি। এবং অবৈধ সুযোগ সুবিধা দেবার বিনিময়ে ঘুষ নিয়ে নয়। শুধু খবর দিয়ে। খবরই টাকা। কিন্তু অমি তো তোমাকে বলেছি, টাকা পয়সায় আমার উৎসাহ নেই। বিন্দুমাত্র না। উইলিরও কোনো উৎসাহ নেই।

উইলি?

বস্। কর্তা। টাকা পয়সা সম্পর্কে বস্-ও বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়।

তাহলে কি সম্পর্কে সে উৎসাহী?

সে উৎসাহী উইলি সম্পর্কে। সোজাসুজি এবং প্রত্যক্ষভাবে। এবং উইলি যেভাবে উইলি সম্পর্কে উৎসাহী, কেউ যদি কখনো তার নিজের সম্পর্কে ওই রকম সোজাসুজি এবং প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহী হয় তাহলে মানুষ তাকে বলে জিনিয়াস, প্রতিভা। মিঃ প্যাটনের মতো আধা-সেদ্ধ মানুষেরাই টাকা পয়সার ব্যাপারে উৎসাহী হয়। এমনকি যেসব মহারথীরা সত্যিকার টাকার পাহাড় গড়ে তোলে তারাও আসলে টাকা পয়সা সম্পর্কে উৎসাহী হয় না। হেনরি ফোর্ড টাকা পয়সা সম্পর্কে উৎসাহী নন। তিনি উৎসাহী শুধু হেনরি ফোর্ড সম্পর্কে। আর তাই তিনি একটি জিনিয়াস।

মা আর একটা হাত তাঁর নিজের হাতে তুলে নিয়ে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, খোকা, ওরকম করে কথা বলো না।

কি রকম করে?

তুমি যখন ওরকম করে বলো তখন কি যে ভাববো আমি বুঝতে পারি না। সত্যি পারি না। মা অনুনয়ের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন। চুল্লীর আগুন থেকে আলো পড়ে তাঁর গালের টোল দেখালো আরো গভীর, আরো বুভুক্ষু। তিনি তাঁর হাতে ধরা আমার হাতের উপর তাঁর অন্য হাতটাও রাখলেন, এবং কোনো রমণী যখন আপনার হাত নিয়ে ওই রকম স্যান্ডউইচ বানায় তখনই বুঝতে হবে যে সামনে একটা কিছু আসছে। এটা তার ভূমিকা। এক্ষেত্রে সেটা হলো ঃ খোকা, কেন তুই স্থিতু হয়ে বসছিস না? কেন একটা লক্ষ্মী মেয়ে দেখে বিয়ে করছিস না?

আমি বললাম, সেটা তো একবার করে দেখেছি, মা। আর শোনো, তুমি যদি ওই দুমঁদকে নিয়ে কিছু মতলব এঁটে থাকো, তাহলে আগেই বলে রাখছি, সে গুড়ে বালি।

মা তাঁর অত্যুজ্জ্বল চোখ নিয়ে আমার দিকে একটা ক্রমবর্ধমান অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আমাকে দেখছিলেন, যেন কিছু একটা আবিষ্কার করতে চাইছেন, যেন দূরে দেখতে পাওয়া একটা জিনিস সত্যি সত্যি কি তা বোঝার চেষ্টা করছেন। তারপর বললেন, খোকা, খোকা, কাল রাতে তুমি ভারী অদ্ভুত রকম ব্যবহার করেছো। তুমি আলোচনায় কোনো অংশ নাও নি, তারপর হঠাৎ এক সময় যে সুরে —

আমি বললাম, ঠিক আছে।

তুমি স্বাভাবিক ব্যবহার কর নি। সব সময় তুমি যেরকম আচরণ করতে, চিরকাল যেভাবে থাকতে অভ্যস্ত ছিলে —

আমি বাধা দিয়ে বললাম, চিরকাল আমি যেভাবে থাকতে অভ্যস্ত ছিলাম যদি

আর কখনো সেরকম থাকতে শুরু করি তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো। আর আমি যদি গতরাতে ওই নির্বোধ প্যাটন–দম্পতি আর ওই নির্বোধ দুমঁদের সামনে তোমাকে বিব্রত করে থাকি, তাহলে আমি দুঃখিত।

মা বলতে আরম্ভ করেছিলেন, জাজ আরউইন —

ওঁকে বাদ দাও। ওঁর কথা আলাদা।

আঃ, খোকা, কেন যে তুমি এই সব করো! না, তুমি আমাকে বিব্রত করো নি, কিন্তু কিসের তাড়নায় তুমি এরকম করো? ওই লোকগুলো — ওই লোকগুলোর কারণেই তুমি এরকম করো। তুমি একটু স্থিতু হয়ে বসো না কেন? জাজ আরউইন, থিওডোর, ওরা তোমাকে অতি সহজে খুব ভালো একটা কাজ যোগাড় —

আমি ওর তৈরী স্যান্ডউইচের মধ্য থেকে আমার হাত সজোরে টেনে নিয়ে বললাম, ওদের কাছ থেকে আমি কিছুই চাই না, কিছুই না। কারো কাছ থেকেই কিছু চাই না। আর আমি স্থিতু হয়ে বসতে চাই না, বিয়ে করতে চাই না, অন্য কোনো চাকুরি চাই না, আর টাকা পয়সার কথা যদি বলো —

খোকা, খোকা! মা আবার কোলের উপর তাঁর হাত মোচড়াতে শুরু করলেন।

— আর টাকা পয়সার কথা যদি বলো তাহলে আমার যা আছে তার চাইতে বেশি আমি চাই না। তাছাড়া এনিয়ে তো আমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। তোমার তো অঢেল টাকা আছে।

আমি সোফা থেকে উঠে সিগারেট ধরিয়ে ম্যাচের কাঠিটা আগুনের চুল্লীতে ফেলে দিয়ে বললাম, তোমার যা টাকা আছে তাতে তুমি সহজেই থিওডোর আর আমাকে, আমাদের দুজনকেই, খুব ভালো অবস্থায় রেখে যেতে পারবে।

তিনি নড়লেন না, কিছু বললেন না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, আর আমি ওঁর চোখদু'টি জলে ভরে উঠতে দেখলাম, নির্ভুলভাবে বুঝলাম যে মা আমাকে ভালোবাসেন, কারণ আমি ওর সন্তান। সময়ের প্রশ্ন এখানে অর্থহীন, কিন্তু এটাও আমি লক্ষ করলাম যে তাঁর উজ্জ্বল বড়ো বড়ো চোখ সত্ত্বেও ওই মুখ একটা বয়স হয়ে যাওয়া মুখ, চোখের নিচে, গালের টোলের নিচে, চামড়া শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে।

আমি বললাম, অবশ্য তোমার টাকা যে আমি চাই তা নয়।

মা তাঁর হাত বাড়িয়ে কেমন করুণ, অনিশ্চিত, বিনীত ভঙ্গিতে আমার ডান হাতটা ধরলেন, ঠিক হাতও নয়, আঙ্গুলগুলি ধরলেন, তারপর সেগুলি নাড়তে লাগলেন।

খোকা, তুই তো জানিস আমার যা কিছু আছে সবই তোর। জানিস না?

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

জানিস না তুই? মা আমার আঙ্গুলগুলি এমনভাবে আঁকড়ে ধরলেন যেন তিনি জলে ডুবে যাচ্ছেন আর কেউ একজন তার দিকে একটা দড়ি ছুঁড়ে দিয়েছে।

আমি নিজের কণ্ঠস্বর শুনলাম, ঠিক আছে। আমি অনুভব করলাম যে আমার আঙ্গুলগুলি তার হাতের বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য আঁকুপাঁকু করছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার এটাও মনে হলো যে আমার হৃদয় যেন হঠাৎ ভীষণ কোমল হয়ে যাচ্ছে, হাতের মুঠোয় একটা বরফের নরম গোল্লা নিয়ে চাপ দিলে যেমন গলে যায় সেই রকম গলে গলে যাচ্ছে। আমি বললাম, ওরকম ভাবে কথা বলার জন্য আমি দুঃখিত, মা, কিন্তু দোহাই তোমার, আমাদের কেন কথা বলতেই হবে? আমি দু'একদিনের জন্য বাড়ি আসি, এই সময়টায় কেন আমরা এসব কথা না তুলে চুপচাপ থাকতে পারি না?

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু আমার আঙ্গুলও ছাড়লেন না। তখন আমি নিজেই আমার আঙ্গুল টেনে নিয়ে বললাম, উঠি এবার। খাবার আগে স্নান করবো। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি জানতাম যে তিনি মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে আমার নিস্ক্রমণ লক্ষ করছেন না, কিন্তু ঘরের মেঝে অতিক্রম করতে করতে আমার মনে হলো একটা কিচ্ছু শেষ হয়ে গেছে, অথচ কেউ যেন যবনিকা ফেলে দিতে ভুলে গেছে, আর সহস্র চোখ আমার পিঠের উপর নিবদ্ধ, তবে করতালি এখনো শুরু হয় নি। বুদ্ধুগুলো বোধহয় বোঝেই নি যে, খেলা শেষ হয়ে গেছে। বোধহয় বোঝেই নি যে হাততালির সময় হয়েছে।

আমি উপরে গিয়ে বাথটাবে গা এলিয়ে দিলাম, কান পর্যন্ত গরম জলে শরীর ডুবিয়ে। এবং বুঝলাম যে এবারকার মতো আবার সব শেষ হলো।

এখন আমি, খাবার পর, আমার গাড়িতে উঠেই পাগলের মতো শহরের দিকে ছুটবো, কুয়াশাঘেরা কালো কালো মাঠের মধ্য দিয়ে প্রসারিত নতুন কংক্রিটের সড়কের উপর দিয়ে ছুটে যাবো, মাঝরাত নাগাদ শহরে গিয়ে পৌঁছুবো, তারপর হোটেলে আমার ঘরে গিয়ে ঢুকবো, যেখানে আমার নিজস্ব বলতে কিচ্ছু নেই, কোনো কিছুই যেখানে আমার নাম জানে না, যেখানে আমাকে বলার মতো কিছুই নেই, কি কি ঘটলো তা নিয়ে আলাপ করবার মতো কেউ নেই।

আমি বাথটাবে শুয়ে শুয়ে একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। হ্যাঁ, তরুণ এক্সিকিউটিভ বাড়ি ফিরছেন। তিনি সামনের দরজা দিয়ে ঢুকবেন, সোফায় উপবিষ্ট মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাবেন, তাঁর ছোট কাঁধ শক্ত করে বুড়ো হয়ে যাওয়া মুখটি তুলে ধরবেন একটা উপহারের মতো। সব আমার জানা।

এবং, দোহাই ঈশ্বরের, ব্যাটাকে যেন কৃতজ্ঞ দেখায়।

দু'ঘণ্টা পরে আমি আমার গাড়িতে উঠে বসলাম, তারপর বার্ডেন্স ল্যান্ডিং পড়ে রইলো আমার পেছনে। গাড়ির উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার মৃদু শব্দ করে আপন কাজে ব্যস্ত, আমার ভেতরেও যেন কিসের একটা নিরন্তর শব্দ, ওই শব্দ যেন না থেমে যায়, থামলেই বিপদ। কারণ আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অন্ধকারের ভেতর থেকে আমার হেডলাইটের উপর বড়ো বড়ো ফোঁটা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, যেন উজ্জ্বল কোনো ধাতুর মালা, আর তার ভেতর দিয়ে, তাকে ঠেলে সরিয়ে, আমার গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যে গাড়িতে থাকার মতো একাকীত্ব আর কোনো কিছুতে নেই। এবং আমি এখন গাড়ির মধ্যে। আর সেজন্য আমি আনন্দিত। ম্যাপের এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দু, আর তার মধ্যবর্তী সময়ে বৃষ্টির ভেতর গাড়ির মধ্যে এই একাকীত্ব। লোকে বলে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের শর্তেই তুমি তুমি, নইলে তুমি কিছুই নও। যদি অন্য কোনো মানুষ না থাকে তাহলে তুমিও থাকবে না, কারণ তুমি যা করো, যা তোমাকে তুমি বানায়, অন্য লোকের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই শুধু সেটা অর্থ লাভ করে। রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যে গাড়িতে তুমি যখন একা তখন এই ধরনের চিন্তা খুব আরামপ্রদ, কারণ তখন তুমি আর তুমি নও, তুমি কিংবা অন্য কোনো কিছুই না হওয়ার জন্য তুমি তখন ভালো করে গা এলিয়ে দিয়ে একটু প্রকৃত বিশ্রাম নিতে পারো। এ হলো তুমি হওয়া থেকে একটা ছুটি। তখন তোমার পায়ের নিচে ইঞ্জিন থেকে উৎসারিত শুধু একটা প্রবাহ, তার ধাতব দেহের ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ শব্দের সুতো ছড়িয়ে যাওয়া, একটা মাকড়সার মতো, ওই সূক্ষ্ম তন্তু, ওই বন্ধন, যে-তোমাকে তুমি এই মাত্র একটা জায়গায় ফেলে এসেছো আর যে-তোমাকে তুমি অন্য একটা জায়গায় পৌঁছুবার পর পাবে তার মধ্যে ওই সূক্ষ্ম তন্তু, ওই বন্ধন, সত্যি সত্যি যা কিন্তু নেই।

তোমার উচিত একদিন ওই দুই তুমিকে একই পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো। কিংবা তোমার সবক'টা তুমিকে ডেকে গাছের নিচে বারবেকিউ পার্টি করে একটা পারিবারিক পুনর্মিলনীর ব্যবস্থা করা। ওরা পরস্পরকে কি বলে সেটা শুনতে পেলে ভারী মজা হতো কিন্তু।

কিন্তু ইত্যবসরে, ওদের দুজনের কেউই এখানে নেই, আর রাত্রিবেলা বৃষ্টির মধ্যে গাড়িতে রয়েছি আমি।

আমি যে গাড়িতে তার কারণ হলো এই। ৩৭ বছর আগে, ১৮৯৬ সালের দিকে, একজন গাট্টাগোট্টা, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, বয়স চল্লিশের মতো, চোখে স্টীলের

চশমা, পরনে কালো স্যুট, দক্ষিণ আরকানস'র একটি কাঠ কাটার শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত এটর্নী। ওই শহরের প্রধান কাজ ছিলো বড় বড় গাছ কেটে, করাত দিয়ে চিরে, তক্তা বানানো। ওই রকম একটা কাজের সঙ্গে জড়িত বড়ো একটা মামলা উপলক্ষে তিনি ওখানে যান। ব্যাপারটা তদন্ত করতে হবে, সাক্ষীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। জায়গাটা শহর বলার মতো তেমন কিছু ছিলো না। কয়েকটি ঝুপড়ি, মালিক আর প্রকৌশলীদের জন্য একটা বোর্ডিং-হাউস, একটা ডাকঘর, কোম্পানীর একটা খাদ্যসামগ্রীর দোকান — ব্যস, লাল কাদামাটির মধ্য থেকে গড়ে ওঠা এই হলো শহর, আর চারপাশে অনেক দূর অবধি বিস্তৃত শুধু কর্তিত গাছের গুঁড়ি, ওই গুঁড়িগুলির মধ্যে একটু দূরে একটা গরু দাঁড়িয়ে আছে, চারিদিকে করাতের কর্কশ শব্দ, যেন আপনার মাথার ভেতর, একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে, একটা স্নায়ু দপদপ করছে, আর বাতাসে এবং আপনার নাসারন্ধ্রে চেরা কাঠের মিষ্টি ভেজা গন্ধ।

আমি ওই শহর দেখি নি। আরকানস' স্টেটের সীমানার মধ্যেই আমি কোনেদিন পা দিই নি। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে আমি ওই শহর দেখেছি। আর ওই খাদ্যসামগ্রীর দোকানের সিঁড়িতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার হলুদ চুল মোটা দুটি বেণী করে বাঁধা, বড়ো বড়ো নীল চোখ তার, দুই গালে মনোহর, ঈষৎ বুভুক্ষু দুটি টোলের আভাস। তার পরনে, ধরা যাক, একটা ঘন সবুজ রঙের ডোরাকাটা সুতীর পোশাক, কারণ একটি সোনালী-শুভ্র সুন্দরী মেয়ের সতেজ ত্বকের জন্য ঘনসবুজ রঙই সব চাইতে মানানসই। সকালের রোদে ওই পোশাক পরে মেয়েটি দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাঠচেরা করাতের কর্কশ শব্দ শুনতে শুনতে দেখছে কালো স্যুট পরা একজন গাট্টাগোট্টা লোক বসন্তের শেষ ভারী বৃষ্টির দান এই লাল কাদামাটির মধ্য দিয়ে গম্ভীরভাবে, সতর্কতার সঙ্গে, এগিয়ে আসছে।

মেয়েটি দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে কারণ তার বাবা কোম্পানীর ওই খাদ্যসামগ্রীর দোকানে কেরানীর কাজ করেন। তার বাবা সম্পর্কে ওই টুকুই আমি জানি।

কালো স্যুট পরা লোকটি নিজের আইন সংক্রান্ত ব্যবসার কাজে ওই শহরে দু'মাস ছিলেন। বিকালে, সূর্য যখন ডুবু-ডুবু, তখন তিনি আর মেয়েটি শহরের রাস্তা ধরে হাঁটতেন, রাস্তা এখন ধুলোময়, চলে যেতেন বাড়িঘর ছাড়িয়ে কাটাগাছের গুঁড়ির এলাকায়। আরকানস'র গ্রীষ্মকালীন তামাটে আর রক্তলাল সূর্যাস্তের পটভূমিতে আমি ওদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছি, ধ্বংস করে দেওয়া ওই অঞ্চলের মাঝখানে তারা দাঁড়িয়ে আছে। পরস্পরকে ওরা কি বলছে তা আমি বুঝতে পারছি না।

লোকটি শহরে তার কাজকর্ম শেষ করে সেখান থেকে চলে যাবার সময় মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলো। মানুষটা সরল, সহৃদয়, লাজুক প্রকৃতির। ট্রেনের লাল গদীমোড়া আসনে মেয়েটির পাশে বসে সে সতর্কতার সঙ্গে, সযত্নে, মেয়েটির হাত নিজের হাতে ধরে রাখলেন, যেন পড়ে গেলে মূল্যবান কিছু একটা ভেঙে যাবে।

লোকটির ঠাকুর্দা একটা বিশাল সাদা বাড়ি তৈরি করেছিলেন। বাড়ির সামনেই সমুদ্র। মেয়েটিকে সে ওই বাড়িতে রাখলো। মেয়েটির কাছে এটা ছিলো নতুন একটা অভিজ্ঞতা। প্রতিদিন সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সময় কাটিয়ে দিতো। মাঝে মাঝে সমুদ্রতীরে গিয়ে একা একা দাঁড়িয়ে সুদূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতো।

আমি জানি এটা সত্য, এই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকার ব্যাপারটা, কারণ অনেক পরে, আমি যখন বেশ বড়ো হয়ে গেছি, আমাকে মা একদিন বলেছিলেন, আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আমি শুধু জলের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ওই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম, কেন তা জানি না। কিন্তু পরে এই আকর্ষণ উঠে যায়। তোমার জন্মের আগেই সে আকর্ষণ মরে যায়।

বিদ্যানুরাগী এটর্নী আরকানস' গিয়েছিলেন, মেয়েটি দাঁড়িয়েছিলো খাদ্যসামগ্রীর দোকানের সিঁড়িতে, আর সে কারণেই আমি এখন গাড়িতে, বৃষ্টির মধ্যে, রাত্রিবেলায়।

আমি যখন আমার হোটেলের লবিতে ঢুকলাম তখন প্রায় দুপুররাত। হোটেল–কেরানী আমাকে ঢুকতে দেখে হাত নেড়ে কাছে ডেকে একটা নম্বর দিয়ে সেখানে ফোন করতে বললো, জানালো যে হোটেলের ফোন অপারেটরকে ওরা প্রায় পাগল করে ছেড়েছে। আমি নম্বরটা দেখে চিনতে পারলাম না। কেরানী যোগ করলো, ওই নম্বরে মিস বার্ককে খোঁজ করতে বলেছে।

শুনেই আমি ফোন করার জন্য আর উপরে উঠলাম না। হোটেলের লবির একটা বুথে ঢুকে ডায়াল করতেই চটপটে গলায় উত্তর পেলাম, মার্কহাইম হোটেল। আমি মিস বার্ককে চাইলাম। তারপরই ভেসে এলো স্যাডির গলা ঃ কী কাণ্ড! কোথায় ছিলে তুমি! আমি বার্ডেন্স ল্যান্ডিং–এ ফোন করেছিলাম। ওরা বললো যে তুমি বেরিয়ে গেছো। তো করছিলে কি? হেঁটে আসছিলে নাকি?

আমি বললাম, আমি সুগার–বয় না।

ঠিক আছে। এখন তাড়াতাড়ি চলে এসো। স্যুইট ৯০৫ নম্বর। ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে।

আমি ধীরে ধীরে টেলিফোন নামিয়ে রেখে কেরানীর কাছে গিয়ে বললাম আমার

ব্যাগটা যেন বেয়ারা দিয়ে আমার ঘরে পৌঁছে দেয়, তারপর লবিতে রাখা জলের মেশিন থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে সেটা খেলাম, লবির দোকানের নিদ্রাতুর মেয়েটির কাছ থেকে দু'প্যাকেট সিগারেট কিনে একটা সিগারেট মুখে দিয়ে সেটা ধরালাম, তারপর তাতে দীর্ঘ এক টান দিয়ে শূন্য লবির চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে আনলাম যেন গোটা দুনিয়ায় যাবার মতো আমার কোনো জায়গা নেই।

কিন্তু জায়গা ছিলো। আর সেখানে গেলামও আমি। যাত্রা শুরু করার পর, দ্রুত।

৯০৫ নম্বর স্যুইটের বাইরের ঘরে টেলিফোন স্ট্যান্ডের পাশে বসে ছিলো স্যাডি। ওর সামনের ট্রেতে সিগারেটের শেষাংশের স্তূপ, ওর অযত্নে ছাঁটা কালো চুলভর্তি মাথার চারপাশ দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধীরে ধীরে ঘুরছে।

ধোঁয়ার আড়াল থেকে সে বললো, এই যে! ওর গলা শোনালো বেয়াড়া মেয়েদের হোটেলের কোনো মেট্রনের মতো। কিন্তু আমি কোনো কথা না বলে, চেয়ারে উপবিষ্ট, নাক ডাকানো, নিদ্রামগ্ন সুগার-বয়ের পাশ দিয়ে, সোজা স্যাডির কাছে হেঁটে গেলাম, তারপর সে তার অবিন্যস্ত কালো আইরিশ চুলের গুচ্ছ নিজের মুঠিতে ধরে, মাথাটাকে স্থির করে, আমাকে শাপ-শাপান্ত করে উঠবার আগেই, ওর কপালে সশব্দে একটা চুমু খেলাম।

শাপ-শাপান্ত সে করলো।

আমি বললাম, কেন আমি এটা করলাম তুমি ধারণাও করতে পারবে না।

পারার দরকার নেই, শুধু দেখ, এটা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে না যায়।

আমি বললাম, এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিচ্ছু নেই। তোমার নাম দুর্মঁদ নয়, তাই এই ব্যবহারের কারণ।

শোনো, এক্ষুণি যদি ওখানে না যাও তাহলে তোমার নাম শিগগীরই গোবরে পরিণত হবে।

আমি হাল্কা গলায় বললাম, কে জানে, আমি হয়তো রিজাইন করবো, তারপরই ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশ বাল্বের মতো আমার মাথার মধ্যে একটা বাল্ব জ্বলে উঠলো, আর আমি মনে মনে বললাম, হয়তো সত্যিই তাই করবো।

স্যাডি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, আর তক্ষুণি টেলিফোন বেজে উঠলো। ও এমন একটা ভঙ্গি করে হ্যাঁচকা টানে রিসিভার তুলে নিলো যেন পারলে ও খালি হাতে গলা টিপে ওটাকে মেরে ফেলে। আমি ভেতরের ঘরের দরজার দিকে যেতে যেতে শুনলাম ও বলছে, তো, ওকে পেয়েছো? ঠিক আছে, এখানে পাঠিয়ে দাও . . . জাহান্নামে যাক ওর স্ত্রী। ওকে বলে দাও যে ও না এলে স্ত্রীর চাইতেও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বে সে নিজে . . . হাঁ, বলে দাও —

আমি ভেতরের দরজায় টোকা দিলাম, কণ্ঠস্বর শুনলাম, ঘরের ভেতরে ঢুকলাম।

কর্তাকে দেখতে পেলাম আমি। একটা ইজিচেয়ারে আধশোয়া, মোজা পরা পা সামনের চেয়ারে তুলে দেয়া, গলার টাই বাঁকা হয়ে গেছে, পরনে শুধু শার্ট, চোখদু'টি জ্বলজ্বলে, ঈষৎ বিস্ফারিত, হাতের তর্জনী চাবুকের মতো সামনের বাতাসে উঁচু করে ধরা। তারপরই আমার চোখে পড়লো কার উদ্দেশে চাবুকের মতো এই তর্জনী উত্তোলিত। তিনি হলেন মিঃ বাইরাম বি. হোয়াইট, স্টেট অডিটর। তার দীর্ঘ শীর্ণ মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, তার দৃষ্টি আমার দিকে ছুটে এলো, সর্বশেষ আশার মতো আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

আমি বুঝলাম যে আমি বেমক্কা ঢুকে পড়েছি।

একসকিউজ মি, বলে আমি পেছন ফিরে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম।

কর্তা বললেন, দরজাটা বন্ধ করে এখানে এসে বসো। বলেই, কোন রকম যতি ছাড়াই, আমি ঢুকবার আগে যা বলছিলেন সরাসরি সেই প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তাঁর তর্জনী দুলে উঠলো, তাঁকে আমি বলতে শুনলাম, শোনো, একথাটা খুব ভালো করে মনে রেখো যে ধনী হওয়া তোমার কপালে নেই। তোমার মতো একটা লোক, পঞ্চাশ বছর বয়স, শরীরে পদার্থ বলতে কিছু নেই, দাঁত পড়ে গেছে, এ যাবৎ একটা পয়সাও করতে পারো নি। তোমাকে ধনী করবার কোনো ইচ্ছা যদি বিধাতার থাকতো তাহলে বহু আগেই তিনি সে কাজটা করতেন। নিজের দিকে এক নজর তাকিয়েও দেখতে পারো না? তুমি যদি ভেবে থাকো যে তোমার ধনী হওয়া উচিত তা হলে সেটা হবে সরাসরি ঈশ্বরনিন্দার সামিল। বুঝলে? নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো! কি, কথাটা ঠিক না? কর্তার তর্জনী সোজা মিঃ বাইরাম বি. হোয়াইটের দিকে তুলে ধরা।

কিন্তু মিঃ হোয়াইট কোনো জবাব দিলেন না। তিনি, অসুখী, চুপ করে দাঁড়িয়ে আঙ্গুলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কর্তা তীব্র কণ্ঠে বললেন, কি হলো? বেড়ালে জিভ নিয়ে গেছে নাকি? একটা ভদ্র সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছো না?

মিঃ হোয়াইটের ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটি কোনো রকমে উচ্চারণ করলো, হ্যাঁ।

মিন মিন করো না, জোরে বলো, কথাটা ঠিক, সেটা ঈশ্বরনিন্দার সামিল।

মিঃ হোয়াইটের ঠোঁট আরো সাদা হয়ে গেলো, কণ্ঠস্বর আরও নিচু ও অস্পষ্ট, কিন্তু তিনি এবার উচ্চারণ করলেন। প্রতিটি শব্দ।

কর্তা বললেন, ঠিক আছে, এবার হয়েছে। এবার তোমাকে কি করতে হবে তুমি

বুঝেছো। তোমার নিয়তি হচ্ছে পরিষ্কার থাকা আর হুকুম তামিল করে যাওয়া। তোমার যৌন জীবনের শুদ্ধতা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, চেহারা দেখে মনে হয় সে-শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য তোমাকে বিশেষ কোনো কষ্ট পেতে হয় না, কিন্তু আমি বলছি দারিদ্র্যের কথা, নির্দেশ মেনে চলার কথা। এটা কক্ষণো ভুলে যেও না। বিশেষ করে শেষ কথাটা। মাঝে মধ্যে ছিটেফোঁটা তোমার ভাগ্যে জুটবে, কিন্তু সেটা ডাফি দেখবে। তুমি নিজে থেকে আর কোনো দিন কোনো উদ্যোগ নিতে যেও না। একক ফায়দা লোটার ব্যাপার আর কোনো দিন হবে না। বুঝতে পারছো তো কি বলছি? কথা বলো!

মিঃ হোয়াইট বললেন, হ্যাঁ। আরো জোরে বলো। বলো, বুঝতে পেরেছি। বললেন তিনি। আরো জোরে।

কর্তা বললেন, ঠিক আছে, তোমার ইমপীচমেন্টের ব্যাপারটা আমি বন্ধ করছি। কিন্তু ভেবো না যে তোমার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে সেটা করছি। ওই লোকগুলো যেন মনে না করে যে ইচ্ছা করলেই ওরা যে কাউকে ধরাশায়ী করতে পারে। ওদের সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই আমি তোমায় রক্ষা করবো। কি, আমার উদ্দেশ্যটা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে?

মিঃ হোয়াইট বললেন, হ্যাঁ।

ঠিক আছে। এবার ওই টেবিলে গিয়ে বসো। কর্তা একটা ছোট টেবিল দেখিয়ে দিলেন। কলমের ট্রে আর টেলিফোন রাখা আছে তার উপর।

এখন ড্রয়ার থেকে একটা সাদা কাগজ বার করে কলমটা হাতে নাও।

মিঃ হোয়াইট নিঃশব্দে, ভূতের মতো, ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে আসন গ্রহণ করা পর্যন্ত কর্তা অপেক্ষা করলেন। মনে হলো মিঃ হোয়াইট নিজেকে খুব ছোট্ট করে গুটিয়ে নিয়েছেন, বোতলের মধ্যে আবার ঢুকে যাবার জন্য তৈরি হওয়া দৈত্যটির মতো, যেন তিনি নিজেকে কুঁকড়ে জন্মপূর্ববর্তী ভ্রূণাবস্থায় নিয়ে যেতে চাইছেন, আঁধারের মধ্যে ক্ষুদ্র, উষ্ণ আর নিরাপদ হয়ে উঠতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কর্তা বলে চললেন, এবার আমি বলছি, তুমি লিখে যাও। কর্তা ডিক্টেট করতে শুরু করলেন, প্রিয় গভর্নর স্টার্ক, অসুস্থতার কারণে আমার পক্ষে, আমার বিবেককে সন্তুষ্ট রেখে, কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে — কর্তা এখানে থেমে বললেন, হ্যাঁ, বিবেককে সন্তুষ্ট রেখে কথাটা খেয়াল করে লিখো, ওটা যেন বাদ না যায় — তারপর তিনি তাঁর কাজের গলায় আবার শুরু করলেন, অতএব আমি আমার অডিটরের চাকুরি থেকে পদত্যাগ করতে চাই। উপরে প্রদত্ত তারিখের পর, যতো শীঘ্র আপনি আমাকে অব্যাহতি দিতে পারবেন সেই তারিখ থেকেই আমার এই পদত্যাগপত্র

কার্যকর হবে। কর্তা ওর কুঁকড়ে যাওয়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে শেষ করলেন, আপনার বিনীত . . . ।

তারপর নীরবতা, কাগজের বুকে কলমের খসখস শব্দ, সেই শব্দ থেমে যাওয়া। কিন্তু মিঃ হোয়াইটের লম্বা সরু টাকমাথা প্রায় কাগজ স্পর্শ করে ঝুঁকেই থাকলো, যেন তিনি খুবই ক্ষীণদৃষ্টির মানুষ, কিংবা তিনি যেন প্রার্থনা করছেন, কিংবা যে বস্তুটি ঘাড়ের পেছনে থেকে মাথা সোজা করে রাখে সেটা তিনি হারিয়ে বসেছেন।

কর্তা তার নুয়ে পড়া মাথার পেছনটা লক্ষ করে বললেন, সই করেছো?

না।

তবে করো! সই করো! কাগজের বুকে আবার খসখস শব্দ যখন থামলো তখন কর্তা বললেন, তারিখ বসিও না। দরকার মতো আমি সেটা বসিয়ে নিতে পারবো।

মিঃ হোয়াইটের মাথা উঁচু হলো না। আমি যেখানে বসে ছিলাম সেখান থেকে দেখলাম যে তার হাতে তখনো কলমটি ধরা, তার নামের শেষ অক্ষরটির উপর তখনো তার কলমের মাথা লেগে আছে।

কর্তা বললেন, নিয়ে আসো এখানে।

মিঃ হোয়াইট উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখ নিম্নমুখী। আমি সেমুখের যতটুকু দেখা যায় দেখলাম। তার চোখে এখন আর কোনো সাহায্যের আবেদন নেই। আমার পাশ দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। ওই চোখে এখন কিছুই নেই। অসাড়, অভিব্যক্তিহীন, ভাঙা খোলসের মধ্যে একজোড়া বিবর্ণ ধূসর শুক্তির মতো।

মিঃ হোয়াইট কাগজটা কর্তাকে দিলেন, কর্তা সেটা পড়ে, ভাঁজ করে, যেখানে তিনি বসেছিলেন তার কাছে বিছানার পায়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, দরকার মতো আমি তারিখটা বসিয়ে নেবো। যদি আমি দরকার মনে করি। সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তোমার উপর। কিন্তু, একটা কথা কি জানো, বাইরাম, আমি যে কেন গোড়াতেই তোমার কাছ থেকে এই রকম তারিখ ছাড়া একটা পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নিই নি তা বুঝতে পারছি না। অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছি। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে আমি ভুল মূল্যায়ন করেছিলাম। তোমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই আমি মনে মনে বলেছিলাম, নাঃ, এই ব্যাটাচ্ছেলে কোনো ঝামেলা করবে না। আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে তুমি এতোই মার খেয়েছো যে বিধাতা যে তোমাকে ধনী হবার জন্য সৃষ্টি করেন নি সেটা তুমি সুনিশ্চিতভাবে বুঝে গেছো। তুমি যে এই রকম একটা ধান্দাবাজী করতে পারো আমি সেটা কক্ষনো ভাবি নি। আইবুড়ো বৃদ্ধা

মহিলাদের হোস্টেলের বাথরুমে পড়ে থাকা ঘর মোছার ভেজা ন্যাকড়ার চাইতে তোমার মধ্যে বেশি কর্মোদ্যোগ আছে বলে আমার কখনো মনে হয় নি। কিন্তু আমার যে ভুল হয়েছিলো, বাইরাম, সে কথা আমি খোলাখুলি স্বীকার করছি, পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেছে, আর এই সারাটা সময় তুমি শুধু একটা বড়ো সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিলে! কখন জাহাজ এসে কূলে ভিড়বে তার জন্য অপেক্ষা করেছিলে! বিরাট সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিলে, ভেবেছিলে যে এইবার সে সুযোগ এসেছে, এবং এখন থেকে সব বদলে যাবে, হ্যাঁ? কিন্তু — মিঃ হোয়াইটের দিকে কর্তা আবার তাঁর তর্জনী তুলে ধরে বললেন — তুমি ভুল করেছো, বাইরাম। তোমার কোনো সুযোগ আসে নি। কোনো দিন আসবেও না। তোমার মতো মানুষদের জন্য তা কখনো আসবে না। এখন বেরিয়ে যাও! বিদায় হও।

মিঃ হোয়াইট বেরিয়ে গেলেন। এই ছিলেন, এই নেই। তার প্রস্থানের কোনো আওয়াজ পর্যন্ত হলো না। মিঃ বাইরাম বি. হোয়াইট নামে যে শূন্য স্থানটি এতক্ষণ অধিকৃত হয়েছিলো সেই শূন্য স্থানটি এখন শূন্য পড়ে রইলো, ব্যস।

আমি কর্তাকে বললাম, আচ্ছা করে সাধ মিটিয়ে নিলেন।

কর্তা বললেন, অসহ্য! এই লোকগুলির চোখের মধ্যে একটা কিছু আছে যা তোমাকে দিয়ে এই জাতীয় আচরণ করিয়ে নেয়। এই যে, এই লোকটা, তুমি দেখতে পাচ্ছো যে এই লোকটা থুতু চাটবে, এবং তাই তোমাকে ওরকম ব্যবহারে প্ররোচিত করে।

হ্যাঁ। একটা লম্বা পোকার মতো। গা ঘিন ঘিন করে।

কর্তা বিরস কণ্ঠে বললেন, আমি ওকে কতোগুলো সুযোগ দিয়েছিলাম! আমি ওকে যা বলতে বলেছিলাম সে তা না বলতে পারতো। আমার নির্দেশ সে না শুনতে পারতো। সে সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যেতে পারতো। সে ওই পদত্যাগপত্রের উপর একটা তারিখ বসাতে পারতো, তারিখ বসিয়ে আমার হাতে দিতে পারতো। সে অনেক কিছুই করতে পারতো। কিন্তু করলো কি? না। বাইরাম এসব কিছুই করলেন না। একটা কুকুর যেমন লাথি খাবার আগে পর্যন্ত তোমার পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ মিট মিট করতে থাকে তিনি সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন, আর দোহাই ঈশ্বরের, তোমার মনে হয় যে ওই লাথিটা যদি তুমি না মারো তাহলে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করবে। তুমি ওই কাজটা করো, কারণ তার মাধ্যমে তুমি বাইরামকেই তার স্বভাবের পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করছো।

আমি বললাম, যদিও এটা আমার কোনো ব্যাপার নয়, তবু জিজ্ঞাসা করছি, হয়েছেটা কি?

তুমি কাগজ পড়ো নি?

না, আমি তো ছুটি কাটাচ্ছিলাম।

স্যাডি তোমাকে কিছু বলে নি?

আমি তো সবে এসে পৌঁছুলাম।

বাইরাম বড়ো লোক হবার একটা সুন্দর ফন্দী এঁটেছিলো। স্থাবর সম্পত্তির কারবারী একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অগ্রিম যোগাযোগ করে সে ভূমিকর বিভাগের হ্যামিলের সাথে একটা ভাগাভাগির ব্যবস্থা করে নেয়। সব ছিমছাম। শুধু সব টাকাটা ওরা নিজেরা খেতে চেয়েছিলো, এবং এর ফলে ভাগ না পাওয়া কোনো একজন খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে আইনসভায় ম্যাকমারফির দলবলের কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয়। আমি যদি একবার জানতে পারি কে এই কাজটা করেছে তা হলে —

কে কোন্ কাজটা করেছে?

যে ম্যাকমারফির লোকের কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে। ওর উচিত ছিলো ডাফিকে জানানো। সবাই জানে ডাফি এসব অভিযোগের ফয়সালা করে। এখন আমাদের ইমপীচমেন্টের একটা সুরাহা করতে হবে।

কার ইমপীচমেন্টের?

বাইরামের।

হ্যামিলের কি হয়েছে?

কিউবায় ভেগেছে। ওখানে ভালো আবহাওয়া, তাই। যা খবর পাচ্ছি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে খুব দ্রুত ও সট্‌কে পড়েছে। ডাফি আজ সকালে খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলো, কিন্তু ততক্ষণে ও ট্রেনে চেপে বসেছে। কিন্তু আমাদের এখন ওই ইমপীচমেন্টের ব্যাপারটা সামাল দিতে হবে।

আমার মনে হয় না ওরা সেটাকে পাশ করাতে পারবে।

সে চেষ্টাই করতে দেয়া হবে না। এধরনের একটা কিছু শুরু হতে দিলে কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। ওদের এখনই ঠাণ্ডা করতে হবে। বিগড়ানো, না-খোশ, শ্রমিক এলাকার নেতা জাতীয় যতো লোকজন আছে খুঁজে খুঁজে তাদের এখানে নিয়ে আসতে বলেছি। স্যাডি সারাক্ষণ ফোনে খবর নিচ্ছে। কিছু পাখি গা ঢাকা দিয়েছে, খবরটা নিশ্চয়ই এর মধ্যে চাউর হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আমার লোকেরা ওদের খুঁজে বার করতে শুরু করেছে। বিকালের দিকেই তিনটাকে ধরে এনেছিলো। আচ্ছা করে রগড়ে দেয়া হয়েছে ওদের। সব তৈরি করাই ছিলো, সবার সব অপকীর্তির তালিকা ছিলো আমাদের হাতে। জেফ হপকিন্স যখন টের পেলো যে ওর বাবা যে ট্যালিমাজে তার ছোট্ট ওষুধের দোকান থেকে লুকিয়ে মদ

বিক্রী করেন আর জাল প্রেস্ক্রিপশান তৈরি করে তার হিসাব মেলান আমরা এখবরটা জানি, তখন যদি তুমি তার মুখের চেহারাটা একবার দেখতে! কিংবা মার্টেন — ও যখন টের পেলো যে ওকালুসার ব্যাংকের কাছে ওর বাড়ির মর্টগেজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে আর মাত্র সপ্তাহ পাঁচেক বাকী আছে, এর মধ্যে ওকে টাকা যোগাড় করতেই হবে এখবরটা আমরা জানি, তখন যদি তুমি তার অবস্থা দেখতে! তো — কর্তা পরমানন্দে মোজার ভেতরে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলদু'টো নাচালেন, তারপর বললেন, তো আমি ওদের শান্ত করেছি। দাওয়াইটা পুরনো, কিন্তু এখনো ভারী কাজ দেয়।

আমাকে কি করতে হবে?

কালই হারমোভিলে চলে যাও, দেখ সিম হারমনের মাথায় কিছু বুদ্ধি ঢোকাতে পারো নাকি।

ব্যস, এই?

কর্তা জবাব দেবার আগেই দরজার মুখে স্যাডির মাথা দেখা গেলো। ও জানালো যে স্টেটের সুদূর উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধি উইদারস্পুনকে নিয়ে আসা হয়েছে।

কর্তা বললেন, ওকে ওই দিকের ঘরে রেখে দাও। বসে বসে সেদ্ধ হোক কিছুক্ষণ।

স্যাডি দরজার মুখ থেকে সরে যেতেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন। হ্যাঁ, তবে যাবার আগে এ্যাল কোয়েল সম্পর্কে যতো তথ্য যোগাড় করতে পারো সব একত্র করে আমাকে দিয়ে যেও। আমার লোকেরা ওকে এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন পাকড়াও করে আনবে তখন আমি ভালো রকম তৈরি থাকতে চাই।

ঠিক আছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

কর্তা আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন কিছু একটা বলবেন। আমার মনে হলো তিনি যেন কথাটা বলার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছেন। আমি আমার চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম, অপেক্ষা করে থাকলাম। কিন্তু তখুনি স্যাডি আবার মাথা ঢুকিয়ে কর্তাকে লক্ষ্য করে বললো, মিঃ মিলার এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। স্যাডির ভাব দেখে মনে হলো না যে সে খুব একটা সুখবর দিচ্ছে।

কর্তা বললেন, পাঠিয়ে দাও।

আমি বুঝলাম যে এক মুহূর্ত আগে তিনি আমাকে যে কথাই বলতে চেয়ে থাকুন না কেন এখন আর সেটা তার মাথার মধ্যে নেই, এখন সেখানে অন্য জিনিস। এখন

সেখানে বিরাজমান হার্ভার্ড ল' স্কুল, লাফায়েত এস্কাড্রিল, ক্রয় দ্য গ্যুয়ের-খ্যাত মিঃ হিউ মিলার, নিষ্কলঙ্ক হাত ও নির্মল হৃদয়ের অধিকারী, সরকারের এটর্নী জেনারেল।

আমি বললাম, উনি খুশি হবেন না।

না, তা হবেন না।

তারপরই দোরগোড়ায় ওঁকে দেখা গেলো। লম্বা, শীর্ণ , ঈষৎ ন্যুব্জ একটি মানুষ, মুখের রঙ তামাটে, অবিন্যস্ত কালো চুল, কালো ভ্রূযুগলের নিচে বিষণ্ন চোখ, পারিপাট্যহীন নীল সার্জের কোট থেকে একটা ফাই বেটা কাপ্পা চাবি ঝুলছে। দরজার মুখে এক মুহূর্ত থেমে পড়ে তিনি তাঁর বিষণ্ন চোখদু'টি মিট মিট করলেন, যেন হঠাৎ আলোর মধ্য থেকে অন্ধকারে এসে পড়েছেন, কিংবা বেখেয়ালে ভুল ঘরে ঢুকেছেন। অবশ্য তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিলো যে তিনি ঠিকই ভুল ঘরে প্রবেশ করেছেন।

কর্তা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মোজাপরা পায়ে এগিয়ে গিয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন, হ্যালো, হিউ।

হিউ মিলার করমর্দন করে ঘরের ভেতরে আসতেই আমি বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। তারপরই কর্তার দিকে আমার চোখ পড়লো। তিনি দ্রুত মাথা নেড়ে আমাকে চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অতএব আমিও হিউ মিলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার আমার চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

কর্তা হিউ মিলারকে বললেন, বসো।

হিউ মিলার তাঁর স্বাভাবিক ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, না, ধন্যবাদ, উইলি। তুমি বসো, উইলি।

কর্তা নিজের চেয়ারে বসে তাঁর পা আবার সামনের চেয়ারে তুলে দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার?

হিউ মিলার বললেন, আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পেরেছো।

তা বোধহয় পেরেছি।

তুমি হোয়াইটের চামড়া বাঁচিয়ে দিচ্ছো, তাই না?

কর্তা বললেন, হোয়াইটের চামড়া নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমি অন্য কিছু বাঁচানো নিয়ে ব্যস্ত।

ও দোষী।

কর্তা প্রফুল্ল চিত্তে সায় দিলেন, দোষী মানে? আপাদমস্তক দোষী। অবশ্য যদি বাইরাম বি. হোয়াইটের মতো কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে দোষী-নির্দোষী কথার

প্রাসঙ্গিকতা থাকে।

হিউ মিলার আবার বললেন, ও দোষী।

ওহ্! তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন বাইরাম একটা মানুষ। ও তো একটা বস্তু। স্প্রিঙ্গ ভেঙ্গে যাবার ফলে একটা এ্যাডিং মেশিন যদি ভুল করে তাহলে তো তুমি সেটার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করো না, তুমি সেটা সারিয়ে নাও। তো, আমি বাইরামকে সারিয়ে নিয়েছি। এমনভাবে সারিয়ে নিয়েছি যে তুমি সেটা কল্পনাও করতে পারবে না। আরে বাবা, বাইরাম হলো কাজে লাগাবার একটা জিনিস, আর এখন থেকে সে সত্যিই খুব কাজে লাগবে।

বুঝলাম। শুনতে ভালোই শোনাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা তো এই দাঁড়ালো যে তুমি হোয়াইটের চামড়া বাঁচিয়ে দিচ্ছো।

কর্তা বললেন, জাহান্নামে যাক হোয়াইটের চামড়া! আমি বাঁচাচ্ছি অন্য কিছু। আইনসভায় ম্যাকমারফির লোকগুলি যদি একবার বুঝতে পারে যে ওরা এরকম একটা কাজ করতে সক্ষম তা হলে কতদূর পর্যন্ত যে যাবে কেউ বলতে পারে না। তুমি কি মনে করো এযাবৎ যেসব কাজ এখানে হয়েছে তার একটাতেও ওরা খুশি হয়েছে? এক্সট্র্যাকশান ট্যাক্স? খাস জমির উপর রয়ালটির হার বৃদ্ধি? ইনকাম ট্যাক্স? সড়ক নির্মাণ কর্মসূচী? জনস্বাস্থ্য বিল?

হিউ মিলার স্বীকার করলেন, না, তা হয় নি। ম্যাকমারফির পেছনে যে লোকগুলি আছে ওরা খুশি হয় নি।

তুমি খুশি হয়েছো?

হিউ মিলার বললেন, হ্যাঁ। আমি হয়েছি। তবে এখানকার সবই যে আমার ভালো লাগে সেকথা বলতে পারতো না।

কর্তা হেসে বললেন, তোমার মুশ্কিল কোথায়, জানো হিউ? তুমি হলে একজন আইনবিদ। খুবই দক্ষ একজন আইনবিদ।

হিউ মিলার বললেন, তুমিও একজন আইনবিদ।

কর্তা ওঁকে শুধরে দিলেন, না, আমি আইনবিদ নই। আমি কিন্তু আইন জানি। সত্যি বলতে কি, অনেকখানিই জানি। আর আইন ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আমি প্রচুর টাকাও করেছি। কিন্তু আমি আইনবিদ নই। সেজন্যই আইনের চেহারাটা কিরকম সেটা আমি দেখতে পাই। একটা বড় বিছানায় রয়েছে একটা ছোট কম্বল, খাটে রয়েছে তিনজন লোক, আর রাতটা খুব ঠাণ্ডা — আইন হলো এই রকম। যতোই টানাটানি করো না কেন, সুব্যবস্থা করার মতো অতোখানি কম্বল কখনোই পাওয়া যায় না, এবং কোনো একজনকে প্রায় নিউমোনিয়ার শিকার হতে হয়। আরে, আইন

হলো বাড়ন্ত ছেলের জন্য গত বছরে কেনা প্যান্টের মতো, আর সময়টা হলো এই বছর, তাই প্যান্ট ফেটে গিয়ে গায়ে বাতাস লাগার ব্যবস্থা হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান মানবসমাজের জন্য আইন সর্বদাই বড্ড খাটো, বড্ড আঁটো। এই অবস্থায় তুমি সর্বোত্তম যা করতে পারো তা হলো কাজ করে যাওয়া, তারপর তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আইন তৈরি করা, এবং যতদিনে সে আইন গ্রন্থভুক্ত হবে ততদিনে তুমি দেখবে যে তোমাকে আবার ভিন্ন রকম কিছু করতে হচ্ছে। তুমি কি মনে করো আমি এপর্যন্ত যেসব কাজ করেছি তার অর্ধেকও এই স্টেটের গঠনতন্ত্রে সহজ, সরল ও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে?

হিউ মিলার বলতে শুরু করেছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট তো রুলিং দিয়েছে —

হ্যাঁ, দিয়েছে, কারণ ওই রুলিং দেবার জন্য তাদের ওখানে বসানো হয়েছে, আর কি কি করা দরকার সেটাও ওরা বুঝেছে। অর্ধেক জিনিসই তো গঠনতন্ত্রে ছিলো না, কিন্তু এখন? এখন সেগুলি গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কেমন করে এটা হলো? কেউ একজন কাজটা করেছে, তাই।

হিউ মিলারের মুখ লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো। তিনি একটু মাথা নাড়লেন, প্রায় বোঝাই গেলো না, পাশ দিয়ে মাছি উড়ে যাবার সময় কোনো ধীরগতি প্রাণী যেমন করে। তারপর বললেন, গঠনতন্ত্রে এমন কিছু নেই যার বলে বাইরাম বি. হোয়াইট গুরুতর অপরাধ করেও অব্যাহতি পেতে পারে।

কর্তা কোমল গলায় বললেন, হিউ, তুমি কেন বুঝতে পারছো না যে বাইরাম কোনো ব্যাপারই নয়? বর্তমান পরিস্থিতিতে ওর প্রশ্নটা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। ওদের উদ্দেশ্য তো প্রশাসনকে ধ্বংস করা। বাইরামকে নিয়ে তারা একটুও ভাবছে না। শুধু একজন লোক টাকা করছে, ফায়দা লুটছে, ওরা কিছু করতে পারছে না, এটা ভাবতেই খারাপ লাগে, মানুষের স্বভাবই তাই, এটুকু ছাড়া বাইরামকে নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। ওদের উদ্দেশ্য শুধু একটাই। এই প্রশাসন যা যা করেছে সব ওরা নস্যাত করে দিতে চায়। ওদের প্রতিহত করার এখনই সময়। আর যখন তুমি কিছু করতে শুরু করো — কর্তা এবার নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন, পাশের মোটা গদীমোড়া হাতার উপর নিজের হাত দুটি রেখে, হিউ মিলারের দিকে মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে বললেন, যখন তুমি একটা কিছু করতে শুরু করো তখন তোমার যা আছে তাই তোমাকে ব্যবহার করতে হয়। তখন বাইরাম আর ডাফির মতো মানুষ, আর আইনসভার ওই জঘন্য নোংরা লোকগুলোকে তোমার কাজে লাগাতে হয়। কাদামাটি ছাড়া ইঁট বানানো যায় না, আর বেশির ভাগ সময়ই হাতে ওঠে গোয়ালঘরের পচা পুরানো কাদামাটি। আর যদি ভেবে থাকো যে ভিন্ন কোনোভাবে

একাজ করা যায় তাহলে তুমি একটা পাগল ছাড়া কিছু নও।

হিউ মিলার তাঁর কাঁধ একটু সোজা করলেন, তারপর কর্তার মাথার উপর দিয়ে পেছনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসলেন, আমি এটর্নী জেনারেলের পদে ইস্তফা দিচ্ছি। কাল সকালেই তুমি পত্রবাহকের হাতে আমার লিখিত পদত্যাগপত্র পাবে।

কর্তা মৃদু কোমল গলায় বললেন, কাজটা করতে তুমি অনেক সময় নিলে। অনেক সময় নিলে, হিউ। তোমার এতো সময় লাগলো কেন, হিউ?

হিউ মিলার কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু দেয়াল থেকে সরিয়ে কর্তার মুখের উপর চোখ রাখলেন।

কর্তা বললেন , আমি তোমাকে বলছি, হিউ। পনেরো বছর ধরে তুমি তোমার আইনজীবীর আপিসে বসেছিলে। তুমি দেখেছো এই স্টেটের কর্মকর্তারা, কুত্তার বাচ্চাগুলো, একটা কাজও করে নি। গদী আঁকড়ে ধরে শুধু আরাম-আয়েস করেছে, ধনীকে আরো ধনী আর গরীবকে আরো গরীব বানিয়েছে। তারপর আমি এলাম, তোমার হাতে একটা ডাণ্ডা দিয়ে নিচু গলায় বললাম, এই নাও, ওদেরকে একটু শায়েস্তা করবে নাকি? তুমি করলে। সানন্দে, সোৎসাহে। তুলোধুনো করলে কয়েকজনকে, ঘুষখোর নয় ব্যাটাকে জেলে পুরলে। কিন্তু ওদের পেছনে যারা তাদের তুমি স্পর্শও করলে না। আইন দিয়ে এসব কাজ হয় না। এটা করার পথ শুধু একটাই। ওদের পেছনে যে সরকার সেই সরকারকে পাল্টে দিতে হবে, ওদের কাছ থেকে সেটা ছিনিয়ে এনে ওদের শত হস্ত দূরে রাখতে হবে। যেভাবে পারা যায়। তুমি একথাটা তোমার অন্তরের অন্তস্থলে জানো। তুমি তোমার হার্ভার্ডের করযুগল নির্মল রাখতে চাও, কিন্তু তুমি ভেতরে ভেতরে জানো যে আমি সত্য কথা বলছি, তুমি সুবিধাটুকু নিতে চাও, কিন্তু চাও যে অন্য কেউ হাত নোংরা করুক। তুমি জানো যে এখন সরে গিয়ে তুমি তোমার দায়িত্ব এড়াচ্ছো।

কর্তা হিউ মিলারের দিকে আরেকটু ঝুঁকে, তাঁর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে, গলা আরেকটু নামিয়ে বললেন, এই জন্যই তোমার এতটা সময় লেগেছে, হিউ। শুধু এই জন্যই, হিউ।

হিউ মিলার আধ মিনিট ধরে কর্তার উত্তোলিত মাংসল মুখ আর ঈষৎ বেরিয়ে আসা স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মিলারের মুখে দেখা গেলো একটা বিভ্রান্ত ছায়াচ্ছন্ন ভাব, যেন অস্পষ্ট আলোয় কিংবা স্বল্পজানা কোনো বিদেশী ভাষায় লেখা কিছু পড়তে চেষ্টা করছেন তিনি। তারপর তিনি বললেন, আমি মন স্থির করে ফেলেছি।

কর্তা বললেন, আমি সেকথা জানি। আমি জানি যে আমি তোমার মত

পরিবর্তন করাতে পারবো না , হিউ।

তিনি দাঁড়িয়ে প্যান্টটা টেনে একটু উঠিয়ে নিলেন, পেটের কাছে ঈষৎ মেদ জমতে শুরু করলে একটা মানুষকে যা মাঝে মাঝে করতে হয়, তারপর মোজা পায়ে হিউ মিলারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, খুব খারাপ লাগছে। তুমি আর আমি, চমৎকার টিম হয়েছিলো আমাদের। তোমার বুদ্ধি আর আমার শক্তি।

হিউ মিলারের মুখে ক্ষীণ হাসির আভাস ফুটলো।

কর্তা বললেন, কোনো রাগ নেই তো? বলে তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হিউ মিলার হাত মিলালেন।

কর্তা বললেন, যদি সুরা পান ছেড়ে না দাও তা হলে মাঝেমধ্যে এসো, একসঙ্গে বসে দু'এক পাত্র খাওয়া যাবে। কথা দিচ্ছি, রাজনীতি আলোচনা করবো না।

হিউ মিলার বললেন, ঠিক আছে।

তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রায় যখন দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেছেন তখন কর্তা বললেন, হিউ।

মিলার থেমে ঘুরে তাকালেন।

কর্তা আধা-কৌতুক মেশানো বিষন্ন গলায় বললেন, হিউ, তুমি আমাকে কুত্তার বাচ্চাগুলোর মধ্যে একা ছেড়ে চলে যাচ্ছো।

হিউ মিলারের মুখে বিব্রত, চাপা একটু হাসি ফুটে উঠলো। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আহ্, উইলি — কিন্তু কি যে বলতে চেয়েছিলেন তা আর উচ্চারিত হলো না, তাঁর কণ্ঠস্বর অস্ফুট হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলো, আর তারপর হার্ভার্ড ল' স্কুল, লাফায়েত এস্কড্রিল ও ক্রয় দ্য গ্যুয়ের-খ্যাত, নির্মল হাত ও নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের অধিকারী, হিউ মিলার আমাদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

কর্তা খাটের পায়ের দিকে বসে তাঁর বাঁ পা ডান হাঁটুর উপর তুলে একজন চাষী যেভাবে রাতের বেলা তার জুতো খুলে পা চুলকোয় সেভাবে নিজের বাঁ পা চুলকোতে চুলকোতে বন্ধ দরজার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, কুত্তার বাচ্চাগুলো! দরজার দিকে চোখ রেখেই তিনি তার পা টা মেঝের উপর ধপ করে ছেড়ে দিলেন।

আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম। এখান থেকে বেরিয়ে, আমার হোটেলে গিয়ে, একটু ঘুমুবার উদ্দেশ্যে এটা ছিলো আমার তৃতীয় প্রয়াস। কর্তা সারারাত জেগে বসে থাকতে পারতেন, রাতের পর রাত, তাঁর মুখ দেখে কেউ তা বুঝতেও পারতো না, কিন্তু তাঁর সহযোগীদের অবস্থা কাহিল হয়ে যেতো। আমি ধীরে ধীরে দরজার দিকে পা বাড়ালাম, কিন্তু তখুনি কর্তা আমার দিকে তাকালেন, এবং আমি বুঝলাম যে

একটা কিছু আসছে এবার। তাই আমি দাঁড়িয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, আর তাঁর চোখ আমার মুখকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো, মনে হলো তিনি যেন ডাক্তারের ছুরি দিয়ে আমার মাথার ভেতরকার ধূসর পদার্থের স্বরূপটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন।

তারপর কর্তা বললেন, তোমার কি মনে হয় হোয়াইটকে বাঘের মুখে ছুঁড়ে দেয়াই আমার উচিত ছিলো?

আমি বললাম, আচ্ছা সময় বটে ওই প্রশ্ন তুলবার!

তুমি কি মনে করো তাই করা আমার উচিত ছিলো?

উচিত ভারী মজার একটা শব্দ। আপনি যদি জেতার কথা চিন্তা করেন তাহলে সময়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে। আর আপনি যদি ন্যায়ের কথা চিন্তা করেন তাহলে কেউই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

তুমি কি মনে করো?

আমি বললাম, মনে করাটরা আমার লাইনে পড়ে না। আর আমার পরামর্শ যদি শোনেন, তাহলে আপনিও এসব কথা নিয়ে আর চিন্তা করবেন না, কারণ আপনি কি করতে যাচ্ছেন তা খুব ভালো করেই জানেন। আপনি যা করছেন তাই করবেন।

শান্ত গলায় কর্তা বললেন, লুসি আমাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবছে। কথাটা এমনভাবে বললেন যেন এর মধ্যে আমার মন্তব্যের একটা জবাব আছে।

তাই নাকি! আমি সত্যি ভীষণ অবাক্ হলাম। কারণ আমি ধরে নিয়েছিলাম যে লুসি হলো সেই জাতের নীরবে দুঃখ সহ্য করে যাওয়া মেয়ে, শেষ পর্যন্ত সর্বদা যার বুকে অনুতপ্ত চোখের জল বিসর্জিত হয়। একেবারে শেষ পর্যায়ে। তারপরই আমার চোখ গেলো বন্ধ দরজার দিকে, যার ওপাশে টেলিফোন সামনে নিয়ে বসে আছে স্যাডি বার্ক, যার দাগভর্তি মুখে কয়লার মতো কালো জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ, যার অযত্নে ছাঁটা বন্য কালো আইরিশ চুলের মধ্যে জড়িয়ে থাকা সিগারেটের ধোঁয়াকে মনে হয় পাইনের ঝোপে আটকে পড়া ভোরের কুয়াশার মতো।

কর্তা দরজার দিকে আমার দৃষ্টি লক্ষ করে বললেন, না, সেটা নয়।

আমি বললাম, সাধারণ মানদণ্ডে অবশ্য সেটাই যথেষ্ট কারণ হতে পারতো।

লুসি জানতো না। অন্ততঃ আমার জানা মতে।

ও তো মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষ এসব ব্যাপারের গন্ধ পায়।

কর্তা বললেন, না, সে সব কিছু নয়। লুসি আমাকে বলে দিয়েছিলো যে আমি যদি বাইরাম বি. হোয়াইটকে রক্ষা করি তা হলে সে আমাকে ত্যাগ করবে।

মনে হচ্ছে সবাই আপনার কাজের ভার নিজেদের হাতে তুলে নিতে চেষ্টা

করছে!

জাহান্নামে যাক সব কিছু।

কর্তা সোজা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, হিংস্রভাবে কার্পেটের উপর দিয়ে চার পা এগিয়ে গেলেন, ঝড়ের মতো ঘুরলেন, আবার পা ফেললেন. তাঁকে দেখে, তাঁর ভঙ্গি লক্ষ করে, তাঁর ভারী মাথা নাড়ানোর দিকে তাকিয়ে আমার অনেক দিন আগের কথা মনে পড়লো। রাতের পর রাত কোনো বাজে হোটেল কক্ষে শুয়ে আমি দেয়ালের ওপাশে অন্য একটি ঘরে এই রকম পায়চারির অস্থির চঞ্চল শব্দ শুনেছি, কর্তা যখন শুধু উইলি স্টার্ক, আর উইলি স্টার্কের বক্তৃতা যখন থাকতো হাইস্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া কোনো বালকের মতো অজস্র তথ্য আর সংখ্যা দিয়ে আকীর্ণ।

আমি এখন আবার সেই দৃশ্য দেখছিলাম, সেই তীব্র, টানটান গতি, দেয়ালের ওপাশের ছোট্ট হোটেলের ঘরে যার উপস্থিতি আমি সেদিন প্রচণ্ডভাবে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু এখন তা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখন তা মুক্ত অরণ্যে শিকারের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জাহান্নামে যাক সব কিছু, কর্তা আবার বললেন। ওরা এর কিছু বোঝে না, কিছু জানে না, আর ওদের বোঝাবার কোনো উপায়ও নেই।

তিনি আরো বার দুই ওরকম পদচারণা করলেন, তারপর আবার বললেন, ওরা কিচ্ছু জানে না।

কর্তা আবার তীব্র বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন, হাঁটলেন, থামলেন, মাথাটা সামনে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, তুমি জানো এবার আমি কি করবো? ওদের একবার ঠাণ্ডা করার পর আমি কি করবো তুমি জানো?

আমি বললাম, না, আমি জানি না।

আমি এমন একটা হাসপাতাল বানাবো যা সারা দুনিয়ায় কোথাও নেই। বিশাল, আগাগোড়া ক্রোমিয়ামে মোড়া, ফরমালডিহাইড দিয়ে নিকোনো, তকতকে ঝকঝকে, সূক্ষ্মতম জীবাণুমুক্ত, অকল্পনীয় এক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রত্যেক ঘরে থাকবে খাঁচাভর্তি ক্যানারি পাখি, তারা ইতালীয় গ্র্যান্ড অপেরার সঙ্গীত পরিবেশন করবে, প্রতিটি নার্স হবে এ্যাটলান্টিক সিটির বিউটি কনটেস্টে বিজয়িনীদের মতো অপূর্ব রূপসী, সব বেডপ্যান হবে আঠারো ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি, আর তার গায়ে লাগানো থাকবে সুইস মিউজিক-বক্স, সেখানে দু'রকম মনমাতানো সুরের ব্যবস্থা থাকবে, বোতাম টিপে ব্যবহারকারী যেটা খুশি সেটা শুনতে পারবেন।

আমি বললাম, চমৎকার হবে।

বানাবো আমি। তুমি বিশ্বাস করছো না, কিন্তু আমি সত্যি বানাবো।

আমি বললাম, প্রতিটি কথা বিশ্বাস করি আমি।

আমি তখন ঘুমে মৃতপ্রায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছি, আর ঝাপসা চোখে তাঁকে দেখছি, বিরাট মাথা নেড়ে হিংস্রভাবে হাঁটছেন, তীব্র বেগে ঘুরছেন, আবার হাঁটছেন, চোখের উপর নেমে এসেছে তাঁর চুলের গোছা।

ওই সময় আমার মনে হয়েছিলো লুসি স্টার্ক যে কেন বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে বহু আগেই চলে যায় নি সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। কিছু কিছু জিনিস, যাকে মোটেই গোপনীয় বলা যায় না, লুসি যে কেমন করে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো তা আমার বুদ্ধির অগম্য। ব্যাপারটা যে কখন শুরু হয়েছিলো তা আমি কোনোদিন জানতে পারি নি। কিন্তু আমি যখন জানলাম তখন তা সর্বত্র চাউর হয়ে গেছে। গভর্নর হবার গত আট মাস পর কর্তা একবার একটা ব্যক্তিগত কাজে শিকাগো যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে জশ কঙ্কলিন নামের এক ভদ্রলোক আমাদের শহরের তাবৎ ফূর্তির জায়গাগুলি তাঁকে ঘুরিয়ে দেখান। সে কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তিনি। লম্বা চওড়া, জোয়ান, অকালে চুল পেকে গেছে, লাল মুখ, কালো পুরু জোড়া ভ্রূ, মেয়েদের বক্ষবন্ধনীর মতো আঁটো পোশাক পরা, চলচ্চিত্রের সেটের মতো নানা কায়দায় পূর্ণ তাঁর এ্যাপার্টমেন্ট, আর তাঁর এ্যাড্রেস-বুক হচ্ছে এক ইঞ্চি পুরু। অজস্র মেয়ের ঠিকানা সেখানে লেখা। ঠিক আসল জিনিস ছিলেন না, কিন্তু নিঃসন্দেহে ঐ আসলের একটা খুব ভালো ইমিটেশন ছিলেন, আর সেটা অনেক সময় আসলের চাইতেও ভালো হয়, কারণ আসল জিনিস শিথিল ও সহজ হতে পারে, নকলের পক্ষে তা সম্ভব হয় না, কারণ তাকে সর্বদাই আসলের চাইতেও এক ধাপ বেশি আসল হবার চেষ্টায় সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়, এবং তার জন্য টাকার কথা ভাবলে তার চলে না। ভদ্রলোক আমাদের একটা নৈশ ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের জায়গায় কর্তৃপক্ষ একেবারে সত্যিকার বরফের মেঝে তৈরি ক'রে, রূপালী ধরাচূড়া আর রূপালী কাঁচুলী পরিহিতা, এক দঙ্গল "নর্ডিক পরী" উপস্থিত করিয়ে ছিলেন, ওরা সত্যিকার স্কেট পায়ে বরফের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে নাচতে নাচতে একটা মোহময় পরিবেশ গড়ে তুলেছিলো। বাজনা বাজছে, আলোর কারসাজিতে অরোরা বরিয়লিস সৃষ্ট হয়েছে, সেই নীলাভ দ্যুতিতে সাদা হাঁটু ঝলসে উঠছে, সাদা বাহু সাপের মতো এঁকেবেঁকে নড়ছে, নিরাভরণ পিঠের উপর মেরুদণ্ডের দুপাশে কঠিন-কোমল পেশী আর মাংসের ছোট্ট যুগল-স্তম্ভ চমৎকার পারস্পরিক গতিতে তরঙ্গায়িত হয়ে দুলছে, আর রূপালী কাঁচুলীর নিচে যে জিনিস তা সঙ্গীতের তালে তালে থরথর করে কাঁপছে, আর দীর্ঘ

বন্ধনমুক্ত নিষ্কলঙ্ক রূপালী সুইডিশ চুল চাবুকের মতো বাতাস কেটে কেটে ভাসছে, উড়ছে।

মেসন সিটির কাঁচা মানুষটা, যে নাকি ঘোড়ার জলের চৌবাচ্চায় জমে থাকা হাল্কা বরফের স্তর ছাড়া জীবনে অন্য কোনো বরফ দেখে নি, ওই দৃশ্য দেখে দিশেহারা হয়ে গেলো। অকৃত্রিম মুগ্ধ-বিস্ময়ে সে বলে উঠলো, যীসাস্! তারপর আবারও বললো, যীসাস্! আর ঢোঁক গিলতে লাগলো যেন গলার মধ্যে শক্ত ভুট্টার রুটি আটকে গেছে।

অনুষ্ঠান শেষ হলে জস কঙ্কলিন সবিনয়ে জানতে চেয়েছিলো, কেমন লাগলো, গভর্নর?

গভর্নর জবাব দিয়েছিলেন, ওরা স্কেট করতে জানে বটে! সত্যি!

এরপর সুইডিশ-কেশবতী একটি পরী ড্রেসিং-রুম থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের টেবিলে বসলো। এখন আর পায়ে স্কেট নেই, তার নগ্ন কাঁধের উপর একটা রূপালী কাপড় ফেলা। জস কঙ্কলিনের বন্ধু সে, আর তার চুলটা যদি এখানকার দোকানের না হয়ে সুইডেনের হতো তাহলে সে সত্যিই চমৎকার একটি বন্ধু হতো। তো, এই অনুষ্ঠানে এই মেয়ের এক বান্ধবী ছিলো। মেয়েটি তাকে ডেকে আনলো আর সে দ্রুত গভর্নরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললো। এবং এর পর থেকে যে ক'টা দিন আমরা শিকাগোতে ছিলাম গভর্নর আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিলেন, শুধু প্রতি রাতে যখন স্কেটিং হতো তখন আমি তাঁকে দেখতে পেতাম। তখন তিনি তাঁর আসনে বসে মুগ্ধ হয়ে নৃত্যরতা পরীদের দেখতেন, তাঁর গলায় যেন আটকে থাকতো শক্ত ভুট্টার রুটি। তারপর অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি, 'গুড নাইট, জ্যাক' বলে, জস কঙ্কলিনের বন্ধুর বন্ধুকে নিয়ে, রাত্রির বুকে উধাও হয়ে যেতেন।

লুসি এই স্কেটিং ইতিবৃত্তের কথা জানতো কিনা আমি বলতে পারবো না। তবে স্যাডি জেনেছিলো। খবরাখবর পাবার জন্য স্যাডির এমন কিছু পথ ছিলো যা গৃহিণী গোত্রের মহিলাদের জন্য ছিলো রুদ্ধ। কর্তা আর আমি রাজধানীতে ফিরবার পর, তরমুজের বুকে থেঁৎলে যাওয়া কোমল মিষ্টি দাগের মতো নর্ডিক পরীরা যখন একটা মধুর স্মৃতি মাত্র, তখন স্যাডি প্রচণ্ড হৈ চৈ শুরু করে দিলো। কর্তা আর আমি সবে ফিরে এসেছি, সেদিন ভোরের কথা। আমি বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে রিসেপশানিস্ট মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিলাম, গত কয়েক দিনের খবরাখবর নিচ্ছিলাম, এমন সময় কর্তার অফিস ঘরের ভেতর থেকে গম্‌গম্ শব্দ ভেসে এলো। আমি ঘরের ভেতর একটা গোলমালের আভাস পেলাম, মনে হলো একজন কেউ টেবিলের উপর

সশব্দে একটা বই ছুঁড়ে মারলো, তারপরই আমি শুনলাম স্যাডির গলা। আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, হচ্ছেটা কি?

মেয়েটি বললো, তার আগে তুমি আমাকে বলো শিকাগোতে কি হয়েছিলো?

আমি সরলভাবে বললাম, ওহ্, ওই ব্যাপার!

মেয়েটি আমাকে ভেঙিয়ে বলে উঠলো, ওহ্, ওই ব্যাপার! আর সেই ব্যাপার কী রকম!

আমি আমার ছোট্ট ঘরের দরজার কাছে ফিরে গেলাম। বাইরের ঘরের ভেতর দিয়ে সেখানে যেতে হয়। আমি আমার ঘরে, দরজার ঠিক ওপাশে, আমার দরজা তখনো হাট করে খোলা, ঠিক ওই মুহূর্তে কর্তার ঘর থেকে স্যাডি ছিটকে বেরিয়ে এলো, মনে হলো যেন একটা বিরাট সিংহী এরিনার ওপাশের খাঁচা থেকে ছুটে আসছে, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে নিবেদিতচিত্ত খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষটির উপর। তার চুল নিজস্ব সুস্পষ্ট প্রাণশক্তিতে হাওয়ায় উড়ছে, তার দাগভর্তি মুখ খড়িমাটির মতো সাদা, যেন ফুটকিপূর্ণ একটা প্ল্যাস্টার, এই ধরুন, মেডুসার একটা প্ল্যাস্টারের মুখোশের মতো, যাকে কোনো বালক তার বন্দুক দিয়ে লক্ষ্যভেদের অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু ওই প্ল্যাস্টারের মুখোশের ঠিক মাঝখানে এমন একটা ঘটনা ছিলো যার সঙ্গে প্ল্যাস্টারের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিলো না, সেটা হলো তার চোখ, একটা যুগ্ম–বিপর্যয়, একটা কৃষ্ণ বিস্ফোরণ, একটা দাবাগ্নি। এমনভাবে সে ফুঁসছিলো যে মনে হচ্ছিলো জোড়গুলি বুঝি সব খুলে খুলে যাবে, মেঝের উপর দিয়ে তার ছুটন্ত গতি দেখে মনে হচ্ছিলো এখনই বুঝি পট পট করে তার স্কার্ট ফেঁসে যাবার শব্দ শুনতে পাবেন আপনি।

তারপরই ওর চোখ পড়ে আমার উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে ওই একই ভঙ্গিতে, কিন্তু গতি পরিবর্তন করে, আমার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, কুত্তার বাচ্চা!

আমি বললাম, আমাকে দুষবার দরকার নেই।

তীব্র দৃষ্টি হেনে সে আবার বললো, কুত্তার বাচ্চা! আমি ওকে খুন করবো। এই আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি আমি ওকে খুন করে ফেলবো।

আমি বললাম, তুমি একটা জিনিসের বড়ো বেশি দাম ধরে বসেছিলে।

আমি ওর সর্বনাশ করে ছাড়বো। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি ওকে এই স্টেট থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়াবো। আমি ওর জন্য কি না করেছি, আর তারপর আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। শোনো — স্যাডি তার শক্ত দুই হাতে আমার কোটের কলার ধরে ঝাঁকুনি দিলো। (ওর হাত ছিলো পুরুষের হাতের মতো, চৌকো

চৌকো, বলিষ্ঠ আর শক্ত) সে আবার বললো, শোনো —

আমি বিরস কণ্ঠে আপত্তি জানালাম, আমার দম বন্ধ করার তো দরকার নেই। আর আমি শুনতে চাই না। আমি ইতোমধ্যেই অনেক বেশি জেনে ফেলেছি।

আমি কিন্তু কথাটা ঠাট্টা করে বলি নি। সত্যিই আমি কিছু শুনতে চাই নি। আমি শুনতে অনিচ্ছুক, দুনিয়ায় ওই জাতীয় জিনিসের অন্ত ছিলো না।

সে আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, শোনো, ওর আজকের জায়গায় কে ওকে তুলে এনেছে? কার জন্য ও আজ গভর্নর? ও যখন বছরের সেরা ওঁচা জঞ্জাল তখন কে তাকে বিখ্যাত বানিয়েছিলো? যেন ও হেরে না যায় সে জন্য কে তাকে ধাপে ধাপে সাহায্য করেছিলো?

মনে হচ্ছে তোমার ইচ্ছা এই যে আমি বলি তুমিই এসব করেছো।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এবং সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর ও কিনা আমার চোখে ধুলো দিয়ে, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে —

আমি ওর হাতের মুঠি থেকে আমার কোটের কলার ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, না, ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে লুসির সঙ্গে, কাজেই তোমার সঙ্গে যা করেছে তার জন্য তোমাকে ভিন্ন গাণিতিক সংজ্ঞা খুঁজে বার করতে হবে। তবে এই জাতীয় অঙ্কের ক্ষেত্রে গুণ করতে হয়, নাকি ভাগ করতে হয়, সেটা আমার জানা নেই।

ঠোঁট বাঁকিয়ে সে ফেটে পড়লো, লুসি! লুসি তো একটা বোকার হদ্দ। লুসির কথামতো চললে ওকে আজও মেসন সিটিতে থেকে শুয়োরের খবরদারি করতে হতো, আর সেকথা ও ব্যাটা জানে। লুসি ওর জন্য কি করতে পারতো তা ও জানে। যদি লুসির কথা ও শুনতো। লুসির তো সুযোগ ছিলো, লুসি —

দমের অভাবে তাকে থামতে হলো, কিন্তু নিঃশ্বাস নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করার সময়টুকুতেও আপনি তার মাথার মধ্যে কথাগুলি আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখতে পাচ্ছিলেন।

লুসি — নামটা উচ্চারণ করেই সে থামলো, কিন্তু তার সুরের মধ্যেই লুসি সম্পর্কে তার সমস্ত মন্তব্য স্পষ্ট ফুটে উঠেছিলো। লুসি, ছোট্ট একটা মফস্বলের মেয়ে, গেঁয়ো এক ব্যাপ্টিস্ট কলেজে যে লেখাপড়া করেছে, যেখানে সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যে মেসন কাউন্টি স্কুলে সোনালী–সাদা চুলের ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়িয়েছে, উইলি স্টার্ককে বিয়ে করেছে, তাকে একটি সন্তান উপহার দিয়েছে, আর যে তার সুযোগ হারিয়েছে।

তারপর স্যাডি হঠাৎ শান্ত হয়ে কঠোর বাস্তব একটা সত্য উচ্চারণের ভঙ্গিতে

বলে উঠলো, ওকে একটু সময় দাও, ও ঠিক লুসির কাছ থেকে কেটে পড়বে, ছেড়ে দেবে লুসিকে, হারামজাদা!

আমি কথাটার যৌক্তিকতা উপলব্ধি না করে পারলাম না, তাই বললাম, তো সেটা তোমার জানার কথা। আর তখুনি ও ঠাস করে আমার গালে একটা চড় কষালো। তো যখনই আপনি এসব ব্যাপারে নিজেকে জড়ান, তা পাবলিকই হোক কিংবা প্রাইভেটই হোক, তখনই এটা আপনার প্রাপ্য হয়ে ওঠে।

সে আবার জ্বলে উঠতে যাচ্ছিলো। আমি তার আগেই গালে হাত বুলাতে বুলাতে তপ্ত কটাহের কাছ থেকে এক পা পিছনে হটে এসে বললাম, ভুল লোককে মারলে তুমি। আমি এই নাটকের নায়ক নই।

জ্বলে ওঠার পরিবর্তে স্যাডি অকস্মাৎ সম্পূর্ণ মিইয়ে গেলো। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। ঢোলা পোশাকের নিচে তার শরীর যেন অসাড় ও ভারী হয়ে ঝুলে পড়েছে। আমি তার দু' চোখের ভেতরের কোণার দিকে দুটি অশ্রুবিন্দু খুব ধীরে ধীরে জমে উঠতে দেখলাম, বিন্দু দুটি ফুলে উঠলো, তারপর একটা যান্ত্রিক খেলনার সূক্ষ্ম নিশ্চয়তা নিয়ে তার ঈষৎ খাঁদা নাকের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো, তারপর তার গাঢ় লিপস্টিক-রঞ্জিত ঠোঁটের প্রান্তদেশে পৌঁছে ছড়িয়ে পড়লো সেখানে। আমি দেখলাম তার জিভ অল্প একটু বেরিয়ে এলো, খুব সূক্ষ্ম পরিশীলিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটটা স্পর্শ করলো, যেন সে লবণের স্বাদটা পরীক্ষা করে দেখছে।

এই গোটা সময়টা সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, যেন যথেষ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে সে তার মধ্যে একটা কিছুর উত্তর খুঁজে পাবে।

তারপর সে আমার পাশ দিয়ে সোজা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলো। ওখানে একটা আয়না ঝুলছিলো। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ আয়নার একেবারে কাছে নিয়ে তার মুখটা ধীরে ধীরে এধার থেকে ওধারে নাড়ালো। আয়নার মধ্যে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু তার মাথার পেছন দিকটা আমার চোখে পড়লো।

সুদূর এবং আবেগহীন গলায় সে জিজ্ঞাসা করলো, ও দেখতে কেমন ছিলো?

কে? আমি সত্যি সরল মনে প্রশ্ন করেছিলাম।

শিকাগোতে।

ওই ধরনের শস্তা, বাজে মেয়েরা যেমন হয় তেমন। মাথায় নকল সুইডিশ চুল, পায়ে স্কেট, আর ওই দুই-এর মাঝখানে প্রায় কিছুই না। আবেগহীন, সুদূর কণ্ঠস্বরটি আবার জানতে চাইলো, ও কি খুব সুন্দরী ছিলো?

যাচ্ছেলে! কাল ওর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে আমি সত্যি ওকে চিনতে

পারবো না।

কণ্ঠস্বরটি আবার বললো, ও কি খুব সুন্দর দেখতে ছিলো?

বিরক্ত গলায় আমি বললাম, তা আমি কেমন করে জানবো? যেভাবে সে তার জীবিকার ব্যবস্থা করে তাতে মানুষের ওর মুখের দিকে তাকাবার বিশেষ দরকার পড়ে না।

ও কি খুব সুন্দরী ছিলো?

দোহাই তোমার, বাদ দাও ওকথা।

ও ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে অগ্রসর হলো, তার দুটি হাত দু'পাশে চিবুকের সমান উঁচু করে তোলা, আঙ্গুলগুলি ঈষৎ বাঁকানো, পরস্পরের সঙ্গে লাগানো, কিন্তু তখনো তার হাত তার মুখ স্পর্শ করে নি। সে আমার খুব কাছে এসে থামলো। বললো, বাদ দেবো? যেন এই মাত্র সে আমার কথাটা শুনলো।

তারপর দুটি হাত অল্প একটু তুলে তার দাগভর্তি প্ল্যাস্টারের মুখোশটা খুব হাল্কাভাবে স্পর্শ করলো, যেন জায়গাটা ফোলা, যন্ত্রণাকাতর। তারপর সে আদেশ করলো, দেখো!

সে তার মুখটা আমার সামনে ধরে রাখলো। হিংস্রভাবে সে বললো, দেখো! মাংসের গায়ে সে জোরে খোঁচা দিলো। হ্যাঁ, মাংসেরই মুখ ওটা, মোটেই প্ল্যাস্টারের নয়।

দেখো ভালো করে। আমরা একটা জঘন্য ঝুপড়িতে থাকতাম, আমরা দু'জন, আমি আর আমার ভাই, দুটি শিশু — বসন্ত হয় আমাদের — আমার বাবা ছিলেন এক হতভাগা অকর্মণ্য মাতাল, কারো কাছ থেকে চেয়েচিন্তে, ভিক্ষা করে, সামান্য পয়সা হাতে পেলেই সেটা নিয়ে শুঁড়িখানায় ছুটতেন, মদ গিলে চুর হয়ে যেতেন, হাসতেন, কাঁদতেন, নিজের দেবদূতের মতো মিষ্টি বাচ্চাদের কথা বলে চোখের জল ফেলতেন, ওরা রোগাক্রান্ত হয়ে ঝুপড়িতে পড়ে আছে — ওহ্ তিনি ছিলেন বাচ্চা-পেটানো, চোখের জল ফেলা, স্নেহপ্রবণ একজন আইরিশ — আর আমার ভাইটি মরে যায়, ওরই বেঁচে থাকা উচিত ছিলো, ওর কিছু এসে যেতো না, পুরুষ মানুষের জন্য ওটা কিছুই নয়, কিন্তু আমি মরি নি, আমার মৃত্যু হলো না, সেরে উঠলাম আমি — আর, বাবা আমাকে বুকে নিয়ে চুমু খেতেন, আমার সারা মুখে বসন্তের দাগভর্তি মুখের গর্তগুলি কাঁদতে কাঁদতে তিনি চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতেন, তাঁর গায়ে মদের গন্ধ, কিংবা তিনি হয়তো আমার দিকে তাকিয়ে আমার গালে একটা চড় কষিয়ে বলতেন, ইস্, কি হয়েছে দেখতে! কিন্তু একই কথা, একই ব্যাপার ছিলো সেটা, কারণ আমি মরি নি, মরে গেছিল অন্যজন, আমার মৃত্যু হয় নি — আমি —

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে যাচ্ছিলো। তারপর হঠাৎ সে থেমে গেলো। অন্ধের মতো আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো, আমার কোট আকঁড়ে ধরলো, তার অবনত মুখ গুঁজে দিলো আমার বুকে। অতএব আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ডান হাত দিয়ে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরলাম, ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম, আস্তে আস্তে ওর পিঠ চাপড়ে দিতে থাকলাম, আর ওর পিঠ নিঃশব্দ কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠলো। মাথা না তুলেই সে বললো, সব সময় এই রকমই হবে — এই রকমই হয়ে এসেছে সব সময় — এই রকমই হতে থাকবে —

আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি তার মুখের কথা বলছে।

কিন্তু না, কারণ সে বলে চললো, এই রকমই হতে থাকবে, ওরা চুমোয় চুমোয় তোমার মুখ ভরিয়ে দেবে, চোখের জলে ভিজিয়ে দেবে তোমাকে, তারপরই কষে তোমাকে চড় মারবে — তুমি ওদের জন্য যতো কিছু করো না কেন, ওদের বর্তমান প্রতিষ্ঠার পেছনে তোমার যতো অবদানই থাকুক না কেন, নদর্মা থেকে তুলে এনে তুমি ওদের যা কিছুই বানাও না কেন, ওরা প্রথম সুযোগেই তোমার গালে কষে চড় লাগাবে, কারণ তোমার মুখভর্তি বসন্তের দাগ — ওরা স্কেট পায়ে নগ্নদেহের একটা বাজে শস্তা মেয়ে দেখবে আর তোমার মুখে চড় কষিয়ে দেবে —

আমি সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে ওর পিঠ চাপড়ে দিতে থাকলাম, কারণ আর কিছুই করার ছিলো না আমার।

— ওই রকমই হবে সব সময় — সব সময়ই স্কেট পায়ে কোনো বাজে শস্তা মেয়ে —

তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আমি বললাম, শোনো, তোমার তো চলে যাচ্ছে। ও কি করলো না করলো তাতে তোমার কি এসে যায়?

সে এক ঝটকায় মাথা তুলে বললো, তুমি এর কি জানো? এ্যা? তুমি কি বোঝো?

আমার কোটের বুকে ওর আঙ্গুল বসে গেলো, ও জোরে ঝাঁকুনি দিলো আমাকে।

আমি বললাম, এতোই যদি কষ্ট তাহলে ওকে যেতে দাও।

যেতে দেবো! যেতে দেবো ওকে! আগে আমি ওকে খুন করবো, এই তোমাকে আমি দিব্যি কেটে বলছি। তার চোখ এখন লাল, ওই লাল দুটি চোখ পাকিয়ে আমাকে লক্ষ করে সে বললো, যেতে দেবো ওকে? শোনো, ও একটা বাজে শস্তা মেয়ের পেছনে যতোই ঘুরুক ও ফিরে আসবে। ওকে আসতেই হবে। কারণ আমাকে ছাড়া ওর চলবে না। এবং সেকথা ও জানে। ওই সব বাজে শস্তা মেয়েদের

ছাড়াও ওর চলবে কিন্তু আমাকে ছাড়া চলবে না। না, স্যাডি বার্ক ছাড়া ওর উপায় নেই, আর সে কথা ও জানে।

সে উঁচু করে তার মুখ তুলে ধরলো, প্রায় ঠেলে দিলো আমার দিকে যেন সে আমাকে এমন একটা জিনিস দেখাচ্ছে যা আমার বহু আগেই লক্ষ করা, এবং ক'রে গর্বিত হওয়া উচিত ছিলো।

কঠিন গলায় সে আবার বললো, সব সময় ও ফিরে আসবে।

ঠিকই বলেছিলো স্যাডি। উইলি সব সময় ফিরে আসতো। দুনিয়া ভর্তি তো বাজে শস্তা স্কেট পায়ে পরা মেয়ে, অবশ্য ওদের সবার পায়ে স্কেট থাকতো না। কারো কারো পরনে থাকতো ঘাসের ঘাগরা, কেউ কেউ টাইপ করতো, কেউ কেউ হোটেলের কাউন্টারে কাজ করতো, কেউ কেউ ছিলো বিবাহিতা, আইনসভার সদস্যের স্ত্রী, কিন্তু ও সব সময়ই ফিরে এসেছে। এসে যে আবশ্যিকভাবে প্রসারিত বাহু আর মধুর হাসি মুখের অভ্যর্থনা লাভ করতো তা নয়। মাঝে মাঝে মরু অঞ্চলের হিমশীতল রাতের মতো নীরবতা বিরাজ করতো। মাঝে মাঝে মনে হতো প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা মহাদেশ ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো উচ্চারিত হতো সুনির্বাচিত কঠিন তিরস্কার বা ধিক্কারের বাণী। যেমন, একবার কর্তা আর আমাকে একটা কাজে স্টেটের উত্তরাঞ্চলে যেতে হয়। ফিরে এসে বিকালের দিকে আমরা ক্যাপিটল ভবনে ঢুকেই দেখি রাজকীয় লবিতে, বিশাল ব্রোঞ্জের গম্বুজটার নিচে, স্যাডি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত ও অপেক্ষা করলো, তারপর কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই শুধু বললো, ইউ বাস্টার্ড।

কর্তা তার উড়নচণ্ডী আকর্ষণীয় তারুণ্যভরা হাসি উপহার দিয়ে বললেন, এই স্যাডি, তুমি কোনো খবরাখবর না নিয়েই —

স্যাডি বললো, ইউ বাস্টার্ড, তখনো কথাটা উচ্চারণ করলো সহজভাবে, ইউ বাস্টার্ড, বোতামগুলি বন্ধ রাখতেই পারো না। বলেই সে অন্যদিকে চলে গেলো।

লুসি স্টার্ক কি জানতো? কতোটুকু জানতো? আমি জানি না। আমার ধারণা ও কিছুই জানতো না। যখন ও তাঁকে বলে যে ও তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে, তখনো কর্তা বলেছিলেন যে, উনি যে বাইরাম বি. হোয়াইটকে বাঘের মুখে ছুঁড়ে দেন নি সেজন্যই লুসি তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু লুসি যায় নি। তখনো না।

যায় নি, কারণ ওর মধ্যে একটু বেশি সম্মানবোধ, একটু বেশি ঔদার্য, একটু বেশি একটা কিছু ছিলো যার জন্য সে উইলির দুঃসময়ে তাকে আঘাত করতে পারে

নি। কিংবা যখন উইলি দুঃসময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। পাল্লা তখন নিচের দিকে, ডুবতে শুরু করেছে উইলি, বিপর্যয়ের সুন্দর একটা বস্তা পাল্লায় চাপানো, বাদামী মোড়কের ভেতর দিয়ে একটু একটু রক্তও ঝরে পড়ছে, সেই সময় লুসি তার বুড়ো আঙ্গুলের ওজনটুকুও সেখানে চাপাতে পারবে না। কারণ তখন বাইরাম বি. হোয়াইটের ইমপীচমেন্ট, তাকে আইনসভার কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ব্যাপারটা, গৌণ হয়ে উঠেছিলো। তখন আসল জিনিসটা একেবারে সামনে এসে পড়েছে ঃ উইলি স্টার্কের ইমপীচমেন্ট।

ওরা গোড়া থেকেই ও–রকম পরিকল্পনা করেছিলো কিনা আমি সেকথা বলতে পারবো না। অথবা ওই পরিকল্পনা করার আগে ওরা যখন দেখলো যে কর্তা ওদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছেন, নিজেরা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় না গেলে ওদের আর বাঁচবার কোনো আশা নেই, তখন তারা বাধ্য হয়ে ওই রাস্তা ধরেছিলো কিনা সে কথা আমি বলতে পারবো না। অথবা ওরা হয়তো ভেবেছিলো যে স্বয়ং ঈশ্বর এবার উইলিকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, আইনসভাকে অসঙ্গত চাপ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, উৎকোচ প্রদান করে সে যে অন্যায় করেছে, আরো যেসব বেআইনী কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিয়েছে সে, এবার তার শাস্তি বিধানের সুযোগ তাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। হয়তো ওরা সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকে কতিপয় বীরকে ঠিক করে রেখেছিলো যারা ওদের উপর অন্যায় চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। বীরত্ব অথবা যথেষ্ট প্রলোভন ব্যতিরেকে এটা সম্ভব হতো না, কারণ নথিপত্রে যা ছিলো তার আলোকে একমাত্র বুদ্ধু ছাড়া কারো বিশ্বাস করার কারণ ছিলো না যে কর্তা ফাঁকা কথা বলেছেন, অনর্থক ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু স্পষ্টতঃই ওরা ভেবেছিলো যে ওরা কতিপয় বীরকে খুঁজে পেয়েছে কিংবা কিনে নিতে পেরেছে।

যাই হোক, ওরা চেষ্টা করেছিলো। এবং এরপর একটা স্বল্পকালীন বিরতিতে জীবন হয়ে উঠেছিলো প্রচণ্ড বেগে শুধু ছুটে যাওয়া, একটা ঝাপসা অস্পষ্ট গতিময়তা, আর কিছু নয়। আমার গভীর সন্দেহ হয় যে পুরো দু'সপ্তাহ কর্তা ঘুমোন নি, মানে বিছানায় শুয়ে নিদ্রা যাননি। আমরা যখন রাতের বেলায় গাড়ি করে প্রচণ্ড বেগে সগর্জনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে চলেছি তখন পিছনের আসনে বসে কিংবা ঘরের ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে আসার পর আরেক জনের ঢোকার মধ্যবর্তী সময়টুকুতে তাঁর চেয়ারে বসে তিনি নিঃসন্দেহে কয়েক পলক ঘুমিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। স্টেটের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়ে আশি মাইল বেগে গাড়ির হর্ণের তীব্র তীক্ষ্ণ ধ্বনি তুলে, এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক চৌরাস্তার মোড় থেকে আরেক চৌরাস্তার মোড় পর্যন্ত। তিনি

দিনে পাঁচ অথবা ছয় অথবা সাত অথবা আটটা ভাষণ দিয়েছেন জনসমাবেশে। অলস শিথিল নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে মঞ্চে উঠে আসতেন, যেন তাঁর সামনে অনন্ত সময় পড়ে আছে, যেন সমস্ত সময়টুকু তাঁর একার। তিনি শুরু করতেন সহজ সুরে, প্রিয় বন্ধুগণ, রাজধানীতে সামান্য একটু গণ্ডগোল হতে যাচ্ছে বলে মনে হয়। আইনসভার অকর্মণ্য, ফজুল, বেফায়দা সদস্যগুলো আর আমার মধ্যে। ওদের মাথা হায়েনার মতো, মুখ নেড়ী কুত্তার মতো, নেকড়ের বাচ্চার মতো কষ্টেসৃষ্টে পেট টেনে চলে ওরা। তো, ওদের আর ওদের মতো মুখ দীর্ঘ কাল ধরে দেখতে দেখতে, আমার মনে হলো, মানুষের মুখ দেখতে কি রকম সেটা সম্পূর্ণ ভুলে যাবার আগেই আমার একবার বেরিয়ে পড়া উচিত। তো, তোমাদের সবার মুখই তো দেখছি মানুষের মতো। কম-বেশি। আর দেখে বুঝদারও মনে হচ্ছে, তা আইনসভায় বসে বসে তোমাদের ট্যাক্সের টাকা থেকে দৈনিক পাঁচ ডলার পকেটস্থ করতে করতে আইনসভার সদস্যরা যাই বলুন না কেন। তাঁরা বলেন, তোমরা যখন আমাকে তোমাদের পবিত্র ভোট দিয়ে এই স্টেটের গভর্ণর বানিয়ে ছিলে তখন তোমাদের মাথায় একটা চামচিকার বুদ্ধিও ছিলো না। হয়তো ছিলো না। আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। আমি পক্ষপাতদুষ্ট। কিন্তু —

এইখানে তাঁর অলস শিথিল ভঙ্গি অন্তর্হিত হতো, ভারী ঈষৎ আনত পল্লবের নিচে তাঁর চোখের কোমল দৃষ্টি মিলিয়ে যেতো, মাথাটা আর একদিকে সামান্য হেলানো থাকতো না, সে জায়গায় তিনি তাঁর ভারী মাথা হঠাৎ সামনে ঠেলে দিতেন, অনিদ্রায় লাল চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠতো, তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো — কিন্তু আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করবো এবং আমি তার জবাব চাই। আমি ঈশ্বরের সামনে, সর্বশক্তিমান ও সর্বোচ্চ শক্তির সামনে তোমাদের জবাব চাই। জবাব দাও আমার প্রশ্নের। আমি কি তোমাদের নিরাশ করেছি? করেছি কি?

তারপরই তীব্র গতিতে সামনে ঝুঁকে, প্রশ্নটা বাতাসের বুকে বাজতে থাকা অবস্থাতেই, তিনি তাঁর ডান হাতটি তুলে বলে উঠতেন, দাঁড়াও, তোমাদের অন্তরের অন্তস্থলে দৃষ্টিপাত করে সত্যকে সেখানে প্রত্যক্ষ করবার আগে জবাব দিও না। কারণ সত্যের অবস্থান সেইখানে। বই-তে নয়। আইনজীবীর কেতাবে নয়। এক টুকরো কাগজের গায়ে তা লেখা থাকে না। সত্যের অবস্থান মানুষের অন্তরে।

তারপর কিছুক্ষণ থেমে, সমগ্র জনতার মুখের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি বলতেন, জবাব দাও!

আমি গর্জনধ্বনি ওঠার জন্য অপেক্ষা করতাম। না করে পারতাম না। জানতাম যে উঠবেই, তবু অপেক্ষা করতাম তার জন্য, আর প্রতিবারই মনে হতো কী

অসহনীয় দীর্ঘ সময় লাগছে ওই ধ্বনিটা উঠতে। যেন বহু উঁচু থেকে আমি জলে ডুব দিয়েছি। তারপর উপরে আলোর দিকে উঠে আসতে শুরু করেছি, কিন্তু জানি যে এখনো নিঃশ্বাস নিতে পারবো না, আর একটা অসহনীয় কালহীনতার অনুভূতি নিয়ে আমার মাথার মধ্যে রক্তের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। তারপরই জেগে উঠতো সেই গর্জন, আর আমার মনে হতো অনেক উঁচু থেকে ডুব দেবার পর গভীর জলের ভেতর থেকে উপরে উঠে এলাম আমি, আমার ফুসফুসের ভেতর অবরুদ্ধ বাতাস এক ঝলকে বেরিয়ে এলো, আর সব কিছু যেন দুলছে আলোর সমুদ্রে। জনতার মধ্য থেকে ফুলে ওঠা গর্জনধ্বনির মতো আর কিছুই নেই। হঠাৎ, একসঙ্গে তা উত্থিত হয়, জনতার মধ্যে প্রতিটি মানুষের ভেতরে যে বস্তু আছে সেখান থেকেই সেটা উঠে আসে, কিন্তু ওই বস্তুটি সেই মানুষ নয়। ওই গর্জনধ্বনি ফুলতে থাকতো, উঠতো, নামতো, আবার ফুলে উঠতো, আর কর্তা তাঁর ডান বাহু সোজা আকাশের দিকে তুলে তাঁর বিস্ফারিত চোখ নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

এবং গর্জনধ্বনি থামলে, তখনো তাঁর হাত উত্তোলিত, কর্তা বলতেন, আমি তোমাদের মুখ দেখতে পেয়েছি।

এবং তারা চিৎকার করে উঠতো।

তিনি বলতেন, হে প্রভু, আমি একটা ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছি।

এবং তারা আবার চিৎকার করে উঠতো। তিনি বলতেন, আমি মেষের লোমের উপর শিশিরবিন্দু দেখতে পেয়েছি, অথচ মাটি শুকনো।

তারপর — আবার চিৎকার।

তারপর — আমি চাঁদের বুকে রক্ত দেখেছি! তারপর — ওহ্, বালতি বালতি রক্ত। এ রক্ত কার তা আমি জানি।

তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ডান হাত প্রসারিত করে, যেন বাতাসের মধ্য থেকে তিনি কিছু একটা শক্ত করে ধরেছেন সেইভাবে বলে উঠতেন, ওই মাংস কাটার চাপাতিটা আমাকে দাও!

সব সময়ই এই ঘটেছে। অথবা প্রায় এই রকম। রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হর্ণের তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলে ছুটে যাওয়া, এক চুল পরিমাণ দূরত্ব দিয়ে সুগার–বয়ের পেট্রল ট্রাকের পাশ কাটানো, ওর ঠোঁটের নিঃশব্দ আঁকুপাঁকু আর তার মধ্য থেকে থুতুর ফোয়ারার নির্গমণ আর তার ভেতরে জমে উঠা শব্দপুঞ্জ : হা – হা – হারাম – জাদা ! কথাটি বেরিয়ে আসা। আর কর্তা দাঁড়িয়ে আছেন কিছু একটার উপর, আকাশের পানে তাঁর হাত উঁচু করে (হয়তো বৃষ্টি পড়ছে, হয়তো গনগনে সূর্য জ্বলছে, হয়তো সময়টা রাত্রিকাল আর মফস্বলের কোনো দোকানের সামনের

বারান্দা থেকে গ্যাসের বাতির লাল শিখা হিস হিস করে উপরে উঠে যাচ্ছে), আর জনতার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে সমুদ্র-গর্জন। আর অনিদ্রায় অনিদ্রায় আমার মাথা অসম্ভব হাল্কা হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে আমার মাথা যেন আকাশের মতো বড়ো, আর এই যে আমি হাঁটছি মনে হচ্ছে যেন পেঁজা তুলোর মেঘপুঞ্জের উপর দিয়ে পা টিপে টিপে চলেছি।

এই সবই যথার্থ।

কিন্তু এটাও ঃ কর্তা ক্যাডিলাকটায় বসে আছেন, ছোট রাস্তার ধারের একটা বাড়ির পাশে, বাড়ির সবগুলো আলো নেভানো, দুপুর রাত অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। কিংবা মফস্বল অঞ্চলে, একটা ফটকের পাশে। কর্তা একটা লোকের দিকে ঝুঁকে দ্রুত নিচু গলায় কথা বলছেন, লোকটা হয়তো সুগার-বয় অথবা তার কোনো স্যাঙাত, মোটু হ্যারিস কিংবা এ্যাল পার্কিন্স, কর্তা বলছেন, যাও ওকে বেরিয়ে আসতে বলো। আমি জানি ও ভেতরে আছে। ওকে বলো, ভালো চাইলে ও বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলবে। যদি না আসে তবে শুধু বলো যে তুমি এলা লু'-র বন্ধু, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। কিংবা জিজ্ঞাসা করো, ও কখনো ধাপ্পাবাজ উইলসনের নাম শুনেছে কিনা। কিংবা ওই জাতীয় কিছু। আর তার পরই দেখা যাবে একটা লোক বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, তার রাতকামিজ প্যান্টের মধ্যে গোঁজা, সে হিহি করে কাঁপছে, অন্ধকারে তার মুখ বিবর্ণ, সাদা।

আর এটাও ঃ কর্তা ধোঁয়াভর্তি একটা ঘরে বসে আছেন, মেঝের উপর ধরা আছে এক পাত্র কফি, কিংবা একটা বোতল, আর কর্তা বলছেন, নিয়ে এসো নচ্ছারটাকে। যাও, নিয়ে এসো !

আর ওরা নচ্ছারটাকে নিয়ে এলে পর কর্তা ধীরে সুস্থে তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলছেন, এই তোমার শেষ সুযোগ। কর্তা কথাটা বলছেন সহজ শান্ত সুরে। তারপর হঠাৎ তিনি লোকটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর এখন আর সহজ ও শান্ত নয়, বলছেন, তুমি জানো আমি তোমার কি হাল করতে পারি? জানো তুমি?

আর তিনি সেটা করতে পারতেনও। কারণ তাঁর হাতে সব মালমশলা মজুদ ছিলো।

১৯৩৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল রাজ্যের ক্যাপিটলে তথা সংসদ ভবনে যাবার রাস্তাগুলি লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছিলো। সাধারণতঃ এসব রাস্তায় যে ধরনের লোকজন দেখা যেতো এরা সেধরনের ছিলো না। অন্ততঃ সংখ্যার দিক থেকে নয়। সেদিন সন্ধ্যার ক্রনিকল পত্রিকা ক্যাপিটল অভিমুখে একটা পদযাত্রার গুজবের কথা

উল্লেখ করে কিন্তু এটাও বলে যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ভয় খাওয়ানো যাবে না। ৫ই এপ্রিল দুপুরের আগেই লোকের ভীড় আরো বাড়লো। গ্রামাঞ্চলের চাষাভুষো নর–নারী, মাথায় পশমের টুপী পরনে, ঢোলাঢালা পোশাক, লালচে ধুলোমাটি মাখা, বেশ কিছু মুখ আর পোশাক অবশ্য কাউন্টি–আসনের, পেট্রল–পাম্পের দোকানপাতির। জনতা ক্যাপিটল ভবনের দিকে এগিয়ে চলছে, তাদের কণ্ঠে এখন গান বা চিৎকার নেই। ভবনের সামনে যে মস্ত বড় মাঠে স্ট্যাচুগুলি বসানো আছে ওরা সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে।

ক্যামেরা আর তার ত্রিপদী স্ট্যান্ডগুলি নিয়ে আলোকচিত্রগ্রাহকরা জনতার পাশ দিয়ে ছোটাছুটি করছে, ক্যাপিটলের সিঁড়িতে তাদের জিনিসপত্র বসাচ্ছে, ভালো ছবি তুলবার জন্য ফ্রক–কোট পরা স্ট্যাচুগুলির ভিত্তিভূমির উপর চড়ে বসছে। জনতার ধার ঘেঁষে মাঝে মাঝে অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মানুষের মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। ক্যাপিটল আর জনতার মধ্যবর্তী মাঠের ফাঁকা অংশে দেখা যাচ্ছে মহাসড়ক বাহিনীর কতিপয় সুদক্ষ, সুসজ্জিত সদস্যকে, তাদের পরনে উজ্জ্বল সবুজ ইউনিফর্ম, পায়ে কালো বুটজুতো, কোমরে কালো স্যাম ব্রাউন বেল্ট, সেখান থেকে ঝুলে আছে চামড়ার খাপে পোরা রিভলভার।

ততক্ষণে জনতা সুর করে চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে, উইলি, উইলি, উইলি — আমরা উইলিকে চাই!

আমি তেতলার একটি জানালা থেকে মুখ বার করে দৃশ্যটি দেখলাম। প্রতিনিধিবর্গের চ্যাম্বারে, যেখানে ওরা বক্তৃতা–ভাষণে ব্যস্ত, তর্কবিতর্কে লিপ্ত, সেখানে কি এই আওয়াজ গিয়ে পৌঁছুচ্ছে? বাইরের মাঠে, বসন্তের ঝলমলে আকাশের নিচে, ব্যাপারটা খুব সহজ। কোনো তর্কবিতর্ক নেই। খুব সহজ। আমরা উইলিকে চাই — উইলি, উইলি, উইলি! একটা প্রলম্বিত সুরেলা ধ্বনি, বেশি উচ্চকণ্ঠ নয়, ঈষৎ ভাঙা গলায়, সমুদ্রের ছুটে আসা সফেন তরঙ্গমালার মতো।

তারপরই আমার চোখে পড়লো একটা বিরাট কালো গাড়ি. গাড়িটা ধীরে ধীরে ক্যাপিটল ভবনের সামনে এসে দাঁড়ালো। একজন লোক তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, পুলিশদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে, মাঠের প্রান্তে যেখানে ব্যান্ডস্ট্যান্ড সেদিকে এগিয়ে গেলো। মোটা একটি লোক। টাইনি ডাফি।

জনতাকে উদ্দেশ করে সে কিছু বললো। কি বললো তা আমি শুনতে পাই নি, কিন্তু তার বক্তব্য আমার জানা ছিলো। সে বলছিলো যে উইলি স্টার্ক তাকে শান্তিপূর্ণভাবে শহরে চলে যেতে বলেছেন, রাত না নামা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে, তারপর আটটা নাগাদ ক্যাপিটলের সামনে এই মাঠে ফিরে আসবে, আর তখন

উইলি স্টার্ক তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন।

তিনি ওদের কি বলবেন আমি জানতাম। আমি জানতাম তিনি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন যে তিনি তখনও তাদের গভর্নর।

আমি জানতাম, কারণ গত সন্ধ্যায়, সাড়ে সাতটার দিকে, উইলি আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে আমার হাতে একটা বড়ো বাদামী খাম তুলে দিয়ে বলেছিলেন, লোডান হাস্কেল হোটেলে আছে। আমি জানি ও এখন ঘরে আছে। ওখানে যাবে তুমি, তাকে এক নজর দেখতে দেবে এটা, কিন্তু তার হাতে দেবে না, তারপর তাকে তার কুকুরগুলো সরিয়ে নিতে বলবে। অবশ্য নিক, বা না নিক, তাতে কিছু এসে যাবে না, কারণ ওরা ওদের মত পাল্টে ফেলেছে। (লোডান হলো সংসদে ম্যাকমারফির দলের প্রধান স্তম্ভ।)

আমি হাস্কেল হোটেলে গিয়ে, আমার নাম না পাঠিয়ে, সোজা মিঃ লোডানের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম । আমি তাঁর ঘরের দরজায় টোকা দিলাম, ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, আমি বললাম, চিঠি আছে। তিনি দরজা খুললেন। বড়োসড়ো হাসিখুশি দেখতে একটি লোক, চমৎকার ভাবভঙ্গি, পরনে ফুলের নক্শা আঁকা ড্রেসিং গাউন। আমাকে প্রথমে চিনতে পারেন নি, তাঁর চোখে পড়েছিলো শুধু একটা বড়ো বাদামী খাম আর খামের ঊর্ধে একটা মানুষের মুখ। কিন্তু তিনি হাত বাড়াতেই আমি যখন খামটা সরিয়ে নিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকলাম তখন তিনি নিশ্চয়ই আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই যে, মিঃ বার্ডেন, কেমন আছেন? শুনতে পাই আজকাল খুব ব্যস্ত সময় যাচ্ছে আপনার।

না, না, শুধু আড্ডা দিই, এখানে ওখানে অলসভাবে ঘুরে বেড়াই। এই তো, এদিকে ঘুরছিলাম, ভাবলাম আপনার এখানে একটু আসি, একটা লোক আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে, আপনাকে সেটা একটু দেখাই।

খামের ভেতর থেকে লম্বা একটা পাতা বার করে ওঁর চোখের সামনে ধরলাম।

আমি বললাম, না, ধরবেন না, হাত পুড়ে যাবে।

তিনি হাত দিলেন না, শুধু দেখলেন, চোখ তীক্ষ্ণ করে। আমি তাঁর কণ্ঠার নিচের ডিমটিকে বার দুই ওঠা-নামা করতে দেখলাম। তিনি মুখ থেকে তাঁর চুরুট সরিয়ে (গন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো বেশ দামী চুরুট), বললেন, জাল।

না, সইগুলি সব অকৃত্রিম। কিন্তু সন্দেহ থাকলে আপনি এখানে যাদের নাম দেখছেন আপনার সেই পাণ্ডাদের যে কাউকে ফোন করে দেখতে পারেন।

তিনি এক মিনিট কথাটা ভেবে দেখলেন, তাঁর কণ্ঠার ডিম আবার ওঠা-নামা করলো, এবার আগের চাইতে দ্রুতগতিতে, কিন্তু ব্যাপারটা তিনি গ্রহণ করছিলেন

একজন সৈনিকের মতো। কিংবা হয়তো তখনো ভাবছিলেন যে সব কিছুই জালিয়াতি। অবশেষে তিনি বললেন, ঠিক আছে, আপনার ধাপ্পাবাজীটাই পরখ করে দেখা যাক।

ফোনের কাছে গিয়ে নম্বর ঘোরালেন তিনি। নম্বর পাবার আগের সময়টুকুতে তিনি মুখ তুলে আমাকে লক্ষ করে বললেন, বসুন না?

আমি বললাম, না, ধন্যবাদ, কারণ ঘটনাটাকে আমি সামাজিক বলে বিবেচনা করি নি।

তারপর তিনি নম্বর পেলেন। ফোনে তিনি বললেন, মন্টি, আমি এখানে একটা বিবৃতি দেখতে পাচ্ছি, তাতে বলা হয়েছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের বিবেচনায় ইমপীচমেন্ট প্রসিডিংস–এর পেছনে কোন যুক্তি নেই এবং সকল চাপ সত্ত্বেও তারা এর বিরুদ্ধে ভোট দেবে। হ্যাঁ। বলা হয়েছে 'সকল চাপ'। তালিকায় তোমার নাম আছে। ব্যাপারটা কি?

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মিঃ লোডান বললেন, আঃ, মিন মিন করো না, যা বলবার পরিষ্কার করে বলো।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর মিঃ লোডান চেঁচিয়ে উঠলেন, তুমি — তুমি — কিন্তু তাঁর মুখে আর কথা যোগালো না, তিনি টেলিফোনটা ঠাস করে নামিয়ে রেখে আমার দিকে তাঁর বড়োসড়ো, একটু আগের হাসিখুশি দেখতে মুখটা ফেরালেন। মুখ দিয়ে তিনি একজন দম–বন্ধ–হয়ে–আসা মানুষের মতো ভঙ্গি করলেন, কিন্তু কোনো শব্দ করলেন না।

আমি বললাম, কি, আরেক জনকে চেষ্টা করে দেখতে চান?

তিনি খুব ধীরে, কিন্তু ধরা গলায়, যেন বুকের ভেতর আর বাড়তি নিঃশ্বাস নেই, বললেন, এটা ব্ল্যাকমেইল। তারপর, বুকের ভেতর আরেকটু নিঃশ্বাস সঞ্চয় করে তিনি বললেন, এটা ব্ল্যাকমেইল। জুলুমবাজী। ঘুষের কারসাজি। আমি বলছি আপনারা ওই লোকগুলিকে ব্ল্যাকমেইল করেছেন, ঘুষ দিয়ে কিনে নিয়েছেন। আমি—

আমি বললাম, ওরা কেন বিবৃতিতে সই দিয়েছে আমি জানি না। কিন্তু আপনার অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হয়ঃ ঘুষ দিয়ে কেনা যায়, কিংবা এমনসব কাণ্ডকীর্তি করেছে যার জন্য ব্ল্যাকমেইল করা চলে, তেমন লোককে ম্যাকমারফির পক্ষে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত করা উচিত হয় নি।

ম্যাকমারফি — কথাটা বলতে শুরু করেই তিনি থেমে, গভীর এক নীরবতার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। ফুলের নক্শা আঁকা ড্রেসিংগাউন পরা চিন্তান্বিত মুখ নিয়ে

তিনি টেলিফোন স্ট্যান্ডের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিঃসন্দেহে, ম্যকমারফিকে নিয়ে তাঁর নিজস্ব একটা ঝামেলা হবে।

আমি বললাম, একটা ছোট্ট ব্যাপার, কিন্তু আমার মনে হয় যদি ভোটাভুটির পর্যায়ে পৌছুবার আগেই ইমপীচমেন্ট প্রসিডিংস থামিয়ে দেয়া বা তুলে নেয়া যায় তাহলে বিষয়টা আপনার জন্য এবং বিশেষভাবে যারা এই কাগজে সই করেছে তাদের জন্য কম বিব্রতকর হবে। কাল বিকালের মধ্যেই। যাবতীয় ব্যবস্থা করার এবং যথাসম্ভব সসম্মানে এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন আপনি। অবশ্য ব্যাপারটা ভোটাভুটির পর্যায়ে গেলে রাজনৈতিক দিক থেকে গভর্নরের জন্য বেশি ফলপ্রসূ হবে, কিন্তু তিনি আপনাকে সহজ পথে এর সুরাহা করার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক, বিশেষ করে শহরে এই ব্যাপার নিয়ে বিরাজমান প্রচণ্ড অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে।

কিন্তু আমার মনে হলো আমার কোনো কথা তাঁর কানে যায় নি। আমি দরজার কাছে গিয়ে, দরজা খুলে, পেছন ফিরে তাকালাম। বললাম, শুনুন, শেষ পর্যন্ত কিভাবে ব্যাপারটা সামাল দেবেন সেটা গভর্নরের দিক থেকে একেবারেই অবান্তর।

তারপর আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে হল দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

সেটা ছিলো চৌঠা এপ্রিলের রাত। পরদিন উপরের উঁচু জানালা থেকে আমি যখন ক্যাপিটলের সামনের স্ট্যাচুগুলির ওপাশের বিশাল মাঠ এবং আশেপাশের রাস্তাগুলি লোকে লোকাকীর্ণ হয়ে উঠতে দেখলাম তখন আমি যা জানতাম তা জানার জন্য আমি দুঃখিত হই। না জানলে আমি ওই মুহূর্তটির সম্ভাবনাগুলি পূর্ণ উত্তেজনা নিয়ে উপভোগ করতে পারতাম। কিন্তু নাটক কিভাবে সমাপ্ত হবে তা আমি জেনে ফেলেছিলাম। এ যেন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর ড্রেস রিহার্সাল দেখা। ওখানে দাঁড়িয়ে আমার নিজেকে মনে হচ্ছিলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যেন গম্ভীর মুখে ইতিহাসের গতিধারা অবলোকন করছি।

যেটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে নিশ্চয়ই খুব নীরস একটা কাজ। যিনি জানেন পরিণতি কি হবে। বস্তুতঃপক্ষে, কোনো ইতিহাস সৃষ্টি হবে কিনা সেটা জানবার আগেই যিনি জানতেন ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি কিভাবে হবে। এটা অবশ্য অর্থহীন, কারণ এর মধ্যে একটা কালের ধারণা আছে, কিন্তু তিনি তো কালহীন, কারণ ঈশ্বর হচ্ছেন অস্তিত্বের পূর্ণতা এবং তাঁর মধ্যে সমাপ্তিই হচ্ছে সূচনা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে অপরিষ্কার কাপড় পরা, স্টীলের চশমা চোখে, খুশকি-আবৃত, মোটাসোটা বুড়ো লোকটি যে সরু পুস্তিকাগুলি বিলি করে বেড়াতো, একদা যে ছিলো বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত এটর্নী, যে আরকানস'-র স্বর্ণকেশী, গালে বুভুক্ষু দেখতে টোল-পড়া স্বচ্ছ

সুন্দর এক মেয়েকে বিয়ে করেছিলো, তার মধ্যে এইসব কথা লেখা ছিলো। কিন্তু পুরানো দিনের সেকথা ভেবে আমার মনে হলো যে ওসব বাজে, নেহাৎ পাগলামী, ঈশ্বর অস্তিত্বের পূর্ণতা হতেই পারেন না। কারণ জীবন হচ্ছে গতি।

(বুড়ো মানুষটা পুস্তিকাগুলিতে যে ক্যাপিটাল লেটার, বড় অক্ষর, ব্যবহার করতেন আমিও তাই করলাম। তাঁর উল্টোদিকে আমি টেবিলে বসে থাকতাম, এক প্রান্তে পড়ে থাকতো আধোয়া বাসনপত্র, অন্য প্রান্তে টাল করা বই আর কাগজ, রেল লাইনের এপাশের ঘরটিতে বসে তিনি কথা বলে যেতেন এবং আমি তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে ওই বড় অক্ষরগুলি শুনতে পেতাম। তিনি বলেছিলেন, **ঈশ্বর** হচ্ছে **অস্তিত্বের পূর্ণতা**। আর আমি বলেছিলাম, আপনি ভুল বলছেন। কারণ **জীবন** হচ্ছে **গতি**। কারণ —

(কারণ জীবন হচ্ছে **জ্ঞানের** পথে **গতি**। **ঈশ্বর** যদি পরিপূর্ণ জ্ঞান হন তাহলে তিনি **পরিপূর্ণ অ-গতি,** যা হচ্ছে **অ-জীবন**, যা মৃত্যু। অতএব যদি **অস্তিত্বের পূর্ণতার** কোনো ঈশ্বর থাকেন তাহলে আমাদের পূজা করতে হয় **বিশ্বপিতা মৃত্যুকে**। আমি বৃদ্ধকে একথাই বলেছিলাম। কাগজপত্র আর আধোয়া বাসনকোসনের ওপাশে বসা বৃদ্ধের লালের ছোঁয়া লাগা চোখ দুটি মিটমিট করে উঠেছিলো, তাঁর স্টীলের চশমা নাকের উপর নেমে এসেছিলো, তিনি মাথা নেড়েছিলেন, তাঁর করোটির প্রান্তদেশ ঘিরে কয়েক গাছি সাদা চুল থেকে খুশকি ঝরে পড়েছিলো, আর ওই করোটির মধ্যে স্পর্শের মতো, রক্তে ভেজা, তালগোল পাকানো বৈদ্যুতিক আঁকুপাঁকুর ভেতর থেকে শব্দগুলি আকার গ্রহণ করছিলো। তিনি বলে উঠেছিলেন, আমি **পুনরুত্থান** এবং **জীবন**। আর আমি বলেছিলাম, আপনি ভুল বলছেন।

(কারন **জীবন** হল আগুন ধরে যাওয়া একটা দড়ির টুকরো — নাকি বারুদের স্তূপে একটা ফিউজ যাকে আমরা **ঈশ্বর** বলি — আর দড়িটা হচ্ছে যা আমরা জানি না, আমাদের **অজ্ঞানতা**, আর ছাই-এর রেখাটা, বাতাসের ঝাপটা না এলে যা দড়ির কাঠামোটা ধরে রাখে, সেটা হল **ইতিহাস,** মানুষের **জ্ঞান**, কিন্তু সেটা তো মৃত, এবং আগুন যখন গোটা দড়িটা পুড়িয়ে দেবে তখন মানুষের **জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞানের** সমান হবে, আর তখন কোনো আগুনও থাকবে না, যেটা হল **জীবন**। কিংবা দড়িটা হয়তো গিয়ে পৌঁছুবে একটা বারুদের স্তূপে, তখন ঘটবে একটা প্রচণ্ড অগ্নিময় বিস্ফোরণ , আর ছাই-এর রেখাটিও সম্পূর্ণ উড়ে যাবে। এই কথাই আমি বলেছিলাম বৃদ্ধকে।

(কিন্তু তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তুমি চিন্তা করছো সীমার পরিপ্রেক্ষিতে। আমি

বলেছিলাম, আমি কোনো চিন্তাই করছি না, আমি শুধু একটা ছবি আঁকছি। তিনি বলে উঠেছিলেন, হুঁঃ! আমার মনে পড়লো বহু বহু দিন আগে বিচারপতি আরউইনের সঙ্গে তাঁর সমুদ্রের ধারের সাদা বাড়ির লম্বা ঘরটায় বসে তাঁর সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে তিনি একবার এই রকম শব্দ করেছিলেন। যাই হোক, আমি তাঁকে বলেছিলাম, আচ্ছা, আমি আপনার জন্য আরেকটা ছবি আঁকছি। একটা লোকের ছবি, সে সূর্যাস্তের ছবি আঁকতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তার রঙের পাত্রে তুলি ডোবাবার আগেই আকাশের রঙ আর আকৃতি অনবরত বদলে যাচ্ছে। যে ছবিটা সে আঁকতে চেষ্টা করছে তার নাম দেয়া যাক **জ্ঞান**। এখন একটা লোক যে-বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছে তা যদি অনবরত বদলে যেতে থাকে তাহলে তার সম্পর্কে **জ্ঞান**ও ক্রমাগত অসত্য হয়ে উঠতে থাকে, অতএব সেটা হয়ে দাঁড়ায় **অ-জ্ঞান**, এবং তখনই **অনন্ত গতি** সম্ভব হয়ে ওঠে। এবং **অনন্ত জীবন**। কাজেই আমরা যদি **ঈশ্বরকে**, যে **ঈশ্বর** পরিপূর্ণ **জ্ঞান**, অস্বীকার করি শুধু তখনই আমরা **অনন্ত জীবনে** বিশ্বাস করতে পারবো।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, আমি তোমার আত্মার জন্য প্রার্থনা করবো।

কিন্তু আমি যদি বৃদ্ধের ঈশ্বরে নাও বিশ্বাস করতাম তবু, সেদিন সকালে ক্যাপিটলের জানালায় দাঁড়িয়ে, আমার নিজেকে ঈশ্বরের মতো মনে হয়েছিলো, কারণ কি হতে যাচ্ছে তা আমি জানতাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন **ইতিহাস** নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন **ঈশ্বর**, কারণ আমি ওখানে দাঁড়িয়ে আমার চোখের সামনে **ইতিহাসের** একটা টুকরো দেখতে পাচ্ছিলাম। এই যে মাঠে তাদের পাদভূমির উপর ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি দাঁড়িয়ে আছে, ফ্রক-কোট পরা, ডান হাত কোটের মধ্যে ঢোকানো, ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপর, পরনে মিলিটারী পোশাক, আরেক হাত তরবারির হাতলের উপর, হরিণের চামড়ার পোশাক পরা একটা মূর্তিও আছে, তার ডান হাত ধরে আছে মাটিতে স্থাপিত একটা দীর্ঘ রাইফেলের নল, এরা তো ইতোমধ্যে ইতিহাস হয়ে গেছে, তাদের পাদভূমির চারপাশের ঘাস খুব ছোট ও মসৃণ করে ছাঁটা আর ফুলের বেডগুলি নক্ষত্র আর বৃত্ত আর অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে সাজানো। তারপর মূর্তিগুলির ওপাশে দেখা যাচ্ছিলো জনতাকে, যারা এখনো ইতিহাস হয় নি। এখনো ঠিক হয়ে ওঠে নি। কিন্তু আমার চোখে তাদের ইতিহাস বলেই মনে হচ্ছিলো, কারণ যে ঘটনার তারা একটা অংশ সেই ঘটনার সমাপ্তি আমার জানা ছিলো। অন্ততঃ আমি ভেবেছিলাম যে তা আমি জানি।

ঘটনাটির সমাপ্তি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজগুলি জনতাকে কি চোখে দেখবে সেটাও আমার জানা ছিলো। তারা জনতাকেই কারণ হিসাবে বিবেচনা

করবে। তারা লিখবে, আইনসভা কর্তৃক চরম লজ্জাজনক কাপুরুষতা প্রদর্শন . . . চাপের মুখে নতজানু . . . নেতৃত্বের শোচনীয় অভাব . . .। আপনি জনতার দিকে তাকিয়ে দেখতে পারতেন, শুনতে পেতেন তাদের চাপা গর্জন, সমুদ্রের ঊর্মিমালার মতো, আর ভাবতেন যে জনতাই বুঝি ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। কিন্তু না, এটাও হয়তো বলা যেতো, উইলি স্টার্কই আইনসভাকে ঘুষ দিয়ে এবং ব্ল্যাকমেইল করে ঘটনাটা ঘটিয়েছে। কিন্তু না, তার জবাবে এটাও বলা চলতো যে উইলি স্টার্ক শুধু আইনসভাকে তার স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করার সুযোগ দিয়েছে, এর বেশি কিছু নয়, এবং ম্যাকমারফি, যে তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ওই লোকগুলির ভয় ও লোভকে ব্যবহার করার কথা চিন্তা ক'রে তাদের আইনসভার সদস্য নির্বাচন করেছিলো, সেই আসলে দায়ী। কিন্তু না, তার উত্তরে তখন এটা বলা যেতো যে শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় ওই জনতার উপরই, কারণ পরোক্ষভাবে, তারাই ম্যাকমারফিকে আইনসভার ওই সদস্যদের নির্বাচন করতে দিয়েছিলো, আর প্রত্যক্ষভাবে, ম্যাকমারফি সত্ত্বেও, উইলি স্টার্ককে নির্বাচিত করেছিলো। কিন্তু কেন তারা উইলি স্টার্ককে নির্বাচিত করেছিলো? এই জন্য কি যে যে-জটিল শক্তিসমূহের সমাহার তাদের যা বানিয়েছিলো তারা তা-ই, নাকি এই জন্য যে উইলি স্টার্ক বিস্ফারিত চোখে তাদের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলো আর তার ডান হাত উত্তোলিত করেছিলো স্বর্গের পানে?

তবে একটা জিনিস সুনিশ্চিত ঃ ওই যে সুরেলা ধ্বনি উঠছিলো আর নামছিলো, সেটা কিছু ঘটায় নি, কিছুই না। আমি ক্যাপিটল ভবনের জানালায় দাঁড়িয়ে একটা মূল্যবান এবং কণ্টকাকীর্ণ গোপন কথার মতো আমার সেই জ্ঞান সাদরে বুকের মধ্যে ভরে রেখেছিলাম। আর কিছুই আমি ভাবি নি।

আমি দেখেছিলাম মোটা লোকটা বিশাল কালো গাড়ি থেকে নেমে ব্যান্ডস্ট্যান্ডের উপর উঠে দাঁড়িয়েছিলো। আমি দেখেছিলাম জনতা নড়ে উঠেছিলো, তারপর ধীরে ধীরে হাল্কা হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিলো। আমি দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছিলাম, বর্তমানে নিঃসঙ্গ এবং কর্মহীন পুলিশদের উপর দিয়ে, ফ্রককোট আর ইউনিফর্ম আর হরিণের চামড়ার পোশাক পরা মূর্তিগুলির উপর দিয়ে, বিরাট প্রান্তরের পানে, বসন্তের উজ্জ্বল সূর্যালোকের নিচে এই মুহূর্তে যা জনশূন্য। আমি আমার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটের শেষ প্রান্তটুকু খোলা জানালা দিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেললাম, ঘুরতে ঘুরতে বহু নিচের পাথরের সিঁড়িতে সেটা কেমন করে পড়ছে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখলাম।

সে রাতে আটটার দিকে উইলি স্টার্ক এই সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

আলোর বন্যায় জায়গাটা ভেসে যাচ্ছিলো। পেছনে পাহাড়ের মতো বিশাল ক্যাপিটল ভবন। সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে, তার প্রেক্ষাপটে, উইলিকে খুব ছোট দেখাচ্ছিলো।

সে রাতে জনতা একেবারে সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত ঠেলে এসেছিলো। উজ্জ্বল আলোর বৃত্তের বাইরের ছায়া পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো। (দুটি মূর্তির পাদদেশে. একটা ফ্রককোট, আরেকটা হরিণের চামড়ার পোশাক পরিহিত, আলোর সরঞ্জামগুলি বসানো হয়েছিলো।) জনতা ডেকে উঠেছিলো, সঙ্গীতের সুরে আওয়াজ তুলেছিলো : উইলি — উইলি — উইলি। ওরা সিঁড়ির পাদদেশে পুলিশের কর্ডনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। তার একটু পরে, ক্যাপিটলের দীর্ঘ উচ্চ বিশাল দরজার মুখে দেখা গেলো উইলিকে। যিনি ওখানে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল আলোয় একটু চোখ মিটমিট করলেন, তারপর ধ্বনি থেকে শব্দগুলি মুছে গেলো। মুহূর্তের জন্য একটা নীরবতা নেমে এলো, তারপর শুধু গর্জন। মনে হলো সেই গর্জন থামাবার জন্য উইলি হাত তুললেন অনেকক্ষণ পরে। তারপর তাঁর হাতের নিম্নমুখী চাপে যেন ওই গর্জন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছিলো।

আমি নিচে এ্যাডাম স্ট্যান্টন আর এ্যান স্ট্যান্টন সহ জনতার মধ্য থেকে তাঁকে বেরিয়ে এসে ক্যাপিটলের সিঁড়ির উপর দাঁড়াতে দেখেছিলাম। সব চুকেবুকে যাবার পর — জনতাকে তাঁর যা বলার ছিলো তা বলার পর — তিনি পেছনে অপ্রতিহত নতুন গর্জনধ্বনি ফেলে রেখে আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন। এ্যান আর এ্যাডামকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমিও কর্তার সঙ্গে মিলিত হতে গেলাম।

আমি ওঁর সঙ্গে এক গাড়িতে ম্যানসনে ফিরে যাই। আমি গাড়িতে গিয়ে ওঠার সময় তিনি কোনো কথা বলেন নি। সুগার-বয় পেছনের রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলো। আমরা তখনো পেছনের দিকে লোকজনের গর্জনধ্বনি, চেঁচামেচি, আর গাড়ির প্রলম্বিত তীক্ষ্ণ হর্ণের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর সুগার-বয় ভীড় ঝেড়ে ফেলে পাশের একটা নির্জন ছোট রাস্তা ধরলো। এখানে বাড়িগুলি ফুটপাথ থেকে বেশ খানিকটা দূরে, এখন বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে, আলোকিত ঘরগুলিতে রয়েছে লোকজন, আর আমাদের মাথার উপর জড়াজড়ি করা গাছের শাখায় স্ফুটোনোন্মুখ ফুলের কলি। মোড়ের উপর রাস্তার বাতির আলোয় গাছের শাখাগুলির সবুজ রঙের আভাস পর্যন্ত আপনার চোখে পড়ে।

সুগার-বয় গাড়ি ম্যানসনের পেছনের প্রবেশপথে নিয়ে গিয়ে থামালো। কর্তা নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, আমি চললাম তাঁর পেছন পেছন। পেছনের হলঘরে ঢুকলেন তিনি, সেখানে কাউকে দেখা গেল না, তারপর তিনি প্রবেশ করলেন

বড়ো হলঘরে। উপরে ঝাড়বাতি আর পাশের আয়নাগুলির মধ্য দিয়ে হলঘর পেরিয়ে গেলেন, সিঁড়ির বাঁক ঘুরে ড্রয়িংরুমের ভেতরে দেখলেন, আবার ফিরে এসে পেছনের বসবার ঘরটা দেখলেন, তারপর আবার লাইব্রেরিতে উঁকি দিলেন। এবার আমি ব্যাপারটা বুঝলাম। তাই ওঁর পেছন পেছন না হেঁটে হলঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি বলেন নি যে আমাকে তাঁর দরকার আছে, কিন্তু দরকার যে নেই সেকথাও বলেন নি। বস্তুতঃপক্ষে তিনি কিছুই বলেন নি। একটি কথাও না।

তিনি যখন লাইব্রেরি থেকে আবার হলঘরে এলেন তখন খাবার ঘর থেকে সাদা কোট পরা একজন নিগ্রো পরিচারককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। কর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বয়, মিসেস স্টার্ককে দেখেছো?

হ্যাঁ।

কর্তা তীব্র কণ্ঠে বললেন, বুদ্ধু! কোথায় তিনি? তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমার কাছে আমার স্বাস্থ্যের খবর জানতে চেয়েছি?

না, স্যার, আমি কিছুই ভাবি নি, আমি —

কোথায়? কর্তার গলার সুরে যেন ঝাড়বাতি ঝনঝন করে বেজে উঠলো।

পক্ষাঘাতের প্রথম ধাক্কা কেটে যাবার পর কালো মুখের ঠোঁট দুটিতে প্রাণ ফিরে এসেছিলো, কিন্তু প্রথম দিকে তার মধ্য থেকে কোনো শব্দ নির্গত হলো না। তারপর শোনা গেলো, উনি — উনি উপরে গেছেন — আমার মনে হয় শুয়ে পড়েছেন — উনি —

কর্তা দ্রুত বেগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এসে, আমার পাশ দিয়ে, একটি কথাও না বলে, লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলেন। আমিও তাঁর পেছন পেছন গেলাম। বড়ো একটা চামড়ার কৌচে গা এলিয়ে, পা দুটি কৌচের উপরে তুলে দিয়ে, তিনি বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

আমি দরজা বন্ধ করে দেবার পর তিনি কুশানের গায়ে সমতলের সঙ্গে প্রায় ত্রিশ ডিগ্রী বাঁকা করে নিজের দেহভার সমর্পণ করলেন, তারপর নিজের আঙ্গুলের সন্ধিগুলি মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। অবশেষে অঙ্গুলিসন্ধির উপর চোখ রেখেই তিনি বললেন, আজ রাতে ও আমার জন্য অপেক্ষা করলে পারতো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শুয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়েছে, আর চাবি দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বললো মাথা ধরেছে। আমি উপরে গিয়ে দেখি ওর ঘরের উল্টো দিকের ঘরে টম স্কুলের পড়ালেখা করছে। আমি ওর ঘরের দরজার হাতল ধরতেই সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, মা বলে দিয়েছেন ওঁকে যেন কেউ বিরক্ত

না করে। যেন আমি একটা ছোকরা, কোনো চিঠি বা জিনিস দিতে এসেছি। আমি টমকে বললাম যে আমি ওঁকে বিরক্ত করবো না, শুধু কি ঘটেছে সেটা ওঁকে জানাতে এসেছি। টম আমার দিকে তাকিয়ে আবারো বললো, মা চান না যেন কেউ ওঁকে বিরক্ত করে। ওঁর মাথা ধরেছে।

কর্তা একটু ইতস্তত করলেন, আবার তাঁর আঙ্গুলের সন্ধিগুলির দিকে তাকালেন, তারপর আমার মুখের উপর চোখ রেখে কতকটা আত্মরক্ষামূলক সুরে বললেন, আজ রাতে ব্যাপারটা কিভাবে শেষ হলো আমি শুধু ওকে সেই কথাটা বলতে চেয়েছিলাম।

আমি বললাম, ও চেয়েছিলো আপনি যেন বাইরামকে বাঘের মুখে ছেড়ে দেন। তো ও কি চেয়েছিলো যে আপনি আপনার নিজেকে বাঘের মুখে ছেড়ে দেন?

ও যে কি চায় তা আমি জানি না। ওরা কেউ যে কি চায় তার মাথামুণ্ডু কিছু আমি বুঝি না। কোনো মানুষই তা বলতে পারবে না। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, ওরা যেভাবে তোমাকে তোমার কাজকর্ম চালাতে বলে তুমি যদি তার অর্ধেকও শোনো তবে তোমাকে শেষ পর্যন্ত নির্ঘাৎ পথে দাঁড়াতে হবে। এবং তখন ব্যাপারটা ওর কি রকম লাগবে?

আমি বললাম, আমার মনে হয় লুসি সেটা সহ্য করতে পারতো।

লুসি — তাঁকে কেমন অবাক-অবাক দেখালো, যেন আমাদের কথাবার্তার মধ্যে আমি হঠাৎ একটা নতুন বিষয় নিয়ে এসেছি। আমার তখন মনে হলো যে এতক্ষণ যে কথা হয়েছে তার মধ্যে একবারও লুসির নাম উচ্চারিত হয় নি। নিঃসন্দেহে তিনি লুসি স্টার্কের কথা বলছিলেন। তিনি জানতেন যে আমি সেটা জানি। কিন্তু যে মুহূর্তে ওর পরিবর্তে লুসির নামটা উচ্চারিত হলো তখনই যেন সবকিছু একটু অন্যরকম হয়ে গেলো। মনে হলো লুসি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

লুসি — তিনি আবার বললেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে — লুসি। ও সহ্য করতে পারতো। লুসি মাটির উপর শুতে পারতো, শাক-চচ্চড়ি খেয়ে বাঁচতে পারতো, কিন্তু তার ফলে দুনিয়াটা এক কানাকড়িও বদলে যেতো না। কিন্তু সেকথা বোঝার সাধ্য কি লুসির আছে? না, সে সাধ্য লুসির নেই।

স্পষ্টতঃই এখন নামটা উচ্চারণ করার মধ্যে তিনি একটা তৃপ্তি পাচ্ছিলেন। ওর বদলে যে লুসি বলছেন, বলতে পারছেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি যেন কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে কিছু একটা প্রমাণ করছিলেন, হয়তো লুসি সম্পর্কে কিংবা তাঁর নিজের সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন, লুসি শুধু মাটির উপর শুতে পারে। আর ওর

ইচ্ছানুযায়ী চললে টমকেও সে ওইভাবেই বড়ো করে তুলবে। ও তাকে এমন করে গড়ে তুলবে যে ছয় বছরের বাচ্চাগুলো তাকে যখন নাস্তানাবুদ করবে তখনও সে দৌড়ে পালাবে না। অথচ সে বেশ শক্তসমর্থ, ভালো ছেলে — সুন্দর ফুটবল খেলে – – আমি বাজী ধরে বলতে পারি যে একদিন সে তার কলেজ টীমে জায়গা পাবে — কিন্তু ও তার সর্বনাশ করবে। ও তাকে একটা খুকী বানিয়ে ছাড়বে। আমি টমকে কিছু একটা বলেছি কি তুমি দেখবে ওর মুখ বরফের মতো জমে গেছে। আজ রাতে আমি এখানে ফোন করে বলেছিলাম টম যেন ওখানে যায়, গিয়ে জনতার ভীড়টা দেখে। আমার বাড়িতে আসার সময় ছিলো না, তাই আমি ঠিক করেছিলাম সুগার–বয়কে পাঠিয়ে দেবো, সে টমকে নিয়ে যাবে। কিন্তু উনি কি তাকে যেতে দেবেন? না, স্যার। উনি বলে দিলেন যে তাকে বাড়িতে থাকতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা!

একটু থেমে তিনি বললেন, ও চায় নি যে টম ওখানে যাক। হ্যাঁ, এইটেই আসল কথা। ও চায় নি যে সে আমাকে দেখুক, ওই জনতাকে দেখুক।

আমি বললাম, আঃ, অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? সব মায়েরাই তাদের বাচ্চাদের নিয়ে এরকম করে। তাছাড়া, আপনিও তো বইপুঁথি পড়েই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

ও তো চালাকচতুর। খুকী না হয়েও বুদ্ধিমান। স্কুলে ভালো ফল করছে। করাই মঙ্গল, নইলে ওর হাড় গুঁড়ো করে দেবো। আমি অবশ্যই চাই যে ও মন দিয়ে পড়াশোনা করুক, কিন্তু যে ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না —

এমন সময় হলঘরের দিকে একটা হৈ চৈ শোনা গেলো, কয়েকজনের গলার আওয়াজ, দরজায় টোকার শব্দ।

কর্তা বললেন, দেখো কে?

আমি দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে কয়েকটি পরিচিত উদ্ভাসিত মুখ ঘরে ঢুকে পড়লো। সবার আগে টাইনি ডাফি। ওরা কর্তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কলকল করে উঠলো, আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছি ব্যাটাদের। হ্যাঁ! বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি একেবারে। আর সহসা মাথা তুলতে পারবে না।

কর্তা কিন্তু ত্রিশ ডিগ্রী বেঁকে যেমন কৌচে গা এলিয়ে ছিলেন তেমনি রইলেন, পা কৌচের চামড়ার উপরে তোলা, তাঁর অর্ধনিমীলিত চোখের দৃষ্টি ওদের মুখের উপর দিয়ে একবার ঘুরলো, যেন একটা গোপন ফুটো দিয়ে তিনি সব কিছু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলেন। একটি কথাও কিন্তু তিনি বললেন না।

হৈ হৈ করে দলের একজন বললো, শ্যাম্পেন! একদম খাঁটি শ্যাম্পেন। ফরাসী

শ্যাম্পেন। এক বাক্স। ফ্রান্স থেকে এসেছে! রান্নাঘরে স্যাম্বো বরফ দিয়ে আনছে। উৎসব করতে হবে, বস্!

কর্তার মুখ থেকে কোনো শব্দ বেরুলো না।

উৎসব, বস্, উৎসব। কি? উৎসব করবেন না?

এবার অনুচ্চ কণ্ঠে কর্তা বললেন, ডাফি, তুমি এতটা মাতাল হও নি যে আমি যে এখানে এই হট্টগোল পছন্দ করছি না সেটা বুঝতে পারছো না। তোমার সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে বাড়ির অন্য দিকে যাও। এখান থেকে একটু দূরে থাকো, কেমন?

সবাই চুপ। কর্তার দৃষ্টি আবার সবার মুখের উপর দিয়ে ঘুরে এসে ডাফির উপর স্থির হলো। তাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, কি, আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো?

তা টাইনি ডাফি সেটা বুঝতে পেরেছিলো। অন্যরাও পেরেছিলো। আমার মনে হলো কে আগে বেরিয়ে যাবে তার জন্য একটা ছোটখাটো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

কর্তা বন্ধ দরজার সুদৃশ্য প্যানেলিং-এর দিকে মিনিট দুয়েক তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি জানো লিঙ্কন কি বলেছিলেন?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি?

তিনি বলেছিলেন, বিভক্ত গৃহ টিকে থাকতে পারে না, কিন্তু তিনি ভুল বলেছিলেন।

ভুল?

হ্যাঁ, ভুল। কারণ এই সরকারের এক ভাগ হচ্ছে দাসানুদাস, আরেক ভাগ স্রেফ কুত্তার বাচ্চা। তুব তো এই সরকার টিকে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কারা এই দুইভাগ?

দাসানুদাসগুলো আসন গ্রহণ করে আইনসভায় , আর কুত্তার বাচ্চাগুলোর জায়গা হচ্ছে এখানে। একটু থেমে তিনি যোগ করলেন, শুধু মাঝে মাঝে তারা মিশে যায় পরস্পরের সঙ্গে।

কিন্তু ইমপীচমেন্টের হাঙ্গামা মিটে যাবার পর পরই লুসি স্টার্ক কর্তাকে ছেড়ে চলে যায় নি। ১৯৩৪ সালে কর্তা যখন দ্বিতীয় টার্মের জন্য নির্বাচিত হন তার পরও লুসি চলে যায় নি। (আমাদের স্টেটে পর পর দু'বার গভর্নর হওয়া যায় এবং কর্তা তাই হন প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে। ওই রকম ভোট আর কখনো কেউ পায় নি।) আমার মনে হয় লুসির থেকে যাবার পেছনে কারণটা ছিলো টম। শেষ পর্যন্ত লুসি যখন চলে গেলো তখন তা নিয়ে হৈ চৈ হয় নি। স্বাস্থ্য। প্রথমে শরীর সারাবার

উদ্দেশ্যে ফ্লোরিডায় গেলো অনেক দিনের জন্য। ফ্লোরিডা থেকে ফেরার পর সে শহরের ঠিক বাইরে তার বোনের ওখানে একটা ছোট্ট হাঁস-মুরগীর খামারে গিয়ে থাকতে আরম্ভ করে। টম ওই খামারে ওর সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটাতো, কিন্তু আমার মনে হয় টম যে আর মায়ের ছোট্ট ছেলেটি নেই সেটা বোধহয় লুসি উপলব্ধি করেছিলো। টম তখন লম্বা-চওড়া এক জোয়ান, একটু হামবড়া, ক্ষিপ্রগতি, ফুটবল মাঠের স্বাভাবিক কোয়ার্টারব্যাক। ততদিনে সে আবিষ্কার করে ফেলেছে যে বোতলে ক'রে শুধু পাস্তুরিত দুধ আসে না, অন্য জিনিসও আসে, আর মানবজাতির প্রায় অর্ধেকই তার নিজের চাইতে অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক ভিন্ন লিঙ্গের অধিকারী। লুসি ভেবেছিলো যে সে হয়তো টমকে কোনো রকমে ধরে রাখতে পারবে, এবং তার ফলে উইলির সঙ্গে তার ছেদটা চূড়ান্ত হয়ে উঠবে না। খুব বেশি নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে, লুসিকে উইলির সঙ্গে জনসমক্ষে দেখা যেতো। যেমন, সেবার যখন মেসন সিটিতে যাই, যেবার কর্তা আর আমি রাতদুপুরে বিচারপতি আরউইনের বাসায় গিয়েছিলাম, তখন লুসি আমাদের সঙ্গে ছিলো। সেটা ১৯৩৬ সালের কথা। ততদিনে বোনের হাঁস-মুরগীর খামারে লুসির বছর খানেক থাকা হয়ে গেছে।

মুখোশটা ঠিক রাখার জন্য কর্তা নিজেও মাঝে মাঝে ওই খামারে যেতেন। দু'তিন বার কাগজে, প্রশাসনের কাগজে, ছবিও বেরিয়েছিলো। তিনি, স্ত্রী ও সন্তানসহ, মুরগীর উঠোন কিংবা ডিমের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মুরগীর উপস্থিতিতে কোনো ক্ষতি হতো না। বরং এর ফলে একটা সুন্দর, ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি হতো। সেটা প্রত্যয়ের জন্ম দিতো।

## চতুর্থ অধ্যায়

যেদিন রাতদুপুরে কর্তা আর আমি বিচারপতি আরউইনের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেদিন প্রচণ্ড বেগে রাস্তা প্রায় পুড়িয়ে দিয়ে মেসন সিটিতে ফিরে আসবার পথে কর্তা আমাকে বলেছিলেন, কিছু না কিছু সব সময়ই থাকে।

আমি বলেছিলাম, হয়তো তাঁর ক্ষেত্রে নয়।

আর তিনি বলেছিলেন, মানুষের উৎপত্তি হয় পাপের মধ্যে, তার জন্ম হয় দুর্নীতির ভেতর, এবং তার পরিক্রমা শৈশবের নোংরামি থেকে কবরের দুর্গন্ধ পর্যন্ত। কিছু না কিছু সব সময়ই থাকে।

আর তিনি আমাকে বলেছিলেন খুঁড়তে, খুঁড়ে সেটা বার করে আনতে, একটা মরা বেড়াল, তার টান্‌টান্‌, ফোলা, ধূসর–সাদা চামড়ার গায়ে এখনো চাপচাপ রোঁয়া লেগে আছে। আমারই যোগ্য কাজ, কারণ আমি তো বলেছি, আমি এক সময় ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম। ছাই–এর গাদা, আবর্জনার স্তূপ, গোবরের ঢিবি, মানুষের এইসব অতীত থেকে ইতিহাসের ছাত্র কি বস্তু খুঁড়ে বার করে আনে তা নিয়ে সে কিছুমাত্র চিন্তিত নয়। সেটা একটা মরা বিড়াল, নাকি কোহিনূর হীরকখণ্ড তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। অতএব অতীতের গর্ভে ওই অভিযান আমার জন্য একটা যোগ্য কাজ ছিলো।

এটা ছিলো অতীতের বুকে আমার দ্বিতীয় অভিযান, প্রথমটার চাইতে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক ও উত্তেজনাপূর্ণ, অনেক বেশি সফলও। বস্তুতঃপক্ষে অতীতের কোলে আমার এই দ্বিতীয় অভিযান নিখুঁত সাফল্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু প্রথমটা সফল হয় নি। তার কারণ অনুসন্ধানপর্বের মাঝখানে আমি তথ্যের পরিবর্তে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলাম। তারপর যখন সত্য আবিষ্কার করা গেলো না, কিংবা আবিষ্কারের পর যখন আমি তা বুঝতে ব্যর্থ হলাম, তখন তথ্যের শীতলচক্ষু তিরস্কারের সঙ্গে বসবাস করা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলো। তাই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, যে–ঘরে একগাদা তিন–বাই–পাঁচ ইঞ্চি কার্ডের মধ্যে লিপিবদ্ধ

হয়ে তথ্যাবলী একটা বড়ো বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিলো। তারপর থেকে আমি চলতেই থাকি, যতক্ষণ না আমি আমার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক গবেষণাকর্মের সাক্ষাৎ পাই, যে-কর্মকে আখ্যায়িত করা উচিত 'ন্যায়পরায়ণ বিচারপতির মামলা' বলে।

কিন্তু তার আগে অতীতের মোহমায়ার মধ্যে আমার প্রথম অভিযানের কথা বলতে হবে। ওই প্রথম অভিযানের সঙ্গে যে উইলি স্টার্কের কাহিনীর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ আছে তা নয়, কিন্তু জ্যাক বার্ডেনের কাহিনীর সঙ্গে তার যোগ গভীর ও ব্যাপক। আর, একদিক থেকে, উইলি স্টার্কের গল্প আর জ্যাক বার্ডেনের গল্প আসলে একই গল্প।

অনেক আগে জ্যাক গার্ডেন ছিলো একজন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট, নিজের রাজ্যের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সে মার্কিন ইতিহাসে পিএইচ. ডি.-র জন্য কাজ করছিলো। ওই জ্যাক বার্ডেন (যে বর্তমান জ্যাক বার্ডেনের, আমার, আইনসম্মত, জৈবিক, হয়তো আধি-ভৌতিক পূর্বসূরি) আর দু'জন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টের সঙ্গে একটা নোংরা জঘন্য এ্যাপার্টমেন্টে বাস করতো। ওই দুজনের একজন ছিলো পরিশ্রমী, নির্বোধ, দুর্ভাগ্যের শিকার ও সুরামত্ত, এবং অন্যজন ছিলো অলস, বুদ্ধিমান, ভাগ্যবান ও সুরামত্ত। অন্ততঃ সহকারী শিক্ষক হিসাবে তাদের তুচ্ছ কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুচ্ছ চেক প্রাপ্তির পর, মাসের পয়লা তারিখ থেকে একটা সময় পর্যন্ত তারা সুরামত্ত অবস্থায় থাকতো। ওদের দুজনের একজনের পরিশ্রম ও দুর্ভাগ্য অপরজনের আলস্য ও সৌভাগ্যের সঙ্গে কাটাকাটি হয়ে যেতো এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই মোট ফল একই দাঁড়াতো। যা হাতের কাছে পেতো, যে কোনো ধরনের সুরা, তাই তারা পান করতো। তারা মদ খেতো কারণ তারা যে-কাজ করছিলো সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিলো না এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে তারা কোথাও একরত্তি আশার আলো দেখতে পেতো না। নিজেদের ডিগ্রীর কাজটা কোমর বেঁধে শেষ করার কথা তারা ভাবতেও পারতো না, কারণ তার অর্থ হবে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়া (মাসপয়লায় মদে চূর হওয়ায় যতি পড়া, সিগারেটের ধোঁয়াভর্তি ঘরে নিজেদের গবেষণাকর্ম ও আইডিয়ার কচকচানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে টলোমলো পায়ে খিক্ খিক্ করে হাসতে হাসতে তাদের এ্যাপার্টমেন্টে আসা তরুণীদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়া), রোদ-জ্বলা কোনো চৌরাস্তা-মোড়ের নর্মাল স্কুলে অথবা কোনো মিশনারী জুনিয়র কলেজে গিয়ে চাকুরি নেওয়া, যেখানে যীশুভক্তি যথেষ্ট আছে কিন্তু টাকা পয়সার বড়ো টানাটানি, তখন তাদের মুখোমুখি হতে হবে ক্লান্তিকর দৈনন্দিন রূঢ় বাস্তবতার, এবং যে সূক্ষ্ম সবুজ লতার মতো স্বপ্ন তারা এতোদিন তাদের হৃদয়ে লালন করে আসছিলো তা এক চিররুগ্ন মানুষের

জানালায় বোতলে রাখা পাতার মতো শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাবে। ওই বোতলে তো জল নেই, যে জিনিসটা আছে তা দেখতে জলের মতো, তার গন্ধ কেরাসিনের মতো, তার স্বাদ কার্বলিক এসিডের মতো ঃ শস্তা, বাজে, রদ্দি ভুট্টার হুইস্কি শুধু।

জ্যাক বার্ডেন ওদের সঙ্গে ওই নোংরা এ্যাপার্টমেন্টে বেসিনে আর টেবিলের উপর পড়ে থাকা আধোয়া বাসনকোসনের মধ্যে, সিগারেটের ভারী, ঘন, বাসি ধোঁয়ার মধ্যে, কোণায় স্তূপ করে রাখা ময়লা শার্ট আর আন্ডারওয়্যারের মধ্যে বাস করতো। ওই নোংরা পরিবেশের মধ্যে যেন সে এক ধরনের আনন্দ ও তৃপ্তি পেতো। মাখন মাখানো রুটির শেষ ছোট্ট টুকরোটা সে মেঝের উপর ফেলে দিতে পারতো, কারো পায়ের তলায় পড়ে গুঁড়ো হয়ে কাদা-রঙ্ কার্পেটের মধ্যে মিশে যাওয়া পর্যন্ত সেটা সেখানে পড়ে থাকতো. মোটা একটা আরশোলা বাথরুমের মেঝের ফাটা লিনোলিয়ামের উপর দিয়ে এগিয়ে আসতো, আর সে গরম জলভর্তি বাথটাবে শুয়ে শুয়ে ওই দৃশ্য দেখতে পারতো। একবার সে তার মাকে এখানে চা খেতে ডেকেছিলো। তিনি পুরু গদীওয়ালা চেয়ারের একেবারে ধারে বসে, হাতে ভাঙা পেয়ালা তুলে নিয়ে, অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তাঁর সযত্ন চর্চিত মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে, ভঙ্গুর আলাপচারিতায় মগ্ন হয়েছিলেন। রান্নাঘরের দোরগোড়া থেকে একটা আরশোলাকে তিনি উঁকি দিতে দেখেছিলেন। তিনি জ্যাক বার্ডেনের এক বন্ধুকে চিনির কৌটার ভেতর দিকে একটা পিঁপড়া টিপে মারতে এবং তারপর মরা পিঁপড়াটাকে আঙ্গুল থেকে ঝেড়ে ফেলতে দেখেছিলেন। ওর আঙ্গুলের নখ বিশেষ পরিষ্কার ছিলো না। তবু তিনি তাঁর অচঞ্চল মুখ থেকে মাধুর্য নিঃসরণের কাজ চালিয়ে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তাঁর সম্পর্কে ওকথা জ্যাক বার্ডেনের বলতেই হবে।

কিন্তু পরে রাস্তা দিয়ে ওরা দুজন যখন হেঁটে যাচ্ছিলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা, তুমি ওভাবে থাকো কেন?

জ্যাক বার্ডেন বলেছিলো, আমি হয়তো এরই জন্য তৈরি হয়েছি।

এই লোকগুলোর সঙ্গে, তিনি বলেছিলেন।

এরা ঠিক আছে। বলার পর তার মনে হয়েছিলো সত্যিই কি ওরা ঠিক আছে? সে-ই কি ঠিক আছে?

এক মিনিট তার মা কোনো কথা বললেন না। ফুটপাতের উপর তাঁর জুতোর উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ খটখট শব্দ হতে লাগলো, তাঁর সুন্দর কাঁধ ঋজু, একটু পেছনে হেলানো, তাঁর গালে বুভুক্ষু দেখতে টোল, চোখ দুটি নীল, মুখে নিষ্পাপ সৌন্দর্য, এপ্রিলের কম্পমান সূর্যাস্তের দিকে ওই মুখ সামান্য উঁচু করে তুলে ধরা, বিশ্বকে তিনি যেন একটা মূল্যবান উপহার দিচ্ছেন, যেটা শুধু দেখতে পাওয়ার জন্যই বিশ্বের

আনন্দিত হওয়া উচিত।

ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তিনি কতকটা আত্মমগ্নভাবে বলেছিলেন, ওই কালোচুলওয়ালা ছেলেটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিলে ও দেখতে খুব খারাপ হবে না।

জ্যাক বার্ডেন বলেছিলো, হ্যাঁ, অনেক মেয়েই তাই ভাবে, এবং তারপরই হঠাৎ ওই কৃষ্ণকেশী লোকটির বিরুদ্ধে, যে চিনির কৌটার মধ্যে আঙ্গুলে টিপে পিঁপড়া মেরেছিলো, যার নখ ছিলো ময়লা, তার মনে একটা বমি–বমি তীব্র বিতৃষ্ণার অনুভূতি জেগে উঠেছিলো। কিন্তু সে বলে চললো, তার ভেতরের একটা কিছু তাকে থামতে দিলো না। বললো, হ্যাঁ, এবং অনেক মেয়ে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেয়ার ব্যাপারেও মাথা ঘামায় না। যেমন আছে তেমন নিয়েই তারা খুশী। সেই হল এ্যাপার্টমেন্টের প্রেমিকশ্রেষ্ঠ। ওই ডিভানটার স্প্রিঙ্ সেই মাটি করেছে।

তিনি বলেছিলেন, আঃ, অসভ্যতা করো না। কথাবার্তায় অসভ্যতা অশালীনতা তিনি একদম বরদাস্ত করতে পারতেন না।

জ্যাক বলেছিলো, কথাটা সত্য।

তিনি এর কোনো জবাব দেন নি, তার জুতোয় উজ্জ্বল খটখট শব্দ হতে থাকলো। একটু পরে বললেন, ওই যাচ্ছেতাই কাপড়জামা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যদি একটু ভদ্ররকম পোশাক পরতো।

হ্যাঁ, ওর ওই পঁচাত্তর ডলারের মাসিক বেতনে!

এবার তিনি জ্যাকের পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জামাকাপড়ের অবস্থাও তো খুব খারাপ।

তাই?

আমি টাকা পাঠিয়ে দেবো, কিছু ভালো কাপড়জামা কিনে নিও।

ক'দিন পরে একটা চেক এলো, তার সঙ্গে একটি চিরকুট, যেন গোটাদুই ভালো স্যুট ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কিনে নেয়। আড়াই শো ডলারের চেক। ও একটা নেকটাই–ও কেনে নি। কিন্তু তার আর ওই দুটো মানুষের চমৎকার কিছু সময় কেটেছিলো, প্রায় পাঁচদিনের মতো, যার ফলে পরিশ্রমী ও দুর্ভাগ্যপীড়িত লোকটির চাকুরি চলে যায়, আর অলস ও ভাগ্যবান লোকটি বড়ো বেশি সামাজিক হওয়ার দরুন, তার সৌভাগ্য সত্ত্বেও, একটি সামাজিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু জ্যাক বার্ডেনের কিছু হয় নি। জ্যাক বার্ডেনের কখনোই কিছু হয় না। সে সকল বিপর্যয়ের ঊর্ধে। হয়তো সেটাই তার অভিশাপ, কোনো বিপর্যয় তাকে স্পর্শ করে না।

তো জ্যাক বার্ডেন ওই দুজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সঙ্গে সেই নোংরা এ্যাপার্টমেন্টে বাস করতে থাকে, কারণ চাকুরি চলে যাবার পরও পরিশ্রমী এবং ভাগ্যহীন লোকটা এ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যায় নি। সে পয়সা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো কিন্তু চলে গেলো না। সিগ্রেটের পয়সা ধার করতো। অন্যের কেনা, অন্যের রান্নাকরা খাবার, খেতো মুখ গোমড়া করে। সারাদিন শুয়ে থাকতো, কারণ তখন আর পরিশ্রম করার কোনো যুক্তি ছিলো না, কোনোদিনই না। ও ঘুমাতো বসার ঘরে, একটা দেয়াল-খাটে। একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার পর জ্যাক বার্ডেনের মনে হলো সে যেন বসবার ঘর থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পেলো। তারপর একদিন ভাগ্যহীন আর পরিশ্রমী লোকটিকে দেখা গেলো না। কোথায় গেলো সে কথা ওরা কোনোদিন জানতে পারে নি। তার কাছ থেকে কোনো খবর ওরা আর কখনো পায় নি।

কিন্তু এর আগে ওরা সেই এ্যাপার্টমেন্টে একটা ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহমর্মিতার পরিবেশে বাস করছিলো। একটা বিষয়ে তাদের মিল ছিলো, তারা সবাই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। তফাৎটা ছিলো কি থেকে তারা পালাচ্ছে সেইখানে। বাকী দুজন পালাচ্ছিলো তাদের ভবিষ্যত থেকে, তাদের ডিগ্রী পাওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাবার দিনটি থেকে। কিন্তু জ্যাক বার্ডেন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো তার বর্তমান থেকে। অন্য দুজন আশ্রয় নিয়েছিলো বর্তমানের বুকে, জ্যাক বার্ডেন অতীতের কোলে। অন্য দুজন বসবার ঘরে বসে তর্ক করতো, মদ খেতো, কিংবা তাস খেলতো কিংবা বই পড়তো, কিন্তু জ্যাক বার্ডেন পেছনের দিকে তার শোবার ঘরে একটা পাইন কাঠের টেবিলের সামনে বসে থাকতো, টেবিলে ছড়ানো থাকতো কাগজপত্র, টোকা, বই পুঁথি। বসবার ঘরের কোনো শব্দ তার কানেই পৌঁছুতো না। মাঝে মধ্যে হয়তো সে উঠে গিয়ে ওদের সঙ্গে একপাত্র মদ খেতো, কিংবা একহাত তাস খেলতো কিংবা ওদের সঙ্গে তর্ক করতো, কিংবা ওরা যা করছিলো তাতে অংশ নিতো, কিন্তু ওর আসল জিনিস ছিলো তার শোবার ঘরে পাইন কাঠের টেবিলের উপর ।

কি ছিলো শোবার ঘরের ওই পাইন কাঠের টেবিলের উপর?

একটা বড়ো চিঠির তাড়া, আটটা জীর্ণ কালো বাঁধাই হিসাবের খাতা, বিবর্ণ লাল ফিতা দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা, একটা পাঁচ-বাই-আট ইঞ্চি ফটোগ্রাফ, কার্ডবোর্ডের উপর বসানো, জল পড়ে নিচের দিকটায় দাগ ধরে গেছে, একটা সাদামাটা সোনার আংটি, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের আঙ্গুলের, সুতোয় ঝোলানো। এই হলো অতীত। কিংবা অতীতের সেই অংশ যার নাম ছিলো কাস্ মেস্টার্ন।

কাস্ মেস্টার্ন ছিলেন পণ্ডিত এটর্নী এলিস বার্ডেনের দুই মামার এক মামা, তার মা ল্যাভিনিয়া মেস্টার্নের এক ভাই। অন্য মামার নাম ছিলো গিলবার্ট মেস্টার্ন। ১৯১৪ সালে, চুরানব্বই কিংবা পঁচানব্বই বছর বয়সে, তিনি মারা যান। তিনি ছিলেন বিত্তশালী, রেলপথ নির্মাতা, বোর্ড অব ডিরেক্টরের সদস্য। তিনি ওই চিঠির তাড়া, কালো হিসাবের খাতা, ফটোগ্রাফ ও প্রচুর টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নাতিকে। (জ্যাক বার্ডেনকে এক পয়সাও দেন নি।) এর বছর দশেক পরে গিলবার্ট মেস্টার্নের ওই উত্তরাধিকারীটির জ্যাক বার্ডেনের কথা মনে পড়ে। জ্যাকের সঙ্গে তার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো না। তার হঠাৎ মনে পড়ে যে জ্যাক বার্ডেন ইতিহাসের ছাত্র কিংবা ওই জাতীয় একটা কিছু। সে তার কাছে ওই চিঠির তাড়া, হিসাবের খাতা আর ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দিয়ে জানতে চায় এগুলোর কোনো আর্থিক মূল্য আছে কিনা, জ্যাক বার্ডেন কি মনে করে এসম্পর্কে। কারণ সে, ওই উত্তরাধিকারী, শুনেছে যে লাইব্রেরি–টাইব্রেরি নাকি অনেক সময় এই জাতীয় পুরানো চিঠি, ছবি, স্মরণিকা প্রভৃতির জন্য বেশ মোটা টাকা দেয়। জ্যাক বার্ডেন উত্তর দিয়েছিলো যে যেহেতু ব্যক্তি হিসাবে কাস্ মেস্টার্নের কোনো ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই সেহেতু এইসব জিনিসের জন্য কোনো লাইব্রেরি কিছু যদি দেয়ও তো সেটা দু'চার ডলারের বেশি হবার সম্ভাবনা খুব কম। এই পরিস্থিতিতে জিনিসগুলোর সে কি ব্যবস্থা করবে জ্যাক বার্ডেন তা জানতে চেয়েছিলো। উত্তরাধিকারী ভদ্রলোক তাকে জানায় যে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে জ্যাক বার্ডেন হয়তো ভাবালুতাজনিত কারণে সেগুলি তার নিজের কাছেই রেখে দিতে চাইতে পারে।

আর এইভাবেই জ্যাক বার্ডেনের পরিচয় ঘটে কাস্ মেস্টার্নের সঙ্গে, যিনি ১৮৬৪ সালে এ্যাটলান্টার এক সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, যিনি এতদিন জ্যাক বার্ডেনের কাছে ছিলেন শুধু শ্রুত কিন্তু বিস্মৃত একটি নাম, ফটোর মধ্য থেকে, পঞ্চাশ বছর পরও, ধুলো আর ময়লার ভেতর দিয়ে যার একজোড়া কালো, গভীর, দূরস্থিত চোখ এখনো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলো। মুখটা শীর্ণ, লম্বা, কিন্তু তরুণ, আর হাল্কা কোঁকড়ানো কালো দাড়ির উপরে ঠোঁট দুটি ভরাট। ওই শীর্ণ মুখ আর জ্বলন্ত চোখের সঙ্গে ঠোঁট দুটি যেন মানাচ্ছিলো না। ওই চোখ দু'টিই ছিলো কাস্ মেস্টার্ন।

ছবিতে যুবকটিকে দেখা যাচ্ছিলো উরুর উপর থেকে দাঁড়ানো অবস্থায়। পরনে একটা ঢোলা জ্যাকেট, গলার কাছটায় বড়ো, হাতের দিকে খানিকটা ছোট, মজবুত কব্জি আর শীর্ণ হাত কোমরের কাছে ধরা। তখনকার সময়, স্থান ও শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উঁচু কপাল থেকে টেনে পেছনের দিকে আঁচড়ানো চৌকো করে কাটা

ঘন কালো চুল প্রায় জ্যাকেটের কলার পর্যন্ত নেমে এসেছে। জ্যাকেটটা ছিলো গৃহযুদ্ধের সময়কার কনফেডারেট সেনাবাহিনীর পদাতিক সৈনিকের পোশাক।

ছবিতে কালো জ্বলন্ত চোখের বিপরীতে আর সব কিছুকেই মনে হচ্ছিলো কেমন আকস্মিক। কিন্তু জ্যাকেটটির ক্ষেত্রে কোনো আকস্মিকতা ছিলো না। ওটা খুব হিসাব করে, প্রগাঢ় যন্ত্রণা, অহঙ্কার আর পরম বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে পরা হয়েছিলো, এই বিশ্বাস নিয়ে যে পরিধানকারী ওই পোশাকেই মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু মৃত্যু অতো দ্রুত কিংবা সহজ হয়ে আসে নি। সে এসেছিলো ধীর পায়ে, কঠিনভাবে, এ্যাটলান্টার এক পূঁতিগন্ধময় হাসপাতালে। প্যাকেটের শেষ চিঠিটা কাস্ মেস্টার্নের নিজের হাতে লেখা নয়। পচনধরা ক্ষত নিয়ে, হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে, তিনি তাঁর ভাই গিলবার্ট মেস্টার্নের কাছে ওই বিদায়ী চিঠি আরেকজনকে মুখে মুখে বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওই চিঠি এবং সর্বশেষ হিসাবের খাতাটি, যার মধ্যে কাস্ মেস্টার্নের দিনপঞ্জী ও জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ ছিলো, মিসিসিপিতে তাঁর দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আর কাস্ মেস্টার্ন সমাহিত হন এ্যাটলান্টার কোনো এক স্থানে, কোথায় তা কেউ কখনো জানতে পারে নি। একদিক থেকে কাস্ মেস্টার্ন যে ওই ঘামে ভিজে শক্ত হয়ে যাওয়া, কর্কশ, ধূসর জ্যাকেট পরে, যেটা ছিলো তার জন্য একটা গৌরবেরও প্রতীক, ধীরে ধীরে মরবার জন্য জর্জিয়ায় এসেছিলেন সেটা যোগ্য কাজই হয়েছিলো। কারণ তিনি জন্মেছিলেন জর্জিয়ায়, তিনি এবং গিলবার্ট মেস্টার্ন এবং ল্যাভিনিয়া মেস্টার্ন, টেনেসীর দিকে যে লাল পাহাড়গুলি উঠে গেছে সেখানে। জার্নাল বা জীবনবৃত্তান্তের প্রথম খণ্ডের প্রথম পাতায় লেখা ছিলো : আমি দারিদ্র্যের পরিবেশে উত্তর জর্জিয়ার একটি কাঠের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে আমি যদি কোমল শয্যায় শুয়ে থাকি, আহার করে থাকি রূপোর থালায়, তবুও সৃষ্টিকর্তা যেন আমার হৃদয় থেকে তুষার আর মোটা আহার্যের অভিজ্ঞান মুছে না দেন। কারণ সব মানুষই এই পৃথিবীতে আসে নগ্নদেহে, এবং আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন অনিবার্যভাবে উপর দিকে উত্থিত হয় সচ্ছলতাও তেমনি পাপের পথে তাদের টেনে নিয়ে যায়।

কাস্ যখন এই কথাগুলি লেখেন তখন তিনি কেন্টাকিতে ট্রান্সিলভানিয়া কলেজের ছাত্র। ওই সময় তিনি একটা 'অন্ধকার ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ' সময় অতিক্রম করে ঈশ্বরপ্রদত্ত শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর জার্নাল শুরু হয়েছিলো ওই অন্ধকার ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের বর্ণনা দিয়ে। ব্যাপারটা যথার্থই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ছিলো, কারণ পরিণামে তা রেখে যায় একটি মৃত পুরুষ আর একটি জীবন্ত রমণী আর কাস্ মেস্টার্নের শীর্ণ মুখে কয়েকটি দীর্ঘ নখের আঁচড়। কাস্ তাঁর জার্নালে লেখেন, আমি

এই ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করছি, একজন পাপীর পক্ষে যতোটা সততা অর্জন করা সম্ভব ততোটা সততা নিয়ে, যেন আমার মধ্যে যদি কখনো দেহ বা আত্মার কোনো অহঙ্কার দেখা দেয় তখন আমি যেন এই লেখা পড়ে লজ্জার সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি আমার মধ্যে কতোখানি পাপ ছিলো, কিংবা আবারো কতখানি পাপ জেগে উঠতে পারে, কারণ কে বলতে পারে পোড়া কাঠের উপর হাওয়ার দাপাদাপির ফলে পুনর্বার সেখানে আগুনের শিখা জ্বলে উঠবে না?

জার্নাল লেখার ইচ্ছা ওই 'অন্ধকার ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ' দিনগুলির অভিজ্ঞতা থেকে জেগে উঠেছিলো, কিন্তু স্পষ্টতঃই কাসের ছিলো একটা সুশৃঙ্খল মন, তাই তিনি একেবারে গোড়ায় গিয়ে জর্জিয়ার লাল পাহাড়ী এলাকার কাঠের ঘর থেকে শুরু করেছিলেন। গিলবার্ট ছিলেন কাসের চাইতে বছর পনের বড়ো। গিলবার্টই তাদের পরিবারকে কাঠের ঘর থেকে উপরে তুলে এনেছিলেন। বাচ্চা বয়সেই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে মিসিসিপি চলে যান, এবং তাঁর বয়স যখন ত্রিশের কোঠায়, অর্থাৎ ১৮৫০ সালের দিকে, তখনই তিনি একজন 'তুলা উন্নাসিক' রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিলেন। নিঃস্ব এবং নিঃসন্দেহে বুভুক্ষু একটি বালক, যে এক সময় মিসিসিপির কালো মাটিতে নগ্নপদে হেঁটে বেড়িয়েছে, দশ বারো বছর অতিক্রান্ত হতেই দেখা গেলো যে সে মালিক হয়েছে, তার বাড়ির সাদা বারান্দার সামনে একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। (ঘোড়াটির নাম ছিলো পাওহাটান — জার্নালে উল্লেখ আছে) কিভাবে গিলবার্ট তার প্রথম ডলারটি রোজগার করেছিলো? সে কি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে কোনো পথিকের গলা কেটেছিলো? সে কি সরাইখানার সামনে বসে জুতো পালিশ করেছিলো? সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু গিলবার্ট বিরাট সম্পত্তি গড়ে তুলেছিলেন, বসেছিলেন সাদা বারান্দায়, আর ভোট দিয়েছিলেন হুইগ দলের পক্ষে। তারপর গৃহযুদ্ধের শেষে যখন ওই বারান্দা ছাই-এর গাদায় পরিণত হয় আর সব সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যায় তখন যে-গিলবার্ট, যিনি খালি হাতে একদা একটা বিরাট সম্পত্তি গড়ে তুলেছিলেন, একেবারে হাওয়ার মধ্য থেকে, তিনি যে এখন তার সকল অভিজ্ঞতা, ধূর্ততা আর কাঠিন্য নিয়ে (চার বছর ঘোড়ার পিঠে থেকে থেকে, স্বল্পাহার করে, আশাভঙ্গ হয়ে যে কাঠিন্য এখন আরো কঠিন হয়ে উঠেছিলো) আবারো সম্পদশালী হয়ে উঠবেন, প্রথমবারের চাইতেও এবার অনেক বেশি, তার মধ্যে সত্যি সত্যি বিস্ময়ের কিছু ছিলো না। পরবর্তী সময়ে, শেষের দিনগুলিতে, যদি গিলবার্টের কখনো তাঁর ভাই কাসের কথা মনে পড়ে থাকে, আর তিনি তার শেষ চিঠিটা, এ্যাটলান্টার হাসপাতালে সে যেটা মুখে মুখে আরেকজনকে বলেছিলো, হাতে তুলে নিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তখন তাঁর মুখে একটা স্নিগ্ধ ব্যঙ্গের ভাব

ফুটে উঠেছিলো। কারণ ওই চিঠিতে লেখা ছিলোঃ আমাকে স্মরণ করো তুমি, কিন্তু শোকের সঙ্গে নয়। আমাদের মধ্যে যদি কেউ ভাগ্যবান হয়ে থাকে তবে সে ব্যক্তি আমি। আমি বিশ্রাম পাবো, এবং আমার আশা আছে আমি চিরন্তনের দয়া লাভ করবো, তাঁর আশীর্বাদধন্য হব। কিন্তু তুমি, আমার প্রিয় ভ্রাতা, তোমাকে আহার করতে হবে তিক্ততার রুটি, তোমাকে গড়তে হবে সেই স্থানে যেখানে শুধু পোড়া কাঠের টুকরো আর ছাই–এর গাদা, তোমাকে ইঁট বানাতে হবে কোনোরকম খড়কুটো ছাড়া, এবং আমাদের প্রিয় ভূমির ধ্বংস ও অপরাধ, এবং সকল মানুষের যে সাধারণ অপরাধ, তার সুকঠিন যন্ত্রণা তোমাকে ভোগ করতে হবে। আমার পাশের শয্যায় ওহায়োর একটি যুবক শুয়ে আছে। মৃত্যুপথযাত্রী। সে অনবরত গোঙাচ্ছে, শাপশাপান্ত করছে, এই যন্ত্রণার আস্তানায় আর সবাই যেভাবে প্রার্থনা করে তার প্রার্থনাও তার চাইতে ভিন্ন রকম নয়। সে তার অপরাধ নিয়ে এখানে মার্চ করে এসেছিলো, যেমন আমি এসেছিলাম আমার অপরাধ নিয়ে। আর সে এসেছিলো তার ভূমির অপরাধ নিয়েও। একটা ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ত্রাণ যেন আমাদের উভয়কে ধুলোর আসন থেকে ঊর্ধে তুলে নেয়। এবং, প্রিয় ভ্রাতা, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন যা হবে, যা আসছে, তার জন্য তিনি যেন তোমাকে শক্তি দেন।

গিলবার্ট পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে নিশ্চয়ই হেসে উঠেছিলেন, কারণ তাঁকে তিক্ততার কোনো রুটি খেতে হয় নি। এবং তাঁর নিজের ধরনের একটা শক্তি তাঁর মধ্যে সব সময়ই ছিলো। ১৮৭০ সাল নাগাদ তিনি আবার সচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন, ১৮৭৫ অথবা '৭৬ সাল নাগাদ রীতিমতো বিত্তশালী। ১৮৮০ সাল নাগাদ তাঁকে দেখা গেলো বিশাল সম্পত্তি এবং ঐশ্বর্যের মালিকরূপে, তখন নিউ ইয়র্কে থাকেন, নামজাদা মানুষ একটা, স্থূলদেহী, চলাফেরায় ধীরগতি, মাথাটা নিরাভরণ গ্র্যানিট পাথরের মতো। তিনি নিজের উত্তরণ ঘটিয়েছেন এক বিশ্ব থেকে আরেক বিশ্বে। সম্ভবতঃ তিনি পুরনো বিশ্বের চাইতে নতুন বিশ্বেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিংবা গিলবার্ট মেস্টার্নরা হয়তো যে কোনো বিশ্বেই নিজেদের সব সময় মানিয়ে নিতে পারেন। কাস্ মেস্টার্নরা যেমন কোনো বিশ্বেই, কখনোই, স্বচ্ছন্দ হতে পারেন না। কিন্তু যে কথা বলছিলাম। গিলবার্ট মেস্টার্নের নাতির কাছ থেকে জ্যাক বার্ডেন ওই কাগজপত্রগুলি পেয়েছিলো। তারপর যখন তার পিএইচ. ডি.–র অভিসন্দর্ভের জন্য বিষয় নির্বাচনের সময় হলো তখন জ্যাক বার্ডেনের প্রফেসর একটা পরামর্শ দিলেন। সে কাস্ মেস্টার্নের জার্নাল ও চিঠিপত্রগুলি সম্পাদনা করতে পারে, তার জীবনী নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে পারে, এবং ওইসব এবং আনুষঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে তা

একটা সামাজিক গবেষণাকর্ম হয়ে উঠতে পারে। অতএব জ্যাক বার্ডেন অতীতের পানে তার প্রথম ভ্রমণযাত্রা শুরু করলো।

প্রথমে কাজটা বেশ সহজ মনে হয়েছিলো। লাল পাহাড়ে কাঠের ঘরের জীবন পুনর্নির্মাণ করা কঠিন হয় নি। উন্নতির শুরুর দিকে গিলবার্ট প্রথম প্রথম যেসব চিঠি লিখেছিলো সেগুলি ছিলো। (গৃহযুদ্ধের আগের কালের গিলবার্ট মেস্টার্নের কাগজপত্র জ্যাক বার্ডেন হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছিলো) ওই জাতীয় জীবনের যে রূপ সবার জানা, প্রথমে সেটাই ছিলো। তারপর ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন এলো। সাচ্ছল্যের দিকে। অত দূরে বসেও গিলবার্টের সাচ্ছল্যের স্পর্শ কিছুটা অনুভূত হলো। তারপর এক সময় মা ও বাবা মারা গেলেন, আর তখন কাস্ এবং ল্যাভিনিয়ার সামনে গিলবার্ট এসে আবির্ভূত হলো, নিঃসন্দেহে এক অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক দৃশ্যের মতো, চমকপ্রদ এক প্রবঞ্চক, পরনে দামী কালো পোশাক, পায়ে চকচকে বুট জুতো, সাদা শার্ট, আঙ্গুলে ভারী সোনার আংটি। সে ল্যাভিনিয়াকে এ্যাটলান্টার স্কুলে ভর্তি করে দিলো, তার জন্য ট্রাঙ্কভর্তি কাপড় কিনলো, তারপর তার গালে স্নেহচুম্বন দিয়ে বিদায় নিলো। (ভাইয়া, আমাকে কি তুমি তোমার কাছে নিয়ে যেতে পারো না? আমি তোমার দেখাশোনা করবো, আদরযত্ন করবো, তোমার কথামতো চলবো সব সময়, ল্যাভিনিয়া এরকম লিখেছিলো গিলবার্টকে, ব্রাউন কালিতে, গোটা গোটা কপিবুকের হস্তাক্ষরে, তার নিজের স্বাভাবিক ভাষায় নয়, স্কুলের শেখানো সৌজন্যের ভঙ্গিতে। সে লিখেছিলো, আমি কি এখন তোমার ওখানে আসতে পারি না? ছোটোখাটো কোনো কাজই কি নেই যা আমি — কিন্তু গিলবার্টের ছিলো ভিন্ন পরিকল্পনা। ওর বাড়িতে ল্যাভিনিয়ার আসার যখন সময় হবে, তখন ল্যাভিনিয়া তৈরি হয়ে যাবে।) কিন্তু সে কাস্‌কে সঙ্গে নিলো। কাস্ তখন এক আড়ষ্ট ভ্যাবলা গোছের যুবক, পরনে কালো পোশাক, এক তরতাজা ঘোড়ার পিঠে আসীন।

তিন বছর পরে কাস্ আর আড়ষ্ট ভ্যাবলা যুবক রইলো না। গিলবার্টের বাড়ি ভালহাল্লায় সে তিন বছর মঠের মতো কঠিন নিয়মানুবর্তিতা আর পরিশ্রমের মধ্যে কাটায়, শিক্ষা গ্রহণ করে জনৈক মিঃ লসন এবং স্বয়ং গিলবার্টের কাছ থেকে। গিলবার্টের কাছ থেকে সে শিখেছিলো তুলা চাষের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়, আর মিঃ লসনের কাছ থেকে কিছু জ্যামিতি, কিছু লাতিন, আর প্রচুর প্রেসবাইটেরীয় ধর্মতত্ত্ব। মিঃ লসন ছিলেন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, আপন-ভোলা এক যুবক, নিউজার্সি, প্রিন্সটনের মানুষ। কাস্ বইপুঁথি পড়েছিলো আনন্দের সঙ্গে, এবং একবার গিলবার্ট (জার্নালে তাই লেখা ছিলো) দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাস্‌কে টেবিলের উপর মুখ গুঁজে লেখাপড়া করতে দেখেছিলো। এবং তখন সে বললো,

অন্ততঃ এটাতে তুমি ভালো করবে বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু ভালো সে অন্য ব্যাপারেও করেছিলো। গিলবার্ট তাকে একটা ছোটোখাটো তুলার খামার দিয়েছিলো। সে তার ব্যবস্থাপনায় চমৎকার দক্ষতার পরিচয় দেয়। (অবশ্য ভাগ্যও তাকে সাহায্য করেছিলো, মৌসুম ও বাজার দুই-ই তার পক্ষে ছিলো) সে এতো ভালোভাবে খামারটা চালায় যে দু'বছরের শেষে সে গিলবার্টকে তার ক্রয়মূল্যের একটা মোটা অংশ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়। তারপর কাস্ ট্রান্সিলভানিয়ায় যায়, বরং বলা চলে যে তাকে সেখানে পাঠানো হয়। আইডিয়াটা গিলবার্টের। একদিন রাতে সে কাসের খামারে এসে দেখে যে কাস্ টেবিলে বসে লেখাপড়া করছে। গিলবার্ট ঘরে ঢুকে বইপত্র ছড়ানো টেবিলটার কাছে চলে আসে, কাস্ তখন টেবিলের পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে। গিলবার্ট তার বাহু প্রসারিত করে হাতে ধরা ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে খোলা বইটার গায়ে ঠুক ঠুক করে টোকা দেয়। তারপর সে বলেছিলো, এর মধ্য থেকে হয়ত তুমি কিছু ফায়দা তুলতে পারবে। জার্নালে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু গিলবার্টের চাবুক কোন্ বই-এর বুকে টোকা দিয়েছিলো তার কোনো উল্লেখ নেই। বইটি কি ছিলো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিংবা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের মনের মধ্যেকার কিছু একটা, আমাদের কল্পনার ভেতরকার একটা কিছু, ওই তথ্যটি জানতে চায়। আমরা দেখতে পাই সাদা আস্তিনের ভেতর থেকে একটা লাল, চৌকো, শক্তিশালী হাত বেরিয়ে এসেছে (আমার ভাইর গড়ন বেশ বলিষ্ঠ, মোটাসোটা), সেই হাতে শক্ত করে ধরা একটা চাবুক, ওই হাতের মুঠিতে চাবুকটাকে মনে হচ্ছে একটা ক্ষীণ ভঙ্গুর গাছের মাথা। আমরা চাবুকের গোল ছোট চামড়ার মুখটাকে খোলা বই-এর উপর নেমে আসতে দেখি, হাল্কা ও দ্রুত ভঙ্গিতে, তেমন সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে নয়, কিন্তু ওই খোলা বই-এর পাতায় কি লেখা আছে তা আমরা পড়তে পারি না।

যাই হোক, সেটা ধর্মতত্ত্বের কোনো বই ছিলো না, কারণ তাহলে ওর মধ্য থেকে কাস্ হয়ত কিছু ফায়দা তুলতে পারে তেমন কথা গিলবার্ট বলতো কিনা সেটা খুব সন্দেহের বিষয়। তবে সেটা কোনো লাতিন কাব্যগ্রন্থের পাতা হতে পারে, কারণ গিলবার্ট আবিষ্কার করে ফেলেছিলো যে, অল্প মাত্রায় দিলে, ওই বস্তুটি রাজনীতি কিংবা আইনের সঙ্গে বেশ ভালো যায়। অতএব ট্রান্সিলভানিয়া কলেজ ঠিক হয়ে গেলো। পরে জানা গেলো যে গিলবার্টের পড়শী এবং বন্ধু মিঃ ডেভিস ওই পরামর্শটা দেয়। মিঃ জেফারসন ডেভিস এক সময় ওই কলেজের ছাত্র ছিলেন। মিঃ ডেভিস অধ্যয়ন করেছিলেন গ্রীক।

লেক্সিংটনের ট্র্যান্সিলভানিয়ায় কাস্ আবিষ্কার করেছিলো আনন্দ। কাস্

লিখেছে, আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে পুণ্যের জন্য যেমন তেমনি পাপের জন্যও একটা শিক্ষা আছে, এবং যা শেখবার তা আমি শিখেছিলাম জুয়ার টেবিল, সুরার বোতল, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আর শরীরের অবৈধ সুধা থেকে।

কাস্ এসেছিলো কাঠের ঘরের দারিদ্র্য আর ভালহাল্লার মঠের মতো কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন এবং তার ছোট্ট খামারের দায়িত্ব পালনের পরিমণ্ডল থেকে। আর সে ছিলো দীর্ঘদেহী এবং বলিষ্ঠ এবং, ছবি দেখে মনে হয় , তার জ্বলজ্বলে কালো চোখ নিয়ে রীতিমতো আকর্ষণীয়। তাই সে যে আনন্দ আবিষ্কার করেছিলো, কিংবা আনন্দই যে তাকে আবিষ্কার করেছিলো, তাতে অবাক হবার কিছু ছিলো না। কারণ, জার্নাল যদিও সেকথা বলে না, যে ঘটনাগুলি ওই 'অন্ধকার এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ' পরিণতি ডেকে আনে তার মধ্যে কাসের ভূমিকা ছিলো পশ্চাদ্ধাবনকারীর নয়, বরং পশ্চাদ্ধাবিতের। অন্ততঃ গোড়ার দিকে।

জার্নালে পশ্চাদ্ধাবনকারী উল্লেখিত হয়েছে 'সে' বা 'তার' রূপে। তবে জ্যাক বার্ডেন নামটা জেনেছিলো। 'সে' ছিলো এ্যানাবেল ট্রাইস, মিসেস ডানকান ট্রাইস। মিঃ ডানকান ট্রাইস ছিলেন লেক্সিংটন, কেন্টাকির, একজন স্বচ্ছল ব্যাংকার, কাস্ মেস্টার্নের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, স্পষ্টতঃই তাদেরই একজন যারা কাস্‌কে আনন্দের রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিলো। ১৮৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের লেক্সিংটনের খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটে একটা মৃত্যুর তথ্য খুঁজতে গিয়ে জ্যাক বার্ডেন নামটা জানতে পারে। মৃত্যুটা ছিলো মিঃ ডানকান ট্রাইসের। খবরের কাগজে ব্যাপারটাকে একটা দুর্ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়। কাগজ লেখে যে ডানকান ট্রাইস একজোড়া পিস্তল পরিষ্কার করছিলেন। ওই সময় হঠাৎ একটা পিস্তল থেকে গুলী ছুটে যায় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি তখন তাঁর লাইব্রেরিতে সোফায় বসেছিলেন, ওই সোফায় পরিষ্কার করা একটা পিস্তল পড়েছিলো। অপর পিস্তলটি, মৃত্যু ঘটায় যেটি, সেটি পড়ে গিয়েছিলো ঘরের মেঝের উপর। জ্যাক বার্ডেন জার্নাল থেকে ঘটনার প্রকৃতিটা জেনেছিলো, তাই বিশেষ পরিস্থিতিটা বোঝার পরই জার্নালের 'সে' যে কে সেটা আবিষ্কার করতে তার কোনো অসুবিধা হয় নি। কাগজে রিপোর্ট করা হয় যে মৃত্যুকালে মিঃ ট্রাইস তাঁর বিধবা স্ত্রীকে রেখে গেছেন, যার বিবাহ-পূর্ব নাম ছিলো এ্যানাবেল পাকেট। ওয়াশিংটন ডি.সি.-র অধিবাসী।

কাস্ লেক্সিংটন আসার অল্পকাল পরেই তার সঙ্গে এ্যানাবেল ট্রাইসের দেখা হয়। ডানকান ট্রাইস কাস্‌কে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলো। সে মিঃ ডেভিসের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলো। মিঃ ডেভিস লেখেন যে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু এবং প্রতিবেশী মিঃ গিলবার্ট মেস্টার্নের ভাই ওখানে যাচ্ছে। (ডানকান ট্রাইস নিজে

লেক্সিংটনে এসেছিলো দক্ষিণ কেন্টাকি থেকে, যেখানে তার বাবা ছিলেন জেফারসন ডেভিসের বাবা স্যামুয়েল ডেভিসের বন্ধু। স্যামুয়েল সে সময় ফেয়ারভিউতে বাস করতেন আর রেসের ঘোড়া পুষতেন।) অতএব ডানকান ট্রাইস দীর্ঘদেহী যুবকটিকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনেছিলো, তখন আর কাসের মধ্যে কোনো ভ্যাবলা ভাব ছিলো না। একটা সোফায় বসিয়ে ডানকান তার হাতে সুরার গ্লাস তুলে দিয়েছিলো, তারপর অতিথিকে স্বাগত জানাবার জন্য ডেকে এনেছিলো নিজের সুন্দরী ও ঈষৎ ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী স্ত্রীকে, যাকে নিয়ে তার গর্বের অন্ত ছিলো না। জার্নালে কাস্ লিখেছে, সে যখন প্রথম ঘরে এসে ঢুকলো তখন গোধূলির ছায়া ঘন হয়ে উঠতে শুরু করেছে কিন্তু মোমবাতি জ্বালাবার সময় তখনও হয় নি, তার চোখ দু'টি মনে হলো কালো, অথচ চুল সোনালী, অদ্ভুত লেগেছিলো আমার। তার হাঁটার ভঙ্গিও আমার চোখে পড়লো, কোমল ও অপূর্ব লীলায়িত, আর যদিও সে হয়তো ঈষৎ খর্বকায়া ছিলো তবু তার মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো একটা রাণীর মতো মর্যাদা —

> **et avertens rosea cervice refulist Ambrosiaeque comae divinum vertice odorem Spiravere, pedes vestis defluxit ad imos, Et vera incessu patuit Dea**

এইভাবেই মান্টুয়ান লিখেছিলেন, ভেনাস যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর হাঁটার ভঙ্গিই প্রকৃত দেবীর স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলো। সে ঘরে এসে ঢুকলো এবং তার গতিভঙ্গি বলে দিলো যে সত্যিকার দেবী সে, এবং ঈশ্বরের দয়া না হলে (যদি আমার মতো দূষিত, বিকৃত এক হতভাগার ভাগ্যে তা জোটে) আমার জন্য অনন্ত নরক। সে আমার সঙ্গে হাত মিলালো, কথা বললো ঈষৎ ভাঙা ভাঙা স্বরে, একটা নরম পুরু ভেলভেটের মতো কাপড়ে হাত ঘষবার কথা আমার মনে হলো। সচরাচর যে ধরনের কণ্ঠস্বর সুরেলা গানের মতো বলে প্রশংসিত হয় তার কণ্ঠস্বর সেরকম ছিলো না। আমি সেকথা জানি, কিন্তু আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর তার কণ্ঠস্বর যে প্রভাব ফেলেছিলো আমি শুধু সে কথাই লিপিবদ্ধ করতে পারি।

কাস্ তার চেহারার, তার প্রতিটি ভঙ্গির, পুংখানুপুংখ বর্ণনা দিয়েছে, যেন যন্ত্রণাবিদ্ধ একটা তালিকা তৈরি করেছে, 'অন্ধকার আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ' পরিস্থিতিতে, দুঃসহ কষ্টভোগ এবং প্রত্যাখ্যান করার মুহূর্তেও, শেষবারের মতো পেছন ফিরে তাকে একবার দেখে নিয়েছে, লবণের স্তম্ভে পরিণত হবার ঝুঁকি নিয়েও। সে লিখেছে, তার মুখমণ্ডল বড়ো ছিলো না, যদিও একটু ভরাটের দিকে ছিলো, মুখটা ছিলো তেজস্বী কিন্তু ঠোঁট দুটি লাল, ভেজা ভেজা, ঈষৎ ফাঁক করা, অথবা এখনই যেন ফাঁক হবে সেই রকম। চিবুক হ্রস্ব, সুডৌল। দেহের ত্বক, বাতি জ্বালাবার আগে

মনে হয়েছিলো, খুব সাদা কিন্তু পরে তাতে দেখা গেলো রঙের উদ্ভাসন। মাথায় ছিলো প্রচুর চুল, খুবই সুন্দর, পেছনে টেনে বড়ো বড়ো বেণী করে ঘাড় পর্যন্ত নামানো। কোমর ছিলো সরু, আর তার স্বাভাবিকভাবে সমুন্নত, গোলাকার, ভরাট স্তনযুগল বক্ষবন্ধনীর জন্য আরো উঁচু দেখাচ্ছিলো। তার পোশাক ছিলো, আমার মনে আছে, ঘন নীল সিল্কের, কাঁধের দিকে অনেকখানি নিচু করে কাটা, আর সামনের দিকে এমনভাবে যাতে করে তার স্তনযুগল দুটি বৃত্তের মতো উঁচু হয়ে উঠেছিলো।

ওই ভাবেই কাস্ তার বর্ণনা দিয়েছিলো। সে স্বীকার করেছিলো যে তার মুখমণ্ডল সুন্দর ছিলো না, 'যদিও তার বিভিন্ন অংশ ছিলো সুসমন্বিত ও সুবিন্যস্ত', আর তার চুল ছিলো ভারী সুন্দর, 'বিস্ময়কর রকম কোমল, স্পর্শ করলে মনে হতো যেন সিল্ক'। অন্ধকার ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতেও, ওই মুহূর্তেও, জার্নালে লিপিবদ্ধ হয়েছে কাসের আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে তার চুল পিছলে গলে যাবার স্মৃতি। কিন্তু, সে যোগ করেছে, তার আসল সৌন্দর্য ছিলো তার চোখজোড়া।

প্রথম প্রবেশ করার সময় ছায়াচ্ছন্ন ঘরটিতে তার চোখ দুটিকে যে কালো মনে হয়েছিলো সে কথা সে উল্লেখ করেছে। কিন্তু পরে কাস্ আবিষ্কার করে যে তার ভুল হয়েছিলো, এবং ওই আবিষ্কারই হয় তার সর্বনাশের প্রথম ধাপ। স্বাগত জানাবার পর (সে আমাকে সম্ভাষণ করেছিলো পরম সরলতা ও সৌজন্যের সঙ্গে, আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলো আমাকে) সে ঘরটা কি রকম অন্ধকার সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলো, বলেছিলো যে শরতের সন্ধ্যা ওই রকম আচমকা নেমে আসে। তারপর সে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজালে একটি নিগ্রো বালক এসে হাজির হয়। কাস্ লিখেছে, সে তাকে আগুন এনে আলোটা ঠিক করতে বলে। আলো তখন প্রায় নিভে গিয়েছিলো। বালকটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি সাতমাথাওয়ালা মোমবাতিদান নিয়ে এসে আমি যে কৌচে বসেছিলাম তার সামনের টেবিলের ওপাশটায় রাখলো। ও একটা ম্যাচ ধরাতেই সে বলে উঠলো, দাঁড়াও, আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি। আমার মনে হয় সব যেন গতকালের ঘটনা। আমি কৌচে বসে অলসভাবে মাথা হেলিয়ে মোমবাতিগুলিতে তার আগুন ধরানো দেখছিলাম। আমাদের দু'জনের মাঝখানে শুধু ছোটো একটা টেবিল। সে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলো, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কেমন করে তার বক্ষবন্ধনী তার স্তনদুটিকে তুলে ধরেছিলো, কিন্তু ঝুঁকে দাঁড়াবার ফলে চোখের পাতাগুলি তার চোখের উপর নেমে এসেছিলো, সে জন্য আমি তার চোখ ভালোভাবে দেখতে পাই নি। তারপর সে তার মাথা সামান্য উঁচু করে, সদ্য প্রজ্বলিত মোমবাতিগুলির উপর দিয়ে, সোজা আমার দিকে তাকালো, আর তখনই

আমি অকস্মাৎ লক্ষ করলাম যে তার চোখ কালো নয়। সে-চোখ নীল, কিন্তু এতো গাঢ় নীল যে আমি তাকে শুধু স্বচ্ছ পরিষ্কার আবহাওয়ায় শরতের নৈশাকাশের রঙের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যখন আকাশে কোনো চাঁদ নেই, আর তারাগুলি সবে উঠতে শুরু করেছে। আর ওই চোখদুটি যে কতো বড়ো তাও আমি আগে বুঝতে পারি নি। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি মনে মনে কয়েকবার বলেছিলাম, ওই চোখ দুটি যে কতো বড়ো তা আমি আগে বুঝতে পারি নি, কথাটা বলেছিলাম ধীরে ধীরে, একটা ভীষণ অবাক হয়ে যাওয়া মানুষের মতো, তারপরই আমি টের পেলাম যে আমি লাল হয়ে গেছি, আমার মুখের মধ্যে জিভ শুকিয়ে এসেছে, আমার পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে উঠেছে।

কাস্ লিখেছে, আমি এখনো তার মুখের অভিব্যক্তি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই, কিন্তু তার মর্মোদ্ধার আমি করতে পারি না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে যে তার মধ্যে বোধহয় একটা হাসি লুকানো ছিলো, কিন্তু সে-বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত নই। (আমি শুধু একটি বিষয়ে সুনিশ্চিত, যে মানুষ কখনো নিরাপদ নয়, এবং হে ঈশ্বর, আমার ত্রাণকর্তা, অনন্ত নরকের অবস্থান তার খুব কাছেই।) আমি বসেছিলাম হাঁটুর উপর একটা হাত শক্ত মুঠি করে ধরে, আরেকটা হাতে ধরা ছিলো আমার খালি গ্লাস আর আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। তখন সে তার স্বামীকে, যে ঘরের ভেতর আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলো, বলেছিলো, ডানকান, মিঃ মেস্টার্নের গ্লাস যে শূন্য সেটা দেখতে পাচ্ছো?

একটা বছর কেটে গেলো। কাস্ ছিলো বয়সে ডানকান ট্রাইসের চাইতে অনেক ছোট, বস্তুতঃপক্ষে সে ছিলো এ্যানাবেল ট্রাইসের চাইতেও কয়েক বছরের ছোট। কাস্ ডানকান ট্রাইসের একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হয়ে উঠেছিলো, তার কাছ থেকে সে অনেক কিছু শিখেও ছিলো। ডানকান ট্রাইস ছিলো বিত্তশালী, কেতাদুরস্ত, চালাক এবং উচ্ছল ('প্রচুর হাসতো, প্রাণ-ঐশ্বর্যে ভরপুর')। ডানকান ট্রাইস কাস্‌কে নিয়ে যায় সুরার পাত্র, জুয়ার টেবিল ও ঘোড়দৌড়ের ময়দানে, কিন্তু সে তাকে 'শরীরের অবৈধ সুধার' কাছে নিয়ে যায় নি। ডানকান ট্রাইস তার স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসতো। স্ত্রীর প্রেমে ছিলো সে আকণ্ঠনিমজ্জিত। কাস্ লিখেছে, সে ঘরে ঢুকলেই ডানকান তার দিকে নিলাজের মতো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো, ঘরে অন্য লোকজন থাকলে ডানকানের ওই তীব্র দৃষ্টির সামনে আমি তার স্ত্রীকে বিব্রত হতে, মুখটা ঘুরিয়ে নিতে, এবং লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে দেখেছি। কিন্তু আমার মনে হয় তার প্রতি ওর অত্যধিক পক্ষপাতিত্বের কারণে নিজের অজান্তেই ও ওইরকম করতো।

না, ডানকান ট্রাইস নয়, ট্রাইস গোষ্ঠীর অন্যান্য তরুণ সদস্যরাই কাস্‌কে প্রথম শরীরের অবৈধ সুধার সন্ধান দেয়। কিন্তু নতুন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ এবং আনন্দ উপভোগ সত্ত্বেও কাস্‌ তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকে। সময়ের টানাটানি তার হয় নি, কারণ সে ছিলো যথেষ্ট বলশালী, আর তার মধ্যে ছিলো টিকে থাকবার প্রচুর ক্ষমতা।

ওই ভাবে একটা বছর কেটে গেলো। ট্রাইসদের বাড়িতে তার অনেকটা সময় কেটেছে কিন্তু 'সৌজন্য এবং নির্দোষ হাসিগল্প' ছাড়া কাস্‌ আর এ্যানাবেল ট্রাইসের মধ্যে অন্য কোনো বাক্য বিনিময় হয় নি। তারপর জুন মাসে ডানকান ট্রাইসের এক বন্ধুর বাড়িতে একটা নাচের পার্টি হয়। সেখানে এক সময় ডানকান ট্রাইস, তার স্ত্রী ও কাস্‌ বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এক পর্যায়ে একটা ছোট্ট নিকুঞ্জে গিয়ে বসে। চারিদিকে মল্লিকার ঝাড়। ডানকান তিনজনের জন্যই পানীয় আনতে বাড়ির দিকে যায়। কাস আর ডানকানের স্ত্রী পাশাপাশি বসে ছিলো। কাস মল্লিকার মিষ্টি গন্ধ সম্পর্কে কি একটা মন্তব্য করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আবেগভরে মহিলা বলে ওঠে (কাস্‌ লিখেছে, তার কণ্ঠস্বর ছিলো নিচু গ্রামের, প্রায় আবেগরুদ্ধ, ভাঙা ভাঙা, ওই কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম), হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড়ো বেশি মিষ্টি। দম বন্ধ হয়ে আসে । আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো। সে নিজের ডানহাতটি, আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে, তার বক্ষবন্ধনীর চাপের ঊর্ধ্বে তার বুকের নিরাভরণ ঢৌলটির উপর স্থাপন করেছিলো।

কাস তার জার্নালে লিখেছে, আমার মনে হয়েছিলো তিনি বোধহয় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর কি মাথা ঝিম ঝিম করছে, তিনি কি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছেন? তিনি নিচু গলায় প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, না। তবু আমি তার জন্য এক গ্লাস জল আনবার উদ্দেশ্য নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই তিনি প্রায় রূঢ় কণ্ঠে হঠাৎ কথা বলে উঠলেন। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, বিশেষ করে তাঁর স্বভাবজ সৌজন্যের কথা মনে করে। তিনি বলেছিলেন, বসুন! বসুন আপনি। আমার জল চাই না! আমি কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বসে পড়লাম। আমি কি অজান্তে তার বিরক্তি উৎপাদন করেছি, তাকে কোনোভাবে অপমান করেছি? আমি বাগানের অপর দিকে তাকালাম। সেখানে দেখলাম নিচু নিচু ঝোপের মধ্যবর্তী সরু রাস্তা দিয়ে চাঁদের আলোয় জোড়ায় জোড়ায় কয়েকজন নারী-পুরুষ মন্থর ভঙ্গিতে পায়চারি করছে। আমার পাশে আসীন এ্যানাবেলের নিঃশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। অশান্ত, অনিয়মিত। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার বয়স কতো, মিঃ মেস্টার্ন। আমি বললাম, বাইশ। তখন তিনি বললেন, আমার বয়স উনত্রিশ। আমি অবাক

হয়ে তোৎলাতে তোৎলাতে কিছু একটা বলি। তিনি যেন আমার বিভ্রান্তি দেখে হেসে উঠেছিলেন, তারপর বলেছিলেন, হ্যাঁ, মিঃ মেস্টার্ন, আমি আপনার চাইতে সাত বছরের বড়ো। আপনাকে কি আমি অবাক করলাম, মিঃ মেস্টার্ন? আমি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিতেই তিনি বললেন, সাত বছর একটা দীর্ঘ সময়। সাত বছর আগে, মিঃ মেস্টার্ন, আপনি ছিলেন একটি শিশু। তারপর তিনি অকস্মাৎ তীক্ষ্ণভাবে হেসে ওঠেন, কিন্তু দ্রুত হাসি থামিয়ে বললেন, আমি কিন্তু শিশু ছিলাম না। সাত বছর আগে, মিঃ মেস্টার্ন, আমি শিশু ছিলাম না। আমি একথার কোনো উত্তর দিই নি, কারণ আমি স্বচ্ছভাবে কিছু ভাবতে পারছিলাম না। আমি বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলাম। কিন্তু আমার সেই বিমূঢ় বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও আমি মনে মনে তার শিশু-রূপটি দেখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার চোখের সামনে কোনো ছবি ভেসে ওঠে নি। এই সময় তার স্বামী বাড়ির ভেতর থেকে ফিরে আসেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পর কাস্ মিসিসিপি ফিরে যায়, সেখানে কয়েকমাস মন দিয়ে তার খামারের কাজকর্ম দেখে, তারপর গিলবার্টের নির্দেশে একবার রাজধানী শহর জেফারসন এবং একবার ভিক্স্বার্গে যায়। গিলবার্টের উদ্দেশ্য এবার সে স্পষ্ট দেখতে পেলো ঃ গিলবার্ট তাকে ধনী বানাবে, তারপর তাকে রাজনীতিতে নামাবে। এই সম্ভাবনা ছিলো ঝলমলে, খুশি হয়ে উঠবার মতো, এবং একজন যুবকের পক্ষে, যার ভাই কিনা গিলবার্ট মেস্টার্ন, মোটেই অযৌক্তিক আশা নয়। (কাস্ লিখেছে, আমার ভাই খুব শক্ত মনের মানুষ, কম কথা বলে, এবং যখন কথা বলে তখন অনাবশ্যক বিনয় বা বাজে সৌজন্যকে প্রশ্রয় দেয় না, তবু লোকজন, বিশেষ করে যারা গম্ভীর প্রকৃতির, দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাবান, তারা তার কথাকে বেশ গুরুত্ব দেয়।) তো গিলবার্টের কড়া হাত আর শীতল চোখের নিচে গ্রীষ্মকালটা কেটে গেলো। মৌসুমের শেষ দিকে, কাস যখন ট্র্যান্সিলভানিয়াতে ফিরে আসার কথা ভাবতে শুরু করেছিলো তখন লেক্সিংটন থেকে তার নামে অপরিচিত হাতে লেখা, একটা খাম এসে পৌঁছলো। ভেতরে একটি মাত্র পাতা। পাতাটা খুলতেই তার মধ্য থেকে একটা ছোট্ট পিষ্ট পুষ্পমঞ্জরী পিছলে পড়লো। এক মুহূর্তের জন্য কাস্ জিনিসটা কি, এবং কেন তার হাতে, বুঝতে পারে নি। তার পর সে নিজের নাকের কাছে সেটা তুলে ধরলো। সে গন্ধ পেলো, ক্ষীণ, ধূলিময়, মল্লিকার গন্ধ।

কাগজটা দু'বার ভাঁজ করা, চারটা সমান অংশে। একটা অংশে পরিষ্কার, সতেজ, কিন্তু বড়ো অক্ষরে নয়, লেখা ছিলো, ওহ্ কাস্! ব্যস, ওইটুকুই।

কিন্তু ওইটুকুই ছিলো যথেষ্ট।

লেক্সিংটনে ফেরার পর পরই বৃষ্টিঝরা শরতের এক অপরাহ্নে কাস্ তার শ্রদ্ধা

নিবেদনের জন্য ট্রাইসদের বাড়ি যায়। ডানকান ট্রাইস বাড়িতে ছিলেন না। শহরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে খবর পাঠিয়েছেন যে একটা জরুরী কাজে তিনি আটকে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে, রাতে এসে খাবেন, কিন্তু একটু দেরিতে। ওই অপরাহ্নের কথা কাস্ তার জার্নালে লিখেছে ঃ আমি দেখলাম যে ঘরে শুধু তিনি আর আমি। ঘর ছায়াচ্ছন্ন, প্রায় এক বছর আগের আরেক অপরাহ্নে যেমন ছিলো, যখন আমি তাকে এই ঘরেই প্রথম দেখি, যখন আমি তার চোখ দুটিকে ভেবেছিলাম কালো। তিনি সৌজন্যের সঙ্গে আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন, আমি উত্তর দিয়ে তাঁর করমর্দন ক'রে এক পা পিছনে সরে এলাম। তারপর আমি উপলব্ধি করলাম যে তিনি স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, এবং আমিও, একই ভাবে, তার দিকে। হঠাৎ তাঁর দুটি ঠোঁট সামান্য বিযুক্ত হলো, এবং তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো মৃদু গোঙানি কিংবা দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ। এর পর যেন একই সঙ্গে, যুক্তি করে, আমরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেলাম, বাঁধা পড়লাম পরস্পরের বাহুবন্ধনে। কোনো কথা না বলে আমরা ওই ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ। অন্ততঃ মনে হয়েছিলো অনেকক্ষণ আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি দৃঢ় আলিঙ্গনে তাকে আমার বুকের খুব কাছে ধরে রেখেছিলাম, কিন্তু আমরা চুমু খাই নি। পরে এটা বেশ অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু সত্যিই কি তা অদ্ভুত ছিলো? লজ্জার যে অবশিষ্ট একটা অংশ আমাদেরকে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে বাধা দেয় সেটা কি বিস্ময়কর কিছু? আমি অনুভব করছিলাম, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, আমার হৃৎপিণ্ড যেন আমার বুকের ভেতর ছুটছে, সব বাঁধন ছিঁড়ে, নোঙ্গর উপড়ে, সেটা আমার ভেতরের একটা গুহার মধ্যে দাপাদাপি করছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার বর্তমান পরিস্থিতিও মেনে নিতে পারছিলাম না। ওইখানে দাঁড়িয়ে, নাকভর্তি চুলের গন্ধ নিয়ে, একটা অবিশ্বাসের বোধ তখন আমাকে, আমার নিজস্ব পরিচয়কে, গ্রাস করেছিলো, এটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয় যে আমি, কাস মেস্টার্ন, তার বন্ধু এবং উপকারীর বাড়িতে এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। ওই হীন কাজের জন্য আমার মনে কোনো অনুশোচনা বা ত্রাসের বোধ জাগে নি, শুধু অবিশ্বাসের, যার কথা আমি উল্লেখ করেছি। (প্রথম যখন একটা অভ্যাস ভাঙ্গে তখন মানুষের মনে ওই রকম অবিশ্বাসের বোধ জাগে, কিন্তু ত্রাস বা আতঙ্কের বোধ জাগে তখনই যখন সে একটা নীতি ভঙ্গ করে। যে চারিত্রিক পবিত্রতা ও সম্ভ্রমের জ্ঞান আমার মধ্যে অতীতে ছিলো সেটা ছিলো নিছক অভ্যাসজাত একটা দৈব ঘটনা। সেটা সচেতন ইচ্ছার ফল ছিলো না। কিন্তু পুণ্য আর পবিত্রতা কি কখনো মানুষের সচেতন ইচ্ছার ফল হতে পারে? এটা ভাবাই তো অহঙ্কার।)

বলেছি, আমরা দুজন দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু তার মুখ ছিলো নিচু, আমার বুকের উপর, আর আমার নিজের দুচোখের দৃষ্টি ন্যস্ত ছিলো ঘর ছাড়িয়ে, জানালা দিয়ে, বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের উপর। অবশেষে সে যখন তার মুখ তুললো তখন দেখতে পেলাম যে সে এতক্ষণ নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করছিলো। কেন অশ্রু বিসর্জন করছিলো সে? আমি নিজেকে ওই প্রশ্ন করেছিলাম। এই জন্য কি, যে সে প্রতিকারের অসাধ্য একটা চরম অন্যায় কর্মের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলো, অথচ সেটা প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই, আর সে-কর্মের পরিণাম কি হবে, এটা ভেবেই কি সে অশ্রু বিসর্জন করেছিলো? এই জন্য কি, যে যে-লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরেছিলো সে তার চাইতে অনেক ছোট এবং ওই লোকটির আলিঙ্গন তার উপর যৌবন ও সাতটি বছরের তিরস্কার বর্ষণ করছিলো? কিংবা এই জন্য কি, যে সে এলো সাত সাতটি বৎসর দেরি করে, এবং একটা শুভ্র নিষ্পাপ পরিবেশে আসতে পারলো না? কারণটা কি ছিলো তাতে কিছু এসে যায় না। প্রথমটা হলে, তার অশ্রু প্রমাণ করে যে আবেগ-অনুভূতি কর্তব্যের কোনো বিকল্প নয়, আর দ্বিতীয়টা হলে, তার অশ্রু প্রমাণ করে যে নিজের প্রতি করুণা প্রজ্ঞার কোনো বিকল্প নয়। কিন্তু সে অশ্রু বিসর্জন করেছিলো, এবং অবশেষে সে যখন তার মুখ আমার মুখের কাছে তুলে ধরে তখন তার বড়ো বড়ো দু'চোখে ছিলো উজ্জ্বল অশ্রুকণা, এবং এখনও, যদিও ওই অশ্রুই আমার সর্বনাশ ডেকে এনেছিলো, আমি তাকে অশ্রু বিসর্জন না করা অবস্থায় কল্পনা করতে চাই না, কারণ ওই অশ্রু তার হৃদয়ের উষ্ণতার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, এবং প্রমাণ করে যে সে যে-পাপই করুক (এবং আমিও যে পাপই করে থাকি) সে চঞ্চল লঘু পায়ে ওই পথ মাড়ায় নি, আর তার চোখে ফুটে ওঠে নি যৌনক্ষুধার কঠিন কর্কশ দ্যুতি।

কাস্ তার জার্নালে আরো লিখেছে, ওই অশ্রুই আমার কাল হয়। কারণ সে যখন আমার মুখের কাছে তার মুখ তুলে ধরলো তখন আমার অনুভূতির মধ্যে একটা মমতার ধারা এসে মিশ্রিত হলো, আমার বুকের ভেতরকার বিশাল গহ্বরে এতক্ষণ আমার যে-হৃদয় দাপাদাপি করছিলো সেটা যেন এখন করুণাধারায় প্লাবিত হয়ে গেলো। এ্যানাবেল বললো, কাস্ — এই প্রথম সে আমাকে ওই নামে, আমার ক্রিশ্চিয়ান নামে, সম্বোধন করলো, আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ, আর সহজভাবে সে বললো, আমাকে চুমু খাও। এখন চুমু খেতে পারো। আমি তার মুখচুম্বন করলাম। আর তারপর আমাদের মানবীয় রক্তের অন্ধত্বে, আমাদের হৃদয়ের ক্ষুধায়, আমরা কাজটি করলাম। ওই ঘরেই, বাড়ির অন্য কোনো অংশে চাকরবাকররা তখন নম্র পদে চলাফেরা করছিলো, এঘরের দুয়ার খোলা, তার স্বামী যে কোনো মুহূর্তে এসে

পড়তে পারে, বাইরের অন্ধকার তখনো ঘরের মধ্যে এসে জমাট বাঁধে নি। কিন্তু আমাদের হঠকারিতাই আমাদের নিরাপত্তা যুগিয়েছিলো, যেন আমাদের কামনাতাড়িত হৃদয় একটা অন্ধকারের মেঘ তৈরি করে আমাদের দুজনকে তার মধ্যে ঢেকে দিয়েছিলো, ঠিক যেভাবে একদা দেবী ভেনাস ঈনীসকে মেঘের চাদরে ঢেকে দিয়েছিলেন যেন সে অন্য সব মানুষের চোখ এড়িয়ে ডাইডোর শহরে প্রবেশ করতে পারে। আমাদের মতো এ জাতীয় ক্ষেত্রে হঠকারিতাই নিরাপত্তাবোধের জন্ম দেয়, যেমন কামনার শক্তি ন্যায়বিচার ও সাধুতার অনুমোদন দান করে বলে মনে হয়।

যদিও সে অশ্রু বিসর্জন করেছিলো এবং কাজটি করার সময় তার মধ্যে একটা বিষণ্ণতা ও মরীয়া ভাব ফুটে উঠেছিলো, তবু তার ঠিক পরেই সে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলো খুব প্রফুল্লতা নিয়ে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে তার চুল ঠিকঠাক করে নিয়েছিলো। আমি, একটু থেমে থেমে, আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু একটা বলার চেষ্টা করেছিলাম, খুবই অস্পষ্ট এবং এলোমেলোভাবে, কারণ তখনো আমার চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত কিন্তু সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলো, আহ্, এখন ওসব কথা থাকুক, এমনভাবে বললো যেন আমি একটা নিতান্ত অর্থহীন বাজে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলাম। ভৃত্যকে ডেকে সে আলোর ব্যবস্থা করতে বললো। আলো দেয়া হলে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, দেখলাম সতেজ সুন্দর নিষ্কলঙ্ক একটি মুখ। তার স্বামী আসার পর সে তাকে সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে, প্রীতিভরে, স্বাগত জানালো। সে দৃশ্য দেখে আমার বুক যেন ছিঁড়ে গেলো, আমাকে স্বীকার করতে হবে, অনুশোচনায় নয়, বরং একটা তীব্র ঈর্ষার দংশনে। তার স্বামী যখন আমার সাথে করমর্দন করলো, কথা বললো, তখন আমি এতো বিচলিত বোধ করেছিলাম যে তা নিশ্চয়ই আমার মুখে চোখে ধরা পড়েছিলো।

তো,এইভাবে শুরু হয় কাস্ মেস্টার্নের কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব। ওই গোটা বছর ধরে, আগের মতো, সে প্রায়ই ডানকান প্রাইসের বাড়িতে এসেছে, এবং আগের মতোই তার সঙ্গে প্রায়ই অংশ নিয়েছে মুক্ত ময়দানের খেলাধুলায়, সুরাপানে, জুয়ার টেবিলে আর ঘোড়দৌড়ের মাঠে। সে শিখেছিলো, কাস্ লিখেছে, কেমন করে তার ভ্রূ অকুঞ্চিত রাখতে হয়, কেমন করে পরিস্থিতি মেনে নিতে হয়, কেমন করে নিজেকে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। এ্যানাবেল ট্রাইস সম্পর্কে সে লিখেছে যে পেছনের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে তার বিশ্বাস হতে চাইতো না যে সে এক সময় অশ্রু বিসর্জন করেছিলো। সে ছিলো, কাস্ লিখেছে, সহৃদয় ও উষ্ণ প্রকৃতির, বেপরোয়া, কামনাদীপ্ত, ভবিষ্যতের নাম উচ্চারণ পর্যন্ত সে সহ্য করতে পারতো না

(আমাকে সে ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ কক্ষনো তুলতে দিতো না), চটুল, বুদ্ধিমতী, আমাদের মিলনের উপায় উদ্ভাবনে সানন্দ তৎপর, অথচ সে এই সবই করতো এমন একটা রমণীয় মমত্ব ও কোমলতার সঙ্গে যে যেকোনো মানুষ তার পবিত্র গৃহকোণে এর জন্য নিজেকে ধন্য ও পুরস্কৃত মনে করতে পারতো। সে যে ক্ষিপ্রবুদ্ধি ও উদ্ভাবনশীল ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ সেকালে ও সেস্থানে লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে এই রকম একটা গোপন প্রণয়সম্পর্ক অব্যাহত রাখা নিশ্চয়ই ঘোরতর সমস্যার বিষয় ছিলো। ট্রাইসদের বাগানের পাদদেশে একটা গ্রীষ্মকালীন কুটীরমতো ছিলো, একটা গলি থেকে সেখানে প্রবেশ করা যেতো। তারা মাঝে মাঝে সেখানে মিলিত হতো। লেক্সিংটনে এ্যানাবেল ট্রাইসের এক সৎ-বোন বাস করতো, সে স্পষ্টতঃই প্রেমিকযুগলকে সাহায্য করে, কিংবা ওদের দুজনের সম্পর্কের ব্যাপারটা দেখেও দেখে নি, কিন্তু এটা ঘটে এ্যানাবেল বেশ কিছু চাপ সৃষ্টি করার পর, তার আগে নয়, কারণ তাদের দুজনের মধ্যে কাস্ একটা 'ঝড়ো দৃশ্য'-এর উল্লেখ করেছে। তো সে বাড়িতেও ঘটতো তাদের কিছু কিছু মিলনপর্ব। কিন্তু মাঝে মাঝে ডানকান ট্রাইসকে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে শহর ছেড়ে বাইরে যেতে হতো এবং সেই সব সময়, গভীর রাতে, দরজা খুলে দিলে কাস্ ট্রাইসদের বাড়িতেই আসতো, এক পর্যায়ে এ্যানাবেলের মা-বাবা যখন সে-বাড়িতে ছিলেন তখনও সে এসেছিলো। অতএব সে প্রকৃতপক্ষে ডানকান ট্রাইসের নিজের বিছানাতেই শয্যা গ্রহণ করেছিলো।

এর বাইরেও অবশ্য তারা মিলিত হয়েছিলো, অপরিকল্পিতভাবে, হঠাৎ দুজন দুজনকে একা পেয়ে কয়েক মুহূর্তের সুযোগ ছিনিয়ে নেওয়া সেই সব মিলন। কাস্ তার জার্নালে লিখেছে, আমার বন্ধুর পরম বিশ্বাসী বাড়ির কোনো কোণা, ঘুপচি, সংরক্ষিত আড়াল-আবডাল ছিলো না যাকে আমরা কলঙ্কিত করি নি, এবং তাও প্রখর নির্লজ্জ দিনের আলোয়। ইতিহাসের ছাত্র জ্যাক বার্ডেন যখন লেক্সিংটনে উপস্থিত হয়ে ট্রাইসদের সেই বাসভবন দেখতে যায় তখন তার ওই বাক্যটির কথা মনে পড়েছিলো। বাড়িটার চারপাশে শহর এখন অনেক বিস্তৃত হয়েছে, ট্রাইসদের বাগান বলতে ছোট্ট একটুখানি লন ছাড়া আর সবই বিলীন হয়ে গেছে, তবে বাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণ মোটামুটি ভালো। (বর্তমানে মিলার নামে একটি পরিবার সেখানে বাস করছিলো, তারা জায়গাটার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখায় নি।) জ্যাক বার্ডেন বাড়িটা ঘুরে দেখার অনুমতি পায়। সে হাঁটতে হাঁটতে সেই ঘরটিতে গিয়ে উপস্থিত হলো যেখানে এ্যানাবেল আর কাসের প্রথম দেখা হয়, যেখানে সদ্য প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির শিখার উপর দিয়ে এ্যানাবেল কাস্ মেস্টার্নের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলো, যেখানে এক

বছর পর সে মৃদু গোঙানি কিংবা দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে নিজেকে কাসের বাহুবন্ধনে সমর্পণ করেছিলো। জ্যাক বাইরের সুন্দর হলঘরটিতে গেলো, তার চমৎকার সিঁড়িটা দেখলো, তারপর ছোট, ছায়াচ্ছন্ন লাইব্রেরিতে, তারপর পেছনের আরেকটি ঘরে, যাকে স্পষ্টতঃই নির্জন কোণা বা সংরক্ষিত আড়াল–আবডাল বলা চলে, আর বস্তুতঃপক্ষে প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত আসবাবপত্রও সেখানে ছিলো। জ্যাক বার্ডেন বড় হলঘরটায় দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, ঠাণ্ডা, ছায়া ছায়া ঘর, সুন্দর ঝকঝকে মেঝে, নিঃশব্দ বাড়িতে তার অতীতের কথা মনে পড়লো, প্রায় সত্তুর বছর আগের কথা, তার মনে পড়লো বহু চোরা চাউনি, চাপা সতর্ক গুঞ্জন, নৈঃশব্দের মধ্যে অকস্মাৎ সিল্কের খসখসানি (সে যুগের পোশাক লঘু ঘরোয়া প্রণয়লীলার উপযোগী করে নিশ্চয়ই বানানো হতো না), কতো তীক্ষ্ণ নিঃশ্বাস টেনে নেওয়া, কতো দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করার কথা। তো, সেসব অনেক অনেক আগের কথা। এ্যানাবেল ট্রাইস আর কাস্ মেস্টার্ন বহু দিন হলো মরে ভূত হয়ে গেছে। এখন মিসেস মিলার নেমে এসে জ্যাক বার্ডেনের হাতে এক পেয়ালা চা তুলে দিলেন (তাঁর বাড়ি সম্পর্কে এজাতীয় 'ঐতিহাসিক কৌতূহল' দেখে তিনি বেশ তুষ্ট হন, যদিও ব্যাপারটার যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিলো না), নিঃসন্দেহে তিনি চটুল নন, তাকে দেখে মোটেই উদ্ভাবনশীল বলে মনে হয় নি, সম্ভবতঃ তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন এপিসকোপাল গীর্জার মহিলা সংস্থায় কাজ করে করে।

কাস্ মেস্টার্নের কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব, তার গোপন প্রণয়লীলার কাল, পুরো একটা এ্যাকাডেমিক বছর ধরে ব্যাপ্ত ছিলো, গ্রীষ্মের একটা অংশ এবং পরবর্তী শীতেরও অনেকখানি জুড়ে (কারণ তার খামারের কাজ দেখাশোনার জন্য এবং তার ছোটবোন ল্যাভিনিয়ার বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য কাস্‌কে মিসিসিপি যেতে হয়, ল্যাভিনিয়া বিয়ে করেছিলো উইলিস বার্ডেন নামক এক সদ্বংশজাত সুযোগ্য যুবককে), তারপর কাস আবার লেক্সিংটনে ফিরে আসে। এবং ১৮৫৪ সালের ১৯শে মার্চ ডানকান ট্রাইস তাঁর লাইব্রেরিতে (যা ছিলো তাঁর বাসভবনের একটা সংরক্ষিত আড়াল–আবডাল), বুকের মধ্যে একজন পুরুষ মানুষের বুড়ো আঙ্গুলের সমান সীসার গুলি নিয়ে, মৃত্যুবরণ করেন। স্পষ্টতঃই ব্যাপারটা ছিলো একটা দুর্ঘটনা।

স্বামীহারা বিধবা গীর্জাতে বসেছিলেন নিশ্চল ও সোজা হয়ে। একবার চোখে রুমাল ছোঁয়াবার জন্য যখন তিনি তার মুখের নেকাব উত্তোলন করেন তখন কাস্ মেস্টার্ন লক্ষ করে যে তার গাল 'মার্বেলের মতো পাংশু, শুধু দুগণ্ডে দুটি লাল বিন্দু,

জ্বর হলে যেমন হয়'। কিন্তু নেকাব নামিয়ে দেবার পরও 'ওই কৃত্রিম ছায়ার ভেতরেও' কাস্ দেখতে পায় দুটি স্থির উজ্জ্বল চোখের জ্বলজ্বলে দ্যুতি।

কাস্ মেস্টার্ন ও লেকিসংটনের আর পাঁচটি যুবক, মৃতব্যক্তির স্যাঙাত ও আনন্দসঙ্গী, শবাধার বহন করে। কাস্ লিখেছে, আমি যখন কফিনটি বহন করছিলাম তখন আমার মনে হলো যে এটার কোনো ওজন নেই, অথচ আমার বন্ধু ছিলেন লম্বা-চওড়া মানুষ, রীতিমতো মোটার দিকে। তারপরই আমার মনে একটা অদ্ভুত ভাবনা উদয় হলো, মনে হলো কফিনটা শূন্য, সমস্ত ব্যাপারটা একটা মুখোশপরা অভিনয়, একটা নকল খেলা, যাকে হাস্যকর ও অসঙ্গত-অপবিত্র পর্যায় পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছে, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া, স্বপ্নে যেমন হয়। কিংবা আমাকে প্রতারণা করার জন্য। আমি এই প্রতারণার শিকার, অন্য সবাই এর সঙ্গে যুক্ত, এবং ষড়যন্ত্রটা পরিচালিত হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই চিন্তা আমার মনে আসতেই একটা প্রচণ্ড ধূর্ততা ও উন্মত্ত উল্লাসের অনুভূতি আমাকে অকস্মাৎ গ্রাস করলো। ওদের চালাকি আমি ধরে ফেলেছি। আমাকে ওরা বোকা বানাতে পারে নি। আমার ভীষণ ইচ্ছা হলো কফিনটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিই, এর শূন্য অভ্যন্তর দেখি, এবং বিজয়ের হাসি হেসে উঠি। কিন্তু আমি কিছুই করলাম না, আমি দেখলাম কফিনটা গহ্বরে নামানো হলো, মাটির সমান করে বসানো হলো, আমরা মাটির উপর চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালাম, আর মাটি ফেলা হতে লাগলো কফিনের উপর।

কফিনের উপর মাটির প্রথম ঢেলাগুলি পড়ার শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। আর তখনই আমি অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করলাম, এবং একটা দুর্দমনীয় কামনার তাড়নায় আমি আক্রান্ত হলাম। আমি ওর দিকে তাকালাম। সে কবরের পায়ের দিকে দাঁড়িয়েছিলো, ওর মনের মধ্যে কি হচ্ছিলো তা বোঝার সাধ্য আমার ছিলো না। মাথাটা একদিকে ঈষৎ হেলানো, মুখের উপর নেকাব টানা। উজ্জ্বল সূর্যালোক ঝরে পড়ছে তার কালো পোশাক পরা দেহের উপর। আমি ওই দৃশ্যের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলাম না। ওর ভঙ্গিটা যেন তার দেহের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে তুলেছিলো, আমার উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের সামনে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কমনীয়তা যেন প্রবল ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছিলো। এমনকি তার পোশাকে যে শেষকৃত্যের আভা ছিলো তাও যেন একটা বাড়তি উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কড়া রোদ এসে পড়েছিলো আমার ঘাড়ের উপর। আমার কোটের ভেতর দিয়ে কাঁধের উপর আমি তার উত্তাপ অনুভব করছিলাম। আলোর অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো, আমি প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, আমার ইন্দ্রিয়াবলী তেতে উঠেছিলো। কিন্তু ওই সারাটা সময়, যেন বহু

দূর থেকে, আমি শুনছিলাম টাল করা মাটির গায়ে কোদালের শব্দ, কবরের মধ্যে ধুপধুপ করে মাটি ফেলার চাপা ধ্বনি।

ওই সন্ধ্যায় কাস্ ওদের বাগানে গ্রীষ্মকালীন কুটিরটিতে যায়। আগে কোনো কথা হয় নি, শুধু ভেতরের একটা তাড়নায় ও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। অনেকক্ষণ ও সেখানে অপেক্ষা করেছিলো, কিন্তু অবশেষে ও আসে, তার পরনে ছিলো কালো পোশাক, 'প্রায় রাত্রির মতো কালো'। সে কোনো কথা বলে নি। ও যখন 'ছায়াগুলির মধ্যে আরেকটা ছায়ার মতো' নিঃশব্দে ভেসে এলো, তখনো সে কোনো সাড়া না দিয়ে কুটিরটির অন্ধকারতম কোণে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। ও কুটিরের মধ্যে ঢোকার পরও কাস্ তার উপস্থিতি জানান দিলো না। কাস্ লিখেছে, আমার ওই নীরবতার পেছনে যে কোনো পূর্বস্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত ছিলো আমি সেকথা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না। একটা অপ্রতিরোধ্য তাড়না আমাকে অধিকার ক'রে ছিলো, আমার টুঁটি টিপে ধরেছিলো, আমার হাত-পা জমিয়ে দিয়েছিলো পাথরের মতো। আমি জানতাম, সেই মুহূর্তের আগে এবং পরেও, যে এইভাবে লুকিয়ে কাউকে দেখা অন্যায়, চরম অসভ্যতা, কিন্তু ওই মুহূর্তে এসব চিন্তা আমার মনে উদয়ই হয় নি। ওখানে ও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে একা, ওর উপর আমার স্থির একাগ্র দৃষ্টি রাখতে হবে। আমার মনে হলো যেহেতু ও এখানে নিজেকে একা ভাবছে সেহেতু আমি হয়তো এখন তার সত্তার স্বরূপটি বুঝতে সক্ষম হবো, তার স্বামীর মৃত্যু তার মধ্যে কি পরিবর্তন এনেছে, তার উপর কি প্রভাব ফেলেছে, সেটা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। অপরাহ্নে আমার বন্ধুর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যে আকস্মিক কামনা আমাকে গ্রাস করেছিলো তা এখন সম্পূর্ণ অপসৃত। আমি এখন পুরোপুরি প্রশান্ত। কিন্তু আমাকে জানতেই হবে, জানার চেষ্টা করতেই হবে। যেন ওকে জানার মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে জানতে পারবো। (এটা হলো মানবিক ত্রুটি — আরেক জনকে জানার মধ্য দিয়ে নিজেকে জানার চেষ্টা করা। মানুষ নিজেকে জানতে পারে শুধু ঈশ্বরের মধ্যে আর তাঁর বিশাল দৃষ্টির মধ্যে।)

ও কুটিরে ঢুকে আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে একটা বেঞ্চে অবশ ভাবে বসে পড়লো। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখলাম। ও সোজা নিশ্চল হয়ে বসে ছিলো। অনেকক্ষণ পর আমি খুব নিচু গলায়, যতোটা সম্ভব ততোটা নিচু স্বরে, নাম ধরে তাকে ডাকলাম। ও শুনলো কিনা তার কোনো রকম চিহ্ন পাওয়া গেলো না। তখন আমি আবার তার নাম ধরে ডাকলাম, আগের মতো, একই রকম করে। তারপর আবার। তিনবারের বার ও

অস্ফুট কণ্ঠে বললো, উঁ। কিন্তু সে তার মাথা ঘুরালো না, কিংবা তার বসবার ভঙ্গিও পরিবর্তন করলো না। তখন আবার তার নাম উচ্চারণ করলাম, এবার আগের চাইতে জোরে, আর তখনই সে ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো, তার গলা থেকে একটা রুদ্ধ আর্ত চিৎকার নির্গত হলো, আর তার হাত দুটি উঠে এলো তার মুখের দিকে। সে টলে উঠলো, মনে হলো যেন মেঝেতে পড়ে যাবে, কিন্তু সামলে নিয়ে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম, কোনো রকমে বললাম যে আমি তাকে চমকে দিতে চাই নি, কিন্তু আমার ফিসফিস আহ্বানের উত্তরে তাকে উঁ বলতে শুনেছি বলে আমার মনে হয়, আর তাই আমি কথা বলে উঠি। আমি এর পর জানতে চাই, তুমি কি আমার অস্ফুট ডাকের জবাবে উঁ বলেছিলে?

সে জানালো যে বলেছিলো।

তাহলে আমি যখন আবার তোমার নাম ধরে ডাকলাম তখন অতো আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলে কেন?

কারণ তুমি যে ওখানে আছো আমি সেটা বুঝতে পারি নি।

কিন্তু তুমি যে এইমাত্র বললে তুমি আমার অস্ফুট ডাক শনুতে পেয়েছিলে, জবাব দিয়েছিলে, আর এখন বলছো আমি যে ওখানে ছিলাম তুমি তা বুঝতে পারো নি।

নিচু গলায় সে আবার বলল, তুমি যে ওখানে ছিলে আমি তা জানতাম না। এবং এবার তার কথার তাৎপর্য আমার চেতনায় ধরা পড়লো।

আমি বললাম, শোনো, তুমি যখন অস্ফুট কণ্ঠে তোমার নাম উচ্চারিত হতে শুনেছিলে তখন কি তুমি আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছিলে?

সে উত্তর না দিয়ে স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

আমি তীব্র কণ্ঠে বললাম, জবাব দাও। আমাকে উত্তরটা জানতেই হবে।

সে তাকিয়েই থাকলো আমার দিকে, অবশেষে ইতস্তত করে বললো, আমি জানি না।

তুমি ভেবেছিলে — আমি বলতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জলে নিমজ্জমান একটি মানুষের মতো, আমাকে মরীয়া হয়ে আঁকড়ে ধরলো, তারপর পাগলের মতো বলে উঠলো, না, না, শোনো, আমি কি ভেবেছিলাম তাতে কিচ্ছু এসে যায় না, তুমি এখানে আছো, তুমি আছো!

তারপর আমার সব কথা বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে আমার মুখ নিচু করে টেনে

আমার ঠোটের উপর সে তার ঠোঁট চেপে ধরলো। শীতল ওষ্ঠযুগল, কিন্তু তা পড়ে রইলো আমার ওষ্ঠযুগলের উপর।

আমিও ছিলাম একেবারে ঠাণ্ডা, মৃত্যুর মতো হিমশীতল। এবং তারপর আমাদের মিলনপর্ব হলো ওই শীতলতার চূড়ান্ত ভয়াবহ রূপ, আমরা কাজটি করলাম যেন দুটি নিষ্প্রাণ পুতুল, আমরা যেন চরম লজ্জা ও নোংরামির একটা প্যারডি সংঘটিত করলাম।

কাজটির শেষে সে আমাকে লক্ষ করে বললো, আজ রাতে যদি আমি তোমাকে এখানে না দেখতাম তাহলে ওই মুহূর্তেই আমাদের দুজনের মধ্যেকার সব কিছু শেষ হয়ে যেতো।

আমি জানতে চাইলাম, কেন?

এটা ছিলো একটা দৈব সঙ্কেত।

দৈব সঙ্কেত?

এই সঙ্কেত যে আমরা পালাতে পারবো না, আমরা — সে একটু থেমে, অন্ধকারের মধ্যে তীব্র উত্তেজনাভরে, ফিসফিস করে বললো, আমি পালাতে চাই না — এটা একটা দৈব সঙ্কেত — যা কিছু করেছি আমি সেটা করা হয়ে গেছে। তারপর একটু শক্ত হয়ে সে বললো, তোমার হাতটা দাও।

আমি আমার ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে হাতটা ধরলো, তারপর ছেড়ে দিয়ে বললো, অন্য হাত।

আমার শরীরের উপর দিয়ে আমি অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, কারণ আমি বসে ছিলাম তার বাম পাশে। সে তার বাম হাত দিয়ে আমার হাতটা তুলে ধরে তার বুকের উপর চেপে ধরলো, তারপর হাতড়ে হাতড়ে আমার আঙ্গুলে, অনামিকায়, একটা আংটি পরিয়ে দিলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কি?

উত্তরে বললো, একটা আংটি। তারপর একটু থেমে যোগ করলো, ওর আংটি।

তখন আমার মনে পড়লো যে ও, আমার বন্ধু, তার আঙ্গুলে সর্বদা তার বিয়ের আংটিটি পরে থাকতো। আমি আমার মাংসের উপর শীতল ধাতব স্পর্শ অনুভব করলাম। আমি জানতে চাইলাম, তুমি কি এটা ওর আঙ্গুল থেকে খুলে নিয়েছিলে? কথাটা ভাবতেই আমি একটা ভীষণ নাড়া খেলাম।

সে বললো, না।

না?

না। ও নিজেই ওটা খুলেছিলো। ওই একবারই সে খুলেছিলো এই আংটি।

আমি তার পাশে বসেছিলাম, কিসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম বলতে পারবো না। ও তখনো আমার হাত তার বুকের উপর চেপে রেখেছিলো। আমি তার বক্ষের ওঠা–নামা অনুভব করতে পারছিলাম। আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরলো না।

তারপর সে বললো, তুমি শুনতে চাও কেমন করে — কেমন করে ও তার আংটিটা খুলে রাখে?

আঁধারের মধ্যে বসে আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, আমি অপেক্ষা করে থাকি তার কথা শুনবার জন্য। জিভ বার করে আমি আমার শুকনো ঠোঁটের উপর তা বুলিয়ে নিয়েছিলাম।

সে ফিসফিস করে, তীব্র প্রভুত্বব্যঞ্জক গলায়, আদেশ করেছিলো, শোনো, ওই রাত্তিরে, সব চুকেবুকে বাড়িঘর শান্ত হবার পর, আমি আমার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ছোট্ট চেয়ারটায় বসেছিলাম। ফিবি যখন আমার চুল আঁচড়ে দেয় তখন আমি সব সময় ওই আসনেই বসি। সেদিনও, মনে হয়, অভ্যাসের বশেই ওখানে গিয়ে বসেছিলাম, কারণ তখনও আমাদের দেহ–মন সম্পূর্ণ অসাড়। ফিবি রাতের বিছানা করছিলো, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। (ফিবি ছিলো এ্যানাবেলের ব্যক্তিগত পরিচারিকা, হলুদ রঙের একটি সুশ্রী তরুণী) আমি ফিবিকে বালিশটা সরাতে দেখলাম, শয্যায় আমার দিকের বালিশটা, তারপর যেখানে বালিশটা ছিলো সেখানে একটা জায়গার দিকে তাকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। সে ওখান থেকে একটা জিনিস তুলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। এক দৃষ্টিতে সে আমাকে দেখলো — তার চোখ দুটি ছিলো হলুদ রঙের, সেদিকে তাকিয়ে সে চোখে কি আছে তা বোঝা যেতো না — সে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো, তারপর সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তার হাত ছিলো মুঠিবব্ধ, আর সে আমাকে লক্ষ করছিলো, তারপর — ধীরে — অতি ধীরে সে তার আঙ্গুলগুলি খুললো, আর আমি তার করতলের উপর দেখলাম একটা সোনার আংটি — আমি জানতাম যে ওটা ডানকানের আংটি কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার শুধু মনে হয়েছিলো যে ওটা একটা সোনার আংটি আর ওটা পড়ে আছে একটা সোনার হাতের উপর। কারণ ফিবির হাত ছিলো সোনার — আমি আগে কখনো লক্ষ করি নি যে তার হাতের রঙ ছিলো একেবারে খাঁটি সোনারঙ। আমি তখন চোখ তুললাম, দেখলাম যে ফিবি তখনো স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটিও সোনালী, সোনার মতো কঠিন ও উজ্জ্বল। এবং আমি বুঝলাম যে সে বুঝেছে।

বুঝেছে? আমি প্রতিধ্বনি করলাম, একটা প্রশ্নের মতো, কিন্তু ততক্ষণে আমিও বুঝেছিলাম। আমার বন্ধু প্রকৃত অবস্থাটা টের পেয়েছিলো — তার স্ত্রীর শীতলতা

থেকে, চাকরবাকরদের কানাঘুষো থেকে — আর তখন সে তার আঙ্গুল থেকে সোনার আংটিটি খুলে তার শয্যায় নিয়ে যায়, যে শয্যায় তার স্ত্রীর সঙ্গে সে শুয়েছে, সেখানে তার স্ত্রীর বালিশের নিচে সে আংটিটা রেখে দেয়, তারপর নেমে এসে নিজের বুকে গুলী চালায়, কিন্তু এমন পরিস্থিতি তৈরি ক'রে, যেন একমাত্র তার স্ত্রী ব্যতীত আর কেউই ব্যাপারটাকে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু ভাবতে না পারে। কিন্তু একটা জায়গায় তার হিসেবে ভুল হয়ে যায়। হলুদরঙ তরুণীটি আংটিটা দেখে ফেলে।

আমার হাত তার বুকের উপর সজোরে চেপে ধরে, তার বুক তখন এক নতুন উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছিলো, জোরে জোরে ঢিব ঢিব করছিলো, সে বলেছিলো, ও জানে — ও বুঝেছে, আর সে আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, সব সময় দেখবে। তারপরই হঠাৎ তার গলা নেমে গেলো আর তার কণ্ঠস্বরে কান্নার সুর বাজলো ঃ সে বলে দেবে। ওরা সবাই জেনে যাবে। বাড়ির সবাই আমার দিকে তাকাবে, বুঝবে — যখন খাবার দেবে, যখন আমার ঘরে আসবে, — আর ওরা যখন হাঁটে–চলে তখন ওদের পায়ে একটুও শব্দ হয় না। কথাটা বলেই সে অকস্মাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো। আমি বসে থাকলাম। সে আমার পাশে দাঁড়ানো, তার পিঠ আমার দিকে, তার মুখ আর হাতের শুভ্র রঙ এখন আর দেখা যাচ্ছে না, আর আমার চোখে তার পোশাকের কালো রঙ যেন অত কাছে থেকেও ছায়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো। তারপর হঠাৎ সে কর্কশ কণ্ঠে, আমি তার স্বর বলে চিনতেই পারি নি, অন্ধকারের ভেতর থেকে বলে উঠেছিলো, এ আমি সহ্য করবো না, কিছুতেই সহ্য করবো না। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ভঙ্গি করে, নিচু হয়ে, আমার মুখচুম্বন করলো। তারপরই সে ছুটে চলে গেলো আমার পাশ থেকে, রাস্তার সুর্কির উপর আমি তার পায়ের শব্দ পেলাম। আর আমি অন্ধকারে ওখানে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। বসে বসে আঙ্গুলে আংটিটা বারবার ঘোরাচ্ছিলাম।

বাগানের ঘরে ওই সাক্ষাতের পর এ্যানাবেল ট্রাইসের সঙ্গে কাসের কয়েকদিন দেখা হয় নি। ও জেনেছিলো যে এ্যানাবেল লুইসভিলে গেছে। তার মনে পড়লো যে ওখানে তার কতিপয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। সে ফিবিকে তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো। তাই ছিলো স্বাভাবিক। তারপর ওর ফিরে আসার খবর পেয়ে সে ওই দিনই অনেক রাতে, বাগানের কুটিরে গিয়ে হাজির হয়। অন্ধকারের মধ্যে সে ওখানে বসেছিলো। কাস্‌কে সে সম্ভাষণ জানালো। পরে ওর মনে হয়েছিলো সে যেন দূরবর্তিণী, কেমন আনমনা, অদ্ভুতরকম বিচ্ছিন্ন, ঘুমের ঘোরের মধ্যে আছে, কিংবা কোনো ওষুধের প্রভাবের ভেতর। ও তাকে তার লুইসভিলে যাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো। সে

সংক্ষেপে জানায় যে সে নদীর ভাটিপথ ধরে পাডুকা গিয়েছিলো। কাস্ যখন মন্তব্য করে যে ওখানে তার কোনো বন্ধু আছে বলে তো তার জানা ছিলো না, তখন সে বলে যে, না, নেই। তারপরই হঠাৎ সে যেন ক্ষেপে গেলো, তার আনমনা, ছাড়া-ছাড়া ভাবের জায়গায় একটা হিংস্রতা ফুটে উঠলো, সে ক্রুদ্ধ গলায় ফেটে পড়লো, তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সব ব্যাপার জানতে চাইছো, এ আমি সহ্য করবো না। কাস্ একটা কিছু কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছিলো কিন্তু সে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, তবে যদি তুমি জানতে চাও তাহলে বলছি। আমি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম।

এক মুহূর্তের জন্য কাস্ সত্যি সত্যি বিভ্রান্ত বোধ করে।

কাকে? সে জিজ্ঞাসা করেছিলো।

ফিবিকে। আমি ওকে পাডুকা নিয়ে গিয়েছিলাম। সে চলে গেছে।

চলে গেছে? কোথায় চলে গেছে?

সে বললো, ভাটিপথ ধরে। তারপর আবার বললো, ভাটিপথ ধরে। বলেই সে খাপছাড়া ভাবে হেসে উঠলো এবং তারপর যোগ করলো, আর সে কোনোদিন আমার দিকে ওই রকম চোখ করে তাকাবে না।

তুমি তাকে বিক্রী করে দিয়েছো?

হ্যাঁ, আমি তাকে বিক্রী করে দিয়েছি। পাডুকাতে। ওখানে একটা লোক নিউ অর্লিয়ান্সের জন্য ক্রীতদাসের পাল যোগাড় করছিলো, তার কাছে। পাডুকাতে আমাকে কেউ চেনে না, আমি যে সেখানে গিয়েছিলাম কেউ সেকথা জানে না, কেউ জানে না যে আমি ওকে বিক্রী করে দিয়েছি। আমি বলবো যে ও ইলিনয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমি ওকে বিক্রী করে দিয়েছি। তেরশো' ডলারে।

কাস্ বলেছিলো, ভালো দাম পেয়েছো। ফিবি হলুদবর্ণ, চটপটে মেয়ে, তবু বলবো তুমি ভালো দাম পেয়েছো। কাস্ তার জার্নালে লিখেছে যে সে তিক্ততার সঙ্গে হেসে উঠে কর্কশ কণ্ঠে ওই কথা বলেছিলো, তবে কেন তা সে জানে না।

এ্যানাবেল জবাবে বলেছিলো, হ্যাঁ, আমি ভালো দাম পেয়েছি। লোকটার কাছ থেকে আমি ওর দাম কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আমি টাকাটা দিয়ে কি করেছিলাম তুমি জানো? জানো তুমি?

না।

আমি যখন লুইসভিলে জাহাজ থেকে নামলাম তখন দেখি যে ঘাটের কাছে এক বৃদ্ধ নিগ্রো বসে আছে, অন্ধ, গিটারে 'ওল্ড ডান্ টাকার্'-এর সুর বাজাচ্ছে আর গাইছে। আমি আমার ব্যাগ থেকে টাকাটা বার করে সব তার জীর্ণ টুপিটার মধ্যে ঢেলে দিই।

তো টাকাটা যদি তুমি দিয়েই দিতে চেয়েছিলে — তুমি যদি ওই টাকা কলঙ্কিত বলেই মনে করে থাকো — তবে ওকে মুক্তি দিলে না কেন?

ও যেতো না। এখানেই থাকতো ও। এখানেই থাকতো আর তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখতো। না, না, ও যেতো না, কারণ ওর স্বামীও এখানে থাকে। মোট্‌লিদের সহিস সে। ও এখানেই থাকতো, আমার দিকে তাকাতো, বলে দিতো, ও যা জানে সেই কথাটা ও বলে দিতো। আর আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করবো না।

তখন কাস্‌ বলেছিলো, আমাকে যদি তুমি জানাতে তাহলে আমি মিঃ মোট্‌লির কাছ থেকে লোকটাকে কিনে নিয়ে তাকেও মুক্ত করে দিতাম।

ওকে কেনা যেতো না। মোট্‌লিরা ওদের চাকরদের বিক্রী করে না।

কাস্‌ বলেছিলো, কেউ মুক্ত করতে চাইলেও করে না? কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে সে বলে উঠেছিলো, শোনো, আমার কাজে তুমি নাক গলাতে আসবে না। বুঝতে পারলে?

ওর পাশ থেকে উঠে সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো। কাস্‌ ছায়ার মধ্যে তার মুখটা ঝিলমিল করতে দেখলো, শুনতে পেলো তার অশান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ। কাস্‌ বললো, আমি ভেবেছিলাম ও তোমার প্রিয়পাত্রী।

সে বললো, ছিলো। কিন্তু যখন ও আমার দিকে ওই রকম দৃষ্টি নিয়ে তাকায় তারপর থেকে — তারপর থেকে আর নয়।

কাস্‌ জিজ্ঞাসা করেছিলো, তুমি ওর জন্য কেন ভালো দাম পেয়েছো জানো? উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে বলেছিলো, কারণ তার গায়ের রঙ হলুদ, সে দেখতে সুশ্রী, তার দেহের গড়ন চমৎকার। ওরা ওকে শেকলে বেঁধে ক্রীতদাসের পালের সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ওরা ওকে কুশ্রী মলিন করে তুলবে না। ওরা বেশ সযত্নে ওকে নিয়ে যাবে। তুমি জানো কেন?

সে বলেছিলো, হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তাতে তোমার কি? তুমি কি ওর রূপে এতোই মুগ্ধ?

এ তোমার অন্যায়।

তাই, মিঃ মেস্টার্ন? হ্যাঁ, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে আপনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ সহিসের সম্ভ্রমের কথা ভেবে চিন্তান্বিত। এটা খুবই মধুর ভদ্রজনোচিত অনুভূতি, মিঃ মেস্টার্ন — কাস্‌ যেখানে বেঞ্চে বসেছিলো সে সেখানে এগিয়ে এসে বলেছিলো — তো আপনি আপনার বন্ধুর ক্ষেত্রে এই অনুভূতির সামান্য কিছুটা কেন দেখান নি? আপনার সেই বন্ধু যিনি এখন মৃত।

জার্নাল অনুযায়ী, এই সময় কাসের বুকে 'একটা প্রচণ্ড ঝড়' উঠেছিলো। সে

লিখেছে, সব সময় যে-অভিযোগটি একটি ভদ্র ও সরল মানুষকে সব চাইতে বেশি মর্মপীড়া দেয় সেই অভিযোগটি আমি ওই মুহূর্তে আমার বিরুদ্ধে উচ্চারিত হতে শুনলাম। একজন লোকের হৃদয়-মন শক্ত হয়ে ওঠার পর সে তার ভেতরের দুর্বল ও ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের তাড়না সহ্য করতে পারে, কিন্তু যখন চিরকালীন কোনো কণ্ঠ অনুরূপ অভিযোগ করে তখন তা যেন একটা মানুষের গাল থেকে তার সমস্ত রক্ত শুষে নেয়। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু ওই অভিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না, কারণ সত্যি বলতে কি তার যন্ত্রণা আমি আগেই পুরোপুরি ভোগ করেছিলাম, ওটা আমার জন্য নতুন কোনো বিষয় ছিলো না। এটা শুধু আমার বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার ছিলো না। এটা শুধু আমার বন্ধুর মৃত্যুর ব্যাপার ছিলো না, যে-বন্ধুর বুকের দিকে আমিই বন্দুক তাক করেছিলাম। আমি কোনোরকমে এগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পারতাম। কিন্তু আমার হঠাৎ মনে হলো যে আমার বাইরে গোটা দুনিয়াটা যেন নড়ে যাচ্ছে, সব কিছুর সারবস্তু বদলে যাচ্ছে এবং যাবতীয় জিনিস ধ্বসে পড়বার ও চুরমার হয়ে যাবার প্রক্রিয়াটা সবে শুরু হয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছি আমি। আমার কপালে ঠাণ্ডা ঘাম জমে উঠেছিলো। আমার মনের ওই চরম বিপর্যস্ত অবস্থায়, ওই মুহূর্তে, আমি আমার মনের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট চিন্তাকে রূপ দিতে পারি নি। কিন্তু আমি পরে পেছনের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছি, কি সত্য তা জানবার জন্য যুদ্ধ করেছি। একজন ক্রীতদাসীকে, যে একটি বাড়িতে আশ্রয় ও ভালো ব্যবহার পেয়েছে, তাকে ওই বাড়ি এবং তার স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে ছিঁড়ে এনে কুৎসিত, নোংরা লাম্পট্যের জীবনে নিক্ষেপ করা হলো, কথাটা শুধু তাই ছিলো না। এসব জিনিস যে বাস্তব জীবনে ঘটে তা আমার জানা ছিলো। আমি তো শিশু ছিলাম না। বস্তুতঃপক্ষে লেক্সিংটনে আসার পর কতিপয় অমিতাচারী বন্ধুদের সাহচর্যে, শিকারী আর রেস-খেলুড়েদের পাল্লায় পড়ে, আমি নিজেও ওই জাতীয় আনন্দের অংশীদার হয়েছিলাম। যে রমণীর জন্য আমি আমার বন্ধুর প্রাণ এবং আমার সম্মান বিসর্জন দিয়েছিলাম এবং যে এখন তার অসহনীয় যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে আমার প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধভরে এমন চরম অপমানকর ভাষা প্রয়োগ করেছিলো যে আমি তাকে চিনতে পর্যন্ত পরাছিলাম না, ব্যাপারটা শুধু তাই ছিলো না। বরং এটা যেন ছিলো আমার একটি মাত্র পাপ ও বিশ্বাসঘাতকতার কাজ থেকে জন্ম নেওয়া যাবতীয় পরিণামের সমাহার — আমার বন্ধুর মৃত্যু, ফিবির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, যে রমণীকে আমি ভালোবেসেছিলাম তার যন্ত্রণা, ক্রোধ এবং রূপান্তর এই সব যেন একটি জায়গা থেকেই জন্ম নিয়েছিলো, যেমন গাছের শাখাপ্রশাখা জন্ম নেয় তার কাণ্ড থেকে, আর পত্রগুচ্ছ সেই সব শাখাপ্রশাখা থেকে।

কিংবা একটু ভিন্নভাবে বলতে গেলে, আমার কাজের দ্বারা আমি যেন গোটা পৃথিবীর ভিত্তিভূমিতে একটা কম্পন জাগিয়ে তুলেছিলাম, সেটা ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করতে করতে এতো অসম্ভব বেড়ে গেছে যে তার চূড়ান্ত পরিণতি যে কি হবে সেকথা বলার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। আমার বুকের ভেতরে যে ঝড় বয়ে চলেছিলো তাতে আলোড়িত হতে হতে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু আমি তখন তাকে এই ধরনের কোনো কথায় রূপ দিই নি।

যখন কাস্ তার চিত্তের আলোড়নকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় তখন সে জিজ্ঞাসা করেছিলো, তুমি মেয়েটিকে কার কাছে বিক্রী করেছো?

সে জবাব দিয়েছিলো, তাতে তোমার কি দরকার?

তুমি মেয়েটিকে কার কাছে বিক্রী করেছো?

বলবো না আমি।

ঠিক আছে, আমি বার করে নেবো। আমি পাডুকাতে যাবো, গিয়ে খুঁজে বার করবো।

সে হিংস্রভাবে কাসের বাহু আঁকড়ে ধরেছিলো, তার আঙ্গুলগুলি ওর মাংসে 'পাখির নখের মতো' বিঁধে গিয়েছিলো। সে তীব্র কণ্ঠে জানতে চাইলো, কেন, কেন যাবে তুমি?

কাস্ বলেছিলো, তাকে খুঁজে বার করতে, তারপর তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিতে। কাস্ কিন্তু আগে থেকে এ পরিকল্পনা করে নি। সে তার জার্নালে লিখেছে, কথাগুলি শোনার পর তার মনে হলো যে ওটাই ছিলো তার উদ্দেশ্য ঃ তাকে খুঁজে বার করতে, তারপর তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিতে। কথাটা বলা শেষ হতে না হতে এ্যানাবেল তার বাহু ছেড়ে দিলো, আর কাস অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ তার গালের উপর ওর তীব্র তীক্ষ্ণ নখের আঁচড় অনুভব করলো, এবং ওর গলায় শুনলো 'উন্মাদিনীর হিস হিস শব্দ', ও বলছিলো, যদি তুমি — যদি তুমি — ওহ্, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না, কিছুতেই না!

ও কাসের পাশ থেকে সবেগে বেঞ্চের উপর লুটিয়ে পড়লো। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটা অবরুদ্ধ আর্ত কান্নার শব্দ, 'পুরুষ মানুষের কঠিন শুষ্ক ক্রন্দনধ্বনির মতো'। সে নড়লো না। তারপর সে ওর কণ্ঠস্বর শুনলো, যদি তুমি — যদি তুমি ওরকম করো — আমার দিকে ওই রকম দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিলো — এ আমি সহ্য করবো না — এরপর ও একটু থেমে অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বলেছিলো, যদি তুমি ওরকম করো তাহলে এ জীবনে আমি আর তোমার মুখ দেখবো না।

কাস্ কোনো জবাব দেয় নি। সে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েছিলো, কতক্ষণ বলতে

পারবে না, তারপর চলে যায়, চলে যায় গলিপথ ধরে। এ্যানাবেল তখনো ওখানে বসেছিলো।

পরদিন সকালে সে পাডুকা যাত্রা করে। সেখানে সে দাস ব্যবসায়ীটির নাম জানতে পারে, কিন্তু এটাও জানতে পারে যে সে ফিবিকে (ফিবির বর্ণনার সঙ্গে মেলে সেরকম একটি হলুদবরণ তরুণীকে) জনৈক 'প্রাইভেট পার্টি'-র কাছে বেচে দিয়েছে। ওই লোকটা সেসময় পাডুকাতে উপস্থিত ছিলো কিন্তু সে ভাটির পথ ধরে চলে গেছে। পাডুকাতে সে অপরিচিত, কেউ তাকে চেনে না। আর প্রয়োজনীয় ক্রীতদাসের পাল জোটানো হয়ে গেলেই দাস ব্যবসায়ীটি যেন বাধামুক্ত হয়ে তার গন্তব্যে সরাসরি যেতে পারে সেজন্য সে ফিবিকে সঙ্গে না নিয়ে এখানেই বিক্রী করে দেয়। কাস খবর পায় যে সে এখন সাউথ কেন্টাকির পথে, সঙ্গের দাস মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে আরো কয়েকজনকে সে ওখান থেকে যোগাড় করবে। কাস্ ঠিকই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো। সে ফিবিকে তার পালের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জীর্ণ মলিন ক'রে ফেলতে চায় নি। তাই পাডুকাতে ভালো দাম পেতেই সে তাকে বিক্রী করে দেয়। কাস্ দক্ষিণে বোলিং গ্রীণ পর্যন্ত যায়, কিন্তু তারপর আর ব্যবসায়ীটির কোনো খোঁজ পায় নি। তখন অনেকটা হতাশ হয়ে সে তার নিউ অর্লিয়ন্সের বাজারের ঠিকানায় তাকে একটা চিঠি লেখে। সে যেন ফিবির ক্রেতার নাম ও সংশ্লিষ্ট খবরাখবর তাকে জানায়। তারপর সে আবার লেক্সিংটনে ফিরে আসে।

লেক্সিংটনে ফিরে এসে কাস ওয়েস্ট শর্ট স্ট্রীটে লিউইস রোবার্ড্স্-এর দাসনিবাসে যায়। মিঃ রোবার্ডস্ কয়েক বছর আগে পুরনো লেক্সিংটন থিয়েটারকে তার দাসনিবাসে রূপান্তরিত করে নিয়েছিলো। সে ছিলো এই অঞ্চলের প্রধান দাস ব্যবসায়ী। নদীর নিম্নাঞ্চলের দাস ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা আছে। কাস্ ভেবেছিলো তাকে ভালো কমিশন দিলে সে হয়তো ওই যোগাযোগের সূত্রে ফিবির খবর যোগাড় করে দিতে সক্ষম হবে। দাসনিবাসে গিয়ে অফিস ঘরে কাস্ একটি ছেলে ছাড়া আর কাউকে দেখলো না। ছেলেটি তাকে জানালো যে মিঃ রোবার্ড্স্ ভাটি অঞ্চলে গেছেন, তবে মিঃ সিমস্ এখন এখানকার কাজ দেখাশোনা করছেন, তিনি এই মুহূর্তে ওদিকের 'বাসা'-য় আছেন, সেখানে এখন 'ইন্সপেকশন' চলছে। অতএব কাস্ পার্শ্ববর্তী বাসায় গেলো। (জ্যাক বার্ডেন যখন কাস মেস্টার্নের জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য লেক্সিংটনে যায় তখন সে এই 'বাসা'টি পরিদর্শন করে, তখনো তা দাঁড়িয়ে আছে, গতানুগতিক পাকা দোতলা আবাসিক বাড়ির মতো, লম্বা ছাদ, সামনে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দরজা, ঘরের দু'পাশে জানালা, দুই প্রান্তে চিমনী। রোবার্ড্স্ তার 'সেরা মাল' খদ্দেরকে দেখাবার জন্য খাঁচায় না

রেখে এখানে রাখতো।)

কাস্ দেখলো যে বাসার প্রধান দরজায় তালা দেয়া নেই। সে ঢুকে পড়ে হলঘরে কাউকে দেখলো না, কিন্তু উপর থেকে ভেসে আসা হাসির শব্দ শুনতে পেলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের হলঘরের শেষ প্রান্তে একটা খোলা দরজার সামনে সে অল্প কয়েকজন লোককে জটলা করতে দেখলো। ওদের মধ্যে দু'জনকে সে চেনে, বখাটে দুই যুবক, শহরের বিভিন্ন জায়গায় আর রেসের মাঠে সে তাদের দেখেছে। সে এগিয়ে গিয়ে মিঃ সিমস্-এর খোঁজ করলো। একজন তাকে জানালো যে মিঃ সিমস্ ভেতরে আছে, 'দেখাচ্ছে'। ওদের মাথার উপর দিয়ে কাস্ ঘরের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিলো। প্রথমে তার চোখে পড়লো একজন বেঁটে, শক্তসমর্থ পুরুষ মানুষ, চকচকে দেখতে, কালো চুল, কালো স্কার্ফ ঘাড়ে জড়ানো, বড়ো বড়ো উজ্জ্বল কালো চোখ, কালো কোট গায়ে, হাতে একটা চাবুক। সঙ্গে সঙ্গে কাস্ বুঝলো যে এই হলো ফরাসী 'স্পেকুলেটর', যে লুইসিয়ানার জন্য 'বিশেষ সরেস মাল' কিনতে এসেছে। কাসের দৃষ্টিসীমানার বাইরে ফরাসী লোকটি কিছু একটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। কাস্ আরেকটু এগিয়ে যেতেই সে ঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখতে পেলো।

শোলার হ্যাট মাথায় একটা সাদামাটা লোককে সে দেখলো। তাকে সে মিঃ সিমস্ বলে ধরে নিলো। তার ওপাশে একটি মেয়ে, অল্প বয়সের। উনিশ-কুড়ি হবে, ক্ষীণাঙ্গী, গায়ের রঙ গজদন্তের চাইতে একটু ময়লা, চুল যতখানি কোঁকড়া তার চাইতে বেশি মুচমুচে, চোখ দুটি গাঢ় কালো। স্বচ্ছ, ঈষৎ রক্তোচ্ছ্বাসভরা, সে ফরাসী লোকটির মাথার উপর দিয়ে একটা বিন্দুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির পরনে বিক্রীর জন্য ক্রীতদাস মেয়েদের পরনে যেরকম প্রচলিত পোশাক ও রুমাল থাকে সে রকম কিছু ছিলো না। সে পরেছিলো সাদা ঢোলা একটা কাটা পোশাক, পোশাকের হাত কনুই পর্যন্ত। শার্ট মেঝে ছুঁয়ে আছে, মাথায় কোনো রুমাল নেই। শুধু একটা ফিতা দিয়ে তার চুল বাঁধা। তার পেছনে একটা পরিচ্ছন্ন সাজানো ঘর ( জার্নালে কাস্ লিখেছে, 'বেশ ছিমছাম' তবে সে লক্ষ করেছে যে জানালায় গরাদ দেয়া আছে)। ওই ঘরে আছে একটা দোল-চেয়ার, ছোট একটা টেবিল, টেবিলের উপর একটা সেলাইর ঝুড়ি, পাশেই পড়ে আছে একটা সৌখিন সেলাইর কাজ, কাপড়ে সুঁই আটকানো, 'যেন কোনো সম্ভ্রান্ত তরুণী কিংবা কোনো গৃহকর্ত্রী অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য হাতের কাজটা নামিয়ে রেখে এইমাত্র উঠে গেছে। কাস্ লিখেছে যে সে কেন যেন ওই সেলাইর কাজটির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো।

মিঃ সিমস্‌ তখন বলছিলো, হ্যাঁ, এই, এই, এই যে। সে মেয়েটির কাঁধ ধরে তাকে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে তার পুরো শরীরটা দেখাচ্ছিলো। তারপর সে তার একটা কব্জি ধরে বাহুটা কাঁধের সমান উঁচু ক'রে বারদুই সেটা ভাঁজ করে দেখালো কি রকম সাবলীলভাবে তা ওঠানামা করে, আর মুখ দিয়ে সে উচ্চারণ করলো, এই যে। এর পর সে হাতটা ফরাসী লোকটির দিকে সামনে টেনে আনলো. কব্জির কাছে ধরে থাকা তার হাতটা নিষ্প্রাণভাবে ঝুলে ছিলো। (জার্নালের বর্ণনা অনুসারে, 'হাতটা ছিলো সুডৌল. আঙ্গুলগুলি সামনের দিকে সুন্দরভাবে সরু হয়ে আসা'।) মিঃ সিমস্‌ বলেছিলো, ওর হাতটা দেখুন। এর চাইতে ছোট, এর চাইতে মোলায়েম হাত কোনো ভদ্র রমণীরও নেই। কেমন গোল গোল আর নরম, হ্যাঁ?

দরজার কাছ থেকে একজন চেঁচিয়ে জানতে চাইলো, গোল আর নরম অন্য কিছু নেই ওর? প্রশ্নটা শুনে আর সবাই হেসে উঠলো।

মিঃ সিমস্‌ বললো, আছে, আছে। সে ঝুঁকে পড়ে তার পোশাকের নিম্ন প্রান্তদেশ ধরে একটা চটুল রমণীয় ভঙ্গিতে সেটা তার কোমরের উপরে তুলে আনলো, তারপর নিজের অন্য হাত দিয়ে কাপড়টা ওর কোমরের চারপাশে জড়িয়ে ধরলো। ওই ভাবে সেটা তার হাতে ধরে রেখেই সে মেয়েটির চারপাশে ঘুরলো, মেয়েটিকেও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে বাধ্য করলো (কাস্‌ লিখেছে, মেয়েটি কোনো বাধা দিলো না, সে যেন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ছিলো), যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নিতম্ব দরজার মুখ থেকে স্পষ্টভাবে দেখা গেলো। মিঃ সিমস্‌ বললো, দেখে নাও, বাপুরা, গোল আর নরম। সে সজোরে মেয়েটির নিতম্বে একটা চাপড় মারলো, সেখানকার মাংস থরথর করে কেঁপে উঠলো। সিমস্‌ জিজ্ঞাসা করলো, কি বাপুরা? এর চাইতে গোল আর নরম কোনো কিছুর উপর জীবনে কখনো হাত বুলিয়েছো? এ্যাঁ? এতো একটা কুশান। মিষ্টি জেলির মতো।

একটা লোক বলে উঠলো, কী কাণ্ড? পায়ে আবার মোজা পরে আছে দেখছি!

অন্য লোকগুলি যখন হাসাহাসি করছিলো তখন ফরাসী ক্রেতাটি দু'পা সামনে এগিয়ে এসে মেয়েটির নিতম্ব যেখান থেকে স্ফীত হয়ে উঠতে শুরু করেছে ঠিক তার উপরে ছোট্ট বর্তুলাকার চাপা জায়গায় তার চাবুকের মাথাটা স্থাপন করলো। এক মুহূর্তে সে সূক্ষ্ম কোমলতার সঙ্গে সেটা ওখানে চেপে ধরে রাখলো, তারপর ধীরে ধীরে সেটাকে টেনে নামিয়ে আনলো, দুটি নিতম্বের উপর দিয়ে সমান গতিতে, বঙ্কিম ডৌল দুটি যেন স্পষ্ট বোঝা যায় সেজন্য। বিদেশী কণ্ঠে সে বললো, ঘুরিয়ে দেখাও।

মিঃ সিমস্‌ নিজের হাতে ধরা কাপড়টি ঘোরালো। মেয়েটিও অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে

গেলো, আর দরজার কাছে দাঁড়ানো একটি লোক সঙ্গে সঙ্গে শিস্ দিয়ে উঠলো। ফরাসীটি তরুণীর পেটের উপর তার চাবুক স্থাপন করলো, যেন সে একটা কাঠমিস্ত্রী, একটা জিনিস মেপে দেখছে, কি রকম সমতল তা পরীক্ষা করছে, তারপর আবার ধীরে ধীরে আগের মতো তার কাঠামোটা চিহ্নিত করলো তার চাবুক দিয়ে। অবশেষে চাবুক যখন মেয়েটির ত্রিভুজের ঠিক নিচে উরু দুটির মাঝামাঝি এসে পৌছুলো তখন সে একটু থামলো, তারপর চাবুকসহ নিজের হাত পাশে নামিয়ে মেয়েটিকে লক্ষ করে বললো, মুখ হাঁ করো।

মেয়েটি বাধ্য ভঙ্গিতে তার মুখ হাঁ করলে সে তীক্ষ্ণ চোখে ওর দাঁতগুলি লক্ষ করলো, তারপর ঝুঁকে তার নিঃশ্বাস নিলো, এবং যেন কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করলো, ভালো গন্ধ।

মিঃ সিমস্ বললো, হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ, এর চাইতে ভালো গন্ধ আপনি কোথাও পাবেন না।

ফরাসী ক্রেতা জিজ্ঞাসা করলো, আর আছে? মজুত মাল?

মিঃ সিমস্ জানালো, আছে।

তবে দেখা যাক, বলে ফরাসীটি দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, উদ্ধত ভঙ্গিতে, যেন সে এগিয়ে গেলেই তার সামনের ছোট দলটি শূন্যে মিলিয়ে যাবে। সে হলঘরে চলে গেলো। মিঃ সিমস্ তাকে অনুসরণ করলো। মিঃ সিমস্ যখন দরজায় তালা লাগাচ্ছিলো তখন কাস্ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, আপনি যদি মিঃ সিমস্ হন তাহলে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

জার্নালের ভাষা অনুযায়ী মিঃ সিমস্ 'ঘোঁৎ' করে একটা শব্দ করলো, বললো, হুঁ? কিন্তু তারপরই তার আচরণে ভদ্রতা ফুটে উঠলো। কাসের পোশাক এবং ভঙ্গি দেখে সে বুঝে নেয় যে ও অন্যদের মতো হাভাতে বখাটে দলের মানুষ নয়। অতএব সে ফরাসী লোকটিকে পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দিলো, ও সেখানে সে ঘরের বাসিন্দাকে দেখতে থাকুক, ইত্যবসরে সে কাসের কাছে ফিরে এলো। কাস্ তার জার্নালে লিখেছে যে সে যদি আরেকটু সতর্ক হয়ে সিমসের সঙ্গে আড়ালে কথা বলতো তাহলে হয়তো গোলমালটা এড়ানো যেতো, কিন্তু ওই মুহূর্তে ব্যাপারটা এমনভাবে তার সমস্ত মন জুড়ে ছিলো যে অন্য লোকগুলিকে তার ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছু বলে মনেই হয় নি।

কাস্ মিঃ সিমসের কাছে তার উদ্দেশ্য খুলে বললো। সে ফিবির বিশদ বর্ণনা দিলো, পাডুকার দাস ব্যবসায়ীটির নাম জানালো, সিমস্কে ভালো কমিশন দেবার আশ্বাস দিলো। মিঃ সিমস্ বিশেষ আশাবাদ দেখালো না, বললো যে সে যতোটা

সম্ভব চেষ্টা করে দেখবে, তারপর বললো, সাহেব, দশভাগের মধ্যে ন'ভাগ সম্ভাবনা এই যে আপনি আর তার দেখা পাবেন না। কিন্তু আমাদের এখানে ওর চাইতেও ভালো জিনিস আছে। আপনি তো ডেলফিকে দেখলেন, ও তো প্রায় যে কোনো শ্বেতাঙ্গিণীর মতো সাদা, আর খুবই রসালো দেখতে, আর আপনি যে-মেয়ের কথা বলছেন সে তো শুধু হলুদ বর্ণের। তো ডেলফি —

এমন সময় চারপাশে ঘুরঘুর করা বখাটেদের মধ্যে একজন হেসে উঠে বললো, কিন্তু এই তরুণ ভদ্রলোকের জান্ তো আন্‌চান্ করছে ওই হলুদ মেয়েটির জন্য। ওর কথা শুনে অন্যরাও হো হো করে হেসে উঠলো।

কাস্ লোকটির মুখে সজোরে আঘাত করলো। কাস্ তার জার্নালে লিখেছে, আমি আমার মুঠো করা হাতের একটা পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে তার মুখে আঘাত করেছিলাম। আমি কোনো রকম ভেবে চিন্তে তাকে মারি নি, আর যখন তার মুখ থেকে চিবুক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো তখন, আমার মনে আছে, আমি রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে লোকটা তার শার্টের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘ তীক্ষ্ণ ছুরি বার করছে। প্রথম আক্রমণটা আমি এড়াবার চেষ্টা করি, কিন্তু আঘাতটা এসে পড়ে আমার বাঁ কাঁধের উপর। সে ছুরিটা টেনে বার করবার আগেই আমি আমার ডান হাতে তার কব্জি শক্ত করে ধরে চাপ দিয়ে সেটা নিচে নামিয়ে আনলাম, যেন আমি আমার বাঁ হাতটাও, যেটাতে তখনো কিছু শক্তি অবশিষ্ট ছিলো, কাজে লাগাতে পারি। তারপর আমি আমার শরীরটা মুচড়ে তার বাহুটা আমার ডান কটির উপর সজোরে চাপ দিয়ে মট্ করে ভেঙে তাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি মেঝে থেকে ছুরিটা কুড়িয়ে নিয়ে সেখানে পড়ে থাকা লোকটির বন্ধু বলে যাকে মনে হলো তার মুখোমুখি হলাম। তার হাতেও একটা ছুরি ছিলো, কিন্তু সে এই সংলাপটা আর বেশি দূর চালিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহী বলে মনে হলো না।

কাস্ মিঃ সিমসের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলো। সে তার ক্ষতস্থান রুমাল দিয়ে বেঁধে ওই দালান থেকে বেরিয়ে নিজের বাসার দিকে অগ্রসর হলো কিন্তু ওয়েস্ট শর্ট স্ট্রীট পর্যন্ত এসেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরদিন তার অবস্থা কিছুটা ভালো হলো। সে খোঁজ নিয়ে জানলো যে মিসেস ট্রাইস শহরে নেই, সম্ভবতঃ ওয়াশিংটন গেছেন। দিন দুই পরে তার ক্ষতস্থানে সংক্রমণ দেখা দেয় এবং কয়েকটা দিন সে অতিবাহিত করে অচৈতন্য অবস্থায়, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দুলতে দুলতে, সেরে উঠতে অনেক সময় লাগে, সম্ভবতঃ, জার্নালের ভাষ্য অনুযায়ী 'অন্ধকারের প্রতি তার মনের তাগিদের জন্য।' কিন্তু তার

দেহের গড়ন ও শক্তি ছিলো তার মনের তাগিদের চাইতে বেশি জোরালো এবং শেষ পর্যন্ত সে সেরে ওঠে, তবে নিজেকে ভাবতে থাকে 'অন্যতম পাপী রূপে, এই মানবিক বিশ্বের দেহে একটি চরম কলঙ্কিত বিন্দুরূপে।' অনন্ত নরকবাসের ভয় না করলে সে আত্মহত্যা করতো, কারণ 'ঈশ্বরের ক্ষমা সম্পর্কে তার মন হতাশায় নিমজ্জিত হলেও সে আশা ত্যাগ করতে পারে নি।' কিন্তু মাঝে মাঝে আত্মহত্যার পরিণাম যে অনন্ত নরকবাস সেটাই আত্মহত্যার পক্ষে একটা প্রধান যুক্তি হয়ে দেখা দিতো। সে তার কর্মের মাধ্যমে তার বন্ধুকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে গিয়েছিলো, তাকে অনন্ত নরকবাসের পথে ঠেলে দিয়েছিলো, এখন নিজে আত্মহত্যা করে তার নিজের অনন্ত নরকবাস সুনিশ্চিত করবে, সেইটেই তো ন্যায়বিচার হবে। 'কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আত্মহননের হাত থেকে রক্ষা করেন, তাঁর কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তা আমার জ্ঞানের পরিধির বাইরে।'

মিসেস ট্রাইস আর লেক্সিংটনে ফিরে আসে নি।

কাস্ মিসিসিপি ফিরে আসে। সে দু'বছর কাটিয়ে দেয় তার তুলার খামার দেখাশোনা ক'রে, বাইবেল পড়ে আর প্রার্থনা ক'রে। এবং আশ্চর্যের বিষয়, তার প্রচুর বৈষয়িক উন্নতি ও রোজগার হলো, যেন তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। অবশেষে সে গিলবার্টের সব দেনা পরিশোধ করলো, তারপর নিজের ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দিলো। সে ঠিক করলো পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে একই রকম সাফল্যের সঙ্গে সে তার চাষবাসের কাজ চালিয়ে যাবে। গিলবার্ট তাকে তখন বলেছিলো, বুদ্ধু, গোপনে যদি বোকামি করতে চাও তবে কর, কিন্তু প্রকাশ্যে দশজনের সামনে, দোহাই ঈশ্বরের, এরকম বোকামি করো না। তুমি কি মনে করো যে ওদের মুক্তি দেবার পরও তুমি ওদের দিয়ে কাজ করাতে পারবে? একদিন কাজ করবে তো তার পরদিন গল্পগুজব আর আড্ডা দিয়ে বেড়াবে। তুমি কি মনে করো যে তোমার পালের খামার পরিচালিত হবে ক্রীতদাসদের দ্বারা আর তোমার এখানে থাকবে একদল মুক্ত নিগার? এ কি চলতে পারে? ওদের মুক্তি দেবার পর কি জীবনভর তোমাকেই ওদের ভরণপোষণ করতে হবে? ওদের এই অঞ্চল থেকে বার করে দাও, তারপর নিজে আইন কিংবা ডাক্তারী পড়ো। কিংবা ধর্ম প্রচারের কাজে লেগে যাও, এই যে দিনরাত এতো প্রার্থনা করছো এর মধ্য থেকে অন্ততঃ নিজের জীবিকার ব্যবস্থাটা করে নাও।

কাস্ পুরো এক বছর তার মুক্ত নিগ্রোদের নিয়ে নিজের খামার চালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু অবশেষে তার প্রকল্পের ব্যর্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। গিলবার্ট তাকে তখন বলেছিলো, ওদের এখান থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দাও, কাস্। আর তুমিও

ওদের সঙ্গে চলে যাও না কেন? তুমি উত্তরাঞ্চলে যাচ্ছো না কেন?

কাস্ জবাব দিয়েছিলো, এখানেই আমার স্থান।

তাহলে এখানেই তুমি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচারণার কাজ শুরু করছো না কেন? একটা কিছু করো, যা-কিছু একটা, শুধু মুক্ত নিগারদের দিয়ে তুলা উৎপাদনের চেষ্টার মতো বোকামি আর করো না।

কাস্ বলেছিলো, হয়ত দাসপ্রথা বিলোপের পক্ষে প্রচারণার কাজ আমি একদিন সত্যিই শুরু করবো। তবে এখন নয়। অন্যকে শেখানোর যোগ্যতা আমি এখনো অর্জন করি নি। এখনো না। কিন্তু আপাততঃ আমার দৃষ্টান্ত তো থাকছে। এটা ভালো কাজ হয়ে থাকলে কখনো সম্পূর্ণ খোয়া যাবে না। কোনো কিছুই খোয়া যায় না।

শুধু তোমার জ্ঞানগম্যি ছাড়া, বলেই গিলবার্ট ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

বাতাসে ইতোমধ্যে গোলমালের আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। গিলবার্টের বিশাল সম্পদ ও প্রতিপত্তি এবং কাসের প্রতি তার প্রায় প্রকাশ্য তাচ্ছিল্যের ভাবই কাস্‌কে তখন একঘরে হওয়া বা তার চাইতেও কঠিন কোনো পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করেছিলো। কাস্ লিখেছে, ওর তাচ্ছিল্য আমার জন্য একটা ঢাল। আমার সঙ্গে সে আচরণ করে একটা বিপথগামী একগুঁয়ে ছোট ছেলের মতো, যে যথাসময়ে ঠিক হয়ে যাবে, আপাততঃ যাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়ার দরকার নেই। তাই আমার প্রতিবেশীরাও আমাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয় না।

কিন্তু গোলমাল এড়ানো যায় নি। কাসের জনৈক ক্রীতদাসের স্ত্রী কাজ করতো পাশের খামারে। সে ছিলো ওই খামার-মালিকের ক্রীতদাসী। একদিন ওখানকার ওভারসীয়ারের সঙ্গে একটা ছোটখাট ঝগড়ার পর মেয়েটির স্বামী তাকে ওই খামার থেকে চুরি ক'রে দুজনে একযোগে পালিয়ে যায়। টেনেসী সীমান্তের কাছে ওরা ধরা পড়ে। লোকটি অফিসারদের বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনা হয় তার খামারে। গিলবার্ট তখন বলেছিলো, দেখলে তো, তোমার কাজের ফলে একটা নিগার মারা গেলো এবং আরেকটা বেত খেলো। আমার অভিনন্দন নাও।

এরপর কাস্ তার মুক্ত নিগ্রোদের জাহাজে তুলে নদীপথে উজান এলাকার দিকে পাঠিয়ে দিলো। ওদের কোনো খবর সে আর পায় নি।

কাস্ তার জার্নালে লিখেছে, আমি জাহাজটাকে উপসাগরের বুকে পড়তে দেখলাম, প্রবল স্রোতের মুখে তার চাকাগুলি সজোরে ঘুরছে, আর আমার মনের মধ্যেও আমি অনুভব করলাম প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত। আমি জানতাম যে ওই নিগ্রোগুলি এক

কষ্টের জীবন থেকে যাচ্ছে আরেক কষ্টের জীবনে, যে আশা তারা বুকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। ওরা আমার হাতে চুমু খেয়েছিলো, আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলো, কিন্তু আমি তাদের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারি নি। আমি তাদের জন্য কিছু করেছি ওই রকম আত্মসন্তুষ্টিকে আমি কখনো প্রশ্রয় দিই নি। আমি যা করেছি তা আমার নিজের জন্য করেছি, আমার নিজের চিত্তকে ভারমুক্ত করার জন্য করেছি, ওদের যন্ত্রণার ভার, আমার উপর ওদের দৃষ্টির ভার। আমার মৃত বন্ধুর স্ত্রী তার উপর ফিবির দৃষ্টি লক্ষ করে উন্মত্ত দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলো, আপন সত্তাকে সে হারিয়ে ফেলেছিলো, সে ফিবিকে বেচে দিয়েছিলো এক চরম যন্ত্রণার জীবনের মধ্যে। আমিও আমার দিকে নিবদ্ধ ওদের দৃষ্টি লক্ষ করেছিলাম, আর তাই, পাছে আরো জঘন্য কিছু করে ফেলি সেই ভয়ে, আমি ওদের মুক্তি দিই। কারণ অনেকেই নিজেদের উপর ওদের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না, এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় মরীয়া হয়ে উঠে অসম্ভব অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হয়। আমি এই শহরে এসে বাস করতে শুরু করার দশ–বারো বছর আগে এই লেক্সিংটনে ফিল্ডিং এল্ টার্নার নামক একজন বিত্তশালী আইনজ্ঞ বাস করতেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন বোস্টনের জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে। ওই মহিলা, ক্যারোলিন টার্নার, কখনো নিগ্রো পরিবৃত থাকেন নি, তার সমগ্র মনমানসিকতা গড়ে উঠেছিলো মানবিক পরিবেশে, দাসত্বের ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়ে, অথচ অল্পকালের মধ্যেই তিনি একেবারে বদলে যান, ক্রোধের মুহূর্তে আত্মহারা হয়ে তার নিগ্রো দাসদাসীদের উপর অকথ্য নির্যাতনের জন্য তিনি অচিরে কুখ্যাত হয়ে ওঠেন। তিনি নিজের হাতে দাসদাসীদের যেভাবে বেত মারতেন সেজন্য তার সমাজের সবাই তার নিন্দা করতো। শোনা যায়, বেত মারবার সময় তার গলা থেকে নাকি মৃদু অদ্ভুত একটা চিৎকার–ধ্বনি নির্গত হতো। একবার তার প্রাসাদোপম ভবনের দোতলার একটা ঘরে তিনি যখন জনৈক ভৃত্যকে বেত্রাঘাত করছিলেন তখন একটি ছোট নিগ্রো বালক সেখানে ঢুকে পড়ে এবং নিচু গলায় কাঁদতে শুরু করে। তিনি ছেলেটিকে ধরে উঁচু করে তুলে সোজা জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দেন। নিচের পাকা জায়গায় পড়ে ছেলেটির পিঠ ভেঙ্গে যায়, সারাটা জীবন তাকে অতিবাহিত করতে হয় পঙ্গু হয়ে। সমাজের ক্রোধ ও আইনের বিধানের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিচারপতি টার্নার স্ত্রীকে পাগলাগারদে সমর্পণ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে চিকিৎসকরা বলেন যে তিনি মানসিক দিক থেকে সুস্থ, তারা তখন তাঁকে ছেড়ে দেন। তার স্বামী নিজের উইলে স্ত্রীকে কোনো দাসদাসী দিয়ে যান নি, কারণ তাহলে, উইলে লেখা ছিলো, ওই দাসদাসীদের ঠেলে দেয়া হতো এক অসহনীয় যন্ত্রণার জীবনে এবং অবশেষে মৃত্যুর

মধ্যে। কিন্তু ওই মহিলা নিজের উদ্যোগে দাসদাসী সংগ্রহ করেন। ওদের মধ্যে ছিলো রিচার্ড নামের এক সহিস, হলুদ রঙের, ভদ্র, বুদ্ধিমান, প্রশংসনীয় স্বভাব-চরিত্রের। একদিন মহিলা তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে বেত মারতে শুরু করেন। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিলো একটা দেয়ালের সাথে। লোকটা শেকল ছিঁড়ে ছুটে এসে মহিলার গলা টিপে তাকে মেরে ফেলে। পরে লোকটা ধরা পড়ে, খুনের অভিযোগে তার ফাঁসী হয়, যদিও সে পালিয়ে যেতে পারলেই বহু লোক খুশী হতো। লেক্সিংটনে আমি এই কাহিনী শুনি। একজন মহিলা আমাকে বলেন, মিসেস টার্নার নিগ্রোদের বুঝতে পারতেন না। আরেকজন বলেন, মিসেস টার্নার এসেছিলেন বোস্টন থেকে, সেটা তো, দাসপ্রথার বিরোধীদের জায়গা, তাই তার আচরণ ওরকম ছিলো। আমি এর কোনো মানে খুঁজে পাই নি। কিন্তু পরে, অনেক পরে, আমি ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করি। যে-কারণে আমার বন্ধুর স্ত্রী ফিবিকে ভাটি অঞ্চলে বিক্রী করে দেয় ঠিক সেই কারণেই মিসেস টার্নার তার নিগ্রোদের বেত মারতেন ঃ নিজের উপর তাদের দৃষ্টি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমি বুঝতে পারি, কারণ আমিও তাদের দৃষ্টি আর সহ্য করতে পারি না। বোধহয় একমাত্র আমার ভ্রাতা গিলবার্টের মতো মানুষরাই চরম পাপের মধ্যেও নিজেদের উপর তাদের দৃষ্টি সহ্য করবার মতো যথেষ্ট সারল্য ও শক্তি ধারণ করতে পারে, বিরাট অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের ধারণা অনুযায়ী যৎকিঞ্চিত ন্যায় বিতরণে সক্ষম হয়।

তো খামার-মালিক কাস্ দেখলো যে খামার চালাবার জন্য তার কোনো লোকজন নেই। অতএব সে রাজধানী শহর জ্যাকসনে গিয়ে আইন পড়তে শুরু করলো। চলে আসবার আগে গিলবার্ট প্রস্তাব দিয়েছিলো যে সে তার খামারটা নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে তার লোকজন দিয়ে কাসের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চাষ করাতে পারে। স্পষ্টতঃই সে তখনো কাস্‌কে বিত্তশালী বানাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করে নি। কিন্তু কাস্ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলো। গিলবার্ট তখন তাকে বলেছিলো, তুমি আপত্তি করছো এই জন্য যে আমি ক্রীতদাসদের দিয়ে চাষ করাবো, তাই না? তবে শোনো, তুমি যদি এটা বিক্রী করে দাও তাহলেও এটা ক্রীতদাসদের দিয়েই চাষ করানো হবে। এ-মাটি কালো মাটি, আর কালো ঘাম দিয়েই এ-জমি জলসিঞ্চিত হবে। কাজেই কার কালো ঘাম এখানে পড়লো কি পড়লো না, তাতে কি খুব বেশি কিছু এসে যায়? তারপর গিলবার্ট প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠেছিলো, আরে হতভাগা, এটা তো জমি, তুই বুঝতে পারছিস না, এটা জমি, আর জমি ডাক ছেড়ে কাঁদছে মানুষের হাতের জন্য। কিন্তু তবু কাস্ তার জমি বিক্রী করে নি। সে তার বাড়িতে একজন তত্ত্বাবধায়ক রাখলো, আর

জনৈক প্রতিবেশীকে চারণভূমির জন্য তার সামান্য কিছু জমি ভাড়া দিয়ে দিলো।

কাস্ জ্যাকসনে চলে যায়, অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করে, লক্ষ করে যে দেশের উপর ঝড় ঘনিয়ে আসছে। সে জ্যাকসনে যায় ১৮৫৮ সালের শরতে। ১৮৬১ সালের ৯ই জানুয়ারী মিসিসিপি বিচ্ছিন্ন হবার আইন পাশ করলো। গিলবার্ট ছিলো এই কার্যক্রমের বিরোধী। সে কাস্‌কে লিখেছিলো, যতসব নির্বোধের দল! এই স্টেটে অস্ত্রের একটি কারখানাও নেই। গণ্ডগোল ঘনিয়ে আসতে দেখেও কোনো প্রস্তুতি নেয় নি বোকাগুলি। আর যথাসময়ে না দেখে থাকলে, বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়. যতসব নির্বোধের দল! এখন তাদের অবস্থা বুঝে সময় নেয়া উচিত ছিলো, যদি আঘাত হানতেই হয় তাহলে তার জন্য আগে নিজেদের তৈরি করে নিতে হতো। দায়িত্বপূর্ণ পদে যারা আছে আমি তাদের তৈরি হতে বলেছি। যতসব নির্বোধের দল।

এর উত্তরে কাস্ লিখেছিলো, আমি দিনরাত শান্তির জন্য প্রার্থনা করছি। কিন্তু পরে সে লেখে, আমি মিঃ ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি তো জানো, তিনি হলেন কামান–বন্দুক শাখার প্রধান। তিনি বলেছেন, সৈন্যদের তারা শুধু পুরনো গাদা–বন্দুক দিতে পারবেন। গভর্নর পিটাসের নির্দেশে তারা শটগানের জন্য সারা রাজ্য চষে বেড়িয়েছেন। শটগান! মিঃ ফ্রেঞ্চ ঠোঁট বাঁকিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন। আর কী শটগান! তিনি এই উদ্যোগে দান হিসাবে প্রাপ্ত একটি বন্দুকের কথা আমাকে বলেন, পুরানো একটা গাদা–বন্দুক, নলটা এক প্রান্তে বাঁকানো, সাইপ্রেস গাছের শাখার সঙ্গে ধাতু দিয়ে বাঁধা। এক বৃদ্ধ ক্রীতদাস এই মহান উদ্যোগের জন্য তার ওই সম্পত্তিটা দান করেছিলো। বলো, মানুষ হাসবে, না কাঁদবে?

জেফারসন ডেভিস সিনেট থেকে পদত্যাগ করে মিসিসিপি ফিরে এসে মেজর–জেনারেলের পদমর্যাদা নিয়ে মিসিসিপির সেনাদলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কাস, গিলবার্টের অনুরোধে, তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলো। সে গিলবার্টকে লেখে, জেনারেল বললেন যে ওরা তাঁকে দশ হাজার লোক দিয়েছে কিন্তু সামান্য কয়েকটা আধুনিক রাইফেলও দেয় নি। কিন্তু, জেনারেল আরো বলেছিলেন, ওরা আমাকে একটা চমৎকার কোট দিয়েছে, সামনে চৌদ্দটা তামার বোতাম বসানো, আর কালো ভেলভেটের কলার। তিনি বলেছিলেন, হয়তো বোতামগুলি আমরা আমাদের শটগানে ব্যবহার করতে পারবো। কথার শেষে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিলো।

কাস্ মিঃ ডেভিসকে আরেকবার দেখেছিলো। সে তখন নাট্‌চেজ জাহাজে গিলবার্টের সঙ্গে ছিলো। ওই জাহাজে কনফেডারেসির নয়া প্রেসিডেন্ট তাঁর

ব্রায়ারফিল্ডের খামার থেকে মন্টগোমারি ভ্রমণযাত্রার প্রথম ধাপ অতিক্রম করছিলেন। কাস্ তার জার্নালে লিখেছে, আমরা ছিলাম বুড়ো টম লেদারের জাহাজে। কথা ছিলো ব্রায়ারফিল্ড থেকে কয়েক মাইল দূরের একটা ঘাট থেকে প্রেসিডেন্টকে তুলে নেয়া হবে। কিন্তু মিঃ ডেভিসের বাড়ি ছেড়ে বেরুতে দেরি হয়ে যায় এবং পরে তাঁকে নৌকা করে আমাদের জাহাজে নিয়ে আসা হয়। আমি রেলিং-এর উপর ঝুঁকে ছোট্ট কালো নৌকাটিকে লাল জলের উপর দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। নৌকা থেকে একজন লোক হাত নাড়ালো। নাট্‌চেজের ক্যাপ্টেন সেই সঙ্কেত দেখতে পেয়েই তার জাহাজের প্রচণ্ড সিটি বাজালো, সেই শব্দে আমাদের কান ঝিনঝিন করে উঠলো, বিশাল জলরাশিও যেন কাঁপতে থাকলো। আমাদের জাহাজ থামলো, নৌকা এগিয়ে এলো, মিঃ ডেভিসকে জাহাজে তুলে নেয়া হলো। জাহাজ আবার চলতে শুরু করলে মিঃ ডেভিস পেছন দিকে তাকিয়ে তার নিগ্রো ভৃত্যটিকে হাত তুলে অভিবাদন করলেন (ইসায়া মন্টগোমারি, আমি ওকে ব্রায়ারফিল্ডে দেখেছি), ও নোকায় দাঁড়িয়েছিলো আর আমাদের জাহাজের ঢেউ-এর ধাক্কায় নৌকাটি দুলছিলো, সেও হাত তুলে বিদায় অভিবাদন জানিয়েছিলো। পরে আমরা যখন উজানপথে ভিক্‌স্‌বার্গের উঁচু ভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন প্রেসিডেন্ট ডেভিস আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন। আমি আমার ভাই-এর সঙ্গে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমরা তাঁকে আগেই স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম। আমার ভাই আরেকবার এবং অধিকতর অন্তরঙ্গতার সাথে তাঁকে অভিনন্দিত করলে পর মিঃ ডেভিস বলেছিলেন যে তাঁর এই সম্মানে তিনি আনন্দিত বোধ করতে পারছেন না। তিনি বলেছিলেন, আমি সব সময় ইউনিয়নকে দেখেছি একটা বিশেষ, প্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শ্রদ্ধার সঙ্গে। আমি একাধিক যুদ্ধক্ষেত্রে ইউনিয়নের প্রিয় পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য আমার জীবন বিপন্ন করেছি। এখন আমার দীর্ঘকালের প্রিয় বস্তুটিকে যখন আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হলো তখন আমার মনের অবস্থা কি রকম তা, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছেন। তিনি আরো বলেছিলেন, আমি এই মুহূর্তে শুধু একটা সরল বিবেকের বিষণ্ন আনন্দ বোধ করছি, আর কিছু নয়। তাঁর মুখে তাঁর বিরল মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিলো। এর পর তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যে ভেতরে চলে যান। রোগে আর দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখ ভীষণ কৃশ হয়ে গিয়েছিলো, হাড়ের উপর পাতলা চামড়া যেন কোন রকমে লেগে ছিলো। আমি আমার ভাইকে বলেছিলাম যে মিঃ ডেভিসকে মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না। ও জবাবে বলেছিলো, একটা অসুস্থ মানুষ। প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমরা পেয়েছি একটা

অসুস্থ মানুষকে। চমৎকার অবস্থা! আমি বলেছিলাম যে যুদ্ধ নাও হতে পারে, মিঃ ডেভিস শান্তির আশা করছেন। কিন্তু আমার ভাই বলেছিলো, ভুল কোরো না, ইয়াঙ্কিরা যুদ্ধ করবে, এবং ভালোমতো যুদ্ধ করবে। মিঃ ডেভিস মূর্খ, তাই তিনি শান্তির আশা করছেন। আমি যখন বললাম যে সব ভালো মানুষই শান্তির আশা করে তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে একটা অবোধ্য ধ্বনি করে বলেছিলো, আমাদের ওরা যে অবস্থায় এনে ফেলেছে সেখানে এখন আমাদের দরকার ভালো মানুষ নয়, আমাদের দরকার এমন মানুষ যে জিততে পারবে। আর মিঃ ডেভিসের বিবেকের বিলাসিতায় আমার কোনো উৎসাহ নেই।

এর পর আমি আর আমার ভাই নীরবে ডেকে পায়চারি করতে থাকি। আমি মনে মনে ভাবি যে মিঃ ডেভিস একজন ভালো মানুষ। কিন্তু এখন, আমি যখন আমার জার্নালে এই লাইনগুলি লিখছি তখন, আমি ভাবছি যে সারা দুনিয়া তো ভালো মানুষে পূর্ণ, তবু এই পৃথিবী ধাবিত হচ্ছে অন্ধকার আর রক্তের অন্ধত্বের দিকে। এখন, এই মুহূর্তে, আমি যখন ভিক্স্‌বার্গে আমার হোটেল–কক্ষে বসে এই লেখা লিখছি তখনও তো তাই ঘটছে। আর আমাদের পুণ্যের অর্থ কি, সে প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছে করছে আমার। হে ভগবান, তুমি আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করো!

গিলবার্ট একটি অশ্বারোহী বাহিনীতে কর্নেল হিসেবে কমিশন লাভ করে। কাস্‌ যোগ দেয় মিসিসিপি রাইফেল বাহিনীতে, সাধারণ সৈনিকরূপে। গিলবার্ট বলেছিলো, তুমি সহজেই ক্যাপ্টেন কিংবা মেজর হতে পারো। তার জন্য যথেষ্ট মাথা আছে তোমার, যা ওদের খুব কম লোকের আছে। কাস্‌ উত্তর দিয়েছিলো যে সে সাধারণ সৈনিক হবারই পক্ষপাতী, সে চায় 'অন্য মানুষদের সঙ্গে একযোগে মার্চ করতে'। কিন্তু কেন সে এটা করতে চায় সেকথা সে তার ভাইকে বলতে পারে নি। সে বলতে পারে নি যে অন্য মানুষের সঙ্গে একযোগে মার্চ করলেও, নিজের হাতে বন্দুক বহন করলেও সে কখনো কোনো শত্রুর প্রাণ হরণ করবে না। সে তার জার্নালে লিখেছিলো, যারা মার্চ করছে তাদের সঙ্গে আমাকে মার্চ করতেই হবে, কারণ তারা আমার আপনজন, তাদের সঙ্গে আমাকে সকল তিক্ততার স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, তাদের চাইতেও বেশি পরিপূর্ণভাবে। কিন্তু আমি আরেকজন মানুষের প্রাণ নিতে পারবো না। আমি, যে নাকি আমার বন্ধুর প্রাণ নিয়েছি, সে কি করে একজন শত্রুর প্রাণ নেবে, কারণ আমার রক্তপাতের অধিকার আমি নিঃশেষ করে ফেলেছি।

অতএব কাস্‌ মার্চ করে যুদ্ধে গেলো, তার হাতে থাকলো বন্দুক, যেটা তার জন্য ছিলো একটা অর্থহীন বোঝামাত্র আর তার বুকের কাছে ধূসর কাপড়ের জ্যাকেটের নিচে সুতোয় বাঁধা একটা আংটি ঝুলে রইলো একেবারে চামড়ার সঙ্গে

লেগে, এক সময় যে–আংটি ছিলো ডানকান ট্রাইসের বিয়ের আংটি, এবং যেটা সেদিন রাতে তাদের বাগানের কুটিরে এ্যানাবেল ট্রাইস তার বুকের উপর চেপে ধরে কাসের আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়েছিলো।

কাস্ প্রাণবন্ত মাঠগুলির মধ্য দিয়ে, কারণ তখন এপ্রিলের গোড়ার দিক, সৈন্যদের সঙ্গে মার্চ করে শিলোহ্ গেলো, তারপর নদীকে আড়াল করে রাখা বনানীতে গিয়ে পৌঁছুলো। (নিশ্চয়ই নানা রকম ফুল ফুটেছিলো সেখানে।) সে মার্চ করে এগিয়ে গিয়েছিলো বনানীর মধ্যে, কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে সীসার গুলী ছুটে যাবার শব্দ শুনতে পায়, আর পরের দিন বন থেকে বেরিয়ে কোরিস্মোর দিকে বিষণ্ন রুষ্ট পশ্চাদাপসরণে যোগ দেয়। সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলো যে ওই যুদ্ধের ভেতর থেকে সে বেঁচে ফিরে আসবে না। কিন্তু সে জীবিত ফিরে আসে, জনাকীর্ণ পথ ধরে সে চলে আসে 'যেন স্বপ্নের মধ্যে'। কাস্ লিখেছে, আমার মনে হয়েছিলো যে এর পর থেকে আমি স্বপ্নের মধ্যেই থাকবো। সেই স্বপ্ন তাকে আবার টেনে নিয়ে যায় টেনেসীতে — চিকামাউগায়, নক্সভিলে, চাটানুগায় — আরো অনেক অখ্যাত সংঘর্ষে, কিন্তু কাসের প্রতীক্ষিত বুলেট তার নাগাল পেলো না। একবার চিকামাউগায় শত্রুর গুলীবর্ষণের মুখে তার কোম্পানী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, মনে হচ্ছিলো নিজেদের আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, কিন্তু সে অবিচলিতভাবে উৎরাই বেয়ে উপরে উঠে যায়, আর কেমন করে যে সে অক্ষত থাকলো তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনি। তাকে দেখে তার দলের লোকজন নতুন করে জোট বাঁধে, তাকে অনুসরণ করে। কাস্ তার জার্নালে লিখেছে, আমার কাছে অবাক মনে হলো যে–আমি ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজের মৃত্যু চেয়েছিলাম সেই আমি তা পেলাম না, আর আমার ইচ্ছার পরিণতি হিসাবে যারা তা চায় নি তাদেরকে সেখানে টেনে নিয়ে গেলাম। কর্ণেল হিকম্যান যখন তাকে অভিনন্দন জানায় তখন সে উত্তর দেবার মতো কোনো কথা খুঁজে পায় নি।

কিন্তু সে এক সময় আত্মার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে প্রায়শ্চিত্তের আশায় ওই ধূসর জ্যাকেট পরে থাকে, তবে পরবর্তী সময়ে সে ওটা পরেছিলো সগর্বে, কারণ সে যাদের সঙ্গে একযোগে মার্চ করছিলো তাদের পরনেও ছিলো ওই এক জ্যাকেট। কাস্ লিখেছে, আমি মানুষকে পরম সাহসী কাজ করতে দেখেছি, এবং সে জন্য তারা কোনোরকম প্রতিদান চায়নি। কাস্ আরো লিখেছিলো, মানুষ যেসব কষ্ট সহ্য করে, যেসব কথা বলে না, তার জন্য তাকে ভালোবাসা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

তবে কাসের জার্নালে ক্রমবর্ধমান হারে, প্রার্থনা এবং নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথার ফাঁকে ফাঁকে একজন পেশাদার সৈনিকের মন্তব্যসমূহ স্থান করে নিচ্ছিলো —

রণাঙ্গনে নেতৃত্বের সমালোচনা (চিকামাউগার পরে ব্র্যাগ সম্পর্কে), রণকৌশল ও গোলাগুলী চালাবার ব্যাপারে সন্তোষ এবং এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক অহঙ্কার ('মার্লোর ব্যাটারির অনুশীলন চমৎকার'), আর সবশেষে আটলান্টার পথে এগিয়ে যাবার সময় বাজার্ড্স্ রুস্টে, স্নেক ক্রীক গ্যাপে, নিউ হোপ চার্চে, কেনেস' মাউন্টেনে জনস্টনের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দেয়া এবং দেরি করানোর দক্ষতা সম্পর্কে প্রশংসার কথা ('যতোই কষ্টের হোক, যতোই ঢাকা পড়ে থাকুক, মানুষ যখন কোনো কাজ সুসম্পন্ন করে তখন তার মধ্যে সর্বদাই একটা গৌরবের ছোঁয়া লেগে থাকে এবং জেনারেল জনস্টন তাঁর কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন')।

তারপর আটলান্টার বাইরে বুলেটটা তার নাগাল পেলো। হাসপাতালে শুয়ে, পচতে পচতে, সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু সংক্রমণ শুরু হবার আগেই, যখন তার পায়ের ক্ষতকে মোটেই গুরুতর বলে মনে হয় নি, তখনই সে বুঝেছিলো যে এবার সে মারা যাবে। সে তার জার্নালে লিখেছিলো, আমি মারা যাবো। যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি এবং শেষ তিক্ততার হাত থেকে আমি রেহাই পাবো। আমি কোনো মানুষের মঙ্গল করি নি এবং আমার পাপের জন্য আমি অপরকে কষ্ট ভোগ করতে দেখেছি। অন্যরা যে আমার পাপের জন্য কষ্ট ভোগ করেছে সেজন্য আমি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলছি না, কারণ সব মানুষ যে ভাই-ভাই, তারা যে তাঁর পবিত্র নামে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ, সেই সত্য ঈশ্বর হয়তো নিরপরাধীর শাস্তিভোগের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং এখন এই ঘরে আমার সঙ্গে যেসব মানুষ আছে তারা তাদের নিজের পাপের জন্য ততোটা নয় যতোটা অপরের পাপের জন্য কষ্ট ভোগ করছে। আর আমি যে শুধু আমার পাপের জন্যই কষ্ট পাচ্ছি এই চিন্তা আমাকে কিছুটা আরাম দিচ্ছে।

শুধু সে যে মারা যাবে তাই নয়, যুদ্ধও যে শেষ হয়ে গিয়েছিলো তাও কাস্ বুঝতে পারে। সে লিখেছে, যুদ্ধ শেষ। মৃত্যু ছাড়া সব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মৃত্যু এখনো চলতে থাকবে। ফোঁড়া পেকে উঠেছে, ফেটে গেছে, কিন্তু পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে। আবার মানুষ একজোট হবে, মানুষের সম্মিলিত অপরাধের মধ্যে প্রাণ বিসর্জন দেবে, দূরদূরান্ত থেকে যে-অপরাধ তাদের এক জায়গায় এনে জড়ো করেছে সেই অপরাধের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে তাঁর অপার করুণায় ওই পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন। চির আশীষধন্য হোক তাঁর নাম।

জার্নালে আর কিছু লেখা ছিলো না। শুধু অচেনা হাতে গিলবার্টের কাছে লেখা চিঠিটা, অত্যধিক দুর্বলতার জন্য যেটা কাস্ নিজে লিখতে পারে নি, অন্য

একজনকে মুখে মুখে বলেছিলো, যে চিঠিতে লেখা ছিলো ঃ আমাকে স্মরণ করো, কিন্তু আমার জন্য দুঃখ করো না। আমাদের মধ্যে কেউ যদি সৌভাগ্যবান হয় তবে সে আমি।

আটলান্টার পতন হলো। শেষ মুহূর্তের ডামাডোলের মধ্যে কাস্ মেস্টার্নের কবর চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নেয়া যায় নি। হাসপাতালের একজন, জনৈক এ্যালবার্ট ক্যালোওয়ে, নিজের কাছে কাসের কাগজপত্র এবং তার গলায় সুতো দিয়ে ঝুলানো আংটিটা রেখে দিয়েছিলো। অনেক পরে, বস্তুতঃপক্ষে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর, সে একটি সৌজন্যমূলক চিঠি দিয়ে গিলবার্ট মেস্টার্নের কাছে সেগুলো পাঠিয়ে দেয়। গিলবার্ট মেস্টার্ন জার্নালটি, কাসের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিপত্র, কাসের ফটো এবং সুতোয় বাঁধা আংটিটা সযত্নে রক্ষা করেছিলো। অবশেষে গিলবার্টের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী একটা প্যাকেট করে ওই সব জিনিস ইতিহাসের ছাত্র জ্যাক বার্ডেনকে পাঠিয়ে দেয়। এইভাবেই সেগুলি এসে স্থান লাভ করে জ্যাক বার্ডেনের নোংরা এ্যাপার্টমেন্টে পাইন কাঠের ছোট্ট টেবিলটির উপর, যেখানে সে অপর দু'জন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টের সঙ্গে থাকতো, যাদের একজন ছিলো দুর্ভাগা, পরিশ্রমী এবং সুরাসক্ত, আর অপরজন ছিলো ভাগ্যবান, অলস এবং সুরাসক্ত। জ্যাক বার্ডেন মেস্টার্ন সংক্রান্ত কাগজপত্রের সঙ্গে দেড় বছর বসবাস করেছিলো। যে-জগতে কাস্ ও গিলবার্ট মেস্টার্ন বাস করেছিলো সে ওই জগতের সমুদয় তথ্য জানতে চায়। অনেক তথ্য সে জানতে পারেও। তার মনে হয় যে সে গিলবার্ট মেস্টার্নকে চিনেছে। গিলবার্ট মেস্টার্ন কোনো জার্নাল রাখে নি, কিন্তু জ্যাক বার্ডেনের মনে হলো যে ওই লোকটি তার চেনা, যার মাথা নিরাভরণ গ্র্যানিট পাথরের মতো, যে এক জগত থেকে বেরিয়ে অন্য এক জগতে প্রবেশ করেছিলো, এবং উভয় জগতেই যে ছিলো সহজ ও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু একটা সময় এলো যখন তার পাইন কাঠের টেবিলে বসে জ্যাক বার্ডেনের মনে হলো যে সে কাস মেস্টার্নকে চেনে না। ডিগ্রী পাবার জন্য কাস্ মেস্টার্নকে চেনা অপরিহার্য ছিলো না, কাস্ মেস্টার্নের জগত সম্পর্কে তথ্যাদি জানলেই চলতো। কিন্তু কাস্ মেস্টার্নকে না চিনে তার জগত সম্পর্কে তথ্যাবলী সে লিপিবদ্ধ করতে পারবে না। জ্যাক বার্ডেন অবশ্য নিজেকে একথা স্পষ্ট করে কখনো বলেনি। সে শুধু রাতের পর রাত কিছুই না লিখে, স্থির দৃষ্টিতে ফটোটার দিকে তাকিয়ে, তার পাইন কাঠের টেবিলে বসে থাকতো। তারপর এক সময় জল খাবার জন্য উঠতো, অন্ধকার রান্নাঘরের সামনে গ্লাস হাতে দাঁড়াতো, কল থেকে ঠাণ্ডা জল পড়ে কখন গ্লাসটা ভর্তি হবে সেজন্য অপেক্ষা করতো।

আমি বলেছি যে কাস্ মেস্টার্নকে চিনতে পারেনি বলে জ্যাক বার্ডেন কাস

মেস্টার্নের জগত সম্পর্কে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করতে পারেনি। কেন সে কাস্ মেস্টার্নকে চিনতে পারেনি সেকথা জ্যাক বার্ডেন কিন্তু কখনো নিজের কাছে স্পষ্ট করে বলেনি। তবে আমি (যে-আমি জ্যাক বার্ডেন যা হয়েছিলো সেই ব্যক্তি) এখন বহু বছর পর, পিছনে তাকিয়ে দেখে সেকথা বলার চেষ্টা করবো।

কাস্ মেস্টার্ন আরো কয়েক বছর বেঁচে ছিলো, আর ওই সময়ে সে উপলব্ধি করে যে, এই পৃথিবী একটা অখণ্ড সত্তা। সে উপলব্ধি করে যে এই পৃথিবী একটা বিশাল মাকড়শার জালের মতো, সেটা যদি তুমি স্পর্শ করো, যতো হাল্কাভাবেই হোক, যেখানেই হোক, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত একটা কম্পনের ঢেউ উঠবে, তন্দ্রাচ্ছন্ন মাকড়শাটির বুকে তা ঝিনঝিন করে বাজবে, সে তখন আর তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকবে না, বরং লাফিয়ে উঠে যে তার জাল স্পর্শ করেছে তার চারপাশে মুহূর্তের মধ্যে সূক্ষ্ম তন্তুর কুণ্ডলী বিস্তার করবে, আর তোমার চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেবে কালো, অবশ-করা বিষ। তুমি জালে ধাক্কা লাগাতে চেয়েছিলে কিংবা না চেয়েছিলে, তাতে কিছু এসে যায় না। তোমার সুখী পা কিংবা আনন্দিত পাখা হয়তো অত্যন্ত আলগোছে তা স্পর্শ করে, কিন্তু তারপর যা হবার তাই হয়, ওইখানে বসে আছে মাকড়শা, কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত রৌদ্রালোকে আয়নার মতো জ্বলজ্বল করা তার দুটি চোখ তোমার উপর স্থির নিবদ্ধ, কিংবা সে-চোখ ঈশ্বরের চোখের মতো, আর লালা ঝরছে তার দাঁত থেকে।

কিন্তু জ্যাক বার্ডেন তো জ্যাক বার্ডেনই ছিলো, সে কি করে এসব বুঝতে পারতো? বহু বছর আগে কাস্ মেস্টার্ন নিজের ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেবার পর তার নিঃসঙ্গ খামারে বসে এই সব লিখেছিলো, অথবা জ্যাকসন, মিসিসিপিতে তার আইনজীবীর ঘরে বসে, অথবা জেফারসন ডেভিসের সঙ্গে আলাপের পর মোমবাতির আলোয় ভিকস্‌বার্গের তার হোটেল কক্ষে বসে, অথবা রণাঙ্গনের কোনো খোলা জায়গায় নিভু নিভু ক্যাম্পের আগুনের পাশে বসে, চারিদিকে মাটিতে শুয়ে রয়েছে রাতের অন্ধকারে তার সাথী সৈনিকরা, আর রাত তখন পরিপূর্ণ একটা ধীর বিষণ্ন ফিসফিসানিতে, যেন পাইন গাছের শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়ে মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে যাচ্ছে, যদিও সে শব্দ ছিলো হাজার হাজার ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। তো জ্যাক বার্ডেন যেসব কথা পড়তে পারতো, কিন্তু সে তার অর্থ বুঝবে সেটা কেমন করে প্রত্যাশা করা যায়? তার কাছে তো সেসব ছিলো কিছু কথামাত্র, কারণ তার কাছে পৃথিবী তো তখন শুধু কতকগুলি বস্তুর সমাহার, নানান তুচ্ছ টুকিটাকি জিনিস, ভাঙা, জীর্ণ, ধূলি-ধূসরিত, চিলেকোঠায় যেগুলি কোনোরকমে জড়ো করে রাখা হয়। অথবা সেটা তার চোখের সামনে (কিংবা

চোখের পেছনে) নানা জিনিসের একটা নিরন্তর প্রবাহ মাত্র, যার একটার সঙ্গে আরেকটা কোনো অবধি সম্পর্ক নেই।

কিংবা বুঝতে পারেনি বলে কাস্ মেস্টার্নের জার্নাল নিজের সামনে থেকে সে ঠেলে সরিয়ে দেয় নি, বরং সে যে বুঝতে ভয় পাচ্ছে সেই জন্য, কারণ ওর উপলব্ধির মধ্যে লুকিয়ে ছিলো তার নিজের জন্য একটা তীব্র তিরস্কার।

সে যাই হোক, জ্যাক বার্ডেন জার্নালটা ছেড়ে দিয়ে তার মহানিদ্রার একটা পর্বের মধ্যে ঢুকে গেলো। সে রাতের বেলায় ঘরে ফিরতো এবং যেহেতু জানতো যে সে কাজ করতে পারবে না সেহেতু সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়তো। সে বারো ঘণ্টা, চৌদ্দ ঘণ্টা, পনেরো ঘণ্টা ঘুমাতো, ঘুমের মধ্যে তার মনে হতো সে যেন গভীর থেকে গভীরতর ঘুমের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে, সে যেন এক ডুবুরী, কালো অন্ধকার জলের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, একটা কিছু খুঁজছে, সেটা হয়তো সেখানে আছে, ওই অতল আঁধারেএকটু আলো থাকলেই যেটা জ্বল জ্বল করে উঠতো, কিন্তু সেখানে কোনো আলো নেই। তারপর ভোরবেলার ঘুম ভাঙার পর সে বিছানায় শুয়ে থাকতো, কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তার, ক্ষুধার্ত নয় সে, এই দুনিয়ার নানান ছোটছোট শব্দ শুনতে পেতো চুপিসারে, তারা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, দরজার তলা দিয়ে, কাঁচের ফাঁক দিয়ে, দেয়ালের ফুটো দিয়ে, কাঠ আর প্ল্যাস্টারের রন্ধ্র দিয়ে। তারপর সে ভাবতো, আমি যদি না উঠি তাহলে তো আবার শুতে যেতে পারবো না। অতএব সে উঠে পড়ে এমন একটা জগতের মধ্যে চলে যেতো যা তার কাছে মনে হতো অত্যন্ত অচেনা, কিন্তু সেই অচেনার মধ্যে আশা দিয়ে নিরাশ করার বিড়ম্বনার মতো একটা কিছু থাকতো, যেন একজন বৃদ্ধ তার শৈশবের জগতে প্রত্যাবর্তন করছে।

তারপর একদিন সকালে উঠে পড়ে, সে ওই জগতের মধ্যে যাবার পর তার ঘরে এবং পাইন টেবিলের কাছে আর ফিরে এলো না। জার্নালের কালো খাতাগুলি, আংটি, ফটো, চিঠির প্যাকেট সব পড়ে রইলো একটা মোটা ভারী পাণ্ডুলিপির পাশে, জ্যাক বার্ডেনের সমগ্র রচনা, কাগজচাপার নিচে যার পৃষ্ঠাগুলি ইতোমধ্যে কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছিলো।

কয়েক সপ্তাহ পরে তার বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে সে একটা মস্ত বড়ো প্যাকেট পেলো, ডাক মাশুল তাকেই দিতে হয়, তার মধ্যে ছিলো তার ছোট্ট পাইন কাঠের টেবিলের উপর ফেলে আসা যাবতীয় জিনিসপত্র। প্যাকেটটা না খোলা অবস্থাতেই তার সঙ্গে ঘুরলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, গেলো তার এ্যাপার্টমেন্টে, যেখানে তার সুন্দরী স্ত্রী লয়-এর সঙ্গে সে কিছুকাল বাস করেছিলো,

তারপর সেই মুহূর্ত এসে উপস্থিত হলো যখন সে ওই এ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে আবার বেরিয়ে গেলো, আর ফিরে এলো না। তারপর আবার এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, এক হোটেল কক্ষ থেকে আরেক হোটেল কক্ষে তার সঙ্গে সঙ্গে চললো হলদে হয়ে আসা বাদামী কাগজে মোড়ানো একটা বড় চৌকোমতো প্যাকেট, যে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিলো তা ঝুলে পড়েছে, তার উপরে মিঃ জ্যাক বার্ডেন লেখা নামটি ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে আসছে।

## পঞ্চম অধ্যায়

অতীতের মোহময় ভুবনে আমার প্রথম ভ্রমণের এবং ঐতিহাসিক গবেষণায় আমার প্রথম কাজের সমাপ্তি ওইখানেই ঘটে। আগেই বলেছি ব্যাপারটাতে খুব সফল হতে পারি নি। কিন্তু আমার দ্বিতীয় কাজে আমি চমৎকার সাফল্য অর্জন করি। সেটা হল 'ন্যায়পরায়ণ বিচারপতির মামলা'। একটা কাজ চমৎকারভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমি অবশ্যই নিজেকে অভিনন্দিত করতে পারতাম। নিখুঁত একটা গবেষণার কাজ হয়েছিলো সেটা, তবে তার আঙ্গিকগত ত্রুটিহীনতা মলিন করে দেয় একটি বিষয় ঃ ঐ কাজের একটা অর্থ দাঁড়িয়ে যায়।

সূত্রপাতটি কিভাবে হয় সেকথা আগে বলেছি। কর্তা কালো ক্যাডিলাকে বসে আছেন, আঁধার রাতে গাড়ি ছুটে চলেছে, তিনি আমাকে বললেন ( যে-আমি, ইতিহাসের ছাত্র, বর্তমানের জ্যাক বার্ডেনে পরিণত হয়েছি), কিছু না কিছু সব সময়ই থাকে। আমি বলেছিলাম, হয়ত জাজের ক্ষেত্রে নয়। আর তিনি বলেছিলেন, মানুষের সূচনা পাপের মধ্যে, তার জন্ম দুর্নীতি ও দূষণের মধ্যে, এবং ন্যাপির দুর্গন্ধ থেকে যাত্রা শুরু করে সে তা শেষ করে কাফনের কাপড়ের গন্ধের মধ্যে। সব সময় কিছু না কিছু থাকেই।

কালো ক্যাডিলাক রাত্রির আঁধার চিরে গুঞ্জন করছে, গাড়ির টায়ারগুলি সড়কের বুকে গান গাইছে, কালো ক্ষেতগুলি দ্রুত পেছনে সরে যাচ্ছে। সুগার-বয় হুইলের উপর ঝুঁকে বসে আছে, তার তুলনায় হুইলটাকে বেশি বড়ো দেখাচ্ছে, আর কর্তা সামনের আসনে বসে আছেন, একেবারে পিঠ সোজা করে। আলোর সুড়ঙের মধ্য দিয়ে ছুটে যেতে যেতে আমি তাঁর মাথার পেছন দিকটার কালো পুঞ্জ দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

গাড়ি থামতেই আমি জেগে উঠি। টের পেলাম যে আবার আমরা স্টার্ক বাসভবনে ফিরে এসেছি। গুঁড়ি মেরে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। কর্তা আগেই নেমে গিয়েছিলেন। তিনি এখন আঙ্গিনায়, তারার আলোয়, ঠিক ফটকের ওপাশে। সুগার-বয় গাড়ির দরজা লক্ করছিলো।

আঙ্গিনাতে যেতেই কর্তা বললেন, সুগার–বয় নিচে কৌচে ঘুমুবে, তবে তোমার জন্য উপরে একটা ছোট খাট ঠিক করা আছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজা। এখন একটুখানি দু'চোখের পাতা এক ক'রে নাও, কাল থেকেই তোমাকে খুঁড়তে শুরু করতে হবে, বিচারক কোথায় কি ফেলেছেন খুঁজে বার করতে হবে।

আমি বলেছিলাম, খোঁড়াখুঁড়িটা দীর্ঘ হবে।

তিনি বলেন, শোনো, তুমি যদি কাজটা করতে না চাও তাহলে করতে হবে না। অন্য কাউকে টাকা দিয়ে এটা করাতে পারবো। নাকি তুমি নিজের বেতন বাড়িয়ে নিতে চাইছো?

না, আমি আমার বেতন বাড়াতে চাই না।

চাও বা না চাও, মাসে একশো বাড়িয়ে দিলাম।

আমি বলেছিলাম, ওটা গীর্জায় দান করে দেবেন। টাকাই যদি আমি চাইতাম তাহলে আপনার চাকুরি করার চাইতে অন্য কোনো সহজ রাস্তায় টাকা রোজগারের কথা ভাবতে পারতাম।

তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসো বলে আমার চাকুরি করছো?

কেন যে আপনার চাকুরি করছি তা আমি জানি না, তবে আপনাকে ভালোবাসি বলে নয়। আপনার টাকার জন্যেও নয়।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কর্তা বলেছিলেন, না, আমার জন্য কেন কাজ করো, কেন আমার চাকুরি করো, তা তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। বলে তিনি হেসে উঠেছিলেন।

কেন?

তুমি আমার চাকুরি করো কারণ আমি যা আমি তাই, আর তুমি যা তুমিও তাই। বস্তুনিচয়ের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছে।

খুব চমৎকার একটা ব্যাখ্যা দিলেন বটে!

না, ব্যাখ্যা নয়। তিনি আবার হেসে উঠে বললেন, কোনো ব্যাখ্যা নেই। কোনো কিছুরই। তুমি শুধু বস্তুনিচয়ের প্রকৃতিটা নির্দেশ করতে পারো এই মাত্র। যদি সেটা দেখবার মতো বুদ্ধি তোমার থাকে।

আমার অতো বুদ্ধি নেই, আমি বলেছিলাম।

বিচারকের অতীতে যা কিছু আছে সেটা খুঁড়ে বার করবার মতো বুদ্ধি তোমার ঠিকই আছে।

কিছু নাও থাকতে পারে।

মাথা খারাপ! যাও, শুয়ে পড়ো।

আপনি শোবেন না?

না।

আমি চলে যাই। তিনি অন্ধকারে আঙ্গিনায় পায়চারি করতে থাকলেন, মাথা সামনে অল্প ঝুঁকিয়ে, দু'হাত পেছনে বেঁধে, অলসভাবে, যেন বিকাল বেলায় পার্কে বেড়াতে এসেছেন। তবে সময়টা তখন বিকাল নয়, রাত সোয়া তিনটা।

উপরে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেলাম না। শুয়ে শুয়ে জাজ আরউইনের কথা ভাবতে থাকলাম। উন্নত, বয়স হয়ে যাওয়া মাথা নিয়ে তিনি কিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাঁর হলুদ চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিলো, তাঁর শক্ত, বয়স হয়ে যাওয়া হলুদ দাঁতের উপর ঠোঁট কুঁচকে আমাকে বলেছিলেন, এই সপ্তাহে আমি তোমার মায়ের ওখানে খেতে যাচ্ছি, আমি কি তাঁকে বলবো যে তোমার চাকুরিটা এখনো তোমার বেশ ভালো লাগছে? কিন্তু আমার চোখের সামনে ওই দৃশ্য স্থায়ী হলো না। তারপর বিচারপতিকে দেখলাম সমুদ্রের ধারের সাদা বাড়িতে, লম্বা টানা ঘরে তিনি পণ্ডিত এটর্নীর মুখোমুখি বসে আছেন, দুজনের মাঝখানে দাবার বোর্ড পাতা, তখন তিনি বুড়ো মানুষ নন, এক যুবাপুরুষ, তীক্ষ্ণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখ, একাগ্র চিত্তে কি চাল দেবেন সেটা ভাবছেন। কিন্তু এই ছবিও স্থায়ী হলো না। ভেজা ভেজা, ধূসর শীতের প্রত্যুষে জলাভূমিতে লম্বা লম্বা ধূসর বুনো ঘাসের মধ্য দিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়া তাঁর মুখ দেখতে পেলাম আমি, তিনি বলছেন, ওই হাঁসটাকে তোমার আরো তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হতো, জ্যাক। হাঁসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, বেটা। তবে, কুছ্ পরোয়া নেই, বেটা, আমি তোকে ঠিকই পাক্কা হাঁসশিকারী বানিয়ে ছাড়বো। সে-মুখ ছিলো হাসিতে উদ্ভাসিত। আর আমি বলতে চাইছিলাম, জাজ্, কিছু কি আছে? আমি কি পাবো কিছু? কিন্তু মুখটা শুধু হাসলো আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সে-মুখ কিছু বলতে পারার আগে, হাসির মাঝখানেই, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তারপর এলো নতুন দিন, আর আমি লেগে গেলাম মরা বিড়াল খুঁড়ে বার করার কাজে, পনীরের ভেতর থেকে পোকা খুঁটে আনার কাজে, গোলাপের মধ্যে কোথায় কীট সেটা দেখতে, চালের পায়েসে কিসমিসের সাথে মরা মাছি খুঁজতে।

আর পেয়েও গেলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নয়। খুঁজতে থাকলেই তা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। সেটা সমাধিস্থ হয়ে থাকে কালের ধ্বংসাবশেষের তলায়, সেটাই তার যোগ্য স্থান। আর তুমি তা সঙ্গে সঙ্গে পেতেও চাও না, অন্ততঃ তুমি যদি ইতিহাসের ছাত্র হও তাহলে। সঙ্গে সঙ্গে পেলে তোমার আঙ্গিকনৈপুণ্য দেখাবার কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি সে-সুযোগ পেয়েছিলাম।

পর দিন বিকালে শহরের একটা পানশালায় আমার চারপাশে শূন্য বীয়ারের বোতল পরিবৃত হয়ে, আমি প্রথম পদক্ষেপ নিলাম। শেষ সিগারেটের মাথা থেকে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, মানবসন্তানের প্রথম মৌলিক পাপের কথা ছেড়ে দিলে, কোনো একজন মানুষের পক্ষে সীমারেখা অতিক্রম করার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশি কিসের জন্য?

জবাব দিলাম ঃ উচ্চাভিলাষ, রমণীপ্রেম, ভয়, অর্থ।

প্রশ্ন করলাম ঃ বিচারপতি কি উচ্চাভিলাষী ?

জবাব দিলাম ঃ না। উচ্চাভিলাষী হল সেই মানুষ যে চায় অন্য লোকরা তাকে বড়ো ভাবুক। বিচারপতি জানেন যে তিনি বড়ো, এবং অন্য লোকরা তাঁকে কী ভাবে সে নিয়ে তাঁর কোনো মাথা ব্যথা নেই।

প্রশ্ন করলাম, রমণীপ্রেমের কি খবর?

আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না যে বিচারপতি তাঁর সময়ে এক্ষেত্রে খুব পিছিয়ে ছিলেন না, কিন্তু এ বিষয়েও আমি সুনিশ্চিত ছিলাম যে এব্যাপারে তাঁর কোনো কেলেঙ্কারীর খবর এখানকার কেউ জানে না। কারণ একটা ছোট শহরে এসব কথা কখনো চাপা থাকে না। কিছু থেকে থাকলে অনেক আগেই সবাই তা জেনে ফেলতো।

প্রশ্ন করলাম, বিচারপতি কি সহজে ভয় পাবার মতো মানুষ?

জবাব দিলাম, না, সহজে ভয় পাবার মতো মানুষ তিনি নন।

বাকী থাকলো অর্থ।

অতএব আমি প্রশ্ন করলাম, বিচারপতি কি অর্থ ভালোবাসেন?

তাঁকে সুখী করার জন্য যতটুকু অর্থ প্রয়োজন ততটুকু অর্থই তিনি চান।

আমি প্রশ্ন করলাম, এমন একটা সময় কি কখনো ছিলো যখন বিচারপতিকে খুশি করার মতো অর্থ বিচারপতির ছিলো না? স্বাভাবিকভাবেই সেটা খুব খুদকুঁড়ো হবে না।

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। কিন্তু কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না। আমার শৈশব থেকে উঠে আসা একটা কণ্ঠস্বর ফিস ফিস করে কিছু একটা বললো, কিন্তু কথাটা ধরতে পারলাম না। আমার একটা আবছা অনুভূতি হলো, সময়ের গভীরতা থেকে, আমি এক ছোট্ট বালক, বড়োরা বসে আছে একটা ঘরে, আমি সেখানে ঢুকে পড়েছি, আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ওরা তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিলো, ওরা চায় নি যে আমি ওদের কথা শুনে ফেলি। ওরা কি নিয়ে কথা বলছিলো? আমি কি তা শুনে

ফেলেছিলাম? শৈশব থেকে উঠে আসা সেই ফিসফিস শব্দ আমি শুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেই শব্দ বহু দূরে। আমাকে কোনো উত্তর যোগাতে পারলো না তা। অতএব টেবিল থেকে উঠে পড়লাম, খালি বীয়ারের বোতল আর সিগারেটের টুকরোগুলো পড়ে থাকলো, আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম, শেষ বিকালে একটু বৃষ্টি হয়েছিলো, টার্কিশ স্নানাগারের মতো রাস্তা থেকে তখনো ভাঁপ উঠছিলো, ভেজা এ্যাশফাল্টের উপর দিয়ে ছুটবার সময় মোটর টায়ারগুলি উষ্ণ হিসহিস শব্দ করছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আরো পরে উপসাগরের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসবে। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়।

শেষ পর্যন্ত একটা ট্যাক্সি ধরতে পারলাম। বললাম, সেন্ট-এটীন স্ট্রীট আর সাউথ ফিফ্থের মোড়ে চলুন। তারপর আসনে গা এলিয়ে দিয়ে ভেজা রাস্তায় টায়ারের হিস হিস শব্দ শুনতে থাকলাম, মনে হলো কড়াইতে কিছু ভাজা হচ্ছে। আমি যাচ্ছি বিচারপতির বিষয়ে উত্তরের খোঁজে। যে-লোকটা উত্তর জানে সে যদি বলে আমাকে।

লোকটা বহু বছর ধরে বিচারপতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো, তার অন্য সত্তা, তার ডেমন, তার জোনাথান, তার ভ্রাতা। লোকটা ছিলো সেই লোক যে একদা ছিলো পণ্ডিত এটর্নী। সে ঠিক জানবে।

আমি মেক্সিকান রেস্তোরাঁটির সামনে ফুটপাথের উপর দাঁড়ালাম। ভেতর থেকে ভেসে আসা জিউক বক্সের ধ্বনিতরঙ্গে বাতাস জেলির মতো থরথর করে কাঁপছিলো। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে আমি ওই কম্পমান ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়ে চোখ তুলে তেতলার দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, লেখাগুলি এখনো সেখানে আছে, ছোট লোহার বারান্দা থেকে তার দিয়ে ঝোলানো, পেরেক দিয়ে দেয়ালে সাঁটা, কাঠের বোর্ডে রঙ-বেরঙের কালি দিয়ে আঁকা, সাদা, লাল, কালো, সবুজ, অক্ষরগুলি বিপরীত রঙে চিত্রময়। ব্যালকনি থেকে একটা বড়ো সাইন ঝুলছে, সেখানে লেখা আছে ঃ ঈশ্বরকে উপহাস করা যায় না। আরেকটা ঃ এখনই ত্রাণের সময়।

আমি মনে মনে বললাম, হ্যাঁ, তিনি এখনও এখানেই থাকেন। এই রেস্তোরাঁর উপরে তাঁর আস্তানা। পাশের ব্লকে উলঙ্গ নিগ্রো শিশুরা বেড়ালদের মধ্যে খেলাধুলা করে, সূর্যাস্তের পর নিগ্রো মহিলারা সিঁড়িতে বসে ধীরে ধীরে তালপাতার পাখা নেড়ে হাওয়া খায়। সিঁড়ির দরজা দিয়ে উপরে উঠে যাবার আগে সিগারেটের জন্য পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম যে নেই। কাজেই রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। জিউক বক্স সেখানে এতক্ষণে সশব্দে থামবার উপক্রম করছিলো।

বীয়ার বার-এর পেছনে এক বৃদ্ধা মহিলা বসেছিলো, পিপার মতো চ্যাপ্টা হয়ে,

ভ্রূ খোঁচা খোঁচা, কাঁটার মতো, সাদা হয়ে গেছে, গায়ের মেক্সিকান চামড়ার রঙ বাদামী, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সিগারিল্লো?

ও জানতে চাইলো, কে টিপো?

বললাম, লাকি। মহিলা সিগারেটের প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দিতেই আমি উপরে আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই বৃদ্ধ, উপরে আছেন? মহিলার মুখ দেখে মনে হলো সে কিছুই বোঝে নি। কাজেই এবার আমি বললাম, ইস্ত্রা আরিবা এল ভিইয়ো? বলতে পেরে বেশ খুশি হলাম।

মহিলা জবাব দিলো, কিয়েঁ সাবে? ভিয়েন ই ভা।

তাহলে তিনি আসা–যাওয়ার মধ্যেই আছেন। ঈশ্বরের কাজে।

তারপর মোটামুটি বোধগম্য ইংরেজীতে বারের পেছন দিকের ছায়াঘেরা জায়গা থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, বৃদ্ধ বাইরে গেছেন।

ওই লোকটিও মেক্সিকান, বুড়ো মানুষ, ভেতর দিকে একটা চেয়ারে বসে আছে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বৃদ্ধার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, আমাকে একটা বীয়ার দিন। আঙ্গুল দিয়ে আমি দেখিয়ে দিলাম।

বীয়ার খেতে খেতে আমি কাউন্টারের ওপাশে আরেকটা লেখা দেখলাম, বিরাট একটা প্লাইউডের টুকরোর উপর আঁকা, কাঁটা দিয়ে দেয়ালে টানানো। পশ্চাদপটে উজ্জ্বল লাল রঙ, উপরে কোণার দিকে নীল রঙের লতানো পুষ্পগুচ্ছ, অক্ষরগুলি কালো রঙে লেখা, সাদার পরিপার্শ্ব তাকে ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। সেখানে লেখা আছে ঃ অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য সন্নিকট। (ম্যাথু, তৃতীয় সূত্র, দ্বিতীয় স্তবক)।

আমি আঙ্গুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে বললাম, দে এল্? বৃদ্ধের কাজ, তাই না?

বয়স্কা মহিলা বললো, সি, সিনর। তারপর অপ্রাসঙ্গিকভাবে যোগ করলো, এস্ কোনো উন্ সান্তিতো।

আমি একমত হয়ে বললাম, হ্যাঁ, সন্ত হতে পারেন, তবে উন্মাদও বটে।

উন্মাদ?

আমি ব্যাখ্যা করলাম, এস্ লোকো, পাগল।

মহিলা এর জবাবে কিছু বললো না। আমি বীয়ার খেতে লাগলাম। হঠাৎ বার–এর শেষ প্রান্তের দিক থেকে বুড়ো মেক্সিকান লোকটি বলে উঠলো, ওই যে, উনি আসছেন!

মুখ ঘুরিয়ে ময়লা কাঁচের দরজার ওপাশে আমি কালো পোশাক পরিহিত মানুষটাকে দেখলাম, তারপরই তিনি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। আগের চাইতে আরো বুড়ো হয়ে গেছেন, জীর্ণ পানামা হ্যাটের নিচ দিয়ে ঘামে ভেজা সাদা চুলের

গোছা নেমে এসেছে, স্টীল ফ্রেমের চশমা বিপজ্জনকভাবে নাকের উপর ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটি ফ্যাকাশে, কাঁধ ঝুঁকে গেছে, যেন কুৎসিৎ বেঢপ পেটের সতর্ক টানে টিকে আছে কোনোরকমে, আর পেটটা সামনে ঠেলে বেরিয়ে আছে ভারী একটা ট্রের মতো, পথের মোড়ে কোনো ফেরিওয়ালা যেন কিছু বিক্রী করতে বেরিয়েছে। পেটের উপর কালো কোটের বোতাম আটকানো যায় না।

বাইরের শেষ বিকালের রোদের মধ্য থেকে রেস্তোরাঁর ছায়ার ভেতরে প্রবেশ করায় উনি পরিষ্কারভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। ভেতরে ঢুকে গম্ভীর মুখে কয়েকবার চোখ মিটমিট করলেন, স্পষ্টতঃই আমাকে চিনতে পারেন নি।

মেক্সিকান বুড়ো পণ্ডিত এটর্নীকে স্বাগত জানালো, শুভ সন্ধ্যা, সিনর।

মহিলা বললো, বুয়েনাস্ তার্দেস্।

পণ্ডিত এটর্নী টুপী খুলে মহিলার দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু নিচু করলেন, আর তাঁর মাথার ওই ভঙ্গি অকস্মাৎ আমার মনে একটা ছবি জাগিয়ে তুললো, বহু যুগের ওপার হতে, সমুদ্রের ধারে সাদা একটা বাড়ির লম্বা টানা একটা ঘর, সেখানে এই মানুষটা বসে আছে, একই অথচ ভিন্ন, অনেক কম বয়েসী, চুল সাদা হয় নি, বসে আছে ওই ঘরে। তারপরই মহিলাকে লক্ষ করে তাঁকে বলতে শুনলাম, শুভ সন্ধ্যা, এর পর তিনি মেক্সিকান বুড়োর দিকে তাকিয়ে তাকেও শুভ সন্ধ্যা জানালেন।

মেক্সিকান বুড়ো আমাকে দেখিয়ে বললো, আপনার জন্য বসে আছে।

আমার মনে হয় শুধু তখনই পণ্ডিত এটর্নী আমাকে সত্যি সত্যি লক্ষ করেন, কিন্তু তখনো আমাকে চিনতে পারেন নি। ছায়া ছায়া ঘরে তখনো চোখ মিট মিট করে তাকাচ্ছিলেন। আর আমাকে তিনি ওখানে দেখবেন তেমন আশা করারও কোনো কারণ ছিলো না তাঁর।

আমি বললাম, হ্যালো, আমাকে তুমি চেনো না?

চিনি।

তিনি চোখ মিটমিট করে আমাকে লক্ষ করে চললেন, তারপর তাঁর হাত বাড়িয়ে দিতেই আমি হাত মেলালাম, তাঁর হাত চটচটে, ভেজা ভেজা।

আমি বললাম, চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।

মেক্সিকান বুড়ো জিজ্ঞাসা করলো, রুটি লাগবে?

পণ্ডিত এটর্নী বললেন, হ্যাঁ, ধন্যবাদ, যদি অসুবিধা না হয়।

মেক্সিকানটি উঠে কাউন্টারের ওপাশে গিয়ে একটা বড়ো ব্রাউন কাগজের ঠোঙ্গা নিয়ে এলো, কি সব জিনিসে ঠাসা, তারপর ওটা তাঁর হাতে তুলে দিলো।

পণ্ডিত এটনী বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, স্যার।

মেক্সিকান মাথা নুইয়ে বললো, ডি নাদা, কিছু না, কিছু না।

পণ্ডিত এটনী প্রথমে লোকটির ,পরে মহিলার, উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে সৌজন্যের সঙ্গে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর মাথা নাড়াবার ভঙ্গি আবার আমার মনে সমুদ্রের ধারের সাদা বাড়িটার একটা ঘরের স্মৃতি জাগিয়ে তুললো।

তারপর আমি তাঁর পেছন পেছন রেস্তোরাঁ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। রাস্তার ওপাশে একটা ছোট পার্ক, পায়ে পায়ে মাড়ানো বাদামী ঘাস, এখন জল পড়ে চিকচিক করছে, বেঞ্চের উপর কয়েকটি হাভাতে বাউণ্ডুলে বসে আছে, স্বচ্ছ বিবেক নিয়ে পায়রাগুলি সেখানে কোমল গলায় বক্‌বকম করছে আর ফোয়ারার চারপাশের সিমেন্ট বাঁধানো জায়গায় খুব মার্জিতভাবে পিচ্‌ করে তাদের ছোট ছোট চুন-সাদা পুরীষ ত্যাগ করছে। আমি পায়রাগুলির দিকে তাকালাম, তারপর তাঁর হাতের মুখ-খোলা ঢাউস ঠোঙ্গাটা লক্ষ করলাম, দেখলাম তার মধ্যে রুটির টুকরো ঠাসা। আমি জানতে চাইলাম, তুমি কি পায়রাগুলোকে খাওয়াবে নাকি?

তিনি উপরে যাবার দরজার দিকে এগুতে এগুতে বললেন, না। এ গুলো জর্জের জন্য।

কুকুর রেখেছো নাকি তুমি?

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি বললেন, না।

তা হলে জর্জটা কি? টিয়াপাখি?

সিঁড়ির ধাপগুলি ছিলো খাড়া। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি বললেন, না, জর্জ একজন দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষ।

তার মানে, আমি বুঝতে পারলাম, একটা হাভাতে বাউণ্ডুলে। দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষ হলো একটা বাউণ্ডুলে, যার সৌভাগ্য হয়েছে একজন নির্বোধ কোমলপ্রাণ মানুষের বাড়িতে পা দেবার এবং সেখানে আশ্রয় পাবার। সেখানে থাকার একটা ভালো জায়গা যদি তার জুটে যায় তাহলে সে হাভাতে বাউণ্ডুলের স্তর থেকে দুর্ভাগ্যপীড়িতের স্তরে উত্তীর্ণ হয়। পণ্ডিত এটনী ইতোপূর্বে বেশ কয়েকজন দুর্ভাগ্যপীড়িতকে তাঁর কাছে রেখেছিলেন। একবার একজন দুর্ভাগ্যপীড়িত, তিনি যে মিশনের সঙ্গে কাজ করতেন, তার অর্গান-বাদিকার সঙ্গে লটর-পটরের কাণ্ড ঘটায়। আরেক দুর্ভাগ্যপীড়িত তাঁর ঘড়ি আর ফাই বেটা কাপ্পা চাবিটি নিয়ে কেটে পড়ে।

তো জর্জ হলো আরেকজন দুর্ভাগ্যপীড়িত। আমি রুটির ঠোঙ্গার দিকে তাকিয়ে বললাম, এই যদি তার খাবার হয় তাহলে সে বেশ দুর্ভাগ্যপীড়িতই বটে।

পণ্ডিত এটনী বললেন, সে এর সামান্যই খায়, তাও দৈবক্রমে। এগুলি সে

ব্যবহার করে তার কাজে। তবে কিছু কিছু গলা দিয়ে নেমে যায়। আমি নিশ্চিত যে সে-কারণেই সে কখনো ক্ষুধার্ত বোধ করে না। শুধু মিষ্টির জন্য ছাড়া।

দোহাই ঈশ্বরের, রুটির টুকরো দিয়ে সে কি কাজ করে? আর তার অজান্তে গলা দিয়ে সেগুলো নেমেই বা যায় কিভাবে?

খামোখা এভাবে ঈশ্বরের নাম নিও না। জর্জের কাজটা খুবই ধীসম্পন্ন, খুব নন্দনতাত্ত্বিক। দেখতে পাবে।

তা আমি দেখেছিলাম। আমরা দোতলায় উঠে সরু হলঘর পেরিয়ে একটা দরজা দিয়ে ঢুকলাম। ও-ই নিশ্চয়ই জর্জ। বেশ বড়ো ঘর, স্বল্প আসবাবপত্রে সজ্জিত, ঘরটার এক কোণায় একটা পুরানো কম্বলের উপর দর্জির মতো ভঙ্গিতে জর্জ বসে আছে, তার সামনে দুটি পাত্র, যার মধ্যে জিনিসপত্র মাখানো যায়, আর রয়েছে দু'ফুট-বাই-চার ফুট একটা কাঠের বড়ো খণ্ড, মেঝের উপর শোয়ানো।

আমরা ঢুকতেই জর্জ মুখ তুলে বললো, আমার রুটি শেষ হয়ে গেছে।

পণ্ডিত এটর্নী তাঁর হাতের ব্যাগটা ওকে দিয়ে বললেন, এই নাও।

জর্জ রুটির টুকরোগুলি একটা পাত্রে ঢেলে দিলো, তারপর একটা টুকরো নিজের মুখে পুরে গম্ভীরভাবে, একাগ্র চিত্তে, চিবুতে শুরু করলো, বেশ বড়ো সড়ো একটা লোক, পেশীবহুল, ঘাড়টা দেখতে অসম্ভব শক্তিশালী, রুটি চিবুনোর সময় তার ঘাড়ের মোটা রগগুলি ফুলে ফুলে ওঠা-নামা করছিলো। মাথার চুল হলুদ রঙের, চুল এখন প্রায় নেই বললেই চলে, চ্যাপ্টা মুখ, নীল চোখ। রুটি চিবুনোর সময় সে ঘরের ওপাশে একটা বিন্দুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে ছিলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি জন্যে করছে?

দেবদূত বানাচ্ছে।

তাই?

ঠিক তক্ষুণি জর্জ তার সামনের একটা পাত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে ভালো করে চিবুনো রুটির গোল্লাটা তার মুখ থেকে পাত্রের মধ্যে ফেলে দিলো। তারপর সে আরেক খণ্ড রুটি মুখে পুরলো।

পণ্ডিত এটর্নী ঘরের অন্য এক কোণায় দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা একখণ্ড প্লাইউডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ওই যে ওখানে একটা আছে। ওটা সে শেষ করেছে। আমি ভালো করে দেখবার জন্য ওদিকে এগিয়ে গেলাম। এক পাশে এক দেবদূতের ছবি, ডানা আছে, ঢেউ-খেলানো পর্দা আছে, পুটিং জাতীয় কিছু দিয়ে জমি থেকে উঁচু করে বানানো হয়েছে, বাস্-রিলিফিরে আঙ্গিকে। পণ্ডিত এটর্নী জানালেন, ওটা সবে শুকোতে আরম্ভ করেছে। ভালো করে শুকিয়ে যাবার পর ও

রঙ করবে। তারপর লাক্ষা দিয়ে বিশেষভাবে বানানো পাতলা কাগজে তার কাজটা চূড়ান্ত করবে। সবশেষে বোর্ডটা রঙ করবে এবং নিচে একটা মটো বসাবে।

আমি বললাম, খুব সুন্দর।

ও দেবদূতের স্ট্যাচুও বানায়। দেখো। তিনি রান্নাঘরের একটা দেরাজ খুললেন, তার এক তাকে কিছু বাসন-কোসন, পেয়ালা-পিরিচ ইত্যাদি, অন্য তাকে বর্ণাঢ্য কয়েকটি দেবদূতের মূর্তি।

আমি যখন দেবদূতগুলি লক্ষ করছিলাম তখন পণ্ডিত এটর্নী একটা স্যুপের কৌটা, একটা রুটি আর কিছু মাখন দেরাজ থেকে বার করে ঘরের মাঝখানের টেবিলটার উপর রাখলেন। তারপর তিনি ঘরের এক কোণায় দুই বার্নারের চুলার একটা জ্বালিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি খাবে আমার সঙ্গে?

আমি বললাম, না। তারপর আমি দেবদূতগুলি দেখতে থাকলাম।

স্যুপটা একটা পাত্রে ঢেলে তিনি বললেন, মাঝে মাঝে রাস্তায় বসে ও এগুলো বিক্রী করে, তবে সব চাইতে ভালোগুলো ও প্রাণ ধরে বিক্রী করতে পারে না।

এই কি সব চাইতে ভালোগুলো?

পণ্ডিত এটর্নী বললেন, হ্যাঁ, তারপর যোগ করলেন, খুব সুন্দর, তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আর কিইবা বলতে পারতাম আমি? তারপর শিল্পীর দিকে চোখ তুলে আমি জানতে চাইলাম, দেবদূত ছাড়া ও কি আর কিছু বানায় না? এই যেমন বাচ্চাদের পুতুল, কিংবা বুলডগ?

না, শুধু দেবদূত বানায়। ওই ঘটনাটার জন্য।

কোন ঘটনা?

ওর স্ত্রী। পাত্রে স্যুপ নাড়তে নাড়তে পণ্ডিত এটর্নী বললেন, ওর স্ত্রীর কারণেই ও শুধু দেবদূত বানায়। ওরা একটা সার্কাসে কাজ করতো, জানো তো?

না, আমি জানতাম না।

ওরা ছিলো, যাদের বলা হয়, নভোচারী। মেয়েটি দেবদূতের খেলা দেখতো। ওর গায়ে বিশাল দুটি সাদা পাখা লাগানো থাকতো। জর্জ বলেছে।

রুটি চিবুতে চিবুতে জর্জ বললো, সাদা পাখা। আমি শুনলাম সে বলছে 'সাওয়া পাওয়া।' তার বড়ো বড়ো দুটি হাত সে পাখার মতো নাড়ালো।

পণ্ডিত এটর্নী ধৈর্য সহকারে ব্যাখ্যা করলেন, মেয়েটি যেন উড়ছে এমনিভাবে পাখা দোলাতে দোলাতে অনেক উঁচু থেকে নেমে আসতো।

আমি বললাম, তারপর একদিন দড়ি ছিঁড়ে যায়।

যন্ত্রটা কোথাও বিগড়ে গিয়েছিলো। ব্যাপারটা জর্জের উপর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া

ঘটায়।

তো মেয়েটির উপর কী রকম প্রতিক্রিয়া হয়?

আমার কৌতুকের প্রতি কোনো কান না দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, এমন হলো যে জর্জ তার নিজের খেলাটা আর দেখাতে পারতো না।

ওর কি খেলা ছিলো?

ও ফাঁসীকাঠে ঝুলে পড়তো।

ওহ্! আমি জর্জের দিকে তাকালাম। তার শক্তিশালী বলিষ্ঠ ঘাড়ের পেছনে তা হলে এই হলো কথা। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওর ক্ষেত্রেও কি তার যন্ত্রটা খারাপ হয়ে যায়, ওর শ্বাস রুদ্ধ করে দেয়, বা ওই জাতীয় কিছু?

না, ওর কাছে গোটা ব্যাপারটাই ভীষণ অরুচিকর হয়ে উঠেছিলো।

অরুচিকর?

হ্যাঁ, অরুচিকর। শেষে এমন হলো যে তার নিজের বেছে নেওয়া পেশাতেও সে আর সানন্দে কাজ করতে পারছিলো না। ঘুমুতে গেলেই সে স্বপ্ন দেখতো যে পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে। বাচ্চা ছেলের মতো বিছানা ভিজিয়ে ফেলতো।

জর্জ রুটি চিবুতে চিবুতে বললো, পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি, কিন্তু তার মুখ থেকে যে-ধ্বনি বেরুলো তা হল 'পোয়ে যাই, পোয়ে যাই'। তার মুখে তখনো উদ্ভাসিত হাসি।

পণ্ডিত এটর্নী বললেন, একদিন ও মঞ্চে উঠেছে, তার গলায় ফাঁস পরানো হয়ে গেছে, কিন্তু ও লাফ দিচ্ছে না। আসলে সে নড়তেই পারছিলো না। মঞ্চের উপর হাঁটু মুড়ে বসে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তাকে সশরীরে ধরে ওখান থেকে সরিয়ে নিচে নামিয়ে আনতে হয়। তারপর কিছু দিনের জন্য সে পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলো।

আমি বললাম, মনে হচ্ছে, আপনি যেমন শোভন ভঙ্গিতে বলেছেন, ফাঁসীর খেলাটা সত্যিই ওর জন্য বিশেষ অরুচিকর হয়ে উঠেছিলো।

তিনি আবারো আগের কথাই বললেন, ও পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলো। আমার সরস মন্তব্য উপেক্ষা করে তিনি বললেন, কোনো রকম দৈহিক বা বস্তুগত কারণে তার ওই অবস্থা হয় নি, অবশ্য যদি — তিনি একটু থামলেন, তারপর বললেন, যদি বস্তুগত কারণে এই পৃথিবীতে কিছু ঘটে। কারণ বস্তুগত পৃথিবী থাকলেও, তার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, সেটা অস্বীকার করলে ঈশ্বর-নিন্দা হবে, তবু সেটা কখনো কারণ নয়, সেটা শুধু ফল, শুধু উপসর্গ, কুমোরের বুড়ো আঙ্গুলের তলায় কাদামাটি, আর আমরা — হঠাৎ তিনি চুপ করলেন, যে বিবর্ণ

চোখে আলোর দ্যুতি জ্বলে উঠতে শুরু করেছিলো সেটা নিভে গেলো, কথার সঙ্গে সঙ্গে যে হাত দুটি উত্তোলিত হচ্ছিলো তা ঝুলে পড়লো। নিজের কপালে একটা আঙ্গুল ঠেকিয়ে তিনি বললেন, গোলমালটা ঘটেছিলো এই খানে। ওর আত্মায়। সব সময় আত্মাই কারণ — আমি তোমাকে বলছি — আবার তিনি চুপ করে গেলেন, তারপর আমার দিকে ঝুঁকে আমার মুখের উপর চোখ রেখে বিষণ্ন গলায় বললেন, কিন্তু তুমি এসব বোঝো না।

আমি একমত হলাম, হ্যাঁ, তা বুঝি না বোধহয়।

তিনি বললেন, পক্ষাঘাত থেকে জর্জ সেরে ওঠে কিন্তু সে এখন আর ঠিক পুরোপুরি সুস্থ মানুষ নয়। ও উঁচু জায়গা একদম সহ্য করতে পারে না। জানালা দিয়ে কখনো বাইরে তাকায় না। আমি যখন ওর শিল্পকর্মগুলি রাস্তায় বিক্রী করার জন্য ওকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিচে নিয়ে যাই তখন ও দুহাতে চোখ ঢেকে রাখে। তাই আজকাল কদাচিৎ আমি ওকে নিচে নামাই। ও কক্ষণো চেয়ারে বসবে না, খাটে ঘুমুবে না। সারাক্ষণ শুধু মেঝেতে থাকবে। দাঁড়াতে পছন্দ করে না ও। পা দুটো ভেঙে পড়ে, সে কাঁদতে আরম্ভ করে। ওর যে শিল্পকর্মের দিকে সব সময় একটা ঝোঁক ছিলো এটা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার। এটা তার মনকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আর ও খুব প্রার্থনা করে। আমি ওকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছি। এতে বেশ কাজ হয়। আমি উঠে প্রার্থনা করি, সেও আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দেয়। রাত্রিবেলায় যখন ও স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে, আর ঘুমুতে পারে না, তখন আমরা প্রার্থনা করি।

ও কি এখনো বিছানা ভিজিয়ে ফেলে?

পণ্ডিত এটর্নী শান্ত গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, মাঝে মাঝে।

আমি জর্জের দিকে তাকালাম। সে নিঃশব্দে কাঁদছিলো। তার মসৃণ চ্যাপ্টা গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু তার চোয়ালের কাজ থামে নি, রুটি চিবুনো সমানে চলছে। আমি বললাম, ওকে দেখো!

পণ্ডিত এটর্নী ওর দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড় বিড় করে বললেন, বোকা, বোকা। তাঁর কালো সার্জের কলারের উপর বাড়তি কিছু সাদা খুশকি ঝরে পড়লো। বিড় বিড় করে তিনি বললেন, বোকা, আমি একটা বোকা বুড়ো মানুষ, ভুলে যাই। মাথা নাড়তে নাড়তে, ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে, মুখ দিয়ে মুরগীর মতো আওয়াজ করতে করতে তিনি একটা পাত্রে কিছু স্যুপ ঢেলে চামচ হাতে নিয়ে জর্জের দিকে এগিয়ে গেলেন, বললেন, এই যে, দেখো, তিনি চামচটা ওর মুখের সামনে তুলে ধরলেন, বললেন, ভালো, ভালো স্যুপ — স্যুপ — একটু স্যুপ খাও।

কিন্তু জর্জের চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে যেতে থাকলো। সে মুখ খুললো না। এখন আর তার চোয়াল কাজ করছে না, রুটি চিবুনো বন্ধ হয়ে গেছে। চোয়াল এখন আঁটো, শক্ত, অনড়।

বুড়ো মানুষটা মেঝের উপর স্যুপের পাত্র নামিয়ে রেখে এক হাতে এক চামচ স্যুপ জর্জের মুখের কাছে ধরে অন্য হাত দিয়ে তাকে শান্ত করার জন্য হাল্কাভাবে তার পিঠ চাপড়ে দিতে লাগলেন। আর সারাক্ষণ তিনি মুখ দিয়ে মুরগীর মতো, মায়ের মতো, একটা বিভ্রান্ত মৃদু শব্দ করে চলেছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো আমার উপর, তাঁর চশমা ঝুলে পড়েছে, আমাকে লক্ষ করে এক বিপর্যস্ত মায়ের মতো খিটখিটে গলায় তিনি বললেন, আমি যে কি করবো বুঝতে পারছি না — স্যুপ মুখে দেবে না — প্রায় কিচ্ছু খাবে না, কেবলমাত্র চকোলেট ছাড়া — আমি যে কি করবো আমি জানি না — ওঁর গলার স্বর মিলিয়ে গেলো।

আমি বললাম, তুমি হয়তো ওকে বেশি আদর দিয়ে নষ্ট করছো।

মেঝের উপর পায়ের কাছে রাখা পাত্রের মধ্যে তিনি হাতের চামচ নামিয়ে রাখলেন, তারপর পকেটের মধ্যে কিছু একটা হাতড়ে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে একখণ্ড চকোলেট বার করে আনলেন, গরমে খানিকটা নেতিয়ে পড়েছে, তারপর তিনি তার উপরের আঠা আঠা টিনের পাতটা খুলতে আরম্ভ করলেন। জর্জের গাল বেয়ে তখন তার শেষ অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিলো। সে সমস্ত প্রক্রিয়াটা দেখছে, তার মুখ ঈষৎ খোলা, ভেজা ভেজা, সেখানে একটা সুখী প্রত্যাশা। কিন্তু সে তার মোটা বেঁটে আঙ্গুলগুলো দিয়ে চকোলেটটা আঁকড়ে ধরলো না।

বুড়ো মানুষটা একটুখানি চকোলেট ভেঙে জর্জের উম্মুখ ঠোঁটে তুলে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। নিঃসন্দেহে ভেতরের অন্ধকারে স্বাদের কুঁড়িগুলি জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠেছিলো, গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত হয়েছিলো ক্লান্ত, মধুর, সুখী শ্বাসের সঙ্গে রসের ধারা, আর জর্জের মুখে ফুটে উঠলো একটা ধীর, গভীর অন্তঃস্থিত, মৌল সুখের অভিব্যক্তি, একজন সন্তের মতো।

বুড়ো মানুষটাকে আমি তখন প্রায় বলে ফেলেছিলাম, এই, তুমি বলেছিলে যে বস্তুগত বা প্রাকৃতিক বিষয় কখনো কোনো কিছুর কারণ হয় না। কিন্তু চকোলেট তো বস্তু, আর তাকিয়ে দেখো এটা এখন কি ঘটাচ্ছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি মনে হয় না যে হারসে চকোলেটের এক কামড় নয় বরং যীশু খ্রীস্টের এক কামড় এই কাণ্ডটা ঘটাচ্ছে। আর দুটোর তফাৎ তুমি এখন কিভাবে চিহ্নিত করবে, এ্যাঁ?

কিন্তু কোনো কথা বলি নি। আমি বুড়ো মানুষটাকে দেখছিলাম, সে নিজের হাতে আরেকটু চকোলেট নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, মুখ দিয়ে চুকচুক করে মৃদু

কোমল শব্দ করছে, তার চশমা ঝুলে পড়েছে, কোট ঝুলে পড়েছে, পেট ঝুলে পড়েছে, ঝুঁকে দাঁড়াবার জন্য, তার নিজের মুখও এখন সুখী, সেটাই তার বর্তমান মুখের অবস্থার জন্য সঠিক শব্দ, এবং ওই মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অকস্মাৎ মানুষটাকে সমুদ্রের ধারের একটা লম্বা সাদা ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম, একই মানুষ কিন্তু ভিন্ন মানুষ, সমুদ্রের দিক থেকে ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি আগেভাগে নেমে আসা অন্ধকারে জানালার কাঁচের শার্সীর গায়ে আছড়ে পড়ছে, কিন্তু সে-শব্দ সুখী ও নিরাপদ, কারণ ঘরের ভেতর রয়েছে চুল্লীর নৃত্যরত অগ্নিশিখা, আর সেই আলোয় রাত্রি-কালো জানালার কাঁচে বৃষ্টির ছাঁট রূপালী সুতোর মতো দেখাচ্ছে, আর মানুষটা হাতে কিছু একটা নিয়ে ঝুঁকে বলছে, এই যে, দেখ, বাবা আজ কি নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এখন শুধু এক কামড় — মানুষটা একটুখানি চকোলেট ভেঙে এগিয়ে দিচ্ছে — শুধু এক কামড়, তোমার রাতের খাবার প্রায় তৈরি হয়ে গেছে — খাবার পরে আবার —

আমি ওখানে দাঁড়ানো বুড়ো মানুষটাকে দেখলাম আর হঠাৎ আমার ভেতরে একটা উষ্ণ অনুভূতি উথলে উঠলো, একটা বিশাল ডেলা যেন আমার বুকের ভেতর গলে গেলো, যেন দীর্ঘ কাল ধরে সঙ্গে নিয়ে বয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমি তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ সেটা গলে গিয়ে নিঃশ্বাস সহজ হবার আগে পর্যন্ত তার অস্তিত্ব আমি বুঝতেই পারি নি। আমি বলে উঠলাম, বাবা, বাবা —

বুড়ো মানুষটা আমার দিকে চোখ তুলে বদমেজাজী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি — কি বলছো?

ওহ্, বাবা, বাবা! কিন্তু তিনি আর সমুদ্রের ধারের ওই লম্বা সাদা ঘরে ছিলেন না, ওখানে আর তিনি থাকবেন না। কোনোদিন। ওখান থেকে তিনি একদা বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন — কেন? কেন? কারণ নিজের সংসারকে ঠিকভাবে চালাবার মতো শক্ত পুরুষ তিনি ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন বোকা, কারণ — আর তাই তিনি সেখান থেকে অনেক দূর চলে এসেছেন, সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছেন এই ঘরে, এক বৃদ্ধ, চকোলেট হাতে সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর মুখে ক্ষণিকের জন্য সুখের উদ্ভাস — যদি সেটাকে তা বলা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মুখে আর সেটা নেই। সেখানে শুধু একটা বুড়োর খিটখিটে মেজাজের আভাস, তার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত কোনো কথা যে বুঝে উঠতে পারে নি।

কিন্তু আমিও তো সমুদ্রের ধারের সেই সাদা ঘর থেকে অনেক দূর চলে এসেছি। আমি আগুনের চুল্লীর সামনে আমার সার্কাসের খেলনা গাড়ি, ছবি আঁকার রঙ-পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে বসেছিলাম, শুনছিলাম কাঁচের উপর ঝড়ো বাতাস আর

বৃষ্টির শব্দ, বাবা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেছিলেন, দেখো, বাবা আজ রাতে তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছেন, আমিও তো সেখান থেকে উঠে এই ঘরে চলে এসেছি, জ্যাক বার্ডেন, এখন দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছি। তার উপর ঝুঁকে পড়ে কেউ তার দিকে এখন আর চকোলেট বাড়িয়ে দিচ্ছে না।

আর তাই বুড়ো মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে তার রুষ্ট প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, না, কিছু না। কারণ সেটাই সত্য। যা'ই এক সময় থাকুক না কেন, এখন আর কিছুই নেই। কারণ যা ছিলো তা আর এখন নয়, এবং যা এখন তাও আর থাকবে না, এবং সমুদ্রের ঢেউ বাতাসের ঝাপ্টায় শক্ত বালির উপর যে-ফেনা ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসে, যার রেখাগুলি এমন চকচকে সূর্য-উজ্জ্বল দেখায়, তাকেই জোয়ার নেমে যাবার পর মনে হয় হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া নোংরা ময়লা।

কিন্তু কিছু একটা থাকে : শক্ত বালির উপর নোংরা ময়লা। তাই আমি বলে উঠলাম, হ্যাঁ, কিছু একটা আছে।

কি?

আমাকে তুমি বিচারপতি আরউইনের কথা বলো। তিনি সোজা হয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। নিচে আলোর মধ্য থেকে ছায়াচ্ছন্ন মেক্সিকান রেস্তোরাঁটিতে ঢোকার পর যেমন মিটমিট করে তিনি আমাকে দেখেছিলেন এখনও চশমার পেছন থেকে তার বিবর্ণ চোখ দুটি আমাকে সেই রকম মিটমিট করে দেখলো।

আমি আবার বললাম, বিচারপতি আরউইন, ওই যে, তোমার পুরনো অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তিনি ভাঙা গলায় এক হাতে চকোলেট ধরে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে অন্য এক কালের কথা।

নিশ্চয়ই। তাঁর দিকে এবার ভালো করে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তারপর মুখে বললাম, অবশ্যই, কিন্তু তোমার মনে আছে।

তিনি বললেন, ওই সময় এখন মৃত।

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি মৃত নও।

আমি যে পাপী মানুষটা ছিলাম, যে অহঙ্কার আর দুর্নীতির পথে পা বাড়িয়েছিলো সে মৃত। এখন যদি আমি পাপ করি সেটা ঘটে আমার দুর্বলতার জন্য, আমার ইচ্ছার জন্য নয়। আমি সব অনাচার, সব অশ্লীলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

আমি বললাম, শোনো, শুধু একটা সহজ প্রশ্ন। শুধু একটা প্রশ্ন।

হাত দিয়ে যেন কিছু ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন এমনি ভঙ্গি করে তিনি বললেন, ওই

সময়টা, আমি সেটা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

আমি নাছোড়বান্দা। শুধু একটা প্রশ্ন।

কোনো কথা না বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, শোনো, আরউইন কি কখনো খুব অর্থকষ্টে পড়েছিলেন? অর্থের খুব টানাটানি ছিলো কখনো? খুব বেশি রকম?

তিনি বহু দূর থেকে আমার দিকে তাকালেন, অনেক দূরত্ব পেরিয়ে, মেঝের উপর রাখা স্যুপের পাত্রের ওপার থেকে, হাতে ধরা চকোলেটের ওপার থেকে, কালের সমুদ্রের ওপার থেকে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কেন — কেন তুমি জানতে চাইছো?

সচেতনভাবে আমি বলতে চাই নি, তবু বলে ফেললাম, সত্যি কথা বলতে কি, আমি জানতে চাই না, কিন্তু অন্য একজন মানুষ জানতে চায়, যে মাস-পয়লা আমাকে বেতন দেয়। গভর্নর স্টার্ক।

আমাদের দুজনের মাঝখানে যে বস্তুটি ছিলো, সেটা যাই হোক না কেন, তার ওপার থেকে তিনি শুধু বললেন, নোংরা , অশ্লীল, অশ্লীল !

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, আরউইনের কি কখনো অর্থের ভীষণ টানাটানি পড়েছিলো?

অশ্লীল, আবার উচ্চারণ করলেন তিনি।

আমি বললাম, শোনো, তুমি যদি তোমার এই অশ্লীল অশ্লীল দিয়ে গভর্নর স্টার্ককে বোঝাতে চাও, তা হলে এটা সত্য যে তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে ঈশ্বরের দরবারে প্রার্থনা করে বেড়ান না, কিন্তু তুমি কি কখনো নিজেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে দেখেছো? স্ট্যান্টন আর আরউইনের মতো তোমার বন্ধুরা, যারা নিয়মিত চার্চে যায়, চমৎকার সব মানুষ, যারা হোরেসের উদ্ধৃতি দেয়, তারা রাজ্যটাকে কি অবস্থায় নিয়ে এসেছিলো? কর্তা অন্ততঃ কিছু করছেন, আর ওরা তো শুধু গদীমোড়া চেয়ারে আরামসে পাছা ঠেকিয়ে —

বৃদ্ধ সজোরে ডান হাত সামনে প্রসারিত করে বললেন, সব, সব অশ্লীল! তখনো তার ডান হাতে চকোলেট ধরা রয়েছে, এমন চেপে ধরেছেন যে সেটা প্রায় পিষ্ট হয়ে গেছে। একটুখানি চকোলেট ভেঙে মেঝেতে পড়ে গেলো। খোকন সেটা তুলে নিলো।

আমি বললাম, তুমি যদি এটা বোঝাতে চাও যে রাজনীতি, তোমার পুরনো দিনের বন্ধুদের রাজনীতিসহ, মঠবাসিনীদের ইস্টার সপ্তাহ পালনের মতো পূতপবিত্র ব্যাপার নয় তা হলে তুমি ভুল করো নি। কিন্তু এবার আমি তোমাকে তোমার এই

আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে হারিয়ে দেবো। রাজনীতি হচ্ছে কর্ম, আর কর্মহীনতার (যা হচ্ছে শান্তি) নিখুঁত অবস্থার মধ্যে সব কর্মই একটা খুঁত, যেমন অনস্তিত্বের নিখুঁত অবস্থার মধ্যে সব অস্তিত্বই একটা খুঁত। অনস্তিত্ব হচ্ছেন ঈশ্বর। অতএব ঈশ্বর যদি নিখুঁত হন, এবং অনস্তিত্বই যদি একমাত্র নিখুঁত অবস্থা হয়, তা হলে ঈশ্বর হচ্ছেন অস্তিত্বহীন। অর্থাৎ ঈশ্বর 'কিছুই না'। এবং 'কিছুই না' কোনো বস্তুর বস্তুত্বের সমালোচনার ভিত্তি হতে পারে না। এবার কি বলার আছে তোমার? এখন কোথায় দাঁড়াবে তুমি?

তিনি বললেন, নির্বুদ্ধিতা, নির্বুদ্ধিতা। নির্বুদ্ধিতা আর অশ্লীলতা।

হ্যাঁ, বোধহয় ঠিকই বলছো। এটা নির্বুদ্ধিতাই বটে। তবে এরকম সব কথাই যতোটুকু নির্বোধ হয় ততোটুকু, তার বেশি নয়। শুধুই বাক্য।

তুমি নোংরা অশ্লীল কথা বলছো।

না। শুধু কথা। আর সব কথাই এক রকম। তিনি বললেন, ঈশ্বরকে উপহাস করা যায় না। আমি দেখলাম ঘাড়ের উপর তাঁর মাথাটা নড়ছে।

আমি দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম, তারপর ঠিক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, আরউইন কি কখনো দারুন অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েছিলেন?

মনে হলো তিনি কিছু বলবেন। তাঁর ঠোঁট একটু ফাঁক হলো, কিন্তু তারপরই বন্ধ হয়ে গেলো।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি? জবাব দাও।

আমার মুখের উপর তাঁর বিবর্ণ চোখের স্থির দৃষ্টি স্থাপন করে তিনি বললেন, আমি আর কখনো অশ্লীলতার পৃথিবী স্পর্শ করবো না, আমার আঙ্গুলে আমি আর কোনো দিন তার নোংরামির দুর্গন্ধ লাগতে দেবো না।

আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো ওকে ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিই যেন ওর দাঁত পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্‌ করে কেঁপে ওঠে। ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কথাটা ওর কাছ থেকে আমার বার করে আনার প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছিলো। কিন্তু একজন বুড়ো মানুষকে নিয়ে এটা করা যায় না। আমার গোটা কর্মপদ্ধতি ভুল হয়েছে। আমার উচিত ছিলো ওকে ধীরে ধীরে বিষয়টির কাছে নিয়ে যাওয়া, তারপর আচমকা, ওর অসতর্ক মুহূর্তে, তথ্যটি উদ্ধার করা। কিন্তু ওর কাছে এলেই আমার ভেতরটা এমন চঞ্চল আর টানটান হয়ে উঠতো যে কেমন করে ওখান থেকে পালাবো সেকথা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারতাম না। এবং তারপর, ওখান থেকে চলে যাবার পর, আমার আরো খারাপ লাগতে থাকতো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ওকে আমার মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারতাম। এবারও আমি সব কাঁচিয়ে ফেলেছি।

ওইটুকুই আমি পাই। চলে যাবার সময় আমি পেছন ফিরে খোকনকে একবার দেখলাম। বৃদ্ধের হাত থেকে যে চকোলেটটুকু পড়ে গিয়েছিলো সেটা ও খেয়ে শেষ করেছে, এখন মেঝেতে আর কোনো টুকরো পড়ে আছে কিনা সেটা চিন্তামগ্ন মুখে হাত বুলিয়ে দেখছে, আর বৃদ্ধ আবার ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার মনে হলো আমি যদি বুড়োর সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি আলাপ করতাম তবুও হয়তো ওর কাছ থেকে কোনো কথা বার করতে পারতাম না। আমি যে ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলাম ব্যাপারটা তা নয়। আমি যে গভর্নর স্টার্ক সম্পর্কে উত্তেজিত মন্তব্য করেছিলাম ব্যাপারটা তাও নয়। গভর্নর স্টার্ক সম্পর্কে উনি কি জানেন? তাঁর সম্পর্কে ওর কি মাথাব্যথা? আসলে যে-অতীতের জগত থেকে তিনি চলে এসেছেন আমি তাঁকে সেই অতীতের জগত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। ওই জগত, সমস্ত জগত, অশ্লীল ও নোংরা। তিনি বলে দিয়েছেন যে ওই জগতকে তিনি আর ছোঁবেন না। সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলবেন না। না, আমি তাঁকে কোনো কথা বলতে পারতাম না।

কিন্তু আমি একটা জিনিস জেনেছি। তিনি যে কিছু একটা জানেন সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। তার মানে, জানবার মতো কিছু একটা আছে। তো, আমি সেটা জানবো। আজ হোক কিংবা কাল হোক। অতএব আমি পণ্ডিত এটর্নী ও অতীতের জগত ত্যাগ করে বর্তমানের জগতে ফিরে এলাম।

সে জগত ঃ

একটা বিশাল এরিনা, অনেক উঁচুতে, চারপাশে বসানো, ফ্লাড-লাইটের আলোয় গাণিতিকভাবে সাদা রেখা টানা মাঠে ঘাসকে এখন দেখাচ্ছে আর্সেনিক সবুজ। মাঠের উপর দিকে, উঁচুতে, উষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে স্ফীত কম্পমান আলোর রশ্মি ছিড়েখুঁড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে, কিন্তু ত্রিশ হাজার মানুষের জোড়া জোড়া চোখ এখন উপরের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে নেই, তাদের একাগ্র দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ নিচের আলোয় ভেসে যাওয়া মাঠের উপর, যেখানে উজ্জ্বল লাল সিল্কের শার্ট আর মাথায় সোনালী হেলমেট পরা কতকগুলি মানুষ উজ্জ্বল নীল সিল্কের শার্ট আর সোনালী হেলমেট পরা আর কতকগুলি মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, পরস্পরের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে, সরে যাচ্ছে, আবার হুড়োহুড়ি করছে, আর ভারী বাতাসকে নির্মমভাবে দ্বিখণ্ডিত করে বেজে উঠছে একটা বাঁশি, যেন একটা সোফা-কুশানের মধ্য দিয়ে কেউ তরবারি চালিয়ে দিলো।

সে জগত ঃ

প্রচণ্ড জোরে ব্যান্ড বাজছে, সমুদ্র-গর্জনের মতো, আর্ত চিৎকার, নীরবতা,

তারপর একটি মহিলা কণ্ঠের চিৎকার, রূপোলি ও উচ্চগ্রামের, একটি সর্বস্ব হারানো আত্মার ক্রন্দনের মতো নীরবতাকে তা ফালাফালা করে দিলো, তারপরই আবার গর্জনধ্বনি, মনে হলো সেই ধ্বনিতে যেন উষ্ণ বাতাস ফুলে ফেঁপে উঠলো। কারণ সবুজ মাঠের ধ্বস্তাধ্বস্তি আর হুটোপুটি আর ঔজ্জ্বল্যের মধ্য থেকে লাল একটা অংশ বিস্ফোরিত হয়ে জটলার বাইরে চলে এসেছে, সবুজের বুক চিরে সেটা প্রচণ্ড বেগে কোণাকুণি ছুটে চলেছে, এঁকে বেঁকে, ঘুরে, পাশ কাটিয়ে সেটা ছুটছে, তবু ওই প্রচণ্ড গর্জনের ভয়ঙ্কর দায়িত্বের তলায়, মুহূর্তের ওই কাল–হীনতার মধ্যে, কতো ধীরগতি, যেন নড়ছেই না।

সে জগত ঃ

একটা লোক আমার পিঠ চাপড়াচ্ছে তো চাপড়াচ্ছেই আর চেঁচাচ্ছে — লোকটার মুখ ভরাট, রুক্ষ কালো চুল কপালের উপর নেমে এসেছে, সে চিৎকার করছে — আমার ছেলে! টম — টম — টম! ওই যে টম — জয় ছিনিয়ে এনেছে সে — এখন আর ওদের টাচ্–ডাউনের সময় নেই। জিতে গেছে সে, তার প্রথম ভার্সিটির খেলা, বিজয়ী হয়েছে টম, আমার ছেলে! লোকটা আমার পিঠে চাপড় দিলো, তার দুই শক্তিশালী হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিলো, যেন আমি তার ভাই, তার সত্যিকার ভালোবাসা, তার পুত্র, আর তার চোখ ভরে উঠলো অশ্রুতে, তার পুরু গাল বেয়ে অশ্রু আর ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগলো, আর সে তখনো চেঁচাচ্ছে, ওই যে আমার ছেলে — আর কেউ নেই ওর মতো — সে অল–আমেরিকান হবে, সেরা জাতীয় দলে স্থান পাবে, আর লুসি চায় আমি যেন ওর খেলা বন্ধ করে দিই — আমার স্ত্রী চায় যে ও খেলা ছেড়ে দিক — বলে কিনা যে খেলা ওকে ধ্বংস করে দিচ্ছে — নষ্ট করছে ওকে — ও শ্রেষ্ঠ মার্কিন খেলোয়াড় হবেই — আমার ছেলে, দেখেছো, কি রকম দ্রুতগতিতে ও ছোটে, ব্যাটা হারামজাদা! তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই এবং কথাটা সত্য।

আশ্চর্য দ্রুতগতি ওর এবং সে একটা হারামজাদাও বটে। এখনও না হয়ে উঠলেও অন্ততঃ সে–অভিমুখে বেশ বিশ্বাসযোগ্য নৈপুণ্য ইতোমধ্যে দেখাতে শুরু করেছে। লুসি যে ওর ফুটবল খেলা বন্ধ করতে চায় সেজন্য তাকে খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না — সারাক্ষণ ক্রীড়াজগতের পাতায় ওর নাম উঠছে — ওর ছবি ছাপা হচ্ছে — ফ্রেশম্যান হুইজ — সফোমোর থান্ডারবোল্ট — হাততালি আর চিৎকার – – পিঠের উপর মোটা মোটা হাতের চাপড় আর অভিনন্দন — কাঁধে টাইনি ডাফির হাত — সত্যি, বস্, বাপকা ব্যাটা বটে — তারপর রাস্তার ধারের আস্তানাগুলো, সরু

পা আর টাইট বুকের মেয়েগুলোর তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ। ওহ, টম, ওহ, টম — আর সুরা আর পর্যটন কুটীর — জনতার সমুদ্রগর্জন আর নিরন্তর সেই অভিশাপের মতো নীরবতাকে ফালাফালা করে দেয়া একক মহিলাকণ্ঠের আর্ত চিৎকারধ্বনি।

কিন্তু লুসির কোনো আশা ছিলো না। কারণ টম অল-আমেরিকান হবেই। যে কারো দলে হোক সে জাতীয় নিখিল মার্কিন কোয়ার্টারব্যাক হবেই। একশো আশি পাউন্ড ওজন, বিদ্যুতের মতো গতি, সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, স্নায়ু আর পেশী টান টান হয়ে যায়, সুইস ঘড়ির ভেতরকার কলকব্জার মতো নিখুঁত একটা যন্ত্র, টম স্টার্ক, কর্তার সন্তান, সফোমোর থান্ডারবোল্ট, বাবার খোকনমণি, সে অল-আমেরিকান হবেই, যদি না সুরা আর শয্যা তার ভেতরের কোনো কিছুকে অকালে শিথিল করে না দেয়। সেদিন রাতে ও একটা হোটেলকক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো, নাকের উপর ছোট্ট প্ল্যাস্টার লাগানো, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, ছেলেমানুষী মুখে অহঙ্কারী হাসি — হ্যাঁ, সে মুখ ছিল যথার্থই সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও ছেলেমানুষী – – আর তার বাবার বন্ধুরা সবাই তার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, তাকে আদর করছে, টাইনি ডাফি পিঠ চাপড়াচ্ছে, আর স্যাডি বার্ক ওই যৌথ উত্তেজনার একটু বাইরে তার সিগারেটের ধোঁয়া ও হুইস্কির আমেজভরা ব্যক্তিগত কুয়াশার ঘেরটোপের মধ্যে বসে আছে, আর বলছে, হ্যাঁ, টম, কে যেন বলছিলো যে আজ রাতে তুমি ফুটবল খেলেছিলে।

কিন্তু এ ধরনের সূক্ষ্ম বিদ্রূপ টম বুঝতো না কিংবা শুনতে পেতো না। সে টম স্টার্ক, অসাধারণ খেলা খেলেছে একটা, তার নিজস্ব সোনালী উজ্জ্বল কুয়াশার মধ্যে সে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারপর এক সময় কর্তা বললেন, যাও, বাবা, এবার গিয়ে শুয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ো বাবা। আসছে শনিবার আবার একহাত দেখাতে হবে, তৈরি হও তার জন্যে। তিনি তাঁর পুত্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমরা সবাই তোর জন্য গর্বিত, খোকা।

আর আমি মনে মনে বললাম, আবার যদি ওঁর চোখে অশ্রুবিন্দু টলটল করে ওঠে তাহলে আমি কিন্তু বমি করে ফেলবো।

কর্তা বললেন, যাও বাবা, শুয়ে পড়ো এবার।

আর টম স্টার্ক বলেছিলো, হ্যাঁ, তারপর প্রায় বাঁকা হাসি হেসে সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলো।

আর আমি দাঁড়িয়েছিলাম বর্তমানের বুকে।

কিন্তু অতীতও ছিলো। প্রশ্নটা ছিলো। ছাই-এর গাদার নিচে মরা বেড়াল চাপা পড়ে ছিলো।

তাই, পরে একটা বড়ো জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমি বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম, দিনের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে তখন, ম্যাগনোলিয়া গাছের ধাতব পাতায় তা আর ঝলমল করছে না, ঘনায়মান অন্ধকারে দূরে সমুদ্রের সাদা ফেনা ঈষৎ মলিন দেখাচ্ছিলো। আর আমার পেছনে যে-ঘর, সমুদ্রের ধারে আরেকটা লম্বা সাদা ঘরের চাইতে খুব আলাদা নয়, যেখানে হয়তো এই মুহূর্তে আমার মা তরুণ এক্সিকিউটিভের মুখের দিকে একটা মহামূল্যবান উপঢৌকনের মতো তাঁর মুখ তুলে ধরেছেন, আর ভালো চাইলে সে ব্যাটা যেন ওই মুখের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে, কিন্তু এখন আমার পেছনের এই ঘরটার, একটিমাত্র মোমবাতির আলোয় ছায়া ছায়া এই ঘরে, আসবাবপত্র কাফনের মতো সাদা কাপড়ে ঢাকা, কোণার দিকে পুরানো দিনের ঘড়ি অতিবৃদ্ধ ঠাকুর্দার মতোই নিশ্চুপ, কিন্তু আমি জানতাম যে মুখ ঘুরালেই ওই সাদা কাপড়ের ঢাকনি আর কালহীন নীরবতার মধ্য থেকে একটি মেয়েকে দেখতে পাবো প্রশস্ত চুল্লীর সামনে বসে কাঠের নিচে পাইনের খড়কুটো গুঁজে দিচ্ছে সে, যে বলেছিলো, না, আমাকে করতে দাও, এটা আমার বাড়ি। এভাবে যখন এখানে ফিরে আসি তখন আমারই উচিত চুল্লী ধরানো। এটাকে একটা অনুষ্ঠান বলতে পারো। এ্যাডাম একাজটা সব সময় আমাকেই করতে দেয়। যখন আমরা এখানে আসি।

কারণ ওই মেয়ে হলো এ্যান স্ট্যান্টন আর এই বাড়ি হলো গভর্নর স্ট্যান্টনের বাড়ি, যার মুখ পাথরের মতো প্রশান্ত, অচঞ্চল, সুমহান, মুখে কালো চৌকো দাড়ি, পরনে কালো ফ্রক-কোট, চুল্লীর উপরে ভারী সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো যে-মুখ নিচু করা, যেন তাঁর পায়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসা কন্যার দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছে কেমন করে দেশলাই জ্বালিয়ে সে চুল্লীতে আগুন ধরাচ্ছে। তো আমি এই ঘরে আগেও এসেছি, যখন গভর্নর ভারী সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো প্রশান্ত পাথরের মুখের মতো ছবি ছিলেন না, যখন তিনি সতেজ জীবন্ত মানুষ, দীর্ঘদেহী, পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর পায়ের কাছে বসা একটি ছোট মেয়ে, একটি শিশুকন্যা, তাঁর হাঁটুতে মাথা রেখে এক দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে, আর তিনি তাঁর মস্ত বড়ো হাত দিয়ে সস্নেহে মেয়ের সোনালী চুল নেড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আজ আমি এখানে এসেছি কারণ এ্যান স্ট্যান্টন, এখন আর যে ছোট্ট মেয়েটি নেই, আমাকে বলেছিলো, এই, ল্যান্ডিং চলো না, আমরা যাচ্ছি, শুধু শনিবার আর রোববারটা থাকবো, আগুন জ্বালিয়ে টিনের সামান্য খাবারটাবার খাবো, ওই বাড়ির ছাদের নিচে ঘুমুবো, ব্যস। এ্যাডাম এর বেশি সময় দিতে পারে না। আজকাল এটুকু সময়ও সে কদাচিৎ দিতে পারে।

আর এজন্যই আমি এখানে এসেছিলাম। আমার প্রশ্নটা সঙ্গে নিয়ে।

দেশলাই জ্বালাবার শব্দ শুনে আমি অন্ধকার হয়ে আসা সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফেরালাম। শুকনো হাল্কা কাঠে আগুন ধরার পর তার শিখা বড়োদিনের উৎসবের তারাবাতির মতো উপর দিকে ছিটকে উঠছে, সেই আলো নাচছে ঝুঁকে পড়া এ্যান স্ট্যান্টনের মুখের উপর, এখনো সে চুল্লীর সামনে উবু হয়ে বসে আছে, আলো পড়েছে তার গলায়, তার গালে, আমি চুল্লীর দিকে এগিয়ে যেতেই সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। একটা শিশু অবাক-করা, অপ্রত্যাশিত কিছু পেলে তার চোখ যেমন চকচক করে, এ্যানের চোখ এখন সেই রকম চকচক করছে। হঠাৎ সে ভরাট গলায় হেসে উঠলো, অদ্ভুত জলতরঙ্গের মতো শব্দ ক'রে। কোনো রমণী নির্ভেজাল খুশিতেই শুধু এভাবে হেসে ওঠে। সৌজন্যের খাতিরে কিংবা কোনো কৌতুক শুনে তারা কক্ষণো এরকম ক'রে হাসে না। একটি মেয়ে তার সারা জীবনে মাত্র অল্প কয়েকবারই এই হাসি হাসে। যখন তার অন্তরের গভীরতম সত্তায় কিছু একটা তাকে স্পর্শ করে এবং সুখ যখন সহজ নিঃশ্বাসের মতো তার ভেতর থেকে উথলে ওঠে, পাহাড়ী ঝর্ণা কিংবা প্রথম ফোটা ফুলের মতো, শুধু তখনই কোনো রমণী ওই ভাবে হাসে। আর মেয়ে মানুষের ওই হাসি তোমার ভেতরে একটা কিছু ঘটায়। তার মুখ কেমন দেখতে, সেটা তখন কোনো ব্যাপারই থাকে না। ওই হাসি তুমি শোনো, আর তোমার মনে হয় তুমি যেন একটা সুন্দর, পরিচ্ছন্ন সত্য ধরতে পারলে। তোমার ওরকম মনে হয় কারণ ওই হাসি দৈবপ্রেরিত। সেটা নৈর্ব্যক্তিক এক প্রগাঢ় আন্তরিকতা। সর্বব্যাপী অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় ডাঁটা থেকে উৎসারিত শিশির-ধোয়া পুষ্পগুচ্ছের একটা ঝলক তা, সংশ্লিষ্ট রমণীর নাম আর ঠিকানার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আর তাই ওই হাসি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না। যদি কোনো মেয়ে ওই হাসি নকল করতে পারতো তাহলে সে নেল গুইন আর পম্পাডুরকে বাইফোকাল চশমা পরা, মাটি কামড়ানো জুতো পায়ে, দাঁতে ব্যান্ড লাগানো ক্যাম্পফায়ার কন্যাতে রূপান্তরিত করতে পারতো, গোটা সমাজকে সে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারতো, কারণ সব মানুষই আসলে রমণী-কণ্ঠে ওই হাসি শুনতে চায়।

তো, এ্যান তার চকচকে উজ্জ্বল চোখ আর তার গালে চুল্লীর অগ্নিশিখার লাল আভা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ওই ভাবে হেসে উঠেছিলো। তখন আমিও নিচু হয়ে তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিলাম। সে আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিতেই আমি তাকে টেনে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম, সে সোজা উঠে দাঁড়ালো সুন্দর সাবলীল ভঙ্গিতে — ওঃ, কোনো মেয়েকে এলোমেলোভাবে বসা অবস্থা থেকে

কোনো রকমে উঠে দাঁড়াতে দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে — আমি তখনো তার হাত ধরে রেখেছি, তার পূর্ণ উচ্চতায় সোজা হয়ে দাঁড়াবার পূর্ব মুহূর্তে সে ঈষৎ দুলে উঠেছিলো। সে এখন আমার খুব কাছে, তার মুখে এখনো ওই হাসি লেগে আছে — আমার ভেতরের গভীর কোনো এক জায়গায় ওই হাসি একটা প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলছে — আমি তার হাত ধরেছিলাম যেমনভাবে ধরেছিলাম অনেক কাল আগে, পনেরো বছর আগে, বিশ বছর আগে, তাকে হাত ধরে যখন আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, তার সরু কোমর জড়িয়ে ধরেছিলাম, তাকে টেনে নিয়েছিলাম আমার বাহুবন্ধনে, আর ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে সে দুলে উঠেছিলো একটুখানি। সে কথা মনে পড়লো আমার। আর হয়তো তাই আমি এখন আবার তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম, তখনো তার মুখে হাসি লেগে আছে, আর একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবার আগের মুহূর্তে সে যেভাবে তার মাথা একটু পেছনে হেলিয়ে দেয় সেই ভাবে এ্যানও তার মাথা একটু পেছনে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই তার মুখের হাসি মুছে যায়। মনে হলো কেউ যেন তার মুখের সামনে একটা পর্দা ফেলে দিয়েছে। আমার মনে হলো আমি অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মুখ তুলে একটা আলোকিত জানালা দেখতে পেয়েছিলাম, ভেতরে উজ্জ্বল একটি ঘরে লোকজন গল্প করছে, হৈ হল্লা করছে, গান গাইছে, সুরের তরঙ্গ বাইরের রাস্তার উপর আছড়ে পড়ছে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, আর তারপরই একটা হাত, কার হাত তা কখনোই জানতে পারবো না, জানালার পর্দাটা ফেলে দিলো। আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, আমি ছিলাম বাইরে।

হয়তো ওকে বুকে টেনে নেয়াই আমার উচিত ছিলো, কিন্তু আমি তা করি নি। ও আমার দিকে তাকিয়ে ঠিকই হেসে উঠেছিলো কিন্তু সে-হাসি আমার জন্য ছিলো না। ও আবার এই ঘরে ফিরে এসেছে, যে-ঘর অতীতকে ধরে রেখেছে তার বুকে, একদা যে-অতীতের একটা অংশ ছিলাম আমি, কিন্তু এখন আর নেই, ও চুল্লীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তাতে আগুন ধরিয়েছে আর সদ্য ধরানো আগুনের উত্তাপ তার মুখের উপর মনে হচ্ছে করস্পর্শের মতো, এই খুশিতেই সে হেসে উঠেছিলো। ওই হাসির পেছনে আমার কোনো স্থান ছিলো না।

তাই আমি তার ধরে-থাকা-হাত ছেড়ে দিয়ে এক পা পেছনে সরে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, বিচারপতি আরউইন কি কখনো সংঘাতিক অর্থকষ্টে পড়েছিলেন? খুব দৈন্যদশায়?

আমি প্রশ্নটা করি আচমকা, খুব দ্রুত, কারণ অনেক সময় ওই রকম আচমকা

প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া যায়, যেটা অন্য ভাবে কখনোই পাওয়া যেতো না। যাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে যদি ব্যাপারটা ভুলেও গিয়ে থাকে ওই রকম আকস্মিক প্রশ্ন অনেক সময় সেটা তার মনের গভীর থেকে তুলে আনে, আর সে যদি ভুলে না গিয়ে থাকে কিন্তু উত্তরটা দিতে চায় না তখন এই রকম আচমকা তীব্র প্রশ্ন অনেক সময় তাকে হঠাৎ অবাক করে দেয় এবং সে ভালো করে ভাববার আগেই উত্তরটা দিয়ে ফেলে।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কৌশলটা কাজে লাগলো না। হয় ও জানতো না, কিংবা ওকে চমকানো যায় নি। আমার বোঝা উচিত ছিলো যে ওর মতো লোক, যার ভেতরে সত্তার একটা গভীর স্থিতি ও নিশ্চয়তা আছে, যার ব্যক্তিত্ব ছেঁড়াখোঁড়া টুকরো টুকরো জিনিসের জোড়াতালি নিয়ে গড়ে ওঠে নি, আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই যা ঘটে, যার মধ্যে একটা নিটোল অখণ্ডতা আছে, তাকে যে হঠাৎ চমকে দিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোনো প্রশ্নের উত্তর বের করে আনা যাবে না, সেটা আমার বোঝা উচিত ছিলো। উত্তরটা তার জানা থাকলেও। আর এক্ষেত্রে উত্তরটা হয়তো তার সত্যিই জানা নেই।

কিন্তু সে একটু অবাক ঠিকই হয়েছিলো। জিজ্ঞাসা করেছিলো, কি বললে?

অতএব আমি আবার কথাটা বললাম।

সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একটা সোফায় গিয়ে বসলো, সিগারেট ধরালো, তারপর সোজা আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কেন জানতে চাও?

আমিও একইভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি জানতে চাই না। আমার এক বন্ধু জানতে চায়। আমার সব চাইতে বড়ো বন্ধু। মাস–পয়লা যে আমার হাতে মাইনের প্যাকেট তুলে দেয়।

ওহ্, জ্যাক —

সবেমাত্র ধরানো সিগারেটটা চুল্লীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, ওহ্ জ্যাক, কেন তুমি সব কিছু এভাবে নষ্ট করে দিচ্ছো? আমরা তো পুরানো দিনগুলোকে ফিরে পেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সেই পরিবেশটা নষ্ট করে দিতে চাও। আমরা —

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমরা?

— তখন আমাদের কিছু ছিলো, আর তুমি সেটা ধ্বংস করতে চাও, সেটাকে ধ্বংস করার কাজে তুমি ওকে সাহায্য করতে চাও — ওই লোকটাকে, তুমি ওই লোকটাকে —

আমি আবার বললাম, আমরা?

— ও খুব খারাপ কাজ করতে চাইছে —

আমি বললাম, আমাদের দিন যদি অতোই মধুর ছিলো তাহলে তুমি কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে?

তার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো —

তুমি বলতে চাইছো যে তখন, ওই অতীতে, আমাদের দিনগুলো ছিলো মধুর, চমৎকার, কিন্তু আমি বলতে চাই, তাই যদি সত্য হয়, যদি ওই দিনগুলো যথার্থই মধুর ও চমৎকার ছিলো তাহলে আজ কেন তা আর মধুর ও চমৎকার নেই, তখনকার দিনগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ছিলো যা তেমন মধুর ও চমৎকার নয়, নইলে কিছুতেই এমন হতে পারতো না, তাই না? উত্তর দাও।

ও বললো, চুপ করো, জ্যাক, চুপ করো!

আমি বললাম, আমাকে ওই প্রশ্নের উত্তরটা দাও। তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে আমাদের বর্তমান সময়টা খুব মধুর ও চমৎকার। এই সময়টা তো এসেছে ওই সময় থেকেই, তোমার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ, আর তুমি শান্তি আর আনন্দের জন্য এখানে পালিয়ে আসো, এই নির্জন বাড়িতে, যার আসবাবপত্র কাপড়ে মোড়ানো, যেখানে বিজলী বাতির সংযোগ কেটে দেয়া হয়েছে, এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে এসে তুমি বসে থাকো, আর এ্যাডাম — কি জীবন তার, দিন রাত শুধু মানুষের উপর ছুরি চালাচ্ছে, এটা কাটছে, ওটা চিরছে, একদণ্ড বিশ্রাম পায় না, অথচ তার নিজের ভেতরটায় হাজারো জট পাকানো —

আঃ, এ্যাডামকে এর মধ্যে টেনে এনো না, ওকে নিয়ে টানা–হ্যাঁচড়া কোরো না – বলতে বলতে এ্যান তার করতল আমার দিকে প্রসারিত করলো, যেন আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে, অথচ আমি ওর দশ ফুটের মধ্যে ছিলাম না। এ্যান যোগ করলো, ও অন্তত্তঃ কিছু করছে। কিছু তো করছে এ্যাডাম।

আমি আমার আগের কথার সূত্র ধরে বললাম, আর আরউইন, তিনি তাঁর খেলনা নিয়ে খেলা করছেন, আর আমার মা রয়েছেন থিওডোরকে নিয়ে, আর আমি —

হ্যাঁ, তুমি, তুমি!

ঠিক আছে, আমি।

হ্যাঁ, তুমি। ওই লোকটার সঙ্গে।

আমি তার ভঙ্গি নকল করে বললাম, ওই লোকটা, ওই লোকটা, এখানে সবাই তার উল্লেখ ওভাবেই করে। প্যাটন ওরকম করে বলে। যাদের সে খেদিয়ে দিয়েছে

তাদের সবাই তাই বলে। তো সে তো কিছু কাজ করেছে। এ্যাডাম যতোটুকু করে ততোটুকু তো সে করেছে। তার চাইতে বেশিই করেছে। এই স্টেটের জন্য সে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করছে। গোটা স্টেটের জন্য। সে —

ক্লান্ত কণ্ঠে ও বললো, আমি জানি না। এখন আর এ্যানের দৃষ্টি আমার উপর ন্যস্ত নয়।

সে শিথিলভাবে কাপড়ে মোড়ানো একটা সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিলো।

আমি বললাম, তুমি জানো, কিন্তু তুমিও আর সবার মতো উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দিচ্ছো। তুমিও আর সবারই মতো।

আমার দিকে না তাকিয়েই ও বললো, ঠিক আছে, আমি উন্নাসিক। আমি এতোই উন্নাসিক যে গত সপ্তাহে আমি ওঁর সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছি।

তো কোণার দিকের পুরানো দিনের বড়ো ঘড়িটা যদি আগেই বন্ধ না হয়ে গিয়ে থাকতো তাহলে একথা শোনার পর নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যেতো। অন্ততঃ কথাটা আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলো। নৈঃশব্দের মধ্যে আমি চুল্লীতে আগুনের গুঞ্জন শুনতে পেলাম। তারপর সে-গুঞ্জন থেমে গেলো। এখন আর কিছুই নেই।

তারপর আমি বলে উঠেছিলাম, দোহাই ঈশ্বরের। আর তৃষ্ণার্ত নীরবতা আমার ওই উচ্চারণ চোষ কাগজের মতো শুষে নিয়েছিলো।

ও বলেছিলো, ঠিক আছে। দোহাই ঈশ্বরের।

আমি বলেছিলাম, কী কাণ্ড! গভর্নর স্ট্যান্টনের কন্যা গভর্নর স্টার্কের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে এর সচিত্র প্রতিবেদন তো ক্রনিকল পত্রিকার সোসাইটি এডিটরের মাথা খারাপ করে দেবে। তো, এ্যান, কি ফ্রক পরেছিলে তুমি? আর ফুল? পান করেছিলে কি? শ্যাম্পেন ককটেল? এ্যাঁ?

একটা পনীরের স্যান্ডউইচ খেয়ে কোকা কোলায় চুমুক দিচ্ছিলাম। ক্যাপিটল ভবনের নিচতলার কাফেটারিয়াতে।

আমার কৌতূহল ক্ষমা করে দিও, কিন্তু —

কিন্তু তুমি জানতে চাও আমি কেন ওখানে গিয়েছিলাম। বলছি, শোনো। আমি গভর্নর স্টার্কের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। শিশু সদনের জন্য সরকারী অর্থ যোগাড় করার উদ্দেশ্যে।

এ্যাডাম জানে?

আর, শোনো, আমি টাকাটা পাচ্ছি। আমাকে একটা বিশদ রিপোর্ট তৈরি করতে হবে —

এ্যাডাম জানে একথা?

এ্যাডামের জানা না–জানায় কিছু এসে যায় না। আমি ওকে রিপোর্টটা দিলে পর —

কঠোর গলায় বললাম, এ্যাডাম জানলে পর কি বলবে আমি অনুমান করতে পারি।

আমার কাজ, আমার মনে হয়, আমি স্বাধীন ভাবেই করতে পারি। এ্যানের কণ্ঠে একটু উত্তাপের ছোঁয়া লাগলো।

আমি দেখলাম যে ওর গাল লাল হয়ে উঠেছে। আমার ডান হাত তুলে, তর্জনী আর মধ্যমাকে পাশাপাশি লাগিয়ে শক্ত করে ধরে রেখে আমি বললাম, আরে! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আর এ্যাডাম চিরকাল এই রকম।

হ্যাঁ, আমরা ওই রকমই কিন্তু এক্ষেত্রে ও কি ভাবলো তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

উনি কি ভাবতেন, উনি কি বলতেন, তা নিয়েও নিশ্চয় তোমার কোনো মাথাব্যথা নেই? আমি ভারী সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো উচ্চ, সুমহান, পাথরের মতো মুখের ছবিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলাম। ওই মুখ তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখছিলো।

ওহ্ জ্যাক —

এ্যান সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ওর ভঙ্গির মধ্যে একটা অস্থিরতা ফুটে উঠলো, যা সারাধণতঃ ওর মধ্যে দেখা যায় না। ও বললো, কেন তুমি এভাবে কথা বলছো, জ্যাক? তুমি কি বুঝতে পারছো না? আমি শুধু সদনের জন্য টাকা সংগ্রহ করছি। একটা ব্যবসাদারী ব্যাপার। নিছক ব্যবসাদারী। সে আমার দিকে তার চিবুক উঁচু করে এমনভাবে তাকালো যেন এর পর আর কোনো কথা থাকতে পারে না, সব সুরাহা হয়ে গেছে, কিন্তু এর ফল হলো এই যে আমার ভেতরে সব ওলট পালট হয়ে গেলো।

অস্থির হয়ে বললাম, শোনো, ওর সঙ্গে এরকম ঘোরাঘুরি করা, এমন মাখামাখি করা, তোমার সুনামের কথাটা তো তুমি খেয়াল করবে?

ঘোরাঘুরি? মাখামাখি? গাধার মতো কথা বলো না। ওর সঙ্গে দুপুরে খেয়েছি শুধু। নিছক কাজের ব্যাপারে।

কাজ কিংবা অকাজ, তোমার সুনাম —

সুনাম? সেদিকে খেয়াল রাখার মতো যথেষ্ট বয়স আমার হয়েছে। তুমিই তো এইমাত্র বললে যে আমি বুড়ি হয়ে গেছি।

আমি বলেছি যে তোমার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ হয়েছে, নিছক তথ্যভিত্তিক উক্তি

করলাম আমি।

এ্যান বললো, ওহ্ জ্যাক, তাই হয়েছে আমার বয়স, আর আমি কিছুই করি নি। আমি কিচ্ছু করি না। বলার মতো কিচ্ছু না।

ও একটু ইতস্তত করলো, ঈষৎ বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে সে তার চুলে হাত দিলো। তারপর আবার বললো, কিচ্ছু না। সারাক্ষণ আমি তাস খেলতে চাই না। আর টুকটাক যা করি — এই শিশুসদন, খেলার মাঠ —

আমি বাধা দিয়ে বললাম, কেন, জুনিয়ার লীগ তো পড়েই আছে, কিন্তু তাতে কান না দিয়ে বলে চললো, ওসব যথেষ্ট নয়। কেন আমি কিছু করলাম না — বিশেষ কিছু একটা পড়লাম না? ডাক্তার অথবা নার্স হলাম না? এ্যাডামের সহকারী হতে পারতাম আমি। আমি উদ্যান বিদ্যায় পড়ালেখা করতে পারতাম। আমি —

আমি বললাম, তুমি আলোর ঢাকনি তৈরি করতে পারতে।

আমি কিছু একটা করতে পারতাম — কিছু একটা —

আমি বললাম, বিয়ে করতে পারতে। আমাকে বিয়ে করতে পারতে তুমি।

আহ্, আমি শুধু বিয়ে করার কথা ভাবছিলাম না, আমি ভাবছিলাম —

তুমি কি ভাবছো সেটা তুমি নিজেই জানো না।

ওহ্ জ্যাক! সে হাত বাড়িয়ে আমার হাত আঁকড়ে ধরে বললো, হয়তো তাই। আজ রাতে আমার কি হয়েছে তাও হয়তো আমি জানি না। মাঝে মাঝে আমি যখন এখানে আসি আমার খুব ভালো লাগে, সত্যি, কিন্তু তারপর —

এর পর এসম্পর্কে ও আর কিছু বললো না। ততক্ষণে ও আমার বুকে তার মুখ গুঁজে দিয়েছিলো, আমি সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলাম কয়েকবার, আর ও অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলো আমাকে তার বন্ধু হতেই হবে এবং আমি জবাব দিয়েছিলাম, অবশ্যই, আর ওর চুলের মিষ্টি গন্ধ এসে লেগেছিলো আমার নাকে। ওর চুলের গন্ধ সব সময়ই ওই রকম ছিলো, পরিচ্ছন্ন, নির্মল, ভালো করে ধোয়া, পার্টিতে যাবার জন্য তৈরি ছোট্ট মেয়ের সুন্দর চুলের গন্ধের মতো। কিন্তু এ্যান আর ছোট মেয়ে নয়, এটাও কোনো পার্টি নয়। না, নিঃসন্দেহে এটা কোনো পার্টি নয়। গোলাপী আইসক্রীম নেই। মুখরোচক মিষ্টি কেক্ নেই, শিঙ্গা বাজাচ্ছে না কেউ, আমরা হাততালি দিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে নাচছি না, গান গাইছি না, কার্পেটের উপর হাঁটু মুড়ে মাঠে ঘাস তোলার ভান করে কাকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসি সেই খেলা খেলছি না।

ও দু'এক মিনিট আমার বুকে মাথা গুঁজে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো, যদি দিনের আলো তখনো থাকতো তাহলে আপনি হয়তো ও আর ওর বন্ধুর মাঝখান দিয়ে এক

ঝলক সূর্যালোক দেখতে পেতেন, লক্ষ করতেন কেমন করে ওর বন্ধু ওর পিঠে নৈর্ব্যক্তিক, চিকিৎসকসুলভ, স্নায়ু–শান্ত–করা মৃদু চাপড় দিচ্ছে। তারপর ও দূরে সরে গেলো, চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, আর ওই আগুন ততক্ষণে চমৎকারভাবে জ্বলে উঠে সমস্ত পরিবেশটাকে চমৎকার ঘরোয়া করে তুলেছে।

আর তখন বাইরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের এক ঝলক শীতল বাতাস হুশ্ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো, যেন একটা বিশাল কুকুর গা ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরে ঢুকে পড়েছে, আর চুল্লীর ভেতর থেকে আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠলো দপ করে। ঘরের অন্তরঙ্গ পরিবেশে এসে প্রবেশ করেছে এ্যাডাম স্ট্যান্টন, তার হাত ভর্তি কয়েকটা প্যাকেট, কারণ সে ল্যান্ডিং–এ গিয়েছিলো আমাদের জন্য জিনিসপত্র কিনে আনতে।

হাতের ব্যাগ আর ঠোঙ্গার উপর দিয়ে চোখ তুলে সে বললো, হ্যালো। তার চওড়া মুখে, সরু শক্ত ঠোঁটে, হাসি ফুটে উঠলো। ওই ঠোঁট আর মুখ শান্ত গম্ভীর থাকলে মনে হতো যেন একটা চমৎকার অস্ত্রোপচার করা ক্ষত, সুন্দরভাবে সেরে গেছে, কিন্তু হেসে উঠলেই — যদি সে হেসে উঠতো — তখন আপনি অবাক হয়ে যেতেন, আপনার মনে তখন একটা গাঢ় উষ্ণতার ছোঁয়া লাগতো।

আমি দ্রুত বলে উঠলাম, শোনো, অনেক কাল আগে, কোনো সময়, বিচারপতি আরউইন কি অর্থের খুব টানাটানির মধ্যে ছিলেন? রীতিমত দৈন্যদশায়?

ওর মুখে ভাবনার ছায়া ঘনিয়ে এলো, বললো, কেন — না তো, আমার জানামতে তো —

এ্যান দ্রুত ঘুরে এ্যাডামের দিকে তাকালো একবার, তারপর আমার দিকে। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিলো সে বুঝি কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বললো না।

তারপর এ্যাডাম বললো, তখনো সে দাঁড়িয়ে আছে, তার বুকের কাছে প্যাকেটগুলি ধরা।

ও, হ্যাঁ।

গভীর কাদার ভেতর থেকে আমি তাহলে সেটা খুঁচিয়ে বার করে আনতে সক্ষম হয়েছি।

এ্যাডাম আবার বললো, ও, হ্যাঁ!

সুদূর অতীত থেকে কোনো হারানো জিনিস খুঁজে বার করে আনতে সক্ষম হলে মানুষের মুখে যেরকম সুখী উজ্জ্বল আভা ফুটে ওঠে এ্যাডামের মুখে এখন সেই

রকম আভা দেখা গেলো। এ্যাডাম বললো, দাঁড়াও, বলছি, তখন খুব ছোট আমি, ১৯১৩ অথবা ১৯১৪ সালের কথা, আমার মনে আছে বাবা এসম্পর্কে কিছু বলছিলেন, জন কাকা কিংবা অন্য কোনো একজনের কাছে, আমি যে ঘরে আছি সেটা কেউ খেয়াল করে নি, জাজ আরউইনও ছিলেন সেখানে, তিনি আর বাবা বেশ রেগে গিয়েছিলেন, গলা উঁচু করে প্রায় ঝগড়া করছিলেন তাঁরা — টাকাপয়সা নিয়ে।

আমি বললাম, ধন্যবাদ।

এ্যাডাম বললো, ঠিক আছে। মুখে ঈষৎ বিভ্রান্ত হাসি ফুটিয়ে সে সোফায় গিয়ে বসলো। তার হাত থেকে প্যাকেটগুলি নরম কার্পেটের উপর খসে পড়লো।

এ্যান আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কেন তুমি প্রশ্নটা করলে ওকে সেটুকু জানাবার মতো সৌজন্য অন্ততঃ তুমি দেখাতে পারো।

আমি বললাম, অবশ্যই। তারপর এ্যাডামের দিকে তাকিয়ে বললাম, তথ্যটা আমি জানতে চেয়েছি গভর্নর স্টার্কের জন্য।

এ্যাডাম বললো, রাজনীতি। তারপর তার চোয়াল খাঁচার দরজার মতো বন্ধ হয়ে গেলো।

এ্যান একটু তিক্ত হাসি হেসে বললো, হ্যাঁ, রাজনীতি।

এ্যাডাম বললো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাকে রাজনীতি নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে হয় না। অন্ততঃ আজকাল। এ্যাডাম উক্তিটি করলো প্রায় হাল্কা সুরে, যার ফলে আমি একটু অবাক হই। তারপর সে বললো, কিন্তু বিচারপতি আরউইন এক সময় আর্থিক দৈন্যদশায় ছিলেন এটা জেনে গভর্নর স্টার্কের কি ঘোড়ার ডিম লাভ হবে? এটা বিশ বছরেরও বেশি আগের কথা। টাকাপয়সার টানাটানি তো কোনো বেআইনী কাজের মধ্যে পড়ে না, নাকি? তো, কি ঘোড়ার ডিম হবে এখবর জেনে?

এ্যান আমার দিকে তাকিয়ে আগের মতোই তিক্ত হাসি হেসে বললো, হ্যাঁ, ঘোড়ার ডিম হবেটা কি?

এ্যাডাম এ্যানের দু'কাধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে হাসতে হাসতে বললো, তো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার ডিম কি করছো? রান্নাবাড়ি করতে হবে না? যাও, গোমড়ামুখী। সে ওকে ব্যাগভর্তি জিনিসপত্রগুলির দিকে ঠেলে দিলো।

ও ব্যাগগুলি তুলবার জন্য নিচু হতেই সে তার পশ্চাদ্দেশে একটা চাপড় মেরে বললো, চটপট কর! তারপর সে সশব্দে হেসে উঠলো। এ্যানও হেসে উঠলো সানন্দে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব কিছু ভুলে গেলাম।

এ্যাডামকে এরকম চিন্তামুক্ত, খোলামেলা, হাসি-খুশী অবস্থায় খুব বেশি পাওয়া যেতো না। ওকে এরকম অবস্থায় পাওয়া গেলে যে সময়টা ভালো কাটবে এটা

আমরা জানতাম।

সত্যিই চমৎকার সময় কেটেছিলো আমাদের। এ্যান রান্না করেছিলো, আমি পানীয় ঢেলে পরিবেশন করেছিলাম, টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছিলাম, এ্যাডাম পিয়ানোর উপরের ঢাকনি টান দিয়ে সরিয়ে ফেলে এমন উচ্ছল সুরের ঝড় তুলেছিলো যে মনে হচ্ছিলো সমস্ত বাড়িটা যেন ফুলে ফেঁপে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এমন কি খেতে বসবার আগেই সে একবারের পরিবর্তে তিনবার তার পানীয়ের পাত্র নিঃশেষ করে ফেলেছিলো। আহারপর্বের শেষে সে আবার গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসেছিলো, পুরানো দিনের রোমান্টিক গানের সুর বাজিয়েছিলো, আমি আর এ্যান অন্তরঙ্গ হয়ে নেচেছিলাম, এ্যান আমার কানের কাছে মুখ এনে গুণ গুণ করে কথা বলেছিলো, আর হাল্কা বাতাসে তরুণ দুটি পপলার গাছের মতো আমরা দুজন মধুরভাবে দুলেছিলাম। তারপর এ্যাডাম তার আসন থেকে লাফিয়ে উঠে 'সুন্দরী, ওগো সুন্দরী'-র সুর শিস্ দিয়ে, আমার বাহু থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে, বড়ো এক চক্কর ওয়াল্‌জ্ নাচ নেচে নিলো, আর এ্যান তার বাহুতে মাথা রেখে মধুর আবেশে চোখ বুঁজলো, প্রসারিত ডান হাত দিয়ে হাল্কাভাবে ধরে রাখলো নিজের কম্পমান স্কার্টের প্রান্তদেশ।

এ্যাডাম চমৎকার নাচতো, যখন ভাঁড়ামি করতো তখনও। তার কারণ নাচের ক্ষেত্রে তার একটা সহজাত প্রতিভা ছিলো, নইলে আজকাল সে আর বেশি নাচবার সময় পায় না। কখনো বেশি নাচেও নি। কাজ ছাড়া কোনো কিছুতেই সে কখনো বেশি উৎসাহ দেখায় নি। দেখালে সব কিছুই তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়তো। তারপর পাঁচ বছরে হয়তো একবার সে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আনন্দের জোয়ারে ভেসে যেতো, স্ফূর্তিতে উত্তাল হয়ে উঠতো, আর তখন একটা বাঁধভাঙা স্রোত এসে সব গাছগাছালি একেবারে শেকড় থেকে উপড়ে নিয়ে চলে যেতো, আর সেই গাছগাছালি হতেন আপনি। আপনি এবং তার চারপাশের আর সবাই। তখন তার চোখে দেখা যেতো একটা উদ্দাম তীব্র দ্যুতি, একটা অদম্য প্রাণশক্তি ফুটে উঠতো তার হাত পা নাড়ার ভঙ্গির মধ্যে, যেন তার ভেতর থেকে কিছু একটা ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আপনার মনে হতো কোনো একটা বিশাল টারবাইন কিংবা ডাইনামোর কথা, প্রতি মিনিটে দশ লক্ষ বার যেটা ঘোরে, অসম্ভব শক্তির আধার, টগবগ করছে, আর মনে হচ্ছে এখনই যেন সব বাঁধন ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। সে যখন তার দীর্ঘ সবল সুচারু সাদা হাত দু'খানি নেড়ে কিছু বলতো তখন মনে হতো সে যেন স্‌ভেঙ্গালি আর এটম-বিস্ফোরক যন্ত্রের একটা মিশ্রণ। এখনই যেন আপনি নীল স্ফুলিঙ্গরাশি দেখবেন। ওর ওই রকম অবস্থায় ওর পায়ের কাছে গিয়ে লুটিয়ে

পড়ার মতো শক্তিও কারো থাকতো না। যে যেখানে আছে সেখানেই পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতো। তবে এতে তাদের বিন্দুমাত্র লাভ হতো না।

কিন্তু এরকম পরিস্থিতি খুব কমই হতো। এবং তার স্থায়িত্ব বেশি হতো না। শৈত্য নেমে আসতো অনতিবিলম্বে এবং আবার ঢাকনা পড়ে যেতো শক্ত হয়ে।

সেদিন রাতে এ্যাডামের মধ্যে শক্তিমত্তা ছিলো না। সে শুধু মৃদু মৃদু হাসছিলো, সশব্দে হেসে উঠছিলো, ঠাট্টা-মশকরা করছিলো, উচ্ছলভাবে পিয়ানো বাজাচ্ছিলো, বোনকে নিয়ে নাচছিলো, আর ওদিকে চুল্লী থেকে আগুনের শিখা উঠছিলো লাফিয়ে লাফিয়ে, আর ভারী সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো সমুন্নত মুখটি তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের দেখছিলো, আর সমুদ্র থেকে বাতাস ভেসে আসছিলো, বাইরের অন্ধকারে ম্যাগনোলিয়ার পাতা ঝাপটানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিলো।

অবশ্য ঘরের মধ্যে, আগুনের গুঞ্জন আর বাজনার শব্দ ছাপিয়ে, বাতাসের আঘাতে বাইরে ম্যাগনোলিয়ার পাতায় যে মৃদু ঝাপটানির আওয়াজ উঠেছিলো তা আমরা শুনতে পাই নি। আমি সে-শব্দ শুনেছিলাম পরে, উপরের ঘরে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে, খোলা জানালা দিয়ে, পাতার মৃদু শুকনো খসখস শব্দ, আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আমরা কি সত্যিই সুখী বলে আজ রাতে এতো সুখী মনে হচ্ছে, নাকি এক সময়, বহু কাল আগে, আমরা সুখী ছিলাম, আর সেজন্যই আজ আমাদের নিজেদের এতো সুখী মনে হচ্ছে? আমাদের আজকের রাতের সুখ কি চাঁদের আলোর মতো, যে-আলো চাঁদ থেকে আসে না, কারণ চাঁদ তো ঠাণ্ডা, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার আলো তো শুধু বহু দূরের প্রতিফলিত আলো? আমি কিছুক্ষণ মাথার মধ্যে এই ধারণাটা নাড়াচাড়া করলাম, চেষ্টা করলাম এর মধ্য থেকে একটা ছোট্ট সুন্দর পরিচ্ছন্ন উপমা নির্মাণ করতে, কিন্তু পারলাম না, কারণ তার জন্য আমাকে হতে হতো শীতল, মৃত, ভ্রাম্যমান চাঁদ, আবার সূর্যও, বহু দূরে, বহু কাল আগে, আর কেমন করে একজনের পক্ষে একই সঙ্গে সূর্য আর চাঁদ হওয়া সম্ভব? এটা হয় না। এর মধ্যে কোনো সুচারু পরিচ্ছন্নতা নেই। পাতার শব্দ শুনতে শুনতে আমি মনে মনে বললাম, জাহান্নামে যাক এসব ভাবনা!

তারপরই আমার মনে হল, তো, আর যাই হোক, আমি তো এখন জেনেছি যে আরউইন এক সময় দারুণ অর্থকষ্টে ছিলেন।

অতীত থেকে আমি অন্তত এটুকু খুঁড়ে বার করতে পেরেছি এবং আগামী কাল আমি বার্ডেন্স ল্যান্ডিং আর অতীতকে ফেলে রেখে চলে যাবো, ফিরে যাবো বর্তমানে। তাই আমি ফিরে গেলাম বর্তমানে।

সেটা ছিলো ঃ

টাইনি ডাফি, একটা বড়ো নরম চামড়ার চেয়ারে আসীন, তার বিশাল কোমল পশ্চাদ্দেশের খানিকটা চামড়ার আসন ছাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, তার বিশাল কোমল পেট সামনে ঠেলে এসেছে, মুখের এক কোণায় কায়দা করে সে একটা লম্বা সিগারেট হোল্ডার ধরে আছে, সেখানে একটা সিগারেট জ্বলছে (সিগারেট হোল্ডারটা নতুন উদ্ভাবন, যে–রাজনৈতিক দলের অনুগত টাইনি ডাফি সেই দলের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সদস্যের অনুকরণে সে এটা রপ্ত করেছে), তার বিশাল কোমল চিবুক ঝুলে পড়েছে তার কলারের উপর দিয়ে, তার আঙ্গুলে হীরার আংটি, কাঠবাদামের মতো বড়ো — এই সব কিছু মিলেই হলো টাইনি ডাফি, অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য, নিঃসন্দেহে সে নব্বুই–র দশকের ফাইল ঘেঁটে হার্পার্স উইকলির কার্টুনগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখেছে এবং একজন সফল রাজনীতিবিদ কি রকম হন, কি করেন, কি পরেন তা হুবহু আবিষ্কার করেছে।

সেটা ছিলো ঃ

টাইনি ডাফি বলছে, কী কাণ্ড, কর্তা একটা হাসপাতালের পেছনে ছয় মিলিয়ন ডলার খরচ করছেন — ছয় মিলিয়ন! তারপর চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, স্বপ্নালু চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে, মাথার চারপাশে সিগারেটের শিশু–নীল ধোঁয়ার মালা নিয়ে, যেন স্বপ্নের ঘোরে সে বিড়বিড় করছে, ছয় মিলিয়ন ডলার!

আর স্যাডি বার্ক বলছে, হ্যাঁ, ছয় মিলিয়ন ডলার, আর আপনাকে ওর মধ্য থেকে এক কানাকড়িও বাগিয়ে নেবার সুযোগ উনি দেবেন না।

চতুর্থ জেলায় তো এখনো ওর আধিপত্য নেই। ম্যাকমারফি এখনো সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছে। ম্যাকমারফি আর গামি লারসন। আমি কর্তার স্বপক্ষে এটা পাল্টে দিতে পারি। হাসপাতালের কন্ট্রাক্টটা গামিকে দিলেই —

গামি ম্যাকমারফিকে অথই জলে ফেলে দিয়ে চলে আসবে, তাই বলছো তুমি?

তা, আমি ঠিক ওকথা বলছি না। তবে বলতে পারো যে তখন গামি ম্যাকমারফিকে পরিস্থিতিটা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

এবং তোমাকে একটা ভাগ দেবে, তাই না টাইনি?

আমি আমার কথা বলছি না। আমি বলছি গামির কথা। কর্তার হয়ে সেই ম্যাকমারফিকে ঠিক করবে।

ম্যাকমারফিকে ঠিক করার জন্য কর্তার কারো প্রয়োজন নেই। সময় হলে তিনি নিজেই ম্যাকমারফির ব্যবস্থা করবেন, আর সেই ব্যবস্থা হবে পাকাপাকি। আমার অবাক লাগে, টাইনি, কর্তাকে তুমি এত কাল ধরে চেনো, তুব তাকে তুমি চেনো না। পয়সা দিয়ে কিনে নেবার চাইতে তিনি যে একটা লোককে একেবারে ধ্বংস করে

দিতে চাইবেন, এটা তুমি জানো না? তুমি কি বলো, জ্যাক?

আমি বললাম, তা আমি কি করে জানবো। কিন্তু আমি ঠিকই জানতাম।

অন্ততঃ আমি এটা জানতাম যে বিচারপতি আরউইন নামের জনৈক ভদ্রলোককে ধ্বংস করে দিতে কর্তা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং সে উদ্দেশ্যে খোঁড়াখুঁড়ির কাজের জন্য নির্বাচিত হয়েছি আমি।

অতএব আমি আবার সে-কাজে ফিরে গেলাম।

কিন্তু পর দিন, খোঁড়াখুঁড়ির কাজ আবার শুরু করবার আগেই আমি এ্যান স্ট্যান্টনের ফোন পেলাম। ও হাসতে হাসতে বললো, শোনো, চালাকপ্রবর, তুমি ভাবছো তুমি খুব চালাক, তাই না?

তারের ওপাশ থেকে ওর হাসির তরঙ্গ ভেসে এলো, আর আমি যেন আমার চোখের সামনে দেখতে পেলাম তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

হ্যাঁ, চালাকপ্রবর। বিচারপতি আরউইন যে বহু কাল আগে আর্থিক দৈন্যদশায় ছিলেন এ খবরটা তুমি এ্যাডামের কাছ থেকে পেয়েছো, কিন্তু আমিও একটা খবর পেয়েছি, বুঝলে?

তাই?

হ্যাঁ, চালাকপ্রবর। আমি কাজিন ম্যাথিল্ডার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। গত একশো বছরে কি ঘটেছে তার সব কিছু বুড়ির নখদর্পণে। আমি বিচারপতি আরউইনের প্রসঙ্গ তুলতেই বুড়ি তার থলি খুলে দিলো। হ্যাঁ, বিচারপতি আরউইন এক সময় বেশ আর্থিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু তারপর, চালাকপ্রবর জ্যাকি, খবরটা তোমাকে হতাশ করবে, তোমাকে আর তোমার কর্তাকে! ওর গলায় আবার হাসির তরঙ্গ জেগে উঠলো, আর বহু দূর থেকে এই কালো টিউবের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে সেটা আমার হাতে লাগলো।

আমি আবার বললাম, তাই?

হ্যাঁ, তারপর তাঁর বিয়ে হয়।

কার বিয়ে হয়?

বারে, কার কথা বলছি আমরা, চালাকপ্রবর? তারপর বিচারপতি আরউইন বিয়ে করেন।

নিশ্চয়। সে কথা তো সবাই জানে। কিন্তু তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক —

তিনি বিয়ে করেন খুবই ধনী এক মহিলাকে। এই খবরটা দিয়েছেন কাজিন ম্যাথিল্ডা, এবং তাঁর অজানা কিছুই নেই। আরউইন দৈন্যদশায় ছিলেন কিন্তু বিয়ে করেন এক বিত্তশালী রমণীকে। এবার, চালাকপ্রবর, বিষয়টা একটু ভেবে দেখো,

কেমন?

আমি বললাম, ধন্যবাদ। কিন্তু কথাটা আমার মুখ থেকে বেরুবার আগেই খুট্ করে একটা শব্দ হলো। ও ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম, চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিলাম, তারপর টেবিলের উপর আমার পা দু'টো তুলে দিলাম। বিচারপতি আরউইন যে বিবাহিত ছিলেন একথা সকলেরই জানা ছিলো। আসলে তিনি দু'বার বিয়ে করেন। প্রথমবার বিয়ের সময় তাঁর বয়স খুব কম ছিলো। স্ত্রী একদিন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আহত হন। তারপর থেকে সারা জীবন বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়। শুয়ে শুয়ে তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, যেদিন একটু ভালো বোধ করতেন সেদিন শুধু জানালা দিয়ে দূরে দৃষ্টি মেলে দিতেন। তিনি যখন মারা যান আমি তখনো শিশু। তাঁর কথা আমার প্রায় মনেই নেই। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর কথাও আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। অনেক দূরের কোনো অঞ্চল থেকে তিনি এসেছিলেন। আমি ভদ্রমহিলার চেহারা মনে করতে চেষ্টা করলাম। বেশ কয়েকবার আমি তাঁকে দেখি কিন্তু পনেরো বছর বয়সে কোনো বালক একজন বয়স্ক মহিলাকে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে না। যাই হোক, আমার চোখের সামনে একটি ছবি ভেসে উঠলো ঃ শ্যামলা, রোগা এক মহিলা, বড়ো বড়ো কালো চোখ, পরনে লম্বা সাদা পোশাক, হাতে সাদা ছাতা। হয়তো এছবিটা ঠিক নয়। হয়তো বিচারপতি আরউইন অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। যাই হোক, ওই মহিলা বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এ আসেন, বিচারপতি আরউইনের লম্বা সাদা বাড়িটায় কৌতূহলী, হাস্যমুখ মহিলাদের আপ্যায়ন করেন, তারপর একদিন সেন্ট ম্যাথ্যু গীর্জায় প্রার্থনা শুরু হবার পূর্বক্ষণে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর থেকে দীর্ঘকাল তিনি অসুস্থ অবস্থায় উপরতলার একটি ঘরে থাকতেন, একজন নিগ্রো সেবিকা তাঁর দেখাশোনা করতো। এতো দীর্ঘ সময় তিনি ওইভাবে টিকে ছিলেন যে মানুষ তার অস্তিত্বের কথা ভুলেই গিয়েছিলো। শেষে যেদিন তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হলো সেদিনই শুধু তারা তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। কিন্তু শেষকৃত্যের পর তাঁর কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য আর কিছুই রইলো না, কারণ তার মরদেহ তিনি যেখান থেকেই এসে থাকুন না কেন আবার সেখানেই ফিরে যায়। সেন্ট ম্যাথ্যু গীর্জার সমাধিক্ষেত্রে, আরউইন পরিবারের জন্য সংরক্ষিত স্থানে ওক্ গাছের ছায়ায়, বিষণ্ন কাব্যিক স্পেনীয় শ্যাওলা আচ্ছাদিত নানা শাখাপ্রশাখা দিয়ে মালার মতো ঢাকা কুঞ্জে, যেন অশরীরীদের আনন্দ উৎসবের জন্য জায়গাটা তৈরি করে রাখা হয়েছে, ওই প্রয়াত মহিলার জন্য প্রস্তরফলকে কোনো নাম খোদাই করে রাখা হয় নি।

বিচারপতির স্ত্রীভাগ্য ভালো হয় নি। সেজন্য লোকজন তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। দীর্ঘ কাল অসুস্থ থাকার পর দুই স্ত্রীই বিচারপতির গৃহেই মৃত্যুবরণ করেন।

কিন্তু আমি শুনেছি যে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ধনী ছিলেন। আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠা মুখটি যে সুশ্রী ছিলো না তার ব্যাখ্যা বোধহয় সেখানেই নিহিত। বিচারপতি আরউইনের স্ত্রীর মুখ ঠিক ওরকম হবে সেটা আশা করা যায় নি — রোগা পাঁশুটে চেহারা, অল্পবয়সীও নয়, দুটি বড়ো বড়ো কালো চোখ ছাড়া সপক্ষে বলার মতো আর কিছুই তাঁর মধ্যে ছিলো না।

তো, তিনি ধনী ছিলেন। অতএব ১৯১৩ কিংবা ১৯১৪ সালের দিকে বিচারপতি অর্থকষ্টে ছিলেন এবং তাই কোনো একটা অন্যায় করেছিলেন, সীমারেখা পার হয়ে গিয়েছিলেন, আমার সেই ধারণা বাতিল হয়ে গেলো। আর সেজন্যই এ্যান স্ট্যান্টন খুশি। সে খুশি কারণ, তার অজানিতভাবে হলেও, এ্যাডামের হাত দিয়ে কর্তার কোনো কাজ সাধিত হলো না। ঠিক আছে, এতে যদি এ্যান খুশি হয় তা হলে আমিও খুশি। আর বিচারপতি আরউইন নির্দোষ, এটাও হয়তো এ্যানের খুশির কারণ। আমিও সেজন্য খুশি। বিচারপতি যে নির্দোষ আমিও তো তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলাম। এখন, দুদিন আগে বা পরে, আমি কর্তার কাছে গিয়ে বলতে পারবো, কর্তা, কিছু পাওয়া গেলো না। তিনি একেবারে ধোপদুরস্ত।

কর্তা বলবেন, হ্যাঁ, একেবারে সাবান–কাচা! হারামজাদা! কিন্তু তাঁকে আমার কথা মেনে নিতে হবে, কারণ তিনি জানেন যে আমার কাজে কোনো ফাঁক থাকে না। আমি যে একজন সুদক্ষ সুশিক্ষিত রিসার্চ স্টুডেন্ট। আমার অন্বিষ্ট সত্য, সেখানে ভয় পাওয়ার বা অনুগ্রহ লাভ করার কোনো স্থান নেই। সত্য তুলে ধরবো, তারপর যা হবার তাই হবে।

যাই হোক, ১৯১৩ সালকে আমি তালিকা থেকে কেটে বাদ দিলাম। এ্যান স্ট্যান্টন তার ফয়সালা করে দিয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি দিয়েছে?

আপনি যখন কোনো বিশাল প্রাচীন ভবনে হারানো উইলের খোঁজ করেন তখন ইঞ্চি ইঞ্চি করেই টোকা দেন ঃ চমৎকার মেহগনি কাঠের দেয়ালে, ভাঁড়ার ঘরের ভারী পাথরের এখানে ওখানে, শুনতে চেষ্টা করেন কোথাও ফাঁপা আওয়াজ উঠছে কিনা। তারপর সেরকম আওয়াজ পেলে কোথাও কোনো লুকানো বোতাম আছে কিনা তার খোঁজ করেন কিংবা ওই জায়গায় একটা লোহার পাত ঢুকিয়ে চাড় দেন। আমি ঠুক ঠুক করে টোকা দিয়েছিলাম, একটা ফাঁপা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

বিচারপতি আরউইন এক সময় আর্থিক দৈন্যদশায় ছিলেন। কিন্তু এ্যান স্ট্যান্টন জানিয়ে দিলো যে, না, ওখানে কোনো গুপ্ত স্থান নেই, নিতান্ত সহজ ব্যাখ্যা আছে তার।

আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কারো যখন টাকার দরকার হয় তখন সে ওটা কোথা থেকে পায়? উত্তরটা সোজা ঃ সে ধার করে। আর ধার করতে হলে তার জন্য সিকিউরিটি দিতে হয়। সেক্ষেত্রে বিচারপতি আরউইন কি সিকিউরিটি দিতে পারতেন? খুব সম্ভব তাঁর বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এর বাসভবন কিংবা নদীর উজানে তাঁর তুলার ক্ষেতখামার।

যদি তাঁর খুব বেশি টাকার দরকার পড়ে থাকে তা হলে খামারই বন্ধক দিতে হবে। অতএব আমি গাড়িতে উঠে উজানের দিকে মর্টনভিলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। সেখানেই লাসাল কাউন্টির প্রধান কেন্দ্র, যার একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আরউইনদের মস্ত তুলার ক্ষেত ও খামার, যেখানে শ্বেত শুভ্র কোমল মাখনের মতো তুলা জন্মায় আর হাসিখুশি নিগ্রোরা দিনভর গান গায়, প্রত্যেকে যেন এক একজন অল্‌ জোল্‌সন।

মর্টনভিলের আদালত ভবনে গিয়ে আমি আরউইনের জায়গাটা সম্পর্কে চুম্বকতথ্য সংগ্রহ করে নিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেনীয়দের অনুদান থেকে শুরু করে একেবারে বর্তমান সময় পর্যন্ত সব খবর সেখানে পাওয়া গেলো। ১৯০৭ সালের রেকর্ডে একটা ভুক্তি ঃ বন্ধক দেয়া হলো, মন্টেগু আরউইন কর্তৃক, মর্টনভিল বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে, ৪২,০০০ ডলার, পরিশোধের তারিখ ১লা জানুয়ারি ১৯১০ সাল। ১৯১০ সালের জানুয়ারির শেষ দিক নাগাদ একটা বড়ো অঙ্ক শোধ করা হয়েছে, প্রায় বারো হাজার ডলার, তারপর আবার নতুন বন্ধকী দলিল তৈরি হয়েছে। ১৯১২ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ব্যাংক কর্তৃক আর সুদ গ্রহণ করা হচ্ছে না। ১৯১৪ সালের মার্চে ব্যাংক মালিককে বন্ধক দেয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকারচ্যুত করার মামলা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচারপতির জন্য মৃত্যু-ঘণ্টা বাজে নি। মে মাসের প্রথম দিকের একটা ভুক্তিতে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত পাওনা টাকা পুরোপুরি পরিশোধ করা হয়েছে, বন্ধকমুক্ত হয়েছে ওই জায়গা। তারপর আর কোনো ভুক্তি নেই।

আমি আবার টোকা দিয়েছিলাম, আবার শুনতে পেয়েছিলাম ফাঁপা আওয়াজ, যেন সমাধি-স্তম্ভের ভেতর থেকে আসছে।

কিন্তু তিনি তো এক পয়সাওয়ালা মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন।

কিন্তু ঐ মহিলা কি সত্যিই পয়সাওয়ালা ছিলেন?

তথ্যটা তো শুধু বৃদ্ধা কাজিন ম্যাথিল্ডার কাছ থেকে শোনা। আর সাক্ষী আছে শুধু মিসেস আরউইনের রোগা পাঁশুটে মুখ। আমি ঠিক করলাম লোহার পাতটা ঢুকিয়ে চাড় দেবো।

রেকর্ড থেকে তারিখগুলি নিয়ে বিয়ের তারিখের সঙ্গে মিলিয়েও দেখবো আমি। তবে তার ফল যাই হোক না কেন লোহার পাত আমি ঢোকাবোই।

মিসেস আরউইন সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিলো না। তাঁর বিয়ের তারিখ, তাঁর নাম, তাঁর বাড়িঘর — কিছুই না। কিন্তু এসব বার করা সোজা ব্যাপার। শহরের পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে খবরের কাগজের ফাইল ঘাঁটতে হলো, সামাজিক অনুষ্ঠানাদির পাতা উল্টাতে হলো, তবে বিশ বছরেরও আগের ঘটনা, পাতাগুলি হলুদ আর মুড়মুড়ে হয়ে গেছে, গুঁড়ো হয়ে যাবার উপক্রম প্রায়, তার মধ্যে জমকালো অথবা গৌরবোজ্জ্বল কিছু আর অবশিষ্ট নেই। আমি যখন আবার দিনের আলোয় বেরিয়ে এলাম তখন আমার জামার কলার নেতিয়ে গেছে, আমার হাত ময়লা, কিন্তু একটা খামের উল্টো পিঠে আমি কয়েকটা কথা লিখে নিয়েছি ঃ মেবেল কারুথারস, সাভানা, জর্জিয়ার লে মোয় কারুথারসের একমাত্র সন্তান। বিবাহ, ১৯১৪ সালের ১২ই জানুয়ারি। ওই খাম তখন আমার কোটের ভেতর দিকের পকেটে।

বিয়ের তারিখ থেকে আমি তেমন কিছু পেলাম না। সত্য বটে, বন্ধকী জায়গা পুনরুদ্ধার করার অধিকার রহিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো বিয়ের পর, কিন্তু তাতে করে মেবেল যে ধনী ছিলো না সেটা প্রমাণিত হয় না। টাকাপয়সার কথা তোলার আগে বিচারপতি হয়তো হানিমুনের পুরো সময়টা অতিক্রান্ত হতে দিতে চেয়েছিলেন। অতটা স্থূল তিনি হতে পারেন নি। অতএব মহিলার হয়তো সত্যিই অগাধ বিত্ত ছিলো। তবু সে রাতেই আমি সাভানার পথে ট্রেনে চড়ে বসেছিলাম।

ঈশ্বরের চোখে পঁচিশ বছর এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয় কিন্তু পঁচিশ বছর আগে পরলোকগমন করা লে মোয়-এর মতো একজন সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিকেরও ভেতরকার কাহিনী প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রায় ঈশ্বরের চোখ দরকার হয়। ঈশ্বরের চোখ আমার ছিলো না। আমাকে নানা জায়গায় উঁকি দিতে হলো, নানা কোণা-ঘুপচিতে খুঁচিয়ে দেখতে হলো, খবরের কাগজের পুরানো ফাইল ঘাঁটতে হলো, বৃদ্ধ অথর্ব নগর-সম্পাদককে খোশামোদ করতে হলো, আমার এককালের পরিচিত বর্তমানে বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন স্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে নতুন করে মেলামেশা করতে হলো আর তার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে হলো। আমি পরম উপাদেয় হাঁসের রোস্ট খেলাম, সাভানাতে ওরা যে চমৎকার মশলা-দেয়া রান্না করে

তার স্বাদ গ্রহণ করলাম, সাধারণতঃ যে-আমি খাবার ব্যাপারটাই অপছন্দ করি তার কাছেও ওই খাবার ভারী সুস্বাদু মনে হয়েছিলো। আমি গমের মদ খেলাম, জেনারেল ওগলথর্পের নির্দেশে নির্মিত সুন্দর রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ালাম, পথের পাশের বাড়িগুলির রসকষহীন সম্মুখভাগের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এখন তাদের আগের চাইতেও কাঠ-কাঠ দেখাচ্ছে, কারণ রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়া গাছগুলির সব পাতা এখন ঝরে পড়েছে। এখন সেই ঋতু চলছে যখন প্রবল বাতাসের তোড়ে অতলান্তিক সমুদ্রের উপরকার ধূসর আকাশের বড়ো বড়ো টুকরো নিচু হয়ে প্রায় মাস্তুল ছুঁয়ে ছুটে যায়, যেন গর্ভবতী কোনো শূকরীর পাল একটা নাড়াক্ষেতের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

আমি লে মোয় কারুথারসের বাসভবন দেখলাম। ভদ্রলোক যে বিত্তশালী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উইলের প্রোবেট অনুযায়ী ১৯০৪ সালে মৃত্যুর সময় তিনি নিঃসন্দেহে ধনী ছিলেন। কিন্তু ১৯০৪ আর ১৯১৩-এর মধ্যে ন'বছরের ব্যবধান রয়েছে এবং এই সময়টুকুতে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। মেবেল কারুথারসের জীবনযাপনের ধারা ছিলো অসম্ভব ব্যয়বহুল। সবাই সেকথা বলেছে। কিন্তু তারা একথাও বলেছে যে ব্যয় করার মতো অর্থ তার ছিলো। এবং আমার সংগৃহীত খবর অনুযায়ী নিউইয়র্কে বাস করা মেবেলের যে কাকা উইলের এক্সিকিউটার ছিলেন তিনি যে মেবেলের ইনভেস্টমেন্টসমূহের সুতদারকিতে দক্ষ ছিলেন না এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

সব কিছু মনে হলো পরিষ্কার। কিন্তু একটা জিনিস ভুললে চলে না : আদালতের রায় লিপিবদ্ধ করা রেকর্ড বই। আদালত-ভবনে যেটা থাকে।

আমি তার কথা ভুলি নি। আর সেখানে আমি পেলাম মেবেল কারুথারসের নাম। মেবেলের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করতে কিছু মানুষকে বেগ পেতে হয়। অবশ্য এতে কিছু প্রমাণিত হয় না। অনেক ধনী মেয়েই এতো ধনী হয় যে তারা তাদের বিল পরিশোধের উর্দ্ধে ভাবে নিজেদেরকে, এবং আইনের চাপ প্রয়োগ না করা পর্যন্ত হাতের মুঠো খুলতে চায় না। কিন্তু একটা জিনিস আমার চোখে পড়লো। মেবেলের এই কুঅভ্যাস ১৯১১ সালের আগে গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ, টাকাপয়সা হাতে পাবার পর প্রথম সাত বছর সে তার বিলগুলো ঠিকভাবে পরিশোধ করে এসেছে। তাহলে, আমি চিন্তা করলাম, ওর এই মনোরম ত্রুটিটি যদি তার স্বভাবের ফলেই অর্জিত হয়ে থাকে, প্রয়োজনের তাগিদে নয়, তবে সেটা এই রকম হঠাৎ তার উপর ভর করলো কেন? এই আচরণ তার মধ্যে হঠাৎই দেখা গেলো। এক ঝাঁকে। শুধু যে পাড়ার মুদী দোকানের ব্যাপার তা তো নয়। মেবেল হীরার

গয়নার জন্য নিউইয়র্কের লে ক্লর্কের বিল পরিশোধ করতে চায় নি, সে তার পোশাক নির্মাতার বিল পরিশোধ করতে চায় নি, অত্যন্ত দামী উঁচুমানের সুরার যোগান দিয়েছিলো যে জনৈক স্থানীয় সুরাসরবরাহকারী, সে তার বিলও শোধ করতে চায় নি। মেবেল যে ব্যয়বহুল জীবন যাপন করেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নথিপত্রে শেষ যে রায়ের উল্লেখ দেখলাম সেটা সীবোর্ড ব্যাংক থেকে গ্রহণ করা একটা ঋণ সম্পর্কে। সাতশো পঞ্চাশ ডলারের। মেবেলের কাছে ওই অঙ্ক কিছুই না। বর্তমানে সাভানাতে কোনো সীবোর্ড ব্যাংক নেই। টেলিফোন নির্দেশিকা থেকেই তা জানা গেলো। কিন্তু আদালতভবনে একটা পাছা–চেরা চেয়ারে বসা এক বুড়ো আমাকে খবর দিলো যে হ্যাঁ, ১৯২০ সালের দিকে জর্জিয়া ফাইডালিটি সীবোর্ড ব্যাংক কিনে নিয়েছিলো। আমি জর্জিয়া ফাইডালিটিতে যখন খোঁজ নিতে গেলাম তখন তারা আমাকে জানালো যে, হ্যাঁ, ১৯২০ সালেই সেটা ঘটে। তখন সীবোর্ডের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? দাঁড়ান, এক মিনিট, দেখছি। হ্যাঁ, মিঃ পার্সি পয়েন্ডেক্সটার। তিনি কি সাভানায় আছেন? তা তো নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না। সময় এতো দ্রুত বদলে যায়। তবে মিঃ পেটিস জানবেন। মিঃ চার্লস পেটিস, ওঁর জামাতা। না, না, ঠিক আছে। এ তো কিছুই না।

মিঃ পয়েন্ডেক্সটার এখন সাভানায় নেই, বলতে গেলে তিনি এই দুনিয়াতেই প্রায় নেই। অতি কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করেন, গায়ের ত্বক স্বচ্ছ সাদা কাগজের মতো, সারা দেহে নীল শিরার কারুকাজ, প্রতিবারই তিনি শক্তি সঞ্চয় করে নতুন নিঃশ্বাস টেনে নেন এবং আপনাকে সেজন্য চুপচাপ অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়। মিঃ পয়েন্ডেক্সটার তাঁর হুইল চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিলেন, মদের রঙের সিল্কের ড্রেসিংগাউনের উপর তাঁর রক্তহীন স্বচ্ছ হাত দুটি রাখা, ফ্যাকাশে–নীল চোখের দৃষ্টি অতীন্দ্রিয় এক দূরত্বের প্রতি নিবদ্ধ। প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে থেমে থেমে কথা বলছিলেন, হ্যাঁ, ছোকরা, তুমি আমাকে মিছে কথা বলেছো — কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না — কেন তুমি সেকথা জানতে চাও তাতেও — আমার কিছু এসে যায় না — কারোই কিছু এসে যায় না — ওরা সবাই মরে গেছে — লে মোয় কারুথারস মরে গেছে — আমার বন্ধু ছিলো সে — আমার সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু — কিন্তু সেটা বহু দিন আগের কথা, তার চেহারা আর আমি পরিষ্কারভাবে স্মরণ করতে পারি না — আর তার মেয়ে মেবেল — ওর জন্য আমার যতোটুকু করা সম্ভব আমি করেছি — আর্থিক বিপর্যয়ের পরও ওর যে টাকাপয়সা ছিলো তা দিয়ে ও অনায়াসে ভদ্রভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো — এমন কি সামান্য বিলাসিতার মধ্যেও থাকতে পারতো — কিন্তু না, ও খোলামকুচির

মতো টাকাপয়সা খরচ করতে থাকে — সব সময়ই আরো চাই, আরো চাই — ব্যাংক থেকে অনেক টাকা আমি ওকে ধার দিই — ওর উপর চাপ দিয়ে, ওকে লজ্জায় ফেলে, তার কিছু অংশ আমি ওকে শোধ করতে বাধ্যও করি — কিছু ধার আমি নিজেই শোধ করে দিই — লে মোয়-এর কথা মনে করে — তারপর সেই টাকা পরিশোধের রশিদ আমি ওর কাছে পাঠিয়ে দিই যেন ও লজ্জা পায়, লজ্জা পেয়ে একটু বিবেচক হয়ে ওঠে — কিন্তু না — নির্লজ্জের মতো ও আমার কাছে ছুটে আসতো, ওর বড়ো বড়ো চোখ তুলে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাতো — কালো, ক্ষুব্ধ, উষ্ণ সেই দৃষ্টি, যেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে — বলতো, আমার টাকা দরকার — শেষে আমি ধারের দায়ে ওর বিরুদ্ধে আদালতে যাই — ওকে লজ্জা দেবার জন্য — ওকে ভয় পাওয়াবার জন্য — ওর নিজের ভালোর জন্য — কারণ ও অর্থ ব্যয় করতো জলের মতো — বিকারের ঝোঁকে ও বড়ো বড়ো নাচের জলসার আয়োজন করতো, পার্টি দিতো — নিজেকে সাজিয়ে তোলার জন্য প্রচুর পয়সা খরচ করতো — খুবই সাদামাটা ছিলো দেখতে — কিন্তু তারপর একটা স্বামী জুটিয়ে নিয়েছিলো — পশ্চিমের কোনো এক জায়গা থেকে, বিত্তশালী একটা লোক শুনেছি নাকি ঝটপট বিয়ে করে ওকে এখান থেকে নিয়ে চলে যায় — তারপর ওর মৃত্যু ঘটে, ওর মৃতদেহ এখানে নিয়ে আসা হয় — সমাধিস্থ করা হয় তাকে — দিনটা ছিলো খুব খারাপ, বেশি লোকজন আসে নি — লে মোয়-এর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ও নয় — তার বন্ধুরাও আসে নি — কয়েকজন তো মরেই গিয়েছিলো — দশ-বারো বছর আগেই — তার কথা ওরা ভুলে গিয়েছিলো — মানুষ ভুলে যায় —

আর তাঁর দমে কুলালো না। আমার মনে হলো তাঁর কথা শেষ হয়েছে, কিন্তু না, আরো কিছু ছিলো। তিনি বললেন, মানুষ ভুলে যায় — কিন্তু তাতেও কিছু এসে যায় না।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর করমর্দন করলাম, শীতল মোমের মতো মনে হলো, আমার করতলকে সেই স্পর্শ শীতল করে দিয়ে গেলো। বেরিয়ে এসে আমার ভাড়া করা গাড়িতে উঠে আমি শহরে ফিরে এলাম। তারপর এক পাত্র সুরা গলায় ঢাললাম, উৎসব করার জন্য নয়, আমার মজ্জার মধ্যে যে বরফ বাসা বেঁধেছিলো সেটাকে তাড়াবার জন্য। আর বরফটা সেখানে আবহাওয়া ঢুকিয়ে দেয় নি, সেটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

আমি জানতে পেরেছি যে মেবেল কারুথারস ভীষণ আর্থিক অনটনে পড়ে, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের এক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে সে বিয়ে করে। পশ্চিমাঞ্চল মানে সাভানার লোকজন যাকে পশ্চিম বলে। কিন্তু এইখানেই ঠাট্টাটা। নিঃসন্দেহে

পশ্চিমাঞ্চলের ধনাঢ্য ব্যক্তিটিও মেবেলকে তার বিত্তের জন্যই বিয়ে করেছিলেন। পরে প্রকৃত অবস্থা জানার পর নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা মজা হয়েছিলো। আমি পরদিন সাভানা ছেড়ে চলে যাই, কিন্তু ফিরে যাবার আগে সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে কারুথারসের কবরটা দেখতে গিয়েছিলাম। জাঁদরেল নামটার উপর শ্যাওলা জমে গেছে, পাথরের দেবদূতের একটা বাহু নেই। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ কারুথারস পরিবারের সকল সদস্যই এখন কবরের নিচে।

পাথরের পাত আমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, আর ভেতর থেকে ফাঁপা, খুব ফাঁপা একটা শব্দ এসেছিলো। আমি পাতটা অরেকটু ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম। বিচরাপতি আরউইন স্ত্রীর টাকায় ১৯১৪ সালে তাঁর বন্ধকী ঋণ পরিশোধ করেন নি। অর্থ উপার্জনের জন্য ১৯১৪ সালে তিনি কি করতেন? নিজের তুলার খামার পরিচালনা করতেন, আর সেই সময় তিনি ছিলেন গভর্নর স্ট্যান্টনের অধীনে রাজ্যের এ্যাটর্নী জেনারেল। তো এক মৌসুমে তুলার ক্ষেত-খামারের আয় থেকে কেউ ৪৪,০০০ ডলারের ঋণ শোধ করতে পারে না (১৯১০ সালে শোধ করা ১২,০০০ ডলার তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ল্যান্ডিং-এর বাসভবন বন্ধক রেখে, বাড়ি আর খামার দুটো বন্ধকই তিনি খালাস করেন এক সঙ্গে)। এ্যাটর্নী জেনারেল হিসাবে তাঁর বেতন ছিল মাত্র ৩,৪০০ ডলার। দক্ষিণের কোনো স্টেটে এ্যাটর্নী জেনারেলের কাজ করে কেউ ধনী হয় না। অন্ততঃ হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে বিচারপতি ভালো একটা চাকুরি পান। খুবই ভালো। তিনি এ্যাটর্নী জেনারেলের পদ ত্যাগ করে আমেরিকান ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানীতে আইন-উপদেষ্টা এবং কোম্পানীর সহসভাপতি হিসেবে যোগ দেন। খুব মোটা বেতনে। বছরে ২০,০০০ ডলার। তা বিচারপতি আরউইনকে নিয়োগ না করার ওদের কোনো কারণ ছিলো না। তিনি সত্যিই ভালো আইনবিদ ছিলেন। তবে ওই সময়ে বছরে ২০,০০০ ডলারের চাইতে অনেক কম বেতনে অনেক ভালো আইনবিদ ওরা পেতে পারতো। আর একটা কথা। ১৯১৫ সালের চাকুরি দিয়ে তো ১৯১৪ সালের আদালতের পেয়াদাকে ঠেকানো যায় না। আমি আবার টোকা দিলাম, আবারও শনুতে পেলাম ফাঁপা আওয়াজ।

অতএব আমি এবার স্টক মার্কেটে ঝাঁপ দিলাম। আমেরিকান ইলেকট্রিক কোম্পানীর একটা শেয়ার কিনলাম। মন্দা যুগের মাঝামাঝি সময়ে তার দাম ছিলো ধুলোর মতো শস্তা। কিন্তু ওই কাগজটাই ভীষণ মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। অনেক ক'জন লোকের জন্য।

আমি নিজেকে একজন কুপন-ক্লিপারে রূপান্তরিত করে ফেললাম। ওরা

আমার ইনভেস্টমেন্টের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করে আমি তা জানতে চাইলাম। অতএব আমি আমার স্টকহোল্ডারের অধিকার খাটালাম। সেই সুযোগ নিয়ে আমি আমেরিকান ইলেকট্রিক কোম্পানীর স্টক রেকর্ডগুলি দেখার উদ্দেশ্যে তাদের দপ্তরে গেলাম। আক্ষরিক অর্থে কালের ধূলি ঝেড়ে আমি কতিপয় তথ্য খুঁড়ে তুললাম ঃ ১৯১৪ সালের মে মাসে মন্টেগু এম. আরউইন, সমান হারে, উইলবার সেটারফিল্ড এবং এলেক্স ক্যান্টরের কাছে সাধারণ স্টকের পাঁচশো শেয়ার বিক্রী করেন। পরে আমি আবিষ্কার করি যে ওই দুজন ছিলো কোম্পানীর কর্মচারী। তো, তার মানে মে-র শেষ নাগাদ আরইউনের হাতে এতো টাকা ছিলো যে বন্ধকী দেনা শোধ করার পরও কিছু অর্থ তার থেকে যায়। কিন্তু স্টকগুলি কখন তিনি সংগ্রহ করেন? সহজেই তার খোঁজ পেলাম। ১৯১৪ সালের মার্চে কোম্পানী নতুনভাবে নিজেদের সংগঠিত করে। তখন বেশ কিছু নতুন স্টক ছাড়া হয়। আরউইনের স্টক ছিলো তারই একটা অংশ। ওরা আরউইনকে সেটা দেয় (নাকি আরউইন তা কিনে নিয়েছিলেন?), এবং কোম্পানীর অন্য কিছু লোক সেই স্টক আবার আরউইনের কাছ থেকে ক্রয় করে ফেরত নেয়। (আরউইন সেজন্য নিশ্চয়ই নিজেকে খুব তিরস্কার করেছিলেন, কারণ অল্পকাল পরেই স্টকগুলির দাম চড়তে থাকে এবং বেশ কিছু কাল পর্যন্ত সেই উঠতি ধারা অব্যাহত ছিলো। স্যাটারফিল্ড আর ক্যান্টর কি আরউইনকে বোকা বানিয়েছিলো? ওরা ছিলো ভেতরের মানুষ, এসব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। তবে আরউইনকে বিক্রী করতেই হতো। এবং দ্রুত। মাথার উপর মরগেজ ঝুলছিলো।)

তো, আরউইনের হাতে স্টক ছিলো আর তিনি তা বিক্রী করেন স্যাটারফিল্ড আর ক্যান্টরের কাছে। বেশ, ভালো কথা। কিন্তু আরউইন স্টকগুলি পেলেন কিভাবে? ওরা কি এমনি এমনি হঠাৎ করেই ওকে স্টকগুলি দিয়ে দিয়েছিলো? মনে হয় না। কেউ কাউকে চমৎকার, মজবুত বাজারে নতুনছাড়া স্টক কি জন্য দেয়? সোজা উত্তর ঃ কারণ সেই ব্যক্তি আপনাকে বিশেষ কোনো অনুগ্রহ দেখিয়েছিলো।

অতএব এখন একটা জিনিস খুঁজে বার করতে হবে। বিচারপতি আরউইন — তখন তিনি ছিলেন এই স্টেটের এ্যাটর্নী জেনারেল — তিনি কি আমেরিকান ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানীকে কখনো বিশেষ কোনো অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন? বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করতে হলো। শেষ পর্যন্ত গর্তের নিচে পাওয়া গেলো একটা বিরাট শূন্য। কারণ বিচারপতি আরউইন যতদিন এ্যাটর্নী জেনারেল ছিলেন ততদিন আমেরিকান ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানীর আচরণ ছিলো একেবারে আদর্শ নাগরিকের মতো। কারো কাছ থেকে তাদের কোনো অনুগ্রহ

চাইবার প্রয়োজন পড়ে নি। গর্তের মধ্যে কিছু পাওয়া গেলো না।

তো, এ্যাটর্নী জেনারেল হিসেবে বিচারপতি আরউইনের সময়টা কেমন কেটেছিলো?

সাধারণ টুকটাক কাজ করে। তবে একটা মামলা প্রায় জমে উঠেছিল। সাদার্ন বেল ফুয়েল কোম্পানী নামে একটা কোম্পানী রাজ্যসরকার থেকে পাট্টা নিয়ে রাজ্যের কয়লাভূমিতে কাজ করছিলো। এক সময় সরকারকে দেয় রয়ালটির টাকা উদ্ধারের জন্য ওই কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রশ্ন ওঠে। তখন ব্যাপারটা নিয়ে কিছু হৈ চৈ ঘটে, আইন পরিষদে একটু চাঞ্চল্য দেখা দেয়, গুটি কয়েক সম্পাদকীয় লেখা হয়, এবং কিছু বক্তৃতা-ভাষণ শোনা যায়। কিন্তু এখন ব্যাপারটা একটা অতি মৃদু গুঞ্জনে, প্রায় না শোনার মতো, পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। সমগ্র স্টেটে আমিই সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যক্তি যে এই ঘটনার কথা জানতো।

যদি না বিচারপতি আরউইন জানতেন এবং অন্ধকার রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একথা ভাবতে থাকতেন।

ব্যাপারটা ছিলো রাজ্য সরকার আর কোম্পানীর মধ্যে যে রয়ালটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার ব্যাখ্যার প্রশ্ন। চুক্তিটি ছিলো অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক। হয়তো সচেতনভাবেই ওই রকম করা হয়েছিলো। সে যাই হোক, একভাবে অর্থ করলে রাজ্য সরকারের বকেয়া রয়ালটি বাবদ প্রায় দেড় লাখ ডলার পাওনা হয়, আর চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া নাগাদ যে আরো কত হবে সেটা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু চুক্তিটি ছিলো অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক , এতোই অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক যে যখন সংঘাতটা প্রায় শুরু হতে যাচ্ছিলো তখনই এ্যাটর্নী জেনারেল সিদ্ধান্ত নিলেন যে, না, মামলার কোনো ভিত্তি নেই। সবার জ্ঞাতার্থে তিনি একটা বিবৃতি দেন। ওই বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ তবে আমরা মনে করি যারা এই চুক্তির জন্য দায়ী, জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে যাঁরা এই রকম শৈথিল্যের পরিচয় দিয়েছেন, যাঁরা রাজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ সম্পদ জলের দরে বিকিয়ে দিয়ে চুক্তির ওই জাতীয় শর্ত মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা কঠোরভাবে নিন্দনীয়। তবে আমরা এটাও মনে করি যে যেহেতু চুক্তিটি বিদ্যমান এবং এর একটাই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হয় এবং যেহেতু সরকার তার নিজস্ব সীমানার মধ্যে শিল্প এবং ব্যবসায়কে উৎসাহিত করতে ইচ্ছুক সেই হেতু সরকারের পক্ষে এটা মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, কারণ অন্যায় হলেও আইনের চোখে এটা অবশ্য পালনীয়। এবং আমাদের মনে রাখা দরকার যে সর্বদা, এমনকি এই রকম পরিস্থিতিতেও, আইনের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার বেঁচে থাকে।

আমি এটা পড়ি টাইমস-ক্রনিকল পত্রিকার পুরানো ১৯১৪ সালের ২৬শে

ফেব্রুয়ারির সংখ্যায়। আরউইনের বন্ধক দেয়া তুলাক্ষেত ও খামারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঠিক দু'সপ্তাহ আগে এই ঘটনাটি ঘটে। অধিকন্তু, এই তারিখটা হলো আমেরিকান ইলেকট্রিক কোম্পানীর চূড়ান্ত পুনর্বিন্যাস এবং নতুন স্টক ছাড়ার তিন সপ্তাহ আগের। সম্পর্কটা হচ্ছে কালের সম্পর্ক।

কিন্তু কোনো সম্পর্কই কি কালের সম্পর্ক, শুধুমাত্র কালের? আমি এখানে একটা টক কুল খেলাম, আর তিব্বতের কোনো এক কাঁসারির দাঁত শিরশির করে উঠলো। দেয়ালের গোপন খাঁজে আটকে থাকা ফুলের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব আমাদের মানতে হয়, কারণ যে কুল আমরা খাই নি তারই অম্লরসে প্রায়ই আমাদের দাঁত শিরশির করে। অতএব আমি ফুলটিকে তার গোপন খাঁজ থেকে ছিঁড়ে আনলাম এবং তখনই আবিষ্কার করলাম উদ্ভিদবিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চার্য সত্য। আমি আবিষ্কার করলাম যে তার কোমল মসৃণ ছোট্ট শিকড় অনেক এঁকেবেঁকে একেবারে নিউইর্য়ক সিটি পর্যন্ত চলে গেছে, আর সেখানে গিয়ে সে স্পর্শ করেছে একটা সতেজ রসালো গোবরের স্তূপ, যার নাম মেডিসন করপোরেশন। দেয়ালের গোপন খাঁজের ওই ফুলটি হলো সাদার্ন বেল ফুয়েল কোম্পানী। এবার আমি আমেরিকান ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানী নামক আরেকটা ছোট্ট ফুল আনলাম, আর দেখলাম যে তার কোমল মসৃণ ছোট্ট শিকড়ও গিয়ে স্পর্শ করেছে ওই একই গোবরের স্তূপ।

আমি একথা বলতে প্রস্তুত ছিলাম না যে আমি জানি ঈশ্বর এবং মানুষ কি বস্তু, কিন্তু একটি বিশেষ মানুষ কি বস্তু সে সম্পর্কে একটা বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান করার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু শুধুই অনুমান।

দীর্ঘদিন ধরে সেটা শুধু অনুমানই ছিলো। কারণ আমি আমার সমস্যার এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিলাম যেখানে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না। ওই রকম একটা স্তর অবধারিতভাবে আসে। তোমার যথাসাধ্য তুমি করো, তারপর তুমি প্রার্থনা করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত পারা যায়, এক পর্যায়ে তুমি আর প্রার্থনাও করতে পারো না, তখন তুমি নিদ্রার আশ্রয় নাও, এবং আশা করতে থাকো যে, ঈশ্বরের দয়ায়, স্বপ্নের মধ্যে তুমি সমাধানটা পেয়ে যাবে। 'কুবলা খাঁ', শৈলজ অঙ্গুরীয়, ক্যাডমনের গীত — এই সবই এসেছিলো স্বপ্নে।

আমার কাছেও আসে। একদিন রাতে আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ি ঠিক তক্ষুণি। একটা নাম শুধু। মজার নাম। মর্টিমার এল. লিটলপাফ। আমার মাথার মধ্যে নামটা ভেসে বেড়ালো, আমি মনে মনে বললাম কি অদ্ভুত মজার নাম, তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই আমার প্রথম ভাবনা হলো ঃ মর্টিমার এল. লিটলপাফ। সেদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা খবরের

কাগজ কিনেছিলাম, তারপর কাগজের পাতায় চোখ বুলাতে বুলাতে হঠাৎ আমি মর্টিমার এল. লিটলপাফ নামটি দেখতে পেলাম। শুধু সদ্য-কেনা কাগজে ওই নামটি ছিলো না। সেটা ছিলো একটা হলুদ হয়ে যাওয়া, পুরনো পনীরের গন্ধমাখা, ঝুরঝুরে কাগজের পাতায়, আর সেটা আমি অকস্মাৎ দেখতে পাই আমার মনের চোখে। মর্টিমার এল. লিটলপাফের মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা, করোনারের জুরির সিদ্ধান্ত। হ্যাঁ, তাই। তারপর জলের নিচে চাপা পড়ে থাকা গভীর অতল থেকে একটুকরা কাঠ যেমন খসে গিয়ে ধীরে ধীরে উপরে ভেসে ওঠে তেমনি এই কথাগুলি আমার মনে ভেসে উঠলো ঃ ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানীর আইনজীবী। হ্যাঁ, তাই।

আমি আবার ফাইল নিয়ে পড়লাম। খবরটা দেখলাম। মর্টিমার একটা হোটেলের জানালা দিয়ে, বরং জানালার ওপাশের লোহার রেলিং দেয়া ছোট বারান্দা থেকে, নিচে পড়ে যায়, পাঁচতলা থেকে এবং তার জীবনের ইতি ঘটে। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের বিচারকার্য চলার সময় তার বোন জানায় যে কিছুদিন যাবত মর্টিমারের শরীর ভালো যাচ্ছিলো না, তিনি প্রায়ই মাথা ঘোরবার কথা বলতেন। ওই সময় আত্মহত্যার একটা কথা উঠেছিলো, কারণ মর্টিমারের আর্থিক অবস্থা ছিলো বেশ জটপাকানো, আর দুর্ঘটনাবশতঃ পড়ে যাবার পক্ষে রেলিংটাও ছিলো বেশ উঁচু। আরেকটা ব্যাপারও কিছুটা রহস্যময় মনে হয়। হোটেলের একটি বেয়ারা শপথ নিয়ে জানায় যে মৃত্যুর আগে, বিকাল বেলায়, মর্টিমার তার হাতে একটা চিঠি দেন। তাকে বকশিস দিয়ে তিনি নির্দেশ দেন বেয়ারা যেন চিঠিটা এক্ষুণি ডাকবাক্সে ফেলে। বেয়ারা জোরের সঙ্গে বলে যে চিঠির উপর মিস লিটলপাফের নাম লেখা ছিলো, কিন্তু মিস লিটলপাফ শপথ করে বলেন যে তিনি কোনো চিঠি পান নি। তো, মর্টিমারের তো মাথা ঘুরতো।

এবং তিনি ছিলেন আমেরিকান ইলেকট্রিকের একজন আইনজীবীও। আমি আবিষ্কার করলাম যে আরউইন ওই কোম্পানীর আইনজীবী হয়ে ঢুকবার অল্প আগে পর্যন্ত মর্টিমারই তাদের আইনজীবী ছিলেন। ব্যাপারটা খুব আশ্বাপ্রদ মনে হলো না। তবু একটা বাড়তি কানাগলিতে আর কী এসে যাবে? এই কাজটা শুরু করার পর বিগত সাত-আট মাসে আমি বহু কানাগলিতে গিয়ে ঠোক্কর খেয়েছি।

কিন্তু দেখা গেলো এটা আর কানাগলি নয়। পাঁচ সপ্তাহের অনুসন্ধান ও ঘোরাঘুরির পর আমি মেমফিসে মিস লিলি মে লিটলপাফের দেখা পেলাম। শহরের বস্তি এলাকার কিনারায় একটা বোর্ডিং হাউসের এক অন্ধকার, নোংরা, দুর্গন্ধময় ছোট্ট কামরায় আমি তাকে আবিষ্কার করি। এক কৃশকায় বৃদ্ধা, পরনে কালো পোশাক, গায়ে খাবারের দাগসহ নানা দাগ, ভদ্রতা রক্ষা করার ছলনাটুকুও আর

নেই, জরার আঁকিবুকি চিহ্নমাখা মুখ, তার মধ্য থেকে একজোড়া দুর্বল লাল চোখ মিটমিট করে আমাকে দেখছে। প্রায়-অন্ধকার ঘরে তিনি বসে আছেন, বুড়ো শেয়াল-শেয়াল একটা গন্ধ আসছে তার চারপাশ থেকে, আর তার সঙ্গে মিশে আছে প্রাচ্যের ধূপধুনা আর মোমবাতির মোমের গন্ধ, ঘরের দেয়ালের সমস্ত খালি জায়গা নানা ধর্মীয় ছবিতে পূর্ণ। এক কোণায় একটা ছোট টেবিলের উপর পূজাবেদীর মতো কিছু তৈরি করা হয়েছে। তার উপরে বিবর্ণ সুরারঙের মখমলের পর্দা ঝোলানো। ঘরের অন্যান্য ছবি দেখে আপনি হয়তো ভাবতেন যে তার মধ্যে ম্যাডোনা কিংবা যীশু খ্রীস্টের প্রতিমূর্তি রক্ষিত আছে, কিন্তু না, তার মধ্যে ছিলো পশমে তৈরি, কাঠের উপর বসানো, বিশাল একটি মূর্তি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম সূর্যমুখী ফুলের আকারে তৈরি একটা পিন-কুশান বুঝি, অবাস্তবভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু পরে উপলব্ধি করলাম যে এটা হলো সূর্য আর তার আলোকরশ্মির প্রতিমূর্তি। প্রাণদাতা। এবং ওই ঘরে। টেবিলের উপর ওই মূর্তির সামনে একটা মোমবাতি উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে, যেন তার শক্তি সে শুধু মোম থেকেই নয় ওই ঘরের তেলতেলে হাওয়া থেকেও আহরণ করছিলো।

ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, সুরা রঙের মখমলের কাপড় দিয়ে ঢাকা, টেবিলের উপর একটা পাত্রে বিষাক্ত রকম দেখতে রঙীন কিছু শক্ত মিষ্টি, এক গ্লাস জল, আর গোটা দুই লম্বা সরু শিঙ্গা, মনে হয় দস্তার তৈরি। আমি টেবিল থেকে অনেকটা দূরে আসন গ্রহণ করলাম। টেবিলের ওপাশে বসে মিস লিটলপাফ তাঁর লাল লাল চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করে, বিস্ময়কর রকম জোরালো গলায় বললেন, তা হলে আমরা শুরু করি?

তিনি আমাকে মন দিয়ে লক্ষ করতে থাকলেন, তারপর কতকটা আপন মনে বলে উঠলেন, আপনাকে যদি মিসেস ডালজেল এখানে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় —

তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। তবে তার জন্য আমাকে পঁচিশ ডলার খসাতে হয়েছে।

আমার মনে হয় তা হলে সব ঠিক আছে। সব ঠিকই আছে।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ছোট টেবিলের উপর রাখা মোমবাতির দিকে এগিয়ে গেলেন। তার চোখ সারাক্ষণ আমার উপর, যেন তার ভয় হচ্ছে মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবার পূর্ব মুহূর্তে দেখা যাবে যে আমার সব কিছু ঠিক নেই। যাই হোক, এর পর তিনি বাতি নিভিয়ে তাঁর চেয়ারে ফিরে এলেন।

এর পর কিছুক্ষণ ধরে শোনা গেলো গলার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা শুষ্ক সাঁ সাঁ

শব্দ আর গোঙানির আওয়াজ, দু'একটা ধাতব টুংটাং শব্দ, নিশ্চয়ই শিঙ্গার, কিছু কথাবার্তা, খুব কাজের বা আলোকসঞ্চারী নয় এমন কিছু উক্তি, প্রিন্সেস স্পটেড উীয়ার নাম্নী এক মহিলার কাছ থেকে, তিনিই মিস লিটলপাফের কন্ট্রোল, আর আমার যৌবনের বন্ধু বলে দাবী করা জিমি নামের এক ব্যক্তির ওপার থেকে আসা মোটা কর্কশ গলার আরো কম কাজের কিছু মন্তব্য। ইতোমধ্যে আমার পেছনের দেয়ালের কাছে রেডিয়েটর থেকে ঘর্ঘর আর ধুপধাপ শব্দ হতে লাগলো, আর আমি নাক ভরে অন্ধকার টেনে নিলাম আর ঘামতে লাগলাম। জিমি তখন বলছিলো যে আমি নাকি শিগ্‌গিরই কোথাও ভ্রমণে বেরুবো।

আমি অন্ধকারের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে বললাম, মর্টিমারকে আসতে বলুন। আমি মর্টিমারকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

একটা শিঙ্গা থেকে আবার মৃদু একটা শব্দ হলো এবং প্রিন্সেস আবার কি একটা মন্তব্য করলেন যা ভালো করে বোঝা গেলো না।

আমি বললাম, আমি মর্টিমার এল.কে চাইছি।

শিঙ্গার মধ্য থেকে খুব অস্পষ্ট মোটা ভাঙা একটা শব্দ ভেসে এলো। তারপর মিস লিটলপাফ বললেন, তিনি আসতে চেষ্টা করছেন কিন্তু কম্পন-তরঙ্গ খুব খারাপ।

আমি ওকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। মর্টিমারকে নিয়ে আসুন। আপনি মর্টিমার এল.কে চেনেন। লঙ্গোর এল.।

কম্পনতরঙ্গ তখনো খুব খারাপ।

আমি ওকে আত্মহত্যার ব্যাপারটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

কম্পনতরঙ্গের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ ছিলো, কারণ এখন আর কোনো শব্দই শোনা গেলো না।

আমি আবার বললাম, মর্টিমারকে নিয়ে আসুন। আমি ওকে ইনসিওরেন্স সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাই। আমি ওকে তার শেষ চিঠিটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

এবার কম্পনতরঙ্গ সাংঘাতিক হলো, একটা শিঙ্গা টেবিলের উপর প্রচণ্ড শব্দ করে নিচের মেঝেতে পড়ে গেলো, সারা টেবিল জুড়ে লুটোপুটি আর খসখস শব্দ হলো, তারপর হঠাৎ ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠলে আমি মিস লিটলপাফকে দেখলাম, তিনি সুইচে হাত রেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, লাল চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। বুড়ো দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিস হিস করে সুস্পষ্টভাবে তিনি আমাকে লক্ষ করে বললেন, আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন! আমার কাছে

আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন।

আমি বললাম, না। আমি মিথ্যা কথা বলি নি। আমার নাম জ্যাক বার্ডেন, আর মিসেস ডালজেলই আমাকে পাঠিয়েছেন।

তিনি হিস হিস করে বললেন, বোকা! আমার কাছে আপনাকে পাঠালো ও? ভীষণ বোকা।

উনি ঠিকই ভেবেছেন যে আমি খারাপ লোক না। আর পঁচিশ ডলার রোজগার করে উনি কোনো বোকামি করেন নি।

আমি আমার টাকার ব্যাগ হাতে নিয়ে তার মধ্যে থেকে কয়েকটা নোট বার করে নিজের হাতে ধরে বললাম, তো আমি খুব ভালো লোক নাও হতে পারি, কিন্তু এই জিনিস সর্বদাই খুব ভালো।

ওঁর চোখ আমার মুখ থেকে দ্রুত সরে এসে আমার হাতে ধরা টাকার উপর পড়লো, তারপর আবার ফিরে গেলো আমার মুখের উপর। তিনি তীব্র কণ্ঠে বললেন, আপনি কি জানতে চান?

যা বলেছি। আমি মর্টিমার লোঞ্জো লিটলপাফের সঙ্গে কথা বলতে চাই। যদি তাকে আপনি কম্পনতরঙ্গের মধ্যে দিয়ে আনতে পারেন।

কি জানতে চান তার কাছ থেকে?

যা জানতে চাই তাই বলেছি। আমি ওকে আত্মহত্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

নিষ্প্রাণ কণ্ঠে তিনি জানালেন, ওটা ছিলো একটা দুর্ঘটনা।

আমি একটা নোট আলাদা করে তুলে ধরে বললাম, এটা দেখছেন? একশো ডলারের একটা নোট। আমি নোটটা টেবিলের উপর রাখলাম, তার কাছাকাছি প্রান্তে। তারপর বললাম, ভালো করে দেখে নিন। ওটা আপনার। নিন, তুলে নিন।

ভয়ার্ত চোখে তিনি নোটটার দিকে তাকালেন।

আমি ওই রকম আরো দুটো নোট উঁচু করে তুলে ধরে বললাম, এই যে আরো দুটো আছে। ঠিক একই রকম। তিনশো ডলার। আপনি যদি মর্টিমারের সঙ্গে আমার সংযোগ স্থাপন করিয়ে দিতে পারেন তবে এই সব টাকাটাই আপনার হবে।

বিড়বিড় করে তিনি বললেন, কম্পনতরঙ্গ — মাঝে মাঝে কম্পনতরঙ্গ এমন হয় যে —

আমি বললাম, হ্যাঁ, তবে একশো ডলার পেলে কম্পনতরঙ্গের অনেক উন্নতি হয়। টাকাটা তুলে নিন। ওটা আপনার।

হঠাৎ তিনি দ্রুত কর্কশ ভাঙা গলায় বললেন, না। না।

আমি আমার হাতে ধরা দুটো নোটের মধ্য থেকে একটা আলাদা করে টেবিলের উপরের নোটটার উপরে রেখে বললাম, নিন, তুলে নিন। চুলোয় যাক আপনার কম্পনতরঙ্গ। কি ব্যাপার? টাকাপয়সা আপনি পছন্দ করেন না? টাকাপয়সার আপনার কোনো দরকার নেই? পেট পুরে শেষবার কখন খেয়েছেন আপনি? আসুন, টাকাটা তুলে নিয়ে এবার কথা বলতে শুরু করুন।

পিছু সরে দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেলেন তিনি, এক হাত দরজার হাতলের উপর, যেন ছুটে পালিয়ে যাবেন, চোখের দৃষ্টি কিন্তু টাকার উপর। ফিসফিস করে বললেন, না। তারপর আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে হঠাৎ তার গলা সামনে লম্বা ক'রে বলে উঠলেন, আমি বুঝতে পেরেছি — আমি আপনাকে চিনেছি, আপনি আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছেন — আপনি ইনসিওরেন্স কোম্পানী থেকে এসেছেন!

আমি বললাম, ভুল। তবে আমি মর্টিমারের ইনসিওরেন্স পলিসির কথা জানি। পলিসিতে আত্মহত্যার ধারার কথাও জানি। সে জন্যই আপনি —

ও — তার কৃশ মুখ কুঁচকে বিকৃত হয়ে গেলো, দুঃখে অথবা রাগে অথবা হতাশায়, নিশ্চিত করে সেটা বলতে পারবো না — হিস হিস করে তিনি বললেন, ও ইনসিওরেন্স থেকে প্রচুর ধার করেছিলো, প্রায় সবটাই — আমাকে বলেও নি — ও —

তার মানে আপনি প্রায় খামোখাই মিথ্যা কথা বলেন। ইনসিওরেন্সের টাকা আপনি ঠিকই সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু সংগ্রহ করার মতো কিছুই সেখানে ছিলো না।

তাই। কিছুই ছিলো না সেখানে। ও আমাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে গেলো — আমাকে বলেও নি — আমার জন্য কিছু রেখে যায় নি — শুধু এইসব — এইসব — তিনি ঘরের চারদিকে চোখ ফেরালেন, ভাঙাচোরা আসবাবপত্র, কুৎসিত, নোংরা সব কিছু, মনে হলো তাঁর শরীর কেঁপে উঠলো, তিনি যেন ঘেন্নায় সিঁটিয়ে গেলেন, যেন এই প্রথমবারের মতো এঘরে ঢুকেছেন, সব কিছু প্রথমবারের মতো তাঁর চোখে পড়লো। তিনি আবার বললেন, এইসব — এইসব —

আমি বললাম, তিনশো ডলার কিছুটা কাজ দেবে। মখমলের উপর রাখা নোট দুটোর দিকে মাথা নাড়লাম আমি।

এই — এই — ও আমাকে ছেড়ে চলে গেলো — কাপুরুষ একটা। ওহ্, তার পক্ষে তো সোজা ছিলো — সোজা — তাকে শুধু —

আমি ওর কথাটা শেষ করলাম, লাফিয়ে পড়তে হয়।

এইবার ওর মুখ বন্ধ হলো। তিনি অনেকক্ষণ আমার দিকে ভারী দৃষ্টিতে

তাকিয়ে থেকে বললেন, ও লাফিয়ে পড়ে নি।

আমি এবার কোমল কণ্ঠে তাকে বললাম, মিস লিটলপাফ, কেন আপনি কথাটা স্বীকার করছেন না? আপনার ভাই মারা গেছেন আজ অনেক দিন হয়ে গেলো। এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না। ইনসিওরেন্স কোম্পানী সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে গেছে। মিথ্যা কথা বলার জন্য কেউ আপনাকে দুষবে না। আপনাকে তো বেঁচে থাকতে হতো। আর —

তিনি বললেন, টাকার কথা নয়। কলঙ্ক। আমি চেয়েছিলাম ও যেন গীর্জার তত্ত্বাবধানে সমাহিত হয়। আমি চেয়েছিলাম — হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন।

আমি বললাম, আহ্! দেয়ালের ধর্মীয় ছবিগুলির দিকে তাকালাম আমি।

তিনি বললেন, আমি তখন বিশ্বাসী ছিলাম। তারপর একটু থেমে যোগ করলেন, এখনও আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু এখন ব্যাপারটা ভিন্ন।

আমি তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে কোমল গলায় বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপর টেবিলের উপর এখনো যে একটা শিঙ্গা পড়েছিলো সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বললাম, আর তাছাড়া ওই ব্যাপারটার মধ্যে কলঙ্কের কিছু আছে ভাবার কোনো মানে হয় না। আপনার ভাই যখন কাজটা করেছিলো শুধু —

ওটা ছিলো একটা দুর্ঘটনা।

মিস লিটলপাফ, এক মুহূর্ত আগে আপনি স্বীকার করেছেন ব্যাপারটা।

তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আবার বললেন, ওটা ছিলো একটা দুর্ঘটনা।

আমি বললাম, না। তিনি কাজটা করেছিলেন কিন্তু সে-অপরাধ তাঁর নয়। তাঁকে নিরুপায় একটা অবস্থায় ঠেলে দেয়া হয়েছিলো। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখভঙ্গি লক্ষ করছিলাম। আমি বললাম, তিনি বছরের পর বছর ওই কোম্পানীর সেবা করেছেন, তারপর একদিন ওরা তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। অন্য একজনকে জায়গা করে দেবার জন্য, যিনি একটা গর্হিত কাজ করেছিলেন। যিনি আপনার ভাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন। ঠিক না? আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে এক পা অগ্রসর হলাম। কি, কথাটা ঠিক না?

তিনি একটুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর ভেঙে পড়লেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তিনিই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন। তিনিই তাকে মেরে ফেলেন। তাকে চাকুরি দেয়া হয় ঘুষ হিসাবে। আমার ভাই ব্যাপারটা জানতেন — তিনি ওদের বলেছিলেন সেকথা — কিন্তু ওরা ওকে বরখাস্ত করে — বলে যে সেকথা ও কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না। ওরা ওকে চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে দেয় —

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কি প্রমাণ করতে পারতেন?

ওহ্, ও ঠিকই জানতো। ওই কয়লার ব্যাপারের সবটাই ওর জানা ছিলো, অনেক দিন ধরেই জানতো, কিন্তু ওকে নিয়ে ওরা কি করতে যাচ্ছে তা ওর জানা ছিলো না। ওরা তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতো কিন্তু মনে মনে ওরা ওকে চাকুরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলো — কিন্তু ও গভর্নর স্ট্যান্টনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলে —

কি বলেন? আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলাম।

গভর্নরের কাছে, ও —

কে?

গভর্নরের কাছে বলে, কিন্তু গভর্নর কিছু শনুবেন না, তিনি শুধু —

আমি শক্ত করে বৃদ্ধার হাত চেপে ধরে বললাম, শুনুন। আপনি বলতে চান যে আপনার ভাই গভর্নর স্ট্যান্টনের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁকে এসব কথা জানিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, কিন্তু গভর্নর স্ট্যান্টন ওর কথা কানে নেন নি। ওর কথা তিনি শোনেনেই নি। বলেন যে ও প্রমাণ করতে পারবে না। তিনি তদন্ত করতে রাজী হন নি, আর তার ফলেই —

আমি তার শীর্ণ কাঠির মতো বাহু ঝাঁকিয়ে বললাম, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন?

আমার হাতের মধ্যে আটকা পড়া অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, না, আমি সত্যি কথাই বলছি, ঈশ্বরের শপথ। আর তার ফলেই ওর মৃত্যু ঘটে। গভর্নরই ওকে মেরে ফেলেন। ও হোটেলে ফিরে গিয়েই আমাকে চিঠিটা লেখে, আর তারপর ওই রাতেই —

আমি বললাম, চিঠিটা, ওই চিঠিটার কি হলো?

ওই রাতে — ঠিক সকাল হবার আগে — কিন্তু ওই ঘরে, সারারাত অপেক্ষা করার পর — ঠিক সকাল হবার আগে আগে —

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠিটার কি হলো?

আমি আবার তাঁকে ঝাঁকুনি দিলাম, আর তিনি ফিসফিস করে পুনরাবৃত্তি করলেন, ঠিক সকাল হবার আগে — তারপরই তিনি যেন হঠাৎ তাঁর ভাবনার অতল গহ্বর থেকে উঠে এলেন, আমার দিকে তাকালেন, তারপর জবাব দিলেন, আমার কাছে আছে।

আমি তার বাহুর উপর থেকে আমার হাত সরিয়ে নিয়ে তার ভেজা ভেজা হাতে আরেকটা নোট গুঁজে তার উপর তার আঙুলগুলি চেপে ধরে বললাম, এই যে

একশো ডলার। আমাকে চিঠিটা দিন — আপনি বাকী টাকাটাও নিন — ওই তিনশো ডলারও।

তিনি বললেন, না, আপনি ওই চিঠিটা নষ্ট করে ফেলতে চান। ওখানে সত্য কথাটা বলা আছে। আপনি ওই লোকটার বন্ধু। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন, চোখ মিট মিট করে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে লক্ষ করলেন, খুব বয়স্ক একজন মানুষ যেন তার দুর্বল আঙ্গুল দিয়ে একটা বাক্স খোলার চেষ্টা করছে। শেষে তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে অসহায় গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ওই লোকটার বন্ধু?

আমি জবাব দিলাম, আমার মনে হয় না উনি আমাকে এখন দেখতে পেলে সেরকম মনে করতেন।

আপনি তাঁর বন্ধু নন?

না।

তিনি সংশয়ভরা চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, না, আমি ওঁর বন্ধু নই। আমাকে চিঠিটা দিন। আমি কথা দিচ্ছি, চিঠিটা যদি কখনো ব্যবহার করা হয় তবে তাঁর বিরুদ্ধেই করা হবে।

তিনি বললেন, আমি ভয় পাচ্ছি। কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে টেবিলের উপরে রাখা নোটগুলির দিকে তার আঙ্গুল ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কথা ভেবে ভয় পাবেন না। অনেক কাল আগের ঘটনা সেটা।

তিনি বললেন. আমি যখন গভর্নরের কাছে যাই —

আপনিও গভর্নরের কাছে গিয়েছিলেন?

ঘটনাটা ঘটে যাবার পর — সব কিছুর শেষে আমি ওই লোকটাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। আমি গভর্নরের কাছে যাই —

মাই গড!

আমি গভর্নরের কাছে যাই, গিয়ে ওকে শাস্তি দেবার কথা বলি, তাঁকে জানাই যে ও ঘুষ খেয়েছিলো, আমার ভাইকে হত্যা করেছে সে, কিন্তু তিনি বললেন যে আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই, বললেন যে ওই লোকটা তাঁর বন্ধু এবং আমার অভিযোগের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

চিঠিটা, আপনি ওঁকে চিঠিটা দেখিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, চিঠিটা ছিলো আমার কাছে।

গভর্নর স্ট্যান্টনকে কি আপনি চিঠিটা দেখিয়েছিলেন?

হ্যাঁ — হ্যাঁ — আর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বলেছিলেন, মিস লিটলপাফ, আপনি আদালতে শপথ করে বলেছেন যে আপনি ওই চিঠি পান নি, আপনি শপথ নিয়ে মিথ্যা উক্তি করেছেন, এই রকম মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তি খুব কঠোর, আর ওই চিঠির কথা যদি এখন জানাজানি হয় তা হলে আইন অনুযায়ী সে-অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ড আপনি ভোগ করবেন।

আপনি কি করলেন?

সরু বৃন্তের মতো ঘাড়ের উপর তার মাথা বসানো, মাথাভর্তি সাদা চুল, হাড়ের উপর টান টান হলুদ চামড়া, মাথার ভেতর কতো অজস্র পুরানো স্মৃতি, হাল্কা শুকনো বাতাসে তার মাথাটা যেন দুলে উঠলো। তিনি বললেন, আমি কি করলাম? অসহায় গরীব মেয়েমানুষ আমি। একা। আমার ভাই, মরে গেছে সে। কি আমি করতে পারতাম?

আপনি চিঠিটা তো রেখে দিয়েছেন। তিনি মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

নিয়ে আসুন সেটা। আনুন। আর কেউ এখন আপনাকে জ্বালাতন করবে না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।

তিনি হলুদ হয়ে যাওয়া কটু গন্ধ ছড়ানো একগাদা কাগজপত্র হাতড়ালেন। ঘরের এক কোণায় টিনের একটা ট্রাঙ্কে জীর্ণ দুমড়ানো কাপড়ের পুঁটুলীতে বিবর্ণ ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিলো ওই কাগজের তাড়া। আমি তার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম। ওর জরাগ্রস্ত আঙ্গুলের অক্ষমতা আমাকে অসহিষ্ণু করে তুলছিলো। অবশেষে তিনি কাগজটা খুঁজে পেলেন।

আমি ওর হাত থেকে খামটা ছিনিয়ে তার ভেতর থেকে চিঠিটা বার করলাম। হোটেলের কাগজে লেখা — হোটেল মনকাস্টেলো — তারিখ ৩রা আগস্ট, ১৯১৫। আমি পড়লাম ঃ

প্রিয় বোন,

আমি আজ বিকালে গভর্নর স্ট্যান্টনের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি তাঁকে বলেছি যে এতোগুলো বছর চাকুরি করার পর কোম্পানী আমাকে একটা কুকুরের মতো তাদের চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ ওই লোকটা, আরউইন, ঘুষ খেয়ে সাদার্ন বেল ফুয়েল কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন আমার জায়গায় বসেছে এই আরউইন, আর ওকে তারা যে-বেতন দিচ্ছে সে-বেতন আমাকে কোনোদিন দেয় নি, অথচ এই এতোগুলি বছর ধরে আমি আমার রক্ত জল করে ওদের সেবা করেছি। শুধু তাই নয়, ওরা ওকে ভাইস-প্রেসিডেন্টও করেছে। আমার সঙ্গে ওরা প্রতারণা করেছে, আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে, আর ঘুষ খাওয়ার

জন্য ওরা ওকে ভাইস–প্রেসিডেন্ট বানায়। কিন্তু গভর্নর স্ট্যান্টন আমার কোনো কথায় কান দিলেন না। তিনি আমাকে প্রমাণ দিতে বললেন। বেশ কয়েক মাস আগে মিঃ স্যাটারফিল্ড আমাকে বলেছিলেন যে মামলার ব্যাপারটার সুব্যবস্থা করে ফেলা হয়েছে এবং কোম্পানী সেজন্য আরউইনের বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখবে, আমি সেকথা গভর্নরকে বলি। তবে স্যাটারফিল্ড এখন আর সেকথা স্বীকার করে না। সে যে আমাকে কখনো কিছু বলেছে সেকথাই সে স্বীকার করে না, এবং সোজা আমার চোখে চোখ রেখে সে এখন এটা বলছে। অতএব আমার কাছে প্রমাণ বলতে কিছু নেই। এবং গভর্নর স্ট্যান্টন তদন্ত করবেন না।

আর আমার কিছু করার নেই। রাজনীতির অঙ্গনে যারা গভর্নর স্ট্যান্টনের বিরুদ্ধপক্ষ আমি তাদের কাছেও গিয়েছিলাম। তারাও আমার কথায় কান দেয় নি। কারণ ওই অবিশ্বাসী বদমাশ ম্যাক্‌কল্, যে ওই দলের প্রধান ব্যক্তি, স্বার্থের সম্পর্কে তার সঙ্গে সাদার্ন বেল কোম্পানীর গাঁটছড়া বাঁধা। প্রথম দিকে তারা উৎসাহ দেখিয়েছিলো কিন্তু এখন শুধু ঠাট্টা করে আমাকে। আমি কি করতে পারি? বয়স হয়ে গেছে, শরীর ভালো না। আর কোনো দিনই আমি কিছু করতে পারবো না। শুধু বোঝাই হয়ে থাকবো তোমার, কোনো কাজে আর আসতে পারবো না। কি আমি করতে পারি, বোন আমার?

তুমি সব সময় আমার প্রতি সহৃদয়তা দেখিয়েছো। আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি যা করতে যাচ্ছি তার জন্য তুমি আমাকে মার্জনা করো। কিন্তু আমি মিলিত হতে যাচ্ছি আমাদের পুণ্যাত্মা মা ও প্রিয় বাবার সঙ্গে, যারা আমাদের সযত্নে প্রতিপালন করেছেন, চিরকাল আমাদের স্নেহ–মমতায় অভিষিক্ত করেছেন, এবার অপর তীরে তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। তাঁরা সব চোখের জল মুছে দেবেন।

বিদায়, সেই শুভদিন পর্যন্ত, যখন আবার আলোকের মধ্যে আমাদের দেখা হবে।

মর্টিমার

পুনশ্চ ঃ আমি আমার ইনসিওরেন্স থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করেছি। বাজে লগ্নী করেছিলাম কয়েকটা, সেজন্য। তবু কিছু আছে, আর আমি যা করতে যাচ্ছি সেটা করেছি জানতে পারলে ওরা তোমাকে কোনো টাকাপয়সা দেবে না।
পুনশ্চ ঃ আমার ঘড়িটা, যেটা বাবা আমাকে দিয়েছিলেন, তুমি জুলিয়ানকে দিও। সে যদিও জ্ঞাতিভাই মাত্র, তবু সে ওটার মর্যাদা দেবে।
পুনশ্চ ঃ তোমার জন্য ইনসিওরেন্সের টাকাটার ব্যবস্থা করার চেষ্টা না করলে আমি

যা করতে যাচ্ছি তা আরো সহজে করতে পারতাম। ইনসিওরেন্সের টাকা আমি দিয়েছি, এবং সেটা তোমারই পাওয়া উচিত।

তো বোনকে ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে ফাঁকি দেবার পরামর্শ দিয়েই হতভাগা অপর তীরে চলে গিয়েছিলো, যেখানে তার মা-বাবা তার সকল চোখের জল মুছে দেবেন। এর মধ্যেই ছিলো সব — মর্টিমার লোঞ্জোর সব কিছু — তার বিভ্রান্তি, দুর্বলতা, ধর্মানুরাগ, আত্মকরুণা, সঙ্কীর্ণ চাতুর্য, প্রতিশোধপরায়ণতা — পরিচ্ছন্ন, পুরনো দিনের হিসাবরক্ষকের লেখার মতো, ছোট ছোট অক্ষরে লেখা, হয়তো সাধারণের চাইতে একটু বেশি কাঁপা কাঁপা, কিন্তু নির্ভুল ও ত্রুটিহীন।

আমি চিঠি খামে পুরে খামটা আমার পকেটে রাখলাম, তারপর বললাম, আমি ফটোস্ট্যাট ক'রে এটা আপনাকে ফেরত দেবো। ফটোস্ট্যাটটা আমি সত্যায়িত করে নেবো, তবে আপনি যে গভর্নর স্ট্যান্টনের কাছে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে একজন নোটারি উকীলের সামনে আপনাকে একটা বিবৃতি দিতে হবে, আর — আমি টেবিলের কাছে গিয়ে তার উপর থেকে নোট দুটি নিয়ে ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম — বিবৃতিটা দেয়ার পর এই রকম আরো একটি আপনি পাবেন। চলুন, টুপিটা পরে নিন।

তো বেশ কয়েক মাস পর আমি ফল পেলাম। কারণ কিছুই হারিয়ে যায় না, কোনো কিছুই কখনো হারিয়ে যায় না। সব সময়ই সূত্র ধরিয়ে দেবার চিহ্নটা থেকে যায়, বাতিল করা চেক, লিপস্টিকের দাগ, ফুলের বাগানে পায়ের ছাপ, পার্কের পথে পড়ে থাকা কনডম, পুরনো ক্ষতে কুঞ্চন, ব্রোঞ্জের মধ্যে ডোবানো বাচ্চার জুতো, রক্তধারায় দোষ। এবং সব সময়ই এক সময়, আর অতীতের মৃত সময়গুলি, যারা কখনো আমাদের সংজ্ঞায় জীবিত ছিলো না তারা প্রাণ পায়, এবং ছায়ার আড়াল থেকে তাদের চোখ আমাদের করুণা ভিক্ষা করে।

আমরা যারা ঐতিহাসিক গবেষক তারা এই কথা বিশ্বাস করি।

এবং আমরা সত্যপ্রেমী।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

মেমফিসে তার নোংরা, শেয়াল-শেয়াল-গন্ধ ছড়ানো আস্তানায় আমি মিস লিটলপাফের সঙ্গে দেখা করি ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসের শেষার্ধে। আর তখনই শেষ হয় আমার গবেষণা কাজ। প্রায় সাত মাস আমি ওই কাজের পেছনে লেগে ছিলাম। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে আমার গবেষণা ছাড়াও আরো কিছু ঘটনা ঘটে। টম স্টার্ক তখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, কিংবদন্তীর খ্যাতিমান অল্ সার্দান ইলেভেন টীমের কোয়ার্টারব্যাক খেলোয়াড়, তার পিতার নামধারী অগুণতি নতুন মহাসড়কের একটাতে, ছোট একটা কালভার্টের পাশে, নিজের দামী হলুদ স্পোর্ট কার নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে তার সাফল্যের উৎসব উদযাপন করেছে। সৌভাগ্যবশতঃ কতিপয় বাচাল সাধারণ নাগরিকের বদলে মহাসড়কে প্রহরারত একটা পুলিশের গাড়ি ধ্বংসকাণ্ডটা প্রথম দেখে। সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে, নিঃসন্দেহে, অর্ধশূন্য সুরার বোতলটি রাত্রির অন্ধকারে পাশের বিলের কালো জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। সংজ্ঞাহীন দ্বিতীয় বর্ষের বিখ্যাত ছাত্রটির দেহের পাশে আরেকটি দেহ পড়ে ছিলো, সংজ্ঞাহীন নয় কিন্তু বেশ আঘাতপ্রাপ্ত, কারণ বিশাল হলুদ দামী স্পোর্ট গাড়িটিতে আরেকজন ছিলো, হলুদকেশী এক তরুণী, তত দামী নয়, তবে নিঃসন্দেহে খেলুড়ে। তার নাম, দেখা গেলো, কারেস জোন্স। অতএব বিলের জলে নয়, কারেসকে চালান করা হলো হাসপাতালের অস্ত্রোপচার কক্ষে। অনুগ্রহ ক'রে কারেস মারা যায় নি, তবে ভবিষ্যতে কোনোদিনই সে আর কারো স্পোর্ট কারে সঙ্গী হয়ে মূল্যবান সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হবে, তেমন অবস্থা রইলো না। কিন্তু কারেস অনুগ্রহ করলেও তার বাবা অতোটা অনুগ্রহ করলেন না। তিনি বেশ দাপাদাপি করলেন, বললেন যে তিনি এর চরম শাস্তি দেবেন, আদালতে অভিযোগ করবেন, জেল খাটিয়ে ছাড়বেন, পত্রপত্রিকায় লেখাবেন, মামলা করবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তার সব হৈ চৈ বন্ধ হয়ে গেলো। অবশ্য এর ফলে যে কিছু শুভ পরিবর্তন সূচিত হয় নি তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় নীরবেই সমাধা হয়ে যায়। মিঃ জোন্সের ছিলো ট্রাকের ব্যবসা এবং কোনো একজন তাকে জানিয়ে দিলো যে ট্রাকগুলি চলাচল

করে সরকারী সড়ক দিয়ে, আর ট্রাক—মালিকদের কতিপয় সরকারী বিভাগের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।

টম তেমন কিছুই আঘাত পায় নি, যদিও তাকে হাসপাতালে তিন ঘণ্টা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটাতে হয়, আর ওই সময়টা কর্তা অপেক্ষা—কক্ষের মেঝেতে অস্থিরভাবে পায়চারি করেছেন, এক হাতের তালুতে অন্য হাতের মুঠি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করেছেন, তাঁর মুখ কাগজের মতো সাদা, চুল চোখের উপর ঝুলে পড়েছে, চোখের দৃষ্টি পাগলের মতো, গাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাসের শব্দ বেরুচ্ছে যেন খুব কষ্ট করে, ওপাশে তাঁর ছেলের মুখ দিয়ে যে—শব্দ বেরুচ্ছিলো ঠিক সেই রকম। তারপর লুসি স্টার্ক সেখানে এসে উপস্থিত হয়, তখন রাত প্রায় চারটা। লুসির চোখ লাল কিন্তু শুকনো, আর মুখের চেহারা হতবুদ্ধি, বিহ্বল। রীতিমতো ঝগড়া হয় ওদের দুজনের মধ্যে । কিন্তু সেটা ঘটে টমের যে কিছু হয় নি, সে খবর পাবার পর। ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তা সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শুধু পায়চারি করেছিলেন আর লুসি অন্ধকারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে ছিলো। কিন্তু খবরটা আসার পর লুসি উঠে গিয়ে কর্তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলো, ওকে তোমার থামাতেই হবে। লুসি কথাটা বললো প্রায় ফিসফিস করে।

তিনি শূন্য দৃষ্টিতে লুসির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না, তারপর তাকে স্পর্শ করার জন্য একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন, ঠিক একটা ভালুক যেভাবে তার স্থূল থাবা বাড়িয়ে দিয়ে তার সামনের বস্তুটির স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করে সেই ভাবে। তারপর নিজের শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিনি বললেন, ও — ও ঠিক হয়ে যাবে, লুসি। ও ঠিক আছে।

লুসি মাথা নাড়লো। না, ও ঠিক নেই।

তিনি স্খলিত পায়ে লুসির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ডাক্তার — ডাক্তার তো বলেছে — লুসি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো, না, ও ঠিক নেই। আর হবেও না। যদি না তুমি তাকে ঠিক করো।

হঠাৎ প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে তাঁর গাল লাল হয়ে গেলো। দেখো, তুমি যদি ওর ফুটবল খেলা বন্ধ করার কথা বলতে চাও — তুমি যদি —

এ ছিলো ওদের দুজনের পুরনো বিতর্কের বিষয়।

লুসি বললো, ওহ্, ব্যাপারটা শুধু ফুটবল নয়। সেটাও যথেষ্ট খারাপ, এই যে সে নিজেকে একজন মহানায়ক ভাবছে, পৃথিবীতে আর যেন কিছুই নেই, এটাও যথেষ্ট খারাপ, কিন্তু এটাই সব নয়, এর সঙ্গে আরো যা কিছু জড়িত — উচ্ছৃঙ্খলতা,

স্বার্থপরতা, আলস্য —

দেখো, আমার ছেলে একটা খুকী হয়ে বেড়ে উঠবে না। তাই তো তোমরা চাও!

তোমার অহমিকা তাকে যা তৈরি করতে চায় সেটা দেখবার আগে আমি ওকে আমার পায়ের কাছে মরে পড়ে থাকতে দেখতে চাই!

আহ্, কী পাগলামি করছো!

তুমি ওকে ধ্বংস করে ফেলবে। লুসির কণ্ঠস্বর শান্ত, দৃঢ়।

আহ্! ওকে একটা যথার্থ পুরুষ মানুষ হতে দাও। আমার কৈশোরে, আমার যৌবনে, আমি কণামাত্র স্ফূর্তির স্বাদ পাই নি। ও করুক না একটু আমোদ আহ্লাদ! আমি চাই ও একটু স্ফূর্তি করুক। আমি এক সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি অন্যরা কতো মজা করছে আর আমি — না, আমি চাই —

লুসি আবার বললো, তুমি ওকে ধ্বংস করে ফেলবে। তার গলার স্বর শোনালো সৃষ্টির চরম বিপর্যয়ের মতো শান্ত ও দৃঢ়।

নিকুচি করি তোমার — ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি বলতে শুরু করলেন, কিন্তু তার আগেই আমি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে চুপিসারে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি।

কিন্তু ওই শীতে শুধু টমের দুর্ঘটনা নয়, আরো কিছু ঘটনা ঘটে।

এ্যান স্ট্যান্টনের শিশুসদনের জন্য সরকারী অনুদান সংগ্রহের পরিকল্পনাও তখনকার ঘটনা। প্রাথমিক সরকারী প্রতিক্রিয়া ছিলো বেশ ভালো, যার ফলে এ্যান খুবই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে জানায় যে সে শিগ্‌গিরই দু'বছরের একটা অনুদান পাবে, আর সেটার খুব দরকারও ছিলো বলে সে মন্তব্য করে। তার কথা খুব সম্ভব ঠিক, কারণ ১৯২৯ সালের দিকে বেসরকারী দানের উৎস প্রায় শুকিয়ে এসেছিলো, এমন কি তার সাত–আট বছর পরেও সেই ধারা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হতে থাকে।

চতুর্থ জেলা অঞ্চলে একটা হৈ চৈ হচ্ছিলো তখন। সেখানে তখনো ম্যাকমারফির কিছু প্রভাব ছিলো। ওয়াশিংটনের কংগ্রেসে তার প্রতিনিধি কর্তা সম্পর্কে কঠোর মতামত প্রকাশ করে। ব্যাপারটা সারা দেশ জুড়ে খবরের কাগজের হেডলাইন হয়। ওয়াশিংটন বেশ দূরে হলেও চাঁদের মতো অতোটা দূরে তো নয়। অতএব কর্তা রেডিও সময়ের একটা বড়ো অংশ কিনে নিয়ে কংগ্রেস সদস্য পেটিট সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত প্রচার করতে শুরু করেন, ভদ্রলোকের একটা বিশদ জীবনীর আকারে। কয়েক কিস্তিতে। কর্তার রিসার্চ বিভাগের কাজের পরিণতিতে দেখা গেলো যে কংগ্রেস সদস্য পেটিট কাঁচের ঘরে একটা গ্রেনেড ছুঁড়েছে। কর্তা পেটিটের বক্তব্যের কোনো উত্তর দিলেন না, শুধু বক্তাকে নস্যাত করার কাজে ব্রতী

হলেন। কর্তা তথাকথিত আর্গুমেন্টাম এ্যাড হোমিনেম ফ্যালাসি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিলেন, তবে তিনি বলতেন, ওটা ফ্যালাসি হতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কার্যকর। যদি যথাযথভাবে আর্গুমেন্টাম ব্যবহার করা যায় তবে তার সাহায্যে হোমিনেমকে চরম পর্যুদস্ত করা সম্ভব।

পেটিট শেষ পর্যন্ত সুবিধা করতে পারলো না, তবে বলতেই হবে ম্যাকমারফি তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। টাইনি ডাফিও তার চেষ্টা ছাড়ে নি। সে কর্তাকে একটা জিনিস বিশ্বাস করাতে ছিলো বদ্ধপরিকর। গামি লার্সন হলো চতুর্থ জেলার আসল শক্তি, তাকে হাসপাতালের মূল কন্ট্রাক্ট দিতে হবে। সে ম্যাকমারফিকে পথে আনতে পারবে। আরো স্পষ্ট করে বললে, সে ম্যাকমারফির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার দল ছেড়ে চলে আসবে। ছাদের উপর বৃষ্টিপাতের শব্দ মানুষ যেভাবে শোনে ঠিক ততোটা মনোযোগ দিয়েই কর্তা টাইনির এসব কথা শুনতেন, তারপর বলতেন, নিশ্চয়, টাইনি, নিশ্চয়। পরে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করবো। কিংবা তিনি বলতেন, আহ্ টাইনি, তোমার রেডকর্টা বদলাও, অন্য কিছু বাজাও। কিংবা তিনি হয়তো তার কথার কোনো উত্তরই দিতেন না, টাইনির উপর তাঁর প্রগাঢ়, গম্ভীর, নিরাসক্ত অথচ অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতেন, যেন কোনো একটা কিছুর জন্য তিনি তার মাপজোক নিচ্ছেন, একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না টাইনির কণ্ঠস্বর স্তিমিত হতে হতে নীরব হয়ে যেতো, আর তখন শুধু শোনা যেতো দুজন মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ, তার বিশাল বপু সত্ত্বেও টাইনির নিঃশ্বাসের শব্দ ছিলো ফাঁপা, একটু হিস্‌হিসে এবং দ্রুত, আর কর্তার ছিলো অচঞ্চল এবং গভীর।

ইতোমধ্যে কর্তা যতক্ষণ জেগে থাকতেন ততক্ষণ শুধু তাঁর হাসপাতালের কথা ভাবতেন। সব চাইতে সুন্দর, সব চাইতে বড়ো হাসপাতালগুলি দেখার উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বাঞ্চলে ঘুরতে গেলেন। ম্যাসাচুসেটস জেনারেল, নিউইয়র্কের প্রেসবাইটেরিয়ান, ফিলাডেলফিয়া জেনারেল ও আরো অনেক হাসপাতাল দেখলেন তিনি। তারপর তাঁর বক্তব্য হলো ঃ ওগুলি যতো চমৎকারই হোক আমার কিছু এসে যায় না, আমার হাসপাতাল হবে সেগুলির চাইতেও চমৎকার, ওগুলি যতো বড়োই হোক না কেন আমারটা হবে তার চাইতেও বড়ো, এবং এই স্টেটের মানুষ সে যতো গরীব ও যতো হতভাগাই হোক না কেন আমার হাসপাতালে গিয়ে এক পয়সাও খরচ না করে সর্বোত্তম চিকিৎসার সুবিধা পাবে।

যখন তিনি ঘুরতে বেরুতেন তখন সারাটা সময় কাটাতেন ডাক্তার, স্থপতি আর হাসপাতালের কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে, নাচ–গান কিংবা ঘোড়দৌড়ের অঙ্গনের কারো

সঙ্গে নয়। আর ঘরে ফেরার পর তাঁর টেবিল জুড়ে আর কিছুই দেখা যেতো না, শুধু স্থাপত্য ও ঘর গরম রাখার বৈদ্যুতিক পদ্ধতিসমূহ, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বইপত্র, তাঁর নোটবই ভর্তি নানা লেখা আর মন্তব্য, আর গাদা গাদা নীলনক্শা। আপনি হয়তো ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, উনি চোখ তুলে আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করবেন, যেন আপনি ওখানে অনেকক্ষণ ধরে আছেন এবং আপনার সঙ্গে তাঁর এই নিয়েই আলাপ হচ্ছিলো ঃ দেখো, ম্যাসাচুটেস জেনারেল হাসপাতালে ওদের — হ্যাঁ, ওই প্রকল্পটা যে তাঁর একান্ত পুত্রবৎ ছিলো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু টাইনি হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়।

এক রাতে আমি গভর্নর–ভবনে গিয়ে দেখি সুগার–বয় সুউচ্চ চমৎকার হলঘরটিতে হাঁটুর উপর খবরের কাগজ পেতে তার উপর নিজের ৩৮ পিস্তলের অংশগুলি বিযুক্ত করে এক হাতে সেগুলি নিয়ে গা এলিয়ে বসে আছে। মেঝের উপর আগ্নেয়াস্ত্র পরিষ্কারের এক শিশি তেল। আমি ওকে কর্তা কোথায় জিজ্ঞাসা করলাম। ওর ঠোঁটদুটো কথা বলার কষ্টকর প্রয়াসে কুঁচকে উঠলো, তার ফাঁক দিয়ে থুতু নিঃসৃত হলো, অবশেষে তার মাথা নাড়ানো থেকে আমি বুঝলাম যে কর্তা লাইব্রেরিতে আছেন। আমি লাইব্রেরী কক্ষের বড়ো দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একেবারে কর্তার তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে পড়লাম, মনে হলো একটা দোনলা বন্দুক তাক্ করা আছে, এখুনি গর্জে উঠবে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। কর্তা চামড়ার বড়ো সোফাটায় এলিয়ে বসা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে আমাকে লক্ষ করে বললেন, দ্যাখো ! তাকিয়ে দ্যাখো ওকে !

এবার তিনি তাঁর দোনলা বন্দুকটা টাইনির দিকে ফেরালেন। আগুনের চুল্লীর সামনের ছোট কার্পেটের উপর টাইনি দাঁড়িয়েছিলো। চুল্লীতে কাষ্ঠখণ্ডগুলি আগুনের তাপে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু টাইনি, মনে হলো, সে তুলনায় দ্রুততর হারে গলে যাচ্ছে।

কর্তা আমাকে লক্ষ করে বললেন, দ্যাখো, এই হারামজাদা আমার সঙ্গে চালাকী করতে গিয়েছিলো, গামি লার্সনকে গোপনে এখানে নিয়ে এসেছিলো যেন সে সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে। সেই সুদূর ডুবোয়াভিল থেকে ওকে এখানে আনিয়েছিলো, ভেবেছিলো আমি ওর সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ভদ্র আচরণ করবো। ভদ্র আচরণ? কর্তা আবার টাইনির দিকে তাকালেন। তো, আমি কি ভদ্র আচরণ করেছি? সৌজন্য দেখিয়েছি?

টাইনির মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুলো না।

বলো ! আমি ভদ্র আচরণ করেছি?

না। টাইনির কণ্ঠস্বর যেন একটা গভীর কূয়ার তলদেশ থেকে উঠে এলো।

কর্তা বললেন, না, করি নি। আমি ওকে দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরেই আসতে দিই নি। আমার পেছনের বন্ধ দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন, আমি ওকে বলেছি যে আমার কখনো ওর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হলে আমিই ওকে ডেকে পাঠাবো। আর এখন যেন সে এখান থেকে বিদায় হয়। দ্রুত। কিন্তু তুমি — কর্তা টাইনির দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, তুমি —

আমি ভেবেছিলাম —

তুমি ভেবেছিলে তুমি আমার সঙ্গে একটা মহা চালাকীর খেলা খেলবে। ভেবেছিলে যে আমি কিনবো, টাকা দিয়ে দলে টেনে নেবো। কিন্তু না, আমি ওকে কিনবো না। আমি ওকে ধ্বংস করবো। ইতোমধ্যে আমি অনেক ক'টা কুত্তার বাচ্চা কিনেছি, আর নয়। ওদের ধ্বংস করে ফেললে ওরা ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থাতেই থাকে, কিন্তু কিনলে কতক্ষণ যে কেনা অবস্থায় থাকবে বলা যায় না। না, না, ইতোমধ্যে অনেক বেশি কিনে ফেলেছি। তোমাকে ধ্বংস না করেই একটা ভুল করেছি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় কেনা অবস্থাতেই থাকবে, অন্য পথ ধরতে তুমি ভয় পাবে।

টাইনি বললো, দেখুন, কর্তা। এটা কি বলছেন আপনি? এটা সুবিচার হচ্ছে না। আপনার সম্বন্ধে আমাদের সবার কি মনোভাব তা তো আপনি জানেন। এবং সেটা ভয়ের জন্য নয়, সেটা —

তুমি বরং ভয়ের মধ্যেই থেকো। অকস্মাৎ কর্তার কণ্ঠস্বর মৃদু আর মধুর শোনালো। যেন মা দোলনায় তার শিশুর সঙ্গে কথা বলছে।

কিন্তু ততক্ষণে টাইনির মুখমণ্ডলে নতুন স্বেদবিন্দু ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

এর পর কর্তা কঠোর স্বরে বললেন, এবার বেরিয়ে যাও !

ও বেরিয়ে যাবার পর বন্ধ দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করে আমি বললাম, ভোটারদের সমর্থন পাবার জন্য আপনি খুব যত্নবান বটে !

ওহ্ ! তিনি কয়েকটা ব্লু-প্রিন্ট হাত দিয়ে এক পাশে সরিয়ে সোফায় গা এলিয়ে বসলেন। হাত তুলে তিনি তাঁর কলারের বোতাম খোলার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, হ্যাঁচকা টানে বোতামটা ছিড়ে ফেলে টাইটা ঢিলা করে দিলেন। তিনি তাঁর ভারী মাথাটা দু'এক বার এপাশ ওপাশ করলেন, যেন কলারের চাপে তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো।

প্রায় শিশুর মতো বিরক্ত গলায় তিনি বললেন, ওহ্, ডাফি কেন বুঝতে পারে না

যে আমি চাই না ও এই ব্যাপারটায় নাক গলাক? তিনি আবার ওই নীলনক্শাগুলি হাত দিয়ে নাড়লেন।

আমি বললাম, আপনি কি প্রত্যাশা করেন? ছয় মিলিয়ন ডলারের কাজ। গুড় তৈরির সময় আপনি কি কখনো মাছিকে দূরে থাকতে দেখেছেন?

ভালো চাইলে এক্ষেত্রে ও যেন দূরেই থাকে।

ও তো যুক্তিসঙ্গত ভাবেই কাজ করছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে লার্সন ম্যাকমারফিকে বিক্রী করে ডুবিয়ে দিতে প্রস্তুত। একটা কন্ট্রাক্টের বিনিময়ে। লার্সন একজন দক্ষ নির্মাতা। ও —

তিনি আসনে ঋজু হয়ে বসে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিও কি এর মধ্যে আছো নাকি?

আমি কাঁধ কুঁচকে বললাম, এর মধ্যে আমার বিন্দুমাত্র স্বার্থ বা উৎসাহ নেই। ইচ্ছে করলে আপনি আপনার খালি হাত দিয়ে হাসপাতালটা বানাতে পারেন, আমার কিচ্ছু এসে যায় না। আমি শুধু বলছিলাম যে প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যাবে যে টাইনি যুক্তিসঙ্গত আচরণই করছে।

তিনি আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, তুমি কেন বুঝছো না? আহ্, তুমিও কি বুঝতে পারছো না?

আমি যা বুঝি তাই বুঝি।

তুমি কেন বুঝছো না? তিনি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, এবং তখনই তাঁর শরীর যেভাবে সামান্য দুলে উঠলো তা থেকে আমি বুঝলাম যে তিনি সুরা পান করছিলেন। তিনি দু'পা এগিয়ে এসে আমার কোটটা ধরে আমাকে ছোট একটা ঝাঁকুনি দিলেন, আমার মুখের উপর তাঁর চোখ রাখলেন, আমার মুখের খুব কাছে এখন তাঁর চোখ, আমি দেখলাম যে তাঁর চোখে রক্তের ছোপ, তিনি বলছেন, তুমিও বুঝতে পারছো না? আমি ওই জিনিসটা তৈরি করছি, সারা দেশের সব চাইতে ভালো জিনিস, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হাসপাতাল, টাইনির মতো একটা বাজে লোক এর মধ্যে নাক গলিয়ে কিছু একটা গোলমাল করুক এ আমি চাই না, বুঝলে? আমি এর নাম দেবো উইলি স্টার্ক হাসপাতাল, এবং যখন আমি মরে যাবো, আমি আর থাকবো না, তুমি মরে যাবে, তুমি আর থাকবে না, যখন ওই কুত্তার বাচ্চাগুলিও মরে যাবে, ওরাও কেউ থাকবে না, তখনও এই হাসপাতাল থাকবে, আর প্রত্যেকে, যার এক কানাকড়িও নেই সে-ও ওখানে গিয়ে —

আমি বললাম, আপনার জন্য ভোট দেবো।

তিনি বলে চললেন, সেদিন আমি থাকবো না, তুমিও থাকবে না, আর আমার

জন্য সে ভোট দিক বা না দিক আমি তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাই না, সে ওখানে গিয়ে —

আমি বললাম, আপনাকে আশীর্বাদ করবে।

আহ্! তিনি তাঁর বিশাল থাবায় আমার কোট কুঁচকে ধরে আমাকে সজোরে নাড়া দিয়ে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইভাবে হাসছো — মুছে ফেলো তোমার মুখের ওই হাসি, মুছে ফেলো, নইলে আমি —

আমি বললাম, শুনুন, আমি আপনার পা-চাটাদের কেউ নই, আর আমার যখনই হাসতে ইচ্ছা করবে আমি তখনই হাসবো।

জ্যাক — আহ্, জ্যাক — আমি এভাবে বলতে চাই নি, তুমি জানো — কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি ওইভাবে হাসতে থাকবে? তুমি কেন বুঝতে পারছো না, জ্যাক? তিনি আমার কোট ধরে তাঁর মুখ আমার মুখের একেবারে কাছে নিয়ে এলেন। তাঁর চোখ দুটি যেন আমার চোখের মধ্যে ঢুকে যাবে। কেন বুঝতে পারছো না যে আমি ওই হারামজাদাগুলোকে কিছুতেই এটা বানচাল করতে দেবো না। উইলি স্টার্ক হাসপাতাল। বুঝতে পারলে? এই হাসপাতাল চালাবার জন্য আমি সব চাইতে যোগ্য সব চাইতে ভালো লোকটিকে নিয়োগ করবো। আজ্ঞে, হ্যাঁ। সবার সেরা লোকটিকে। নিউ ইয়র্কে ওরা আমাকে তার কথা বলেছে, তাকে যেন যোগাড় করি। আর জ্যাক, তুমিই —

কি?

তুমিই তাকে এনে দেবে।

আমি কর্তার হাতের মুঠি থেকে আমার কোট ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে বললাম, কাকে এনে দেবো?

ডাঃ স্ট্যান্টনকে। ডাঃ এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে।

আমি চেয়ার থেকে প্রায় ছিটকে উঠেছিলাম। আমার হাতের সিগারেটের ছাই শার্টের বুকের উপর ছড়িয়ে পড়লো। আমি প্রশ্ন করলাম, কখন থেকে আপনার এই সব উপসর্গ দেখা দেয়? আপনি কি গোলাপী হাতী দেখতে শুরু করেছেন? সুরাপানের ফল কি এতদূর গড়িয়েছে?

তিনি শুধু বললেন, তুমি স্ট্যান্টনকে এনে দাও।

আমি বললাম, আপনি ঘোরের মধ্যে আছেন।

তিনি আবার বললেন, কঠিন কণ্ঠে, তুমি ওকে এনে দাও।

শুনুন, কর্তা, আমি বললাম। এ্যাডাম আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমি ওকে খুব ভালো করে চিনি। ও আপনাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

আমি ওকে ভালোবাসতে বলছি না। ও শুধু আমার হাসপাতাল পরিচালনার ভার নেবে। আমি কাউকেই আমাকে ভালোবাসতে বলছি না। এমন কি তোমাকেও না।

আমি টাইনির ভঙ্গি সকৌতুকে অনুকরণ করে বললাম, আমরা সবাই আপনাকে ভালোবাসি। আপনার সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব কি তা তো আপনি জানেন।

ওকে যোগাড় করো।

এবার আমি উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটা টান টান করলাম, হাই তুললাম, তারপর দরজার দিকে এগুতে এগুতে বললাম, এখন আমি যাচ্ছি। আগামী কাল যখন আপনার বিচারবুদ্ধি আপনার আয়ত্তাধীন থাকবে তখন আপনি কি বলতে চান সেটা শুনবো।

আমি বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

আগামী কাল, যখন তাঁর বিচারবুদ্ধি তাঁর আয়ত্তাধীন ছিলো, আমি তাঁর বক্তব্য আবার শুনলাম। সেটা ছিলো ঃ স্ট্যান্টনকে যোগাড় করো।

অতএব আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম সেই অগোছালো ছোট্ট মঠের সন্ন্যাসীর আস্তানার মতো বাসায়, যেখানে চারি দিকের প্রায় নোংরা মলিনতার মধ্যে বিশাল পিয়ানোটা একটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি নিয়ে ঝলমল করছিলো, বই আর কাগজপত্র চেয়ারগুলোর উপর টাল করে রাখা, একটা ব্যবহৃত কফির পেয়ালা পড়ে আছে, তলানিতে কিছু কফি শুকিয়ে জমে গেছে, নিগ্রো কাজের মেয়েটি তুলে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলো, যেখানে আমার যৌবনের বন্ধু আমাকে এমনভাবে স্বাগত জানালো যেন সে সাফল্যের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান নয়, যেন আমি ব্যর্থতার মালিন্যে কালিমালিপ্ত নই, সে আমার কাঁধে হাত রেখে আমার নাম উচ্চারণ করলো, তার বরফ-নীল চোখের দৃষ্টি রাখলো আমার মুখের উপর, বিমূর্ত দুটি চোখ, দুনিয়ার যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা, বিভ্রান্তি ও ঘোলাটে বিষয়ের বিরুদ্ধে যা একটি নিরন্তর তিরস্কার, বিবেকের মতো যা স্থির ও অচঞ্চল। কিন্তু তার ঠোঁটের কঠিন জোড়বন্ধনের মধ্য থেকে কতকটা পরীক্ষামূলকভাবে বেরিয়ে আসা মুখের হাসি মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা লাজুক উষ্ণতার পরশ ছড়িয়ে দিতো, ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করা এক উজ্জ্বল শীতের দিনের সূর্যালোকের মতো। ওই হাসি ছিলো তার স্বাতন্ত্র্যের জন্য ক্ষমাভিক্ষা, সে যা সে তাই, এর কোনো চারা নেই, সে মানুষকে যে চোখে দেখে তার জন্য ক্ষমাভিক্ষা, সে যা দেখতে পায় তার জন্যও। এটা আপনাকে বা দুনিয়াকে ক্ষমা করার ব্যাপার

ততোটা নয়, যতোটা নিজের জন্য ক্ষমা চাওয়া, সে যে তার সামনে যা আছে তাকে এই রকম সোজাসুজি দেখছে সেই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া, আর সেই বস্তুটি আপনিও হতে পারেন। কিন্তু ও বেশি হাসতো না। আমাকে দেখে এবং আমি যে কি বস্তু সেজন্য সে হাসে নি, সে হেসেছিলো আমি তার যৌবনকালের বন্ধু ছিলাম সেই জন্য।

আপনার যৌবনের বন্ধুকেই আপনি একমাত্র বন্ধু হিসেবে পাবেন কারণ সে আপনাকে সত্যি সত্যি দেখতে পায় না। সে তার মনের চোখে একটি মুখ দেখে বর্তমানে যার কোনো অস্তিত্ব নেই, সে একটা নাম উচ্চারণ করে — স্পাইক, বাড, স্লিপ, রেড, রাস্টি, জ্যাক, ডেভ্ — যে-নাম বর্তমানে অস্তিত্বহীন একটা মুখের পরিচয় বহন করছে, বিশ্বের কোনো মূঢ় জটপাকানো কর্মকাণ্ডের ফলে যে-নামের অধিকারীকে সে অকস্মাৎ তার সামনে দেখতে পায়, অচেনা ও বিরক্তিকর একটা মানুষ, যার সঙ্গে দেখা হয়ে সে মোটেই খুশি বোধ করে না। কিন্তু বিশ্বের ওই নির্বোধ মূঢ় জটপাকানো কর্মকাণ্ডকে সে প্রশ্রয় দেয়, সে এক ভোঁতা অচেনা মানুষকে সৌজন্যভরে তার নাম ধরে সম্বোধন করে, যে-নামের আসল অধিকারী বহু দিন আগের একটি বালক-মুখ, একটি বালক-কণ্ঠ, শেষ বিকেলে জলরাশির উপর দিয়ে তার সরু আহ্বান ভেসে আসছে কিংবা ক্যাম্প-ফায়ারের আলোতে রাতের বেলায় সে গুণগুণ করে কথা বলছে, কিংবা ভীড়েভর্তি রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সে বলে উঠছে, এই দ্যাখো, এটা শুনেছো তুমি? — আপনার যৌবনের বন্ধু আপনার বন্ধু, কারণ সে আপনাকে আর সত্যি সত্যি দেখতে পায় না।

কিংবা সে আপনাকে কখনোই দেখে নি। সে আপনাকে শুধু দেখেছে যে-জগৎ তার সামনে খুলে যাচ্ছে সেই জগতের আসবাবপত্রের একটা অংশরূপে। বন্ধুত্ব জিনিসটা সে অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছে, এবং চাঁদের কুঁড়ির মতো যে অদ্ভুত উন্মাদনাময় জগত তার সামনে খুলে যাচ্ছে তার স্বীকৃতি ও মূল্য হিসেবে তাকে সেটা দান ক'রে দিতেই হবে, কাকে দিচ্ছে সেটা কোনো ব্যাপারই নয়, দেয়াটাই মুখ্য, এবং যদি আপনি তখন হাতের কাছে উপস্থিত থাকেন তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনিই ভূষিত হয়ে যাবেন বন্ধু হবার জন্য প্রয়োজনীয় তাবৎ গুণাবলীতে। আর তারপর আপনার বাস্তবতা হয়ে উঠবে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আপনার যৌবনের বন্ধু ছাড়া আর কোনো বন্ধু আপনি পাবেন না, কারণ তার নিজের স্বার্থ বা আপনার গুণাবলীর বিন্দুমাত্র খতিয়ান সে করে না। প্রাপ্তবয়স্কের বন্ধুত্বের দুটি প্রধান মানদণ্ড, জাগতিক সাফল্য অথবা সর্বোত্তমকে প্রশংসা করার অপ্রতিরোধ্য তাগিদ, এসব নিয়ে তখন সে একটুও ভাবে না। এবং তখন বিরক্তি উৎপাদনকারী অচেনা মানুষটি

উপস্থিত হলে সে তার হাত বাড়িয়ে দেয়, তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে (আপনার মুখ সে সত্যি সত্যি দেখে না), সে আপনার নাম উচ্চারণ করে (যে-নাম এখন আর আপনার ওই মুখের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়), আর বলে ওঠে, এই যে, জ্যাক, কী ভালোই লাগছে তোমাকে দেখে, এসো, ভেতরে এসো।

অতএব আমি ভেতরে ঢুকে ওর একটা জীর্ণ ভাঙা আরাম-কেদারায় বসলাম। তার আগে ওর উপর টাল হয়ে পড়ে থাকা বইগুলি সে সরালো, তার হুইস্কিটা শেষ করলো, আর আমি ততক্ষণ এই কথাগুলি বলবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম ঃ তো, শোনো এ্যাডাম, আমি তোমাকে একটা কথা বলার জন্য এসেছি, আর আমার কথাটা শেষ হবার আগেই তুমি ক্ষেপে চেঁচিয়ে উঠবে না, ঠিক আছে?

আমি শেষ না করা পর্যন্ত ও ঠিকই চেঁচিয়ে ওঠে নি। অবশ্য কথাটা বলার জন্য আমি যে খুব বেশি সময় নিয়েছিলাম তাও নয়। আমি শুধু বলেছি, গভর্নর স্টার্ক চান যে তুমি নতুন হাসপাতাল আর মেডিক্যাল সেন্টারের পরিচালকের পদ গ্রহণ করো।

সে তখনো ঠিক চেঁচিয়ে ওঠে নি। বস্তুতঃপক্ষে সে কোনো শব্দই করে নি। প্রায় এক মিনিট সে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, সে-চোখে কোনো হাসি নেই, সে-দৃষ্টি চিকিৎসকের সন্ধানী দৃষ্টি, যেন আমার উপসর্গসমূহ বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সে লক্ষ করছে, তারপর ধীরে ধীরে সে তার মাথা নাড়লো। আমি বললাম, ব্যাপারটা ভেবে দেখো তুমি, হয়তো শুনতে যতো খারাপ লাগছে ততোটা খারাপ হবে না, হয়তো এর কিছু কিছু দিক — কিন্তু আমি কথাটা আর শেষ করলাম না। আবার তাকে মাথা নাড়তে দেখলাম, আর এখন তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো, সেই হাসি যা আমাকে ক্ষমা করছিলো না, বরং আমাকে অনুরোধ করছিলো আমি যেন তাকে ক্ষমা করে দিই, সে যে আমার মতো নয়, আর সবার মতো নয়, এই দুনিয়ার মতো নয়, সেজন্য যেন তাকে ক্ষমা করি।

সে যদি শুধু না হাসতো কিংবা সে-হাসি যদি আমাকে নস্যাত করে দেয়া হাসি হতো, ব্যঙ্গের হাসি হতো। এমন কি সে যদি আমাকে সরাসরি ক্ষমা করে দেয়ার মতো হাসি হাসতো। কিন্তু না, সে হাসলো সবিনয়ে অথচ মর্যাদার সঙ্গে, আমাকে মিনতি করলো আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। এটা না হলে সব হয়তো অন্য রকম হতো। কিন্তু সে ওই ভাবেই হাসলো, তার ভেতরে যে জিনিসটা ছিলো তারই পূর্ণতার তাগিদে, যে-আদর্শ নিয়ে সে জীবন ধারণ করতো, সে-আদর্শ যাই হোক না কেন, আর যে জন্যই হোক না কেন, যে-আদর্শ সে অনুসরণ করতো তারই তাড়নায় সে ওই ভাবে হেসেছিলো — এবং তার ফলেই সমস্ত ব্যাপারটা এই পথে গড়ালো। ওই হাসির জন্য তাকে মনে হলো সেই লোকটির মতো যে একটি

ভিক্ষুককে একটা টাকা দেবার জন্য পথের মধ্যে থামে। আর ব্যাগ খুলে ভিক্ষুককে ব্যাগের মধ্যে নোটের মোটা বান্ডিলটা দেখতে দেয়। ভিক্ষুক যদি নোটের ওই মোটা বান্ডিলটা না দেখতো তা হলে রাস্তা দিয়ে তাকে অনুসরণ করতো না, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে একটা নির্জন অন্ধকার স্থানের জন্য অপেক্ষা করতো না। ওই মোটা নোটের তাড়ার জন্য ততোটা নয় কিন্তু সে দেখেছে যে লোকটার অতো অর্থ আর সে তাকে মাত্র একটা টাকা দিয়েছে, এটা সে আর সহ্য করতে পারে না।

কারণ ও যখন মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, কিন্তু ওর নানা দিক নিয়ে তো আমি মোটেই উৎসাহী নই, তখন আমি আর শীতের রৌদ্রে যে-কোমল উষ্ণতা থাকে, ও হাসলেই আমি সব সময় যে-উষ্ণতার স্পর্শ পেতাম সেই উষ্ণতার ছোঁয়া পেলাম না, বরং হঠাৎ ভিন্ন কিছু অনুভব করলাম, ঠিক কি জিনিস তা বলতে পারবো না, কিন্তু যেটা মনে হলো সেটা শীতের রৌদ্র নয় বরং নির্ভেজাল শীত, কল্জের মধ্যে কেউ যেন একটা বরফের ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর আমি মনে মনে বলে উঠলাম, ঠিক আছে, ওই ভাবে তুমি হাসছো — তুমি হাসছো ওই ভাবে —

তো আমার ওই চিন্তাটা মিলিয়ে যেতেই — কিন্তু আসলে কোনো চিন্তাই তো মিলিয়ে যায় না, আপনার ভেতর থেকে তা উঠে আসে আবার আপনার ভেতরেই তা ডুবে যায় — আমি বললাম, কিন্তু ওর কি কি দিক আছে তুমি তো জানোই না। যেমন, কর্তার ইচ্ছা যে তোমার বেতন তুমিই ঠিক করবে, যা তুমি বলবে।

এ্যাডাম পুনরাবৃত্তি করলো, কর্তা। শব্দটা উচ্চারণ করার সময় তার উপরের ঠোঁট সাধারণ সময়ের চাইতে বেশি কুঞ্চিত হলো, তার দাঁত দেখা গেলো, গলার স্বর একটু বেশি হিস্ হিস্ শোনালো। সে বললো, কর্তা আমাকে কিনে নেবেন সে রকম আশা করার প্রয়োজন নেই। নিজের ঘরের অগোছালো আজেবাজে জিনিসগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করে সে বললো; আমার যা কিছু দরকার সব আমার আছে।

কর্তা নির্বোধ নন। কর্তা তোমাকে কিনে নেবেন তুমি নিশ্চয়ই সেরকম ভাবছো না।

কিনে নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়।

তা হলে তিনি কি করতে চেষ্টা করছেন বলে তোমার মনে হয়?

ভয় দেখাতে। এর পর তাই করবেন।

আমি মাথা নাড়লাম। না, তোমাকে ভয় দেখাবার সাধ্য কারো নেই।

কিন্তু মনে হয় ওটার উপরই তিনি নির্ভর করছেন। হয় ঘুষ দেবেন, নয়তো ভয় দেখাবেন।

আমি বললাম, অন্য কিছু ভাবো।

সে চেয়ার থেকে উঠে জীর্ণ সবুজ কার্পেটের উপর দিয়ে অস্থিরভাবে বার দুই পায়চারি করলো, তারপর এক ঝটকায় আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় হিংস্রভাবে বললো, আমাকে খোশামোদ করে গলাবেন তেমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

আমি নিচু গলায় বললাম, তোমাকে খোশামোদ করে গলাবার সাধ্য কারো নেই। দুনিয়ায় কারো নেই। কেন তা জানো?

কেন?

শোনো, বন্ধু! দান্তে বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে যথার্থ অহঙ্কারী ব্যক্তি, যিনি তাঁর নিজের মূল্য জানেন, তিনি কখনো ঈর্ষান্বিত হন না, কারণ তিনি ঈর্ষা করতে পারেন এমন লোক আছে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন না। দান্তে এটাও শিখতে পারতেন যে যে-অহঙ্কারী ব্যক্তি তার নিজের মূল্য জানে তাকে কখনো খোশামোদ করে গলানো যায় না, কারণ তার মূল্য সম্পর্কে সে নিজে জানে না এমন কিছু বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব বলে সে বিশ্বাস করে না। না, তোমাকে খোশামোদ করে গলানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এ্যাডাম তীব্র কণ্ঠে বললো, অন্ততঃ তাঁর পক্ষে নয়।

আমি বললাম, কারো পক্ষেই নয়। আর তিনি সেটা জানেন।

তাহলে? কি তাঁর উদ্দেশ্য? তিনি কি মনে করেন যে আমি —

আমি বললাম, অন্য কিছু ভাবো।

ও জীর্ণ সবুজ কার্পেটের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো, মাথা সামনে ঈষৎ ঝোঁকানো, তার সুন্দর বিমূর্ত নীল চোখে সামান্য একটু ছায়া, সন্দেহ কিংবা অস্থিরতার নয়, শুধু একটা প্রশ্নের ছায়া, একটু যেন বিমূঢ় সে।

তবু কিছুটা তো এগুনো গেলো। বেশি নয়, কিন্তু কিছু তো বটে। চিবুকের বাঁয়ে প্রচণ্ড ঘুষি নয়, পা টলে যাবে না এর ফলে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে না। নাকের উপর একটু লেগেছে, দস্তানার শক্ত দিক দিয়ে একটু ছড়ে গেছে। মারাত্মক কিছু নয়, একটুক্ষণের জন্য শুধু থামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একটু সুবিধা তো অবশ্যই পাওয়া গেছে। এখনই চাপ দিতে হবে।

অতএব আমি আবার বললাম, অন্য কিছু ভাবো।

ও জবাব দিলো না, আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো, চোখের ওপর ছায়াটা আরেকটু গাঢ় হলো, যেন নীল জলের উপর দিয়ে হঠাৎ একখণ্ড মেঘ ভেসে গেলো।

এবার আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি বলছি, তিনি জানেন যে তোমার চাইতে ভালো কেউ নেই কিন্তু তুমি এ থেকে কোনো ফয়দা ওঠাও না। অতএব এটা

পরিষ্কার যে তুমি টাকাপয়সা চাও না, চাইলে তোমার পেশায় নিয়োজিত অন্যরা রোগীদের কাছ থেকে যেরকম ফী নেয় তুমিও সেই রকম ফী নিতে অথবা তোমার রোজগার করা টাকাপয়সা তুমি আঁকড়ে ধরে থাকতে। তুমি স্ফূর্তি বা আমোদ-আহ্লাদ করতে চাও না, চাইলে সহজেই তা করতে পারতে, কারণ তুমি বিখ্যাত লোক, তুলনামূলকভাবে কম-বয়েসী, পঙ্গু নও। তুমি আরাম-আয়েশ চাও না, চাইলে এমন দিন-মজুরের মতো সারাক্ষণ খাটতে না, বস্তির মতো এই রকম জায়গায় বাস করতে না। কিন্তু তুমি কি চাও সেটা তিনি জানেন।

তিনি দিতে পারেন এমন কিছুই আমি চাই না।

তুমি কি ঠিক জানো, এ্যাডাম? ঠিক জানো?

কি বলতে চাও তুমি? ওর গাল লাল হয়ে ওঠে।

আমি আবার বললাম, তিনি জানেন তুমি কি চাও। আমি তোমাকে সেটা এক কথায় বলতে পারি।

কি?

তুমি ভালো করতে চাও।

এবার ওর মুখে আর কথা সরলো না। তার মুখ হা হয়ে গেলো, যেন জলের জন্য মাছ খাবি খাচ্ছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই। তিনি তোমার গোপন কথাটা জানেন।

আবার তীব্র কণ্ঠে সে বলতে শুরু করলো, আমি বুঝতে পারছি না —

ওর কথার মাঝখানে আমি বাধা দিয়ে বললাম, শান্ত হও। এর মধ্যে কলঙ্কের কিছু নেই। শুধু একটা ক্ষ্যাপামি, ব্যস। কাউকে অসুস্থ দেখলেই তোমাকে তার চিকিৎসা করতে হবে। কারো হাত বা পা ভেঙে গেছে, তোমার তখুনি ইচ্ছা হবে সেটা ঠিক করে দিতে। কারো দেহের অভ্যন্তরে কিছু পচে গেছে, ব্যস, তৎক্ষণাৎ তোমার শক্তিশালী, শুভ্র, সুন্দর, সুশিক্ষিত আঙ্গুল হাতে ছুরি তুলে নেবার জন্য নিসপিস করে উঠবে, সেটা কেটে বাদ না দেয়া পর্যন্ত তুমি স্বস্তি পাবে না, বন্ধু। কিংবা এটা হয়তো তোমার নিজেরই বাধানো একটা মহা-অসুখ।

ও রুষ্ট কণ্ঠে বললো, পৃথিবীতে অনেক মানুষই অসুস্থ, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না —

আমি সহাস্যে বললাম, ব্যথা হচ্ছে কু, অশুভ।

ও বললো, ব্যথা হচ্ছে 'একটা' অশুভ জিনিস কিন্তু ব্যথা অশুভ নয় — স্বতঃসিদ্ধভাবে নিজে অশুভ নয়। ও আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলো, আমার দিকে তাকালো এমনভাবে যেন আমি ওর মহাশত্রু।

আমি কড়া গলায় পাল্টা জবাব দিলাম, আমার যখন দাঁতব্যথা শুরু হয় তখন আর এই জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হই না। তবে, কথা হলো, তুমি যা তুমি তাই। আর কর্তা — আমি সূক্ষ্মভাবে কর্তা কথাটার ওপর জোর দিলাম — জানেন তুমি কি চাও। তোমার দুর্বলতা কোথায় তা তিনি জানেন, বন্ধু। তুমি ভালো করতে চাও, আর তুমি যেন প্রচুর প্রচুর ভালো করতে পারো সেই সুযোগ তিনি তোমার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন।

ভালো? ও তার দীর্ঘ পাৎলা উপরের ঠোঁটটা হিংস্রভাবে বাঁকালো। ভালো? তিনি যেখানে আছেন সেটা ভালো শব্দটি উচ্চারণ করার মতো উপযুক্ত জায়গা বটে!

তাই?

উপযুক্ত আবহাওয়া না পেলে একটা জিনিস গড়ে ওঠে না, এবং ওই ভদ্রলোক কি রকম আবহাওয়া তৈরি করেন তা তুমি জানো। কিংবা জানা উচিত।

আমি কাঁধ কুঁচকালাম। বললাম, কোনো জিনিস যদি ভালো হয় তবে তা নিজের কারণেই ভালো হয়। একটা লোক কামনা–তাড়িত হয়ে একটি সনেট লিখলো, এখন তার কবিতাটি যদি সত্যি সত্যি ভালো হয়, অবশ্য সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, কিন্তু যদি হয়, তাহলে তার কামনা–জাগানো মেয়েটি অপর এক জনের বিবাহিতা স্ত্রী সেই কারণে কি কবিতাটি খারাপ হয়ে যাবে, তার কামনা লোকে যাকে বলে অবৈধ, সেই জন্য? গোলাপ কি কম গোলাপ হয়ে উঠবে কারণ —

ও বললো, তোমার এসব উক্তি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তো ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো যে আমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছি। আজ থেকে হাজার বছর আগে, আমরা যখন ছোট ছিলাম, যখন সারা রাত আমরা তর্ক করেছি, যখন কোনো একটা বিষয়ে আমি তোমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছি, তখনও সব সময় তুমি এই কথাই বলতে। কি সব বিষয় নিয়ে আমরা তর্ক করেছি! একজন প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধা কি একজন প্রথম শ্রেণীর কুস্তিগীরকে হারাতে পারে? একটা সিংহ কি পারে একটা বাঘকে নাজেহাল করতে? কীটস কি শেলীর চাইতে বড়ো কবি? সত্য, সুন্দর, মঙ্গল। ঈশ্বর বলে কেউ কি আছেন? সারা রাত ধরে আমরা তর্ক করেছি, আর সব সময় আমি জিতেছি, কিন্তু তুমি — তুমি হারামজাদা — আমি ওর পিঠে চাপড় মেরে বললাম, তুমি সব সময় বলেছো যে আমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছি, আমার ওসব যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু জ্যাকি খোকা কখনো অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে না। সে

নিরর্থক কথাও বলে না। আর — আমি ঘুরে তাকালাম, আমার হ্যাট আর কোট হাতে তুলে নিয়ে বললাম, এবার আমি যাচ্ছি। যে কথাগুলো বললাম তুমি সেগুলো নিয়ে একটু ভেবে —

কী মারাত্মক কথাই না তুমি বলেছো ! কিন্তু এখন তার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত, কারণ এখন সে আবার আমার যৌবনের বন্ধু।

কিন্তু আমি এখন ওর মন্তব্যকে উপেক্ষা করে বললাম, শোনো, তুমি বলতে পারবে না যে আমি আর কর্তা তোমার সামনে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার করে তুলে ধরি নি। কিন্তু আর নয়, আমাকে এবার উঠতে হবে। আমি মাঝরাতের ট্রেনে মেমফিস যাচ্ছি, সেখানে এক মিডিয়ামের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে।

মিডিয়ামের সঙ্গে? ও প্রতিধ্বনি করলো।

হ্যাঁ। মিস লিটলপাফ নাম্নী একজন সুদক্ষ মিডিয়াম। সে এই ভুবনের ওপার থেকে আমার জন্য বাণী এনে দেবে যে কর্তা তাঁর হাসপাতালের পরিচালক পদের জন্য স্ট্যান্টন নামক একজন বিখ্যাত সুদর্শন হারামজাদাকে পেতে যাচ্ছেন।

এই কথা বলেই আমি সশব্দে দরজা বন্ধ করে প্রায় ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেলাম। এটা ছিলো সেই ধরনের এ্যাপার্টমেন্ট ভবন যেখানে বাল্ব খারাপ হয়ে গেলে কেউ সেটাকে বদলে সেখানে নতুন বাল্ব লাগায় না, সিঁড়ির মাঝ–পথে বাচ্চার খেলনা গাড়ি পড়ে থাকে, যার কার্পেটের অবস্থা জরাজীর্ণ, আর বাতাসে কুকুর, বাচ্চাদের কাপড়, বাঁধাকপি, বৃদ্ধ মহিলা, পোড়া চর্বি আর মানুষের অন্তহীন নিয়তির একটা ভ্যাপসা ভেজা–ভেজা গন্ধ বিরাজ করে।

আমি অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুরে মুখ তুলে দালানটির দিকে তাকালাম। খোলা জানালা–পথে একজন ভারী দেহ টাক–মাথা মানুষকে দেখা গেলো, শার্ট গায়ে, ছোট্ট খাবার টেবিলে ক্লান্তভাবে গা এলিয়ে বসে আছে, যেন চেয়ারের উপর পড়ে থাকা একটা বস্তা, তার কনুইর কাছে একটি শিশু দাঁড়িয়ে তার জামা ধরে টানছে, আর বিবর্ণ ঢোলা পোশাক পরিহিতা এক রমণী, অবিন্যস্ত খোলা চুল, ধোঁয়া ওঠা একটা সসপ্যান সোজা উনুন থেকে এনে লোকটির সামনে রাখছে, কারণ সারাদিন খাটুনির পর বাবা রাত করে বাড়ি ফিরেছেন, চিরাচরিতভাবে তার পায়ের আঙুল টন টন করছে, বাড়িভাড়া বাকী পড়েছে, জনির জন্য জুতো কিনতে হবে, সুসির পরীক্ষার ফল ভালো হয় নি, আর সুসি পাশে দাঁড়িয়ে তার জামা ধরে টানছে, ওর নির্বোধ দুটি চোখ মেলে রেখেছে বাবার মুখের উপর, ওর এডিনয়েডের মধ্য দিয়ে সশব্দে সে শ্বাস নিচ্ছে, আর দেয়ালে ম্যাক্সফিল্ড প্যারিশের আঁকা ছবিটা বাঁকা

হয়ে লাগানো, ছাদ থেকে ঝুলন্ত ঢাকনাহীন বাল্বের কড়া আলোয় ছবির নীল রঙের মধ্যে এখন এসে মিশেছে একটা হিংস্র বন্য তামাটে আভা। ভবনের অন্য কোনো অংশে কুকুর ডেকে উঠলো, অন্য আর কোনো খান থেকে একটি শিশুর একটানা কান্নার শব্দ ভেসে এলো। এবং এই হলো জীবন আর এ্যাডাম স্ট্যান্টন বাস করে এই জীবনের একেবারে মাঝখানে, এর যতো কাছে সম্ভব ততো কাছে সরে এসে। জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে সে বুকে টেনে নেয় বাঁধাকপির গন্ধ, মাঝ–সিঁড়িতে পড়ে থাকা ছোট ছেলের খেলনা গাড়িতে হোঁচট খায়, হল–ঘরে সাক্ষাৎ লাভ করা সদ্য–বিবাহিত গাম–চিবুনো, পরস্পরের হাতধরা, তরুণ দম্পতিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে, পাৎলা পার্টিশানের আড়ালে বৃদ্ধা মহিলা যেসব শব্দ করেন, যিনি এবার গ্রীষ্ম শুরু হবার আগেই মারা যাবেন (ক্যান্সার, আমাকে বলেছে এ্যাডাম), সেই সব শব্দ শোনে, নিজে বইপুঁথি আর পুরানো চেয়ার–টেবিলের মধ্যে রঙচটা সবুজ কার্পেটের উপর পায়চারি করে। সে জীবনের খুব কাছে সরে এসেছে, হয়তো গরম থাকার জন্যে, উষ্ণতার লোভে, কারণ তার নিজের জীবন বলে কিছু ছিলো না — শুধু তার অফিস, তার ছুরি, তার তপস্বীর মতো ঘর। কিংবা সে হয়তো উষ্ণতার জন্য জীবনের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে আসে নি। সে হয়তো নাড়ীতে হাত রেখে জীবনের উপর ঝুঁকে বসেছে, তার গাঢ় বিমূর্ত নীল চিকিৎসকের চোখ মেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছে, সে–চোখ ঈষৎ ছায়াচ্ছন্ন, সে ঝুঁকে আছে, মুখের মধ্যে একটা বড়ি কিংবা এক চামচ ওষুধ ঢেলে দেবার জন্য তৈরি, কিংবা ছুরি ধরবার জন্য প্রস্তুত। কিংবা যা সে করছে তার একটা কারণ দাঁড় করাবার জন্যই সে এই জীবনের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এসেছে। যা সে করছে তাই যেন জীবন হয়ে ওঠে সেই জন্য। মানুষ যে প্রযুক্তিগত নৈপুণ্য আয়ত্ত করেছে, সকল প্রাণীর মধ্যে সে–ই যে অসামান্য নিপুণ হাতের অধিকারী, শুধু সেই সত্যটি সানন্দে প্রয়োগ করার জন্য নয়।

এটা অবশ্য বাজে কথা, কারণ যেভাবে আপনি বেঁচে থাকেন তাই জীবন। যখন আপনার পুরানো দিনের কোনো স্কুল–কলেজের সাথীর সঙ্গে দেখা হয় আর সে বলে ওঠে, জানো, কঙ্গো নদীপথ ধরে আমাদের শেষ অভিযানে যাবার সময়, কিংবা আরেক জন যখন বলে, জানো, আমার বউটা ভারী লক্ষ্মী, আর বাচ্চা তিনটা যে এতো মিষ্টি, তখন আপনার সে কথাটা মনে রাখা উচিত। যখন আপনি হোটেলের লবিতে বসে থাকেন, কিংবা পানশালায় সুরা পরিবেশনকারীর সঙ্গে গল্প করার জন্য ঝুঁকে দাঁড়ান, কিংবা মার্চের শুরুর দিকে রাত্রিবেলায় একটা অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলোকোজ্জ্বল এক জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন তখন সে কথা আপনার অবশ্যই মনে করা দরকার। এবং আপনার মনে পড়বে ছোট্ট সুসির কথা, যার

এডিনয়েড আছে, আর রুটিটা সম্ভবতঃ পুড়ে গেছে, এবং আপনি ঘুরে এগিয়ে যাবেন রাস্তা ধরে, কারণ সময় হয়ে গেছে এবার, আমার ছড়িটা এগিয়ে দিতে হবে, আমাকে মাঝরাতের ট্রেনটা ধরতে হবে, কারণ আমার সব পাপ ধুয়ে মুছে গেছে। কারণ যেভাবে আপনি বেঁচে থাকেন তাই জীবন।

আমি ঘুরে দাঁড়াতেই দালানের উপরের দিক থেকে ঝড়ের মতো সঙ্গীতের সুরমূর্চ্ছনা ঝরে পড়লো, শিশুর কান্নার শব্দ ছাপিয়ে, সুরের তরঙ্গাভিঘাতে রাস্তার বাঁধানো ইটসুরকি পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠছিলো। এ্যাডামের পিয়ানোর শব্দ।

আমি মেমফিসের ট্রেন ধরলাম, তিনদিন কাটালাম সেখানে, মিস লিটলপাফের মাধ্যমে পরপারের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অধিবেশন করলাম, তারপর ফিরে এলাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম কয়েকটা ফটোস্ট্যাট আর একটা এফিডেভিট। আমার ব্রিফকেসে করে।

ফিরেই আমার বাকেস আমি আহ্বানটা পেলাম। এ্যানের নম্বর, তারপরই তারের মধ্য দিয়ে এ্যানের কণ্ঠস্বর, আর সবসময় যেমন হয় তাই হলো, আমার বুকের ভেতর মৃদু লাফালাফি শুরু হয়ে গেলো, যেন একটা শাপলা–পুকুরে ব্যাঙ লাফ দিয়ে পড়েছে, আর তার ফলে ছোট ছোট অজস্র ঢেউএর মালা ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে।

সে বলছিলো আমার সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে। খুব দরকার। আমি জানালাম যে সে তার বাকী জীবনভর আমাকে দেখতে পারে, ইচ্ছা করলেই, কিন্তু সে ওই ছোট্ট ঠাট্টাকে উপেক্ষা করলো, নিঃসন্দেহে তাই ওটার পাওনা ছিলো। এ্যান বললো যে সে এখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি যখন ক্রেসেন্ট কোভের কথা বললাম সে রাজী হলো। ক্রেসেন্ট কোভ হলো স্লেডের জায়গা।

আমি প্রথমে এসে পৌঁছাই এবং খোদ স্লেডের সঙ্গে বসে এক পাত্র পান করি। চারদিকে কোমল আলো, মধুর সঙ্গীত, ক্রোমিয়ামের ঔজ্জ্বল্য। স্লেডের হাতীর দাঁতের মতো হলুদ–সাদা বুলেট–মাথার দিকে আমি তাকালাম, লক্ষ করলাম তার দর্জি দিয়ে তৈরি দামী পোশাক, ক্যাশ রেজিস্টারে বসা রাণীর মতো স্বর্ণকেশী তরুণী, আর সতৃষ্ণভাবে আমার মনে পড়লো বহু দিন আগের সুরাপান নিষিদ্ধ যুগের একটি সকালের কথা, তার ছোট্ট খেলো পেছনের ঘরে স্লেড বসে আছে, তখন তার মাথায় বেশ চুল ছিলো কিন্তু পকেটে কোনো পয়সা ছিলো না, গ্রামাঞ্চল থেকে আসা কাজিন উইলিকে ডাফি জোর করে বীয়ার খাওয়াবে, কিন্তু স্লেড ডাফির মতলব সমর্থন করে নি, তাকে সাহায্য সহযোগিতা দিতে অস্বীকার করে সে, আর ওই কাজিনই হলো উইলি স্টার্ক, সে দিন যে শুধুমাত্র কমলা লেবুর পানীয় খেয়েছিলো।

স্লেডের ওই আচরণই তাকে চিরদিনের জন্য বানিয়ে দিয়েছিলো। তো আমি তার সঙ্গে বসে একপাত্র খেলাম আজ, আর অবাক হয়ে মনে মনে ভাবলাম, সত্যি, একটা মানুষকে ডুবে যেতে কিংবা বেঁচে উঠতে হলে কতো সামান্য জিনিসেরই দরকার হয়।

আমি মুখ তুলে পানশালার আয়নার দিকে তাকালাম, এ্যান স্ট্যান্টনকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখলাম। বরং বলা যায়, তার প্রতিমাকে দেখলাম দরজার প্রতিমার মধ্য দিয়ে ঢুকতে। কারণ আমি তক্ষুণি বাস্তবের মুখোমুখি হতে চাই নি। আমি তার প্রতিমূর্তি দেখলাম আয়নায়, আমার মনের বরফে যা একটা স্মৃতির মতো বন্দী হয়ে আছে — শীতের সময় কোনো জমাটবাঁধা স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর বুকে আপনি নিশ্চয়ই উজ্জ্বল পরিষ্কার সোনালী–লাল পাতাকে শক্ত হয়ে গেঁথে থাকতে দেখেছেন, আর এখন হঠাৎ আপনার মনে হয় সেই সময়ের কথা যখন এই উজ্জ্বল সোনালী–লাল পাতা, একটা জলসার মতো, গাছের ডালে ডালে ঝলমল করছিলো, আর তার উপর সূর্যালোক এমন অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছিলো যে মনে হচ্ছিলো তা যেন আর কোনোদিন ফুরাবে না। কিন্তু না, এটা স্মৃতি নয়, স্বয়ং এ্যান স্ট্যান্টন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, আয়নাওয়ালা ঠাণ্ডা ঘরটিতে, বারের সামনে উজ্জ্বল রঙের নানা বোতলের ব্যারিকেড, সে দাঁড়িয়ে আছে নীল কার্পেটের উপর, একটু দূরে, একটি তরুণী, না, এখন আর ঠিক তরুণী নয়, যুবতী, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, সুন্দর চঞ্চল পদযুগল, ছোট কিন্তু এমন সুডৌল নিতম্ব যেন লেদ–মেশিনে তৈরি, সরু কোমর, আপনার হাতের বেষ্টনীর মধ্যে আসবে কিনা সেই ভাবনা জেগে ওঠে আপনার মনে, আর এই সবকিছু আচ্ছাদিত একটা ধূসর ফ্ল্যানেলের পোশাকে, যা আপাতদৃষ্টিতে পুরুষালী ঢং–এ তৈরি কিন্তু আসলে যা চিৎকার করে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছে ভেতরকার একান্ত অপুরুষালী কিছু ব্যবস্থাদির প্রতি।

ও দাঁড়িয়ে আছে, এখনো নীল কার্পেটের উপর অধৈর্য পা ঠুকবার জন্য প্রস্তুত নয়, হাল্কা–নীল ফেল্ট হ্যাট মাথায়, তার শান্ত মসৃণ মুখ ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ লক্ষ করছে। মুখ ঘোরাবার সময় আমি তার চোখের নীলের ক্ষণিক দ্যুতি দেখলাম আয়নার মধ্যে।

তারপর আমার পৃষ্ঠদেশ দেখতে পেলো সে। বারে বসে আছি আমি। দেখেই সে আমার দিকে এগিয়ে এলো, কিন্তু আমি ফিরে তাকালাম না। আয়নাতেও ওর চোখে চোখ রাখলাম না। আমার একেবারে কাছে এসে ও ডাকলো, জ্যাক।

আমি তখনো তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে স্লেডকে উদ্দেশ করে বললাম, স্লেড, দ্যাখো তো, এই অচেনা মহিলা সারাক্ষণ আমার পেছন পেছন ঘুরছেন। আমার

ধারণা ছিলো তোমার এই জায়গাটা একটা ভদ্র জায়গা, কিন্তু একী? এখন কি করবে বলো।

স্লেড সঙ্গে সঙ্গে অচেনা মহিলাটির দিকে ঘুরে তাকিয়েছিলো। এদিকে মহিলার মুখ তখন খড়িমাটির মতো সাদা হয়ে গেছে, তার চোখ দুটি থেকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরুচ্ছে। স্লেড বললো, এই যে ভদ্রে, দেখুন —

আর তক্ষুণি মহিলা তার পক্ষাঘাতের আক্রমণ থেকে মুক্ত হলেন, তার আড়ষ্ট জিহ্বা প্রাণ পেলো, প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে তার গাল লাল হলো। তিনি তীব্র কণ্ঠে বললেন, জ্যাক বার্ডেন! তুমি যদি —

স্লেড বলে উঠলো, উনি তোমার নাম জানেন।

আমি এবার ঘুরে বসে বাস্তবতার মুখোমুখি হলাম, এটা এখন আর মনের বরফে ধৃত কোনো স্মৃতি নয়, এ একটা উদ্দীপ্ত, বাঘিনীর মতো, মারাত্মক বিদ্যুৎ-জাতীয় কিছু, এখনই যা বিস্ফোরিত হবে। আমি বললাম, আরে, এ যে দেখছি আমার বাগদত্তা। স্লেড, এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন এ্যান স্ট্যান্টন। আমরা শিগগীরই বিয়ে করছি।

স্লেড বললো, তাই নাকি? শুনে খুশি হলাম। ওর মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। সম্পূর্ণ নির্বিকার এবং অচঞ্চল।

আমি জানালাম, দু'হাজার পঞ্চাশ সালে আমাদের বিয়ে হচ্ছে, সেটা হবে মধুর গ্রীষ্মকালীন জুন মাসের বিবাহ উৎসব, সঙ্গে থাকবে —

তার আগে এখনই হবে শীতকালীন মার্চ মাসের হত্যাযজ্ঞ। কথাটা বলেই কিন্তু এ্যান হেসে ফেললো, তার গালের ক্রুদ্ধ রক্তোচ্ছ্বাস স্তিমিত হলো, আর করমর্দনের জন্য সে তার হাত বাড়িয়ে দিলো স্লেডের দিকে।

স্লেড বললো, পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, অবশ্য তার মুখ তখনো কাঠের মূর্তির মতো, যদিও এ্যানের পোশাকের আভিজাত্য তার নজর এড়ায় নি। সে বললো, একটু কিছু পান করুন, কেমন?

ধন্যবাদ। এ্যান একটা মার্টিনির কথা বললো।

পানপাত্রটি শেষ করে এ্যান বললো, জ্যাক, এবার আমাদের যেতে হবে। ও স্লেডকে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। নিওন বাতি, পেট্রলের ধোঁয়া, কফির গন্ধ আর ট্যাক্সির হর্নে ভরপুর রাত্রির কোলে।

পথে নেমে ও বললো, অদ্ভুত রসবোধ তোমার!

আমি তার মন্তব্যকে পাশ কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

এমন বাহাদুর তুমি!

আমরা যাচ্ছি কোথায়?

তোমার কি কোনোদিন বয়স হবে না?

আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ছোট রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। পানশালা, শস্তা খাবার দোকান, খবরের কাগজের স্টল, ফুল বিক্রী করা বৃদ্ধা মহিলা — এদের পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। আমি কিছু ফুল কিনে এ্যানের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, আমি হয়তো খানিকটা বাহাদুরই, কিন্তু সেটা শুধু সময় কাটাবার একটা পন্থা।

পানশালাগুলির দরজা দিয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে আসা ও প্রবেশ করা লোকজন আর পথের ভীড়ের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে আমরা আরো খানিকটা দূর পর্যন্ত হাঁটলাম।

আমরা যাচ্ছি কোথায়?

এ্যান বললো, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা বলা দরকার, নইলে তোমার সঙ্গে আমি কোনো জায়গাতেই যেতাম না, কোথাও না।

আমরা আরেক বৃদ্ধা ফুলওয়ালীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, অতএব আমি আবার কিছু ফুল তুলে নিলাম, বৃদ্ধাকে দাম দিলাম, তারপর ফুলগুলি এ্যান স্ট্যান্টনের হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, তুমি যদি ভদ্র হতে না পারো তবে এই জঞ্জালগুলির ভার চাপিয়েই আমি তোমার শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলবো।

ও হাসতে হাসতে বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ভালো হবো। আমার বাহু জড়িয়ে, আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে, এ্যান হাঁটতে শুরু করলো, খালি হাত দিয়ে ফুলগুলি ধরে থাকলো, আর ব্যাগটা চেপে রাখলো কনুই দিয়ে।

আমরা কোনো কথা না বলে পায়ের তাল মিলিয়ে খানিকক্ষণ হাঁটলাম। আমি চোখ নিচু করে তাকাতেই তার পায়ের গতিভঙ্গি দেখতে পেলাম, এক-দুই, এক-দুই। কালো সুয়েডের জুতো পরনে, রুক্ষ কঠিন দেখতে, খুব পুরুষালী, কর্তৃত্বের সঙ্গে শব্দ তুলে সে হাঁটছে, কিন্তু ছোট জুতো আর পায়ের সুন্দর গুল্‌ফ, এক-দুই, এক-দুই, কেমন যেন একটা মোহ বিস্তার করে চলেছে।

তারপর আমি বললাম, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

ও বললো, হাঁটবো আমরা। শুধু হাঁটবো। আমার খুব অস্থির লাগছে। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবো না।

আমরা হাঁটতে থাকলাম, নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম।

ও বললো, তোমার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে।

তো বলো। সুর তোলো। ঝুলি খোলো।

গম্ভীর গলায় ও বললো, এখন না। ও আমার মুখের দিকে তাকালো। রাস্তার আলোয় ওর মুখ দেখালো চিন্তাশীল, এমন কি দুর্ভাবনা-পীড়িত। ভারী মসৃণ মুখ, আশ্চর্য, নিখুঁত হাড়ের কাঠামোর উপর দিয়ে ত্বককে যেন বেদনাদায়কভাবে টান টান করে রাখা হয়েছে। ওই মুখে বাড়তি কিছু নেই আর, সব সময় যেমন থাকে তেমনি, সেখানে উপস্থিত রয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত আবেগের তীব্র দ্যুতি, উপর-স্তরে মসৃণ প্রশান্তি কিন্তু ভেতরে প্রচণ্ড প্রগাঢ়তা, কাঁচ-ঢাকা অগ্নিশিখার মতো। কিন্তু এখন, আমি লক্ষ করলাম, ওই প্রগাঢ়তার মাত্রা সাধারণ অবস্থার চাইতে একটু বেশি। আমার মনে হলো সল্‌তেটা যদি একটু বাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কাঁচটা চড়চড় করে ফেটে যাবে।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আরো কয়েক পা হাঁটলাম আমরা। একটু পরে ও বললো, পরে। এখন শুধু হাঁটো।

অতএব আমরা হাঁটলাম। যেসব রাস্তায় পানশালা, বিলিয়ার্ড ক্লাবঘর আর রেস্তোঁরা সেসব রাস্তা ছেড়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। গানের শব্দ, তীব্র উচ্ছল অথবা মৃদু করুণ সঙ্গীতধ্বনি, এখন পেছনে পড়ে রয়েছে। একটা অন্ধকার এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে আমরা অগ্রসর হলাম। দুটি ছেলে পাশের বাড়িগুলির দেয়াল ঘেঁষে বিলের পাখির মতো থেমে থেমে এক ধরনের বিষণ্ন আওয়াজ করতে করতে ছুটে গেলো। এখানে সব বাড়িতে জানালাগুলির খড়খড়ি নামানো, দু'একটার মাঝ দিয়ে এক চিলতা আলো বেরিয়ে আসছে, কিংবা ভেতরের অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠস্বরের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পরে, বসন্ত কালে, যখন আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে, তখন সন্ধ্যার দিকে বাইরে মানুষ দেখা যাবে, রাস্তার ধারে, কিংবা বারান্দার রকে, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে, এবং কখনো কখনো, রাস্তা দিয়ে কোনো পুরুষ মানুষকে হেঁটে যেতে দেখলে মেয়েদের কেউ আলাপচারিতার ভঙ্গিতে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, ও নাগর, চাও নাকি? কারণ এই এলাকা হলো সংসার সীমান্ত এলাকা, এর কয়েকটা বাড়ি বারাঙ্গণাদের বাড়ি। কিন্তু এই ঋতুতে, রাত্রিবেলায়, এই এলাকার বাড়িগুলিতে যে-জীবনই চলতে থাকুক, ভালো জীবন কিংবা মন্দ জীবন, এখন তা স্যাৎস্যাঁতে, ঝুরঝুর করে ঝরে পড়া আর চিলতে ওঠা ইটকাঠের বাড়িগুলির ভেতরে স্তিমিত হয়ে গুটিয়ে আছে। আজ থেকে এক মাস পরে, এপ্রিলের গোড়ার দিকে, এই অবস্থা পাল্টে যাবে। তখন দূরে, শহরের বাইরের সব খাল বিল নালা জলাভূমির প্রতিটি ইঞ্চি কচুরিপানার বর্ণাঢ্য ফুলের সম্ভারে ছেয়ে যাবে, মরমীয়া-বেগুনী থেকে অশ্লীল লাল, প্রবল পরাক্রান্ত, অমার্জিত, মাংসল, কঠিন, কালো জলের উপর টুঁটি টিপে ধরা উজ্জ্বল পুষ্পরাশির বিশাল বিস্তার, আর প্রবীণ সাইপ্রেস গাছগুলিতে কুমারী-

কন্যার স্বপ্নের মতো হৃদয় গুঁড়িয়ে দেয়া যে আবছা হাল্কা সবুজের প্রথম আভাস জেগে উঠেছিলো সেখানে স্থিতু হয়ে এখন পাতা গজাতে শুরু করবে, আর জলাভূমি থেকে কাদা রঙের চটচটে মোটা মোটা সাপ মহাসড়কে উঠে এসে রাস্তা পার হতে চেষ্টা করবে, আপনার গাড়ির সামনের চাকা তার উপরে গিয়ে পড়বে, একটা খর্‌শ্‌ শব্দ হবে, ফেন্ডারের নিচের দিকে জড়িয়ে যাবার পর থপ্‌ করে একটা ছোট্ট শব্দ উঠবে, আর জলাভূমির মধ্য থেকে অজস্র পোকামাকড়ের ঝাঁক উড়ে আসতে থাকবে, সমস্ত বাতাস রাত দিন তাদের নিরন্তর গুঞ্জনে থরথর করে কাঁপতে থাকবে, যেন একটা বৈদ্যুতিক পাখা চলছে, আর সময়টা যদি রাতের বেলা হয় তাহলে জলাভূমির মধ্য থেকে উঠে আসতে শোনা যাবে প্যাঁচার চিৎকার, প্রেম আর মৃত্যু আর অভিশাপের আর্ত ধ্বনির মতো, আর কোনো একটি প্যাঁচা হয়তো আলকাতরার মতো ঘন অন্ধকারের কোল থেকে হঠাৎ আপনার গাড়ির হেডলাইটের উজ্জ্বল শিখার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, রেডিয়েটরের গায়ে ধাক্কা খাবে, তারপর একটা পালকের বালিশ যেমন কখনো কখনো সশব্দে ফেঁসে যায়, ছিঁড়ে যায়, সেই ভাবে ফেটে যাবে, আর মাঠ আর প্রান্তরগুলি ভরে যাবে দুর্গন্ধময়, রসালো, চটচটে, লোমশ অথবা মসৃণ ঘাসে, আর দলে দলে গরু বাছুর ওই ঘাস প্রচুর পরিমাণে গিলতে থাকবে, কিন্তু কিছুতেই তাদের পাঁজরের হাড়ে মাংস লাগবে না, কারণ ওই ঘাসের জন্ম হয়েছে কালো মাটিতে, আর ওই ঘাসের শিকড় যতো গভীরেই যাক না কেন কালো আঠালো অনুর্বর মাটি ছাড়া অন্য কিছুই সে পাবে না, ঘাসে ক্যালসিয়ামের যোগান দেবার জন্য কোনো পাথরই সেখানে নেই। তো, আজ থেকে এক মাস পরে, এপ্রিলের গোড়ার দিকে, শহরতলী ছাড়িয়ে দূরে যখন এই সব ঘটতে থাকবে তখন এই রাস্তার পুরনো বাড়িগুলোর খোলসের মধ্যে, যে-রাস্তায় এই মুহূর্তে আমি আর এ্যান স্ট্যান্টন হাঁটছিলাম সেখানে, সময়টা যদি রাতের বেলা হয়, যে-জীবন এখন স্তিমিত হয়ে বন্দী আছে তা মুক্তি পেয়ে উদ্দাম উচ্ছলতায় টগবগ করবে, ছিটকে বেরিয়ে আসবে রাস্তায় আর বারান্দার রকে।

কিন্তু এখন এই রাস্তা খালি, আঁধার-আঁধার, ব্লকের শেষ দিকে একটা ল্যাম্পপোস্ট ঝুঁকে আছে, তার আলোয় খোয়া-ওঠা তেল চিটচিটে ইঁট চিকচিক করছে, বাড়ির জানালাগুলির খড়খড়ি নামানো, সমস্ত জিনিসটাই যেন একটা নাটকের সেট। মনে হয়, এখনই আপনি নায়িকাকে দেখতে পাবেন, অলস পায়ে হেঁটে এসে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে সে একটা সিগারেট ধারবে। কিন্তু সে এলো না, তবে আমি আর এ্যান স্ট্যান্টন সোজা সেটের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলাম, আপনি জানেন যে এই সেট কার্ডবোর্ডের তৈরি, কিন্তু হাত বাড়িয়ে স্যাঁতসেঁতে

ইটের স্পর্শ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভুল ভেঙে যাবে। আমরা একটিও কথা না বলে এগিয়ে চললাম। হয়তো এই জন্য যে আপনি যখন কার্ডবোর্ডের তৈরি মঞ্চদৃশ্যের মতো দেখতে একটি জায়গায় নিজেকে আবিষ্কার করেন, এতো অপরূপ একটি জায়গায়, তখন আপনি যাই বলুন না কেন মনে হবে যে আপনি এই রকম কার্ডবোর্ডের তৈরি একটি ভবনের উপর-তলায় বাস করা ঝাঁকড়া-চুলো আঁটো-নিতম্বের লোকটির লেখা সংলাপ উচ্চারণ করছেন, যে লোকটি লিটল থিয়েটারের জন্য একটা নাটক লিখেছে, যার শুরুতেই দেখা যায় নায়িকা অলস পায়ে হেঁটে এসে আঁধার-আঁধার রাস্তায় ঈষৎ ঝুঁকে পড়া ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে। কিন্তু এ্যান স্ট্যান্টন সেই নায়িকা নয়, সে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো না, একটি কথাও বললো না, আর আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এসে পৌঁছুলাম। সেখানে মালগুদামগুলি দাঁড়িয়ে আছে আর জলের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেছে ডক্‌গুলি। রাস্তার আলো পড়ে ডকের ধাতব ছাদ অস্পষ্টভাবে ঝিলমিল করছিলো। ডকের পাইলিংগুলির উপর দিয়ে ঘন কুণ্ডলী পাকানো কুয়াশা ভেসে যাচ্ছিলো, ওই কুয়াশার স্তর মাঝে মাঝে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেলে তার ভেতর দিয়ে চোখে পড়ছিলো মসৃণ নিস্তরঙ্গ মখমলের মতো জলরাশি যা ওই ধাতব ছাদগুলি কিংবা একটা সিন্ধুঘোটকের কালো জলে-ভেজা চিকচিক করা ত্বকের মতোই কালো হয়ে ঝিলমিল করছিলো। কয়েকটা ডকের ওপাশে কালো আকাশের পটভূমিতে মালবাহী জাহাজগুলির বেঁটে বেঁটে মাস্তুল অতি অস্পষ্টভাবে দেখা গেলো। ভাটির দিক থেকে একটা জাহাজের ভেঁপুর শব্দ ভেসে এলো, বিষণ্ন, কান্নাভরা। আমরা ডকগুলির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম, নদীর দিকে তাকালম, জলের উপর এবড়ো-খেবড়ো পেঁজো তুলার মতো কালো কুয়াশার স্তর জমাট বেঁধে আছে, তবে সেই কুয়াশা নদীর বুক ঘেঁষে খুব কাছাকাছি থাকাতে তার উপর দিয়ে দূরের পানে তাকাবার পর আমাদের মনে হচ্ছিলো আমরা যেন রাতের বেলা কোনো পাহাড়ের উপর উঠে এসেছি, নিচের মেঘপুঞ্জের উপর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে মাইলের পর মাইল। দূরে নদীর অপর তীরে কয়েকটা আলো জ্বলতে দেখা গেলো।

আমরা একটা খোলা জেটিতে এসে দাঁড়ালাম। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে এখান থেকেই এক্সকারশানের নৌযানগুলো যাত্রা করে। চাঁদনী রাতে মানুষ ভীড় করে নৌবিহারে যায়। হুড়াহুড়ি, চিৎকার, বাচ্চার কান্না, সুরা আর কোক পান করা ঘর্মাক্ত মানুষের জটলার কথা আমার মনে জাগলো। কিন্তু এখন সেখানে বিয়ের কেকের মতো সাদা বিশাল চাকা লাগানো কোনো জাহাজ দাঁড়িয়ে নেই, নানা রঙের উৎসবমুখর

অবিশ্বাস্য সাজসজ্জা নেই, উগ্র উচ্ছল সুরের কোনো সঙ্গীত নেই, জাহাজের ঘন ঘন বংশীধ্বনি নেই। জায়গাটা এখন কবরের মতো শান্ত আর নিথর. নিশ্চন্দ্র রজনীতে গোবি মরুভূমির মতো ফাঁকা। আমরা জেটির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে রেলিং-এর গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর নদীর ওপর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি মেলে দিলাম।

আমি বললাম, হ্যাঁ, এইবার।

ও কোনো উত্তর দিলো না।

আমি আবার বললাম, এইবার। আমার মনে হয় তুমি কিছু বলবে বলেছিলে।

হ্যাঁ, এ্যাডাম সম্পর্কে।

আমি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, এ্যাডাম সম্পর্কে কি?

তুমি সেটা জানো — খুব ভালো করেই জানো তুমি — তুমি ওর কাছে গিয়েছিলে —

দ্যাখো —– আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার মুখে রক্ত উঠে এসেছে, গলায় ঝাঁঝ লেগেছে — আমি ওর কাছে গিয়ে ওকে একটা প্রস্তাব দিই। ও তো একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, পছন্দ না হলে ও সে-প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। এজন্য আমাকে দোষ দেয়া বৃথা, তাছাড়া —

আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না।

তুমি আমাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলে। কিন্তু এ্যাডাম যদি নিজে মনস্থির করতে না পারে তাহলে আমি তো সে-ভার নিতে পারি না। তুমি আমাকে দুষতে পারো না।

আমি তোমাকে দুষছি না, জ্যাক। তুকি এতো স্পর্শকাতর, জ্যাক। ও রেলিং-এর উপর রাখা আমার বাহু স্পর্শ করলো, কয়েকটা মৃদু চাপড় দিলো, আমার মাথা একটু ঠাণ্ডা হলো যেন, রক্তচাপ খানিকটা কমে গেলো।

আমি বলতে আরম্ভ করলাম, ও যদি ওর নিজের ভার নিজে না নিতে পারে, তাহলে তুমি —

এ্যান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দ্রুত আমাকে বাধা দিয়ে বললো, ও পারে না, সেখানেই তো গণ্ডগোল।

আমি ওকে শুধু একটা প্রস্তাব দিয়েছি, আর তো কিছু করি নি।

তার যে-হাত এতোক্ষণ আমার বাহুর উপর স্নিগ্ধ কোমলভাবে পড়েছিলো, মাঝে মাঝে মৃদু চাপড় দিচ্ছিলো, সেই হাত হঠাৎ এখন শক্ত হয়ে সাঁড়াশীর মতো চেপে বসলো, মনে হলো তার আঙ্গুল যেন মাংস কেটে একেবারে আমার হাড় অবধি

চলে গেছে। আমি চমকে উঠলাম আর চমকের মধ্যেই তাকে নিচু গলায় তীব্র কণ্ঠে প্রায় ফিসফিস করে বলতে শুনলাম, তুমি ওকে কাজটা নেয়াতে পারো।

একটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ও, আমি ওকে —

আবারও সে বাধা দিলো। তোমাকে এটা করতেই হবে। হ্যাঁ, করতেই হবে তোমাকে।

আহ্, কী যে বলো তুমি!

ওই একই ভঙ্গিতে সে আবার বললো, এটা তোমাকে করতেই হবে। আমার মনে হলো তার আঙুলের চাপে এবার বোধহয় আমার হাতের চামড়া ফেটে রক্ত বেরুবে।

আমি বললাম, একটু আগে আমি যে ওকে প্রস্তাবটা দিয়েছি শুধু সেজন্যই তুমি আমাকে প্রচণ্ড বকুনি দিতে যাচ্ছিলে, আর এখন তুমি বলছো যে ও যেন কাজটা গ্রহণ করে আমাকে সে ব্যবস্থা করতেই হবে। ব্যাপারটা কি?

আমি চাই যে ও কাজটা নেয়। আমার বাহুর উপর থেকে তার আঙুল শিথিল হয়ে খসে পড়লো।

তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

আমি আকাশের দিগন্তবিস্তারী অন্ধকারের দিকে এক পলক তাকিয়ে ওর মুখের উপর আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলাম। খুব একটা আলো ছিলো না, ওর মুখটা দেখা যাচ্ছিলো, অস্বাভাবিক সাদা, পাথরের মতো, চোখদুটি যেন জ্বলছে, কিন্তু আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে সে তার মনের কথাই বলছে। আমি এবার ধীরে ধীরে বললাম, তা হলে তুমি গভর্নর স্ট্যান্টনের কন্যা, এ্যাডাম স্ট্যান্টনের ভগ্নী, তুমি চাও যে ও এই কাজটি নিক?

ওকে নিতেই হবে। আমি তার দস্তানা পরা ছোট্ট হাতদুটিকে শক্ত মুঠিতে রেলিংটা আঁকড়ে ধরতে দেখলাম। রেলিংটার জন্য আমার মায়া হলো। সে নদীর বুকে কুণ্ডলীকৃত কুয়াশার কার্পেটের উপর দিয়ে দূরে চোখ মেলে দিলো, যেন পাহাড়ের উপর থেকে মেঘে ঢাকা কালো পৃথিবীর উপর দিয়ে দূরে কোথাও তাকিয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কেন?

সে নদীর দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই জবাব দিলো, আমি এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য ওর ওখানে গিয়েছিলাম। যখন যাই তখনো আমি কাজটা ওর নেয়া উচিত হবে কিনা সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু ওকে দেখার পর এ বিষয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।

ওর কথা আমাকে একটু চকিত ও বিরক্ত করলো, যেন মঞ্চের বাইরে কোনো শব্দ হচ্ছে, কিংবা চোখের কোণ দিয়ে কিছু একটা নজরে পড়েছে, কিংবা আপনার দু'হাত জোড়া, চুলকাতে পারছেন না। ওর কথা আমি ঠিকই শুনেছি, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। অন্য কিছু একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু কি সেটা ধরতে পারছি না। অতএব আমি সেটা উনুনের পেছনে ঠেলে দিয়ে ওর কথায় মনোনিবেশ করলাম।

এ্যান তখন বলছিলো, ওর অবস্থা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। নির্ভুলভাবে। ওহ্, জ্যাক, ও ভীষণ চঞ্চল ও অস্থির হয়েছিলো, কাজটা যে ওকে নিতে বলা হয়েছে শুধু সেই জন্যই। এটা স্বাভাবিক নয়, জ্যাক। ও সব কিছু থেকে, সব মানুষ থেকে, নিজেক বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। এমন কি আমার কাছ থেকেও। না, ঠিক তা নয়, কিন্তু আগে যেমন ছিলো তেমন আর নেই।

আমি দুর্বল গলায় আপত্তি করলাম, ও ভীষণ ব্যস্ত।

এ্যান প্রতিধ্বনি করে উঠলো, ব্যস্ত — ব্যস্ত — হ্যাঁ, ও ব্যস্ত। যেদিন মেডিক্যাল স্কুলে ঢুকেছে সেদিন থেকেই ও ক্রীতদাসের মতো খেটেছে। কিছু, একটা কিছু, ওকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বিত্ত নয়, খ্যাতি নয়, সেটা যে কী আমি জানি না — ওর গলার স্বর মিলিয়ে গেলো।

আমি বললাম, খুব সোজা। ও ভালো করতে চায়।

আমার কথার প্রতিধ্বনি তুলে এ্যান বললো, ভালো। আমিও তাই ভাবতাম — আহ্, ভালো তো সে করছেই, কিন্তু

কিন্তু কি?

আমি জানি না — আমার একথা বলা উচিত নয় — কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হয় ওর এই সব কাজ — এই ভালো করা — এই সব কিছুই হলো তার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার একটা পথ। এমন কি আমার কাছ থেকেও — আমার কাছ থেকেও -

একটু থেমে ও বললো, ওহ্, জ্যাক, ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেছে আমাদের। সাংঘাতিক কাণ্ড। আমি ঘরে ফিরে সারা রাত কেঁদেছি। আমরা দুজন কি রকম কাছাকাছি তা তো তুমি জানো। জানো না তুমি? জানো না?

আমার বাহু আঁকড়ে ধরে সে ঝাঁকুনি দিলো, যেন ওর কথায় সে আমার সায় আদায় করে নেবেই, ওরা দুজন যে কাছাকাছি আমার মুখ দিয়ে তা বলাবেই।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি জানি।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম, মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো ও বোধহয় কেঁদে ফেলবে, কিন্তু সে কাঁদলো না, আমার বোঝা উচিত ছিলো, ওর মতো মেয়েরা কাঁদে রাত-দুপুরে, বালিশ ভিজিয়ে। যদি কখনো কাঁদে।

এ্যান বলছিলো, আমি ওকে বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে ও যদি ভালো করতে চায়, সত্যিকার ভালো, তাহলে এখনই সময়। আর এখানেই পথ। মেডিক্যাল সেন্টারটা যেন ঠিক মতো পরিচালিত হয় তা দেখা। এমন কি সেটা যেন সম্প্রসারিতও হয় সেটা দেখা। এই জাতীয় সব কিছু। কিন্তু ও পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলো, বললো যে সে ওই জিনিস স্পর্শও করবে না। তখন আমি ওকে স্বার্থপর বলি, স্বার্থপর ও অহঙ্কারী বলে গাল দিই, বলি যে সব কিছুর উপর ও স্থান দিচ্ছে তার অহঙ্কারকে। ভালো করারও উপরে, তার কর্তব্যেরও উপরে। ও আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার কব্জি চেপে ধরেছিলো, বলেছিলো যে আমি কিছু বুঝি না, একটা মানুষের তার নিজের প্রতি দায়িত্ব আছে, সে-সম্পর্কেও তার কিছু কর্তব্য আছে। আমি বলেছিলাম এটা তার অহঙ্কার, নিছক অহঙ্কার, আর সে বলেছিলো যে এটা তার আবর্জনা স্পর্শ না করার অহঙ্কার, আর আমি যদি চাই যে ও আবর্জনা স্পর্শ করুক তা হলে আমি যেন, আমি যেন —

এ্যান হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা নিঃশ্বাস নিলো, আমি বুঝলাম যে সে তার স্নায়ুর উপর নতুন করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো, যেন যা বলতে যাচ্ছিলো তা বলতে পারে। তারপর বললো, তো ও বলতে যাচ্ছিলো যে সেক্ষেত্রে আমি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। কিন্তু কথাটা ও বলে নি। আর সেজন্য আমি সুখী।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললো, হ্যাঁ, ও যে কথাটা উচ্চারণ করে নি সে জন্য আমি আনন্দিত। কথাটা অন্ততঃ মুখ ফুটে ও বলে নি। আমি বললাম, মনে মনেও সে বলে নি।

আমি জানি না, জ্যাক। আমি জানি না। ওর চোখ দুটো যদি তুমি দেখতে। আগুনের মতো জ্বলছিলো, আর মুখ কাগজের মতো সাদা, টান টান। ওহ্, জ্যাক —

আমার বাহু ধরে সে জোরে নাড়া দিলো যেন ওর প্রশ্নের উত্তর আমি ইচ্ছে করে দিচ্ছি না — কেন ও কাজটা নেবে না? ও কেন এই রকম? সে কি বুঝতে পারছে না যে এই দায়িত্ব ওর নেয়া উচিত? সে-ই এর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি, তাকে এই পদটা গ্রহণ করতেই হবে? কেন, জ্যাক? কেন সে এরকম করছে?

আমি বললাম, যদি নিষ্ঠুরভাবে সত্য কথাটা বলি তাহলে এর কারণ সে হলো এ্যাডাম স্ট্যান্টন, গভর্নর স্ট্যান্টনের পুত্র, বিচারপতি পিটন স্ট্যান্টনের পৌত্র, জেনারেল মর্গান স্ট্যান্টনের প্রপৌত্র, সারা জীবন সে এই ধারণা নিয়ে বড়ো হয়েছে যে অনেক অনেক দিন আগে একটা সময় ছিলো যখন সব কিছু পরিচালিত হতো উচ্চ-মনা সুদর্শন ব্যক্তিদের দ্বারা, যাদের পরনে থাকতো ব্রীচেস আর রূপালী বক্‌লস আঁটা জুতো কিংবা গৃহযুদ্ধের সময়কার কন্টিনেন্টাল নীল কোট, কিংবা

তারও আগের হরিণের চামড়ার জ্যাকেট আর পশুর চামড়ার টুপি, তাঁরা টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসে কিসে জনগণের মঙ্গল হবে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে তা ঠিক করতেন। এ্যাডাম স্ট্যান্টন কিন্তু স্নব বা উন্নাসিক নয়। ও একজন রোমান্টিক, ওর মাথার মধ্যে এই পৃথিবীর একটা ছবি আছে, আর যখন ওই পৃথিবীটা তার ছবির সঙ্গে কোনো দিক থেকেই মেলে না তখন সে পৃথিবীটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। যদি তার অর্থ হয়, স্নান শেষে টবের জলের সঙ্গে শিশুটিকেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়া, তবে তাই। একটু থেমে আমি যোগ করলাম, এবং সব সময় এর অর্থ তা-ই হয়।

একথা শুনে সে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থাকলো। আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এ্যান কুয়াশাচ্ছন্ন নদীর উপর দিয়ে তার দৃষ্টি মেলে দিলো, তারপর নিচু গলায় বললো, কাজটা ওর নেয়া উচিত।

যদি সত্যিই তুমি তা চাও তাহলে ওর মাথার মধ্যে পৃথিবীর যে-ছবি আছে তোমাকে সেই ছবিটা বদলাতে হবে। যদি আমি এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে চিনে থাকি।

আর এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে আমি ঠিকই চিনতাম। এই মুহূর্তে আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম, হাড়ের উপর টান টান চামড়া, দৃঢ় মুখ, গাঢ় নীল চোখ, হাল্কা বরফের মতো জ্বলজ্বলে।

সে আমার কথার কোনো জবাব দিলো না।

আমি বললাম, ওটাই একমাত্র পথ। এ বিষয়ে এখনই তুমি সুনিশ্চিত হতে পারো।

নদীর দিকে চোখ রেখে সে আবারো ফিসফিস করে বললো, কাজটা তার নেয়া উচিত।

আচ্ছা, তুমি কতোটুকু চাও যে সে কাজটা নিক?

সে দ্রুত আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, আর আমি ঈষৎ ঝুঁকে তার মুখের দিকে তাকালাম। এ্যান বললো, এতো বেশি করে আমি আর কখনো কোনো জিনিস চাই নি?

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ। তাকে এই কাজটা নিতেই হবে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য। ও আবার আমার বাহু চেপে ধরলো। তার নিজের জন্য। অন্যের জন্য যতোখানি তার নিজের জন্যও ততোখানি। হ্যাঁ, তার নিজেরই জন্য।

তুমি একদম নিশ্চিত?

তীব্র কণ্ঠে সে বললো, হ্যাঁ, একদম নিশ্চিত।

আমি বলতে চাইছি তুমি চাও যে সেই এই কাজটা নিক, এ বিষয়ে কি তুমি একদম নিশ্চিত?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আমি মনোযোগ দিয়ে ওর মুখটা দেখলাম। সুন্দর মুখ — কিংবা সুন্দর যদি নাও হয়, তাহলে সুন্দরের চাইতেও ভালো, একটা অনুভূতিশীল, মসৃণ, বাহুল্যবর্জিত, সুনির্মিত মুখ, ছায়ার মধ্যে, অসম্ভব সাদা দেখাচ্ছে, চোখ দুটিতে কালো আলোর দীপ্তি। আমি মনোযোগ দিয়ে ওর মুখটা দেখলাম, আর সেই মুহূর্তের জন্য শুধু ওই কাজটিই করলাম, সব প্রশ্নটশ্ন ভেসে যেতে দিলাম, কুয়াশা আর নিচের নদীর জলে যেন তা টুপ করে ফেলে দিলাম, যেন স্রোতের তেলতেলে নীরবতার মধ্যে তা নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে পারে।

সে ফিসফিস করে আবার বললো, হ্যাঁ।

কিন্তু আমি খুঁটিয়ে ওর মুখ দেখতেই থাকলাম। এতো বছর পর এই প্রথম বারের মতো আমি যথার্থই তার মুখটা দেখলাম। কোনো একটা জিনিসকে সত্যিকার গভীরভাবে দেখতে পাওয়া যায় শুধুমাত্র সময়ের বাইরে, সব প্রশ্নের বাইরে, একটা মুহূর্তকে ছিনিয়ে এনে।

সে আমার বাহুর উপর হাত রাখলো, এবার হাল্কাভাবে, তারপর ফিসফিস করে বললো, হ্যাঁ।

ওই স্পর্শে আমি যেখানে ডুবে গিয়েছিলাম তার মধ্য থেকে উঠে এলাম।

নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমি বললাম, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কি চাইছো তুমি তা জানো না।

সে বললো, তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি পারবে কিনা তাই বলো।

আমি বললাম, হ্যাঁ, পারবো।

তাহলে — তাহলে তুমি কেন — কেন তুমি এতোক্ষণ —

আমি আস্তে আস্তে বললাম, আমার মনে হয় না — আমার মনে হয় না আমি কখনো এটা করতাম — অন্ততঃ এভাবে — যদি তুমি, তুমি নিজে, আমাকে এমন করে না বলতে।

কিন্তু কিভাবে করবে? আমার বাহুর উপর ওর আঙ্গুল আবার শক্ত হয়ে বসলো।

খুব সোজা। ওর মাথার মধ্যে সে পৃথিবীর যে-ছবিটা নিয়ে ঘোরে আমি সেই ছবিটা বদলে দিতে পারি।

কিভাবে?

আমি ওকে ইতিহাসের একটা পাঠ দিতে পারি।

ইতিহাসের পাঠ?

হ্যাঁ। আমি তো ইতিহাসের ছাত্র, মনে নেই তোমার? আমরা ইতিহাসের ছাত্ররা সব সময় যে কথাটা শিখি তা হলো এই যে মানুষ একটা মহা জটিল যন্ত্র, তারা ভালো অথবা মন্দ নয়, বরং ভালো এবং মন্দ, আর মন্দ থেকেই ভালো বেরিয়ে আসে এবং ভালো থেকে মন্দ। কিন্তু এ্যাডাম স্ট্যান্টন হচ্ছে একজন বিজ্ঞানী, তার অনুভবে সব কিছুই সিজিল-মিছিল, সুবিন্যস্ত, এক অণু অক্সিজেন যখন দুই অণু হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয় তখন তা সর্বদা একই রকম আচরণ করে, তার কাছে কোনো একটা বস্তু সেটা যা ঠিক তাই, এবং সেজন্যই রোমান্টিক এ্যাডাম যখন তার মাথার মধ্যে পৃথিবীর একটা ছবি নির্মাণ করে তখন সে ওই ছবিটাকে বিজ্ঞানী এ্যাডাম যে-পৃথিবী নিয়ে কাজ করে সেই পৃথিবীর মতো করেই গড়ে তোলে। সব সুবিন্যস্ত। সব সিজিল-মিছিল। ভালোর অণু সব সময় একই রকম আচরণ করে। মন্দের অণুও সব সময় একই রকম আচরণ করে চলে। আর —

আহ্, চুপ করো। চুপ করো তুমি। আমাকে আসল কথাটা বলো। যেন সেটা বলতে না হয় সেজন্যই এসব কথা বলছো তুমি। এবার বলো।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তোমার মনে আছে আমি জানতে চেয়েছিলাম বিচারপতি আরউইন কখনো আর্থিক দৈন্যদশায় পড়েছিলেন কিনা। হ্যাঁ, পড়েছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও ধনী ছিলেন না। তিনি শুধু মনে করেছিলেন যে ভদ্রমহিলা ধনী। আর তিনি ঘুষ নিয়েছিলেন।

বিচারপতি আরউইন ঘুষ খেয়েছিলেন?

হ্যাঁ। আর আমি সেটা প্রমাণ করতে পারি।

তিনি ছিলেন বাবার বন্ধু, তিনি — এ্যান চুপ করে গেলো, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নদীর দিকে তাকালো, তারপর এক মুহূর্ত পরে দৃঢ় কণ্ঠে, যেন আমাকে নয়, বরং কুয়াশার ওপারে সমগ্র বিশ্বচরাচরকে উদ্দেশ্য করে বলছে তেমনিভাবে বললো, তো তাতে কিছু প্রমাণিত হয় না। বিচারপতি আরউইন।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমিও অন্ধকার কুণ্ডলীকৃত কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার চোখ না ফেরালেও আমি টের পেলাম যে ও আবার ঘুরে আমার দিকে তাকিয়েছে।

ও বললো, তো একটা কিছু বলো। আমি ওর কণ্ঠস্বরে ওর মনের প্রচণ্ড তোলপাড়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

কিন্তু আমি কোনো কথা বললাম না। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে

থাকলাম। নীরবে অপেক্ষা করতেই থাকলাম। ওই নৈঃশব্দের মধ্যে আমি কুয়াশার ভেতর পাইলিং-এর গায়ে জলের মৃদু ধাক্কার শব্দ শুনতে লাগলাম। তারপর সে বললো, জ্যাক — আমার বাবা — আমার বাবা কি —

আমি চুপ করে রইলাম।

তীব্র কণ্ঠে ও বলে উঠলো, কাপুরুষ কোথাকার। তুমি আমাকে বলবে না।

আমি বললাম, না, বলবো না।

তিনি ঘুষ নিয়েছিলেন? নিয়েছিলেন তিনি?

নিয়েছিলেন? আমার বাহু আঁকড়ে ধরে ও জোরে ঝাঁকুনি দিলো।

না, অতোটা খারাপ নয়।

সে আমাকে অনুকরণ করে ব্যঙ্গভরে বললো, অতোটা খারাপ নয়, অতোটা খারাপ নয়। আমার হাত আঁকড়ে ধরে সে হা হা করে হেসে উঠলো। তারপরই সে হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ওই হাত ঠেলে সরিয়ে দিলো, যেন একটা অশুচি জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, তারপর ঘৃণায় সিঁটিয়ে গেলো. তারপর সে ঘোষণা করলো, আমি একথা বিশ্বাস করি না।

কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলেছি। তিনি আরউইনের ঘটনা জানতেন, এবং তিনি তাঁকে রক্ষা করেছেন। আমি এটা প্রমাণ করতে পারবো। কাগজপত্র আছে আমার কাছে। আমি দুঃখিত, এ্যান, কিন্তু আমি যা বলছি তা সত্য।

দুঃখিত! তুমি দুঃখিত! তুমিই এইসব খুঁড়ে বার করেছো — এই সব মিথ্যার বেসাতি — ওই লোকটার জন্য — ওই স্টার্কের জন্য — ওর জন্য — আর বলছো তুমি দুঃখিত! সে আবার হাসতে শুরু করলো, তারপর আমার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জেটির উপর দিয়ে দৌড়ে গেলো, প্রায় হুমড়ি খেতে খেতে।

আমি ওর পেছন পেছন ছুটলাম।

যখন প্রায় ওকে ধরে ফেলেছি সেই সময় জেটির শেষ প্রান্তে একটা গুদামের অন্ধকার আড়াল থেকে অকস্মাৎ একজন পুলিশ বেরিয়ে এলো। আমাকে লক্ষ্য করে সে বললো, এই, কি হচ্ছে?

আর তক্ষুণি এ্যান হোঁচট খেলো, আমি ওর বাহু ধরতেই সে আমার হাতের বাঁধনের মধ্যে দুলে উঠলো।

পুলিশটি এগিয়ে এসে জানতে চাইলো, কি হয়েছে? তুমি এই মহিলার পেছন পেছন ছুটছো কেন?

আমি দ্রুত উত্তর দিলাম, এই মুহূর্তে ও প্রকৃতিস্থ নয়, সুরাপান করেছে, ঠিক হুঁশ নেই এখন, আমি সামলে রাখছি শুধু, ভয়ানক শক্ পেয়েছে —

রোমশ, বলিষ্ঠদেহ চৌকো গড়নের পুলিশটি সামনে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে এ্যানের মুখের কাছে মুখ এনে গন্ধ শুঁকলো।

আমি বলে গেলাম, খুব শক্ পেয়েছিলো। এতো বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো যে মদ খায়, তারপর হিস্টেরিকাল হয়ে যায়। আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে চেষ্টা করছি।

পুলিশটির মাংসল, কালচে চিবুকের মুখ আমার দিকে দ্রুত ঘুরে গেলো ঃ তুমি যদি সাবধান না হও তাহলে আমিই তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো। পুলিশের গাড়িতে করে।

ও শুধু বলে যাচ্ছিলো। অনেক রাত হয়ে গেছে। কিচ্ছু করার নেই, খারাপ লাগছিলো তার, তাই সে নিজের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য শুধু শুধু কথা বলছিলো। আমি বুঝেছিলাম সে কথা। আমার তাই বলা উচিত ছিলো, হ্যাঁ, আমি সাবধান হবো, কিংবা হেসে উঠে, এমনকি একটু চোখ টিপে, আমার বলতে হতো, অবশ্যই, ক্যাপ্টেন, আমি ওকে ঠিকঠিক বাড়ি পৌঁছে দেবো। কিন্তু আমি দুটোর একটাও বললাম না। আমার ভেতরটা উত্তেজিত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো, আমার হাতের মধ্যে এ্যান দুলছিলো, নিঃশ্বাস নেবার সময় ওর মুখ দিয়ে এক ধরনের তীক্ষ্ণ ভাঙা ভাঙা শব্দ বেরুচ্ছিলো, আর এই সময় তার কালচে-চিবুক ও মাংসল মুখ নিয়ে এই ব্যাটা নচ্ছার আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অতএব আমি বলে উঠলাম, নিকুচি করি তোমার —

সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ একটু বিস্ফারিত হলো, চোয়ালে জমে উঠলো কালো রক্ত, তার লাঠিতে হাত বুলাতে বুলাতে সে আরেক পা কাছে সরে এসে বললো, আমি তোমার নিকুচি করি! এখনই দেখাচ্ছি, তোমাদের দুজনকেই!

তারপর লাঠি দিয়ে আমার পিঠে খোঁচা দিয়ে বললো, চলো। আমাকে সে ঠেলে নিয়ে চললো জেটির শেষ মাথার দিকে। নিঃসন্দেহে ওখানেই ফোন-বক্স আছে, সেখান থেকে ও ফোন করবে।

আমি তখনো এ্যানের হাত ধরে আছি, তাকে টেনে নিয়ে চলেছি আমার সঙ্গে। আমার পিঠে লাঠির খোঁচা খেতে খেতে আমি দু'তিন পা এগিয়ে গেলাম। তারপর আমার মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম। দ্যাখো, বাপু, তুমি যদি কাল সকালেও চাকুরিতে বহাল থাকতে চাও তবে আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোনো।

ঘোড়ার ডিম শুনবো। সে লাঠির খোঁচাটা আরো একটু তীব্র করলো।

আমি বললাম, এই মহিলা সঙ্গে না থাকলে আমি তোমাকে বিনা বাধায় সখাত সলিলে ডুবতে দিতাম। তোমার সদর দপ্তরে যেতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

কিন্তু তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই আমি।

মুখ বাঁকিয়ে সে প্রতিধ্বনি করলো, সুযোগ! তারপর মুখের এক পাশ দিয়ে থুতু ছিটিয়ে আমার পিঠে আরেকটা খোঁচা দিলো।

আমি বললাম, আমি আমার পকেটে হাত দিচ্ছি। পিস্তলের জন্য নয়, আমার মানি–ব্যাগটা বার করবো। তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই। তুমি উইলি স্টার্কের নাম শুনেছো কখনো?

অবশ্যই। আরেকটা খোঁচা দিলো সে।

তুমি জ্যাক–বার্ডেনের নাম শুনেছো কখনো? সাংবাদিক। উইলি স্টার্কের সেক্রেটারির মতো।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো সে, তখনো আমার পিঠে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিলো, তারপর রুষ্ট গলায় বললো, হ্যাঁ।

তা হলে বোধহয় আমার কার্ডের উপর একটু চোখ বুলাতে পারো। আমি আমার পকেটে মানি–ব্যাগের দিকে হাত বাড়ালাম।

কিন্তু ও আমার বাহুর উপর সজোরে তার লাঠিটা চেপে ধরে বললো, আজ্ঞে না, আপনি না। আমি নিজে বার করছি।

সে ঝুঁকে আমার মানিব্যাগ তার নিজের হাতে উঠিয়ে নিলো। ওটা খুলতে উদ্যত হতেই আমি ওকে সাবধান করে দিলাম। নীতির প্রশ্নে বললাম, তুমি যদি ওটা খোলো, তবে পুলিশের গাড়ি ডাকো কিংবা না ডাকো, তোমাকে আমি একেবারে শেষ করে দেবো।

ও আমার হাতে ব্যাগটা দিলো। আমি তার মধ্য থেকে একটা কার্ড বার করে ওকে দিতে সে অস্পষ্ট আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কার্ডটা পড়লো। বাচ্চা ছেলের হাতের বেলুন ফুটো হয়ে গেলে যে রকম হিস্ হিস শব্দ হয় তার মুখ থেকে সে রকম একটা শব্দ বেরুলো। তো তুমি–তুমি যে সরকারের লোক তা আমি কেমন করে বুঝবো?

শোনো, ভবিষ্যতে এই রকম চালাকী করার আগে একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করো। কেমন? এখন চটপট একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও আমাকে।

ইয়েস, স্যার। তার ফোলা ফোলা মুখের মধ্য থেকে তার ক্ষুদে শুয়োর–চোখে আমার প্রতি তীব্র ঘৃণা উথলে উঠলো। ইয়েস, স্যার বলে সে টেলিফোন বক্সের দিকে এগিয়ে গেলো।

হঠাৎ এ্যান টান দিয়ে নিজেকে আমার হাত থকে মুক্ত করে নিলো। আমি ভাবলাম আবার বুঝি দৌড়ুতে শুরু করবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে

ফেললাম। এ্যান নিচু গলায় ঝাঁঝালো সুরে বললো, ওহ — কী সাংঘাতিক বাহাদুর তুমি কী মহা বাহাদুর তুমি — তুমি হলে অত্যাচারীর অত্যাচারী, পুলিশের পুলিশ — তোমার তুলনা হয় না —

আমি কোনো কথায় কান না দিয়ে ওকে শুধু ধরে থাকলাম। আমার মনে হলো আমার ভেতরে একটা ঠাণ্ডা পাথর জমে বসে আছে।

— এতো চমৎকার লোক তুমি — এতো নির্মল — সব কিছুই এতো চমৎকার আর নির্মল —

আমি কিছু বললাম না।

— তুমি এতো চমৎকার — এতো পরিচ্ছন্ন আর শক্তিশালী — ওহ্, তুমি রীতিমতো হিরো একজন —

আমি দুঃখিত, ইতরের মতো ব্যবহার করেছি আমি।

কৃত্রিম মধুর সুরে এ্যান ফিস ফিস করে বললো, তুমি ঠিক কোন্ বিশেষ ব্যবহারের কথা বলছো আমি বুঝতে পারছি না। বিশেষ শব্দটির উপর ও জোর দিলো। ওর বক্রোক্তি আমার গায়ে চাবুকের মতো কেটে বসলো। তারপর সে আমার দিক থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিলো, আমার দিকে আর তাকালোই না, আমি ওর যে বাহু আঁকড়ে ধরে ছিলাম সেটা মনে হলো পোশাকের দোকানের নিষ্প্রাণ মূর্তির বাহু, আর আমার ভেতরকার ঠাণ্ডা পাথরটা যেন কুৎসিত পিচ্ছিল নোংরা কাদামাটিতে ছেয়ে গেছে, নীরক্ত কুয়াশামাখা রাত, নদীর বুকে কোথাও একটা জাহাজের ভেঁপু বেজে উঠলো, আর ফোলা ফোলা মুখে বসানো ক্ষুদে শুয়োর-চোখের দৃষ্টি আবার পড়লো আমার উপর, তারপর গাড়িতে বসে আছে এ্যান স্ট্যান্টন, পিঠ সোজা করে, আমার কাছ থেকে যতো দূরে সম্ভব, রাস্তার আলোয়, মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে তার কাগজের মতো সাদা মুখ। আমার সঙ্গে সে একটা কথাও বললো না। তারপর গাড়ি চলাচল করে এমন একটা রাস্তায় এসে পৌঁছুনো মাত্র সে বললো, নেমে যাও। কোনো একটা গাড়ি ধরতে পারবে এখানে। আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।

অতএব আমি নেমে গেলাম।

পাঁচ দিন পর আমি টেলিফোনে এ্যান স্ট্যান্টনের গলার স্বর শুনলাম। স্বরটি বললো, ওই জিনিসগুলো — যে কাগজগুলোর কথা তুমি বলছিলে — তোমার কাছে যে কাগজগুলো আছে, ওগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

আমি বললাম, আমি নিয়ে আসবো।

স্বরটি বললো, না, পাঠিয়ে দাও।

আমি বললাম, ঠিক আছে। একটার ফটোস্ট্যাট করাই আছে। আগামীকাল আরেকটার ফটোস্ট্যাট করাবো, তারপর দুটোই একসঙ্গে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।

ফটোস্ট্যাট ! তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না।

আমি বললাম, তোমাকে কাল কাগজগুলো পাঠিয়ে দেবো।

কালো যন্ত্রটির মধ্যে খুট করে একটা শব্দ হলো, তারপর হাল্কা মৃদু হাওয়ার গুঞ্জনের মতো একটা শব্দ শোনা গেলো তার মধ্যে, সেই শব্দ আর কিছু নয়, স্থানের শব্দ, আমার কাছ থেকে খসে পড়ছে, আর অনন্ত কালের শব্দ, আর নিশ্ছিদ্র শূন্যতার শব্দ।

রোজ রাতে ঘরে ফিরেই আমি প্রথমে টেলিফোনের দিকে তাকাতাম। মনে মনে বলতাম, এইবার বেজে উঠবে। একবার মনে হয়েছিলো সত্যিই বুঝি বেজেছে, কারণ আমার সমস্ত স্নায়ুতে সেই ক্রিং শব্দটি লেপ্টে ছিলো। কিন্তু বাজেনি। আমি শুধু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একবার আমি জিনিসটা তুলে আমার কানের কাছে ধরেছিলাম, তখন শুধুমাত্র একটা মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে পাই, সেটা কি কি জিনিসের ধ্বনি তার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

রোজ রাতে লবিতে বসা লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, আমাকে কেউ কোনো ফোন নম্বর দিয়েছে কিনা, ফোন করতে বলেছে কিনা। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সেরকম নম্বর পেয়েছি। কিন্তু কখনো সঠিক নম্বরটি পাইনি।

তারপর আমি উপরে আমার ঘরে যাই। সেখানে আছে টেলিফোন আর আমার ব্রিফকেস, যার মধ্যে রয়েছে মেমফিস থেকে আনা কাগজের ফটোস্ট্যাট ও এফিডেভিটটা। কর্তাকে এখনো এটা দিই নি। তাঁকে যে দিইনি সেকথাও তাঁকে বলি নি। দেবো। আমার কাজের অঙ্গ সেটা। কিন্তু এখনই না। ঠিক এখনই না। আগে টেলিফোনটা বাজুক, তার পরে।

কিন্তু সেটা বাজলো না।

তার বদলে সপ্তাহ খানেক পরে, একদিন রাতে আমি করিডোরে মোড় ঘুরতেই দেখি যে আমার ঘরের কাছে বেঞ্চির উপর এক মহিলা বসে আছেন। আমি পকেট হাতড়ে চাবি বার করে আমার ঘরের দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবো ঠিক তখনই লক্ষ করলাম যে মহিলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি দ্রুত তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। এ্যান স্ট্যান্টন।

ঘন কার্পেটের উপর ওর হাল্কা পা কোনো শব্দ তোলে নি।

আমার প্রায় হার্টফেলের অবস্থা করেছিলে তুমি। আমি দরজাটা পুরো খুলে বললাম, ভেতরে এসো।

আমি ভেবেছিলাম আমার সুনাম সম্পর্কে তুমি বড়ো বেশি সাবধানী। অন্ততঃ সেই দাবীই করতে তুমি। এক সময়।

হ্যাঁ, মনে আছে। সে যাই হোক, এখন ভেতরে এসো।

সে ঘরে ঢুকে মেঝের মাঝখানে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। আমি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। আমি দেখলাম যে তার হাতে রয়েছে তার ব্যাগের সঙ্গে একটা বড়ো বাদামী খাম।

আমার দিকে না তাকিয়ে, দেয়ালের কাছের টেবিলের দিকে সে এগিয়ে গেলো, তারপর খামটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে বললো, ওই যে ফটোস্ট্যাটগুলো। ফেরত নিয়ে এসেছি। বিশ্বাস করে আমাকে দিলে মূল কাগজগুলোও আমি তোমাকে এমনি করে ফেরত দিতাম।

আমি বললাম, আমি জানি।

এ্যান বলে উঠলো, কী সাংঘাতিক! তখনো কিন্তু সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় নি।

আমি ওর কাছে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, আমি দুঃখিত, এ্যান।

কী সাংঘাতিক! তুমি জানো না, জ্যাক।

না, কতোখানি সাংঘাতিক আমি জানতাম না। তাই আমি ঠিক ওর পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম, ওকে আবার স্পর্শ করতে সাহস হলো না। শুধুমাত্র আঙ্গুল দিয়েও না।

সে আবার বললো, তুমি জানো না।

আমি বললাম, না, জানি না।

কী যে সাংঘাতিক! সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার মুখের উপর তার আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে ধরলো। আমার মনে হলো আমি যেন হোঁচট খেয়ে একটা কূয়ার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি। ও বললো, আমি ওকে দিই — ওই জিনিসগুলো — সে পড়লো, তারপর স্থির হয়ে যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো — নড়লো না — কোনো শব্দ করলো না — তার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিলো, আর আমি তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে স্পর্শ করতেই ও আমার দিকে তাকালো। অনেকক্ষণ ধরে ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে ও বলেছিলো, তুমি। শুধু ওইটুকুই, তুমি। বলেছিলো আমার দিকে তাকিয়ে।

অসহ্য! আমি বলে উঠলাম। নিকুচি করি ওর। ও তোমাকে দুষছে কি জন্যে? গভর্নর স্ট্যান্টনকে দুষছে না কেন?

দুষছে। তাঁকে ও দুষছে। সেটাই তো ভয়ংকর। যেভাবে ও তাঁকে দুষছে। ওর বাবাকে। তোমার তো মনে আছে, জ্যাক — তুমি তো ভুলে যাও নি — সে হাত বাড়িয়ে আমার বাহুর উপর তার হাত রেখে বললো, তোমার তো মনে আছে — উনি কি রকম ছিলেন — কিভাবে আমাদের বই পড়ে শোনাতেন — কি রকম ভালোবাসতেন আমাদের — এ্যাডামকে নিজে পড়ালেখা দেখিয়ে দিতেন — কতো গর্ব করতেন ওকে নিয়ে — কতো সময় দিতেন এ্যাডামকে নিজের হাতে পড়াবার জন্যে — ওহ্, জ্যাক, চুল্লীর সামনে বসে উনি জোরে জোরে পড়তেন — আমি তখন কতো ছোট — ওঁর হাঁটুতে মুখ গুঁজে আমি বসে থাকতাম, আর উনি আমাদের পড়ে শোনাতেন — ওহ্, জ্যাক — মনে পড়ে তোমার?

আমি বললাম, হ্যাঁ, পড়ে।

সে বলে চললো, হ্যাঁ — হ্যাঁ — মা মারা যান, তারপর বাবা তাঁর যতোখানি সাধ্য তা করেন — এ্যাডামকে নিয়ে তাঁর সে কি অহঙ্কার ছিলো — আর এখন এ্যাডাম — এখন সে — এ্যান আমার বাহু ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছু হটে, হাত তুলে নিঃস্ব বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে, আঙ্গুল দিয়ে নিজের কপাল টিপে ধরলো। তারপর ফিস ফিস করে বললো, ওহ্, জ্যাক, এ আমি কি করলাম?

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, যেটা করা উচিত মনে করছো তুমি তাই করেছো।

হ্যাঁ, ও ফিস ফিস করে বললো, হ্যাঁ, তাই।

আমি বললাম, যা হবার তা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, তা হয়ে গেছে। এবার সে কথা বলে উঠলো উচ্চ কণ্ঠে, তার চোয়াল শক্ত হয়ে এঁটে বসলো, হঠাৎ তাকে দেখালো একেবারে এ্যাডামের মতো, মুখ দৃঢ় এবং শক্ত করে বন্ধ করা, যেন কুলুপ আঁটা, চামড়া টান টান, মাথা উঁচু করে সোজা সামনে তাকিয়ে আছে, সে দৃষ্টির সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন নতজানু হয়ে পড়বে — আর আমার মনের অবস্থা হলো কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো। মানে, তাই পড়তাম, যদি ওই ধরনের স্বভাব হতো আমার।

আমি বললাম, তো যা হবার তা হয়ে গেছে।

এ্যান বললো, ও করবে।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, কি, কি করবে?

কারণ ওই মুহূর্তে আমি কেন এ্যানকে ওই তথ্য দিয়েছিলাম, কেন তার হাতে ফটোস্ট্যাটগুলো তুলে দিয়েছিলাম, কি জন্যে সে তার ভাইকে সেসব দেখিয়েছিলো সে কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। এর পেছনে যে একটা কারণ ছিলো সেটাই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হলো। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি

চাপ দিয়ে ওকে রাজী করিয়েছো?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে সে বললো, না। আমি কোনো কথা বলি নি। আমি শুধু ওকে ওই জিনিসগুলি দিই। ও বুঝে গিয়েছিলো।

কি ঘটেছিলো?

ওই, তোমাকে যা বললাম। আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে ও শুধু বলেছিলো, তুমি। ব্যস, ওইটুকু। আমি ওকে উদ্দেশ্য করে বলি, ও রকম করে বলো না, এ্যাডাম। ওরকম করে বলো না তুমি। কিছুতেই তুমি ওরকম করে বলবে না।

ও বললো, কেন?

কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি, কারণ আমি বাবাকে ভালোবাসি।

ও এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতেই বললো, ওঁকে ভালোবাসো! অনন্ত নরকবাস ঘটুক তাঁর! অনন্ত নরক!

আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, এ্যাডাম, এ্যাডাম, কিন্তু ও আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সোজা ঘর ছেড়ে চলে যায়, তারপর নিজের শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি তখন বাড়ি ছেড়ে বাইরে চলে আসি, অন্ধকারে অনেকক্ষণ একা একা হাঁটি। যেন ঘুমুতে পারি। তিন দিন ওর কোনো সাড়া শব্দ পাই নি। তারপর সে জানালো আমি যেন ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। আমি যাই। তখন ওই জিনিসগুলো ও আমাকে ফেরৎ দেয়। এ্যান খামের দিকে আঙুল তুলে দেখালো। ও আমাকে বলেছিলো আমি যেন তোমাকে বলে দিই যে সে কাজটা করবে। সব ব্যবস্থা যেন করা হয়। ব্যস, এই-ই সব।

আমি বললাম, বেশ ভালো কারবার হয়েছে।

হ্যাঁ। আমার পাশ দিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, দরজার হাতলের উপর হাত রাখলো, ঘোরালো সেটা, তারপর দরজাটা হাট করে খুলে ধরলো। তারপর আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললো, হ্যাঁ, বেশ ভালো কারবার হয়েছে।

ঘর ছেড়ে সে বাইরে পা দিলো।

কিন্তু তখনো তার হাত দরজার গায়ে। ওই অবস্থাতেই সে বললো, একটা কথা।

কি?

একটা অনুগ্রহ করো। আমাকে। ওই কাগজগুলো যদি তুমি কখনো ব্যবহার করো তা হলে তার আগে বিচারপতি আরউইনকে সেগুলো একবার দেখিও। তাঁকে একটা সুযোগ দিও। অন্ততঃ একটা সুযোগ।

আমি রাজী হয়েছিলাম।

বিরাট কালো ক্যাডিলাকটা সাবলীলভাবে রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। পেছনের আসন থেকেও আমি তার হুড দেখতে পাচ্ছিলাম, রাস্তার আলোয় অনুজ্জ্বলভাবে ঝিকমিক করছিলো, এখন এপ্রিলের গোড়ার দিক, গাছে গাছে নতুন পাতা এসেছে, তার তলা দিয়ে গাড়িটা দামী মসৃণ ফিসফিস শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর আমরা অন্য একটা রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। এখানে আর রাস্তার উপর দু'পাশ থেকে চমৎকার গাছের সারি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নেই।

ওই যে, আমি বললাম, মুদি দোকানের ঠিক ওপাশের বাড়িটা।

সুগার-বয় রাস্তার ধার ঘেঁষে গাড়ি থামালো, সাবধানে, সস্নেহে, মনে হলো যেন কোনো মা তার সাত রাজার ধন মাণিককে শেষ চুমুটি খেয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। তারপর সে কর্তার দরজা খুলে দেবার জন্য ছুটে গেলো কিন্তু কর্তা ততক্ষণে নেমে পড়েছেন। আমি বাইরে বেরিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, এখানেই থাকে ও।

আমরা এসেছি এ্যাডাম স্ট্যান্টনের সঙ্গে দেখা করতে।

আমি যখন কর্তাকে জানাই যে এ্যাডাম স্ট্যাটন কাজটা নেবে, সব ব্যবস্থা করার জন্য আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে, তখন কর্তা শুধু বলেছিলেন, আচ্ছা। তারপর আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মন্তব্য করেছিলেন, তুমি নির্ঘাৎ স্ভেঙ্গালি। যাদুকর।

হ্যাঁ, আমি তাই।

কর্তা বলেছিলেন, আমি ওকে দেখতে চাই।

ঠিক আছে। আমি ওকে এখানে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবো।

এখানে নিয়ে আসবে? কি যা তা বলছো? আমি ওর ওখানে যাবো। আমাকে একটা অনুগ্রহ করছে সে।

কিন্তু আপনি তো গভর্নর, নাকি?

একদম ঠিক কথা বলেছো, আমি গভর্নর, কিন্তু ও হচ্ছে ডাঃ স্ট্যান্টন। কখন যাবো আমরা?

আমি তাঁকে জানাই যে যখনই যাই রাতে যেতে হবে, কারণ রাতের বেলা ছাড়া ওকে ধরা যায় না।

অতএব এই রাতের বেলা আমরা এই ওঁচা এ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে, কোনো ছোট ছেলের খেলনা গাড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে, বাঁধাকপি আর বাচ্চার ডায়াপারের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে উপরে উঠছি। কর্তা বললেন, বাস করার জন্য ভালো জায়গা বেছে নিয়েছে বটে।

হ্যাঁ। এবং কেন সেটা অনেক লোকই বুঝতে পারে না।

কর্তা বললেন, আমার মনে হয় আমি পারি।

তিনি পারেন কি পারেন না, সে কথা ভাবতে ভাবতেই আমরা ওর ঘরের সামনে এসে পৌঁছুলাম, আমি দরজায় টোকা দিলাম, ঘরে ঢুকলাম, আর সোজা এ্যাডাম স্ট্যান্টনের চোখের উপর চোখ পড়লো আমার।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেলো, সুগার–বয় সন্তর্পনে ঘরে ঢুকলো, আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম, কর্তা আর এ্যাডাম পরস্পরকে নীরবে খুঁটিয়ে দেখলো, একটিও কথা না বলে, তারপর আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, গভর্নর স্টার্ক, ইনি হলেন ডক্টর স্ট্যান্টন।

কর্তা এগিয়ে এসে ওঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিলো এ্যাডাম যেন কর্তার হাত গ্রহণ করার আগে সামান্য ইতস্তত করেছিলো। কর্তাও নিশ্চয় এটা লক্ষ করেছিলেন, কারণ করমর্দনের মাঝখানে, কেউ কোনো কথা বলবার আগেই, তিনি হঠাৎ হাসিমুখে বলে ওঠেন, দেখলে তো, যতটা খারাপ ভেবেছিলে ততোটা খারাপ নয়। তুমি মরে যাবে না।

আর, কি আশ্চর্য, এ্যাডামও হেসে উঠলো।

আর আমি বললাম, এবং ইনি হচ্ছেন মিঃ ও'শীন। সুগার–বয় সামনে এগিয়ে এসে তার গাট্টাগোট্টা হাত বাড়িয়ে ধরে মুখ কুঁচকে বলতে শুরু করলো, আমি খু – খু – খু – উব —

এ্যাডাম বললো, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম। তারপরই, আমি লক্ষ করলাম, ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে সুগার–বয়ের বাঁ বগলের নিচে অস্বাভাবিক ফোলা জায়গাটার উপর। মুখের হাসি মুছে ফেলে ও বললো, আপনার যেসব অস্ত্রধারীদের কথা শুনেছি তা হলে ইনি হচ্ছেন তাদেরই একজন।

কর্তা বললেন, কী যে বলো! সুগার–বয় শুধু মজা করে ওটা বয়ে বেড়ায়। সুগার–বয় আমার বন্ধু, আমার প্রিয় সঙ্গী। ওর মতো গাড়ি চালাতে পারে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।

সুগার–বয়ের মুখ দেখে মনে হলো কেউ যেন আদর করে তার প্রিয় কুকুরের মাথা চাপড়ে দিয়েছে।

এ্যাডাম চুপ করে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো জবাব দিলো না। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিলো কারবারটা বুঝি ফেঁসে গেলো কিন্তু তারপরই এ্যাডাম আনুষ্ঠানিক সৌজন্যের সঙ্গে বললো, আপনারা কি দয়া করে বসবেন না?

আমরা বসলাম।

সুগার–বয় তার কোটের পাশ–পকেট থেকে চুপিসারে একটা চিনির ডেলা বার করে মুখে পুরে দিয়ে চুষতে শুরু করলো। তার প্রায়–অপার্থিব আইরিশ গাল দুটি চুপসে যাচ্ছিলো, তার চোখে ফুটে উঠেছিলো পরম পরিতৃপ্তির ছায়া।

এ্যাডাম নিজের চেয়ারে সোজা বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কর্তা আরাম করে জীর্ণ, অতিরিক্ত পুরু একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছেন, তাঁর যেন কোনো তাড়া নেই। কিন্তু অবশেষে তিনি বললেন, তো, ডাক্তার, কি মনে করো তুমি?

কি সম্পর্কে?

আমার হাসপাতাল সম্পর্কে?

আমার মনে হয় এর ফলে এই স্টেটের লোকজনের কিছু মঙ্গল হবে। একটু থেমে সে যোগ করলো, আর আপনার জন্য কিছু ভোটের ব্যবস্থাও হবে।

কর্তা বললেন, আমার ভোটের দিকটা তুমি ভুলে যেতে পারো। ভোট পাবার আরো হাজারো পথ আছে।

তাই শুনেছি আমি। এ্যাডাম আবার কর্তার হাতে, তন্ময় হয়ে প্রশংসা করার জন্য, এক চাকা অখণ্ড নীরবতা তুলে দিলো।

কর্তা কিছুক্ষণ প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, লোকজনের কিছু মঙ্গল হবে, তবে তুমি এর দায়িত্বভার গ্রহণ না করলে খুব বেশি হবে না।

আমার কাজের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু কোনোরকম বাধা কিংবা উটকো নাক–গলানো সহ্য করবো না।

কর্তা হেসে ফেললেন। ভয় নেই, ওরকম কিছু আমি করবো না, তবে তোমার চাকুরি খেয়ে দিতে পারি।

এ্যাডামের হাল্কা–নীল চোখ যেন জ্বলে উঠলো। সে বললো, যদি এই রকম ভয়ই দেখাতে চান তাহলে এখানে না এলেই ভালো করতেন। আপনার প্রশাসন সম্পর্কে আমার কি ধারণা তা আপনি জানেন। সেটা আমি কখনো গোপন রাখি নি। ভবিষ্যতেও রাখবো না। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন?

কর্তা বললেন, শোনো ডাক্তার, তুমি রাজনীতির কিছু বোঝো না। ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলছি। তুমি এবং তোমার মতো আরো দশ ব্যক্তি প্রতিটি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে ঘেয়ো কুকুরের মতো প্রচণ্ড চিৎকার করতে থাকলেও আমি নির্বিবাদে এই স্টেটের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবো। তোমাকে অপমান করার জন্য একথা বলছি না। কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি কিচ্ছু বোঝো না।

এ্যাডাম চোয়াল শক্ত করে দৃঢ় গলায় বললো, আমি কিছু কিছু জিনিস বুঝি।

আর কিছু কিছু জিনিস বোঝো না। যেমন আমিও বুঝি না। কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝি, যেটা তুমি বোঝো না, ঘোড়াটা চলে কিসের জোরে, আমি সেটা জানি, আমি তাকে চালাতে পারি। আরেকটা কথা — এবার কিন্তু আমরা আর কোনো রাখঢাক করছি না — হঠাৎ কর্তা কথা বন্ধ করে, মাথা এক দিকে হেলিয়ে, হাসতে হাসতেই বললেন, ঠিক তো?

এ্যাডাম প্রশ্নটা উপেক্ষা করলো, তখনো সে তার চেয়ারে পিঠ টান করে বসে আছে। এ্যাডাম বললো, আপনি বলছিলেন যে আরেকটা কথা আছে —

হ্যাঁ, আরেকটা কথা আছে। আচ্ছা, ডাক্তার, তুমি হিউ মিলারকে চেনো?

হ্যাঁ, চিনি। আমি চিনি তাঁকে।

তো ও আমার সঙ্গে ছিলো — এ্যাটর্নী জেনারেল ছিলো — পদত্যাগ করে। কেন জানো? উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে কর্তা বলে গেলেন, ও পদত্যাগ করে কারণ সে তার ছোট্ট হাতদুখানি শুভ্র নির্মল রাখতে চেয়েছিলো। সে ইট ঠিকই চেয়েছিলো কিন্তু ওগুলো বানাবার জন্য যে কাউকে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে শরীর নোংরা করতে হয় ওই কথাটা সে জানতো না। ওর অবস্থা ছিলো সেই মানুষটার মতো যে কাবাব খেতে খুব ভালোবাসে কিন্তু কসাইর দোকানের ধারে কাছেও যে যেতে পারে না, কারণ ওখানে কিছু হৃদয়হীন মানুষ আছে যারা পশুপ্রেমিক নয়, যাদের বিরুদ্ধে আসলে পশুক্লেশ নিবারণী সংঘে নালিশ করা উচিত। তো, সে তার চাকুরিতে ইস্তফা দেয়।

আমি এ্যাডামের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সাদা, শক্ত, যেন পাথর কুঁদে তৈরি মুখ। জুরির মুখপাত্র কি বলবে সেটা শোনার জন্য একটা মানুষ যেমন নিজেকে শক্ত করে নেয় তাকে সেই রকম দেখাচ্ছিলো। কিংবা ডাক্তার কি বলে সেটা শোনার জন্য যখন কেউ অপেক্ষা করে। এ্যাডাম তার সময়ে নিজেই নিশ্চয়ই ওই রকম বহু মুখ দেখেছে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে এবং যে কথা জানাতেই হবে সেকথা জানিয়ে দিয়েছে।

কর্তা বললেন, হ্যাঁ, ও পদত্যাগ করে। ও ছিলো সেই সব মানুষের একজন যে সব কিছুই চায়, এবং সব কিছুই চায় এক সঙ্গে, উভয় দিক থেকে। তুমি ওই জাতের মানুষদের চেনো, ডাক্তার?

নদীতে মাছ ধরার জন্য যেভাবে লোক টোপ ফেলে তিনি ওই ভাবে এ্যাডামের দিকে একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন কিন্তু মাছের কাছ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলো না।

হ্যাঁ, ওই হিউ — সে কখনোই শিখে উঠতে পারে নি যে সব কিছু পাওয়া যায় না। আসলে খুব কমই পাওয়া যায়। আর নিজে তৈরি করে না নিলে কিছুই পাওয়া যায় না। ও ভেবেছিলো যে যেহেতু সে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু অর্থ এবং মিলার নামটি লাভ করেছে সেই হেতু সে সব কিছুই পেতে পারবে। হ্যাঁ, আর সে ওই চূড়ান্ত জিনিসটা পেতে চেয়েছিলো যা কখনোই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না। তুমি জানো সেটা কি?

কর্তা এ্যাডামের মুখের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর এ্যাডাম জিজ্ঞাসা করলো, কি?

ভালোত্ব। হ্যাঁ, সহজ, সরল ভালোত্ব। এটা অন্য কারো কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায় না। নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়, ডাক্তার। যদি পেতে চাও। আর সেটা তৈরি করতে হয় মন্দত্বের ভেতর থেকে। হ্যাঁ, মন্দত্ব। এবং কেন জানো, ডাক্তার?

তিনি জীর্ণ অতি–পুরু চেয়ার থেকে তাঁর দেহভার ঈষৎ উত্তোলন ক'রে সামনে ঝুঁকে বসলেন, হাঁটুর উপর দু'হাত, কনুই দুটি বাইরে বেরুনো, মাথা সামনের দিক ঠেলে দিয়েছেন, চুল নেমে এসেছে চোখের উপর। এ্যাডামের চোখে চোখ রেখে তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন, মন্দত্বের ভেতর থেকে। এবং কেন তুমি জানো? কারণ ওটা তৈরি করার জন্য আর কিছুই নেই।

ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে আবার গা এলিয়ে দিতে দিতে তিনি নিচু গলায় বললেন, তুমি এটা জানতে, ডাক্তার?

এ্যাডাম কোনো কথা বললো না।

তখন কর্তা আগের চাইতেও নিচু গলায়, প্রায় ফিস ফিস করে, আবার বললেন, তুমি এটা জানতে, ডাক্তার?

এ্যাডাম তার ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললো, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি যেমন বলছেন, আরম্ভ করার জন্য যদি শুধু মন্দই থাকে, যদি মন্দের ভেতর থেকেই ভালোকে তৈরি করতে হয়, তাহলে ভালো যে কী সেটা আপনি কিভাবে জানবেন? ভালোকে চিনবেনই বা কেমন করে? যদি ধরেও নিই যে আপনি সেটা মন্দের ভেতর থেকেই তৈরি করেছেন। এই প্রশ্নটার উত্তর দিন আমাকে।

সোজা, ডাক্তার, সোজা।

ঠিক আছে, বলুন।

মানুষ চলতে চলতে তা তৈরি করে নেয়।

কি তৈরি করে নেয়?

ভালো। শুভ। মঙ্গল। আর কিসের কথা বলছি আমরা? ভালোর কথাই বলছি, জোর দিয়েই।

এ্যাডাম কোমল কণ্ঠে বললো, তাহলে চলতে চলতে মানুষ সেটা তৈরি করে নেয়?

এ ছাড়া মানুষ এই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কি করেছে বলে তোমার মনে হয়, ডাক্তার? তোমার বড়ো-বড়ো-বড়ো-বড়োদাদা যখন গাছ থেকে নেমে এসেছিলো তখন ভালো আর মন্দ কিংবা ঠিক আর ভুল সম্পর্কে তার ধারণা ওই গাছের কোটরেই বাস করা প্যাঁচার চাইতে কিছুমাত্র বেশি ছিলো না। তারপর একদিন সে গাছ থেকে নেমে আসে, তারপর চলতে চলতেই ভালোটা তৈরি করে নেয়। কাজকর্ম চালিয়ে নেবার জন্য তার যা প্রয়োজন সেটা সে তৈরি করে নেয়, ডাক্তার। আর যেটা সে তৈরি করে নেয়, সবাই সব সময় যেটাকে ভালো এবং সঠিক বলে ধরে নেয়, দেখা যায় যে কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্য যা দরকার সেটা সর্বদা তার চাইতে দু'ধাপ পিছিয়ে আছে। আর সেই জন্যই পরিবর্তন ঘটে, ডাক্তার। কারণ লোকজন যাকে সঠিক বলে মনে করে সেটা সব সময়ই কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্য তাদের যা প্রয়োজন তার চাইতে দু'ধাপ পিছিয়ে থাকে। তো একজন কেউ, কোনো একজন মানুষ, কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়, কারণ ভালো সম্পর্কে তার একটা বিশেষ ধারণা আছে। সে হিরো হয়। কিন্তু, ডাক্তার, সাধারণ মানুষ, যাদের নিয়ে সমাজ, তারা কখনো কাজকর্ম বন্ধ করে দেবে না। সমাজ শুধু ভালোর একটা নতুন ধারণা তৈরি করে নেবে। সমাজ কখনো আত্মহত্যা করতে যাবে না। অন্ততঃ ওই ভাবে নয়, উদ্দেশ্যমূলকভাবে নয়। এইটেই সত্য কথা। তাই না?

এ্যাডাম বললো, তাই কি?

একশো বার তাই, ডাক্তার। ঠিক বা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে একটা ঢাকনি যা তুমি কিছু একটার উপর চাপিয়ে দাও। তো, ওই ঢাকনার নিচের কিছু জিনিস আর ঢাকনার বাইরের কিছু জিনিস কিন্তু দেখতে হুবহু এক রকম। আর তুমি যদি সাধারণ মানুষকে ওই ভালোর ধারণা নিয়ে প্রশ্ন করো, তাদের উপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাও, তবে দেখবে যে অনেকেই তা নিয়ে কোনো তর্কবিতর্ক করবে না, কারণ ওই রকম ঠিক আর ন্যায়সঙ্গতের ধারণা নিয়ে কোনো মানবিক কাজকর্ম তারা চালিয়ে যেতে পারে না। আরে, একটা সময় ছিলো যখন মানুষ বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারতো না। তখন অনেক ভালো ভালো রমণী প্রহৃত হতো, অনেক ভালো ভালো পুরুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতো, কিন্তু তাদের কিছুই করার উপায় ছিলো না। তারপর

হঠাৎ একদিন দেখা গেলো যে বিবাহ বিচ্ছেদটা ঠিক, ন্যায়সঙ্গত। এরপর কি হবে তুমি জানো না। আমিও জানি না। তবে আমি একটা জিনিস জানি। কর্তা থামলেন, আবার সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন, কনুই দুটি আবার বাইরের দিকে ঠেলে বেরুলো।

এ্যাডাম জানতে চাইলো, কি?

আমি অস্বীকার করছি না যে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হলে ভালো সম্পর্কে অবশ্যই একটা ধারণা থাকা দরকার কিন্তু কোনো একটা বিশেষ সময়ে সেই বিশেষ ধারণাটা কি রকম হবে জানো? ছেলেবেলায় স্কুলে আমরা একটা বোতলে জল ভরে খুব শক্ত করে ছিপি এঁটে জ্বলন্ত উনুনে ফেলে দিতাম, যে প্রচণ্ড শব্দ উঠবে সেটা শোনার জন্য। ঠিক ওই রকম হবে তার অবস্থা। যে–বাষ্প জমে উঠে বোতলটা ফাটিয়ে দেয়, শিক্ষিকাকে ভয় পাইয়ে প্রায় কাপড় ভিজিয়ে ফেলার অবস্থায় নিয়ে যায়, সেটা হচ্ছে ওই মানুষী কর্মকাণ্ড যা করতেই হবে, শক্ত করে ছিপি এঁটে তুমি তার মধ্যে যাই পুরে দাও না কেন সেটা তা ফাটিয়ে ফেলবেই, সব কিছু তছনছ করে দেবে, কিন্তু তুমি যদি সেটাকে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় স্থাপন করো এবং একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সেটা নিঃসরণের ব্যবস্থা করো তাহলে তা দিয়ে একটা মালগাড়ির ইঞ্জিন চালানো যাবে।

কর্তা আবার তাঁর চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন, চোখের পাতা শিথিল হয়ে গেলো, কিন্তু দৃষ্টি তখনো সতর্ক, আর তাঁর কপালের উপর চুলের গোছা নেমে এসেছে, শিকারীর চোরাগুপ্তা আক্রমণের আস্তানার মতো।

অকস্মাৎ এ্যাডাম উঠে পড়ে ঘরের অন্য প্রান্তে হেঁটে গেলো। সে আগুনের চুল্লীটার সামনে গিয়ে থামলো, সেখানে এখন আগুন জ্বালানো নেই, কিন্তু অতীতের ছাই তখনো পড়ে আছে, আর অর্ধ–দগ্ধ কিছু কাগজ। বসন্ত প্রায় সমাগত। বেশ কিছুকাল এই চুল্লীতে আগুন জ্বালানো হয় নি। ঘরের জানালা খোলা, তার ভেতর দিয়ে রাতের বাতাস ঘরে ঢুকছে, শিশুর ডায়াপার আর বাঁধাকপির চাইতে ভিন্নতর এক গন্ধ, ভেজা ঘাস আর অন্ধকারে চাঁদোয়ার মতো ঝুঁকে পড়া গাছের পাতার গন্ধ, এমন একটা গন্ধ বর্তমানের এই ঘরের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই। আর আচমকা আমার অন্য একটা ঘরের কথা মনে পড়লো, অন্য একটা সময়ের, অন্য একটা রাতের কথা, আমি একটা ঘরে বসে আছি, হঠাৎ বেশ বড়ো হাল্কা আপেল–সবুজ রঙের একটা মথ্ ঘরের ভেতর উড়ে এলো, প্রায় ছোটখাট বাদুড়ের মতো, স্বপ্নের মতো কোমল আর নীরব — ওর নাম বোধহয় লুনা মথ্ — সুন্দর নাম। পতঙ্গটা উড়ে এলো ঘরের মধ্যে, কেউ বোধহয় জালের দরজাটা খোলা রেখেছিলো, সেটা

ভেসে বেড়ালো চেয়ার আর টেবিলের উপর দিয়ে, হাল্কা–সবুজ, রেশমী, সতেজ একটা বড়ো গাছের পাতার মতো, কোনো কথা না বলে বিজলী বাতির নিচ দিয়ে সেটা নাচতে লাগলো, যে জায়গায় লুনা মথের কোনো স্বাভাবিক অধিকারই ছিলো না। এখন এই ঘরের মধ্যে ভেসে আসা রাতের বাতাসকে আমার ওই রকমই মনে হলো।

এ্যাডাম কাঠের শেলফের উপর কনুইর ভার রেখে দাঁড়ালো। ঘন ধুলো জমে আছে সেখানে, তার উপর নাম লেখা যায়। বই টাল করে ধরা, তলায় জমাটবাঁধা গুঁড়োসহ কফির পেয়ালা পড়ে আছে। এ্যাডাম সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো যেন সে একা, ঘরের আর কোথাও কেউ নেই।

কর্তা সতর্ক চোখে তাকে দেখছিলেন।

তাকে ওই ভাবে দেখতে দেখতেই তিনি বললেন, হাঁ, সেটা দিয়ে একটা মালগাড়ির ইঞ্জিন চালানো যাবে আর —

কিন্তু এবার এ্যাডাম বাধা দিয়ে বলে উঠলো, আপনি আমাকে কি বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করছেন? আমার মনে কোনো কিছু সম্পর্কেই আপনাকে বিশ্বাস সৃষ্টি করাতে হবে না। আমি বলেছি যে কাজটা আমি নেবো। ব্যস, ফুরিয়ে গেলো।

বৃহদাকার চেয়ারে বসা ভারী মানুষটির দিকে এ্যাডাম তীব্র দৃষ্টি হেনে বললো, ব্যস, আর তো কোনো কথার দরকার নেই। কি কারণে কাজটা নিচ্ছি সেটা একান্তই আমার ব্যাপার।

কর্তা আস্তে হেসে, নিজের চেয়ারে একটু নড়েচড়ে, বললেন, হ্যাঁ, তোমার কারণ একান্তই তোমার নিজের ব্যাপার, ডাক্তার। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমার কারণটা কী তুমি বোধহয় তাও জানতে চাইবে। যখন আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি।

এ্যাডামের ঠোঁট ঈষৎ বাঁকা হলো। সে বললো, আমি হাসপাতালটা চালাবো। সেটাকে যদি আপনি একসঙ্গে কাজ করা বলতে চান।

এবার কর্তা জোরে হেসে উঠলেন। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, তুমি কিচ্ছু দুশ্চিন্তা করো না, ডাক্তার। তোমার ছোট্ট হাতদুখানি আমি নিষ্কলঙ্ক রাখবো। তোমার আগাগোড়াই আমি নিষ্কলঙ্ক রাখবো। ওই সুন্দর, দূষণমুক্ত, এ্যান্টিসেপটিক, নির্বীর্য হাসপাতালের মধ্যে আমি তোমাকে সেলোফেনে মুড়ে দেবো, মানুষের হাতের ছোঁয়া লাগতে দেবো না। তিনি এ্যাডামের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ চাপড়ে বললেন, তুমি কোনো দুশ্চিন্তা করো না, ডাক্তার।

এ্যাডাম বললো, আমার নিজের খবরদারি আমি নিজেই করতে পারবো। চোখ

নামিয়ে কাঁধের উপর রাখা হাতটির দিকে তাকালো সে।

একশো বার পারবে, ডাক্তার। কাঁধ থেকে তিনি হাতটা সরিয়ে নিলেন। এবার তাঁর কণ্ঠস্বর বদলে গেলো। হঠাৎ কাজের গলায়, শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই প্ল্যানগুলি সব দেখতে চাইবে। সবই আর্কিটেক্টের সঙ্গে আলোচনার পর তোমার অনুমোদন সাপেক্ষ। তুমি কিছু পরিবর্তন করতে চাইলে তা করা হবে। টড এ্যান্ড ওয়াটারস-এর মিঃ টড তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে দেখা করতে আসবেন। আর তোমার লোকজন বাছাই করার কাজ তুমি এখন শুরু করে দিতে পারো। এখন এটা তোমার শিশু। পুরোপুরি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্তা পিয়ানোর উপর থেকে তাঁর টুপি তুলে নিলেন। তারপরই দ্রুত এ্যাডামের দিকে ঘুরে তিনি আরেকবার দেখে নিলেন, মাথা থেকে পা, তারপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বললেন, তুমি খুব উঁচু স্তরের মানুষ, ডাক্তার। অন্য লোকে ভিন্ন কিছু বললে বলুক, তুমি কান দিও না।

তিনি আবার ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এ্যাডাম কিছু বলবার আগেই। অবশ্য এ্যাডাম যদি কিছু বলতে চেয়ে থাকতো।

সুগার-বয় আর আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। শুভরাত্রি আর আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে আমরা দাঁড়ালাম না। সেটা ঠিক সুসঙ্গত হবে বলে মনে হলো না। তবে দরজার কাছে পৌঁছে আমি একবার ফিরে তাকালাম, বললাম, চলি তাহলে। কিন্তু এ্যাডাম তার কোনো জবাব দিলো না।

রাস্তায় নেমে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কর্তা একটু ইতঃস্তত করলেন, তারপর বললেন, তোমরা চলে যাও, আমি একটু হাঁটবো।

তিনি জীর্ণ এ্যাপার্টমেন্ট দালান, ছোট্ট মুদী দোকান, বোর্ডিং হাউস আর ক্ষুদে বাংলোগুলির পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে শহরের দিকে এগিয়ে চললেন।

কর্তা যেখানে সব সময় বসতেন, সুগার-বয়ের পাশে, আমি সেখানে গিয়ে বসলাম, আর ঠিক তক্ষুণি এ্যাপার্টমেন্ট দালান থেকে সঙ্গীতের উত্তাল শব্দ ভেসে এলো। জানালাটা খোলা ছিলো, সঙ্গীতের শব্দ হলো প্রচণ্ড উচ্চগ্রামে। এ্যাডাম তার দামী পিয়ানোর উপর পাগলের মতো আঙ্গুল চালাচ্ছে। নায়াগ্রার জলপ্রপাতের গর্জনের মতো সেই শব্দে রাতের বাতাস পূর্ণ হয়ে উঠলো।

আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। কর্তাকে ছাড়িয়ে যাবার সময় দেখলাম তিনি মাথা নিচু করে হাঁটছেন, আমাদের খেয়ালও করলেন না। একটু পরে আমরা একটা ভালো রাস্তায় উঠে এলাম, গাছগুলি এখানে চাঁদোয়ার মতো তাদের শাখা বিস্তার করে আছে, আকাশের পটভূমিতে নতুন গজানো পাতা কালো দেখাচ্ছে, আবার

যেখানে রাস্তার আলো এসে তাদের উপর পড়েছে সেখানে পাতার রঙ হয়ে উঠেছে হাল্কা, প্রায় সাদা। এখন আমরা এ্যাডামের সঙ্গীতের আওতার বাইরে চলে এসেছি।

আমি আসনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলাম, গাড়ির মৃদু দোলানির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। কোমল, আরামদায়ক অনুভূতি। তারপর আমি ওই ঘরের মধ্যে কর্তা আর এ্যাডামের পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ানো দৃশ্যটির কথা ভাবতে বসলাম। ওই দৃশ্য দেখবো বলে আমি কখনো ভাবি নি। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে গেলো।

সত্যটা আমি খুঁজে বার করেছিলাম। ছাই-এর গাদা, জঞ্জালের স্তূপ, রান্নাঘরের আবর্জনা হাতিয়ে আমি সত্যটা বার করে আনি, তারপর সত্যের সেই ছোট্ট টুকরোটা আমি এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে পাঠিয়ে দিই। আমি ওর ধ্যানধারণার সঙ্গে মেলাবার মতো করে সত্যটাকে তৈরি করতে পারি নি। তো, ওকেই এখন তার ধ্যানধারণাকে ওই সত্যের সঙ্গে মেলাবার মতো করে বদলে নিতে হবে। আমরা, ঐতিহাসিক গবেষকরা, এই প্রক্রিয়াতেই বিশ্বাস করি। সত্য আপনাকে মুক্তি দেবে।

অতএব আমি আসনে হেলান গিয়ে এ্যাডাম আর সত্যের কথা ভাবতে লাগলাম। আর কর্তার কথা, আর সত্য সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন সেই কথা। ভালো সম্পর্কে। ন্যায় সম্পর্কে। আর ক্যাডিলাকের দোলানির আমেজ উপভোগ করতে করতে আমার মনে একটা জিজ্ঞাসার উদয় হলো। কর্তা যা বলেছেন তা কি তিনি সত্যিই বিশ্বাস করেন? তিনি বলেছিলেন যে মন্দের ভেতর থেকেই ভালোকে তৈরি করে নিতে হয়, কারণ তাকে তৈরি করার জন্য আর কিছুই নেই। তো তিনি কিছু মন্দের ভেতর থেকে কিছু ভালো অবশ্যই তৈরি করেছেন। ওই হাসপাতালটা। উইলি স্টার্ক হাসপাতাল। উইলি স্টার্ক যখন মৃত্যুবরণ করবেন, তিনি যখন আর থাকবেন না, তখনও ওই হাসপাতাল থাকবে। উইলি স্টার্ক যেমন বলেছেন। তো উইলি স্টার্ক যদি বিশ্বাস করেন যে মন্দের ভেতর থেকেই সব সময় ভালো তৈরি করে নিতে হয় তাহলে টাইনি যখন হাসপাতালের ঠিকাদারী থেকে কিছু ফয়দা তুলবার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিলো তখন তিনি অতো ক্ষেপে গেলেন কেন? যে কাঁচামাল থেকে তিনি কিছু ভালো তৈরি করেন তার সঙ্গে টাইনির মন্দের বিশেষ ধরনটা মিশে যাবে শুধু সেই জন্যই তিনি অতোটা উত্তেজিত হলেন কেন? কর্তা আমার কোট ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলো, তুমি বুঝতে পারছো না? তুমিও কি বুঝতে পারছো না? আমি ওই হাসপাতালটা বানাচ্ছি, দেশের সব চাইতে ভালো একটা প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হাসপাতাল, টাইনির মতো কোনো হতচ্ছাড়াকে আমি এর মধ্যে কোনো রকম গোলমাল পাকাতে দেবো না। আমি এর নামকরণ করবো উইলি স্টার্ক হাসপাতাল, আর আমি মরে যাবার পর, আমি যখন

থাকবো না তখন, তুমি মরে যাবার পর, তুমি যখন থাকবে না তখন, ওই কুত্তার বাচ্চাগুলোও মরে যাবার পর, ওরাও যখন কেউ থাকবে না, তখনও এই হাসপাতাল থাকবে।

কিন্তু এর মধ্যে তো কোনো সঙ্গতি নেই। বিন্দুমাত্র সঙ্গতি নেই। কর্তাকে এক সময় এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

একবার কর্তাকে আমি অন্য একটা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। যে–রাতে তাঁকে ইমপিচ করার উদ্যোগ ভেস্তে যায়। যে–রাতে ক্যাপিটল ভবনের সামনের প্রান্তর চারিদিক থেকে উপচে পড়া জনতার ঢলে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। দীর্ঘ ফ্রক–কোট আর হরিণের চামড়ার পোশাক–পরা তরবারি ঝোলানো ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি দাঁড়িয়েছিলো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। তাদের পদপ্রান্তের ফুলের বেডগুলি জনতা মাড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছিলো সে–রাতে। যখন ক্যাপিটলের সুউচ্চ দরজা দিয়ে বেরিয়ে উইলি স্টার্ক স্পটলাইটের নীলচে আলোর নিচে উঁচু সিঁড়িগুলির সর্বোচ্চ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারী এবং ধীর–গতিতে, আলোর দ্যুতিতে চোখ মিটমিট করছিলো তাঁর। তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, পাথরের প্রশস্ত চাতালে সম্পূর্ণ একা, তাঁর পেছনে উঁচু হয়ে ওঠা বিশাল প্রস্তরের পটভূমিতে চোখ মিটমিট করতে থাকা তাঁকে মনে হচ্ছিলো নিঃসঙ্গ, হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষ। জনতার ভেতর থেকে গানের মতো একটানা ধ্বনি উঠছিলো, উইলি — উইলি — আমরা উইলিকে চাই। তিনি সিঁড়ির উপর বেরিয়ে আসতেই সেই ধ্বনি থেমে গেলো। এক মুহূর্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। কোথাও কোনো শব্দ নেই। তারপর জনতার মধ্য থেকে হঠাৎ আবার প্রচণ্ড ধ্বনি উঠলো — কোনো কথা ছাড়াই। অনেকক্ষণ পর তিনি উর্ধ্বে হাত তুললেন, ওদের চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর হাত নামিয়ে আনলেন, মনে হলো ওই হাতের চাপে জনতার গর্জন স্তিমিত হয়ে মিলিয়ে গেলো।

তারপর তিনি বললেন, ওরা আমাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো কিন্তু ওরাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার জনতা গর্জে উঠলো, এবং তাঁর হাতের ইঙ্গিতে আবার তা থেমে গেলো।

তিনি বললেন, ওরা আমাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো কারণ আমার কাজ ওদের পছন্দ হয় নি। তোমাদের হয়েছে কি?

আবার গর্জন উঠলো, আবার থামলো।

তিনি বললেন, এবার আমি কি করবো সে কথা তোমাদের বলছি। আমি একটা হাসপাতাল বানাবো। সব চাইতে বড়ো, সব চাইতে সুন্দর। যতো টাকা লাগে।

তোমরা হবে সেই হাসপাতালের মালিক। যে কোনো পুরুষ কিংবা নারী কিংবা শিশুর অসুখ হলে, ব্যথ্যা-যন্ত্রণা হলে, ওই হাসপাতালে যাবে, এবং মানুষের পক্ষে যতোটুকু সাধ্য তাই করা হবে তার জন্য। তার অসুখ সারাবার জন্য, তার ব্যথা-যন্ত্রণা উপশমের জন্য। এবং বিনি পয়সায়। দয়া-দাক্ষিণ্য হিসেবে নয়। অধিকার হিসাবে। এটা তোমাদের অধিকার। বুঝলে? তোমাদের অধিকার এটা!

জনতা গর্জে উঠলো।

তিনি বললেন, আর প্রতিটি শিশু যেন পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে সেটাও তোমাদের অধিকার। কোনো বৃদ্ধ, কোনো অথর্ব মানুষকে, খাদ্যাভাবে পড়তে হবে না, প্রাণধারণের জন্য তাকে ভিক্ষা করতে হবে না। যে-মানুষ কোনো কিছু উৎপাদন করবে সে তা বিনা বাধায় বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে পারবে, তার জন্য তাকে কোথাও কোনো তোলা দিতে হবে না। কোনো দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ি বা জমির উপর কর আরোপ করা হবে না। বিত্তশালী মানুষ আর বড়ো বড়ো কোম্পানী, যারা এই স্টেট থেকে সম্পদ আহরণ করে, তাদেরকে এই স্টেটের জন্য একটা ন্যায্য অংশ দিতে হবে। তোমাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকতে দেয়া হবে না।

আবার জনতার গর্জন উঠলো। এ্যান স্ট্যান্টন ওই সময় আমার বাহুলগ্না, জনতার চাপে সে আমার গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে গেছে। জনতার চিৎকার মিলিয়ে যেতেই সে প্রশ্ন করলো, জ্যাক, তিনি যা বললেন তা কি সত্যি? সত্যিই তিনি এসব করতে চান?

আমি বললাম, এর অনেক কিছু তিনি ইতিমধ্যে করেছেন।

এ্যাডাম ঠোঁট কুঁচকে বললো, হ্যাঁ, করেছেন। ওটাই তাঁর ঘুষ।

আমি জবাব দিলাম না — আমার জবাব কি হতো তাও আমি জানি না — কারণ ওই মুহূর্তে সুউচ্চ সিঁড়িগুলির মাথায় দাঁড়িয়ে উইলি স্টার্ক বলছিলেন, আমি ওই জিনিসগুলো করবো। ঈশ্বর আমার সহায় হোন। আমি বেঁচে থাকবো তোমাদের ইচ্ছায় আর অধিকারে। আর যদি কেউ সেই অধিকার আর ইচ্ছা পূরণের পথে আমাকে বাধা দেয় তবে আমি তাকে ভেঙে গুঁড়ো করে দেবো। এইভাবে গুঁড়িয়ে দেবো।

তিনি তাঁর দু'বাহু নিজের কাঁধের সমান উঁচু করে তাকে ছড়িয়ে দিলেন, তারপর ডান মুঠি দিয়ে বাঁ করতলে সজোরে আঘাত হানলেন। বললেন, এইভাবে। আমি তাকে এইভাবে আঘাত করবো, তার কটিদেশে আর উরুতে, তার পায়ের হাড়ে, আর ঘাড়ের হাড়ে, কিডনি পাঞ্চ, র‍্যাবিট পাঞ্চ, আপারকাট, আর সোলার প্লেক্সাস। আর কি দিয়ে বা কিভাবে আমি আঘাত করছি সেকথা আমি ভাববো না।

জনতার গর্জনধ্বনির মধ্যে এ্যানের কানের কাছে মুখ এনে এবার আমি চেঁচিয়ে বললাম, তিনি করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ্যান আমার কথা শুনতে পেয়েছিলো কিনা আমি জানি না। সে সিঁড়ির উপর দাঁড়ানো লোকটিকে লক্ষ করছিলো। তিনি তখন দু'চোখ বিস্ফারিত করে জনতার দিকে সামনে ঝুঁকে পড়ে বলছিলেন, আমি তাকে আঘাত করবো। আমি তাকে আঘাত করবো ওই মাংস কাটার কুঠার দিয়ে।

বলেই তিনি হঠাৎ তাঁর দু'বাহু নিজের মাথার উপর তুলে ধরলেন, কোটের হাতা টানটান হয়ে সরে এলো, শার্টের হাতা দেখা গেলো, মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, দাও, মাংস কাটার কুঠারটা আমার হাতে তুলে দাও!

আবার জনতা গর্জে উঠলো।

তিনি ধীরে ধীরে তাঁর দু'হাত নামিয়ে আনলেন, ওদের থামতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের ইচ্ছা আমার শক্তি।

একটু থামলেন, তারপর বললেন, তোমাদের প্রয়োজন আমার ন্যায়। আমার ন্যায়ের মানদণ্ড।

তারপর, ব্যস, আমার কথা শেষ।

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ক্যাপিটল ভবনের সুউচ্চ দরজা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। জনতার গর্জনধ্বনি এবার আরো উত্তাল হলো, সমস্ত আকাশ বাতাস পূর্ণ হয়ে গেলো সেই ধ্বনিতে। আমিও নিজের মধ্যে একটা স্ফীতি অনুভব করলাম, শোণিত আর বিজয়ের স্ফীতির মতো। আমি ক্যাপিটলের বিশাল অন্ধকার দ্বারপথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। জনতার গর্জন তখনো চলছে।

এ্যান স্ট্যান্টন আমার বাহুতে টান দিয়ে প্রশ্ন করলো, উনি কি সত্যিই এসব করবেন, জ্যাক?

কী কাণ্ড! আমি কেমন করে জানবো! আমার নিজের কণ্ঠস্বরে আমি একটা হিংস্রতার আভাস পেলাম।

কুঞ্চিত ঠোঁটে এ্যাডাম স্ট্যান্টন বললো, ন্যায়! ওই শব্দটা ব্যবহার করলেন তিনি।

আর তখনই, এক মুহূর্তের জন্য, এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে আমি ঘৃণা করলাম।

আমি ওদের বললাম যে এবার আমাকে যেতে হবে। কথাটা সত্য। আমি জনতার পাশ ঘেঁষে ধীরে ধীরে পুলিশ বেষ্টনীর দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর ক্যাপিটলের পেছন দিকে কর্তার সঙ্গে মিলিত হলাম।

সেই রাতে, গভর্নর প্রাসাদে ফিরে আসার পর, তিনি যখন টাইনি আর তার দলবলকে নিজের স্টাডি থেকে বার করে দিলেন তখন, আমি তাঁকে প্রশ্নটা করি। আমি জানতে চাই, আপনি যা বলেছেন তা কি সত্যিই মন থেকে বলেছেন?

বড়ো চামড়ার কৌচে তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

এই আজ রাতে যে সব কথা বললেন। আপনি বলেছেন যে তাদের ইচ্ছা আপনার শক্তি। তাদের প্রয়োজন আপনার ন্যায়। এই সব কথা।

তিনি আমার দিকে তাকিয়েই থাকলেন। দু'চোখ বিস্ফারিত। তাঁর দৃষ্টি আমার দৃষ্টির সঙ্গে লড়ছে, আমার ভেতরটা দেখতে চাইছে।

আমি বললাম, আপনি ওই সব কথা বলেছেন।

এবার তিনি হিংস্রভাবে বলে উঠলেন, নিকুচি করি তোমার — তিনি তখনো স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত দিয়ে নিজের বুকে দু'বার আঘাত করে তিনি বললেন, নিকুচি করি তোমার — তোমার মধ্যে কিছু একটা আছে — তোমার মধ্যে —

কথাটা তিনি শেষ করলেন না। আমার উপর থেকে চোখ সরিয়ে তিনি আত্মমগ্নভাবে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমিও আমার প্রশ্নটা নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করলাম না।

তো, বহুদিন আগে আমি যখন তাঁকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম তখন এই হয়েছিলো তার পরিণতি। এখন আবার আমার তাঁকে একটা নতুন প্রশ্ন করতে হবে। তিনি যদি বিশ্বাস করেন যে মন্দের ভেতর থেকেই ভালোকে তৈরি করতে হবে, কারণ অন্য কিছুই নেই যার মধ্য থেকে তাকে তৈরি করা যায়, তাহলে উইলি স্টার্ক হাসপাতালের উপর থেকে টাইনির হাত দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তিনি অতো হৈ চৈ করলেন কেন?

আমার আরও একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিলো। সেটা জিজ্ঞাসা করতে হবে এ্যান স্ট্যান্টনকে। প্রশ্নটা আমার মনে জাগে সেই রাতে যেদিন কুয়াশাঘেরা নদীর বুকে জেটির উপর এ্যান স্ট্যান্টন আমাকে তার এ্যাডামের বাড়িতে যাবার কথা বলেছিলো। এ্যাডামকে যে উইলি স্টার্ক হাসপাতালের পরিচালকের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সে-ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য ও এ্যাডাম স্ট্যান্টনের এ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলো। কথাটা শুনেই আমার মনে একটা অস্বস্তি জেগেছিলো। আপনার দু'হাত জোড়া, চুলকাবার উপায় নেই,. অথচ খুব চুলবুল করছে, তখন যে রকম হয় সেই রকম হয়েছিলো আমার অবস্থা। কেন আমার

অস্বস্তি হচ্ছিলো আমি তখন বুঝতে পারি নি। প্রশ্নটা আমি ধরতে পারছিলাম না। আমি তখন পুরো পাত্রটাই উনুনের পেছন দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম। সেখানে একটু একটু করে সেটা গরম হচ্ছিলো। কয়েক সপ্তাহ তেতে ওঠার পর হঠাৎ এক সময় ওটা টগবগ করে ফুটে বেরিয়ে আসে, আর তখুনি প্রশ্নটা কি ছিলো সেটা আমি জেনে ফেলি। হাসপাতালে যোগদানের আমন্ত্রণের কথা এ্যান স্ট্যান্টন জানলো কি ভাবে?

একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহের আবকাশ ছিলো না। আমি ওকে বলি নি।

হয়তো এ্যাডামই ওকে বলেছিলো, তারপর সে এ্যাডামের সঙ্গে ওই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে যায়। অতএব আমি এ্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ও তখন আকণ্ঠ কাজে নিমজ্জিত। নিজের ডাক্তারি আর শিক্ষকতা, তার উপর হাসপাতালের নক্শা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ততা, প্রায় এক মাস হলো সে তার পিয়ানো স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে নি, মুখ অনিদ্রার ফলে শীর্ণ। বরফের মতো শীতল চোখ তুলে সে আমাকে দেখলো। আমার সঙ্গে আচরণ করলো ক্রোমিয়াম-মোড়া মাত্রাতিরিক্ত সৌজন্যের সঙ্গে, যৌবনের বন্ধুর সঙ্গে যে আচরণ একান্তই বেমানান। ওই সৌজন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে প্রশ্নটা করার জন্য বেশ সাহস সঞ্চয় করে নিতে হয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা আমি করলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ্যাডাম, তোমার কাছে এ্যান যখন প্রথম বার আসে — ওই কাজটা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য — মানে, ওই হাসপাতালের কাজটা — তখন কি তুমি তাকে বলেছিলে —

ছুরির মতো শাণিত গলায় সে বললো, আমি সেকথা আলোচনা করতে চাই না।

কিন্তু আমাকে যে জানতেই হবে। তাই আমি আবার বললাম, তুমি কি ওকে প্রস্তাবটার কথা বলেছিলে?

না। আর আমি তো তোমাকে বললাম যে আমি এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আমার কণ্ঠস্বর শোনালো শুকনো, যেন আমার নিজের গলা নয়। আমি বললাম, বেশ, ঠিক আছে।

সে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালো, তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার কাছে এক পা এগিয়ে এসে বললো, আমি দুঃখিত। আমি দুঃখিত, জ্যাক। আমি খুব টেনশনের মধ্যে আছি। সে তার মাথা সামান্য একটু নাড়লো, যেন ঘুমের কুয়াশা ঝেড়ে ফেলছে। তারপর বললো, ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না। ও আরো এক পা অগ্রসর হলো আমার দিকে। আমি শেলফের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার

মুখের দিকে আবার তাকালো সে, বাহুর উপর হাত রাখলো, তারপর বললো, আমি দুঃখিত, জ্যাক — ওই ভাবে কথা বলা — কিন্তু আমি এ্যানকে কিচ্ছু বলি নি — আর আমি সত্যিই দুঃখিত।

আমি বললাম, ওকথা ভুলে যাও।

সে সায় দিলো। শীতল হাসি হেসে, আমার বাহুতে আস্তে চাপড় মেরে সে বললো, যাবো, যদি তুমি ভুলে যাও।

নিশ্চয়, আমি বললাম। আমি নিশ্চয়ই ভুলে যাবো। হ্যাঁ, আমি ভুলে যাবো। ওটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওকে কে বলেছে সেটা। খুব সম্ভব আমিই বলেছি, তারপর নিজেই ভুলে গেছি।

এ্যাডাম আমাকে শুধরে দিলো। আমি বলছিলাম তোমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছি সেটা ভুলে যাবার কথা, যে রকম হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, ওহ্, সেটা। নিশ্চয়ই। আমি সেটা ভুলে যাবো।

তারপর সে আমার মুখ খুঁটিয়ে দেখলো, একটা প্রশ্ন কালো হয়ে ঘনিয়ে এলো তার চোখে। এক মুহূর্ত সে চুপ করে থাকলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কেন জানতে চেয়েছিলে?

এমনি, আমি বললাম। এমনি, নিছক কৌতূহল। কিন্তু এখন আমার মনে পড়েছে। আমিই ওকে বলেছিলাম। হ্যাঁ। আমার হয়তো বলা উচিত হয় নি। আমি ওকে এর মধ্যে জড়াতে চাই নি। বেখেয়ালে বলে ফেলেছিলাম। কোনো গোলমাল হোক আমি চাই নি। আমি ভাবি নি যে —

যতোক্ষণ আমি এই ভাবে বক বক করে যাচ্ছিলাম ততোক্ষণ মনের ওই শীতল, প্রেমহীন অংশ ওই আইবুড়ো মাসী, স্নানঘরে মাতাল যে আয়নার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেই আয়না, ওই স্থির ছোট্ট কণ্ঠস্বর, তোমার আত্মমর্যাদার পনীরের মধ্যেকার সেই পোকা, রাতের দুঃস্বপ্নের বাতাসে ওই ভাষ্যকার, তোমার প্রতিটি ভোজে ওষ্ঠহীন যুক্তিবাদিতার ওই মড়ার মাথা — মনের ওই সব অংশ বলে চলেছিলো, ওহে, তুমি ব্যাপারটা আরো খারাপ করে তুলছো, তোমার মিথ্যে কথা পরিস্থিতিটা আরো বিশ্রী করে দিচ্ছে, বুদ্ধু কোথাকার, তুমি কি তোমার এই আবোল-তাবোল বকুনি থামাতে পারো না?

আর ওদিকে এ্যাডাম তার সাদা হয়ে যেতে থাকা মুখ নিয়ে বলছে, না, তুমি যাকে গোলমাল বলছো সেরকম কিছু হয় নি।

কিন্তু আমি থামতে পারছিলাম না। তোমার গাড়ি যখন হঠাৎ একেবারে পাহাড়ের প্রান্তসীমায় বরফের কিনারায় এসে দাঁড়ায়, ব্রেকে পা দেবার আগেই যখন

গাড়ি তার উপরে গিয়ে পড়ে, কি মসৃণভাবে গাড়িটা গড়িয়ে যাবে, ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়বে, এতো চমৎকার, এতো মুক্ত, তুমি আর থামতে পারো না, ছেলেবেলার মতো, তুমি তখন হেসে ওঠো। আমার অবস্থা হলো সেই রকম। আমি থামতে না পেরে বলে চললাম, না, ঠিক গোলমাল নয় — মানে, তোমার উপর তাকে লেলিয়ে দেবার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত — আমি চাই নি যে — ইয়ে, আমি শুধু —

ও বললো, এ নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। ওর চোয়াল শক্ত হয়ে চেপে বসলো। আমার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ও ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলো। খুব ঋজু, মিলিটারি ভঙ্গিতে।

অতএব, আমি বিদায় নিলাম। ওর ক্রোমিয়াম-মোড়া সৌজন্য ছিলো এতো উজ্জ্বল, এতো শীতল যে আমরা 'আবার দেখা হবে, ভায়া' কথা ক'টি বাসি-পুরানো ভুট্টার রুটির মতো আমার গলায় আটকে গেলো।

কিন্তু ও এ্যান স্ট্যান্টনকে বলে নি। আর আমিও তাকে বলি নি। তাহলে কে তাকে বললো। ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিলো যে কোথাও হয়তো অসতর্ক কথাবার্তা হয়েছে, খবরটা কোনোভাবে বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ, সেভাবেই ওর কানে পৌঁছেছে। খুব সম্ভব আমি ওই উত্তরটা গ্রহণ করেছিলাম, কারণ আমার পক্ষে সেটা গ্রহণ করাই ছিলো সব চাইতে সহজ। কিন্তু আমার মনের গভীরে আমি জানতাম যে কর্তা কখনো অসতর্ক শিথিল কথাবার্তা বলেন না, যখন বলেন তখন সচেতনভাবে ইচ্ছা করেই বলেন, আর তিনি নিঃসন্দেহে জানতেন যে অগ্রিম গুজব শুরু হয়ে গেলে এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে আর কিছুতেই কাজের জন্য পাওয়া যাবে না। আমি এটা ঠিকই বুঝেছিলাম, কিন্তু ছায়াটা আমার দিকে ভেসে আসতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন শামুকের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তা শামুককে তো বাঁচতে হবে, নাকি?

কিন্তু এ্যান স্ট্যান্টনকে কথাটা কে বলেছিলো সেটা আমি জেনে ফেলি।

সে দিন ছিলো মে মাসের মাঝামাঝি, সুন্দর সকাল, সাড়ে ন'টার মতো, তখনো বসন্তের শেষ ছোঁয়া কিছুটা লেগে আছে — অবশ্য কোনো এক সময় যে বসন্ত এসেছিলো সেকথা মানুষ প্রায় ভুলেই গিয়েছে — বাতাসে কেমন দুখের মতো একটা আভাস, আমার জানালা দিয়ে আমি দূরে নদী দেখতে পাচ্ছিলাম, ছোট্ট অস্পষ্ট সাদা এক চিলতা, সেটাও দুখের মতো। ঋতুটাকে মনে হচ্ছিলো কোনো দরিদ্র ভাগ্যবিড়ম্বিত ভাগচাষীর ভরাট-বক্ষ চমৎকার কন্যার মতো, মোটা হয়ে উঠতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনো কোমর বোঝা যায়, গোলাপী গণ্ড, উজ্জ্বল চোখ, ঝাঁকড়া চুলের কোল ঘেঁষে ছোট ছোট স্বেদবিন্দু জমেছে, কিন্তু তাকে দেখে আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন যে অল্পদিনের মধ্যেই হাড়-মাস ছাড়া তার দেহে আর কিছুই

থাকবে না, মুখ বিশ্রী আর বুড়োটে দেখাবে, মর্চে পড়া একটা আংটার মতো। কিন্তু এখন আপনি যদি তাকে ভালো করে লক্ষ করেন তাহলে তার সৌন্দর্য আপনাকে রীতিমত ভীত চঞ্চল করে তুলতে পারে। সে দিন সকালে ঋতুটা দেখতে ছিলো ওই রকম, ওই রকম অনুভূতিই সেটা আপনার মনে জাগিয়ে তুলতো, যদিও আপনি জানতেন জুন মাসের শেষ নাগাদ সেটা রূপান্তরিত হবে শুকনো হাড় আর মাসে, বিশ্রী বুড়োটে চেহারা হবে তার, আপনার ঘুম ভাঙবে ঘামে ভেজা চিটচিটে চাদরের উপর, মুখ বিস্বাদ, পুরানো তামার মতো। কিন্তু এখন গাছে পত্রপল্লব ঝুলে আছে, ঘন আর পুরু, এখনো সেগুলি কুঁকড়ে যেতে শুরু করে নি। আমি আমার অফিস ঘরের জানালা দিয়ে নিচে সবুজের বড়ো বড়ো, ফোলা ফোলা, গুচ্ছ আর সম্ভার দেখতে পাচ্ছিলাম। সেগুলি আর কিছু নয়, ক্যাপিটল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষরাজি, আমার জানালার সুউচ্চ অবস্থান থেকে ওই রকম দেখাচ্ছিলো। ওই বিরাট গাছগুলির একটার গভীরে যে সবুজের গোলকধাঁধা, তার গুঁড়ির কাছে ছায়াছায়া কুঠুরীর মধ্যে যে ফাঁপা জায়গা তার কথা মনে হলো আমার, সেখানে হয়তো একটা বড়োসড়ো বিদঘুটে দাঁড়কাক কোনো বন্য বর্বর সম্রাটের মতো আলগোছে বসে আছে, তার কালো ঝকঝকে বোতামের মতো চোখ নিয়ে সবুজের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে স্থির দৃষ্টিতে। তারপর হঠাৎ হয়তো সে নিঃশব্দে সেখান থেকে উড়ে যাবে, সবুজের পর্দা ভেদ করে, চলে যাবে উজ্জ্বল সূর্যালোকের মধ্যে, তারপর অকস্মাৎ চিৎকার করে সবার কান ঝালাপালা করে দিতে আরম্ভ করবে। আমি নিচের দিকে তাকিয়ে ওই রকম একটা ফাঁকা ভেতর–কুঠুরীর অভ্যন্তরে নিজেকে কল্পনা করতে পারতাম, স্বচ্ছ সবুজ আলোর মধ্যে, ওই গাছের বিশাল শরীরের ভেতর, এখন আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য একটা দাঁড়কাকও নেই, কারণ কাকটা উড়ে চলে গেছে, গাছের পাতাগুলি এত ঘন যে তার মধ্য দিয়ে ওপাশে কিছু যে আমি দেখবো তারও কোনো সম্ভাবনা নেই, কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু দূর থেকে যান চলাচলের আবছা ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে, যেন সমুদ্র একমনে গাম্ চিবুচ্ছে।

কল্পনাটা ছিলো চমৎকার, প্রশান্ত, সুন্দর। আমি নিচের সবুজ থেকে আমার দৃষ্টি প্রত্যাহার করে আমার ঘোরানো চেয়ারে আরাম করে বসলাম, টেবিলের উপর পা তুলে দিলাম, তারপর চোখ বুঁজে কল্পনা করলাম যে আমি শোঁ করে নিচে নেমে গিয়ে সবুজের মধ্য দিয়ে আরো ভেতরকার আকস্মিক সবুজ প্রশান্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আপনি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে স্বপ্নের মতো গুঞ্জন করা বিজলী পাখার শব্দ শুনতে লাগলাম, আমার মনে হলো আমি যেন সেই শোঁ করে নিচে নেমে যাবার আশ্চর্য অনুভূতি, তারপর ভেতরকার সেই প্রশান্তি, অনুভব করলাম। শুধু

যদি ডানা থাকতো আমার।

ঠিক ওই সময় অভ্যর্থনা কক্ষের বাইরে একটা হৈ চৈ-র শব্দ কানে আসতেই চোখ খুললাম। কেউ একজন দরজায় প্রচণ্ড শব্দ করলো। প্যাসেজে দ্রুত অস্পষ্ট কি যেন চোখে পড়লো, তারপরই আমি দেখলাম স্যাডি বার্ককে, আমার খোলা দরজার সামনে একটা বিশাল বাঁক সৃষ্টি করে সে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করছে, সশব্দে দরজা বন্ধ করে আমার দিকে সবেগে ছুটে আসছে, সবটাই যেন একটা অভঙ্গ গতির তোড়ে বাঁধা। সে আমার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তার ফুরিয়ে যাওয়া দম আবার বুকের মধ্যে টেনে নিলো, যেন যা বলার তা ঠিক মতো বলতে পারে।

অবিকল সেই পুরনো দিনের মতো। অনেক দিন তাকে আমি এতো উত্তেজিত হতে দেখি নি। আমার সেই সকালের কথা মনে পড়লো। শিকাগোতে, বহু কাল আগে, বিনোদন প্রতিষ্ঠানের এক নর্ডিক জলকন্যা কর্তার শয্যায় স্থান করে নিয়েছিলো। ব্যাপারটা জানবার পর স্যাডি কর্তার ঘর থেকে বিস্ফোরণের মতো ছিটকে বেরিয়ে, একটা দুর্দান্ত প্যারাবোলা সৃষ্টি করে, আমার ঘরে এসে ঢুকেছিলো, তার ছোট করে ছাঁটা কালো চুল এলোমেলো, মুখটা দেখাচ্ছিলো ব্রনের দাগভর্তি মেডুসার প্ল্যাস্টার-অব-প্যারিস মুখোশের মতো, শুধু চোখ দুটি যেন জ্বলন্ত অঙ্গার আর কেউ হাপরের হাওয়া দিয়ে তার আগুনকে আরো প্রজ্বলিত করে দিয়েছে।

তো, সেদিনের পর থেকে নিঃসন্দেহে আরো বহু পরিস্থিতি গেছে যখন কর্তা আর স্যাডির মধ্যে যাকে পরিপূর্ণ ঐকমত্য বলে তা বিরাজ করে নি। নর্ডিক জলকন্যা থেকে ক্রনিকল পত্রিকার ঘরসংসারের টুকিটাকির স্তম্ভকার যেসব বিষয়ে ইঙ্গিত দেয় সেসব কর্তার জীবনে নিয়মিত এসেছে, আর স্যাডি এগুলি ঠিক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেও দেখে নি — ক্ষমাসুন্দর স্বভাবের অধিকারী ছিলো না স্যাডি — কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত সহঅবস্থানের পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিলো। স্যাডি আমাকে বলেছিলো, জাহান্নামে যাক ও। ওই সব কুলটা ছাড়া যদি ওর না চলে তাহলে মাঝে মাঝে ঢলাঢলি করুক ওদের সঙ্গে। কিন্তু ওকে আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে। ও জানে যে আমাকে ছাড়া ও চলতে পারবে না। কিছুতেই পারবে না, সেটা ও জানে। একটু থেমে কঠিন মুখে স্যাডি যোগ করেছিলো, আর সে চেষ্টা না করাই তার পক্ষে মঙ্গলকর হবে। তো, ওই ভাবেই চলছিলো। সাডির প্রচণ্ড ক্রোধ, কর্তাকে জাহান্নামে পাঠানো, তার বিদ্রূপ, আর তার তীব্র তিরস্কারের চাবুক — আর কি সেই চাবুক — কখনো কখনো অশ্রুহীন বিরল শোকের প্রকাশ, সব মিলে স্যাডি যেন এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ পেতো। প্রতিটি নতুন-পুরানো ঘটনাকে একটা ছক ধরে এগিয়ে যেতে দেখতো সে,

কর্তা এক সময় কুলটা মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, তারপর আবার স্যাডির সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন, হাসিমুখ, ভারী চেহারা, নিশ্চিত এবং ধৈর্যশীল, গালাগালির চাবুক খাবার জন্য প্রস্তুত। স্যাডি নিজেই হয়তো অনেক দিন আগে থেকেই এই গালাগালে আর বিশ্বাস করতো না, এমন কি যা বলছে তাও আর ভেবে চিন্তে বলতো না। রসালো বিশেষণগুলি অনেক আগেই তার স্বাদ-গন্ধ হারিয়ে ফেলেছিলো, সমস্ত দৃশ্যটার মধ্যে একটা কর্কশ যান্ত্রিকতা এসে পড়েছিলো। যেন একটা ফাটা গ্রামোফোন রেকর্ড কিংবা কোনো বুভুক্ষু পাদ্রীর ভাষণ। শব্দগুলি স্যাডি ঠিকই উচ্চারণ করতো কিন্তু সেদিকে তার কোনো মনোযোগ ছিলো না।

কিন্তু মে মাসের ওই চমৎকার সকালের ব্যাপারটা ছিলো ভিন্ন রকম। ঠিক আগের দিনের মতো স্যাডির বুক হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। যন্ত্রের মধ্যে বাষ্প মাপার কাঁটা একেবারে বিপজ্জনক লাল বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। তারপরই সে ফেটে পড়লো।

আবার করেছেন উনি, আবার — এই আমি শপথ করে বলছি —

কি করেছেন? আমি জানতে চাইলাম, যদিও তিনি কি করেছেন সেটা ঠিকই বুঝেছিলাম। আরেকটা বাজে মেয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই ঝুলে পড়েছেন।

স্যাডি বললো, ও আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে।

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে ওকে লক্ষ করলাম। সকালের উজ্জ্বল আলো সরাসরি নিষ্ঠুরভাবে তার মুখের উপর পড়েছে, কিন্তু চোখ দুটি তখনো অপরূপ।

সে বললো, হারামজাদা! আমার সঙ্গে প্রতারণা!

আমি শিথিলভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়া অবস্থাতেই, টেবিলের উপর রাখা আমার পায়ের জুতোর উপর দিয়ে তার মুখের উপর চোখ রেখে বললাম, দেখো স্যাডি, এই হিসেবটা আমরা অনেক দিন আগেই শেষ করেছি। তিনি তোমার সঙ্গে কোনোরকম প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন না। সে রকম কিছু যদি করে থাকেন তবে সেটা করছেন লুসির সঙ্গে। তোমার সঙ্গে নয়।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি ওই কথাগুলি বললাম শুধু ওর চোখে আরো একটু আগুন জ্বালিয়ে তোলা সম্ভব কিনা সেটা দেখার জন্য। সম্ভব হলো।

কারণ সে বললো, তুমি — তুমি — সে আর কথা খুঁজে পেলো না।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে আমি বললাম, আমি কি?

তুমি, আর তোমার ওই উচুঁতলার শানদার সব বন্ধুরা — তারা জানেটা কি — কি জানে তারা? কোনো একটা বিষয়ে? আর ওদেরকে তোমরা জড়াবেই।

কিসের কথা বলছো তুমি?

আমি হয়তো ওদের মতো সূক্ষ্ম রুচিবান নই, অত শানদার নই। ঝুপড়িতে দিন কেটেছে আমার, কিন্তু আমি না হলে ওকে আর গভর্নর হতে হতো না, এই মুহূর্তে উনি আর গভর্নর থাকতেন না, এবং সেকথা উনি খুব ভালোভাবেই জানেন, আর ভালো চাইলে ওই মেয়ে যেন আর রং-ঢং না করে, করলে রুচিবান হোক বা না হোক আমি ওকে মজা দেখিয়ে ছাড়বো। এই তোমাকে বলে রাখলাম আমি!

আঃ, কিসের কথা বলছো তুমি?

টেবিলের উপর দিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে তার আঙুল নাড়াতে নাড়াতে সে বললো, আমি কিসের কথা বলছি তা তুমি ভালো করেই জানো। আর তুমি ওখানে বসে মিটিমিটি হাসছো, ভাবছো তুমি কতো শানদার, কতো রুচিবান। তুমি যদি সত্যিকার পুরুষ মানুষ হতে তা হলে এক্ষুণি ওর ঘরে গিয়ে ওর মাথা ফাটিয়ে দিতে। আমি ভেবেছিলাম মেয়েটা তোমার। কিংবা, কে জানে, তিনি হয়তো তোমাকেও বাগিয়ে নিয়েছেন। যেভাবে ওই ডাক্তারকে বাগিয়েছেন সেভাবে তোমাকেও তাঁর পথে নিয়ে এসেছেন।

স্যাডি আমার দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে বললো, হয়তো তোমাকেও একটা হাসপাতালের পরিচালক বানিয়ে দিচ্ছেন। হ্যাঁ। তো তোমাকে কিসের ডিরেক্টর বানাচ্ছেন?

ওর কথার বন্যা, হিংস্র আঙুল নাচানো আর অগ্নিবর্ষী চোখের তাড়নায় আমি দ্রুত সোজা হয়ে বসে সশব্দে টেবিল থেকে আমার পদযুগল মাটিতে নামালাম, তারপর তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার মাথার মধ্যে তখন রক্ত দাপাদাপি করছে, মাথাটা টলমল করছে, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে অনেক সময় যেমন হয়, চোখের সামনে লাল লাল বিন্দু নেচে বেড়াতে দেখছি। তখনো ওর কথার স্রোত চলছিলো। তারপর তার ওই প্রশ্নের সঙ্গে কথার তোড় থামলো।

আমি তখন দৃঢ় গলায় বললাম, তুমি কি বলতে চাও যে — আমি এ্যান স্ট্যান্টনের নামটা প্রায় উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলাম, কারণ ওই নামটাই সুস্পষ্টভাবে আমার মনে জেগে উঠেছিলো, চোখের সামনে যেন বিরাট বোর্ডে সেটা লেখা রয়েছে, কিন্তু হঠাৎ সেই নামটি আমার গলায় আটকে গেলো, আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম যে আমি নামটা বলতে পারছি না। তাই আমি বললাম, — যে সে — সে —

কিন্তু স্যাডি বার্ক সোজা আমার মনের ভেতরটা দেখছিলো — অন্ততঃ আমার সেই রকমই অনুভূতি হয় — আর মুষ্টিযোদ্ধার মতো দ্রুত সে ওই নামটি আমার

দিকে ছুঁড়ে দিলো, হ্যাঁ, সে, সে, ওই স্ট্যান্টন পরিবারের মেয়ে, তোমার এ্যান স্ট্যান্টন!

আমি এক মহূর্তের জন্য সোজা স্যাডির চোখের দিকে তাকালাম, আর হঠাৎ ওর জন্য আমার এতো কষ্ট হলো যে চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিলো। এটাতেই আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। স্যাডির জন্য এত কষ্ট বোধ হলো আমার। তারপর আমি আর কিছুই অনুভব করলাম না। নিজের জন্যও আমার কোনো রকম দুঃখবোধ হলো না। আমার মনে হলো আমি যেন একটা কাঠের রেড ইণ্ডিয়ান মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ, এবং আমার মনে পড়ছে আমার পদযুগল কাঠের হলেও যে নিখুঁতভাবে নড়াচড়া করতে পারছিলো তা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, আমি ওই পা নিয়ে সোজা হ্যাটর্যাকের দিকে এগিয়ে যাই, আমার ডান হাত, কাঠের হলেও, সোজা সেখান থেকে আমার পুরনো পানামা হ্যাটটা তুলে নেয়, সেটা আমার মাথায় চাপিয়ে দেয়, তারপর আমার পদযুগল সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, দীর্ঘ অভ্যর্থনা কক্ষের কার্পেটের উপর দিয়ে, সে কার্পেট বসন্তের নিপুণভাবে ছাঁটা লনের মতো কোমল আর গভীর, তারপর ওই পদযুগল বেরিয়ে গিয়ে পড়ে বাইরের ঝনঝন করা মার্বেলের উপর।

এবং বিশাল একটা পৃথিবীতে। মনে হলো এত বড়ো পৃথিবী আগে কখনো দেখি নি। এ যেন সাদা, রোদ-ঝলমল কংক্রিটের পথ ধরে, বাঁক নিয়ে, ব্রোঞ্জের মূর্তি আর নক্ষত্র এবং অর্ধচন্দ্রের আকৃতিতে গড়া অনবদ্য সব ফুলের বেডের পাশ দিয়ে অন্তহীনভাবে চলছে তো চলছেই, সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে বড়ো বড়ো সবুজের বিস্তারকে অতিক্রম ক'রে অন্তহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, ওগুলিই হচ্ছে বিশাল বৃক্ষরাজি, প্রসারিত হচ্ছে উপরের আকাশ অবধি যেখান থেকে সূর্যদেব গলিত লাভার মতো প্রচণ্ড উত্তাপের ঢেউ ঢেলে দিচ্ছেন একের পর এক, আপনাকে যা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে ফেলবে, কারণ বসন্তের শেষ নিঃশ্বাসটুকুও এখন অন্তর্হিত, তা বিদায় নিয়েছে পাকাপাকিভাবে, ভরাটবক্ষ, ফাটিফাটি জামার, পীচ ফল আর দুধে-আলতা রঙের চমৎকার মেয়েটি আর নেই, যার ঝাঁকড়া চুলের পাশে শিশিরের মতো স্বেদবিন্দু জমে ছিলো, সেও বিদায় নিয়েছে পাকাপাকিভাবে, এখন থেকে দেখা যাবে শুধু হাড় মাস, আর বিশ্রী বুড়োটে মুখ। মর্চে পড়া আংটার মতো, আর শুকিয়ে যাওয়া এঁদো ডোবার বুকে নোংরা সবুজের সর, মাঝে মাঝে ফাটা রুক্ষ মাটি, চামড়া ওঠা ঘায়ের মতো।

ব্যাপারটা ছিলো একটা সীমাহীন বিস্ময়ের উৎস। কেমন করে আমার পদযুগল আমাকে ওই সাদা কংক্রিটের ড্রাইভ-ওয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে গেলো, সুন্দরভাবে, এবং

অন্তহীন হলেও আমি কেমন করে সেই পথ অতিক্রম করে, বৃক্ষরাজি ছাড়িয়ে, এক সময় বাইরের রাস্তায় নেমে এলাম, স্ফটিকের মতো লাভার এক নদীর ভেতর দিয়ে, অক্ষত অবস্থায়। যেসব মুখ আমি দেখলাম, আমি তাদের লক্ষ করলাম গভীর কৌতূহলের সঙ্গে কিন্তু তাদের মধ্যে সুন্দর বা উল্লেখযোগ্য কিছুই আমি খুঁজে পেলাম না, তাদের বাস্তবতা সম্পর্কেও আমার মনে কোনো নিশ্চয়তা জাগলো না। কারণ তাদের বাস্তবতায় বিশ্বাস করার জন্য প্রচণ্ডতম প্রয়াসের দরকার ছিলো, তাদের বাস্তবতায় বিশ্বাস করতে হলে আপনাকে আমার নিজের বাস্তবতায় বিশ্বাস করতে হবে, কিন্তু নিজের বাস্তবতায় বিশ্বাস করার জন্য আমাকে তাদের বাস্তবতায় বিশ্বাস করতে হবে, কিন্তু তাদের বাস্তবতায় বিশ্বাস করার জন্য আমাকে বিশ্বাস করতে হবে আমার নিজের বাস্তবতায় — এক–দুই, এক–দুই, এক–দুই, তালে তালে মার্চ করা পায়ের মতো। কিন্তু মার্চ করার জন্য যদি পা না থাকে। কিংবা ওই পা যদি হয় কাঠের পা। আমি নিচের দিকে তাকালাম। আমার পা মার্চ করে চলেছে, এক–দুই, এক–দুই।

অনেকক্ষণ তারা মার্চ করলো। কিন্তু তারপর অনন্তের শেষে তারা আমাকে পৌঁছে দিলো একটা দরজার সামনে। দরজাটা খুললো, আর তখন দেখা গেলো ঠাণ্ডা, সাদা ছায়া–ছায়া ঘরটা, আর হাল্কা–নীল, ঠাণ্ডা–মসৃণ লিনেনের পোশাক পরা তাকে, তার নিরাভরণ লম্বা ছোট বাহু দুটি হাল্কা–নীলের পাশ দিয়ে সোজা ঝুলে আছে, আমি এ্যান স্ট্যান্টনকে দেখলাম। আমি তার মুখের দিকে তাকাই নি, কিন্তু আমি জানি যে সে এ্যান স্ট্যান্টন। আমি পথে আসতে আসতে অন্য সব মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সোজাসুজি, গভীর কৌতূহলের সঙ্গে। কিন্তু এখন তার মুখের পানে আমি তাকাই নি।

তারপর আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ও আমার চোখে চোখ রেখেছিলো স্থির ভাবে। আমি কোনো কথা বলি নি। বলার দরকার হয় নি। ও আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে তার মাথা হেলিয়ে ছিলো।

## সপ্তম অধ্যায়

মে মাসের ওই সকালে এ্যান স্ট্যান্টনের এ্যাপার্টমেন্ট থেকে ফেরার পর আমি কিছুদিনের জন্য শহরের বাইরে ছিলাম। প্রায় আট দিন। সেদিন সকালে ওর ওখান থেকে বেরিয়ে আমি ব্যাংকে যাই, কিছু টাকা তুলি, গ্যারেজ থেকে আমার গাড়িটা বার করি, একটা ব্যাগে কিছু কাপড়জামা ভরে নিই, তারপর পথে বেরিয়ে পড়ি। অস্থি-শুভ্র দীর্ঘ সড়ক, সুতোর মতো সোজা, কাঁচের মতো মসৃণ আর ঝকঝকে, গরমে যেন কাঁপছে, আর টায়ারের নিচ থেকে তির তির করে শব্দ উঠছে, আহত স্নায়ুর মতো। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম পঁচাত্তর মাইল বেগে, কিন্তু রাস্তার উপর দিগন্তের ঠিক এই পাশে যে জলাশয়টা দেখা যাচ্ছিলো সেটা কিছুতেই ছুঁতে পারছিলাম না। একটু পরে আমার চোখে রোদ এসে পড়লো, কারণ আমি যাচ্ছিলাম পশ্চিমের দিকে। সান-স্ক্রীনটা নামিয়ে, চোখ কুঁচকে, আমি গাড়ির গতিবেগ আরো বাড়িয়ে দিলাম। আর এগিয়ে চললাম পশ্চিমের পানে। কারণ আমাদের সবারই পরিকল্পনা থাকে একদিন না একদিন পশ্চিমে যাবার। যখন জমির টানাটানি দেখা দেয় তখন মানুষ সেখানে যায়। যখন চিঠি এসে পৌছয় ঃ তাড়াতাড়ি পালাও, সব আবিস্কৃত হয়ে গেছে, তখন মানুষ সেখানে ছোটে। যখন মানুষ চোখ নিচু করে ব্লেডের দিকে তাকায়, সেখানে দেখে রক্ত, তখন সেখানে যায়। যখন কাউকে বলা হয় যে সাম্রাজ্যের জোয়ারে সে একটা বুদ্বুদমাত্র তখন সে সেখানে যায়। যখন কেউ শোনে যে ওখানকার পাহাড়ে সোনা আছে তখন মানুষ ওই দিকে ছোটে। যখন কেউ দেশের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতে চায় তখন সে ওইখানে যায়। মানুষ সেখানে যায় তার বার্ধক্যের দিনগুলি কাটাবার জন্য। অথবা সেখানে যায় শুধু শুধু, এমনিতেই।

আমি গিয়েছিলাম এমনি, শুধু শুধু।

দ্বিতীয় দিনে আমি গিয়ে পৌছাই টেক্সাসে। আমি পার হয়ে যাই সমতল-পায়ের, বদমেজাজী, বিস্কুট-খাওয়া ব্যাপ্টিস্টরা যেখানে বাস করে সেই এলাকা। তারপর আমি সেই অঞ্চল অতিক্রম করলাম যেখানে বাস করে বাঁকা-পায়ের, উঁচু হীল পরা, বন্দুকধারী, খুনখারাবী করা কঠিন মানুষগুলো, শনিবার রাতে যারা

ড্রাগস্টোরে গিয়ে ভীড় জমায়, তারপর মোড়ের পেক্ষাগৃহে গিয়ে বোরাক্স পিটের ভূমিকায় জিন অট্রি অভিনীত "ভিনেগার ক্রীকে প্রতিশোধ" ছবির তৃতীয় পর্ব দেখে। কিন্তু দুটি অংশেই আকাশ দিনের বেলায় দীর্ঘ তপ্ত তামার পাত আর রাতের বেলায় কালো মখমল, আর বেঁচে থাকার জন্য মানুষের সেখানে প্রয়োজন শুধু কোকাকোলার। এর পর আমি ভ্রমণ করি নিউ মেক্সিকোর মধ্য দিয়ে, অপরূপ এবং পরিপূর্ণ শূন্যতার এক অঞ্চল, সেই শূন্যতার মধ্যে বালির উপর একটা ছোট্ট সাদা পেট্রল স্টেশন কেউ ছুঁড়ে বসিয়ে দিয়েছে, রোদে জ্বলে-পুড়ে সাদা হয়ে যাওয়া মরুপথে পড়ে থাকা গরুর মাথার খুলির মতো, দূরে উত্তরের দিকে মোমার্তের যুদ্ধের কতিপয় বীর অবশিষ্ট যোদ্ধারা মেক্সিকান স্যান্ডাল পায়ে, পেটানো রূপা বসানো পোশাক পরে, একটা শেষ যুদ্ধ-ছাউনীতে জড়ো হয়েছে, তারপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে হোপিদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেবার চেষ্টা করছে। এর পর আরিজোনা, মহিমাময় মেষকুলের শান্ত স্থির দৃষ্টি, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। মোহাভে পৌঁছুনো পর্যন্ত অনেকক্ষণ এই রকম। মোহাভে পার হয়ে গেলাম রাতের বেলায়, আর সেই রাতের বেলাতেও নিঃশ্বাস নেবার সময় আমার বুক যেন চিরে গেলো, মনে হলো আমি এক তরবারি-খেকো, ভুল করে করাত গিলছি, আর রাতের অন্ধকারে গুঁড়ি মারা পাহাড় আর সুউচ্চ ক্যাকটাস আমার দিকে এগিয়ে আসে কটিতটের অনুষঙ্গ মাখা ফ্রয়েডীয় দুঃস্বপ্নের আকৃতি নিয়ে।

তারপর ক্যালিফোর্নিয়া।

তারপর লং বীচ, যা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার সারসত্তা। আমি জানি, কারণ লং বীচ ছাড়া আমি ক্যালিফোর্নিয়ার আর কিছুই কখনো দেখি নি, অতএব প্রতিযোগিতায় অন্য কোনো স্থানের দাবি আমার বিবেচনার মধ্যেই আসে না। লং বীচে আমি ছত্রিশ ঘণ্টা ছিলাম, আর এই গোটা সময়টাই আমি ছিলাম একটি হোটেল কক্ষে, মাঝখানে শুধু চল্লিশ মিনিট কাটাই হোটেলের লবিতে এক নরসুন্দরের দোকানে।

সকালের দিকে একটা চাকা ফুটো হয়ে গিয়েছিলো, তাই লং বীচে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে যায়। আমি একটা মিল্ক-শেক খেলাম, তারপর এক বোতল বুরবন সুরা কিনে নিজের ঘরে গেলাম। সারাটা পথ আমি এক ফোঁটা মদ খাই নি। খাবার ইচ্ছাই হয় নি। কোনো কিছুই ইচ্ছা হয় নি আমার। শুধু ইঞ্জিনের গুঞ্জন শুনতে চেয়েছি, গাড়ির মৃদু দোলানি অনুভব করতে চেয়েছি, আর যা চেয়েছি তা আমি পেয়েছি। কিন্তু এখন আমি জানি যে ওই বুরবন যদি আমি পান না করি, তা হলে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করা মাত্র উত্তপ্ত উত্তাল গোটা মহাদেশটা আমাকে আক্রমণ

করার জন্য অন্ধকারের ভেতর থেকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসবে। অতএব আমি কিছু পান করলাম, তারপর স্নান সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে আমি রাস্তার ওপারে নিওন আলোর চিহ্নগুলি দেখতে লাগলাম, আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে সেগুলি জ্বলছে আর নিভছে। আর আমি সোজা বোতল থেকে পান করে চললাম, শুধু মাঝে মাঝে বোতলটা আমার বিছানার পাশে মেঝের উপর নামিয়ে রাখলাম।

ফলে বেশ ভালো ঘুম হলো আমার। পরের দিন দুপুরের আগে আমার ঘুম ভাঙেনি। আমি প্রাতরাশ ঘরে পাঠিয়ে দিতে বললাম, আর একগাদা খবরের কাগজ, কারণ সেদিন ছিলো রবিবার। আমি নাস্তা খেলাম, তারপর কাগজগুলি পড়লাম, দেখলাম যে ক্যালিফোর্নিয়াও আর সব জায়গার মতোই, কিংবা নিজের সম্পর্কে একই জিনিস ভাবতে চায় সে। তারপর রেডিও শুনলাম, যতক্ষণ না আবার আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে বাইরের নিওন আলোগুলি জ্বলতে আর নিভতে শুরু করলো। এরপর আমি কিছু খাদ্যবস্তুর অর্ডার দিলাম, খেলাম, এবং পুনরায় নিদ্রার আয়োজন করলাম।

পরদিন সকালে আমি ফিরে চললাম।

আমি ফিরে চললাম, কিন্তু আসবার সময় যেসব কথা আমার মনে পড়ে ছিলো সেসব এখন আর আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো না।

যেমন। কিন্তু, না, কোনো দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারছি না। ব্যাপারটা দৃষ্টান্তের ততোটা নয়, একটা বিশেষ ঘটনার ততোটা নয়, একটা বিশেষ ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে পড়েছিলো তা নয়, আসল ব্যাপার হলো প্রবাহ, ফেটা ঘটনার মধ্যে থাকে না, সেটা থাকে ঘটনার ভেতরে প্রবহমান গতিতে। তা না হলে আমরা ঘটনা থেকে একটা মুহূর্ত বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারতাম, বলতাম যে এইটেই ঘটনা। এইটেই অর্থ। কিন্তু আমরা তা করতে পারি না। কারণ যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো গতি। এবং আমি ওই গতির মধ্যে ছিলাম। ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল বেগে আমি পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, লক্ষ টাকার ল্যান্ডস্কেপ আর শৌর্যবীর্যময় ইতিহাসের ঝাপসা ছায়ামিছিলের মধ্য দিয়ে। আর আমি কালের মধ্য দিয়ে পেছনে ফিরে যাচ্ছিলাম আমার স্মৃতির রাজ্যে। লোকে বলে যে জলে নিমজ্জমান মানুষ নাকি ডুবে যাবার মুহূর্তে তার গোটা জীবনটা এক লহমায় নতুন করে বাঁচে। তো আমি জলে ডুবছিলাম না, আমি ডুবছিলাম পশ্চিমে। উত্তপ্ত তামার মতো দিন আর কালো মখমলের মতো রাত্রির মধ্য দিয়ে আমি পশ্চিম অভিমুখে ডুবে যাচ্ছিলাম। ডুবতে আমার আটাত্তর ঘণ্টা লেগেছিলো। ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচে হোটেলের বিছানায়

নগ্নদেহে শুয়ে থাকতে, আমার দেহকে পশ্চিমের গভীরতম তলদেশে ডুবে স্থির হয়ে যেতে দিতে, ইতিহাসের নিশ্চল নিঃসরণের মধ্যে পড়ে থাকার জন্য আমার ওই সময়টা লেগেছিলো।

গাড়ির মৃদু গুঞ্জন ও দোলানিতে আমার মাথার মধ্যে ফিল্মের মতো সমস্ত অতীত পরতে পরতে খুলে গেলো। পারিবারিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মতো। বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি আপনাকে যে ধরনের ছবি তৈরি করে রাখতে বলে, যেন আপনার কাছে একটা সুন্দর রেকর্ড থাকে, এই দিন সুসি টলমল পায়ে প্রথম হাঁটে, এই দিন জনি কিণ্ডারগার্টেনে যাওয়া শুরু করে। এই দিন আপনি পাইক্স্ পীকে উঠেছিলেন, এই দিন গ্রামের খামার বাড়িতে পিকনিকে গিয়েছিলেন, এই দিন আপনি প্রধান সেল্স্ ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন এবং আপনার প্রথম বুইক গাড়িটি খরিদ করেন। বিজ্ঞাপনের ছবিতে সব সময় দেখা যায় একজন মর্যাদাবান, পক্ককেশ, সহৃদয় বৃদ্ধকে, হুইস্কির বিজ্ঞাপনে যেমন দেখা যায় (কিংবা পক্ককেশ, সহৃদয় মিষ্টি মুখের কোন বৃদ্ধা), পারিবারিক চলচ্চিত্রটি দেখছেন আর ধীরে ধীরে অতীতের স্বপ্নের মধ্যে আপনি তলিয়ে যাচ্ছেন। তো, আমার চুল পাকে নি, আমি মর্যাদাবান অথবা সহৃদয় অথবা মিষ্টি দেখতে নই, কিন্তু পারিবারিক চলচ্চিত্র আমি ঠিকই দেখি, অতীতের স্বপ্নের মধ্যে আমি ধীরে ধীরে ডুবে যাই। তাই আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক পরামর্শ আপনাদের যদি কোনো পারিবারিক চলচ্চিত্র থাকে তবে তা পুড়িয়ে ফেলুন এবং নতুন জন্মগ্রহণের জন্য তৈরি হোন।

আমি ধীরে ধীরে অতীতের স্বপ্নের মধ্যে অবগাহন করতে শুরু করি। ওই তো গাট্টাগোট্টা মানুষটা, পরনে কালো কোট, চোখে চশমা, আমি আগুনের সামনে কার্পেটের উপর আমার রঙ পেন্সিলগুলি নিয়ে বসে আছি, তিনি আমার দিকে ঝুঁকে চকোলেট বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন, এই নাও, মাত্র এক কামড়, রাতের খাবার সময় প্রায় হয়ে গেছে। ওই তো হাল্কা চুল, নীল চোখ আর অনাহারে ক্লিষ্ট দেখতে গালের মহিলা, ঝুঁকে পড়ে আমাকে চুমু খেয়ে শুভরাত্রি জানাচ্ছেন, বাতি নিভিয়ে দেবার পর অন্ধকার ঘরে রেখে যাচ্ছেন চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ। ওই তো বিচারপতি আরউইন, প্রত্যুষে আবছা আলোয় আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন, হাঁসটাকে তোমার আরেকটু টেনে আনতে হতো, জ্যাক। ওইটেই নিয়ম। ওই তো কাউন্ট কোভেলি, লম্বা সাদা ঘরে, দামী চেয়ারে, সোজা হয়ে বসে আছে, ছোট করে ছাঁটা কালো গোঁফ, মৃদু মৃদু হাসছে, এক হাতে — ছোট মতো শক্তিশালী হাত, করমর্দনের সময় যার চাপে অনেক সময় মানুষের চোখমুখ কুঁচকে যেতো — গ্লাস ধরে আছেন, অন্য হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড় দিচ্ছেন হাঁটুর উপর পড়ে থাকা বিশাল প্রাণীটির

গায়ে। ওই তো তরুণ এক্সিকিউটিভ, তার গোল মাথার উপর লেপ্টে চুল আঁচড়ানো। ওই তো এ্যাডাম স্ট্যান্টন আর আমি ছোট্ট নৌকা করে ভাসতে ভাসতে অনেক দূর চলে গেছি, বাতাস যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে, সাদা পালগুলি নেতিয়ে পড়েছে, সমুদ্র উত্তপ্ত কাঁচের মতো, আর পশ্চিম দিগন্তে সূর্য জ্বলছে যেন একটা পারমাণবিক গোলক। আর সব সময়, সব সময়, এ্যান স্ট্যান্টন।

ছোট্ট মেয়েরা সাদা পোশাক পরে, ফুলে থাকা স্কার্টের তলায় তাদের ছোট ছোট হাঁটু কেমন মজার দেখায়, কালো পেটেন্ট চামড়ার জুতো পরে তারা, এক–বোতামের স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা, সাদা মোজা, নীল ফিতা বাঁধা চুল, এক বিনুনী করা, পিছন দিকে ঝুলে থাকে। এই ছিলো এ্যান স্ট্যান্টন। দিনটা রোববার, গীর্জায় যাচ্ছে সে, সেখানে গিয়ে চুপ করে বসে আছে, সদ্য পড়ে যাওয়া দাঁতের ফাঁকে বিষণ্নচিত্তে আস্তে আস্তে তার জিভের ডগা ঘষছে। ছোট্ট মেয়েরা বাবার পায়ের কাছে বসে তাঁর হাঁটুর উপর গাল চেপে ধরে আনমনা হয়ে কি যেন ভাবে, আর তিনি তার রেশমের মতো চুল নিয়ে খেলা করতে করতে তাকে সুন্দর সুন্দর বই পড়ে শোনান। এই ছিলো এ্যান স্ট্যান্টন। ছোট্ট মেয়েরা ভীতু বেড়ালের মতো, সমুদ্রতীরে গিয়ে বসন্তের প্রথম দিনে ঢেউ–এর মধ্যে সন্তর্পণে বুড়ো আঙ্গুলটা ডোবায়, তারপর হঠাৎ ঢেউটা একটা বড়ো লাফ দিয়ে উঠে তাদের উরু ভিজিয়ে দিলে তারা ঠাণ্ডায় আর শিহরণে চেঁচিয়ে ওঠে, তাদের রূপার মতো সরু পা নিয়ে লাফাতে থাকে। এই হলো এ্যান স্ট্যান্টন। ছোট্ট মেয়েরা যখন ক্যাম্পফায়ারে গিয়ে খোলা আগুনে মাংস রোস্ট করে তখন তাদের নাকে ধোঁয়ার কালি–ঝুল লেগে যায় — আমাদের লাগে না, কারণ আমরা তো ব্যাটা ছেলে আর বড়ো হয়ে গেছি — আর আমরা তাদের দিকে আঙ্গুল তুলে গানের সুরে বলি, ডার্টি ফেস, ডার্টি ফেস, ইউ আর সো ডার্টি ইউ আর এ ডিসগ্রেস! তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেলো যে ওই রকম যখন গান করছি তখন মেয়েটি আর পাল্টা আক্রমণ করছে না, চিরকাল যেমন করেছে, সে জায়গায় তার ছোট্ট মসৃণ মুখ নিয়ে তার বড়ো বড়ো চোখ আমার মুখের উপর তুলে ধরেছে, তার ঠোঁট কাঁপছে, মনে হলো এক্ষুণি হয়তো কেঁদে ফেলবে, যদিও এভাবে কান্নার বয়স তার পার হয়ে গেছে, সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন আমার মুখের হাসি শুকিয়ে আসে, আমি তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াই, ভান করি যেন আরো কিছু কাঠ যোগাড় করতে যাচ্ছি। এই হলো এ্যান স্ট্যান্টন।

জলের ধারে উজ্জ্বল দিনগুলি, উপরে ঝলমলে উড়ন্ত গাংচিল, এই সবই ছিলো এ্যান স্ট্যান্টন। কিন্তু আমি জানতাম না। আর, ততো উজ্জ্বল দিন নয়। সমুদ্রের দিক থেকে ঝোড়ো হাওয়া ছুটে আসছে, ঘরে আগুনের চুল্লী জ্বলছে, এই সবও ছিলো

এ্যান স্ট্যান্টন, কিন্তু এ–ও আমি জানতাম না। তারপর একটা সময় এলো যখন রাতগুলি হয়ে উঠেছিলো এ্যান স্ট্যান্টন। কিন্তু সেটা আমি জানতাম।

সেই গ্রীষ্ম ঋতুতে আমি একুশে পা দিয়েছিলাম, আর এ্যান স্ট্যান্টন সতেরোতে। আমি ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়িতে এসেছি, প্রাপ্তবয়স্ক একটা মানুষ, যে দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি ফিরে এসেছিলাম বিকালের দিকে। তাড়াতাড়ি স্নান করে, খাওয়ার পাট চুকিয়ে, আমি ছুটলাম স্ট্যান্টনদের বাড়িতে, এ্যাডামের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এ্যাডামকে দেখলাম বাইরে অপরাহ্নের নরম আলোয় বসে একটা বই পড়ছে (গিবন, মনে আছে আমার)। আর এ্যানকে দেখলাম আমি। ও যখন দরজা দিয়ে বাইরে এলো আমি তখন এ্যাডামের সঙ্গে দোলনায় বসে ছিলাম। আমি চোখ তুলে ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে গত বড়োদিনের সময় ওকে যখন শেষ দেখি, মিস পাউণ্ডের স্কুল থেকে ছুটিতে ও ল্যাণ্ডিং–এ এসেছিলো, তারপর থেকে এক হাজার বছর পার হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে ও আর এখন এক–বোতামের স্ট্র্যাপে বাঁধা পেটেন্ট চামড়ার জুতো আর সাদা মোজা পায়ে দেয়া ছোট্ট মেয়েটি নেই। এখন তার পেছনে খুব ঋজুভাবে কাটা সাদা লিনেনের একটা পোশাক, কিন্তু কাট্ যতোই ঋজু হোক, লিনেন যতোই কঠিন হোক, কাপড়ের ভেতরকার বঙ্কিম খাঁজ আর কোমলতার আভাস কিছুতেই লুকানো যাচ্ছিলো না, একটা অদ্ভুত প্যারাডক্সের মতো তা বিরাজ করছিলো। চুল ঘাড়ের কাছে খোঁপার মতো করে বাঁধা, মাথার উপর দিয়ে একটা সাদা ফিতা জড়ানো, হাসতে হাসতে সে এগিয়ে এলো, যে হাসি আমি সারা জীবন ধরে দেখে এসেছি কিন্তু যে হাসি এখন মনে হলো সম্পূর্ণ নতুন, বললো, হ্যালো, জ্যাক, আর আমি আমার হাতে তুলে নিলাম ওর শক্তিশালী সরু হাত। আর আমি উপলব্ধি করলাম যে গ্রীষ্ম এসেছে।

হ্যাঁ, গ্রীষ্ম এসেছিলো। ও রকম গ্রীষ্ম আগে কখনো আসে নি। পরেও না। চিরকাল যেমন তেমনি, দিনের অনেকখানি সময় আমি কাটিয়েছি এ্যাডামের সঙ্গে। সেও থাকতো আমাদের সাথে। তাই থেকেছে চিরকাল। আমরা যেখানে যেতাম সেও সঙ্গে সঙ্গে আসতো। কারণ এ্যাডাম আর ও ছিল খুবই কাছাকাছি। ওই গ্রীষ্মে রোদ চড়া হয়ে উঠবার আগে, বেশ ভোরে, আমি আর এ্যাডাম টেনিস খেলতাম, সেও টেনিস কোর্টে আসতো আমাদের সঙ্গে, মিমোসা আর মার্টেলের বিচিত্রিত ছায়ার নিচে বসে দেখতো কিভাবে এ্যাডাম চিরাচরিতভাবে আমাকে হারিয়ে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে, আর আমি নিজের র‍্যাকেটেই পা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লে সে পাখির গান আর পাহাড়ী ঝর্ণার কলধ্বনির মতো উচ্ছ্বসিত হাসিতে

লুটিয়ে পড়তো। তারপর সে ও হয়তো আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলতো, বেশ ভালো খেলতো সে, আর আমি বেশ খারাপ। হাল্কা-পাতলা গড়ন, কিন্তু ভালো খেলতো তাতে সন্দেহ নেই, ওই ছোট গোল গোল হাতে যথেষ্ট শক্তি ধরতো সে, আর ওই হাত সকালের রোদে ঝলসে উঠতো পাখার মতো। ছুটতেও পারতো বেশ জোরে, তখন নর্তকীর মতো তার স্কার্ট উড়তো, চঞ্চল সাদা জুতোতেও ধরা পড়তো নাচের ছন্দ। কিন্তু ওই সব সকালের একটা বিশেষ দৃশ্য আমার সব চাইতে বেশি মনে পড়ে। কোর্টের ওপাশে দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে, সার্ভ করার জন্য তৈরি, ফিতা-বাঁধা মাথার পেছন দিকে র‍্যাকেট ধরা, বাহুর টানে ডান স্তন ঈষৎ উত্তোলিত, বাঁ হাতে বল উপরে ছুঁড়ে দিয়েছে, ওই হাত এখনো উপরে, যেন হাওয়া থেকে কিছু পেড়ে আনতে উদ্যত, গম্ভীর একাগ্রচিত্ত মুখ উজ্জ্বল আলো আর বিশাল আকাশের দিকে তোলা, আর ছোট্ট শ্বেতশুভ্র বলটি যেন ওই আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্যের মাঝখানে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী। তো, এটা একটা ধ্রুপদী ভঙ্গি, আর গ্রীকরা যে টেনিস খেলতো না তার জন্য আমার আক্ষেপ হয়। তারা টেনিস খেললে নিশ্চয়ই এ্যান স্ট্যান্টনকে একটা গ্রীক পাত্রে উৎকীর্ণ করে রাখতো। কিন্তু, না, দ্বিতীয় চিন্তায় মনে হচ্ছে ওরা বোধহয় তা করতো না। ওই মুহূর্তে, তার সকল সৌন্দর্য নিয়েও, বড়ো বেশি বায়বীয়, টানটান, উত্তেজনা-উদ্দীপনায় ভরপুর। ওই মহুর্ত আঘাত করার ঠিক পূর্বক্ষণ, বিস্ফোরণের আগের মুহূর্ত, আর গ্রীকরা তাদের পাত্রে কখনো এই ধরনের জিনিস উৎকীর্ণ করে নি। তাই ওই মুহূর্তটি যাদুঘরের কোনো পাত্রে নেই, সেটা আছে আমার মাথার ভেতরে, যেখানে আর কেউ তা দেখতে পায় না। কারণ সেটা ছিলো বিস্ফোরণের পূর্ব মুর্হূত, আর বিস্ফোরণটা ঘটেই যায়। র‍্যাকেট আঘাত হানে, মেষের অন্ত্রের গায়ে শব্দ ওঠে, আর সাদা বলটা তীব্র বেগে ছুটে আসে আমার পানে, আর আমি তা ধরতে ব্যর্থ হই। সেট শেষ হয়, খেলার ইতি ঘটে, আমরা সবাই ঘরে ফিরি নিশ্চল উষ্ণতার মধ্য দিয়ে, কারণ তখন ঘাসের উপর থেকে শিশির মিলিয়ে গেছে, প্রভাতের মৃদুমন্দ বাতাসও বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু তারপরও থাকতো বিকাল। বিকালে আমরা নিয়মিত সাঁতার কাটতাম কিংবা নৌকায় পাল তুলে সমুদ্রের বুকে বেরিয়ে পড়তাম, তারপর আবার সাঁতার, আমরা তিনজনই মাঝে মাঝে ল্যান্ডিং-এ ওই রাস্তায় বাস করা কিংবা তাদের ওখানে বেড়াতে আসা ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতো। রাতের খাবার পর আবার আমরা একত্রিত হতাম, ওদের ওখানে কিংবা আমাদের বাসায়, বসে বসে গল্প করতাম, নয়তো ছবি দেখতে যেতাম, কিংবা চাঁদের

আলোয় আবার সাঁতার কাটতাম। একদিন রাতে ওদের বাসায় গিয়ে দেখি এ্যাডাম নেই, বাবাকে গাড়ি চালিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যেতে হয়েছে, তাই এ্যানকে বললাম, চলো, ল্যান্ডিং-এ গিয়ে আমরা ছবি দেখে আসি। ফিরে আসবার সময় আমরা গাড়ি নিয়ে সমুদ্রের ধারে থামি — আমি রোডস্টারটা চালাচ্ছিলাম — মা তাঁর বড়ো গাড়ি নিয়ে বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিলেন, কয়েকজন সঙ্গী সাথী সহ — তারপর হার্ডিন পয়েন্ট ছাড়িয়ে উপসাগরের উপর বিছিয়ে থাকা চাঁদের আলো দেখতে থাকি আমরা দুজন। তিরতির করা জলের উপর সে-আলো পড়েছিলো। একটা উজ্জ্বল সাদা শীতল আগুনের মতো। মনে হচ্ছিলো এখনই সে আগুন দাবানলের মতো গোটা সমুদ্র জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু একটা প্রশস্ত চঞ্চল চাদরের মতো তা ওখানেই ঝিলমিল করতে থাকলো, মনে হলো উজ্জ্বল সুদূর দিগন্তের অস্পষ্টতাকে যেন তা স্পর্শ করতে চাইছে।

আমরা গাড়িতে বসে সদ্য দেখা ছবিটা নিয়ে কথা বললাম, তর্কে লিপ্ত হলাম, আলোর চাদর দেখলাম। এক সময় সব কথা থেমে গেলো। সে আসনে সামান্য গা এলিয়ে বসলো, মাথাটা কুশানের উপর পেছনের দিকে একটু হেলিয়ে দিলো, এখন তার চোখ আর দিগন্তের পানে নয়, ঊর্দ্ধাকাশে নিবদ্ধ — রোডস্টারের হুড নামানো ছিলো — আর চাঁদের আলো তার মুখের উপর ঝরে পড়ে সেই মুখকে করে তুলেছিলো মর্মরের মতো মসৃণ। আমিও একটু পেছনে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম, আমার মুখের উপরও চাঁদের আলো ঝরে পড়তে থাকলো। আমি মনে মনে বলছিলাম, এই এক্ষুণি আমি ঝুঁকে পড়ে ওকে কাছে টেনে নেবো। আড়চোখ ওকে একবার দেখলাম, কোলের উপর হাতদুটি শান্তভাবে ধরে আছে, আঙ্গুলগুলি ঈষৎ বাঁকানো, যেন কোনো উপহার গ্রহণ করতে যাচ্ছে। খুব সহজেই এখন একটু ঝুঁকে ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে ব্যাপারটা শুরু করে দেয়া যায়, তারপর কোথায় থামে সেটা তখন দেখা যাবে। আমি ওই ভাষাতেই ভাবছিলাম, কলেজে পড়া তরুণের গতানুগতিক নৈর্ব্যক্তিক ভাষায়, যে মনে করে যে সে একজন জবরদস্ত ব্যাটা ছেলে হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আমি ঝুঁকে পড়িনি। সে যেখানে, চামড়ার আসনের একটুখানি ব্যবধান রেখে মাথা পেছনে হেলিয়ে দু'হাত কোলের উপর রেখে মুখে চন্দ্রালোক নিয়ে বসে ছিলো আমার মনে হলো তা যেন এক হাজার মাইল দূরে। আমি যে কেন ওকে কাছে টেনে নিই নি বলতে পারবো না। বার বার নিজেকে আশ্বস্ত করেছি, আমি তো ভীরু নই, ও তো কচি মেয়ে একটা, কেন এত ইতস্তত করছি, ও কি করবে, বড়ো জোর একটু ক্ষেপে যাবে, তা হলে আর এগুবো না, ব্যস। তারপর নিজেকে বলেছি,

বাঃ, ও ক্ষেপবে কেন, মোটেই ক্ষেপবে না, এসব ওর জানা আছে, ছেলেমেয়েরা যখন গাড়ি থামিয়ে বসে থাকে তখন চাঁদের আলোয় দাবা খেলার জন্য যে তা করে না সেটা ও জানে, সম্ভবতঃ এসব ব্যাপারে বেশ ভালো অভিজ্ঞতা আছে ওর। এক মুহূর্ত আমি পরিস্থিতিটা এইভাবে বিবেচনা করলাম, আর তখনই হঠাৎ আমার সারা শরীরে একই সঙ্গে উত্তাপ আর ক্রোধ ছড়িয়ে পড়লো। আমি গা ঝাড়া দিয়ে আসনে সোজা হয়ে বসলাম, অকস্মাৎ আমার বুকের ভেতর একটা প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হলো।। আমি বললাম, এ্যান — এ্যান — কিন্তু তারপর আর কি বলবো বুঝতে পারলাম না।

সে আসনের পেছন থেকে তার মাথা না তুলে, সামান্য একটু ঘুরিয়ে, আমার দিকে তার মুখ ফেরালো। তারপর একটা আঙুল ঠোঁটের উপর চেপে ধরে শুধু বললো, শ্‌স্‌, শ্‌স্‌! তারপর আঙুলটা সরিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যবর্তী হাজার মাইলের ওপার থেকে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলো।

আমি আবার গা এলিয়ে দিলাম। আমরা ওইভাবে, আমাদের মাঝখানে ওই জায়গাটুকু রেখে, অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, চন্দ্রালোক-সিক্ত আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম, দূরে বেলাভূমিতে এসে আছড়ে পড়া জলের ক্ষীণ ফিসফিস শব্দ শুনেছিলাম। যত সময় যাচ্ছিলো ততো যেন আকাশটা বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছিলো। অনেকক্ষণ পর আমি আবার এ্যানকে আড় চোখে দেখলাম। এখন তার দু'চোখ বন্ধ, এবং যখন আমার মনে হলো যে আমার মতো সেও ক্রমপ্রসারমান ওই আকাশটা দেখছে না, তখন নিজেকে হঠাৎ বড্ড একা, বড্ড পরিত্যক্ত মনে হলো। কিন্তু তারপরই সে চোখ খুললো, আবার আকাশের দিকে তাকালো। আমি ওকে লুকিয়ে লক্ষ করছিলাম, কাজেই ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ে। আমিও তক্ষুণি আবার গা এলিয়ে দিয়ে উপরের দিকে তাকালাম, আর দুনিয়ার কোনো কিছু সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভাবনাকে মনে জায়গা দিলাম না।

অতীতের সেই যুগে রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশে বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এর ঠিক বাইরে দিয়ে একটা ট্রেন যেতো। ক্রসিং পেরুবার সময় গাড়িটা সব সময় একবার বাঁশি বাজাতো। সেই রাতে বাঁশিটা বেজে উঠতেই আমি বুঝলাম যে এখন রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশ, এবার ফিরতে হবে। অতএব আমি সোজা হয়ে বসে গাড়ি স্টার্ট দিলাম, গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম, তারপর বাড়ির পথ ধরলাম। এতক্ষণ আমরা কোনো কথা বলি নি, স্ট্যান্টনদের বাড়ির সামনে এনে গাড়ি থামাবার আগে পর্যন্ত কোনো কথা বললাম না। বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাতেই এ্যান চোখের পলকে নেমে পড়লো, কাঁকর-ছাওয়া ড্রাইভ-ওয়েতে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বললো, শুভরাত্রি,

জ্যাক, তারপর প্রায় ঘণ্টা দুই আগে চামড়ার আসনে হাজার মাইল দূরত্বে বসে আমার দিকে তাকিয়ে যেভাবে হেসেছিলো সেইভাবে হেসে, পাখির মতো লঘু ভঙ্গিতে, ওর বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলো। এবং আমি একটু ভালোভাবে আত্মস্থ হবার আগেই এই সব ঘটে গেলো।

আমি ওদের বাড়ির প্রবেশপথের ছায়া ছায়া অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম — ও বাড়িতে ঢুকে কোনো আলো জ্বালায় নি — আমি কান খাড়া করে রাখলাম, যেন কোনো একটা সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু কোনো শব্দ হলো না। সাগর যখন সব চাইতে শান্ত তখনো একটা সার্বক্ষণিক গুঞ্জন চলতে থাকে, কিন্তু বেলাভূমি থেকে দূরে চলে এলে আর সে শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু রাত্রির একটা অনামা শব্দ আছে, যখন এক ফোঁটাও বাতাস প্রবাহিত হয় না তখনো সেই শব্দ থাকে, আমি এখন শুধু সেই শব্দ শুনতে পেলাম, আর কিছু না।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেলো, তারপর আমি আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে টায়ারের প্রচণ্ড শব্দ তুলে ঝড়ের মতো ওদের বাড়ির সামনে থেকে বেরিয়ে এলাম। ড্রাইভ-ওয়ের কাঁকর নিশ্চয়ই ঝরণার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিলো। রাস্তায় পড়েই আমি একসেলেটরটা প্রায় গাড়ির মেঝে অবধি চেপে ধরি, ওই সাদা বাড়িগুলির ভেতরে আরামে শুয়ে থাকা হারামজাদাদের পিলে চমকে দিই। ওরা নিশ্চয়ই চমকে উঠে বিছানার উপরে খাড়া হয়ে বসে ছিলো। আমি প্রায় দশ মাইল ওইভাবে সগর্জনে ছুটে চলি, তারপর দেবদারু বনভূমির কাছে এসে গাড়ি থামাই। ওখানে কিছু প্যাঁচা আর জলাভূমির ধার ঘেঁষে অবৈধভাবে ঝুপড়ি তুলে বসতকরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত কিছু মানুষজন ছাড়া ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার মতো আর কেউ ছিলো না। কাজেই আমি আবার গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে চললাম, এবার শান্ত ধীর গতিতে, যেন মৃদু স্রোতের বুকে নৌকা ভেসে যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে আমার হঠাৎ মনে পড়লো — মনে পড়লো নয়, আমি দেখতে পেলাম — এ্যানের মুখ, পেছনে হেলানো, চোখ বন্ধ, চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে তার উপর, আর তখনই আমার অনেক দিন আগের এক পিকনিকের কথা মনে হলো — যেদিন আমরা উপসাগরে বেশ দূর অবধি সাঁতরে গিয়েছিলাম, উপরে ঝড়ো মেঘ জমছে, এ্যান জলের বুকে চিৎ হয়ে ভাসছিলো, তার মুখ কালো হয়ে আসা লালচে-সবুজ আকাশের পানে তোলা, চোখ দুটি বন্ধ, অনেক উঁচু দিয়ে একটা গাংচিল উড়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় না এর পর থেকে আমি একবারও ওই দৃশ্যটার কথা ভেবেছি, কিংবা ভেবে থাকলেও আমার জন্য তা কোনো অর্থ বহন করে নি, কিন্তু এখন হঠাৎ বিছানায় শুয়ে আমার মনে হলো আমি একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ

আবিস্কারের একেবারে টলটলায়মান প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমি উপলব্ধি করলাম যে আজকের রাতের এই মুহূর্ত আর কিছুই নয়, বহুদিন আগের সেই পিকনিকের মুহূর্তটির সম্প্রসারণ মাত্র, আজকের রাতের মুহূর্ত সারাক্ষণই ছিলো। সেদিনের ওই মুহূর্তের মধ্যে। আমি জানতে পারি নি। আমি তা এক পাশে সরিয়ে রেখেছিলাম, কিংবা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা ছিলো ওই বীজের মতো যা আপনি ছুঁড়ে ফেলে দেন, তারপর ওই পথ দিয়ে আরেক দিন যাবার সময় দেখেন, আরে, গাছটা যে বড়ো হয়ে ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে, কিংবা সেটা ছিলো একটা মেটে রঙের লাঠির মতো, অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে যেটা আপনি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু জিনিসটা ছিলো ডিনামাইট, ফলে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো।

হ্যাঁ, বিস্ফোরণটা ঘটলো। আমি বিছানায় খাড়া হয়ে বসলাম ঠিক ওই হারামজাদাদের মতো, যাদের পিলে আমি সে-রাতে আমার গাড়ির গর্জনে চমকে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার ব্যাপারটা হলো তার চাইতেও তীব্র। আমি বিছানায় সোজা হয়ে বসলাম, আর আমার সমস্ত দেহ-মন পূর্ণ হয়ে গেলো এক অভূতপূর্ব আনন্দে। এরকম অনুভূতি এর আগে জীবনে আমার কখনো হয় নি। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। আমার মনে হলো আমার সব শিরা-উপশিরা অসম্ভব ফুলে উঠছে, এখনই ফেটে যাবে, খুব উঁচু থেকে নিচে গভীর জলে ডুব দেবার পর যখন মনে হয় আর বুঝি উঠতে পারবো না, ঠিক সেই রকম। আমার মনে হলো আমি সব কিছু সম্পর্কে প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ সত্য জানবার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছি। আর মাত্র একটা মুহূর্ত, তারপরই আমি সব জেনে ফেলবো। আমি আমার নিঃশ্বাস ফিরে পেলাম, আর তারপর একটা চিৎকার করে আমার দুটি বাহু দুদিকে প্রসারিত করে দিলাম, যতখানি সম্ভব, যেন সমস্ত বাতাসের শূন্যতাটাই আমি আমার বেষ্টনীর মধ্যে ধরে ফেলতে পারবো।

তখন জলের উপর ওই মুখের ছবি আমার মনে পড়লো, লালচে-সবুজ আর কালো হয়ে আসা আকাশের নিচে, অনেক উপরে সাদা গাংচিলটা উড়ে যাচ্ছে। এই মনে পড়া, ওই ছবির এইভাবে ফিরে আসা, আমাকে চমকে দিলো, কারণ, স্পষ্টতঃই, যে জিনিস আমার মনে এই আশ্চর্য আনন্দের জন্ম দিয়েছে তা সমগ্র বিশ্বে বিস্ফোরিত হওয়া আনন্দের মধ্যে নিজেই হারিয়ে গিয়েছিলো, বিস্মৃত হয়ে পড়ে ছিলো। যাই হোক, এখন আমি আবার ওই ছবিটা দেখতে পেলাম, আর তারপর অকস্মাৎ আমার তীব্র আনন্দের অনুভূতি মিলিয়ে গেলো, আমার মনে জেগে উঠলো একটা বিশাল মমতার বোধ, সে-মমতার পরতে পরতে এক ধরনের

দুঃখ ও বিষাদ, যেন ওই মমতা হলো আমার শরীরের মাংস, আর দুঃখ ও বিষাদ তার স্নায়ু ও শিরা-উপশিরা। খুব উদ্ভট শোনাচ্ছে, কিন্তু ওই রকমই ছিলো ব্যাপারটা। সত্যি।

আমার তখন মনে হলো, একেবারে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, যেন আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো ব্যক্তির উপসর্গগুলি লক্ষ করছি ; আরে, তুমি তো প্রেমে পড়েছো।

এক মুহূর্তের জন্য ভাবনাটায় আমি বেশ মজা পেলাম। আমি প্রেমে পড়েছি। এই ব্যাপারটা যে রকম হবে বলে ভেবেছিলাম একটুও সে রকম হলো না তো। অবাক হলাম আমি, একটু ভীতও। সেই মানুষটার মতো, যে অপ্রত্যাশিতভাবে খবর পায় উত্তরাধিকারসূত্রে সে দশ লক্ষ টাকা পেয়েছে, টাকাটা ব্যাংকে তার নামে জমা আছে, যখন খুশী সে সেটা তুলতে পারে, কিংবা সেই মানুষটার মতো যে জানতে পারে যে তার পাশের ছোট্ট সেলাইটা আসলে ক্যান্সার, সে নিজের মধ্যে রহস্যময়, সর্বধ্বংসী, ক্রমাগত বেড়ে ওঠা যে জিনিসটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা তারই একটা অংশ, কিন্তু একই সঙ্গে তার কোনো অংশই নয়, বরং তার শত্রু। আমি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম, খুব সন্তর্পণে, অত্যন্ত ভয়-মাখানো যত্নের সঙ্গে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ালাম, যেন এক ঝুড়ি ডিম আমি, তারপর জানালার কাছে গিয়ে চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া রাত্রির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তো, কলেজে পড়া তরুণটি, যে ভেবেছিলো সে জবরদস্ত ব্যাটা ছেলে হয়ে উঠেছে, দুনিয়ার যাবতীয় হাল হকিকত তার জানা, যে ওই রাতে চামড়ার আসনের ছোট্ট ব্যবধানের এপাশ থেকে নিজের সম্পর্কে তার ধারণার একটা সংজ্ঞা হিসেবে, প্রায় কর্তব্যের মতো, ওই সব গতানুগতিক নৈর্ব্যক্তিক ভাবনাগুলি ভেবেছিলো, তো ওই রাতে চামড়ার আসনের ছোট্ট ব্যবধানের এপাশ থেকে সে তার হাত বাড়িয়ে দেয় নি, এবং তারই ফল হিসেবে আজ সে এই ছায়াঘেরা ঘরে নগ্নদেহে, খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, বাইরের চন্দ্রালোকসিক্ত, সমুদ্রের মতো ঝলমল করা বিশাল রাতের দিকে তাকিয়ে আছে, আর একটু দূরে কোথাও, মার্টল্ কুঞ্জের মধ্য থেকে একটা মকিং বার্ড পাগলের মতো বিশ্বচরাচরের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিরামহীন ধারাভাষ্য দিয়ে চলেছে।

এইভাবে এ্যান স্ট্যান্টন আমার রাতও হয়ে উঠেছিলো। কারণ সেদিন আমার গাড়িতে এ্যান স্ট্যান্টন তার কৌশলটা খুব নিপুণভাবেই প্রয়োগ করেছিলো। সেটা ছিলো শব্দবিহীন এবং হস্তবিহীন কৌশল। তার জন্য কথা কিংবা হাতের প্রয়োজন হয় নি। সে চামড়ার আসনে তার মাথা একটু ঘুরিয়েছিলো, তার ঠোঁটে আঙুল রেখে

শুধু বলেছিলো, শ্‌স্‌, শ্‌স্‌, আর হেসেছিলো। আর ওইভাবেই সে তার হার্পুন গভীরতম প্রদেশে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। ক্যুইকেগ চার ফুট চর্বি ভেদ করে তিমির প্রাণকেন্দ্রে তার হার্পুন ঢুকিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু আমার সব চর্বির অভ্যন্তরে আমি যাকে একেবারে যথার্থ আমি বলে ভেবেছিলাম, এখনো ভাবতে থাকতাম, হার্পুনের সবটুকু দড়ি ছাড়ার পর আমার ভেতরকার লাল মাংসের মধ্যে গিয়ে কাঁটাটা বিঁধে হ্যাঁচকা টান দেবার আগে পর্যন্ত আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি।

এ্যান স্ট্যান্টন ঠিকই আমার রাত হয়ে উঠেছিলো। দিনও। কিন্তু দিনের বেলায় সে পুরো জিনিসটা হয়ে উঠতো না, বরং তখন সে হয়ে উঠতো তার স্বাদ ও গন্ধ, তার পরিশ্রুত রূপ, আবহাওয়া, নিঃশ্বাস, যেসব ছাড়া পুরো জিনিসটা কিছুই হতো না। এ্যাডাম প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থাকতো, কখনো কখনো অন্য লোকজন ও বইপত্র নিয়ে, স্যান্ডউইচ নিয়ে, দেবদারু বনে কম্বল সঙ্গে নিয়ে, সমুদ্র তীরে, টেনিস কোর্টে, বাড়ির ছায়াঘেরা ঘরে, সেখানে গ্রামোফোন বেজে চলেছে, নৌকায়, ছায়াছবির প্রেক্ষাগৃহে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর হাত থেকে বই পিছলে কম্বলের উপর পড়ে যেতো, সে উপরে যেখানে দেবদারু বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা চাঁদোয়া তৈরি করে রেখেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকতো, আর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখতাম, আর হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে মনে হতো যে এ্যাডাম আর সেখানে নেই। কিংবা আমরা ঘরের মধ্যে আছি, ও হাসছে, সবার সঙ্গে বকবক করছে, ওদিকে রেকর্ড বেজে চলেছে, হঠাৎ আমার চোখে পড়লো ও চুপ করে গেছে, মুখ কেমন বিষণ্ন, হয়তো মাত্র এক মুহূর্তের জন্য, ওর চোখে সুদূর এক দৃষ্টি, বাইরের আঙিনার দিকে ও তাকিয়ে আছে, আর তখুনি আবার, শুধু ওই মুহূর্তটির জন্য মনে হতো ওখানে এ্যাডাম নেই, কেউই নেই।

কিংবা আমরা ওই হোটেলে যেতাম, যেখানে খুব উঁচু থেকে জলে লাফ দিয়ে পড়বার একটা টাওয়ার ছিলো, খুব জমকালো হোটেল, মাঝে মাঝে সেখানে নানা প্রদর্শনী আর দৌড় ঝাঁপের প্রতিযোগিতা হতো। ওই গ্রীষ্মে এ্যান ডাইভিং নিয়ে ভীষণ মেতে উঠেছিলো। অনেক উঁচুতে উঠে যেতো সে, দিন-দিন উঁচু থেকে আরো উঁচুতে, রোদের আলোয় একেবারে কিনারে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াতো। তারপর যখন সে তার বাহু দুটি উপরে তুলে ধরতো আমার মনে হতো আমার ভেতরে কিছু একটা বোধহয় ছিঁড়ে যাবে। তারপর সে উড়াল দিতো, হাঁসের মতো সুন্দর একটা ডুব, দু'বাহু প্রসারিত, যার ফলে তার ছোট্ট সুগঠিত দুটি স্তন স্পষ্ট হয়ে উঠতো, তার পিঠ বাঁকানো, লম্বা পা দুটি মিষ্টি করে কাছাকাছি ধরা। সে সূর্যালোকের মধ্য দিয়ে তীরের মতো নেমে আসতো আর আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আমার মনে হতো

আর কেউ কোথাও নেই। আমার ভেতরে যা সেটা প্রায় ছিড়ে যেতে চাইছিলো। সেটা ছিড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখতাম। তারপর সে একটা ছুরির ফলার মতো জলের মধ্যে ঢুকে যেতো, ঢেউ–এর মালা আর ফোয়ারার মতো ছড়ানো জলের মধ্যে তার জোড়া পা মিলিয়ে যেতো, তারপর সে চলে যেতো দৃষ্টির সীমানার বাইরে। অতো উপরে ওঠার জন্য এ্যাডাম মাঝে মাঝে ওর উপর খুব চটে যেতো, আর ও বলতো, ওহ্, এ্যাডাম, কিছু হবে না, কী যে ভালো লাগে, এ্যাডাম ! মই–এর আরো উঁচুতে উঠে যেতো আর ঝাঁপ দিতো। উঠে যেতো আর ঝাঁপ দিতো। বার বার। বার বার। আমি মনে মনে ভাবতাম ঠিক যখন জলের মধ্যে প্রবেশ করছে তখন তার মুখটা কেমন দেখায়। কি অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে সেখানে।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা আক্ষরিক অর্থে একা হতাম। এ্যান আর আমি কখনো কখনো সবার মাঝ থেকে সরে পড়ে দেবদারু বনে চলে যেতাম, যেখানে দেবদারুর পাতা ছাওয়া কোমল মাটিতে নিঃশব্দে পরস্পরের হাত ধরে হাঁটতাম। সমুদ্রতীর থেকে শ'খানেক গজ দূরে নোঙ্গর করা একটা ছোট্ট ডাইভিং ফ্লোট ছিলো, নিচু একটা তক্তার মতো, স্ট্যান্টনদের। আমরা মাঝে মাঝে সেখানে সাঁতরে চলে যেতাম। বেলাভূমিতে লোকজন হৈ চৈ করছে, কিংবা বেলাভূমি নির্জন, আমরা ওই তক্তার উপর শুয়ে ভাসতাম, আমাদের দু'চোখ বন্ধ, দু'জনের আঙুলের ডগা শুধু ছুঁয়ে আছে, একটা অদ্ভুত শিহরণ সেখানে, যেন আমার সমস্ত সত্তা সেখানে উন্মুখ ও পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

রাতের বেলায় আমরা প্রায়ই একা হতাম। এ যাবৎ আমি আর এ্যাডাম সব সময় এক সাথে থাকতাম, আর এ্যান আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতো। কিন্তু এখন হঠাৎ দেখা গেলো যে আমি আর এ্যান এক সাথে থাকছি ; আর এ্যাডাম আস্‌ছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা এ্যাডাম হয়তো বাড়িতেই বসে আছে, গিবন কিংবা ট্যাসিটাস পড়ছে, ওই সময়টায় রোমের ইতিহাসে ও মগ্ন হয়ে গিয়েছিলো। আমি যেমন প্রত্যাশা করেছিলাম তার চাইতে সহজে এই পরিবর্তনটা ঘটলো। গাড়িতে সেদিন রাতে ওই ঘটনার পর, পরদিন সকালে আমি যথারীতি ওদের সঙ্গে টেনিস খেলতে এবং বিকালে সাঁতার কাটতে যাই। আমি সারাক্ষণ এ্যানকে লক্ষ করছিলাম, এটা ছাড়া আর কোনো তফাৎ ছিলো না। ওর মধ্যে আমি কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। সত্যিই কিছু ঘটেছে কিনা সে বিষয়ে আমার রীতিমত সন্দেহ হলো, গত রাতে আমি কি সত্যিই ওকে নিয়ে ছবিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ রাতে আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

সন্ধ্যার দিকেই আমি ওদের বাড়িতে যাই। এ্যান তখন ঘরে, দোলনায় বসে

আছে। এ্যাডাম দোতলায়, একটা জরুরী চিঠি লেখায় ব্যস্ত। এ্যান জানালো যে মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে নেমে আসবে। বাবার কি একটা কাজের ব্যাপারে লিখছে। এ্যান আমাকে বসতে বললেও আমি বসলাম না। জালের দরজার ঠিক ভেতরে সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ভারী অস্বস্তি লাগছিলো আমার, কি বলবো মনে মনে ভাবছিলাম। তারপর দুম্ করে বলে ফেললাম, চলো, ওই ঢালু জায়গাটার দিক থেকে হেঁটে আসি, তারপর দুর্বলভাবে যোগ করলাম, ততক্ষণে এ্যাডাম নেমে আসবে।

কোনো কথা না বলে এ্যান উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো, তার হাত বাড়িয়ে দিলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে যেন দমকল বাহিনীর হাজার ঘণ্টা বেজে উঠলো, প্রচণ্ড দুন্দুভি-নিনাদ শুরু হয়ে গেলো। সে আমার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো, পথে বেরুলো, রাস্তা পেরুলো, তারপর ঢালু জায়গাটার দিকে চললো, আমরা অনেকক্ষণ সেখানে ছিলাম। ততক্ষণে এ্যাডামের এক ডজন চিঠি লেখা হয়ে যেতো। কিন্তু ওই খানে কিছুই ঘটলো না, আমরা শুধু পরস্পরের হাত ধরে, পা ঝুলিয়ে, চুপচাপ বসে ছিলাম, আর আমাদের দৃষ্টি ছিলো সমুদ্রের দিকে ফেরানো।

ওইদিকে, রাস্তার ধারে, স্ট্যান্টনদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে একটা মার্টেলের ঝোপ ছিলো। আমরা হাত ধরাধরি করে বাড়িতে ফিরবার পথে ওখানে পৌঁছুবার পর ওই ঝোপের ছায়ার আড়ালে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, ওকে আমার কাছে টেনে নিই, ঝট্ করে, বোধহয় একটু এলোমেলো ভাবেই। কাজটা করতে আমার বেশ সাহস সঞ্চয় করতে হয়, অনেকক্ষণ ধরে ভেবেছি আমি। তারপর আমি ওকে চুমু খেলাম। ও কোনো আপত্তি জানালো না, কিন্তু আমাকে প্রতিচুম্বনও করলো না, দুপাশে শিথিলভাবে হাত ঝুলিয়ে দিয়ে সে শান্তভাবে চুমুটা নিলো, যেন একটা ছোট্ট লক্ষ্মী মেয়েকে যা করতে বলা হয়েছে তা করলো। চুমু খাওয়ার পর আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম, তার মুখের মসৃণতার উপর একটা অন্তর্মুখী চিন্তামগ্নতার ছায়া পড়েছে। তার মুখে এমন একটা অভিব্যক্তি দেখলাম যা কখনো কখনো শিশুর মুখে দেখা যায়, যখন শিশুকে একটা নতুন খাবার দেয়া হয় আর ওই নতুন খাবারটা তার ভালো লাগছে কিংবা লাগছে না সে বিষয়ে সে মনস্থির করার চেষ্টা করছে তখন যেমন দেখা যায়। আর তখনই আমার মনে হলো, ওহ্ ভগবান, এর আগে বোধহয় কেউ ওকে কখনো চুমু খায় নি, ওর বয়স সতেরো কিংবা প্রায় সতেরো হলে কি হবে, ওর মুখের অভিব্যক্তি এমন মজার দেখাচ্ছিলো যে, আমি প্রায় শব্দ করে হেসে উঠেছিলাম, আর তখন আমার মন গভীর আনন্দে ভরে যায়। আমি ওকে আবার চুমু খেলাম

এবং এবার সেও প্রত্যুত্তর দিলো। ভীরু–ভীরু ভঙ্গিতে, পরীক্ষামূলকভাবে, কিন্তু উত্তর দিলো ঠিকই। আমি বললাম, এ্যান, তখন আমার মাথা ঘুরছিলো, মনে হচ্ছিলো বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যাবে, বললাম, এ্যান, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসি, এ্যান।

ও আমার কোট আঁকড়ে ধরেছিলো, ঠিক কাঁধের নিচে আমার বুকের দু'দিকে ওর দু'হাত, কাপড় কুঁচকে যাচ্ছিলো আমার, ওর মাথা একটু হেলানো, নিচু করা, শিথিলভাবে আমার বুকের উপর ধরা, যেন কিছু একটা অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা চাইছে। আমার কথার কোনো উত্তর দিলো না ও, আর আমি যখন ওর মুখটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম তখন সে তা আরো জোরে আমার বুকে চেপে ধরলো, আমার জামা খামচে ধরলো আরো শক্ত করে। আমি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম, নাক ভরে গ্রহণ করলাম তার চুলের স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন গন্ধ।

খানিক পর, অনেকক্ষণ পরে হতে পারে, অল্প পরেও হতে পারে, আমি জানি না, সে নিজেকে আমার কাছ থেকে মুক্ত করে একটু পেছনে সরে গেলো। তারপর বললো, এ্যাডাম কিন্তু অপেক্ষা করছে, আমাদের যাওয়া দরকার।

আমি ওর পেছন পেছন চললাম, রাস্তা পেরিয়ে স্ট্যান্টনদের বাড়ির প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কয়েক পা এগিয়ে সে আমার জন্য অপেক্ষা করলো, তারপর আমার হাত তুলে নিলো তার হাতে, এবং ওইভাবে হাত ধরাধরি করে আমরা অগ্রসর হলাম বাড়ির ভেতর গ্যালারির দিকে, যার ছায়ায় তখন এ্যাডামের বসে থাকবার কথা।

হ্যাঁ, এ্যাডাম বসেই ছিলো, তার সিগারেটের আলো দেখলাম আমি, লম্বা টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠছে, তারপর আবার ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

তখনো ও আমার হাত ধরে আছে, আগের চাইতেও শক্ত করে, যেন কোনো একটা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে তার খালি হাত দিয়ে জালের দরজাটা খুললো, ভেতরে ঢুকলো, আমাকে টেনে নিলো তার পেছন পেছন। আমরা দুজন এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম, পরস্পরের হাত ধরা, তারপর এ্যান বললো, হ্যালো, এ্যাডাম। আর আমিও বললাম, হ্যালো, এ্যাডাম।

এ্যাডামও বললো, হ্যালো।

আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম কয়েক মুহূর্ত, যেন কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তারপর ও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, আমি উপরে যাচ্ছি, শুভরাত্রি সবাইকে। তারপর সে দ্রুত চলে গেলো, নিচে রবার লাগানো জুতোর মৃদু শব্দ হলো, তারপর সে হলঘরের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ্যাডাম বললো, কি হলো তোমার, বসছো না কেন?

এ্যাডামের সঙ্গে একই দোলনার অন্য প্রান্তে আমি বসলাম। সে আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে দিলে আমি একটা সিগারেট বার করে ম্যাচের জন্য নিজের পকেট হাতড়ালাম কিন্তু পেলাম না। এ্যাডাম দেশলাই জ্বালিয়ে সামনে ঝুঁকে আমার সামনে কাঠিটা বাড়িয়ে দিলো। আমার মুখের সামনে আগুন জ্বলে উঠলো, সিগারেটটা ধরালো, আর আমার মনে হলো সে ইচ্ছা করে ওইখানে আগুনটা ধরিয়েছে, যেন আমার মুখ ভালো করে লক্ষ করতে পারে, নিজের মুখ আড়ালে রেখে। আমার অসম্ভব ইচ্ছা হচ্ছিলো তাড়াতাড়ি নিজের মুখটা সরিয়ে নিয়ে হাত দিয়ে মুছে ফেলি, দেখি সেখানে লিপস্টিকের দাগ লেগে আছে কিনা। সিগারেটটা জ্বলে উঠতেই আমি আলোর সামনে থেকে আমার মুখ সরিয়ে এনে বললাম, ধন্যবাদ।

এ্যাডাম বললো, ইউ আর ওয়েলকাম, এবং এই স্তরেই আমাদের সে–সন্ধ্যার আলাপচারিতার ইতি ঘটে। আমাদের দুজনেরই কিছু একটা বলার ছিলো। আমি জানতাম ওর মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জেগেছে। ও আমাকে সে প্রশ্নটা করতে পারতো। কিংবা সে প্রশ্ন না করলেও আমি নিজে থেকে ওকে বলতে পারতাম। আমার ভয় হচ্ছিলো সে বোধহয় প্রশ্নটা করবে। কারণ মনে মনে আমি যদিও বলছিলাম যে ও জাহান্নামে যেতে পারে, এটা ওর কোনো ব্যাপারই নয়, তবু ভেতরে ভেতরে আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে উঠেছিলো, যেন আমি ওর কাছ থেকে কিছু চুরি করে নিয়েছি। কিন্তু এর সাথে সাথে আমি আমার ভেতরে একটা তীব্র উত্তেজনাও অনুভব করছিলাম, আমি চাইছিলাম যে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ এ্যান স্ট্যান্টন যে বিস্ময়কর, আমি যে তার প্রেমে পড়েছি, একথাটা আমি একজনকে বলার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। যেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি কাউকে বলতে পারছি, দ্যাখো, আমি প্রেমে পড়েছি, সত্যি, ততক্ষণ আমার প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। ওই মুহূর্তে তার পরিপূর্ণতা লাভের জন্য সে কথাটা বলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো, যেমন পরবর্তী সময়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো আমাদের দেহের সংস্পর্শ। তো, আমি প্রেমে পড়েছি এই ঘটনায় বুঁদ হয়ে অন্ধকারে দোলনার মধ্যে বসেছিলাম, ঘটনাটাকে পূর্ণতা দেবার জন্য কথাটা বলতে চাইছিলাম কাউকে, ওই মুহূর্তে আমার ভালোবাসার পাত্রী এ্যানের অনুপস্থিতির অভাবও আমি অনুভব করলাম না। ও উপরে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলো। আমি ঘটনাটার প্রভাবে আমার নিজের আবেগ অনুভূতির মধ্যে এতোটা

ডুবে গিয়েছিলাম যে ও যে কেন উপরে চলে গিয়েছিলো তখন সে সম্পর্কে কিছুই ভাবি নি। পরে আমি স্থির করি যে এ্যাডামের সামনে আমার হাত ধরে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে ওকে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলো, তারপর ওই তথ্যটি তার সামনে রেখে সে উপরে চলে যায়, যেন সে আমাদের স্ফটিক-গোলকের, আমাদের ছোট্ট ভুবনের, নতুন কাঠামো সম্পর্কে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে পারে।

কিন্তু পরে, অনেক পরে, বহু বছর পরে যখন এই ঘটনা আর কোনো দিন তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে বলে মনে হয় নি, তখন আমি স্থির করি যে সে উপরে চলে গিয়েছিলো কারণ একা থাকা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। সে উপরে আলো নেভানো ঘরে জানালার পাশে বসে বাইরে রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকবে, কিংবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকার ছাদ লক্ষ করবে, তার নতুন সত্তার সঙ্গে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেবার জন্য, দেখবে সে এই নতুন বাতাস বুক ভরে টেনে নিতে পারছে কিনা, অনুভূতির নতুন জোয়ারে যে নতুন উপাদান সংযোজিত হলো তার মধ্যে সে টিকে থাকতে পারছে কিনা, ডুব দিতে পারছে কিনা, অলসভাবে সাঁতার কাটতে পারছে কিনা। একটি শিশু যেভাবে আত্মমগ্ন হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে গুটিপোকার মধ্য থেকে সুন্দর একটা পতঙ্গকে বেরিয়ে আসতে দেখে — আবার একটা লুনা পতঙ্গ — কোমল সবুজ ভেজাভেজা, গুটিশুটি পাকানো, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে, মেলে ধরছে নিজেকে, পাখা নেড়ে হাল্কা মৃদু হাওয়া তুলছে, এত মৃদু যে খুব কাছে চোখ নিয়ে ঝুঁকে পড়ে খুঁটিয়ে দেখলেও সেই হাওয়া চোখে লাগবে না, একটি শিশু যেভাবে নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে এই সব দেখে এ্যানও সেই ভাবে নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে একা হবার জন্য উপরে চলে গিয়েছিলো। সে তার নতুন সত্তাকে আবিষ্কারের জন্যই হয়তো নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলো, কারণ প্রেমে পড়লে একটা মানুষের নব সৃষ্টি হয়। একটা মানুষ যখন তোমাকে ভালোবাসে তখন যে বিশাল অনির্মিত কাদার তাল হচ্ছে মানবতা, তার মধ্য থেকে সে তোমাকে বেছে নেয়, একটা কিছু তৈরি করে নিতে চায় সে তার মধ্য থেকে, এবং ওই বেচারা কাদার তাল কি জিনিস যে সে তৈরি হলো তা দেখতে চায়। কিন্তু ওই একই সময়ে তুমি নিজে, তুমি যখন কাউকে ভালোবাসো, তুমিও সত্যি হয়ে ওঠো, তুমি তখন ওই অনির্মিত কাদার তালের সম্প্রসারিত অংশ আর থাকো না, তোমার মধ্যে জীবনের নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়, তুমি জেগে ওঠো। তাই অন্য একটি মানুষকে সৃষ্টি করে তুমি তোমার নিজেকেও সৃষ্টি করো, কিন্তু সে-ও তোমাকে ওই কাদার তালের মধ্য থেকে তুলে নিয়েছে, তোমাকে সৃষ্টি করেছে।

অতএব, তুমি হচ্ছ দু'জন, একজনকে তুমি নিজে সৃষ্টি করেছো, নিজে ভালোবেসে, আরেক জনকে সৃষ্টি করেছে তোমার প্রিয়া, তোমাকে ভালোবেসে। তোমার এই দুই সত্তা পরস্পরের যতো দূরে সরে যায় ততোই এই পৃথিবী তার অক্ষদণ্ডের উপর কর্কশভাবে ঘুরতে থাকে, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু তুমি যদি নিখুঁতভাবে ভালোবাসা দাও, নিখুঁতভাবে ভালোবাসা পাও, তাহলে তোমার দুই সত্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, কোনো দূরত্ব বিরাজ করে না। স্টিরিওস্কোপে এক জোড়া ছবি একটা কার্ডের উপর এক রেখায় যেভাবে ত্রুটিহীন হয়ে মিলে যায় তখন তারাও সেই রকম নিখুঁতভাবে এক হয়ে যায়।

সে যাই হোক, সপ্তদশী এ্যান স্ট্যান্টন হয়তো একা হবার জন্যই উপরে চলে গিয়েছিলো, কারণ সে, হঠাৎ, প্রেমে পড়ে গেছে। একটা বেশ লম্বা, ঈষৎ কুঁজো, একুশ বছরের ল্যাকপ্যাকে যুবক, শীর্ণ ঘোড়ার মতো মুখ, মস্ত বড় খড়্গ–নাসা, অবিন্যস্ত চুল, কালো চোখ (ক্যাস মেস্টার্নের চোখের মতো অতো কালো আর জ্বলজ্বলে নয় ; কিন্তু প্রায়ই কেমন যেন উদাস আর ঘেরাটোপ পরানো, সকালের দিকে রক্তাভ, কোনো উত্তেজনার মুহূর্তে উজ্জ্বল চকচকে), বড়ো বড়ো হাত, কোলের উপর ধীরে ধীরে নড়ছে, একটা আরেকটাকে জড়িয়ে ধরছে, পদযুগলও বড়ো বড়ো, হাঁটেও শিথিলভাবে — দেখতে সুন্দর নয়, অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত নয়, পরিশ্রমী নয়, ভালো নয়, দয়ালু নয়, এমন কি উচ্চাভিলাষীও নয়। প্রায়ই বাড়াবাড়ি করে ফেলে, বিভ্রান্তিতে ভোগে, মাঝে মাঝেই প্রবল বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়, চরম হিংস্রতাকে প্রশ্রয় দেয়, কখনো ভীষণ শীতল আবার কখনো আগুনের মতো উত্তপ্ত, কৌতূহল আর নিরাসক্তির মধ্যে, বিনয় আর সগর্ব আত্মপ্রেমের মধ্যে, গতকাল আর আগামী দিনের মধ্যে প্রায়ই দোদুল্যমান — ওই রকম একটি যুবকের সঙ্গে এ্যান প্রেমে পড়ে গেছে। আর সাধারণ মাটির স্তূপ থেকে ওই রকম অপ্রতিশ্রুতিশীল একটা কাদার তাল তুলে এনে সে যে কি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলো সে ইতিহাস কেউ কখনো জানতে পারে নি।

কিন্তু এ্যান তার ভালোবাসার মধ্য দিয়ে নিজেকেও নতুন করে সৃষ্টি করছিলো আর সে তার নতুন সত্তাকে বুঝে উঠতে চেষ্টা করার জন্যই উপরে নির্জন ঘরে অন্ধকারে গিয়ে বসেছিলো, আর এদিকে এ্যাডাম ও আমি নিচে গ্যালারিতে দোলনায় বসেছিলাম, একটিও কথা না বলে। ওই সন্ধ্যাতেই এ্যাডাম আমাদের অনুভূতি ও বিবেচনার বাইরে চলে যায়। ভবিষ্যতের আর সব সন্ধ্যার জন্যও। বেশ হয়েছে। উচিত শাস্তি হয়েছে তার।

অন্যদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। যখন স্ট্যান্টনদের বাড়িতে কিংবা আমার মায়ের

ওখানে বহু লোকের জমায়েত হতো, ফোনোগ্রাফে গান হতো, সবাই নাচতে শুরু করতো (ছেলেদের কেউ কেউ ফ্রান্সের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর ফিরে এসেছিলো — তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটু পর পর বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ওক্ গাছের খোঁদলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সুরার বোতল বার করে পান করে আসছিলো), তখনো এ্যান আর আমি ওদেরকে বিবেচনার বাইরে রাখতাম। একমাত্র এ্যানের সঙ্গেই আমি সুন্দর শোভনভাবে নাচতে পারতাম, রাতগুলি ছিল উষ্ণ, এ্যানের চাইতে আমি লম্বায় খুব বেশি উঁচু ছিলাম না, খুব সহজেই আমি তার চুলের সবটুকু গন্ধ বুকে টেনে নিতে পারতাম, আর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় বন্দী হয়ে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমাদের দুজনকে একটা মোহমায়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলতো, আমাদের দুজনের নিঃশ্বাস একই সুর লয় তালে বইতো, এবং কিছুক্ষণ পর আমার মনে হতো আমি যেন দেহের সীমানা অতিক্রম করে গেছি, অবয়বহীন হয়ে উঠেছি, পাখির পালকের মতো বাতাসে ভাসছি, কিংবা একটা বিশাল বেলুনের মতো, মাটির সঙ্গে ক্ষীণ একটি মাত্র সুতোর বাঁধনে আটকে আছি, অপেক্ষা করছি এক ঝলক দমকা হাওয়ার জন্য।

কিংবা আমার ছোট গাড়িতে উঠে আমরা দুজন ল্যান্ডিং থেকে বেরিয়ে পড়তাম, রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যেতাম, বাড়িঘর, দেবদারু বন, জলাভূমি সব পিছনে পড়ে থাকতো, ও তার মাথা এলিয়ে দিয়েছে আমার কাঁধের উপর, হাওয়ায় তার চুল ফুলে উঠেছে, চুলের ছোট ছোট গুচ্ছগুলি আমার গালের উপর এসে আছড়ে পড়ছে। সে উঁচু গলায় হেসে উঠে বলতো, জ্যাকি, জ্যাকি, কী আশ্চর্য রাত, কী আশ্চর্য রাত, কী আশ্চর্য রাত, বলো, জ্যাকি সোনামণি, বলো, বলো, কী আশ্চর্য রাত। আর শেষ পর্যন্ত আমাকে ওর সাথে সাথে তাই বলতে হতো, ঠিক পড়া শেখার মতো করে। কিংবা সে হয়তো একটা সুর ভাঁজতো, কিংবা একটা গান গাইতো, গ্রামোফোনে যেসব গান হতো তার মধ্য থেকে একটা — কি গান গাওয়া হতো সেই সময়? আজ তার কিছুই মনে নেই। তারপর এক সময় তার সুর ভাঁজা বন্ধ হতো, সে স্থির নিশ্চল হয়ে যেতো, চোখ দুটি বোঁজা, আমি তখন গাড়িটা থামাতাম, এমন একটা জায়গায় যেখানে উপসাগর থেকে হাওয়া এসে মশককুলকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো। (যে রাতে বাতাস থাকতো না, সে রাতে গাড়ি থামাবার কথাই উঠতো না।) তারপর কখনো কখনো আমি যখন গাড়িটা থামাতাম তখনো সে তার চোখ খুলতো না, শেষে আমি ঝুঁকে পড়ে তাকে চুমু খেতাম, এবং দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের ফলে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলেই সে তার চোখ খুলতো। আবার কখনো কখনো আমি যখন তাকে চুমু খেতে যাবো তার ঠিক আগের মুহূর্তে সে বড়ো বড়ো করে তার চোখ দুটি খুলে হঠাৎ বলে উঠতো, কু-উ! বলেই সজোরে হেসে উঠতো।

তারপরই সে রূপান্তরিত হয়ে যেতো শুধু হাঁটু আর ধারালো কনুই, হ্রস্ব হাসি, খিলখিল শব্দ আর সাপের মতো এঁকেবেঁকে পিছলে যাওয়াতে, আর ওই অবস্থায় তাকে আটকে ফেলে চুমু খাওয়ার জন্য আমাকে প্রায় যুযুৎসু বিশেষজ্ঞের কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছিলো। একটা ছোট্ট গাড়ির ছোট্ট আসনে যে কি করে ফ্ল্যান্ডার্সের প্রান্তরের যুদ্ধের কৌশলগুলি প্রয়োগ সম্ভব হয়েছিলো, যে-মেয়েটি রেশমের মতো কোমল, উইলো শাখার মতো মসৃণ, বেড়ালের মতো আদুরে হয়ে আমার বুকে পড়ে থাকতো সে যে কি করে হঠাৎ এতো ভয়ঙ্কর চতুর হয়ে উঠতে পারতো, কি করে ধারালো কনুই আর অসম্ভব কুশলী হাঁটুতে রূপান্তরিত হয়ে যেতো, সে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আর ওই কনুই আর হাঁটু আর তীক্ষ্ণ নখের আড়ালে তার চোখ জ্বলজ্বল করতো, চাঁদ কিংবা তারার আলোয় তার চুল খুলে পড়েছে, ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক করা, তার মধ্য দিয়ে রুদ্ধশ্বাস হাসির শব্দ বেরিয়ে আসছে, আর হাসতে হাসতে সে ছড়ার সুরে আবৃত্তি করছে, জ্যাকি সোনামণিকে আমি — ভালো — বাসি — না , জ্যাকি পাখিমণিকে কেউ ভালো — বাসে — না, জ্যাকি সোনামণিকে আমি ভালো — বাসি — না, জ্যাকি পাখিমণিকে কেউ ভালো — বাসে — না। অবশেষে সে হাসতে হাসতে নিস্তেজ হয়ে আমার বুকে লুটিয়ে পড়তো, আমার চুম্বন গ্রহণ করতো, বড়ো করে শ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বলতো, জ্যাকি সোনামণিকে আমি ভালোবাসি, তারপর হাল্কাভাবে আমার মুখে আঙুল বুলিয়ে দিতো, আবার বলতো, জ্যাকি সোনামণিকে আমি ভালোবাসি — তার নাক যতো বিশ্রী হোক না কেন, বলেই আচ্ছা করে আমার নাকটা মলে দিতো। আর আমি আমার বাঁকা বিশ্রী খড়্‌গনাসায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে ভান করতাম যেন খুব ব্যথা পেয়েছি, যদিও ভেতরে ভেতরে সে যে ওই নাকটা স্পর্শ করেছে সেই গর্বে বিভোর হয়ে যেতাম।

ব্যাপারটা কি দীর্ঘ চুম্বন নাকি কনুই আর হাঁটুর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আর খিলখিল হাসির তরঙ্গ হবে তা আগে থেকে কখনোই বলা যেতো না। কিন্তু তাতে খুব বেশি কিছু এসে যেতো না, কারণ শেষ অবধি সমাপ্তিটা ঘটতো একই রকম, সে ঝুঁকে আমার কাঁধে তার মাথা রেখে আকাশের পানে চোখ মেলে ধরতো। চুম্বনের ফাঁকে ফাঁকে আমরা কখনো কখনো চুপ করে থাকতাম, কখনো কখনো আমি ওকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতাম — তখন আমি কিছু কিছু কবিতা পড়তাম আর কবিতা ভালেবাসি বলেই মনে করতাম — কিংবা বিয়ের পর আমরা কি করবো তা নিয়ে কথা বলতাম। বিয়ের প্রস্তাব আমি কখনো করি নি। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে আমরা বিয়ে করবো এবং চির জীবন একসঙ্গে বাস করবো, এমন একটা

পৃথিবীতে যেখানে থাকবে সূর্যালোকিত বেলাভূমি আর সমুদ্রতীরবর্তী চন্দ্রালোকিত দেবদারু কুঞ্জ, মাঝে মাঝে ইউরোপ ভ্রমণ (আমাদের দুজনের কেউই ইউরোপ দেখি নি), ওক্ তরু শোভিত একটি বাড়ি, চামড়ার কুশান দেয়া মোটরগাড়ি, আর একগাদা মন কেড়ে নেয়া হাস্যোজ্জ্বল ছেলেমেয়ে, আমার কল্পনায় যারা ছিলো অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে কিন্তু ওর কল্পনায় খুবই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, এবং কথাবার্তার সময় অন্য প্রসঙ্গের অভাব পড়লেই আমরা তাদের কি নাম দেয়া যাবে তা নিয়ে গম্ভীরভাবে দীর্ঘ তর্ক–বিতর্কে লিপ্ত হতাম। ওদের সবারই মধ্য–নাম হবে স্ট্যান্টন। গভর্নরের নাম অনুসারে একটি ছেলের নাম রাখা হবে জোয়েল স্ট্যান্টন। অবশ্যই বড়ো ছেলের নাম রাখা হবে জ্যাক, আমার নাম অনুসারে। এ্যান বলতো, প্রথম ছেলের নাম রাখবো জ্যাক, তোমার নাম অনুসারে, কারণ তুমিই প্রথম, তুমিই জ্যাকি সোনামণি, সব চাইতে পুরানো জিনিস এই পৃথিবীতে, তুমি সমুদ্রের চাইতে আগের, তুমি আকাশের চাইতে আগের, তুমি মাটির চাইতে আগের, তুমি গাছের চাইতে আগের, আর আমি তোমাকে চিরকাল ভালোবেসে এসেছি, চিরকাল তোমার নাক মুচড়ে দিয়েছি, কারণ তুমি একটা প্রাচীন প্রাচীন বিতিকিচ্ছি ব্যাপার, জ্যাকি সোনামণি, জ্যাকি পাখিমণি, আর তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। সে বলতো আর আমার নাক ধরে টান দিতো।

শুধু একবার, গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ দিকে, ও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো জীবিকার জন্য আমি কি করবো বলে ঠিক করেছি। ও আমার বাহুবন্ধনে চুপ করে শুয়েছিলো। অনেকক্ষণ পর সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, জ্যাক, তুমি কি করবে?

ওর প্রশ্ন আমি বুঝতেই পারি নি। আমি জবাব দিয়েছিলাম, করবো? আমি কি করবো? তোমার কানের মধ্যে ফুঁ দেবো। তাই দিয়েছিলাম আমি।

ও আবার প্রশ্ন করেছিলো, তুমি কি করবে? তোমার জীবিকার জন্য কি করবে?

আমি জবাব দিয়েছিলাম, জীবিকার জন্য আমি তোমার কানে ফুঁ দেবো।

ও কিন্তু হাসে নি। বলেছিলো, না, আমি সত্যি সত্যি জিজ্ঞাসা করছি।

প্রায় এক মিনিট আমি কোনো উত্তর দিই নি, তারপর বলেছিলাম, ভাবছি আইন পড়বো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলেছিলো, এইমাত্র তুমি এটা ভাবলে। শুধু একটা কথার কথা বললে তুমি।

হ্যাঁ, তাই, একটা কথার কথাই আমি বলেছিলাম। সত্যি বলতে কি, নিজের ভবিষ্যত নিয়ে আমার কখনোই ভাবতে ইচ্ছা করতো না। এ নিয়ে আমার কোনো

মাথাব্যথা ছিলো না। মনে মনে ভাবতাম একটা চাকুরি জুটিয়ে নেবো, যে কোনো চাকুরি, কাজ করবো, বেতন পাবো, টাকাটা খরচ করবো, তারপর আবার সোমবার সকালে কাজে ফিরে যাবো, ব্যস। আমার কোনো উচ্চাশা ছিলো না। কিন্তু ওখানে বসে এ্যানকে আমার পক্ষে এটা বলব সম্ভব ছিলো না যে আমি যে-কোনো একটা চাকুরি জুটিয়ে নেবো। আমি যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দৃঢ়চিত্ত, দক্ষ একটা মানুষ সে-পরিচয় তুলে ধরতে হবে।

কিন্তু আমার সে চেষ্টা একটুও সফল হয় নি।

সে আমার ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো, একেবারে কাঁচের মতো, আর ওই পরিস্থিতিতে আমার কিইবা আর করার ছিলো? আমি জোর দিয়ে বললাম যে ও যা ভাবছে সেটা ভুল, আমি অবশ্যই আইন পড়বো, আর আইন পড়ার মধ্যে দোষটা কোথায় সে কথা কি ও দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?

ও দৃঢ়কণ্ঠে আবার বললো, ওটা তুমি এইমাত্র বানিয়ে বলছো।

আহ্, শোনো। তোমাকে আমি না খাইয়ে রাখবো না। তোমার যা যা আছে তার সবই আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করবো। তোমার যদি বড়ো বাড়ি চাই, অনেক জামাকাপড় চাই, জমজমাট জলসা চাই, তা আমি —

কিন্তু আমার কথা আমি শেষ করতে পারি নি।

বাধা দিয়ে এ্যান বলে উঠেছিলো, তুমি ভালো করেই জানো, জ্যাক বার্ডেন, যে আমার ওসব কিছুই চাই না। তুমি ছোটলোকোমি করছো শুধু। তুমি আমার উপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করছো। আমার ওসব কিছুই চাই না। তুমি সে কথা জানো। তুমি জানো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, আর তোমার পছন্দমতো কাজ থেকে যদি বেশি টাকা রোজগার না হয়, সেজন্য যদি তোমাকে ঝুপড়িতে থাকতে হয় আর অতি সাধারণ খাবার খেতে হয় তাহলেও আমি সানন্দে তোমার সঙ্গে সেই জীবন মেনে নেবো। কিন্তু তুমি যদি কিছুই করতে না চাও — তাহলে তুমি যদি শুধু শুধু যে কোনো একটা চাকুরি পেয়ে যাও আর তা থেকে প্রচুর টাকা কামাও, তাহলেও — ওহ্, আমি কি বলতে চাই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো — অনেক মানুষ আছে ওই রকম।

সে গাড়ির আসনে সোজা হয়ে বসলো। তারার আলোয় তার দুচোখে সপ্তদশীর সুন্দর ঘৃণা ঝলসে উঠলো। তারপর সে তার তীব্র দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থির নিবদ্ধ করে গম্ভীরভাবে বলে উঠেছিলো, তার ওই গাম্ভীর্যের মধ্যে খুব মজার একটা মিশ্রণ আমি লক্ষ করি, একদিকে একজন বয়স্কা মহিলার ভঙ্গি, অন্যদিকে একটি ছোট মেয়ে যেন অভিনয় করছে, তার মায়ের উঁচু হীলের জুতো পরেছে, গায়ে চড়িয়েছে

দামী অভিজাত পোশাক, তার ওই ভঙ্গির জন্য তাকে একই সঙ্গে মনে হচ্ছে তার সত্যিকার বয়সের চাইতে বড়ো, আবার ছোটও, ওই ভঙ্গি নিয়ে সে গম্ভীরভাবে বলে উঠেছিলো, জ্যাক বার্ডেন, তুমি জানো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, জ্যাক বার্ডেন, তোমার উপর আমার আস্থা আছে, তুমি ওই লোকগুলোর মতো হবে না, জ্যাক বার্ডেন।

ওকে এমন কৌতুককর মনে হয়েছিলো যে আমি জোরে হেসে উঠে ওকে চুমু খেতে চেষ্টা করি কিন্তু ও চুমু খেতে দিলো না, হঠাৎ সে হয়ে উঠলো ধারালো কনুই আর হাঁটু, একটা শক্তিশালী ঘাস কাটার যন্ত্র, আর আমি যেন একটা ঘাসের জঙ্গল। আমি ওকে কিছুতেই শান্ত করতে পারলাম না। তার গায়ে আঙ্গুল পর্যন্ত ছোঁয়াতে পারলাম না আমি। তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বললো সে। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায়ী চুমু পর্যন্ত খেতে দিলো না।

ওই ব্যাপারে তার কাছ থেকে আমি আর কোনো কথা শুনি নি। একটি বাক্য ছাড়া। পর দিন সে আর আমি যখন ডাইভিং তক্তার উপর শুয়েছিলাম, তখন অনেকক্ষণ নীরবে সূর্যের উত্তাপ উপভোগ করার পর সে হঠাৎ বলে উঠেছিলো, গত রাতের কথা তোমার মনে আছে?

আমি জবাব দিয়েছিলাম যে আছে।

সে বললো, তো, আমি কিন্তু সত্যি সত্যি প্রশ্নটা করেছিলাম, এমনি এমনি নয়। বলেই সে আমার হাতের মধ্য থেকে তার হাত টেনে নিয়ে তক্তা থেকে পিছলে নেমে সাঁতার কেটে জলের মধ্যে এগিয়ে যায়, যেন জবাবে আমাকে কিছু বলতে না হয়।

এপ্রসঙ্গে আমি ওর কাছ থেকে আর কিছু শুনি নি। আমিও এটা নিয়ে আর কিছু ভাবি নি। এ্যানের আচরণ ছিলো আগের মতোই, আমি আবার ওই গ্রীষ্মের ভরা জোয়ারের মধ্যে ফিরে যাই, অনুভূতির প্রবল টানের মধ্যে আমরা এক ধরনের রুদ্ধশ্বাস সাবলীলতার সঙ্গে ভেসে বেড়াই, একটা জোরালো, ভারী গভীর স্রোতের মধ্যে, যেখানে কোনো তাড়াহুড়া নেই কিন্তু যার পেছনে ছিলো একটা বিপুল অপ্রতিরোধ্য জলরাশির ভার, যার উপর আমাদের দিন আর রাত্রিগুলি আলো আর ছায়ার মতো ঝিলমিল করে কেটে গিয়েছিলো। আমরা অনির্দিষ্টভাবে ভেসে বেড়াই ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে বদ্ধ এঁদো জলাশয়ে আটকে পড়া পুরানো কোনো নৌকা কিংবা স্নানের টবের ঘোলা জলে এক টুকরো সাবানের ভেসে বেড়াবার মতো নোংরা ও নিন্দনীয় কিছু ছিলো না। না, বরং তা ছিলো একটা সচেতন আত্মসমর্পণ, ওই জোয়ারে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বস্তুতপক্ষে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সেই জোয়ারকে সৃষ্টি করা, আসলে আত্মসমর্পণই নয়, বরং একটা জয় ঘোষণা, কতকটা মরমীয়া

সাধকের ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের মতো, তা যতোটুকু ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে সঁপে দেয়া তাকে ততোটুকু সৃষ্টিও করা, কারণ সে যদি ঈশ্বরকে ভালোবেসে থাকে তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সে তার ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সৃষ্টিও করেছে। তো, যে বিশাল স্রোতে আমি অনির্দিষ্টভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম সেটাকে, আমার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে, আমিই সৃষ্টি করেছিলাম এবং নিজের আয়ত্তের অধীনে এনেছিলাম। ওই স্রোতের উপর আমার দিন আর রাত্রিগুলি ঝিলমিল করছিলো, আমাকে হাত তুলে তাড়াহুড়া করে একটুও এগিয়ে যেতে হয় নি, কারণ স্রোতটা নিজের সময় ও গতিবেগ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলো, সে-ই আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে চলেছিলো।

গোটা গ্রীষ্মকাল ধরে আমি কোনো কিছুই তাড়াহুড়া করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করি নি। বারান্দার দোলনায় নয়, দেবদারু বনে নয়, রাতের বেলায় আমরা যখন সাঁতার কাটতে যেতাম তখন নয়, গাড়িতে নয়। যে রকম সহজভাবে, ধীরে ধীরে, একটা ঋতুর আগমন ঘটে, কিংবা একটা গাছের শাখায় পাতা গজায়, কিংবা একটা বেড়াল ঘুম থেকে জেগে ওঠে, যা কিছু তখন ঘটেছিলো ঠিক ওইভাবেই ঘটেছিলো। এই যে তাড়াহুড়া করছিলাম না, শক্ত উষ্ণ মুঠিতে আঁকড়ে ধরা, উত্তেজিত লুটোপুটি, ছাত্রাবাসে ফেরার পর সহপাঠীদের দাঁত বের করে পরিতৃপ্ত হাসিমুখ দেখানো, এসব উপেক্ষা করে যে বিশাল স্রোত আমাকে আমার নিজস্ব জায়গায় শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবে তার জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে এক ধরনের আভিজাত্যমাখা বিলাসিতা ও নতুন ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছিলো। তার বয়স ছিলো অল্প। অনেক পরে পেছন ফিরে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছে যে সেই সময় তার সত্যিকার বয়সের চাইতেও আমার তাকে কম বয়েসী বলে মনে হয়েছিলো, কারণ ওই গ্রীষ্মে আমি সুনিশ্চিতভাবে নিজেকে একজন বয়স্ক এবং জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা আস্বাদনের পর ঈষৎ ক্লান্ত একজন মানুষ বলে মনে করতাম আর এ্যান ছিলো ভীরু, স্পর্শকাতর, লাজুক এক মেয়ে মাত্র, তবে তার মধ্যে কোনো রকম কৃত্রিম, ভান-করা, আঁকপাঁকু করে বাহুবন্ধনের মধ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া, এই দ্যাখো, ভালো হচ্ছে না কিন্তু, আমি কোনো ছেলেকে আমার সঙ্গে কখনো এরকম ব্যবহার করতে দিই নি জাতীয় লজ্জা ছিলো না। হয়তো এখানে লজ্জা শব্দটি ব্যবহার করাই ভুল। শব্দটির পেছনে যদি অন্যায় আচরণজনিত অপরাধবোধ, কিংবা ভয়, কিংবা 'শোভন' হবার আকাঙ্ক্ষার কোনো আভাস থেকে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে শব্দটি ভুল। কারণ একদিক থেকে, তার সুগঠিত, দৃঢ় পেশীর, কোমল মাংসের, সোনালী কাঁধের শরীর থেকে সে যেন ছিলো বিচ্ছিন্ন,

সেটা যেন ছিলো একটা জটিল সুচতুর যন্ত্রবিশেষ, যার মালিকানায় ছিলো তার আর আমার উভয়ের যৌথ অংশীদারিত্ব, যেন অকস্মাৎ আকাশ থেকে তা আমাদের মাঝখানে এসে পড়েছে, এসম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। তাই পরম ধৈর্য ও গভীর শ্রদ্ধাভরে প্রগাঢ় মনোযোগের সঙ্গে এটা আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে, খুঁটিয়ে পাঠ করতে হবে, পাছে কোনো ছোট্ট পাণ্ডিত্যভরা ডিটেল আমাদের নজর এড়িয়ে যায় এবং সব কিছু পর্যবসিত হয়ে যায় চরম ব্যর্থতা ও অপচয়ে। ওই গোটা সময়টা ছিলো অতি সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ এবং নিগূঢ় অনুসন্ধানের। ওর গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশে ছিলো একটা আশ্চর্য পরিশীলিত উল্লাস (ওহ্, জ্যাকি সোনামণি, ওহ্ জ্যাকি পাখিমণি, আশ্চর্য এই রাত, অবাক, অবাক, সুন্দর তার চোখ দুটি কিন্তু কদাকার তার নাক), ওই উল্লাসের সঙ্গে উচ্চারিত শব্দাবলীর মধ্যে বিশেষ কোনো অর্থ থাকতো না কিন্তু তার সকল অর্থ নিহিত ছিলো সুরের মধ্যে, সেই সুর যেন আকাশের মধ্য থেকে ভেসে এসেছে, নানা অদৃশ্য তারে বাঁধা, এ্যান যেন খেয়ালখুশিমতো অনায়াস সাবলীলতার সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে তার অলস চেনা আঙ্গুল দিয়ে সেই সুর টেনে নামিয়ে এনেছে। আর ওই নিগূঢ় অনুসন্ধানের আড়ালে ছিলো এক ধরনের স্বচ্ছ-দৃষ্টি মায়ামমতা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজ ও স্বাভাবিক, আমাদের অন্য কোনো কোনো সময়ের যে কর্মকাণ্ড, উষ্ণ ঠোঁট আর ঘন দ্রুত অর্ধ-অবরুদ্ধ নিঃশ্বাস, তার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই, ওই সহজ স্বাভাবিক অনুভূতির সঙ্গে আমি যেন আজন্ম পরিচিত, নতুন ও রহস্যময় যে-দেহ এ্যান ও আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছিলো তার সঙ্গে যেন ওই মধুর স্নেহ-ভালোবাসার কোনো সম্পর্কে নেই। এ্যান বসে থাকতো, দু'হাত দিয়ে আমার মাথা তার বুকের উপর টেনে নিতো, নিচু গলায় গান গাইতো, প্রায় ফিস ফিস করে, নিজেই ছড়া বানাতো আর গাইতো (বেচারী জ্যাকি পাখিমণি, নয়কো মোটেই খাসা, তবু তাকে দেবো আমি মিষ্টি মধুর বাসা, শোনাবো তাকে ঘুম-পাড়ানি গান, মন ভোলানো তান), আর কিছুক্ষণ পর গানের কথা মিলিয়ে যেতো, জেগে থাকতো শুধু সুরের গুঞ্জন, আর মাঝে মাঝে ফিস ফিস দু'একটি উচ্চারণ, বেচারী জ্যাকি পাখিমণি, আমি তাকে সব সময় আগ্‌লে রাখবো সকল আঘাত থেকে। খানিক পরে আমি ওর শরীরের দিকে আমার মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিতাম, গরমের হাল্কা পোশাকের ভেতর দিয়ে চুমু খেতাম ওকে, ওর কাপড়ের মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে নিতাম।

ওই গ্রীষ্মে আমরা বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিলাম। কখনো কখনো আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে আমি আরো অগ্রসর হতে পারতাম। চূড়ান্ত বিন্দু পর্যন্ত যেতে পারতাম। কারণ ওই সুন্দর, ক্ষীণকায়, সুগঠিত, শক্ত পেশীর, কোমল মাংসের,

সোনালী কাঁধের যন্ত্রটি, যা নিয়ে এ্যান স্ট্যান্টন ও আমি, আমরা দুজনেই, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, যা অকস্মাৎ আকাশ থেকে আমাদের মধ্যে পড়েছিলো, সেটা ছিলো সত্যিই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে সুর তাল লয়ে বাঁধা একটি যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু ওই যে চূড়ান্ত বিন্দু পর্যন্ত যেতে পারতাম বলে উল্লেখ করেছি আমার সে-অনুমান বোধহয় ভুল। যে স্রোতটির বিশাল চিন্তামগ্নতার মধ্যে আমরা ধরা পড়েছিলাম, যেখান থেকে আমরা ঝুলছিলাম, তাকে তাড়াহুড়া করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য ছিলো না আমার, কিংবা এ্যান স্ট্যান্টন যে বিষণ্নভাবে, বিজ্ঞ গবেষকের মতো, প্রতিটি মুহূর্তের পরিবর্তন আমাদের অভিজ্ঞতার শরীরে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে নিচ্ছিলো, ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার আগে অন্য কিছুকে কিছুতেই জায়গা দিচ্ছিলো না, তার পক্ষেও গোটা ব্যাপারটা তাড়াহুড়া করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য ছিলো না। সে যেন একটা ছন্দ, একটা সুর, তার আপন সত্তা-বহির্ভূত একটা বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলো, তার সূক্ষ্ম জটিল বঙ্কিম গতিপথকে সশ্রদ্ধ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছিলো। কিন্তু আমার অনুমান সঠিক কিংবা ভ্রান্ত যাই হোক না কেন আমি তা প্রমাণ করার চেষ্টা করি নি, কারণ যে-ছন্দ আর বাধ্যবাধকতার প্রভাবে সে আচ্ছন্ন ছিলো সেটা আমি নিজের মধ্যে অনুভব করতে না পারলেও তার প্রতি এ্যানের আনুগত্য উপলব্ধি করতে আমার ভুল হয় নি, এবং তার ফলে এ্যানের সঙ্গে আমার প্রতিটি মুহূর্ত পরিপূর্ণ হয়ে থাকতো। যেটা বিস্ময়কর তা এই যে আমি যখন তার সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতাম, তার আবহ ও পরিমণ্ডলের বাইরে থাকতাম, রাতে আমার নিজের ঘরে, কিংবা দুপুরে খাবার পর অপরাহ্নের প্রথম প্রহরে, তখন এই যে দেরি, এই যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তা নিয়ে আমার চিত্ত একটা হিংস্র অসহিষ্ণুতায় ভরে যেতো। এটা বিশেষভাবে ঘটতো যখন গোটা একটা দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হতো না, আমি তখন বুঝতাম যে ওই দিনগুলি আর কিছু নয়, তার মধ্য দিয়ে আমরা একটা স্তর, একটা মাইলফলক অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। ওই সব সময়ে সে শুধু নীরবে আমার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতো, ওই প্রথম রাতে আমরা চুমু খাবার পর যেমন করেছিলো ঠিক তেমনিভাবে, আমার তখন নিজেকে মনে হতো বিভ্রান্ত, আর অপরাধী-অপরাধী, কিন্তু পরে, সমস্ত ব্যাপারটার কাঠামো ও বিন্যাস যখন আমার কাছে কিছুটা স্পষ্ট হলো, তখন আমি শুধু অধৈর্য হয়ে উঠতাম পরের দিনটির জন্য, যখন সে আবার টেনিস র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে কোর্টে এসে হাজির হবে, তার মসৃণ, তরুণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে, আপাতদৃষ্টিতে নিরাসক্ত, যদিও বন্ধুভাবাপন্ন, যে-মুখকে আমি আমার স্মৃতিতে ধৃত মুখের সঙ্গে মেলাতে পারতাম না, যে-মুখে

চোখের পাতা আনত আর চাঁদ কিংবা তারার আলোয় চকচক করা আর্দ্র ঠোঁট দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত, যার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে দ্রুত অর্ধরুদ্ধশ্বাস, কিংবা অসঙ্কোচ পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস।

কিন্তু গ্রীষ্মের শেষ দিকে পুরো দুদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হলো না। এর আগের রাতে একটুও হাওয়া ছিলো না, আকাশে পূর্ণ চন্দ্র, রাত নেমে এলেও আবহাওয়া একটুও শীতল হয় নি, কোথাও কোনো কম্পন নেই। এ্যান আর আমি অভিজাত হোটেলটির ডাইভিং টাওয়ারে যাই। তখন বেশ রাত হয়ে গেছে, সবাই জল থেকে উঠে পড়েছে। আমরা কিছুক্ষণ বড়ো ফ্লোটটার উপর শুয়ে ছিলাম, কোনো কথা না বলে, চুপচাপ, পরস্পরকে স্পর্শও না করে, চিৎ হয়ে শুয়ে আমরা শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। খানিকক্ষণ পর সে উঠে পড়ে টাওয়ারে উঠতে শুরু করলো। আমি গড়িয়ে এক পাশ হয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। ও বিশ ফুট উচ্চতায় উঠে বোর্ডের উপর স্থির হয়ে দাঁড়ালো, এক মুহূর্ত, তারপর চমৎকার একটি ডাইভ নিলো। তারপর ও তার পরের ধাপে গিয়ে উঠলো। ক'বার সে ঝাঁপ দিয়েছিলো বলতে পারবো না, কিন্তু অনেকবার যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি অলস ঘুম-ঘুম চোখে ওকে দেখছিলাম, ও ক্রমান্বয়ে, খুব ধীরে ধীরে এক এক ধাপ করে উপরে উঠে যাচ্ছিলো, তার কালো কাপড়ের সাঁতারের পোশাকের উপর চাঁদের আলো ঝরে পড়ে মনে হচ্ছিলো সেটা যেন ধাতুর তৈরি, কিংবা বার্নিশ করা, আমি দেখছিলাম ও বোর্ডের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার বাহু দুটি টান টান করে যতোদূর ছড়ানো যায় ছড়িয়ে দিচ্ছে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর উঁচু হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ঝাঁপ দিচ্ছে, এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো ও যেন সেখানে ঝুলে আছে, একটা ক্ষীণকায় ছায়াছায়া ঝলমলে মূর্তি, এত উঁচুতে যে তার দেহ শুধু একটি কি দুটি নক্ষত্রকে ঢেকে দিয়েছে, ছোট্ট একটি মুহূর্ত, তারপরই মাথা নিচু করে তীরের মতো নেমে আসা, আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন নৈপুণ্যের সঙ্গে জলের মধ্যে ঢুকে যাওয়া, রূপোলি চুমকি বসানো কালো সিল্কের কাপড়ে ঢাকা বিরাট সার্কাসের চাকতির মধ্য দিয়ে যেন সে ঝাঁপ দিলো।

ব্যাপারটা ঘটলো এই সময়। অত উঁচু থেকে আমি তাকে কখনো ঝাঁপ দিতে দেখি নি। সম্ভবতঃ সারা জীবনে ও কখনো অত উঁচু থেকে ডাইভ করে নি। আমি তাকে উপরে উঠে যেতে দেখলাম, ধীরে ধীরে, বিশ ফুটের ধাপে উঠলো সে, তারপর ওই বোর্ড পার হয়ে গেলো। আমি চেঁচিয়ে ওকে ডাকলাম, কিন্তু সে মুখ নিচু করে আমার দিকে তাকালো না পর্যন্ত। আমি বুঝেছিলাম যে ও ঠিক আমার ডাক শুনেছে। আমি এটাও বুঝেছিলাম যে ও যখন একবার যেতে শুরু করেছে তখন,

আমি এখন যাই বলি না কেন, সে যেখানে যাবার সেখান অবধি যাবেই। আমি দ্বিতীয় বার আর ডাকি নি।

ঝাঁপ দিলো সে। ঝাঁপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝেছিলাম যে চমৎকার হয়েছে ওই ঝাঁপ, কিন্তু তবু আমি লাফিয়ে উঠে একেবারে ফ্লোটের কিনারে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তার উড়াল দেয়া ভঙ্গির উপর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর যে মুহূর্তে সে নিপুণভাবে জলের মধ্যে ঢুকে গেলো সেই মুহূর্তে আমিও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবেগে সাঁতার কেটে গভীর তলের দিকে ডুব দিলাম। কালো জলের নিচে রূপোলি ঝাপটা আর বুদ্বুদের ছায়ামিছিলের মধ্য দিয়ে আমি এ্যানের পা আর বাহুকে ঝিলমিল করে উঠতে দেখলাম। সে অনেক নিচ পর্যন্ত নেমে গিয়েছিলো। অতো গভীরে যাবার তার দরকার ছিলো না, কারণ ইচ্ছা করলে সে অল্প একটু গিয়েই হুশ্ করে উপরে ভেসে উঠতে পারতো। কিন্তু সেবার — অন্য কয়েকবারও — সে অনেক গভীরে চলে যায়, যেন ওই অস্বচ্ছ মাধ্যমটির ভেতর দিয়ে সে যতদূর পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ততদূর পর্যন্ত যেতে চাইছে। আমিও নিচে নেমে গেলাম, আর তার উঠতি–যাত্রার পথে তার সঙ্গে মিলিত হলাম। আমি দু'বাহু দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে কাছে টেনে নিলাম, আমাদের ঠোঁট যুক্ত হলো, এ্যান তার হাত দু'পাশে শিথিলভাবে নামিয়ে দিয়েছে, একটুও নড়ছে না, আমি তার দেহকে চেপে ধরেছি আমার দেহের সঙ্গে, তার মুখকে ঠেলে দিয়েছি সামান্য পেছনে, আমাদের পা একসঙ্গে নিচের দিকে নেমে গেছে, আর ওই ভাবেই আমরা আস্তে আস্তে কালো জল আর ঊর্ধোত্থিত বুদ্বুদের রূপোলি কুচির মধ্য দিয়ে ভেসে উঠতে লাগলাম। খুব ধীরে ধীরে, অন্ততঃ মনে হচ্ছিলো খুবই ধীরে ধীরে, আর আমি এতো দীর্ঘক্ষণ ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিলাম যে আমার বুক টনটন করে উঠলো, আমার মাথা যেন সম্পূর্ণ খালি হয়ে বনবন করে ঘুরতে লাগলো, একটা অসহ্য তীব্র আনন্দের অনুভূতিতে আমার সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো, যেদিন ওকে নিয়ে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম, বাড়িতে পৌঁছে দেবার পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ছিলাম, সেই রাতে আমার নিজের ঘরে ফিরে আসার পর আমার যে অবস্থা হয়েছিলো এখন ঠিক সেই রকম অবস্থা হলো আবার। আমরা এতো ধীরে এতো ধীরে, ভেসে উঠছিলাম যে আমার মনে হলো আর বুঝি কখনো উপরতলে এসে পৌঁছুবো না।

তারপর এক সময় আমরা ভেসে উঠলাম। আমাদের চোখের চারপাশে চাঁদের আলো গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে জলের উপর ছড়িয়ে পড়লো। আমরা দু'জন আরো এক মুহূর্ত সেখানে একত্রে ঝুলে রইলাম, তারপর আমি ওকে ছেড়ে দিলাম, আমরা দুজন বিচ্ছিন্ন হলাম, তারপর দু'জনই চিৎ হয়ে ভাসতে ভাসতে, উপরের তারাভরা ঘূর্ণমান

আকাশের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস টেনে নিতে লাগলাম।

একটুক্ষণ পর আমি টের পেলাম যে ও সাঁতরে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম যে ও বুঝি ফ্লোটের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু আমি যখন চিৎ অবস্থা থেকে উল্টে ফ্লোটের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম তখন দেখলাম যে ও ততক্ষণে বেলাভূমিতে পৌঁছে গেছে। আমি তাকে বালুর উপর থেকে তার পোশাক তুলে গায়ে জড়িয়ে পায়ে স্যান্ডাল পরে নিতে দেখলাম, আমি ওকে ডাক দিলাম, সে হাত নাড়লো আমার উদ্দেশে, তারপর টুপি খুলে চুল ছেড়ে দিয়ে বেলাভূমির উপর দিয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করলো। আমি যখন সাঁতরে সমুদ্রতীরে উঠে এলাম ও তখন বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। বুঝলাম যে ওকে আর ধরতে পারবো না। তাই আমি সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বেলাভূমির উপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

এই ঘটনার পর দু'দিন আমি তার দেখা পাই নি। তারপর আবার সে র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে টেনিস কোর্টে এসে হাজির হলো, শান্ত, বন্ধুর মতো, এ্যাডাম আমাকে হারিয়ে দেবার পর আমাকে আবার নাস্তানাবুদ করার জন্য প্রস্তুত।

ততদিনে সেপ্টেম্বর পড়ে গেছে। আর কয়েক দিন পরই এ্যান পুবে মিস পাউন্ডের স্কুলে ফিরে যাবে। বাবার সঙ্গে দিন কয়েক আগেই যাবে, তাঁর সঙ্গে ওয়াশিংটনে কয়েক দিন কাটাবে, তারপর নিউ ইয়র্কে, তারপর উনি ওকে পাঠিয়ে দেবেন বোস্টনে, যেখানে মিস পাউন্ড ওকে নিয়ম কানুনের নিগড়ে বেঁধে ফেলবেন। এ্যানকে ওই ভ্রমণপর্ব কিংবা মিস পাউণ্ডের ওখানে ফিরে যাবার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী-উত্তেজিত বলে মনে হয় নি। আমাকে বলেছিলো যে স্কুল ওর ভালোই লাগে, কিন্তু তার ওই মাঝরাতের স্ন্যাকস্ খাওয়া, স্মৃতিকথা লেখা, ভীষণ লক্ষ্মী ফরাসী শিক্ষিকার গল্প, তার শব্দভাণ্ডার যে ফিনিশিং স্কুলের গূঢ় অপভাষায় এখনো আক্রান্ত ও দূষিত হয় নি সেই সব কাহিনীতে আমি মোটেই অভিভূত হই নি। অগাস্টেই ও আমাকে তাদের প্ল্যানের কথা বলেছিলো, এখান থেকে যাত্রার তারিখ জানিয়েছিলো, উৎফুল্ল হয়ে নয়, নিরানন্দের সঙ্গেও নয়, যেন ব্যাপারটা আমাদের দুজনের জন্যই একান্ত অপ্রাসঙ্গিক, একজন অল্পবয়সী মানুষ যে ভাবে মৃত্যুর উল্লেখ করে সেই ভাবে। যখন সে খবরটা দেয় তখন আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যথা খচ্ করে উঠেছিলো, কিন্তু আমি তখন ভাবনাটা একপাশে সরিয়ে দিতে পেরেছিলাম, কারণ যদিও ক্যালেন্ডার বলছিলো যে মাসটা অগাস্ট, তবু তখন আমি বিশ্বাস করতে পারি নি যে ওই গ্রীষ্ম, এই পৃথিবী, কোনোদিন কোনদিন শেষ হবে। কিন্তু এবার ব্যাপারটা আমার চেতনায় শক্ত করে ধাক্কা দিলো। আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে, কোনো রকম সম্ভাষণ ছাড়াই, ওর হাত আমার হাতে তুলে নিলাম।

আমি অনুভব করলাম যে আমার ভেতরে একটা এলোমেলো অপরিণত মরীয়া ভাব আর প্রচণ্ড জরুরী তাগিদ জেগে উঠেছে।

এ্যান আমার দিকে তাকালো। তার চোখে মুখে মৃদু বিস্ময়ের অভিব্যক্তি।

আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইলাম, তুমি আমাকে ভালোবাসো না ?

ও হো হো করে হেসে উঠে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। হাসির ফলে তার আশ্চর্য পরিষ্কার চোখের বাইরের কোণার দিকে নিষ্পাপ কৌতুকভরা কুঞ্চন ফুটে উঠলো। হাসতে হাসতে খালি হাত দিয়ে অলসভাবে র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে সে বললো, অবশ্যই আমি তোমাকে ভালোবাসি, জ্যাকি সোনামণি। জ্যাকি পাখিমণি আমার, কে বললো যে আমি বেচারা জ্যাকি পাখিমণিকে ভালোবাসি না?

অকস্মাৎ গাড়িতে আর বাগানের দোলনায় বসে রাতের পর রাত উচ্চারিত ওই ভাষা দিনের চড়া আলোয়, আমার মনের ওই মরীয়া অবস্থায় আমার কাছে ভারী নির্বোধ আর বিশ্রী শোনালো। আমি বললাম, আঃ, ছেলেমানুষী ক'রো না। আর, আমাকে জ্যাকি পাখিমণি বলবে না।

গম্ভীর মুখে সে জবাব দিলো, কিন্তু তুমি যে সত্যিই জ্যাকি পাখিমণি। তখনো তার চোখের কোনায় হাসির ভাঁজ লেগে আছে।

ওর কথা উপেক্ষা করে আমি আবার বললাম। তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?

ও জবাব দিলো, আমি জ্যাকি পাখিমণিকে ভালোবাসি। বেচারা জ্যাকি পাখিমণি।

আমি তীব্র কণ্ঠে বললাম, আহ্! বলো, তুমি আমাকে ভালোবাসো না?

সে এক মুহূর্ত আমাকে ভালো করে লক্ষ করলো, চোখের কোণার ভাঁজগুলি এখন সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে, তারপর বললো, অবশ্যই বাসি। তারপর আমার হাত থেকে নিজের হাত টেনে নিয়ে সে কোর্টের অপর প্রান্তে চলে গেলো। তার হাঁটার ভঙ্গিতে একটা চূড়ান্ত রূপ ফুটে উঠলো, মনে হলো সে এক্ষুণি কোথাও চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দূরে কোথাও, এবং এখনই তাকে হাঁটতে শুরু করতে হবে। কিন্তু সে শুধু কোর্টের অন্য প্রান্তে গিয়ে মিমোসা গাছের কোমল ছায়ার নিচের বেঞ্চিটায় বসলো। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো কোর্টটা যেন সাহারা মরুভূমির মতো প্রশস্ত আর এ্যান যেন ছোট হতে হতে সুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই সময় এ্যাডাম এলো, আমরা টেনিস খেলতে শুরু করলাম।

সেদিন সকালে এ্যান ফিরে এসেছিলো, কিন্তু আর আগের মতো কিছুই হলো না। এ্যান ফিরে এসেছিলো ঠিকই, কিন্তু তার সবটুকু নিয়ে নয়। আগে সে যতোখানি

সময় আমার সঙ্গে কাটাতো এখনও ততোখানি সময়ই কাটালো, কিন্তু এখন, মনে হলো, সে তার আপন ভাবনায় ডুবে আছে, আদর করার সময় সে আদরটুকু ঠিকই গ্রহণ করলো, কিন্তু মনে হলো যে কর্তব্যের দায়ে তা করছে, বড়োজোর তার সহৃদয়তার জন্যে, যার মধ্যে ঠিক তাচ্ছিল্যের ভাব ছিলো না। আমাদের শেষ সপ্তাহটা ওই ভাবে কেটে যায়। দিনগুলি ছিলো গরম, বায়ুহীন, শেষ বিকালে কালো মেঘ জমে উঠতো আকাশে, মনে হতো ঝড় উঠবে, কিন্তু উঠতো না, আর রাতগুলি ছিলো সাদার ছোঁয়া মাখানো, ফেটে পড়তে উদ্যত, বিশাল কালো একটা আঙ্গুরের মতো, ভারী আর ভোঁতা।

যেদিন ওর চলে যাবার কথা তার দুদিন আগের রাতে আমরা ল্যান্ডিং-এ একটা ছায়াছবি দেখতে যাই। সিনেমা-হল থেকে বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি পড়ছে। আমরা ঠিক করেছিলাম যে ছবির পর সাঁতার কাটতে যাবো। এর আগে ওই গ্রীষ্মে আমরা বৃষ্টির মধ্যে অনেক দিন সাঁতার কেটেছি, তার আগের বহু গ্রীষ্মেও, যখন এ্যাডামও আমাদের সঙ্গে থাকতো। যদি আজকের বৃষ্টিটা ভিন্ন ধরনের বৃষ্টি হতো, যদি ঝিরঝির করে হাল্কা বৃষ্টি পড়তো, সাঁতার কাটার সময় জলের উপর ফিস ফিস শব্দ তুলে রেশমের মতো মোলায়েম বৃষ্টি, কিংবা যদি তীব্র তীক্ষ্ণ সুচের মতো ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামতো, তার হাত থেকে বাঁচার জন্য বেলাভূমির উপর দিয়ে চেঁচিয়ে ছুটে সমুদ্রের বুকে লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছা হতো, কিংবা যদি ভীষণ প্রবল স্রোতের মতো বৃষ্টিও নামতো, উপসাগরের উপর যেমন মাঝে মাঝে নামে, একটা জল ভর্তি মস্ত বড় কাগজের ব্যাগের নিচটা হঠাৎ ফুটো হয়ে গেলে যেমন হয় সেই রকম স্রোতের মতো বৃষ্টি নামলেও আমরা নিশ্চয়ই সেদিন রাতেও সাঁতার কাটতে যেতাম। কিন্তু সেদিনের বৃষ্টি এর একটার মতোও ছিলো না। সেদিন মনে হচ্ছিলো আকাশটা যেন যতটা সম্ভব নিচে ঝুলে নেমে এসেছে, আর কালো, আঠালো, নিস্তেজ বাতাসের মধ্য দিয়ে টিপ টিপ করে একটা বিরামহীন বৃষ্টি চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।

অতএব আমরা গাড়ির উপরটা টানিয়ে নিলাম আর সেটা করতে গিয়ে বেশ ভিজে গেলাম, তারপর গাড়িতে ঢুকে বাড়ির দিকে চললাম। আমার মায়ের ওখানে, গ্যালারিতে, জ্বলজ্বল করে আলো জ্বলতে দেখে আমরা ঠিক করলাম যে সেখানেই যাবো, ওখানে গিয়ে কফি আর কিছু স্যান্ডুইচ তৈরি করে নেবো। আমার মনে পড়লো যে মা বাড়িতে নেই, তাস খেলতে প্যাটনদের বাড়িতে গেছেন, ওদের বাড়িতে কে যেন বেড়াতে এসেছে কয়েক দিনের জন্য, আর মাকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেছে তার। আমরা বাড়ির চৌহদ্দিতে প্রবেশ করে ড্রাইভওয়ে দিয়ে ঘুরে একগাদা কাঁকর আর বৃষ্টির জল ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে দিয়ে বাড়ির দরজার সামনে এসে

দাঁড়ালাম। আমরা ডানদিকের জোড়া সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেলাম, তারপর গ্যালারির ছাদের নিচে আশ্রয় নিয়ে কুকুরের মতো গা ঝেড়ে আর পা ঠুকে শরীর থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলতে শুরু করলাম। ছোটাছুটি, বৃষ্টি আর পায়ের উপর ওই রকম লাফালাফির ফলে এ্যানের চুল খুলে গিয়েছিলো। এখন তার পিঠ ছাপিয়ে চুল নিচে নেমে এসেছে, কয়েক গাছি ভিজে চুল কপালের কাছে লেগে আছে, একটা গালের উপর, বাচ্চা মেয়েকে স্নান শেষে বেরিয়ে আসার পর যে রকম দেখায় ওকে সেরকম দেখাচ্ছিলো। ও তার মাথা এক পাশে হেলিয়ে, হাসতে হাসতে, ঝাঁকুনি দিলো, বন্ধনমুক্ত হয়ে চুল খুলে পড়ার জন্য মেয়েরা যেমন করে থাকে। ছুটকো চুলের কাঁটা তুলে নেবার জন্য সে, বড়ো একটা চিরুণীর মতো করে, তার হাতের আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে চুলের মধ্যে চালিয়ে দিলো। গোটা দুই কাঁটা গ্যালারির মেঝের উপর ঝুপ করে পড়লো। এ্যান মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, হাসতে হাসতে, তার উজ্জ্বল আড় চোখের দৃষ্টি আমার উপর স্থাপন করে বললো, আমাকে ভীষণ বিশ্রী দেখাচ্ছে, তাই না? ওকে এখন আবার অনেকটা আগের মতো দেখাচ্ছিলো।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ভীষণ বিশ্রী। তারপর আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলাম। আমি বড়ো হলঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিলাম, কিন্তু গ্যালারির বাতিগুলি জ্বালিয়ে রেখে, খাবার ঘর আর ভাঁড়ার ঘরের মধ্য দিয়ে, হলঘরের ডান দিক ঘুরে, রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর কফি বানাবার ব্যবস্থা করে আইস-বক্স থেকে আমি কিছু খাবার বার করলাম। তখনো ইলেকট্রিক রেফ্রিজেরেটর বাজারে আসে নি, নইলে এতোদিনে আমার মা বাড়িতে বেশ কয়েকটা অতিকায় রেফ্রিজেরেটরের ব্যবস্থা করে ফেলতেন, আর তাদের ঘিরে থাকতো, মাঝরাতে, নগ্ন-কাঁধ মহিলাবৃন্দ এবং ঈষৎ মাতাল, ডিনার-জ্যাকেট পরিহিত কতিপয় ভদ্রলোক, ঠিক যেমন বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেখা যায়। আমি যতক্ষণ খাবার তৈরিতে ব্যস্ত ছিলাম এ্যান ততক্ষণ তার চুলের পরিচর্যা করছিলো। স্পষ্টতঃই সে দুই বেণী বাঁধছিলো, কারণ রান্নাঘরের টেবিলে জিনিসপত্র সাজিয়ে দেবার পর আমি দেখলাম যে ও একটা বেণী বাঁধা প্রায় শেষ করে এনেছে। আমি ওকে উদ্দেশ করে বললাম, এই, সাজগোজ বন্ধ করে তুমি স্যান্ডুইচগুলি বানাচ্ছো না কেন?

এ্যান বললো, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে আমার বেণী বেঁধে দিতে হবে।

তো, এ্যান টেবিলে বসে স্যান্ডুইচ বানালো, আর আমি প্রথম বেণীটা শেষ করে বললাম, একটা ফিতা বা ওই জাতীয় কিছু চাই যে, নয়তো চুল খুলে যাবে। যেন খুলে না যায় সেজন্য আমি আমার আঙ্গুলের মাথা দিয়ে তার চুল টিপে ধরে

রেখেছিলাম। এমন সময় র‍্যাকে ঝোলানো একটা পরিষ্কার ডিশ-টাওয়েলের উপর আমার চোখ পড়তেই আমি ওর বেণী ছেড়ে দিয়ে সেদিকে গেলাম, তারপর কাপড়ের একপ্রান্ত থেকে ছুরি দিয়ে ফিতার মতো দুটি টুকরা কেটে নিলাম। তোয়ালেটা ছিলো সাদা রঙের, লাল পাড় দেয়া। আমি কাপড়ের টুকরা দু'টি নিয়ে এ্যানের কাছে ফিরে এসে বেণীটা আবার ঠিকঠাক করে তার শেষ প্রান্তে ফুলের মতো একটা গিঁট দিয়ে দিলাম। তারপর বললাম, তোমাকে একটা বাচ্চা নিগ্রো মেয়ের মতো দেখাবে। সে খিলখিল করে হেসে রুটিতে মাখন লাগাতে থাকলো।

আমি দেখলাম যে কফি হয়ে গেছে। গ্যাস বন্ধ করে দিয়ে আমি এবার ওর দ্বিতীয় বেণী নিয়ে পড়লাম। আমি ওর রেশমের মতো কোমল চুলের মধ্য দিয়ে আমার রুক্ষ আঙ্গুল চালিয়ে চুলের গোছাগুলি ভাগ করে, একটার ভেতর দিয়ে আরেকটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বিন্যস্ত করলাম, একটার পর আরেকটা, আর ওর ভেজা চুলের মধ্য থেকে যে সুন্দর মেঠো মেঠো গন্ধ আসছিলো সেটা টেনে নিতে থাকলাম বুকের মধ্যে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। আমি ওর বেণীর প্রান্তটি তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম, এই যে ধরো, তা না হলে সব খুলে যাবে। তারপর আমি হলঘরের দিকে গেলাম ।

আমার মা ফোন করেছেন। তিনি, প্যাটনরা, আর মাকে যে লোকটার ভীষণ পছন্দ হয়ে গেছে সে, আরো কারা তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, ওরা সবাই ঠাসাঠাসি করে গাড়িতে উঠে চল্লিশ মাইল দূরে পাশের কাউন্টির লাগ্রেঞ্জে যাচ্ছে। সেখানে একটা আস্তানায় কয়েকটা পাশা খেলার টেবিল আছে, গোটা দুই রুলেট জুয়ার আয়োজন রয়েছে, অভিজাত থেকে ওঁচা সব ধরনের লোক সেখানে জমায়েত হয়ে মহা ভাইয়াচারির পরিবেশে কণ্ঠনালী চিরে দেয়া সিগারেটের নীল ধোঁয়া নাকে আর বেআইনী মদ গলায় টেনে নেয়। মা জানালেন যে তিনি কখন বাড়ি ফিরবেন বলতে পারছেন না, তবে আমি যেন দরজা খোলা রাখি, কারণ তিনি চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। দরজা খোলা রাখার কথা তিনি আমাকে না বললেও পারতেন, কারণ ল্যান্ডিং-এ কেউই তাদের বাড়ির দরজার তালা দেয় না। মা আরো বললেন আমি যেন তার জন্য চিন্তা না করি, সৌভাগ্য অনুকূল বলে তাঁর মনে হচ্ছে, তারপর হেসে উঠে তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন। তো, তার জন্য চিন্তা না করার কথাও তিনি না বললে পারতেন। সৌভাগ্যের কথাও। ভাগ্য সর্বদাই তাকে আনুকূল্য দেখিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি যখন যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন।

আমি ফোন রেখে মুখ তুলে তাকালাম। পেছনের প্যাসেজের দরজা দিয়ে হলঘরে কিছু আলো আসছিলো, সেই আলোয় আমি এ্যানকে দেখলাম, আমার কাছ

থেকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে সে তার দীর্ঘ দ্বিতীয় বিনুনিতে ফিতা বাঁধছে। আমি ওকে লক্ষ্য করে বললাম, আমার মায়ের ফোন। উনি আর প্যাটনরা লা গ্রেঞ্জে যাচ্ছেন। মায়ের ফিরতে দেরি হবে।

শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমাদের বাড়ির পরিপূর্ণ নির্জনতা সম্পর্কে অকস্মাৎ সচেতন হলাম। আমাদের চারপাশের ঘরগুলি অন্ধকার, আমাদের উপরে পুঞ্জিভূত অন্ধকার, সবগুলি ঘরে, চিলেকোঠায়, চাপ চাপ অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে, সিঁড়ি দিয়ে টিপ টিপ করে ঘন কিন্তু ওজনহীন ওই অন্ধকার নিচে ঝরে পড়ছে, বাইরেও সব অন্ধকার। আমি এ্যানের মুখের দিকে তাকালাম। সারা বাড়িতে কোথাও এক বিন্দু শব্দ নেই। ছাদের উপর টুপ টুপ করে পাতা পড়ছিলো, এখন তাও মিলিয়ে গেছে। হঠাৎ আমার বুকটা ভীষণভাবে ধ্বক করে উঠলো, আর আমার শিরা উপশিরা দিয়ে রক্তের এক নতুন প্রবল বন্যাস্রোত বয়ে গেলো, যেন কেউ স্লুইস গেট খুলে দিয়েছে।

আমি সোজা এ্যানের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, তাই আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না। আমি বুঝলাম, আর সে যে বুঝতে পেরেছে তাও আমি বুঝলাম, বুঝলাম যে এই গ্রীষ্মের, এই গোটা সময়টার, বিশাল বিপুল স্রোত নির্ভুল ও অচঞ্চলভাবে এই মুহূর্তটির দিকেই এগিয়ে আসছিলো। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে হলঘরের মধ্য দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। ও আমার পেছন পেছন আসছে, না দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, সেটা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। তারপর বুঝলাম যে সে আসছে। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম, টের পেলাম যে সে–ও আসছে, আমার প্রায় চার ধাপ নিচে রয়েছে সে।

উপরে উঠে, দোতলার হলঘরে পৌঁছে, আমি একটুও দাঁড়ালাম না, পেছন ফিরে একবারও তাকালাম না। অন্ধকার হলঘর পার হয়ে আমি আমার নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। অন্ধকারেই দরজার হাতল স্পর্শ করলাম, দরজা খুললাম, তারপর ঘরে ঢুকলাম। ঘরে সামান্য আলো ছিলো, রাতের আঁধার তখন একটু পরিষ্কার হয়েছে, তাছাড়া নিচের গ্যালারির বাতির আলো ভেজা পাতার উপর পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছিলো। আমি দরজার হাতলে হাত রেখেই একপাশে একটু সরে দাঁড়ালাম, আর একটু পরেই সে এসে ঘরে ঢুকলো। ঢোকার সময় সে আমার দিকে তাকালো না পর্যন্ত। ঘরের মধ্যে তিন পা এগিয়ে সে চুপ করে দাঁড়ালো। আমি দরজাটা বন্ধ করে শ্বেতবসনা ক্ষীণাঙ্গীর দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়ালো না। আমি তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ আমার কাছে টেনে আনলাম, আমার দু'বাহু তার বুকের উপর ভাঁজ করে ধরলাম, তার চুলের উপর নামিয়ে আনলাম

আমার শুষ্ক অধরোষ্ঠ। ওর হাত তখনো শিথিলভাবে তার দেহের দু'পাশ দিয়ে নামানো। আমরা মিনিট দুই ওই ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, একটা নাটকীয় সূর্যাস্ত কিংবা সমুদ্র কিংবা নায়াগ্রা প্রপাতের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকা কোনো বিজ্ঞাপনের প্রেমিক–যুগলের মতো। কিন্তু আমরা কিছুই তাকিয়ে দেখছিলাম না। আমরা শুধু একটা প্রায়-নিরাভরণ, ছায়াছায়া ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম (লোহার খাট, পুরানো একটা আলমারি, দেবদারু কাঠের টেবিল, ট্রাঙ্ক, বইপত্র, পুরুষ মানুষের নিত্যব্যবহার্য কিছু সাজসরঞ্জাম — এই ঘরটাকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করতে আমি মাকে দিই নি), দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকার গাছগুলির উপর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি মেলে দিয়েছিলাম শুধু, আর তখনই হঠাৎ উপসাগরের দিক থেকে এক ঝলক বাতাস ভেসে এলো, ঝমঝম করে বৃষ্টির ধারও একটু বাড়লো, আর তার ফলে গাছগাছালির পাতার একটা সরসর ধ্বনিও উঠলো।

এবার এ্যান তার বাহু দুটি তুলে সামনে এনে ভাঁজ করে ধরলো, তখন তার দুটি হাত এসে পড়লো আমার দুটি হাতের উপর। ঠিক ফিসফিস করে নয়, কিন্তু নিচু গলায় ও বললো, জ্যাকি, আমি উপরে উঠে এসেছি। আমি এসেছি, জ্যাকি, সোনামণি।

নিঃসন্দেহে ও এসেছিলো।

তার সাদা পোশাকের পেছন দিকের হুকগুলি আমি খুলতে আরম্ভ করি। ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, সুবোধ ও ভারী বাধ্য, পিঠের দু'পাশ দিয়ে দুটি বেণী নেমে গেছে। হাল্কা কাপড়ের ভেজা পোশাক আমার কাজটা মোটেই সহজ করে দিলো না। আমি আনাড়ির মতো হাতড়ে হাতড়ে হুকগুলি খুললাম, তারপর ওর কটিবন্ধনীর কাছে এসে পৌঁছুলাম। আমার মনে আছে, ওটা বাঁধা ছিলো তার বাঁ পাশে। আমি সেটা খুলতেই মেঝের উপর পড়ে গেলো। দু'বাহু পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে, স্থির হয়ে, ও দাঁড়িয়ে ছিলো, যেন আমি দর্জি, তার জন্য তৈরি পোশাক ঠিক হয়েছে কিনা সেটা দেখছি। সে একটি কথাও বলে নি, শুধু একবার, যখন অপটু ও বিভ্রান্ত আমি ওর পোশাকটা তার নিতম্বের উপর দিয়ে নিচে টেনে খুলবার চেষ্টা করছিলাম তখন সে আগের মতো নিচু গলাতে বলেছিলো, না, না, এদিক দিয়ে, বলে তার নগ্ন বাহু দুটি নিজের মাথার উপর তুলে ধরেছিলো। আমি লক্ষ করি যে তখনো সে তার হাতের আঙ্গুলগুলি হাল্কা ও স্বাভাবিকভাবে না রেখে কাছাকাছি সন্নিবদ্ধ করে রেখেছিলো, খুব ঋজু, যেন সে তার দু'বাহু ঊর্ধ্বে তুলছে ডাইভ দেবার জন্য, এবং প্রাথমিক ভঙ্গিটা সম্পূর্ণ করবার আগে এক মুহূর্তের জন্য থেমেছে মাত্র। আমি মাথার উপর দিয়ে তার পোশাকটা খুলে প্রথমে সেটা হাতে নিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম,

তারপর বুদ্ধি খুললো, তখন চেয়ারের গায়ে সেটা ঝুলিয়ে রাখলাম।

তখনো সে দু'বাহু উপরে তুলে দাঁড়িয়ে ছিলো, আমি বুঝলাম যে অন্তর্বাসটিও পোশাকের মতো উপর দিক দিয়ে খুলতে হবে। সেইভাবেই আমি ওটা খুললাম, আমার অস্থির চঞ্চল অপটু হাতে, অস্বাভাবিক যত্নের সঙ্গে, আমি সেটাও চেয়ারের গায়ে ঝুলিয়ে দিলাম, যেন তাড়াহুড়া করলে ভেঙে যাবে। ও আবার শান্তভাবে তার দুটি হাত পাশে নামিয়ে দিলো। আমি বাকী কাজটুকু শেষ করলাম। আমি ওর ব্রেশিয়ারের হুক খুলে সামনের দিকে টেনে উঁচু করতেই সেটা তার নিশ্চল বাহুর উপর দিয়ে নিচে পড়ে গেলো। তারপর আমি হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে তার ড্রয়ারস্ খুলে পায়ের উপর দিয়ে টেনে নামালাম। অসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে আমি এসব করলাম যেন আমার আঙুলের ছোঁয়া তার ত্বকে না লাগে। আমার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছিলো, আমার গলা আর বুকে কেউ যেন ফাঁস লাগিয়েছে, কিন্তু আমার মন যতোসব অদ্ভুত জিনিসের দিকে ছুটে যাচ্ছিলো — কবে একটা বই পড়তে শুরু করেছিলাম, সেটা আর কখনো শেষ করা হয় নি, আমি কি ছুটির পর আবার ছাত্রাবাসে ফিরে যাবো, নাকি বাইরে কোনো ঘর নেবো, পাটিগণিতের একটা সূত্রের কথা আমার মনে পড়লো, সেটা কেবলই আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো, একটা দৃশ্য আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো, ভাঙা একটা বেড়ার পাশে ক্ষেতের একটা কোণ মাত্র, কোথায় দেখেছি সেটা, কোথায় দেখেছি, আমি মরীয়া হয়ে আমার অতীত হাতড়ে তার অবস্থান মনে করার চেষ্টা করলাম। আমার মন ওই রকম অদ্ভুত উন্মত্ত লাফালাফিতে মেতে রইলো।

আমি উবু হয়ে তার পাশে বসেছিলাম, তার নরম হাল্কা অন্তর্বাসটি তার পায়ের কাছে ফেলে দেবার পর সে ওর পাম্পশু থেকে একটা পা তুলে নিলো, মেয়েরা যেভাবে করে, প্রথমে গোড়ালীতে শক্ত করে একটু চাপ দিলো যেন পা সহজে বেরিয়ে আসে, প্রথমে এক পা বার করলো, তারপর দ্বিতীয় পা। আমি উঠে ওর পাশে দাঁড়ালাম, হীলছাড়া মেঝের উপর সমভূমিতে দাঁড়াবার জন্য, আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, ও কতো ছোটখাটো। আমি ওকে হাজার বার সাঁতারের পোশাক পরা এই ভাবে সমতলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, বেলাভূমিতে বালির উপরে কিংবা ফ্লোটে, কিন্তু কখনো সেটা এই রকম করে উপলব্ধি করি নি।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সে-ও দাঁড়িয়ে থাকলো, তার হাত আগের মতোই শিথিলভাবে দু'পাশে ঝোলানো, তারপর সে তার হাত দুটি বুকের উপর ভাঁজ করলো, সামান্য কেঁপে উঠে কাঁধ ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলো, আর তার ফলে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো তার কাঁধের হাড় কি রকম শীর্ণ ও ধারালো, আর

তার দু'পাশ দিয়ে নেমে গেছে দুটি বিনুনি।

এখন বাইরে দমকা হাওয়ার সাথে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। তাও আমার নজরে পড়লো।

ওর মাথা সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে ছিলো। হঠাৎ বোধহয় সে দেখলো, কিংবা তার মনে পড়লো, যে এখনো সে মোজা পরে রয়েছে। তখন আমার দিক থেকে একটু ওপাশে ঘুরে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে, প্রথমে এক পায়ের উপর ভারসাম্য রেখে, পরে অন্য পায়ের উপর, সে তার মোজা দুটি খুললো, তারপর তার সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা জামাকাপড়ের উপর সেগুলি রাখলো। তারপর সে আবার সামনের দিকে ঈষৎ কুঁজো হয়ে, হয়তো একটু কাঁপা কাঁপা শরীর নিয়ে, হাঁটু দুটি অল্প একটু বাঁকিয়ে কাছাকাছি চেপে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি ওখানে দাঁড়িয়ে অস্থির হাতে আমার শার্টের বোতাম খুলতে চেষ্টা করছিলাম। একটা বোতামের ঘর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই বোতামটা ছিঁড়ে ছিটকে নিচের কার্পেটবিহীন মেঝেতে পড়ে গেলো। মুহূর্তের জন্য বাইরে বৃষ্টি আর বাতাস ধরে এসেছিলো, তাই বোতামটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টুক করে একটা শব্দ হলো। আমার মন তার উন্মত্ত লাফালাফিতে মেতে রইলো, আর এ্যান আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে লোহার খাটটার একেবারে ধার ঘেঁষে, যেন পরীক্ষামূলকভাবে, বসলো। তার পা আর হাঁটু এখনো একসঙ্গে চেপে ধরা, কাঁধও আগের মতোই ঈষৎ সামনে ঝোঁকানো, হাত বুকের উপর ভাঁজ করা। আমাদের মাঝখানের স্থানটুকু অতিক্রম করে সে আমার দিকে তাকালো। সে চোখে কি একটা প্রশ্ন, না কি অনুনয়, অন্ধকারের মধ্যে আমি ধরতে পারলাম না।

এ্যান বিছানার উপর একটা হাত রাখলো, তার উপর সামান্য দেহভার রেখে সে মেঝের উপর থেকে তার পা তুললো, পাদু'টি এখনো কাছাকাছি চেপে রাখা, তারপর সুন্দর সাবলীল ভাবে বাঁকা হয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর সে অত্যন্ত ভদ্র সুবোধ ভঙ্গিতে সোজা হয়ে শু'লো, আবার হাত দুটি বুকের উপর জড়ো করে রাখলো, তারপর চোখ বন্ধ করলো।

যে মুহূর্তে সে তার চোখ বন্ধ করলো সেই মুহূর্তে, তার উপর আমার দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমার মন লাফ দিয়ে চলে গেলো তিন বছর আগের ওই পিকনিকের দিনে, সে জলের উপর ভাসছে চিৎ হয়ে, উপরে ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আকাশ, অনেক উপর দিয়ে একটা সাদা গাংচিল উড়ে যাচ্ছে, তার দু'চোখ বন্ধ, আর তার ওই মুখ আর এই মুখ, ওই দৃশ্য আর এই দৃশ্য দুটো যেন মিশে গেলো, সুপারইম্পোজ করা আলোকচিত্রের মতো, দুটো এক হয়ে গেলো, আবার নিজেদের আলাদা

অস্তিত্বও রক্ষা করলো, একটা অন্যটাকে নাকচ করে দিলো না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলাম, আমার গলার কাছে একটা ডেলা জমে উঠলো, যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, আমার শরীর যেন ফেটে যাবে। লোহার খাটে সে শুয়ে আছে, তারপর হঠাৎই যেন আমি লক্ষ করলাম বড়ো, নিরাভরণ ছায়া–ছায়া আমার ঘর, শুনলাম বাইরের ঝড়োবৃষ্টির শব্দ, আর তখনই উপলব্ধি করলাম যে এই সব কিছুই ভুল হচ্ছে, কিভাবে তা বলতে পারবো না, সেটা বুঝবারও চেষ্টা করলাম না আমি, কিন্তু এই গ্রীষ্মকাল আমাদের যে বিন্দুর দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো তা নিঃসন্দেহে এটা নয়। এ আমি করতে পারবো না। ভাঙা, ফ্যাসফ্যাসে গলায় আমি ডাকলাম, এ্যান, এ্যান —

ও কোনো উত্তর দিলো না, কিন্তু চোখ খুলে আমাকে দেখলো।

আমি বলতে আরম্ভ করলাম, এ্যান, আমাদের উচিত হবে না, — এটা উচিত হবে না — এটা ঠিক হবে না, এ্যান। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম যে আমি ‘ঠিক’ শব্দটি ব্যবহার করেছি। এর আগে এ্যান স্ট্যান্টন কিংবা অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে আমি যা কিছু করেছি সেটা ঠিক না বেঠিক তা নিয়ে আমি কখনো এক কণাও মাথা ঘামাই নি, শুধু একটা ঘটনা ঘটেছে সে ভাবেই তাকে গ্রহণ করেছি, বস্তুতপক্ষে কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই উচিত-অনুচিত, ঠিক–বেঠিক এ নিয়ে আমি কখনোই তেমন ভাবি নি, শুধু লোকজন যা করে তাই করেছি, যা করে না তা করি নি। লোকজন যা করে এবং যা করে না। এখন ওই শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে কি রকম অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেকথা আমার মনে পড়লো, যেন কতো কতো বছর আগে, ঈশ্বর জানেন, কেউ এই শব্দটি উচ্চারণ করেছিলো আর তার প্রতিধ্বনি আমার কানে এসে বাজলো আজ এতোদিন পরে, বহু কালের ওপার থেকে, ব্যারন মুনশাউসেনের গল্পের মতো, জমাট বাঁধা বরফের মধ্য থেকে হঠাৎ গলে গিয়ে আমার ছোট বোনকে স্পর্শ করা যেমন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো তেমনি ওকেও আমার পক্ষে এখন স্পর্শ করা অসম্ভব।

ও আমার কথার উত্তরে কিছু না বলে আমার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলো, তার মুখের অভিব্যক্তির অর্থ আমার কাছে মনে হলো দুর্বোধ্য, রহস্যময়, আর ওকে দেখতে দেখতে আমার বুক জুড়ে উথলে উঠলো একটা গভীর উষ্ণ স্নেহ ও করুণার বন্যা, আমি আবেগজড়িত গলায় বললাম, এ্যান — ওহ্, এ্যান — আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো তার শয্যার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে ওর হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিই।

তখন যদি আমি তা করতাম তাহলে হয়তো পরবর্তী সময়ের সব কিছু ভিন্ন

খাতে বয়ে যেতো, অপেক্ষাকৃত সহজ স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরতো, কারণ যখন একজন স্বাস্থ্যবান অর্ধনগ্ন তরুণ একটা বিছানার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে একটি সম্পূর্ণ নগ্নদেহ সুন্দরী তরুণীর হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নেয় তখন, একটু আগে হোক বা একটু পরে হোক, ঘটনার গতিধারা তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরে অগ্রসর হবেই। আর ওর যাবতীয় কাপড়জামা খুলবার সময় আমি যদি তাকে একবারও স্পর্শ করতাম, কিংবা ও যদি আমার সঙ্গে কোনো একটা কথা বলতো, জ্যাকি সোনামণি বলে আমাকে সম্বোধন করতো, কিংবা বলতো যে সে আমাকে ভালোবাসে, কিংবা খিলখিল করে শুধু হেসে উঠতো, আমার কথার জবাবে যদি যা কিছু একটা বলে উঠতো, ও বিছানায় শুয়ে ছিলো আর আমি প্রথম যখন নাম ধরে ওকে ডাক দিই, তখন যদি সে এসবের একটা কিছু করতো তা হলে সব কিছু সেই মুহূর্ত থেকেই, এবং তার পর থেকে, চিরকালের জন্য অন্য রকম হয়ে যেতো। কিন্তু সে-সব কিছুই হলো না, বিছানার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে নিজের হাতের মুঠোয় তার হাত টেনে নেবার যে প্রবল ইচ্ছা আমার মধ্যে জেগে উঠেছিলো তা আমি কার্যে পরিণত করলাম না, মাংসের সঙ্গে মাংসের সেই প্রথম সামান্য সংযোগটা ঘটলো না, যেটা ঘটলেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট হয়ে যেতো। কারণ আমি যখন আবেগজড়িত গলায় বলে উঠেছিলাম, এ্যান — ওহ্, এ্যান — ঠিক তখনই বাইরে গাড়ির চাকার, আর তার পর সশব্দে ব্রেক কষে গাড়ি থামার, শব্দ শোনা গেলো।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, ওরা ফিরে এসেছে! এ্যান এক লাফে বিছানায় উঠে বসে উদভ্রান্ত চোখে আমার দিকে তাকালো।

আমি দ্রুত নির্দেশ দিলাম, তোমার জামাকাপড় তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যাও। চট করে।

আমি কোনোরকমে প্যান্টের মধ্যে আমার শার্ট ঢুকিয়ে বেল্ট লাগাতে লাগাতে দরজার দিকে ছুটতে ছুটতে বললাম, আমি রান্নাঘরে থাকবো, যেন কিছু খাবার তৈরি করছিলাম।

তারপরই আমি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে হলঘর পেরিয়ে, পেছনের সিঁড়ি আর প্যাসেজ দিয়ে ছুটে রান্নাঘরে গেলাম, দেশলাই জ্বালিয়ে গ্যাসের উনুন ধরালাম, তার উপর কফির পাত্র চাপিয়ে দিলাম, আমার হাত তখন রীতিমতো কাঁপছে, আর ঠিক তখুনি বাইরের জালের দরজায় শব্দ হলো, ওরা সবাই এসে হলঘরে ঢুকলো। আমি টেবিলের সামনে বসে স্যান্ডুইচ বানাতে শুরু করলাম। এক্ষুণি মা, প্যাটনরা, আর ওদের নচ্ছার সঙ্গীসাথীদের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে, আমার বুক তখনো হাপরের মতো ওঠা-নামা করছিলো, আমি তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা

করলাম।

মা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলবল নিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন। আমি ততক্ষণে একগাদা লোভনীয় স্যান্ডুইচ বানিয়ে ফেলেছি। ঝড়ের সম্ভাবনা দেখে ওরা আর লা গ্রেঞ্জে যায় নি, আমার সঙ্গে রসিকতা করে বললো আমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, আগে থেকে টের পেয়ে ওদের জন্য স্যান্ডুইচ আর কফি তৈরি করে রেখেছি। আমি সবার সঙ্গে খুবই মধুর ও ভদ্র ব্যবহার করলাম। একটু পরে এ্যান নিচে নেমে এলো (সে বেশ ভালোই গুছিয়ে কাজ করেছে, এতক্ষণ কোথায় ছিলো সেটা বিজ্ঞাপিত করার জন্য দু'বার টয়লেটের ফ্লাশ টেনেছে), ওরা ওকে তার বিনুনি আর নিগ্রো বাচ্চামেয়ের মতো চুলের ফিতা বাঁধা নিয়ে একটু হাসিঠাট্টা করলো, আর ও কোনো কথা না বলে লাজুক ভঙ্গি করে মিষ্টি মিষ্টি হাসলো, বড়োরা ছোটদের প্রতি নজর দিলে সদ্বংশজাত লক্ষ্মী তরুণীরা যে রকম আচরণ করে ঠিক সেই রকম আচরণ করলো, তারপর শান্তভাবে বসে একটা স্যান্ডুইচ খেলো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ও যে কি ভাবছে তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না।

তো, ওই ভাবেই সেই গ্রীষ্ম কাটলো। অবশ্য সেদিন তার পরও বাকী রাতটুকু ছিলো। আমি আমার লোহার কাঠে শুয়ে টুপ টুপ করে পাতা পড়ার শব্দ শুনেছিলাম, নিজের বোকামিকে অভিশাপ দিয়েছিলাম, নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়েছিলাম, এ্যান কি ভেবেছিলো সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম, আর কি করে কাল, শেষ দিনটিতে, তাকে আবার একা পাবো সে সম্পর্কে মনে মনে নানা মতলব আঁটছিলাম। কিন্তু তারপরই ভাবলাম আমি যদি আরেকটু অগ্রসর হতাম তা হলে আরো সর্বনাশ হতো, আমার মা মহিলাদের নিয়ে উপরে আসতেন (তাই করেছিলেন তিনি), আর আমি আর এ্যান আমার ঘরের মধ্যে ধরা পড়তাম। এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা গায়ে শীতল ঘামের স্রোত বয়ে গেলো, আর তারপরই আমি হঠাৎ অনুভব করলাম যে আমি মহাজ্ঞানীর মতো কাজ করেছি। আমি উচিত কাজটি করেছি, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো আচরণ করেছি। আর সেজন্যই আমরা উভয়ে রক্ষা পেয়েছি। এবং এই ভাবে আমার ভাগ্য রূপান্তরিত হলো আমার প্রজ্ঞায় (ঠিক যেভাবে অভিশপ্ত মানবজাতির ভাগ্য রূপান্তরিত হয় তার প্রজ্ঞায়, তারপর পুঁথিপত্রে স্থান লাভ করে এবং সেসব শেখানো হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের), এবং আরো পরে আমার প্রজ্ঞা রূপান্তরিত হলো আমার মহানুভবতায়, কারণ শেষে, অনেক কাল পরে, আমার ধারণা হয় যে সেদিন মহানুভবতার কারণেই আমি ওই রকম আচরণ করেছিলাম। আমি শব্দটা ঠিক সরাসরি নিজের সম্পর্কে প্রয়োগ করি নি, কিন্তু আমি তার চারপাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছি, প্রায়ই, রাতে আমার বিছানায় শুয়ে কিংবা

কয়েক পাত্র পান করার পর, আর আমার সেদিনের আচরণের কথা স্মরণ করে নিজের সম্পর্কে উন্নততর ধারণা পোষণ করতে থাকি।

আমি পশ্চিম দিকে যেতে যেতে, আমার পারিবারিক ছায়াছবির ঘটনাবলী একটার পর একটা দেখতে দেখতে, এটা না ভেবে পারলাম না যে আমি যদি সেদিন ওই রকম মহানুভব না হতাম — যদি তাকে মহানুভবতা বলা যায় — তাহলে হয়তো সব কিছুই অন্য রকম হতো। কারণ আমি আর এ্যান যদি ওই ঘরের মধ্যে ওভাবে ধরা পড়তাম তা হলে মা আর গভর্নর স্ট্যান্টন নিশ্চিতভাবে আমাদের বিয়ে দিতেন, যতোই কঠিন মুখ করে আর অনিচ্ছার সঙ্গে হোক। এবং তাহলে আর যা কিছুই হতো না কেন, যে-ঘটনা আজ আমাকে পশ্চিমের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো সেটা কখনোই ঘটতো না। অতএব আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে কাস মেস্টার্নের ভুবনে তার পাপ তার জন্য যে ভীষণ দুঃসহ পরিণতি ডেকে এনেছিলো আমার মহানুভবতা (কিংবা যাই বলুন তাকে) আমার জন্য আমার ভুবনে সেরকম দুঃসহ পরিণতিই ডেকে এনেছিলো। ওই দুই ভুবনের প্রকৃতি সম্পর্কে এটা কিছু আলোকপাত করতে পারে বৈকি।

তো, যা বলছিলাম, এ্যান চলে যাবার পরও বাকী রাতটুকু পড়ে ছিলো। কিন্তু তারপরও আরো একটা দিন ছিলো। কিন্তু সে দিন এ্যান প্রায় সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলো। বাসায় গোছগাছে আর ল্যান্ডিং-এ এটা-ওটা নানা ছুটকো কাজে। আমি তার বাড়িতেই ঘুর-ঘুর করি, তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি, কিন্তু কখনোই দু'একটি কথার বেশি বলতে পারি নি। শেষে সুযোগ পাই যখন গাড়িতে করে ওকে শহরে নিয়ে যাই। তাকে আমি তক্ষুণি বিয়েতে রাজী করাতে চেষ্টা করেছিলাম, আমার বাড়িতে গিয়ে কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবো, তারপর পালিয়ে যাবো। আইনের চোখে ওর বিয়ের বয়স হয় নি, আরো কিছু অসুবিধা ছিলো, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে আমরা সেসব অতিক্রম করতে পারবো, যদি ওই মুহূর্তে কোনো কিছু সম্পর্কেই সত্যি সত্যি আমি কিছু ভেবে থাকি। যাই হোক, ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর আমার মা আর গভর্নর স্ট্যান্টন যতো খুশি হৈ চৈ করতে পারেন করতেন, তাতে কিছু এসে যেতো না। কিন্তু এ্যান শুধু বললো, জ্যাকি সোনামণি, তুমি জানো যে আমি তোমাকে বিয়ে করবো। আমি তোমাকে বিয়ে করবো চিরকাল, চিরকাল। কিন্তু আজ নয়। আমি যখন পীড়াপীড়ি করলাম তখন সে বললো, শোনো, তুমি তোমার স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাও, এখনকার পড়াশোনাটা শেষ করো, তারপর আমি তোমাকে বিয়ে করবো। এমন কি তোমার আইনের ডিগ্রী পাবার আগেই।

ও যখন আইনের ডিগ্রীর কথা বললো তখন আমি প্রথমে সে কিসের কথা

বলছে তা মনেই করতে পারি নি। কিন্তু ঠিক সময়ে মনে পড়ে যাওয়ায় আর বিস্ময় প্রকাশ করি নি। ওর প্রস্তাবেই তখন আমাকে তুষ্ট থাকতে হয়।

আমি ওকে তার কাজকর্মে সাহায্য করি, তারপর ওকে বাড়ি পৌছে দিয়ে নিজের বাসায় চলে যাই। রাতের খাবার পর আমি বেশ আগে আগে আমার ছোট গাড়িটি নিয়ে ওর ওখানে গিয়ে উপস্থিত হই। আকাশে ঘন কালো মেঘ জমে উঠেছিলো, তবু আমার আশা ছিলো যে আমরা হয়তো একটু ঘুরতে বেরুতে পারবো। কিন্তু সে গুড়ে বালি। ওই গরমের ছুটিতে আর যেসব ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে হৈ-হল্লা আর খেলাধুলা করেছিলো তাদের কয়েকজন এ্যানকে বিদায় শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে। কয়েকজন মা-বাবা আর দুটি দম্পতিও এসেছে, গভর্নর স্ট্যান্টনের সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর সঙ্গে গল্প করতে। তিনি অবশ্য তখন আর গভর্নর নন্, কিন্তু ল্যান্ডিং-এ তিনি চিরকালই সকলের কাছে গভর্নর থাকবেন। অল্পবয়েসীরা গ্যালারিতে গ্রামোফোন চালিয়ে নাচতে শুরু করে দিয়েছিলো, আর বৃদ্ধরা, অন্ততঃ আমাদের চোখে তাদের বৃদ্ধ বলেই মনে হয়েছিলো, ঘরে বসে জিন্ আর টনিক পান করছিলেন। আমি এ্যানের সঙ্গে নাচলাম, তার বেশি কিছু করা গেলো না। আমি বারবার তাকে ওখান থেকে কেটে পড়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা বলেছিলাম কিন্তু সে রাজী হয় নি, অতিথিদের ফেলে ওভাবে চলে যাওয়া যায় না, সম্ভব হলে পরে চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু তারপর জোরে হাওয়া উঠলো, ঝড়ের উপক্রম দেখা দিলো, মা-বাবারা বেরিয়ে এসে বললেন, এবার তাঁদের যাওয়া দরকার, যার যার ছেলে-মেয়েদের গলা উঁচিয়ে ডেকে বললেন, ওদেরও চলা উচিত, কাল এ্যানকে অনেক দূর যেতে হবে, ওর এখন ঘুমিয়ে পড়া প্রয়োজন।

আমি থেকে গেলাম কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। গভর্নর স্ট্যান্টন ড্রয়িংরুমে বসে আরেক পাত্র পান করলেন, একা একাই, তারপর বিকালের কাগজ দেখতে লাগলেন। আমি আর এ্যান বারান্দার দোলনায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বসে রইলাম, ঘরের ভেতর গভর্নর স্ট্যান্টনের পাতা উল্টাবার খসখস শব্দ শুনলাম, ফিসফিস করে পরস্পরকে আমাদের ভালোবাসার কথা বললাম। তারপর আমরা শুধু চুপ চাপ পরস্পরকে জড়িয়ে বসে থাকলাম, কারণ কথা তখন অর্থহীন হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো, আমরা ওই ভাবে বসে গাছের উপর বৃষ্টির আছড়ে পড়ার শব্দ শুনলাম কান পেতে।

বৃষ্টি একটুক্ষণের জন্য থামলে আমি উঠে ভেতরে গেলাম, গভর্নরের সঙ্গে করমর্দন করলাম, বাইরে বেরিয়ে এসে এ্যানকে চুমু খেয়ে শুভরাত্রি জানালাম, তারপর বিদায় নিলাম সেখান থেকে। ওই চুম্বন ছিলো শীতল ঠোঁটের, নিষ্প্রাণ, যেন

গ্রীষ্মকাল আসেই নি, যেন যা কিছু ঘটেছিলো তার কিছুই ঘটে নি।

আমি আমার স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেলাম। কখন বড়োদিনের ছুটি হবে, এ্যান বাড়িতে আসবে, তার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। প্রত্যেক দিন আমরা চিঠি লিখেছি কিন্তু ক্রমেই চিঠিগুলি আমাদের গ্রীষ্মের মূলধনের উপর টানা চেকের মতো হয়ে উঠতে থাকে, ব্যাংকে সঞ্চয় ছিলো বেশ কিছু, কিন্তু জমানো অর্থ ভাঙিয়ে খাওয়া ভালো ব্যবসায়ীর লক্ষণ নয়। আমার মনে হলো আমি আমার সঞ্চিত মূলধনের উপর দিয়ে চলছি, এবং দিন দিনই তা কমতে কমতে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই একই সময়ে ওকে দেখার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম।

বড়োদিনের সময় আবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। দশ দিনের জন্য। কিন্তু এবার গ্রীষ্মের ছুটির মতো আর হলো না। ও আমাকে বলেছিলো যে ও আমাকে ভালোবাসে, আমাকে সে বিয়ে করবে, তার সঙ্গ উপভোগের ক্ষেত্রে সে আমাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগুতে দিয়েছিলো, কিন্তু এখনো সে আমাকে বিয়ে করবে না, এবং চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত সে আমাকে অগ্রসর হতে দিলো না। ও ফিরে যাবার ঠিক আগে এ নিয়ে আমাদের ঝগড়া হয়ে যায়। ও-তো সেপ্টেম্বরে রাজী ছিলো, কিন্তু এখন রাজী হচ্ছে না। আমার মনে হলো এটা যেন একধরনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, তাই আমি বেশ ক্ষেপে গিয়েছিলাম। ওকে আমি বলেছিলাম যে ও আমাকে ভালোবাসে না। এ্যান বলেছিলো যে, না, বাসে। তাহলে, আমি জানতে চাই, সে রাজী হচ্ছে না কেন। এ্যান উত্তর দিয়েছিলো, শোনো, আমি যে ভীতু তা নয়, তোমাকে যে ভালোবাসি না তাও নয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি, জ্যাকি, সত্যি ভালোবাসি। আমি বাজে পুরনোকালীন লক্ষ্মীপক্ষী খুকুমণিও নই। তুমি যে ভাবে গড়া, জ্যাকি, তুমি তাই। সেজন্যই আমি এখন রাজী হচ্ছি না, অন্য কোনো কারণে নয়।

আমি মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ। আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না। তুমি ভাবছো আমি তোমাকে বিয়ে করবো না এবং শেষে তুমি একজন সতীত্ব বিকিয়ে দেয়া কুমারী নারীতে পরিণত হবে।

এ্যান বলেছিলো, আমি জানি তুমি আমাকে বিয়ে করবে। আমার কারণ একটাই, জ্যাকি। তুমি যেভাবে গড়া তুমি তাই।

কিন্তু সে এ বিষয়ে আর কিছুই বলতে রাজী হলো না। ফলে ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেলো আমাদের। আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে ফিরে গেলাম মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে।

এক মাস সে আমাকে কোনো চিঠি লেখে নি। আমি প্রায় দু'সপ্তাহ শক্ত হয়েছিলাম, তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করি। অতএব আবার আমাদের চিঠির

পালা আরম্ভ হলো, আর অনেক দূরে কোথাও বিশ্বপদ্ধতির বিশাল হিসাবরক্ষণ খাতায় একজন কেউ আমার নামের পাশে খরচের পাতায় ছোট ছোট লাল ঢ্যারা বসাতে থাকলেন।

জুন মাসে এ্যান আবার কয়েকদিনের জন্য ল্যান্ডিং-এ এসেছিলো, কিন্তু তখন গভর্নরের শরীর ভালো যাচ্ছিলো না। ডাক্তাররা গরমের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য মেইনে পাঠিয়ে দিলেন, আর তিনি এ্যানকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে আমাদের সম্পর্ক আগের বড়োদিনের মতো হলো, কিন্তু তার আগের গরমের ছুটির মতো আর হলো না। বরং বড়োদিনের ছুটির সময়ের চাইতেও খারাপ হলো, কারণ এখন আমার বি.এ. ডিগ্রী হয়ে গেছে, এবং এবার সময় হয়েছে ল' স্কুলে ভর্তি হবার। এইবার ওই বিষয়টা নিয়ে আমাদের ঝগড়া হলো। ঠিক ওই বিষয়টা নিয়েই কি? সে আমার আইন পড়া নিয়ে কি যেন একটা বলেছিলো, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ি। এ্যান মেইনে ছ' সপ্তাহ কাটাবার পর আমার চিঠির মাধ্যমে আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে ফেলি, তখন আবার পত্র-বিনিময় শুরু হলো, আবার রক্তাক্ত চিহ্ন এঁকে দেয়া, ক্ষুদে পাখির সারির মতো আকাশের বুকে আমার নামের পাশে লাল ঢ্যারা পড়তে থাকলো। আমি তখন বিচারপতি আরউইনের বাড়িতে শুয়ে-বসে মার্কিন ইতিহাস পড়ছি, আমার পড়াশুনার জন্য নয়, কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে নয়, আমি মার্কিন ইতিহাস পড়ছিলাম এই জন্য যে আমি হঠাৎ, দৈবক্রমে, বর্তমানের হাল্কা, ভঙ্গুর বহির্স্তরের ভেতরে পা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করেছিলাম যে চোরাবালি আমার পা জড়িয়ে ধরে তার প্রথম টান দিয়েছে।

শরতের ছুটিতে, ভার্জিনিয়ার একটি নাম-করা বিশেষ পরিশীলিত মেয়েদের কলেজে পড়তে যাবার আগে, এ্যান তার বাবার সঙ্গে সপ্তাহ খানেকের জন্য ল্যান্ডিং-এ এসেছিলো। তখন আবার আমরা সমুদ্রতীরে, আমার গাড়িতে, একসঙ্গে অনেক সময় কাটাই, আগে যা যা করেছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি করি। ডাইভিং টাওয়ার থেকে এ্যান পাখির মতো ঝাঁপ দেয়। চাঁদের আলো থাকলে ও সেই চাঁদের আলোয় আমার বাহুবন্ধনে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। কিন্তু কিছুই আর আগের মতো হলো না।

যেমন, নতুন চুম্বনের ঘটনাটা। ওই শরতের ছুটিতে আমরা দুজন যখন দ্বিতীয় কি তৃতীয়বার বেড়াতে বেরিয়েছি তখন এ্যান একটু ভিন্নভাবে আমাকে চুমু খেলো। আগে কখনো সে এই ভাবে আমার মুখচুম্বন করে নি, আর ইতিপূর্বে গরমের ছুটির সময় সে যেভাবে সতর্কতার সঙ্গে, প্রায় পরীক্ষামূলকভাবে আমাকে চুমু খেয়েছিলো

এটা সেরকম হলো না। বলা যায়, এটা যেন মুহূর্তের কামনার উদ্দীপ্ত ফসল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে এই চুমু সে মেইনে ছুটি কাটাবার সময় সেখানকার কোনো লোকের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে, সাদা ফ্লানেলের প্যান্ট পরা, কায়দা করে কথা বলা, কোনো চালিয়াৎ হারামজাদার কাছ থেকে সে এই নতুন চুমুটা রপ্ত করেছে। আমি ওকে বললাম, ও যে মেইনে কিছু লোকজনের সঙ্গে ফূর্তি করছে আমি তা জানি। এ্যান অস্বীকার করলো না। মুহূর্তের জন্যও না। একটুও বিচলিত না হয়ে, শান্তভাবে সে বললো, হ্যাঁ, তারপর আমি কিভাবে জানলাম সেকথা জিজ্ঞাসা করলো। আমি যখন তাকে চুমুর কথাটা বললাম সে শুধু বললো, ওহ্, তাই তো। এই সময় সারাক্ষণ সে তার হাত দিয়ে আমার গলা বেষ্টন করে ছিলো। ওর কথা শুনে আমি এবার ভীষণ রেগে যাই, সজোরে তার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনি।

তখনো কিন্তু সে শান্ত, অচঞ্চল। আমার দিকে তাকিয়ে শুধু বললো, শোনো, জ্যাক, আমি মেইনে একটি ছেলেকে চুমু খেয়েছি। ভালো ছেলে। আমার ওকে ভালো লেগেছিলো। ওর সঙ্গে বেড়িয়ে আমি আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আমি ওর প্রেমে পড়ি নি। আর আমাদের যদি সেবার ওই ঝগড়াটা না হতো, আমার যদি মনে না হতো যে আমার গোটা পৃথিবী ধ্বসে পড়েছে, তোমার সঙ্গে আর আমার কখনো মিলন হবে না, তাহলে আমি কখনোই একাজ করতাম না। হয়তো আমি সত্যিই ওই ছেলেটির প্রেমে পড়তে চেয়েছিলাম। তুমি যে শূন্যতা সৃষ্টি করে চলে গিয়েছিলে সেই শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য, জ্যাকি — ওহ্ জ্যাকি, কি বিশাল সেই শূন্যতা — একটা পরম সরল আত্মভোলা ভঙ্গিতে সে বুকের উপর তার ডান হাতটি রেখে বললো, কিন্তু আমি পারি নি, আমি তার প্রেমে পড়তে পারি নি, জ্যাকি। আর আমি তাকে চুমু খাওয়া ছেড়ে দিই। আমাদের দুজনের ঝগড়া মিটে যাবার আগেই। সে তার হাত বাড়িয়ে আমার হাতের উপর তার হাত রেখে, আমার দিকে ঝুঁকে বললো, আমরা তো আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে ফেলেছি, জ্যাকি পাখিমণি, মিটিয়ে ফেলি নি? তার গলায় একটা দ্রুত স্নিগ্ধ খুশীর হাসি উথলে উঠলো। আমরা আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে ফেলেছি, জ্যাকি সোনামণি, তাই না? আর আবার আমি খুশি!

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমাদের ঝগড়া আমরা মিটিয়ে ফেলেছি। ও আমার দিকে আরেকটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি খুশি না?

আমি বলেছিলাম, নিশ্চয়ই। আর আমার মনে হয়, আমি সত্যি সত্যি খুশি হয়েও ছিলাম। আমার প্রাপ্য ছিলো তা। কিন্তু জিনিসটা সারাক্ষণ আমার মনের পেছনে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ছিলো, টুঁটি টিপে ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলো।

যদিও আমি তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, তবুও। আর পরের রাত্রে সে যখন আমাকে তার নতুন ভঙিতে চুমু খেলো না, আমি তখন জিনিসটাকে নড়েচড়ে উঠতে অনুভব করলাম। এর পরের রাতেও তাই হলো। সে যখন আমাকে প্রথম ওই নতুন ভঙ্গিতে চুমু খায় তখন আমি রেগে গিয়েছিলাম, এখন যখন ওভাবে চুমু খেলো না, এখন আমি আরো বেশি রেগে গেলাম। অতএব মেইনের ওই লোকটা তাকে যেভাবে চুমু খেয়েছিলো আমি এবার তাকে সেইভাবে চুম্বন করলাম। এ্যান সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ধীর কণ্ঠে বললো, তুমি কি জন্য এরকম করলে আমি জানি।

আমি বললাম, মেইনে তো ব্যাপারটা তোমার বেশ ভালো লেগেছিলো। ওহ্ জ্যাকি, এ্যান বললো, মেইন বলে কোনো জায়গা নেই, কখনো ছিলো না, তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই, জ্যাকি, তুমি হলে আটচল্লিশটা স্টেটের সমাহার, আর তোমাকে আমি ভালোবেসেছি চিরদিন। এবার লক্ষ্মী হবে তো? আমাদের মতো করে আমাকে চুমু খাবে তো?

অতএব আমি তাই করলাম, কিন্তু পৃথিবীটা একটা বিশাল তুষারের গোলক, পাহাড়ের ঢালু বেয়ে সেটা ক্রমাগত গড়িয়ে নামতে থাকে, কখনোই তা গড়াতে গড়াতে চড়াই-এর পথ ধরে উপরে উঠে গিয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায় না, শূন্যে পরিণত হয় না।

সদ্য সমাপ্ত গরমের ছুটি আগের বারের গরমের ছুটির মতো না হওয়া সত্ত্বেও আমি আবার আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে নিরানন্দ খণ্ডকালীন কাজ ও খবরের কাগজে মাঝে মাঝে রিপোর্টিং করতে শুরু করি, আর ল' স্কুলে ভর্তি হই, এবং এই সবই করি চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে। আর ইতিমধ্যে এ্যানকে তার ভার্জিনিয়ার অতি পরিশীলিত মহিলা কলেজে আমার চিঠি লেখার কাজও চলতে থাকে, আর যে মূলধনের উপর আমি চেক কেটে চলেছিলাম সেই মূলধনও ক্রমেই কমে আসতে থাকে। তারপর এক সময় বড়োদিনের ছুটি হলো, আমি বাড়িতে এলাম, এ্যানও বাড়িতে এলো, আমি এ্যানকে জানালাম যে ল' স্কুল আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আমি ভেবেছিলাম (এবং এক জটিল দুর্বোধ্য প্রক্রিয়ার ফলে আশাও করেছিলাম) যে একথা বলার পরই একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু কোনো বিস্ফোরণ ঘটলো না। এ্যান শুধু ঝুঁকে পড়ে আমার হাতটা মৃদু চাপড়ে দিলো। (আমরা স্ট্যান্টনদের বসবার ঘরে কৌচে বসেছিলাম, অনেকক্ষণ জড়াজড়ি করেছিলাম, শেষে পরস্পরের বাহুবন্ধন ছিন্ন করে দূরে সরে যাই, এ্যান এক ধরনের সুদূর বিমর্ষতা নিয়ে, আর আমি বড়ো বেশি প্রলম্বিত কামনা ও তার ব্যর্থতাজনিত ক্লান্তি ও বিরক্তি নিয়ে।) সে আমার হাত চাপড়ে বলেছিলো, তা হলে আইন প'ড়ো

না তুমি। আইন তোমাকে পড়তেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

তা হলে আমি কি করবো? কি তুমি চাও?

জ্যাকি, আমি কখনোই চাই নি যে তুমি আইন পড়ো। সেটা একান্তভাবেই তোমার আইডিয়া ছিলো।

ওহ্, তাই নাকি?

হ্যাঁ। ও আবার আমার হাতে মৃদু চাপড় দিয়ে বললো, তুমি যা করতে চাও তাই করো, জ্যাকি। আমি তাই চাই। আর তুমি যদি টাকাপয়সা রোজগার না করো তাতেও কিছু এসে যায় না। আমি তোমাকে তো অনেক আগেই বলেছি যে আমি তোমার সঙ্গে খুদকুঁড়ো খেয়ে থাকতেও রাজী আছি।

আমি কৌচ থেকে উঠে পড়লাম। সে যেভাবে আমার হাতে চাপড় দিচ্ছিলো তাতে হঠাৎ আমার নার্সের কথা মনে পড়লো। এই ভাবেই সেবিকা রোগীর হাত চাপড়ে দেয়, তাকে শান্ত করে তোলে। আমার উঠে পড়ার একটা কারণ ছিলো সে যেন ওই ভাবে আর আমার হাত চাপড়ে দিতে না পারে। ওর কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে খুদকুঁড়ো খাবে। চলো, আমরা বিয়ে করে ফেলি। কালই। আজ রাতেই। অনেক দিন যথেষ্ট খেলাধুলা হয়েছে। তুমি বলছো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো। বেশ, আমিও তোমাকে ভালোবাসি। ঠিক আছে?

এ্যান কোনো কথা বললো না, কোলের উপর শিথিলভাবে হাত দুটি রেখে চুপ করে বসে রইলো, তারপর তার মুখ তুলে ধরলো, হঠাৎ সে মুখ দেখালো ক্লিষ্ট ও অবসাদগ্রস্ত, আর আমার দিকে তাকিয়ে থাকা তার দু'চোখ অবরুদ্ধ অশ্রুর ভারে ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকলো।

আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাসো?

সে ধীরে ধীরে মাথা দোলালো।

তুমি জানো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি?

আবারো সে মাথা দোলালো।

তাহলে?

এ্যান বললো, জ্যাক — এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বললো, জ্যাক, আমি সত্যি তোমাকে ভালোবাসি। আমার মাঝে মাঝে কি রকম মনে হয় জানো? আমি তোমাকে চুমু খেয়ে, শক্ত করে তোমার হাত ধরে, দু'চোখ বুঁজে, তোমার সঙ্গে পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ি। কিংবা, ওই সেই সময়ের মতো, তুমি জলের গভীরে ডুব দিয়ে আমার কাছে চলে এসেছিলে, জলের নিচেই আমরা চুমু

খেয়েছিলাম, মনে হয়েছিলো আর বুঝি আমরা কখনো উপরে উঠে আসতে পারবো না — তোমার মনে আছে, জ্যাক?

হ্যাঁ।

আমি তোমাকে তখন ওই রকম ভালোবেসেছিলাম, জ্যাক।

আর এখন? এখন কি রকম?

এখনও, জ্যাক। আমার মনে হয় এখনও আমি ওই রকম করতে পারি। কিন্তু এখন তা একটু অন্যরকমও।

অন্যরকম?

ওহ্, জ্যাক। সে হাত দিয়ে তার কপাল টিপে ধরলো, বিভ্রান্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনার ভঙ্গিতে, আগে কখনো তার মধ্যে আমি এই ভঙ্গি দেখি নি, অন্ততঃ দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না, তবে পরে আরেকবার দেখেছিলাম, এখন ওই রকম ভঙ্গি করে সে বললো, ওহ্, জ্যাক, তারপর থেকে কতো কিছু, কতো কিছু ঘটে গেছে।

কি ঘটেছে?

ওহ্, এই যেমন বিয়েটা পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ার মতো ব্যাপার নয়। প্রেমও সেরকম কিছু নয়। কিংবা জলে ডুবে যাওয়ার মতোও নয়। ওহ্, কেমন করে যে বলবো আমি জানি না — ব্যাপারটা হচ্ছে বাঁচার জন্য চেষ্টা করা। বাঁচার জন্য একটা পথ খুঁজে নেওয়া, একটা পদ্ধতি গ্রহণ করা।

আমি বললাম, অর্থ, যদি তুমি অর্থের —

এ্যান বাধা দিয়ে বললো, অর্থ নয়। আমি অর্থের কথা ভাবছি না। ওহ্, জ্যাক, আমি কি বলতে চাইছি তুমি যদি বুঝতে!

তো, শুনে রাখো, আমি প্যাটনদের সঙ্গে কিংবা এখানকার কারো সঙ্গে কাজ করবো না। ওরা কেউ আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবে তাও হবে না। এমন কি আরউইনও না। একটা কাজ আমি নিজেই জুটিয়ে নেবো, কি ধরনের তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু ওদের সঙ্গে নয়।

ক্লান্ত গলায় এ্যান বললো, ডার্লিং, আমি তোমাকে এখানে আনতে চাইছি না। তুমি প্যাটনদের সঙ্গে কিংবা বিশেষ আর কারো সঙ্গে কাজ করো আমি মোটেই তা চাইছি না। তুমি যা চাও, তাই করবে তুমি। সেটাই আমার ইচ্ছা। শুধু কিছু একটা করো। সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট কিছু একটা। তুমি টাকা না বানালেও কিছু এসে যায় না। আমি তো বলেছি যে আমি তোমার সঙ্গে ঝুপড়িতে থাকবো।

অতএব আমি ল' স্কুলে ফিরে গেলাম, তারপর নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালাবার ফলে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হতে সক্ষম হলাম। বহিষ্কৃত হবার

জন্য বেশ কষ্ট করতে হয় আমাকে। খুব সহজ সাধারণ উপায়ে স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কাজটি সম্পাদন করা যায় না। তার জন্য রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়। আমি ছেড়ে দিতে পারতাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে না এলেই চলতো, কিন্তু তাহলে ভবিষ্যতে কোনো একদিন হয়তো আবার ফিরে আসতে সক্ষম হতাম। অতএব আমি বহিস্কৃত হলাম। আমি যখন আমার বহিস্কার নিয়ে আনন্দ উৎসব করছিলাম, যখন আমি সুনিশ্চিত যে এ্যান এবার ক্ষেপে যাবে এবং আমাকে চিরতরে ত্যাগ করবে, সেই সময় আমার জনৈক স্যাঙাত আর জন দুই তরুণীকে নিয়ে আমি একটা ছোটখাটো কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ি, আর ব্যাপারটা খবরের কাগজে উঠে যায়। ততোদিনে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন একজন ছাত্র শুধু, কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে কিছু করতে পারলো না। এ্যানও কিছু করলো না, কারণ আমার মনে হয় আমি ততোদিনে একজন প্রাক্তন জ্যাকি পাখিমণিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম।

অতএব এ্যান তার পথে গেলো আর আমি আমার পথে। আমার পথ হলো একটা খবরের কাগজের সঙ্গে কাজ করা, শহরের নিম্নাঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো, আর মার্কিন ইতিহাসের উপর বইপত্র পড়া। শেষে আমি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কোর্স নিতে শুরু করলাম, প্রথমে শুধু অবসর সময়ে, হাল্কাভাবে, তারপর রীতিমতো মনোযোগ সহকারে। অতীতের মোহমায়ার মধ্যে আমি প্রবেশ করছিলাম। এক সময় মনে হলো আমি আর এ্যান বুঝি আবার আমাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলেছি, কিন্তু না, আবার কোথাও কিভাবে যেন তাল কেটে যায়, তখন সব আগের জায়গায় ফিরে গেলো। আমি আমার পিএইচ.ডি.-র কাজ শেষ করলাম না। আবার আমি ক্রনিকল পত্রিকায় আমার রিপোর্টারের কাজে ফিরে গেলাম, যে কাজে আমার দক্ষতা ছিলো অবিসংবাদিত। আমি বিয়েও করে ফেলি। বিয়ে করি লয়-কে, খুবই সুন্দরী সেই মেয়ে, এ্যানের চাইতে অনেক ভালো দেখতে, রসালো, এ্যানের মতো অত শক্ত পেশী আর হাড় নেই তার। লয়কে দেখে মনে হতো খেয়ে ফেলা যায়, একেবারে শেষ পর্যন্ত কোমল ও সুস্বাদু, কচি গোমাংস আর জর্জিয়া পীচফলের একটি মরমীয়া মিশ্রণ, জিভ লালায়িত হয়ে ওঠে, কামড় বসালেই যেন সোনা ঝরবে। লয় কেন আমাকে বিয়ে করলো তার কারণ সে-ই সব চাইতে ভালো জানে। তবে আমি সুনিশ্চিত যে তার একটা কারণ এই যে আমার নাম বার্ডেন। এক এক করে বাদ দেবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমি উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমার সৌন্দর্য, মাধুর্য, বৈদগ্ধ্য বা বিদ্যাবুদ্ধির জন্য সে আমাকে বিয়ে করে নি, কারণ, প্রথমতঃ, আমার সৌন্দর্য বা মাধুর্য মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিলো না, দ্বিতীয়তঃ, বৈদগ্ধ্য, বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যে লয় বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিলো না। যদি আমার সে সব থেকেও থাকতো।

আমার মায়ের টাকার জন্যও সে নিশ্চয় আমাকে বিয়ে করে নি, কারণ লয়ের নিজের বিধবা মায়েরই প্রচুর টাকাপয়সা ছিলো। যুদ্ধের সময় পাথরকুচি সরবরাহের ঠিকাদারী করে লয়ের বাবা প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন, কিন্তু একটু দেরিতে, যার ফলে তার কন্যা তার সব চাইতে অনুভূতিশীল সময়ে ওই অর্থ থেকে উপযুক্ত ফয়দা তুলতে পারে নি। অতএব বাকী থাকলো শুধু বার্ডেন নামটি।

অবশ্য যদি না লয় আমার প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকে। এই সম্ভাবনা আমি যোগ করলাম শুধু তালিকাটি যুক্তিভিত্তিক এবং ছকটি সম্পূর্ণ করার জন্য, কারণ প্রেম সম্পর্কে লয় মাত্র দুটি জিনিস জানতো, শব্দটির বানান, এবং কি করে তার সঙ্গে চিরকাল ধরে সংশ্লিষ্ট দৈহিক সামঞ্জস্যবিধান করতে হয় সেই সব। বানানটা খুব ভালো করে করতে পারতো না, কিন্তু ওই দৈহিক সমঝোতার কাজটা সে করতে পারতো অতিশয় নৈপুণ্য ও গভীর তৃপ্তির সঙ্গে। তৃপ্তি ও আনন্দ ছিলো প্রকৃতি, কিন্তু নৈপুণ্য ছিলো শিল্পকর্ম, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল। লয়ের অত্যন্ত কুশলী ও নাটকীয় ভাবভঙ্গি সত্ত্বেও আমি এটা জানতাম, কিন্তু ভাঁড়ার ঘরে পনীর চিবুনো অবস্থায় ধরাপড়া ইঁদুরের মতো আমি সেটাকে আমার মনের পেছনের আঙিনায় মাটি চাপা দিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সত্যটির সরাসরি মুখোমুখি হবার মতো কিছু না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বোধহয় তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও চাই নি। আর আমার বাহুবন্ধনে বন্দী মিসেস বার্ডেন ছিলেন অতিশয় বিশ্বস্ত, সুবিবেচক ও সতর্ক। তাই কিছুই কখনো ঘটে নি। ব্যবস্থাটার মধ্যে কোথাও কোনো ত্রুটি ছিলো না।

লয় প্রায়ই বলতো, জ্যাক আর আমার যৌন–সমঝোতা নিখুঁত। এই ধরনের আলাপকে সে মনে করতো বেশ চিন্তাশীল ব্যাপার এবং এক্ষেত্রে সে ছিলো অত্যন্ত প্রগতিশীল, আর তার ভাষাও ছিলো বেশ পরিশীলিত। তার আধুনিক এ্যাপার্টমেন্টে (লয়ের রুচি ছিলো ওই দিকে, পুরানোকালীন ঝুল–বারান্দা ইত্যাদি সে পছন্দ করতো না, তাছাড়া সে–ই ভাড়াটা দিতো) বসে অতিথিদের মুখের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকিয়ে সে তাদের শোনাতো কি নিখুঁত ছিলো আমাদের দুজনের সমঝোতা, আর যৌন শব্দটি উচ্চারণ করার সময় তার মধ্যে দু'চামচ বাড়তি মধু মেখে দিতো। একটা সময় পর্যন্ত আমি এতে কিছু মনে করি নি। বলুক লয় তার অতিথিদের যৌনক্ষেত্রে তার আর আমার সমঝোতা কি নিখুঁত। বরং এতে আমার অহম্ তৃপ্ত হতো, কারণ লয়ের সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে কিংবা তার সঙ্গে প্রকাশ্যে কোনো ছবি তুলতে কারো পক্ষে কোনো কিছু মনে করার প্রশ্নই ছিলো না। অতএব লয় যখন তার বন্ধুদের আমাদের নিখুঁত সমঝোতার কথা বলতো তখন আমি বিনীত ভঙ্গিতে হাসি হাসি মুখ

করে শুনে যেতাম শুধু। কিন্তু কিছু কাল পরে আমি বিরক্তি বোধ করতে আরম্ভ করি।

যতক্ষণ পর্যন্ত লয়কে আমি ক্ষুধা জাগাতে ও মেটাতে সক্ষম একটি সুন্দর, রসালো, কোমল, প্রাণবন্ত, সুগন্ধী যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করতাম (আর ওই জন্যই তাকে আমি বিয়ে করি) ততক্ষণ পর্যন্ত সব বেশ ভালো চলতো। কিন্তু যখনই আমি তাকে মানুষ হিসাবে দেখতাম তখনই গোলমাল শুরু হতো। লয় যদি বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বোবা হয়ে যেতো তা হলে বোধহয় সব ঠিক থাকতো। তখন কোনো পুরুষের পক্ষেই সম্ভব হতো না তাকে প্রতিহত করা। কিন্তু সে কথা বলতে পারতো, এবং কোনো জিনিস যদি কথা বলতে পারে তা হলে, আগে হোক বা পরে হোক, যেসব শব্দ সে করে তা এক সময় আপনি শুনতে শুরু করেন এবং তখন অন্য সব প্রমাণের মুখেও আপনি তাকে একজন মানুষ বলে ভাবতে আরম্ভ করেন। আপনি তার সম্পর্কে মানবিক মানদণ্ড প্রয়োগ করতে থাকেন এবং তখন ওই মানবিক উপাদান আপনি এতো দিন যে সরস সুগন্ধী যন্ত্রটির মধ্যে নিষ্পাপ স্বর্গীয় আনন্দ পাচ্ছিলেন তাকে কীটদষ্ট ও বিকৃত করে তোলে। আমি যন্ত্র–লয়কে ভালোবেসেছিলাম, যেভাবে একজন মানুষ চমৎকার সুপক্ক কচি গো–মাংস কিংবা জর্জিয়ার পীচফলকে ভালোবাসে, কিন্তু নিঃসন্দেহে আমি মানুষ–লয়ের প্রেমে পড়ি নি। বস্তুতঃপক্ষে, যখন আমি বুঝতে শুরু করলাম যে আসলে যন্ত্র–লয়ের মালিক হলো মানুষ লয়, যন্ত্র–লয় হলো মানুষ–লয়েরই একটি হাতিয়ার (অন্ততঃ সেই বস্তুর যা কথা বলতে সক্ষম), তখনই যে যন্ত্র–লয়কে একদা আমি অমন নির্দোষভাবে ভালোবাসতাম তাকে মনে হলো গভীর সমুদ্রে মিটমিট করা একটা জোড়া–শুক্তির মতো, মুখ খোলা, অনবরত স্পন্দিত হচ্ছে, আর আমি যেন একরত্তি একটা সামুদ্রিক প্রাণী, ওই শুক্তির নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে তার দিকে ছুটে যাচ্ছি। কিংবা তাকে মনে হলো একটা বিশাল পিপার মতো, যার মধ্যে ডুব দিয়ে ডিউক মরে গিয়েছিলেন, আর আমি যে ডিউক অব ক্ল্যারেন্স তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিংবা তাকে মনে হলো একটা চমৎকার, লোভী, ক্ষুধার্ত দল্‌দলে পঙ্কিলভূমির মতো, যা পথ–ভোলা বিভ্রান্ত পথিককে একটা শেষ ক্লান্ত, তরল, পরিতৃপ্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে সুড়ুৎ করে গলাধঃকরণ করে ফেলে। হ্যাঁ, ওই চমৎকার, লোভী পঙ্কিলভূমির মধ্যে তার শেষ বিলাসী পরিতৃপ্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে ডুবে যেতে পারে সুগম্ভীর মন্দির, বর্ণাঢ্য রাজপ্রাসাদ, মিনার, দুর্গপ্রাকার, লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, কুটির, হাসপাতাল, বাড়িঘর, নগর–বন্দর, সব, যা কিছু মানুষ তৈরি করেছে। অন্ততঃ তাই আমার মনে হয়েছিলো তখন। আমার স্মৃতি আমাকে সেকথাই বলছে।

কিন্তু যা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় তা এই যে যতক্ষণ লয় শুধু যন্ত্র–লয় ছিলো, একটি সুন্দর সাজ–পোশাক পরা প্রাণীমাত্র ছিলো, যতক্ষণ সে শুধু একটি অবোধ অ–মানবীয় প্রকৃতির অংশমাত্র ছিলো, যতক্ষণ আমি তার উচ্চারিত ধ্বনিগুলিকে মানুষের কথা বলে বুঝে উঠতে শুরু করি নি ততক্ষণ তার মধ্যে ক্ষতিকর কিছু ছিলো না, যে যথার্থ অনির্বচনীয় আনন্দ সে দিতো তার মধ্যে অনিষ্টকর কিছু ছিলো না। কিন্তু আমি যখন লক্ষ করলাম যে এই লয় জড়িয়ে আছে অপর লয়ের সঙ্গে, তার মধ্যে রয়েছে কিছু মানবীয় উপাদান, তখনই আমার মনে হলো যে মানুষের যাবতীয় কীর্তি নিঃশেষে বিলীন হয়ে যেতে পারে সেই পঙ্কিলভূমির অন্তহীন গর্ভে। খুব সূক্ষ্ম একটা প্যারাডক্স এটা।

গলাধিঃকৃত হবো না, এমন কোনো সচেতন সিদ্ধান্ত আমি করি নি, মানুষের আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি এই রকম সিদ্ধান্তের ওপারেই সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকে। একটা লোক যখন নালায় পড়ে যায় তখন সে সাঁতার কাটার সিদ্ধান্ত নেয় না, সে হাত–পা ছুঁড়তে শুরু করে। আমিও আঁকুপাঁকু করতে লাগলাম, কিলবিল করে নড়তে লাগলাম, হাত–পা ছুঁড়তে শুরু করলাম। আমার মনে পড়ছে, প্রথমতঃ, লয়ের বন্ধুদের কথা। আমার কোনো বন্ধু (অবশ্য শহরের হোটেল–রেস্তোঁরায়, কি পানশালায়, কি প্রেসক্লাবে যাদের সঙ্গে আমার আলাপ–পরিচয় ছিলো তাদের যদি বন্ধু বলা যায়) লয়ের কেতাদুরস্ত এ্যাপার্টমেন্টে কখনো আসতো না। লয়ের বন্ধুদের সম্পর্কে আমার মনে একটা বিতৃষ্ণা জাগতে আরম্ভ করে। ওদের মধ্যে খুব একটা আপত্তিকর কিছু যে ছিলো তা নয়। ওরা ছিলো মানুষী আস্তাকুঁড়ের বাহারী বৈচিত্র্যের কিছু সমাহার মাত্র। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলো, লয়ের বিবেচনায়, একটা পজিশনের মানুষ, যদিও এবিষয়ে লয়ের জ্ঞান ছিলো অত্যন্ত সীমিত। এই মানুষগুলোর টাকাপয়সা বিশেষ ছিলো না, আর তারা এখানে আসতো বিনি পয়সার সুরার লোভে। আর কেউ কেউ আসতো যাদের টাকাপয়সাও বিশেষ ছিলো না, পজিশনও বিশেষ ছিলো না, কিন্তু বড়ো বড়ো পোশাকের দোকান থেকে যারা ধারে সুন্দর সুন্দর কাপড়জামা কিনতে পারতো, আর যাদের উপর লয় অনায়াসে হুকুম চালাতে পারতো। আর কেউ কেউ আসতো যাদের পজিশন ছিলো না কিন্তু যারা ছিলো খুবই বিত্তশালী, লয়ের চাইতেও বেশি, যারা উচ্চবিত্ত অভিজাত সমাজের কায়দাকানুন সম্পর্কে ছিলো নিখুঁতভাবে ওয়াকিবহাল। ওরা সবাই পড়তো ভ্যানিটি ফেয়ার কিংবা হার্পারস বাজার (লিঙ্গ অনুযায়ী, অবশ্য কেউ কেউ দুটোই পড়তো), আর পড়তো স্মার্ট সেট, ওরা ডরোথি পার্কার থেকে উদ্ধৃতি দিতো, আর শুধু শিকাগো পর্যন্ত যাওয়া মানুষগুলি নিউ ইয়র্ক ঘুরে আসা মানুষগুলির থুতু চাটতো,

আর শুধু নিউ ইয়র্ক ঘুরে আসা মানুষগুলি প্যারিস ভ্রমণ করে আসা মানুষগুলির থুতু চাটতো। ওই যেমন বলেছি, এই মানুষগুলির মধ্যে বিশেষভাবে মন্দ বা আপত্তির কিছু ছিলো না, এদের অনেকেই ছিলো বেশ অমায়িক ও আকর্ষণীয়। আমি ওদের মধ্যে একটাই আপত্তিকর জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম। ওরা ছিলো লয়ের বন্ধু। প্রথম দিকে আমি ওদের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে ব্যবহার করতে শুরু করি, পরে আমার আচরণে এমন একটা ভঙ্গি প্রকাশ পায় যাকে লয় রীতিমত অবজ্ঞা বলে অভিহিত করে। আমি এক দিন ওই রকম আচরণ করার পর লয় আমাকে শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। সে আমাকে তার সুমধুর যৌন সংসর্গ থেকে বঞ্চিত করতে আরম্ভ করে।

এই তো গেলো লয়ের বন্ধুদের প্রসঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ, লয়ের এ্যাপার্টমেন্টের ব্যাপারটা। ওই এ্যাপর্টমেন্টের প্রতি আমার একটা বিতৃষ্ণা জেগে উঠতে শুরু করে। আমি লয়কে বলেছিলাম যে আমি ওখানে বাস করতে চাই না। আমরা এমন একটা বাড়ি নেবো যার ভাড়া আমি আমার বেতন থেকে দিতে সমর্থ। এ নিয়ে আমাদের কয়েক দফা ঝগড়া হয়। সেসব ঝগড়ায় আমি জিতবো তেমন কথা আমি কখনো ভাবি নি। এর ফলেও সে আমাকে তার মধুর যৌন সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে আরম্ভ করে।

এইতো গেলো এ্যাপার্টমেন্টের প্রসঙ্গ। কিন্তু তার পরও ছিলো তৃতীয় একটা বিষয়। আমার পোশাক–পরিচ্ছদের ব্যাপারটা, লয় যাকে বলতো আমার পারিপাট্য। আমি অভ্যস্ত ছিলাম ত্রিশ ডলারের স্যুট পরতে, একই শার্ট দু–তিন দিন গায়ে চড়াতে, দু'মাস অন্তর চুল কাটতে, পালিশ ছাড়া জুতো পায়ে দিতে। আমার টুপীর প্রান্ত ঝুলে পড়তো, নখ থাকতো প্রায় সর্বদাই ভাঙা, মাঝে মাঝে অপরিষ্কারও। প্যান্ট ইস্ত্রী করার অভ্যাসকে আমি মনে করতাম এমন একটা কাজ যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। প্রথম দিকে, যখন লয়কে আমি শুধু একটা চমৎকার সুস্বাদু যন্ত্ররূপে দেখতাম তখন আমি আমার চেহারা ও পোশাক–পরিচ্ছদে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনতাম, কিন্তু যখন থেকে আমি উপলব্ধি করতে শুরু করলাম যে তার মুখনিঃসৃত ধ্বনিগুলি মানুষের কথার মতো শোনাচ্ছে, আহার গ্রহণ অথবা যৌনমিলনের প্রাথমিক দাবী অথবা তা চরিতার্থতার পর আনন্দ–অভিব্যক্তির চাইতে বেশি কিছু বলছে সেই ধ্বনিগুলি, তখন থেকে আমার মধ্যে একটা প্রতিরোধের মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে এবং আমার চেহারা উন্নয়নের জন্য চাপ যতো বাড়তে থাকলো, আমার প্রতিরোধও ততো তীব্র হয়ে উঠলো। দিনের পর দিন, ক্রমবর্ধমান হারে, আমার অভ্যস্ত চেনা পোশাকগুলি আমার আলমারি থেকে উধাও হয়ে যেতে

লাগলো, তার জায়গায় দেখা গেলো নতুন পোশাক, আমাকে জানিয়ে কিংবা গোপনে, না জানিয়ে, আমাকে নাকি এসব উপহার দেয়া হয়েছে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে আমার প্রতি ভালোবাসা থেকে কিংবা আমার রুচি সম্পর্কে একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমার আনন্দবিধানের জন্য এসব উপহার আমাকে দেয়া হয়েছিলো। পরে বুঝি যে আমার আনন্দবিধানের ব্যাপারটা বিন্দুমাত্রও বিবেচিত হয় নি। চূড়ান্ত সঙ্কট দেখা দিলো যেদিন আমি একটা নতুন টাই দিয়ে আমার জুতো পালিশ করি। প্রচণ্ড ঝগড়া হলো সেদিন। শার্ট, টাই ইত্যাদি নিয়ে আমাদের রুচির পার্থক্যকে ভিত্তি করে যে ঝগড়া চলতে থাকে তার প্রথমটি ঘটে সেদিন। ফলে সে তার যৌনসাহচর্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করলো।

এই ধরনের নানা কারণেই সে ওই কাজটি করতো। কিন্তু খুব বেশি দিন এই অবস্থা চলতো না। কখনো কখনো আমিই আগে নতি স্বীকার করতাম, ক্ষমা চাইতাম। প্রথম দিকে আমার ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে একটা বিষণ্নতা থাকতো, সেই মুহূর্তের জন্য আন্তরিকতাও থাকতো, যদিও সেই আন্তরিকতার মধ্যে এক ধরনের আত্ম–করুণাও মিশে ছিলো। পরে সেগুলি শ্লেষের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে, তার মধ্যে এক ধরনের দ্বিমুখী অভিব্যক্তি এবং নাটকীয়তা যুক্ত হয়। আমি বিছানায় শুয়ে নাটকীয়ভাবে মিনতি করতাম, আমি উপলব্ধি করতাম যে অন্ধকারে আমার মুখ বেঁকেচুরে একটা মুখোশে রূপান্তরিত হচ্ছে, তার মধ্যে ফুটে উঠছে নিজেকে অভিনন্দন জানানো ধূর্ততা, তিক্ততা আর ঘৃণা। কিন্তু আমিই যে সব সময় প্রথমে ভেঙে পড়তাম তা নয়। মাঝেমাঝে রসালো যন্ত্র–লয় শুষ্ক ও ভঙ্গুর ব্যক্তি–লয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তখন সে ঘৃণায় ভরা তীক্ষ্ণ নিচু গলায় আমাকে আমন্ত্রণ জানাতো, এবং এর পরবর্তী প্রক্রিয়া চলাকালে নিজের মুখ সে অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখতো, কিংবা যদি কখনো আমার দিকে তাকাতোও তখন তার চোখেমুখে ফুটে উঠতো একটা কোণঠাসা জন্তুর তীব্র চাউনি। কিংবা আমাকে সে হয়তো কোনো আমন্ত্রণ জানায় নি, দস্তুরমতো ক্ষেপে গিয়ে মারামারি হাতাহাতি শুরু করেছে আমার সঙ্গে, শেষে ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়েছে, শুষ্ক ও ভঙ্গুর ব্যক্তি–লয় অতোটা সহ্য করতে পারে নি, এবং তখন অন্য লয় তার প্রাধান্য বিস্তার করে নিয়েছে। সে যাই হোক, লয় কিংবা আমি, যে–ই ভেঙে পড়ি না কেন, দুমড়ানো–মুচড়ানো বিছানার চাদর, অনুচ্চারিত ঘৃণা এবং কোনো একজনের আত্মমর্যাদার ধ্বংসপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে লয় তার অতিথিদের কাছে আমাদের নিখুঁত যৌন–সমঝোতা সম্পর্কে যে কথা বলতো আমরা তার সত্যতা প্রমাণ করতাম। যথার্থই নিখুঁত সমঝোতা ছিলো আমাদের।

ওই সমঝোতা এতোই নিখুঁত ছিলো যে শেষ পর্যন্ত, সত্তার গভীরে সুদৃঢ়ভাবে স্থিত আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে আমি বারাঙ্গণাদের ওখানে যাতায়াত করতে আরম্ভ করি। সেই সময় আমি কাগজের বৈকালিক সংস্করণের কাজ দেখতাম, অপরাহ্ন দুটো নাগাদ আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যেতো। কোনো দোকানে পাত্র দুই সুরা পান ও বিলম্বিত দ্বিপ্রাহরিক আহারপর্ব শেষ করে আমি আবার দু'এক পাত্র মদ খেতাম, প্রেসক্লাবে খানিকক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলতাম, তারপর হয়তো কোনো বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। তারপর, যদি রাতে খাবার সময় বাড়িতে ফিরতে পারতাম তা হলে খেতে খেতে চিকিৎসকের নৈর্ব্যক্তিকতা ও একটা আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের অনুভূতি নিয়ে আমি লয়কে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করতাম। শেষে এমন হলো যে আমি ইচ্ছা করলেই দৃষ্টির একটা মায়া বা বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারতাম। একটা বিশেষ ভঙ্গিতে লয়ের দিকে তাকালেই আমার মনে হতো সে যেন ক্রমাগত পেছনে সরে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটাও ক্রমেই লম্বা হয়ে যাচ্ছে, অবশেষে মনে হতো আমি যেন একটা বাইনোক্যুলারের উল্টো দিক দিয়ে তাকে দেখছি। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমি একটা বিপুল আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করি। এ-ব্যাপারে আমি শেষ অবধি এতো পারদর্শী হয়ে উঠি যে লয় যখন কথা বলতো, যদি কোনো সন্ধ্যায় গোমড়া মুখে চুপ করে বসে থাকার পরিবর্তে সে হিংস্র অভিযোগভরা উক্তিতে ফেটে পড়তো, তখন আমার মনে হতো তার কথা যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে, বস্তুতঃপক্ষে সেসব যেন আমার উদ্দেশে উচ্চারিত হচ্ছে না।

তারপর এলো চূড়ান্ত পর্ব, বিরাট নিদ্রার পর্ব। প্রতি রাতে খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি শুয়ে পড়তাম আর গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতাম। একটা মিষ্টি অনুভূতিতে আমার মন পূর্ণ হয়ে যেতো, আগামী কাল সকালের শেষ সম্ভাব্য মুহূর্তটি পর্যন্ত আমি যেন একটা পরম উপাদেয় অন্ধকারের কেন্দ্রাভিমুখে পড়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মনোযোগ সহকারে লয়কে লক্ষ করবার আনন্দ থেকেও আমি নিজেকে বঞ্চিত করে, রাতের আহারপর্ব বাদ দিয়ে, সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তাম। আমার মনে পড়ছে বসন্তের শেষ দিকে এটা একটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আমার বিকালের কাজকর্ম শেষ করে আমি বাড়ি ফিরতাম, শোবার ঘরে গিয়ে জানলার পর্দা টেনে বিছানায় শুয়ে পড়তাম, পর্দার চারপাশ দিয়ে বাইরের হাল্কা আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভেতরে ঢুকতো, এ্যাপার্টমেন্ট-ভবনের লাগোয়া ছোট্ট পার্ক থেকে পাখির কিচিমিচি ও সঙ্গীতলহরী আর পার্কের খেলার মাঠে ক্রীড়ারত বাচ্চাদের মিষ্টি কলকাকলির শব্দ ভেসে আসতো। বসন্তের শেষ বিকালে কিংবা গোধূলির ঠিক আগে আগে কেউ যদি ওই সব শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে

তা হলে তার মন একটা আশ্চর্য শান্তিতে ভরে যায়। ভালোভাবে দীর্ঘ জীবন কাটাবার পর বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যে-শান্তি পায় তা নিশ্চয়ই এই রকম।

কিন্তু লয় তো অবশ্যই ছিলো। মাঝে মাঝে সে আমার শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হতো, ততোদিনে আমি আমার গুরুতর নিদ্রার জন্য অতিথিকক্ষে শয্যা গ্রহণ করতে শুরু করেছিলাম। লয় আমার শয্যার কিনারে বসে আমাকে দীর্ঘ বর্ণনা দিতো, নিতান্তই একেঘেঁয়ে বর্ণনা, ওর শব্দভাণ্ডার ছিলো বেশ সীমিত, তাই কতিপয় ধ্রুপদী শব্দগুচ্ছের উপরই তাকে নির্ভর করতে হতো। কখনো কখনো সে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে আমাকে মারতো। সে তার ছোট্ট সাদা মুষ্টিবদ্ধ হাত ব্যবহার করতো দুর্বল মেয়েলী ভঙ্গিতে। তার বর্ণনা আর আমার পার্শ্ব কিংবা পৃষ্ঠদেশে তার মুষ্টিবদ্ধ হাতের মারের মধ্য দিয়ে আমি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রামগ্ন থাকতে সক্ষম হতাম। কখনো কখনো সে কাঁদতো, গভীর আত্মকরুণা ফুটে উঠতো তার আচরণে। এক বার কি দু'বার সে গুটিসুটি মেরে ঘন হয়ে আমার পাশে শয্যা গ্রহণও করেছিলো। কখনো কখনো সে আমার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে রেকর্ড বাজাতো, সে শব্দে সমস্ত বাড়ি যেন থরথর করে কাঁপতে থাকতো। কিন্তু কিস্স্যু ফল হতো না। আমি সব কিছুর মধ্য দিয়ে ঘুমুতে পারতাম। প্রায় সব কিছু। তারপর একদিন সেই সকাল এলো, যখন চোখ খুলেই আমি আমার উপর নিয়তির করস্পর্শ অনুভব করলাম। আমি উপলব্ধি করলাম যে এবার সময় হয়েছে। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম. স্যুটকেস গুছিয়ে নিলাম, তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম আর ফিরে যাই নি। ওই কেতাদুরস্ত ঝকঝকে এ্যাপার্টমেন্টে আর ফিরে যাই নি কোনদিন, ফিরে যাই নি লয়ের কাছে, যে ছিলো রূপসী আর যার সঙ্গে আমার ছিলো নিখুঁত যৌন সমঝোতা।

ওর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি, কিন্তু এখন ওকে কেমন দেখাচ্ছে তা আমি জানি। একটা বিশেষ ধারায় সে জীবন যাপন করেছে, প্রচুর সুরা পান করেছে, মিষ্টি খেয়েছে, অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছে। প্রায় চল্লিশটি বছর তার গোলাপের মতো গাল, পরিপক্ক কিন্তু সতেজ শুভ্র বুক, নমনীয় ক'টিদেশ, নিবিড়, কালো, মখমল-তরল চোখ, মৌমাছি-দংশিত ঠোঁট আর পরম বিলাসী উরুযুগলের উপর তাদের কাজ করে গেছে। এখন সে কোথাও একটা ডিভানের উপর বসে আছে, নিপুণ মালিশওয়ালীর সবল তৎপরতা আর পোশাকের ভেতরে ল্যাসটেক্সের ব্যান্ড দিয়ে সারা শরীর মমীর মতো গোপনে পেঁচিয়ে রাখার ফলে তার গঠন-কাঠামো সে এখনো অনেকখানি ধরে রেখেছে, কিন্তু দীর্ঘ পরিতৃপ্ত নিশ্বাসের সঙ্গে যে সমগ্র বিশ্ব সে লোভীর মতো বিপুল পরিমাণে শুষে নিয়েছে এত দিন, তার পরিণতিতে সে এখন

স্ফীত। সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটা রূপোর ডিশ থেকে চকোলেট তুলে নিচ্ছে। তীক্ষ্ণ নখগুলি টকটকে লাল, যেন সে এইমাত্র দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটা জ্যান্ত মুরগীকে ওই নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। চকোলেটটা এখনো মাঝ-আকাশে ধরা, ওর নিচের ঠোঁট ফাঁক করা, লিপস্টিকের সূক্ষ্ম ছোট ছোট রক্তিম দাগের ওপাশে তার মুখগহ্বরের একটু কম লালচে প্রত্যাশী ঝিল্লীগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আর ওই উষ্ণ রক্তের মধ্যে ঝিলমিল করছে সোনা বাঁধানো দাঁত।

বিদায়, লয়। আমি তোমার প্রতি যা কিছু করেছি তার সব কিছুর জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

ইতোমধ্যে এ্যান স্ট্যান্টন যে-পথে এগিয়ে গিয়েছিলো তার কাহিনী ছোট্ট। ভার্জিনিয়ার বিশেষ মার্জিত মহিলা কলেজটিতে দু'বছর পড়াশোনা করার পর সে বাড়িতে ফিরে এসেছিলো। এ্যাডাম তখন পূর্বাঞ্চলের এক মেডিক্যাল স্কুলে পড়ছে। এ্যান শহরের বিভিন্ন পার্টিতে যোগ দিয়ে এক বছর কাটালো, তারপর তার বাগ্দান হলো একজনের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে আর হলো না। ভদ্রলোক ছিলেন বেশ উপযুক্ত, বুদ্ধিমান, সমৃদ্ধশালী। তবু। কিছু দিন পর আবার আরেক জনের সঙ্গে তার বাগ্দান অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু এবারও কিছু একটা ঘটে। ইতোমধ্যে গভর্নর স্ট্যান্টন রুগ্ন ও প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলেন। এ্যাডাম তখন দেশের বাইরে পড়াশোনা করছে। এ্যান পার্টিতে যাওয়া ছেড়ে দিলো। শুধু গরমের সময় মাঝে মাঝে ল্যান্ডিং-এর দু'একটা পার্টিতে যোগ দিতো। সে বাবার সঙ্গে বাড়িতে থাকতো, তাঁকে ওষুধ খাওয়াতো, তাঁর বালিশ চাপড়ে ঠিকঠাক করে দিতো, নার্সকে টুকটাক সাহায্য করতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁকে বই পড়ে শোনাতো, গ্রীষ্মের গোধূলিতে কিংবা শীতের রাতে সমুদ্রের দিক থেকে ছুটে আসা উদ্দাম হাওয়ায় যখন গোটা বাড়ি কাঁপতো তখন বাবার হাত ধরে থাকতো। তাঁর মৃত্যু হতে সাত বছর লেগেছিলো। দামী, প্রতিভাবান একগাদা চিকিৎসক পরিবৃত হয়ে গভর্নর স্ট্যান্টন তাঁর বিশাল খাটে শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাবার মৃত্যুর পর এ্যান সমুদ্রের দিকে মুখ করা ওই বাড়িতেই বাস করতে থাকে। তার একমাত্র সঙ্গী ছিলো আন্ট সোফোনিসবা, এক দুর্বল, সর্বক্ষণ খুঁত খুঁত করা, বাচাল, অদক্ষ বৃদ্ধা নিগ্রো। তার মধ্যে ঘটেছিলো সহৃদয় মহানুভবতা এবং প্রতিশোধমূলক নির্যাতনের এক অদ্ভুত অস্পষ্ট মিশ্রণ। যেসব বৃদ্ধ নিগ্রো রমণী সারা জীবন একটা স্নেহময় পরিবেশে পরিচারিকার কাজ করেছে, লুকিয়ে লুকিয়ে নানা জিনিস দেখেছে, মিনতি করে নানা জিনিস আদায় করে নিয়েছে, চুরি-চামারি করেছে, ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহ আর দীর্ঘস্থায়ী শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, গৃহকর্ত্রীর পরিত্যক্ত জামাকাপড় পরেছে,

শুধু তাদের মধ্যেই ওরকম মিশ্রণ দেখা যায়। তারপর একদিন আন্ট সোফোনিসবাও মরে গেলো, আর এ্যাডাম বিদেশ থেকে ফিরে এলো একগাদা ডিগ্রী আর নিজের কাজের প্রতি সর্বপ্লাবী একনিষ্ঠ আনুগত্য নিয়ে। সে ফিরে আসার অল্পদিন পরেই তার কাছে থাকার উদ্দেশ্যে এ্যান শহরে চলে আসে। ওর বয়স তখন ত্রিশ।

শহরে একটা ছোট এ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে সে একা থাকতো। কখনো কখনো তার ছেলেবেলার কোনো বান্ধবীর সঙ্গে এক সাথে লাঞ্চ খেতো, যে-বান্ধবী এখন অন্য ভুবনের বাসিন্দা। কখনো কখনো কোনো পরিচিত মহিলার বাড়িতে কিংবা কান্ট্রি ক্লাবের পার্টিতে যেতো। তৃতীয় বারের মতো একজনের সঙ্গে তার আরেকবার বাগ্‌দানও হয়। ভদ্রলোক ছিলেন ওর চাইতে সতেরো-আঠারো বছরের বড়ো, বিপত্নীক, কয়েকটি সন্তানের পিতা , বিত্তশালী আইনজীবী, সমাজের একটি স্তম্ভ। ভালো লোক ছিলেন তিনি। তখনো সবল ও বলিষ্ঠ, বেশ সুপুরুষ। কৌতুকবোধও ছিলো তাঁর। কিন্তু এ্যান শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিয়ে করে নি। তারপর যতো বছর পেরিয়ে যেতে লাগলো ততোই সে নিজেকে পড়াশোনার মধ্যে ডুবিয়ে দিলো, বিক্ষিপ্তভাবে, কখনো জীবনীগ্রন্থ (ড্যানিয়েল বুন অথবা মেরী এ্যান্টয়নেট), কখনো যাকে বলা হয় ভালো কথাসাহিত্য, কখনো সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক গ্রন্থাবলী — আর সে কাজ করতে শুরু করলো, বিনা বেতনে, একটি বসতি সংস্থায় ও একটি অনাথ সদনে। সে তার চেহারা-শ্রী চমৎকার রেখেছিলো, পোশাক-আশাক সম্পর্কেও ছিলো মনোযোগী, যদিও কিছুটা কঠোরভাবে। তবে এখন মাঝে মাঝে তার হাস্যধ্বনি শোনাতো একটু ফাঁপা এবং ভঙ্গুর, এ হাসি যেন আনন্দ অথবা প্রাণোচ্ছলতার ফসল নয়, বরং স্নায়ু-উৎসারিত। এখন মাঝে মাঝে সে কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলে চুপ করে আত্মমগ্ন হয়ে পড়তো, তারপর বিব্রত হয়ে, অনুচ্চারিত তিরস্কার শুনে চমকে উঠতো। মাঝে মাঝে তার দুটি হাত উঠে যেতো তার ভ্রূযুগলের কাছে, দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে সে আলতোভাবে তার ত্বক স্পর্শ করতো কিংবা চুল একটু পেছনে ঠেলে দিতো, একটা সূক্ষ্ম কোমল বিভ্রান্তির চিহ্ন ফুটে উঠতো ওই ভঙ্গির মধ্যে। ওর বয়স পঁয়ত্রিশ হতে চলেছে। কিন্তু তখনো তার সঙ্গ আনন্দদায়ক, তৃপ্তিকর।

এই এ্যান স্ট্যান্টনকেই উইলি স্টার্ক তুলে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যে-এ্যান স্ট্যান্টন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ঠিক আমার সঙ্গে নয়, আমার একটা ধারণার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ওই ধারণাটি যে আমার কাছে কতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলো আমি আগে কখনো তা উপলব্ধি করি নি।

আর সেজন্যই আমি আমার গাড়িতে উঠে বসে পশ্চিম দিকে বেরিয়ে

পড়েছিলাম। কারণ যখন আপনার আর কিছুই ভালো লাগে না তখনই আপনি পশ্চিম অভিমুখে ছুটে যান। আমরা সর্বদা পশ্চিমেই গিয়েছি।

আর সেজন্যই আমি পশ্চিমে ডুবে গিয়েছিলাম এবং একটি পারিবারিক চলচ্চিত্রের মতো আবার নতুন করে যাপন করেছিলাম আমার জীবন।

আর সেজন্যই আমি এখন সর্বশেষ উপকূলে প্রকৃতির ঐশ্বর্যের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচের একটি হোটেলকক্ষে একটি শয্যায় শুয়ে আছি। কারণ সাতসমুদ্দুর পাড়ি দেবার পর, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ইঁদুরের খাঁচায় চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত বন্দী অবস্থায় বাসি বিস্কুট খাবার পর, সবুজ অরণ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করার এবং অসভ্য বুনোদের হুঙ্কার শোনার পর, কাঠের বাড়ি, নগর–বন্দর আর নদীর উপর সেতু নির্মাণের পর, রমণীদের সঙ্গে সহবাস এবং ঝোড়ো হাওয়ায় যবের বীজ ছড়িয়ে দেবার মতো যত্রতত্র সন্তান ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার পর, উদাত্ত দলিল আর যাবতীয় ঘোষণা রচনা করার পর, মহান বক্তৃতা ভাষণের পর, কনুই অবধি দু'হাতে রক্ত মাখানোর পর, জলাভূমিতে আর সুউচ্চ প্রান্তরের উপর দিয়ে ভেসে আসা বরফ–শীতল বাতাসে ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপুনির পর আপনি যেখানে আসেন তা হচ্ছে এই স্থান। আপনি এইখানে আসেন, ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচের একটি হোটেলকক্ষের একটি শয্যায় একাকী শুয়ে থাকার জন্য। যেখানে আমি এখন শুয়ে আছি, আর আমার জানালার বাইরে নিওন আলোর চিহ্ন আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে, সিস্টোল আর ডায়াস্টোলের সঙ্গে, তাল মিলিয়ে ক্রমাগত জ্বলছে আর নিভছে, বারবার ধূসর সামুদ্রিক কুয়াশার উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে রক্তের মতো লাল একটা আভা।

পশ্চিমে নিমজ্জিত হবার পর আমি চুপ করে শুয়েছিলাম। আমার দেহ ভাসতে ভাসতে ইতিহাসের সমুদ্র–তলদেশে গিয়ে ঠেকেছিলো। আমি সেখানে দুঃখসন্তাপহারী মহত নিঃসরণের মধ্যে স্থির হয়ে পড়েছিলাম। ওখানে শুয়ে শুয়ে আমার মনে হয়েছিলো আমি বুঝি আমার নিজের ইতিহাসের একটা সুন্দর পরিপ্রেক্ষিত পেয়ে গেছি। আমি বহুকাল আগের সেই গ্রীষ্মে দেখা তরুণীকে দেখলাম। আমি দেখলাম যে সে সুন্দরী কিংবা তেমন আকর্ষণীয় কিছু ছিলো না, শুধু তার মুখ ছিলো মসৃণ আর সে ছিলো স্বাস্থ্যবতী, আর আমি তার বুকে মাথা গুঁজে দেবার পর যদিও সে জ্যাকি পাখিমণিকে গুনগুন করে গান শুনিয়েছিলো, তবু সে তাকে ভালোবাসে নি, ব্যাপারটা ছিলো তার রক্তের মধ্যে একটা রহস্যময় চুলকানি মাত্র, আর জ্যাক ছিলো হাতের কাছে। ভালোবাসা শব্দটি ছিলো ওই রহস্যময় চুলকানিরই অন্য একটি শব্দরূপ। সে ওই রহস্যময় চুলকানি দ্বারা পীড়িত হয়েছে,

তার মনের তাড়না আর ভয় এই দু'য়ের টানাপোড়েনে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আমার কাছে তার ধরা না দেয়া ও তার তাবৎ দ্বিধা ও সঙ্কোচের পেছনে ভালোবাসাকে অর্থময় করে তোলার কোনো স্বপ্ন অথবা আমাকে সেই স্বপ্নের অর্থ বোঝানোর ইচ্ছা বিন্দুমাত্র কাজ করে নি, তার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিলো তার কতিপয় ভয়-ভীতি, যেসব ভয়-ভীতি তার শৈশবেই রূপকথার দাই-মা'দের মতো গতানুগতিক সমাজের কতিপয় রসকষহীন বুড়ী তার দোলনার উপর ঝুঁকে পড়ে হিসহিস শব্দ করে তার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। আর তার ওই সময়ের ধরা না দেওয়া এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব উত্তপ্ত আবেগঘন আত্মসম্পর্ণের চাইতে ভালোও ছিলো না, মন্দও ছিলো না, লয় তার ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতো এ্যানের ধরা না দেওয়াও তার চাইতে বেশি কিছু ভালো বা মন্দ ছিলো না। শেষ পর্যন্ত লয় সীগারের কাছ থেকে এ্যান স্ট্যান্টনকে পৃথক করে চেনার কোনো উপায় ছিলো না, কারণ তারা উভয়েই ছিলো এক রকম, এবং যদিও উন্মাদ কবি উইলিয়াম ব্লেক তাঁর একটি কবিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে, এই পৃথিবীর রাজাকে, বলেছিলেন যে কেট্‌কে ন্যানে রূপান্তরিত করার সাধ্য তাঁর নেই, তবু কবিই ভুল করেছিলেন, কারণ যে-কেউ কেট্‌কে ন্যানে রূপান্তরিত করতে পারতো, আর রাজা যদি ওই রূপান্তরসাধনে সক্ষম না হতেন তাহলে তার কারণ শুধু এই যে কেট্ আর ন্যান ছিলো গোড়াতেই হুবহু এক রকম, বস্তুতঃপক্ষে একই, শুধু তাদের নামের মধ্যে ছিলো একটা অলীক ভিন্নতা, যেটা সম্পূর্ণ অর্থহীন, কারণ নাম আর আমরা যেসব শব্দ উচ্চারণ করি তার কোনো মানে নেই, শুধু একটা জিনিসই অর্থবহ, রক্তের মধ্যে তরঙ্গের দোলা, স্নায়ুর মধ্যে আকস্মিক একটা টান, গবেষণার সময় মরা ব্যাঙের গায়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলে তার পা যেমন তিড়িক মেরে ওঠে সেই রকম। তো আমি যখন লংবীচে ওই খাটে শুয়ে চোখ বন্ধ করেছিলাম তখন আমার মনে হলো আমি যেন ভেতরকার অন্ধকারের মধ্যে একটা বিশাল পঙ্কভূমি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে অসংখ্য দেহ দুমড়াচ্ছে, মুচড়াচ্ছে, হাঁফাচ্ছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ঘামছে, অন্তহীন ক্ষত থেকে বোধহয় রক্তও ঝরছে। আমি শুধু চোখ বন্ধ করেই এই দৃশ্যকে আমার সামনে তুলে আনতে পারতাম। শেষে এই দৃশ্য আমার কাছে মনে হলো ভারী হাস্যকর। তখন আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম।

আমি শব্দ করে হেসে উঠে কিছুক্ষণের জন্য নিওন চিহ্নের আলোর সামুদ্রিক কুয়াশার ছন্দোময় ভেসে যাওয়া লক্ষ করলাম, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙলো তখন যে জায়গা আর যেসব জিনিসের কাছ থেকে এখানে চলে এসেছিলাম আবার সেখানে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হলাম।

বহু বছর আগে আমার ঘরের লোহার খাটে একটি তরুণী নিরাভরণ দেহে দু'চোখ বন্ধ করে বুকের উপর হাত জড়ো করে শুয়েছিলো, আর আমি তার সমর্পণের ভঙ্গি, আমার উপর তার আস্থা, আর যে-মুহূর্তটি তাকে পৃথিবীর অপরিপূর্ণ অন্ধকার স্রোতস্বিনীর মধ্যে এখনই নিমজ্জিত করবে তার করুণ রূপ প্রত্যক্ষ করে এতোই অভিভূত হয়ে যাই যে আমি তাকে ছুঁতে পারি নি, এবং নিজেকে কিছুমাত্র না বুঝেই আমি তখন তার নাম ধরে ডেকে উঠি। ওই মুহূর্তে আমার অনুভূতিকে ভাষা দেবার মতো শব্দ আমি খুঁজে পাই নি, আর আজ এখনও, তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ওখানে শুয়ে থাকা অবস্থায়, আমার মনে হয়েছিলো সে যেন সেই পিকনিকের দিনের ছোট্ট মেয়েটি, ঝোড়ো, লাল আঙ্গুরের মতো আকাশের নিচে উপসাগরের জলে চিৎ হয়ে চোখ বন্ধ করে ভাসছে, অনেক উঁচু দিয়ে একটিমাত্র সাদা গাংচিল উড়ে যাচ্ছে। সে খাটে শুয়েছিলো, আর আমার মাথায় ওই ছবিটি জেগে ওঠে, আমি তখন নাম ধরে তাকে ডাকতে চেয়েছিলাম, তাকে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলাম — কি, তা আমি জানি না। ও আমাকে বিশ্বাস করেছিলো, কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বের ওই মুহূর্তটিতে আমিই হয়তো নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি নি, এবং আমি অতীতকে মনে করেছিলাম মূল্যবান একটা কিছু, যা আমাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইছে, আর আমি ভয় পেয়েছিলাম ভবিষ্যতকে। আজ আমি যা বুঝতে পারছি তখন তা বুঝতে পারি নি ঃ যে আমরা ভবিষ্যতকে গ্রহণ করেই শুধু অতীতকে ধরে রাখতে পারি, কারণ তারা চিরকালের জন্য এক সূত্রে বাঁধা। অতএব এই পৃথিবী এবং আমার নিজের উপর কিছু অত্যাবশ্যক আস্থার অভাব ছিলো। সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এ্যান আমার সম্পর্কে এই বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠে। সে নিজের কাছে একথা ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছিলো কিনা আমার জানা নেই। মানুষ তাকে যে সহজ শব্দাবলী দিয়েছিলো সে হয়তো তাই ব্যবহার করেছিলো ঃ একটা চাকুরি চাই, আইন পড়া চাই, কিছু একটা করা চাই।

আমরা দুজন দু'পথে চলে যাই সেকথা বলেছি। কিন্তু ঝোড়ো আকাশের নিচে, উপসাগরের জলে ভাসমান, নিষ্পাপ সারল্য ও বিশ্বাসে পূর্ণ, ছোট্ট মেয়েটির ওই ছবি আমি সব সময় আমার সঙ্গে নিয়ে চলেছিলাম। তারপর একটা দিন এলো যখন সেই ছবি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি জানতে পারলাম যে এ্যান স্ট্যান্টন উইলি স্টার্কের উপপত্নী হয়েছে। এবং আমার মনে হলো একটা দুর্বোধ্য এবং অপরিহার্য যুক্তির ধারা অনুসরণ করে আমি নিজেই এ্যানকে উইলির হাতে তুলে দিয়েছি। এই ভয়ঙ্কর সত্যটির মুখোমুখি আমি হতে পারি নি, কারণ আমার

অতীতের ভেতর থেকে যে জিনিসটির উপর নির্ভর করে আমি আমার নিজের অজান্তেই এই মুহূর্ত অবধি বেঁচে ছিলাম ওই সত্য আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

তাই আমি সত্য থেকে পালিয়ে যাই পশ্চিমে, ইতিহাসের শেষ প্রান্তে, সর্বশেষ উপকূলে সর্বশেষ মানুষ, সেখানে আমার খাটে শুয়ে আমি স্বপ্নটি আবিষ্কার করে ফেলি। সে স্বপ্ন হলো এই স্বপ্ন যে, সকল জীবনই রক্তের অন্ধকার তরঙ্গদোলা এবং স্নায়ুর আকস্মিক টান ছাড়া আর কিছুই নয়। যতোদূর পালানো সম্ভব ততোদূর পালাবার পর আপনি সর্বদা এই স্বপ্নই খুঁজে পাবেন, যা হলো আমাদের যুগের স্বপ্ন। প্রথমে এটা মনে হয়েছিলো দুঃস্বপ্ন, ভয়াবহ, কিন্তু পরে দেখলাম যে, না, এটা বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ, শক্তিদায়ক। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য আমার ক্ষেত্রে তাই হয়। স্বাস্থ্যপ্রদ এই জন্য যে এও স্বপ্নের পর আমি অনুভব করলাম, একদিক থেকে, এ্যান স্ট্যান্টনের আর অস্তিত্ব নেই। এ্যান স্ট্যান্টন শুধু এক বিশেষ ধরনের জটিল যন্ত্রের নাম, জ্যাক বার্ডেনের কাছে তার কোনো অর্থ থাকার প্রয়োজন নেই, যে-জ্যাক বার্ডেন নিজেই অন্য একটি জটিল যন্ত্রমাত্র। ওই সময়, যখন আমি জগত ও জীবন সম্পর্কে এই দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করি, যথার্থই আবিষ্কার করি, আমার নিজস্ব প্রক্রিয়ায়, কোনো বইপুঁথি পড়ে নয়, তখন আমার মনে হয়েছিলো আমি বুঝি সকল শক্তি ও সহিষ্ণুতার গোপন উৎস আবিষ্কার করে ফেলেছি। ওই স্বপ্ন সব সমস্যার সমাধান করে দেয়।

প্রথম দিকে, যেমন বলেছি, তা ছিলো বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ ও শক্তিদায়ক। কারণ ওই স্বপ্নের পর যে ব্যাপারটা থেকে আমি পালিয়ে এসেছি আবার সেখানে ফিরে গিয়ে তার মুখোমুখি হওয়ার স্বপক্ষে তো কোনো যুক্তি নেই (যদি মনেও হয় যে আমিই অতীত খুঁড়ে খুঁড়ে সেটা তুলে এনে তার মাধ্যমে এ্যান স্ট্যান্টনকে উইলি স্টার্কের হাতে উঠিয়ে দিয়েছি, তবুও)। কারণ যেখানেই আমি এখন পালিয়ে যাই না কেন তাকে মনে হবে যে জায়গা থেকে আমি পালিয়ে এসেছি ঠিক সেই জায়গার মতো, কাজেই আবার ফিরেই যেতে পারি আমি, ফিরে যেতে পারি সেই জায়গায় যা আসলে আমার নিজের জায়গা, কারণ আমার দোষ তো কিছুই নেই, কারোই কোনো দোষ নেই, কারণ সব সময়ই যা ঘটবার তা ঘটেই। আর প্রফুল্ল চিত্ত নিয়েই ফিরে যাওয়া যায়, কারণ ইতোমধ্যে দুটি খুব বড়ো সত্য শেখা হয়ে গেছে। এক, যা কখনো পাওয়াই যায় নি তা হারানো যায় না। দুই, যে-অপরাধ করাই হয় নি সে

অপরাধের দায়ে দোষীও হওয়া যায় না। অতএব, শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, পশ্চিমে সত্যিই আছে নিষ্পাপ সারল্য ও নতুন যাত্রাবিন্দু।

যদি সেখানে যাবার পর যে-স্বপ্ন আপনি দেখেন সেই স্বপ্ন আপনি বিশ্বাস করেন।

## অষ্টম অধ্যায়

তো, ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচে একটা বিছানায় শুয়ে থাকার পর, যা আমি দেখেছি তা দেখার পর, অনেকখানি সতেজ ও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে বসলাম, তারপর আমার মুখের উপর সকালের সূর্য নিয়ে ফিরে চললাম। ওই সূর্য আমার দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলো সাদা কিংবা গোলাপী কিংবা শিশু–নীল রঙের বাংলোগুলির ছায়া (স্প্যানিশ মিশন, মুর ঐতিহ্যের, কিংবা মার্কিনী ধাঁচের), রূপকথার জগতের রুটি দিয়ে তৈরি বাড়ি কিংবা এ্যান হ্যাথাওয়েয়ের কুটীর কিংবা এস্কিমোদের ইগলুর মতো দেখতে পেট্রল স্টেশনগুলির ছায়া, উদ্ধত ইউক্যালিপটাসের সারির আড়ালে দাঁড়ানো পাহাড়ের উপর ঝলমল করা প্রাসাদগুলির ছায়া, সিংহের মতো গুঁড়ি মেরে বসে থাকা পাহাড়গুলির ছায়া, এক নির্জন সাইডিং–এ ফেলে রাখা বিস্মৃত এক বক্সকারের ছায়া, আর দূরে স্ফটিকের মতো ঝকঝকে সাদা পথ ধরে আমার দিকে অগ্রসরমান একটি মানুষের ছায়া। সূর্য আমার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো গোটা পৃথিবীর অপরূপ গাঢ় লাল ছায়া, কিন্তু আমি তীব্র বেগে এগিয়ে যেতে থাকি, কারণ একবার সত্যি সত্যি আপনি যদি ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচে গিয়ে থাকেন, হোটেলকক্ষের বিছানায় শুয়ে শুয়ে যদি আপনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তাহলে যেখান থেকেই আসেন না কেন সেখানে নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরে না যাবার আপনার আর কোনো কারণ থাকে না, কারণ এখন আপনি জেনেছেন, এবং জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি।

আপনি এখন আপনার থ্রট্‌ল্ একেবারে মেঝে পর্যন্ত চেপে ধরতে পারেন, ষাট অশ্বশক্তির রহস্যময় যন্ত্রটিকে শেকল ছিঁড়ে এগিয়ে যেতে চাওয়া নেকড়ে–কুকুরের মতো গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটিয়ে দিতে পারেন।

আমার দিকে হেঁটে এগিয়ে আসা লোকটিকে অতিক্রম করে গেলাম, আর আমার পাশ দিয়ে তার মুখকে হুশ্ করে উড়ে যেতে দেখলাম, ঝড়ে পড়া এক টুকরো কাগজ কিংবা আমাদের শৈশবের আশাগুলির মতো। আর আমি হেসে উঠলাম শব্দ করে।

মরুভূমির মধ্যে ছোট শহরগুলির চত্বরে আমি লোকজনকে হাঁটাহাঁটি করতে দেখলাম। একটা রেস্তোরাঁয় জনৈক খাবার পরিবেশনকারিণীকে দেখলাম, দুর্বল ভঙ্গিতে মাছি তাড়াচ্ছে, বাতাস এতো হাল্কা আর এতো গরম যেন আগুনের চুল্লী থেকে বেরুচ্ছে, বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে কিন্তু কিছুই লাভ হচ্ছে না তাতে। হোটেলে ঢুকে আমার ঠিক সামনেই আমি দেখলাম একজন ভ্রাম্যমান সেলসম্যানকে, সে ডেস্কের লোকটিকে বলছে, এই যে, এটাকে আপনারা হোটেল বলেন! স্নানের ব্যবস্থাসহ একটা ঘরের জন্য আমি তার করেছিলাম, অথচ আপনারা কোনো বন্দোবস্ত করেন নি। অবশ্য এই রকম ওঁচা জায়গায় যে স্নানের ব্যবস্থাসহ আপনাদের ঘর আছে সেটাই একটা অবাক কাণ্ড। আমি বিশাল প্রান্তরে একাকী এক মেষপালককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। দেখলাম একটি রেড ইন্ডিয়ান রমণীকে, একগাদা চিত্রিত মাটির পাত্র সামনে নিয়ে বসে আছে, তাদের গায়ে জীবন আর উর্বরতার উপজাতীয় প্রতীক আঁকা, নিঃসন্দেহে পাঁচ–আর দশ সেন্টের শস্তা দোকানগুলির জন্য বানিয়েছে, রমণী তার উজ্জ্বল কালো দু'চোখ মেলে আমাকে দেখলো। আর এই সব মানুষ দেখতে দেখতে আমি আমার গোপন জ্ঞানের ভেতরে অনুভব করলাম প্রচণ্ড শক্তি।

আমার বহু কাল আগের কথা মনে পড়লো। উইলি স্টার্ক তখন সাজানো মানুষ, চাতুরি করে তাকে বোকা বানানো হচ্ছে, তখন সে প্রথমবার গভর্নরের জন্য দাঁড়িয়েছিলো। আমি স্টেটের অখ্যাত অবজ্ঞাত পশ্চিমাঞ্চলে যাই, আপটনে অনুষ্ঠিত বক্তৃতা–ভাষণ আর বারবেকিউর খবর সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য। লোকাল ট্রেনে করে গিয়েছিলাম। তুলোর ক্ষেত আর বুনো ঘাসভর্তি প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গাড়ি ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছিলো। ছোট্ট একটা শহরে একবার গাড়ি থামার পর জানালা দিয়ে দেখেছিলাম ছোট ছোট কাঠের বাড়িগুলির চারপাশে কাঠ কিংবা তার দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে। ওই দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় যে এই সব বেড়া খুবই অকিঞ্চিৎকর। বাইরের বুনোঘাসভরা বৈরী প্রান্তর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে বাড়িগুলি গিলে ফেলবে, ওই বেড়া তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমার মনে হয়েছিলো এটা যেন বাড়িগুলির স্থায়ী জায়গা নয়, ক্ষণকালের জন্য এখানে তোলা হয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে বাসিন্দারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, বাইরের দড়িতে শুকুতে দেয়া কাপড় তখনো ঝুলতে থাকবে, কারণ লোকজন যখন বুঝবে যে এখান থেকে তাদের পালাতে হবে, এবং দ্রুত, তখন আর কাপড় তুলে নেবার সময় পাওয়া যাবে না। ওই রকমই মনে হয়েছিলো আমার, কিন্তু ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলতে শুরু করার মুহূর্তে আমি দেখলাম খুব কাছের একটা বাড়ি থেকে পেছনের

দরজা দিয়ে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন, হাতে একটা পাত্র, সেই পাত্র থেকে তিনি ছুঁড়ে জল ফেলে দিলেন, তারপর চলন্ত ট্রেনের দিকে এক নজর তাকিয়ে আবার অচঞ্চল পায়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। না, এই মহিলা পালিয়ে যাবেন না। তিনি বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছেন, যেখানে লুকানো আছে গোপন একটা কিছু, একটা জ্ঞান। ধাবমান ট্রেনে বসে আমার মনে হয়েছিলো যে আমিই পালিয়ে যাচ্ছি, এবং দ্রুত পালানোই মঙ্গল, কারণ শিগ্গীরই আঁধার ঘনিয়ে আসবে। ওই মহিলা একটা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে আমার মনে হয়েছিলো, আর আমি তাকে ঈর্ষা করতে শুরু করি। আমি প্রায়ই বহু মানুষকে ঈর্ষা করেছি। তাদের কাউকে কাউকে দেখেছি খুব অল্প সময়ের জন্য, কেউ কেউ আমার দীর্ঘকালের চেনা, একজনকে দেখেছিলাম কোনো এক এপ্রিলে। কালো ক্ষেতের মধ্যে তার লাঙল একটা দীর্ঘ সরল রেখা তৈরি করে এগিয়ে চলেছিলো, কিংবা আমার ঈর্ষার পাত্র সেই মানুষটি ছিলো এ্যাডাম স্ট্যান্টন। যেসব মানুষকে আমার মনে হয়েছিলো কোনো গোপন শক্তির অধিকারী আমি কোনো না কোন সময়ে তাদের নিশ্চিত ঈর্ষা করেছি।

কিন্তু এখন, মরুভূমির ওপর দিয়ে, পাহাড়ের ছায়ার তলা দিয়ে, প্রান্তর আর মালভূমির মধ্য দিয়ে এই অপূর্ব শূন্য অঞ্চলের মানুষদের দেখতে দেখতে ছুটে যাবার সময় আমার মনে হলো যে আর কোনো দিন কাউকে আমার ঈর্ষা করার দরকার হবে না, কারণ আমিও এখন গোপন জ্ঞানের অধিকারী, আর জ্ঞানের অধিকারী হলে মানুষ যে কোনো জিনিসের মুখোমুখি হতে পারে, কারণ জ্ঞানই হলো শক্তি।

নিউ মেক্সিকোর ডন জন নামের একটি বসতি অঞ্চলে আমার একটি লোকের সঙ্গে কথা হয়। সে পেট্রল স্টেশনের ছায়ার দিকটায় হেলান দিয়ে বসে ছিলো। পুবে একশো মাইলের মধ্যে ওই একটা জায়গাতেই একটু ছায়া ছিলো। বুড়ো মানুষ, বয়স কম করে হলেও পঁচাত্তর হবে। মুখের চেহারা রোদজ্বলা চামড়ার মতো, চোখ হাল্কা-নীল, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, যার রঙ এক সময় কালো ছিলো। রোদজ্বলা চামড়ার মতো মুখটা ছিলো ঋজু, শক্ত, প্রাণরস বিবর্জিত, মমীর চোয়ালের চামড়ার মতো, কিন্তু ওই মুখে একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস ছিলো। বাঁ গালের দিকে হঠাৎ একটা জায়গা নড়ে টান টান হয়ে উঠতো, যেন তার হাল্কা-নীল চোখের দিকে একটা কুঞ্চন উঠে যাচ্ছে। মনে হবে সে বুঝি এখনই আপনার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপবে, কিন্তু না, তা নয়। তার মুখের সঙ্গে কিংবা মুখের পেছনে যা আছে তার সঙ্গে, কিংবা বিশ্বের যতো উপাদান আছে যার মধ্যে আমরা ডুবে আছি তার কোনো কিছুর সঙ্গে ওই কুঞ্চনের সম্পর্ক নেই, ওটা একেবারেই স্বয়ন্তর একটা ব্যাপার। ওই মুখে নিজস্ব একটা ক্ষুদ্র প্রাণশক্তির বলে জীবন্ত সেই আকস্মিক কুঞ্চন ছিলো একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য

ব্যাপার। লোকটি ছেঁড়া কাপড়চোপড়ের একটা পুঁটুলির উপর বসে ছিলো, পুঁটুলির মধ্য থেকে টিনের পাত্রের হাতল বেরিয়ে এসেছিলো, আমি তার পাশে মাটিতে বসে তার কথা শুনছিলাম। কিন্তু সে-কথায় কোনো প্রাণ ছিলো না, প্রাণ ছিলো তার মুখের কুঞ্চনের মধ্যে, যে-সম্পর্কে সে এখন আর সচেতন নয়।

গাড়ির ট্যাঙ্ক ভর্তি করে আমি আবার ছুটতে শুরু করি পুবের দিকে। আমার পাশে বসে আছে সেই বুড়ো। রাস্তার উপর থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে আমি তার ওই কুঞ্চন লক্ষ করতে থাকি। সেও পুবে যাচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে। যে-সময়ের কথা বলছি সে-সময় ধূলিঝড় প্রায় অর্ধেক দেশকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো আর লোকজন তখন পাগলের মতো দলে দলে ছুটেছিলো পশ্চিম অভিমুখে, উত্তেজিত দিশেহারা লেমিংকুলের মতো। শুধু পশ্চিমে পৌঁছুবার পর লেমিংদের ক্ষেত্রে যে আশ্চর্য উন্মত্ত উল্লাস দেখা যায় তাদের মধ্যে সেটা দেখা যায় নি। তারা পাগল হয়ে হাজারে হাজারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে সুনীল প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে ছুটে যায় নি। ওটা করাই তাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হতো, সোজা সাঁতার কাটতে শুরু করা, বাবা আর মা, ঠাকুর্দা আর ঠাকুরমা, আর চিবুকে পুরনো ঘা নিয়ে শিশু রোসবাড, কাচ্চাবাচ্চাসহ দলবল নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত পাঁ ছুড়ে ফেনা তুলে সবারই ছুটতে হতো মাঝ-সমুদ্রের দিকে। কিন্তু, না, তারা লেমিং-এর মতো নয়, তারা শুধু বসে থাকলো, আর ধীরে ধীরে ক্যালিফোর্নিয়াতে উপোস করে মরলো। কিন্তু ওই বুড়োর ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। সে উত্তর আরকানসতে ফিরে যাচ্ছে, যেখান থেকে সে এসেছিলো, সে সেখানে উপোস করে মরবে। আমাকে বললো, ওই ক্যালিফোর্নি, দুনিয়ার বাকী সব জায়গার মতোই, শুধু আরেকটু বেশি-বেশি।

আমি বললাম, একদম ঠিক বলেছো।

বুড়ো জানতে চাইলো, তুমি সেখানটায় গেছো?

আমি জানালাম যে, হ্যাঁ, আমি গিয়েছি সেখানে।

আর এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছো?

আমি ওকে বললাম যে, হ্যাঁ, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

আমরা টেক্সাস পেরিয়ে লুইসিয়ানার শ্রেভপোর্টে পৌঁছুলাম, বুড়ো সেখানে নেমে গেলো, সে এবার উত্তর আরকানস-র পথ ধরবে। ও ক্যালিফোর্নিয়ায় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলো কিনা আমি তাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করি নি। যাই হোক, তার মুখ সেটা পেয়েছিলো, এবং বাঁ চোখের নিচে চূড়ান্ত প্রজ্ঞার চিহ্ন তা ধারণ করে রেখেছিলো। মুখটা জেনেছিলো যে কুঞ্চনই হলো জীবন্ত জিনিস। সেটাই সব। কিন্তু অন্য সবদিক থেকে অনুল্লেখযোগ্য ওই মানুষটির কাছ থেকে বিদায় নেবার পর, যে

বস্তু তাকে উল্লেখযোগ্য করেছে সে বস্তুটির কথা ভাবতে গিয়ে, আমার মনে হলো, যদি কুঞ্চনই সবকিছু হয় তা হলে কুঞ্চন যে সবকিছু এটা জানতে পারছে কোন্ জিনিসটা? গবেষণাগারে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিয়ে দেবার পর কি মৃত ব্যাং-এর পা জেনে ফেলে যে ওই কুঞ্চনই সব? আমি স্থির করলাম যে এটাই তো রহস্য। এটই হলো গুপ্ত জ্ঞান। এই জন্যই আপনাকে ক্যালিফোর্নিয়া যেতে হয়, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে হয় যেন আপনি তা আবিষ্কার করতে পারেন। যেন কুঞ্চনটা জানতে পারে যে কুঞ্চনই সব। তারপর আপনার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সেটা জানার পর আপনার নিজেকে মনে হয় বিশুদ্ধ এবং মুক্ত। মহান কুঞ্চনের সঙ্গে আপনি তখন একাত্ম হয়ে যান।

তো, আমি পুবের দিকে চলতে থাকি এবং অনেক পরে এক সময় বাড়ি এসে পৌঁছি।

আমি যখন ফিরে আসি তখন অনেক রাত। সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি। পর দিন সকালে ভালোভাবে বিশ্রাম নেবার পর, সুন্দর করে দাড়ি কামিয়ে, আমি কর্তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিলো তাঁকে দেখতে, তাঁকে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে, তাঁর চেহারা এবং গড়নে এমন কিছু আছে কিনা যা আগে আমার নজর এড়িয়ে গেছে সেটা আবিষ্কার করতে। খুব ভালো করে তাঁকে দেখতে হবে, কারণ এখন তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর সব কিছু আছে আর আমি হলাম নিঃস্ব। কিন্তু, না, আমি নিজেকে শুধরে নিলাম, তাঁর সবকিছু আছে শুধু একটা জিনিস ছাড়া, যেটা আমার আছে, সেই বড়ো জিনিসটা, ওই গোপন কথাটা। অতএব আমি নিজেকে সংশোধন করে নিলাম, এবং যে-পাদ্রী ঘাম ঝরানো, নিয়ত পরিশ্রমরত, সাধারণ মানুষদের দিকে সহৃদয় করুণামাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকায় সেই পাদ্রীর মনোভাব নিয়ে আমি গভর্নরের দফতরে প্রবেশ করলাম, রিসেপশানিস্টের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম, তারপর দায়সারা গোছের টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

ওই যে তিনি, একটুও বদলান নি।

চোখের সামনে থেকে চুলের গোছা সরিয়ে, টেবিল থেকে পা নামিয়ে, আমার দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, হ্যালো, জ্যাক । কোথায় ডুব দিয়েছিলে তুমি?

করমর্দন করে খুব শিথিল ঘরোয়া ভঙ্গিতে বললাম, পশ্চিমে। এমনিই গাড়ি নিয়ে পশ্চিমে চলে গিয়েছিলাম। এখানে বসে বসে কেমন যেন পচে গিয়েছিলাম, তাই একটু ছুটি উপভোগ করে এলাম ।

তো, কেমন কাটলো সময়? ভালো?

খুব চমৎকার।

তিনি বললেন, খুব ভালো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেমন আছেন?

তিনি বললেন, চমৎকার। সবকিছু চমৎকার চলছে।

অতএব আমি বাড়িতে সেইখানে ফিরে এসেছি যেখানে সবকিছুই চমৎকার। এখান থেকে যাবার আগে যেমন সবকিছু চমৎকার ছিলো এখনও তাই আছে, শুধু এখন আমি গোপন কথাটি জেনে ফেলেছি। আর আমার ওই গুপ্ত জ্ঞানই আমাকে আর সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। গোপন কথাটি জানা থাকলে যার সে-জ্ঞান নেই তার সঙ্গে কিছুতেই আর প্রকৃত যোগাযোগ স্থাপন করা যায় না। ঠুসে ভিটামিন খাওয়ানো একটা বাচ্চা ছেলে, যে সারাক্ষণ তার বাড়ি বানাবার ব্লক কিংবা টিনের ঢোল নিয়ে খেলায় মেতে থাকে, তার সঙ্গে যেমন যোগাযোগ স্থাপন করা যায় না, এ-ও সেই রকম। কোনো একজন লোককে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে আপনি গোপন কথাটা বলতে পারেন না। যদি তাকে, সে পুরুষ হোক কিংবা রমণী হোক, তাকে যদি আপনি সত্য কথাটি শোনাতে চান তাহলে সে ভাববে যে আপনি বুঝি আপনার নিজের জন্য খুব দুঃখ বোধ করছেন, তার সহানুভূতি কামনা করছেন, আসলে আপনি তখন চাইছেন তার অভিনন্দন। অতএব আমি আমার দৈনন্দিন কাজ করে যেতে লাগলাম, নিয়মিত আমার আহার গ্রহণ করলাম, চেনা মুখগুলি দেখলাম, আর পাদ্রীর মতো সহৃদয় সস্নেহ হাসি হাসতে থাকলাম।

তখন জুন মাস। খুব গরম। যেসব রাতে আমি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সিনেমা হলে গিয়ে বসে থাকতাম না, সেসব রাতে আমি খাবার পর নিজের ঘরে চলে যেতাম, তারপর সব কাপড়জামা খুলে সম্পূর্ণ নগ্নদেহে বিছানায় শুয়ে পড়তাম, উপরে বিজলী পাখা ঘুরছে, ঘর্ঘর শব্দ ক'রে কুরে কুরে ঢুকে যাচ্ছে আমার মগজের মধ্যে, শুয়ে শুয়ে কোনো বই পড়তাম আমি, তারপর এক সময় খেয়াল হতো যে নগরীর সব শব্দ প্রায় সম্পূর্ণ থেমে গেছে, দূরে কোথায় হয়তো একটা ট্যাক্সির হর্ণ বাজলো, কিংবা শেষ ট্রামগাড়ি একটিমাত্র ঢং শব্দ করে চলে গেলো। তখন আমি হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়তাম, আর তখনো পাখা চলছে, ঘর্ঘর শব্দ করে কুরে কুরে ঢুকে যাচ্ছে আমার মগজের মধ্যে।

ওই জুনে এ্যাডামের সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়। ও তখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজে আগের চাইতে অনেক বেশি ডুবে গেছে, কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে, বরফের শীতলতা নিয়ে, সে অসম্ভব পরিশ্রম করে চলেছে। টার্ম শেষ হবার ফলে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের চাপ একটু কমেছিলো কিন্তু তার প্রাইভেট প্র্যাকটিস বেড়ে

যাওয়ায় এবং ক্লিনিকের দেখাশোনা করার ফলে ওই ফাঁকটুকু ভরে গিয়ে বরং আরেকটু উপচে পড়েছিলো। আমি যখন ওর এ্যাপার্টমেন্টে যেতাম তখন সে আমাকে বলতো যে আমি আসায় সে খুশি হয়েছে, এবং হয়তো হতোও, কিন্তু আমাকে বলার মতো বেশি কিছু তার ছিলো না। আমি বসে থাকতাম, আর আমার মনে হতো সে যেন নিজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর, শেষে এক সময় আমার মনে হতো আমি যেন একটা কুয়োর ভেতরে পড়ে যাওয়া কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলছি, চিৎকার করে না বললে তাকে কিছুই বোঝাতে পারবো না। শুধু একদিন রাতে তাকে প্রাণবন্ত দেখেছিলাম, যখন ও আমাকে বলেছিলো যে পরদিন সকালে সে একটা বিশেষ অপারেশন করতে যাচ্ছে। আমি ওকে কেস্‌টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি।

ও জানালো যে সেটা একটা ক্যাটাটোনিক শিজোফ্রেনিয়ার কেস্‌।

তুমি বলতে চাইছো যে লোকটা পাগল?

এ্যাডাম হেসে ফেললো, তারপর সায় দিয়ে জানালো যে আমি খুব একটা ভুল বলি নি।

আমি বললাম, পাগলদের যে তোমরা অস্ত্রোপচার করো তা আমার জানা ছিলো না। আমি ভাবতাম তোমরা তাদের খোশমেজাজে রাখতে চেষ্টা করো, ঠাণ্ডা জলে স্নান করাও, ঝুড়ি বানাবার জন্য তাদের হাতে বেত তুলে দাও, আর তোমাদের কাছে তাদের স্বপ্নের কথা তাদের দিয়ে বলিয়ে নাও।

না, তাদের অস্ত্রচিকিৎসা করতে পারো তুমি। তারপর একটু চুপ করে থেকে, প্রায় ক্ষমা চাওয়ার মতো ভঙ্গিতে বললো, প্রিফ্রন্টাল লবেকটমি।

সেটা আবার কি?

মগজের দু'পাশ থেকে সামনের একটু অংশ কেটে ফেলতে হয়।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম লোকটা বাঁচবে কিনা। সে বলেছিলো যে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না, কিন্তু বাঁচলেও সে অন্য রকম হবে।

অন্য রকম মানে?

মানে, তার ব্যক্তিত্ব অন্য রকম হয়ে যাবে।

কনভার্শান বা ব্যাপটাইজ করার পর যেমন হয়?

ও জানালো যে কনভার্শান বা ব্যাপটিজম কাউকে নতুন ব্যক্তিত্ব দেয় না। কনভার্শানের পরও একটা লোকের ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয় না, আগের ব্যক্তিত্বই থেকে যায়। লোকটি তখন কতকগুলি নতুন মূল্যবোধের ভিত্তিতে তার ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করে, এই মাত্র।

কিন্তু এক্ষেত্রে লোকটি একটা ব্যক্তিত্ব অর্জন করবে?

এ্যাডাম বললো, হ্যাঁ। এখন তার কি অবস্থা? সে চুপ করে চেয়ারে বসে বা বিছানায় শুয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার কপালে ভাঁজ, ভ্রূ কোঁচকানো। মাঝে মাঝে নিচু গলায় গোঙায় কিংবা চেঁচিয়ে ওঠে। ওই রকম কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে লোকটা একটা বিভ্রান্তি বা মিথ্যা ঘোরের মধ্যে থাকে, তার ধারণা কেউ তার উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাতে চাইছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই রোগী একটা বিরামহীন, অসাড় করে দেয়া, যন্ত্রণার মধ্যে কাল কাটায়। কিন্তু আমরা তার চিকিৎসা সম্পন্ন করার পর সে অন্যরকম হয়ে যাবে। সে হয়ে উঠবে সহজ, উদ্বেগমুক্ত, হাসিখুশি এবং বন্ধুভাবাপন্ন। তার কপালের ভাঁজ মিলিয়ে যাবে, রাতে ঘুম হবে, ভালো করে খাবে-দাবে, বাড়ির পেছনের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের ফুলের বাগান আর কপি ক্ষেত নিয়ে আলাপ করতে তার ভালো লাগবে। সে সম্পূর্ণ সুখী বোধ করবে।

আমি বললাম, তুমি যদি এই ধরনের নিশ্চয়তা দাও তা হলে তো দারুণ ব্যবসা হবে। খবরটা শুধু একবার ছড়িয়ে পড়লেই হলো।

এ্যাডাম বললো, ফলাফল যে ওই রকম হবেই তার পুরোপুরি নিশ্চয়তা কখনোই দেয়া যায় না।

যদি না হয় তাহলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে?

শোনো, কয়েকটি ক্ষেত্রে — না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি যাদের অস্ত্রোপচার করেছি তাদের কারো ক্ষেত্রে এখনো ওরকম হয় নি — কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগী প্রফুল্লচিত্ত বহির্মুখী না হয়ে অন্য রকম হয়ে গেছে। হাসিখুশি হয়েছে ঠিকই কিন্তু পুরোপুরি ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার জ্ঞানবর্জিত।

তার মানে উজ্জ্বল দিনের আলোয় তারা নার্সকে জাপটে ধরে মেঝের উপর শুইয়ে ফেলেছে?

এ্যাডাম বললো, প্রায় ওই রকমই। যদি তাদের সুযোগ দেয়া হতো। মানুষের সকল সাধারণ দ্বিধা, সংকোচ, মনের ভেতরকার বাধা-নিষেধের বেড়া সব তাদের ক্ষেত্রে উবে গিয়েছিলো।

তা, তোমার আগামী কালের রোগীর যদি ওই রকম অবস্থা হয় তাহলে তো সে সমাজের জন্য এক মহা মূল্যবান মূলধন হবে।

এ্যাডাম তিক্ত হাসি হেসে বললো, অস্ত্রোপচার করা হয় নি এমন বহু লোকের চাইতে খুব একটা বেশি খারাপ হবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি অপারেশনটা দেখতে পারি?

হঠাৎ আমার মনে হলো যে সেটা আমাকে দেখতেই হবে। আমি এপর্যন্ত কোনো অস্ত্রোপচার দেখি নি। সাংবাদিকতার জীবনে আমি তিনটি ফাঁসী ও একটি বৈদ্যুতিক চেয়ারে প্রাণদণ্ড কার্যকর হতে দেখেছি, কিন্তু সেগুলি ভিন্ন ব্যাপার। ফাঁসীতে আপনি একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব পাল্টে দেন না, শুধু তার ঘাড়ের দৈর্ঘ বাড়িয়ে দেন, তার মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলেন, আর বৈদ্যুতিক মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে শুধু একতাল মাংসকে হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠতে দেখেন। কিন্তু এই অস্ত্রোপচার একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। দামাস্কাসের পথে সলের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিলো তার চাইতেও আশ্চর্য ঘটনা। অতএব আমি অপারেশনটা দেখার কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

এ্যাডাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, কেন?

নিছক কৌতূহল।

সে বললো যে ঠিক আছে, তবে দৃশ্যটা খুব মনোহর হবে না।

আমি বলেছিলাম, অন্ততঃ ফাঁসীকাঠে ঝোলাবার মতো মনোহর তো হবে।

এরপর সে আমাকে কেস্‌টা সম্পর্কে বলতে শুরু করেছিলো। সে ছবি এঁকে বোঝালো, বইপত্র খুলে দেখালো। রীতিমত অনুপ্রাণিত হয়ে গিয়েছিলো সে। অনর্গল কথা বলে সে আমার কানে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়ে দিয়েছিলো। ওর কথা এতো কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছিলো যে এর আগে তার সঙ্গে আলাপ করার সময় আমার মনে দু'একবার তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যে একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছিলো আমি তা বেমালুম ভুলে গেলাম। সে বলেছিলো যে ধর্মীয় কনভার্শানের পর ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটে না, শুধু ভিন্ন কতকগুলি মূল্যবোধ দিয়ে তখন সে তার ব্যক্তিত্ব পরিচালিত করে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম যে ব্যক্তিত্ব যদি রূপান্তরিত না-ই হয় তাহলে সে ওই ভিন্নতর মূল্যবোধগুলি কি করে লাভ করলো, যার ভিত্তিতে এখন থেকে তার ব্যক্তিত্ব পরিচালিত হবে? কিন্তু ওই মুহূর্তে বিষয়টা আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিলো।

যাই হোক, অস্ত্রোপচারটি আমি দেখি।

ওর সঙ্গে আমি যেন একেবারে ভেতরে যেতে পারি এ্যাডাম সেই ভাবে আমাকে কাপড়জামা পরিয়ে দিয়েছিলো। ওরা রোগীকে নিয়ে এসে টেবিলে ওঠালো। খড়্‌গনাসা একটি লোক, বিরক্তিভরা মুখ, শীর্ণ কর্কশ দেখতে, বীজাণুমুক্ত পরিশুদ্ধ সাদা তোয়ালে দিয়ে তার মাথা পাগড়ির মতো জড়ানো থাকা সত্ত্বেও সে আমাকে এ্যান্ড্রু জ্যাকসন কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো পাত্রীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। কিন্তু পাগড়ি বাঁকা করে অনেকখানি পেছন দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে,

মাথার সামনের অংশটি উন্মুক্ত। সে জায়গার চুল কামানো। ওরা ওর মুখে মুখোশ পরালো, তাকে সংজ্ঞাহীন করলো। তারপর এ্যাডাম ছুরি হাতে তুলে নিলো, মাথার উপর দিকে পরিষ্কার করে একটুখানি কাটলো, কপালের দু'পাশেও কাটলো, তারপর হাড়ের উপর থেকে নিপুণভাবে খানিকটা চামড়া ছড়িয়ে নিয়ে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিলো। এমন দক্ষতার সঙ্গে সে ওই কাজটি করলো যে একজন কোমান্‌শে আদিবাসীকেও তার ছুরি দিয়ে কারো খুলির চামড়া ছড়ানোর কাজ দেখলে পর আপনার মনে হতো যে সে বুঝি সবে শিখছে। ততক্ষণে ওরা রক্ত মুছতে শুরু করে দিয়েছিলো। রক্ত পড়ছিলোও প্রচুর।

এর পর এ্যাডাম আসল কাজে লাগলো। তার হাতে ছিল তুরপুন জাতীয় একটা যন্ত্র। সে ওটা দিয়ে লোকটির খুলির দু'পাশে পাঁচ-ছ'টা গর্ত খুঁড়লো। তারপর একটা গিগ্‌লি করাত দিয়ে, নামটা আগেই আমাকে বলে দিয়েছিলো, কাজ করতে থাকলো। কতকটা রুক্ষ তারের মতো দেখতে ওই জিনিসটা। এ্যাডাম ওটা দিয়ে ধীরে ধীরে হাড়টা চিরলো, মাথার সামনের দিকে দু'পাশের পাতলা চামড়া ছাড়িয়ে নিচের দিকে একটু ঝুলিয়ে দিলো, যেন এবার সে ভেতরের সত্যিকার যন্ত্রটির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। অবশ্য তার আগে যে হাল্কা ছোট্ট ঝিল্লিটা আছে, যাকে ওরা মেনিঞ্জেস বলে, সেটা কেটে ফেলতে হবে ।

ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছিলো, অন্ততঃ আমার কাছে সেই রকমই মনে হলো। আমার পা ব্যথা করছিলো। ভেতরে বেশ গরমও, কিন্তু আমি অস্থির হই নি, অত রক্ত দেখেও। একটা কারণ, টেবিলে পড়ে থাকা মানুষটিকে আমার ঠিক বাস্তব বলে মনে হচ্ছিলো না। সে যে একটা মানুষ আমি সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি শুধু একজন খুব উচ্চমানের ছুতার মিস্ত্রীকে কাজ করে যেতে দেখছিলাম। এই প্রক্রিয়ার যেসব উপাদানের দিকে লক্ষ করলে বোঝা যেতো যে টেবিলের উপর পড়ে থাকা ওই জিনিস একটা মানুষ। আমি সে দিকে বিশেষ নজর দিই নি। যেমন, নার্স একটু পর পর রক্তচাপ পরীক্ষা করছিলো, দেহে রক্ত দেবার যন্ত্রটি ঠিকঠাক করে দিচ্ছিলো — সারাক্ষণই রোগীকে রক্ত দিতে হচ্ছিলো, একপাশে দণ্ডের উপর বসানো বোতল থেকে টিউবের মধ্য দিয়ে রক্ত নেমে আসছিলো

পোড়ানোর কাজ শুরু করা পর্যন্ত আমি চমৎকার ছিলাম। মগজের টুকরো বার করে আনার জন্য ওরা একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করেছিলো। সেটা আর কিছুই নয়, হাতলওয়ালা একটা ছোট্ট ধাতব দণ্ড, হাতলের মধ্য থেকে একটা সরু বৈদ্যুতিক দড়ি বেরিয়ে এসেছে। সমস্ত জিনিসটাই দেখাচ্ছিলো চুল কোঁকড়া করার

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রীর মতো। বস্তুতঃপক্ষে ওই সব মূল্যবান যন্ত্রপাতি আমার কাছে মনে হচ্ছিলো খুবই যুক্তিসঙ্গত, সহজ সরল, ঘরোয়া জিনিস, ঘরগেরস্থলির সুসজ্জিত যে কোনো বাড়িতে এই জাতীয় জিনিস থাকতে পারতো। নিজের ব্যবসা শুরু করার জন্য আপনি রান্নাঘর আর আপনার স্ত্রীর ড্রেসিং টেবিল হাতড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এইসব জিনিস জোগাড় করে ফেলতে পারতেন।

যাই হোক, ইলেক্ট্রোক্‌টেরি প্রক্রিয়ায় ওই ছোট দণ্ডটিই কাটার কাজ করে, বরং বলা যায়, পোড়ানোর কাজ করে। তখন একটু ধোঁয়া হয় আর বেশ গন্ধ ছড়ায়। অন্ততঃ আমার কাছে গন্ধটা বেশ কড়া বলেই মনে হলো। প্রথম দিকে ততো খারাপ লাগে নি, কিন্তু পরে ঠিক এই রকম গন্ধ আমি আগে কোথায় পেয়েছি তা আমার মনে পড়লো। অনেক দিন আগে, এক রাত্রে, আমি তখন ছোট, ল্যান্ডিং-এ পুরনো আস্তাবলটা আগুন লেগে পুড়ে যায়। ওরা সবগুলো ঘোড়া বার করতে পারে নি। অগ্নিদগ্ধ ঘোড়ার মাংসের গন্ধ রাতের নিস্তব্ধ, ভেজা, পরিপক্ক বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ঘোড়াগুলির কাতর ক্রন্দন থেমে যাবার পরও ওই গন্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নি। আমি যখনই উপলব্ধি করলাম যে এই মগজ-পোড়া গন্ধ আর ঘোড়া-পোড়া গন্ধ একই রকম, তখন থেকেই আমার ভীষণ খারাপ লাগতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত ছিলাম। অনেক সময় লেগেছিলো, আরো কয়েক ঘণ্টা, কারণ মগজের টুকরো, একবারে, খুব অল্প অল্প করে ছাড়া, কাটা যেতো না। তারপর আস্তে আস্তে গভীরে যেতে হতো। এ্যাডাম মেনিঞ্জেস সেলাই করলো, খুলির চামড়া আবার উল্টে, টেনে, ঠিকমতো বসিয়ে দিলো, সব কিছু চমৎকারভাবে আটকে ফেললো। আমি টিকে থাকলাম গোটা সময়টা।

মগজের কাটা ছোট টুকরোগুলি সরিয়ে ফেলা হলো। কোথাও কোনো আবর্জনার স্তূপে চুপ করে শুয়ে শুয়ে সেগুলি তাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকবে, আর কাটার পর আবার ছুড়ে দেয়া খুলির মধ্যে মগজের যে-অংশ রইলো সেটা এখন একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিত্ব তৈরি করার চেষ্টায় তৎপর হবে।

এ্যাডাম আর আমি বেরিয়ে এলাম, ও হাত ধুলো, আমরা আমাদের সাদা এ্যাপ্রন খুলে ফেললাম। আমি ওকে লক্ষ্য করে বললাম, এই, তুমি কিন্তু ব্যাপটাইজ করাতে ভুলে গেছো।

কি বললে? ব্যাপটাইজ?

হ্যাঁ, কারণ ওর তো পুনর্জন্ম হলো, আর রমণীগর্ভ থেকে নয়। ঠিক আছে, আমিই ওকে ব্যাপটাইজ করলাম বিশাল কুঞ্চন, ক্ষুদ্র কুঞ্চন, আর হোলি গোস্টের

নামে। যে নিজেও, নিঃসন্দেহে, একটি কুঞ্চন।

এ্যাডাম জিজ্ঞাসা করলো, কি আবোল-তাবোল বকছো তুমি?

আমি বললাম, না, কিছু না, একটু রঙ্গরস করছিলাম শুধু।

এ্যাডামের মুখে মৃদু প্রশ্রয় দেয়ার মতো হাল্কা হাসি ফুটে উঠলো, কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে মোটেই কৌতুককর বলে মনে হলো না। আর এখন পশ্চাদ্দৃষ্টি দিয়ে আমিও তার মধ্যে মজার কিছু খুঁজে পেলাম না। কিন্তু ওই সময় আমার কাছে তা খুব মজার বলে মনে হয়েছিলো। আমার মনে হয়েছিলো হাসতে হাসতে বোধহয় পেট ফেটে যাবে। কিন্তু ওই গ্রীষ্মে, আমার অলিম্পীয় প্রজ্ঞার শীর্ষবিন্দু থেকে, অনেক কিছুই আমার কাছে ভীষণ কৌতুককর বলে মনে হতো। আজ আর তেমন মনে হয় না।

অস্ত্রোপচারের পর এ্যাডামের সঙ্গে আমার বেশ কিছুকাল দেখা হয় নি। ও শহরের বাইরে গিয়েছিলো, পূর্বাঞ্চলে, কাজে। খুব সম্ভব হাসপাতাল সংক্রান্ত কাজে। তারপর ও ফিরে আসার অল্প পরেই একটা ব্যাপার ঘটলো যার ফলে কর্তার হাসপাতালের জন্য নতুন পরিচালক খোঁজার অবস্থা হয়েছিলো প্রায়।

যা ঘটেছিলো তা ছিলো সরল এবং প্রত্যাশিত। একদিন রাতে, বাইরে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া শেষ করে, এ্যাডাম আর এ্যান এ্যাডামের জীর্ণ এ্যাপার্টমেন্ট-ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই দেখে যে দরজার সামনে একজন লম্বা, সরু, সাদা পোশাক পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় সাদা পানামা হ্যাট, যে-জায়গায় মুখ থাকার কথা সেখানে একটা সিগার জ্বলছে, সিগারের দামী ঘ্রাণ চারপাশের বাঁধাকপির গন্ধের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। লোকটি মাথা থেকে তার সাদা টুপী খুলে, কনুই-এর নিচে হাল্কাভাবে ধরে, এ্যাডামের কাছে জানতে চাইলো সে-ই ডক্টর স্ট্যান্টন কিনা। এ্যাডাম বললো যে, হ্যাঁ, সে-ই। লোকটি বললো তার নাম কফি ( আমার নাম হিউবার্ট কফি)। এক মিনিটের জন্য সে ভেতরে আসতে চাইলো।

এ্যাডাম আর এ্যান ভেতরে ঢুকলো। এ্যাডাম লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো সে কি চায়। লোকটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো, পরনে সাদা, চমৎকার ইস্ত্রী করা স্যুট, পায়ে দু-রঙা জুতো, নিঃসন্দেহে সেখানে নানা কারুকাজ করা জটিল সেলাইর কীর্তি ও চামড়ার ভেতর দিয়ে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আছে (পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে হিউবার্টের অতিরিক্ত সৌখিনতার কথা আমার জানা ছিলো — দিনে দুটো সাদা স্যুট, সাদা সিল্কের হাফ-প্যান্ট, তাতে লাল মনোগ্রাম, লোকে তাই বলতো, লাল সিল্কের মোজা, আর নানা কেরামতিপূর্ণ জুতো), হিউবার্ট কিছুক্ষণ ইতস্তত

করলো, তার লম্বা, হলদেটে মুখের মধ্য থেকে কিছু অর্থহীন ধ্বনি নির্গত হলো, সন্তর্পণে সে গলা খাঁকারি দিলো, তারপর তার বাদামী চোখ ঘুরিয়ে (চোখের রঙ ছিলো ব্যবহৃত মোটর তেলের মতো) অর্থপূর্ণভাবে এ্যানের দিকে তাকালো । এ্যান আমাকে পরে বলেছিলো, এসব খবর আমি তার কাছ থেকেই পাই, সে মনে করেছিলো যে লোকটি এ্যাডামের কাছে তার কোন অসুখের ব্যাপারে এসেছে, তাই সে ওদের দুজনকে ওঘরে রেখে রান্নাঘরে চলে গিয়েছিলো। বাড়িতে আসার পথে সে কোনার ড্রাগস্টোর থেকে একটা ছোট আইসক্রীমের কার্টন নিয়ে এসেছিলো। এখন সেটা ও ইলেকট্রিক আইসবক্সের মধ্যে রেখে দিলো। এ্যাডামের সঙ্গে নিভৃত প্রশান্তির মধ্যে সময়টা কাটাবার পরিকল্পনা করেছিলো এ্যান। (অবশ্য ওই গ্রীষ্মে এ্যাডামের ওখানে বেড়াতে এসে এ্যান খুব একটা শান্তি পায় নি। একটা প্রশ্ন সব সময় তার মনের পেছনে মাথা উঁচিয়ে থাকতো। আজকাল তার অন্য রাতগুলো সে কি ভাবে কাটায় এ্যাডাম যদি তা জানতে পারে তা হলে কি হবে? নাকি সে তার মনের ওই অংশটি তালাবন্ধ করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো? একটা বিরাট বাড়িতে একটি মানুষ যেমন অনেকগুলো ঘর তালাবন্ধ করে রেখে নিজে আরামপ্রদ, কিংবা এখন হয়তো আর তত আরামপ্রদ নয়, পার্লারে বসে থাকে, এ্যানের অবস্থা কি সেই রকম? সে কি চুপ করে বসে কান পেতে থাকতো, কখন মেঝেতে শব্দ হয়? সে কি সর্বদা শুনতো উপরের তালা দেওয়া ঘরগুলিতে চলমান নিরন্তর পদধ্বনি?)

আইসক্রীমটা তুলে রাখার পর তার দৃষ্টি পড়লো সিঙ্কের উপর। সেখানে একগাদা নোংরা থালাবাসন টাল করে ধরা আছে। সে ঠিক করলো, ওরা ওর ঘরে কথা বলতে থাকুক, সে ইতোমধ্যে এগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলবে। ধোয়া-মোছার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে এমন সময় সে খেয়াল করলো যে ওঘর থেকে যে অস্পষ্ট কথার গুঞ্জন ভেসে আসছিলো তা আর শোনা যাচ্ছে না। আকস্মিক নীরবতাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। তারপর সে একটা শুকনো থপ্ শব্দ শুনলো (ওভাবেই এ্যান বর্ণনা দিয়েছিলো), আর তার ভাই বলছে, যান, এক্ষুণি বেরিয়ে যান। তারপর এ্যান দ্রুত নড়াচড়া আর সজোরে এ্যাপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পায়।

বসবার ঘরে গিয়ে এ্যান দেখলো যে এ্যাডাম ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ ভীষণ সাদা, কোলের কাছে ধরা ডান হাতের উপর সে তার বাম হাত বুলিয়ে চলেছে। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দরজার দিকে। এ্যান ঘরে ঢুকতেই সে ধীরে ধীরে তার মাথা ওর দিকে ঘুরিয়ে বললো, আমি ওকে মেরেছি। মারতে চাই নি আমি। আমি এর আগে কাউকে কখনো আঘাত করি নি।

হিউবার্টকে সে নিশ্চয়ই বেশ জোরে মেরেছিলো। এ্যাডামের হাতের চামড়া ছড়ে গিয়েছিলো। ইতোমধ্যে জায়গাটা ফুলে উঠতে শুরু করেছে। হাল্কাপাতলা গড়নের হলে কি হবে। এ্যাডামের গায়ে বেশ জোর ছিলো। যাই হোক, এ্যাডাম ওখানে তার ছড়ে যাওয়া হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, তার মুখে একটা শূন্য অবিশ্বাসভরা অভিব্যক্তি। স্পষ্টতঃই সে তার নিজের আচরণকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলো না।

এ্যান উত্তেজিতভাবে কি গোলমাল হয়েছিলো তা জানতে চায়।

গোলমালটা ছিলো, আমি আগেই যেমন ইঙ্গিত করেছি, সহজ সরল এবং প্রত্যাশিত। গামি লারসন হিউবার্ট কফিকে এখানে পাঠায়। কফি সাদা স্যুট আর সিল্কের মনোগ্রাম করা শর্ট্স্ পরে, আচার-আচরণের নানা সূক্ষ্ম দিক ছিলো তার আয়ত্তে, শোভন সৌজন্যের সঙ্গে কি করে কথা পাড়তে হয় সে তা জানতো। কফি ডক্টর স্ট্যান্টনকে রাজী করাবে, তিনি যেন কর্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে লারসনকে মেডিক্যাল সেন্টারের ঠিকাদারিটা পাইয়ে দেন। এ্যাডাম এতো সব জানতো না, কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারি যে কফি তার কথাবার্তার প্রথম দিকে পশ্চাদপটের আসল মানুষটির নাম উচ্চারণ করে নি। আমি অবশ্য কফির নাম শোনামাত্র বুঝেছিলাম যে এর পেছনে লারসন আছে। তবে কফি তার কথাবার্তার অনুসন্ধানী স্তরেই, নিশ্চয়ই, বেশ খোলামেলা ইঙ্গিত দিয়েছিলো। প্রথমে এ্যাডাম ওর কথার মানে বুঝতে পারে নি। কফি তখন স্থির করে যে এই রকম মোটা মাথার লোকের সঙ্গে সূক্ষ্ম কায়াদাকানুনের কোনো অর্থ নেই। তখন সে প্রায় সোজাসুজি তার প্রস্তাব দেয়। কাজটা করলে এ্যাডামের ভাগ্যেও যে কিছু মাল-পানি জুটবে, এইটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণটা ঘটে।

তখনো এ্যাডামের মুখে সমস্ত ব্যাপারটা যে অবিশ্বাস্য সেই অভিব্যক্তি ফুটে আছে। সে তখনো তার ঝিনঝিন করা হাতের পরিচর্যা করছে। ওই অবস্থাতেই সে কেমন একটা সুদূর গলায় এ্যানকে ঘটনাটার বর্ণনা দিলো। তারপর সে নিচু হয়ে তার ভালো ডান হাত দিয়ে জীর্ণ সবুজ কার্পেটের উপর পড়ে থাকা জ্বলন্ত সিগারের শেষাংশটুকু তুলে নিলো। ওটা ধীরে ধীরে কার্পেটের বুকে একটা গর্ত করে চলেছিলো। এ্যাডাম ওটা নিয়ে, হাত সামনে বেশ বাড়িয়ে ধরে, কার্পেটের অপর প্রান্তে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আগে যখন আমি এখানে আসি তখন লক্ষ করেছিলাম আগের বসন্তের সময় যখন এখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিলো সেই সময়কার কিছু কাগজের টুকরো আর গ্রীষ্মের সময়কার কিছু কমলার খোসা ওখানে পড়েছিলো, সেগুলি এখনো দেখলাম চুল্লীর মধ্যে পড়ে

রয়েছে। সিগারের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে এ্যাডাম আবার কার্পেটের উপর দিয়ে তার আগের জায়গায় ফিরে এসে কার্পেটের ধোঁয়া ওঠা অংশটি পা দিয়ে সজোরে মাড়িয়ে দিলো, অনেকটা প্রতীকী হিংস্রতার সঙ্গে। অন্ততঃ আমি কল্পনায় ওই দৃশ্য দেখতে পাই।

সে তার টেবিলের সামনে বসে কাগজ কলম বার করে লিখতে শুরু করেছিলো। লেখা শেষ করে সে এ্যানের দিকে ঘুরে ঘোষণা করে যে সে এইমাত্র তার পদত্যাগপত্র লিখেছে। এ্যান কোনো কথা বলে নি। একটি কথাও না। আমাকে ও পরে বলেছিলো যে ওর সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টা ছিলো অর্থহীন, এর মধ্যে যে গভর্নর স্টার্কের কোনো দোষ নেই, কোনো বদমাশ যদি এ্যাডামের কাছে এসে তাকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করে তার মধ্যে যে তার নিজের চাকুরির কোনো দোষ থাকতে পারে না, এসব কথা এ্যাডামকে বলে কোনো লাভ হবে না। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই সে বুঝেছিলো যে কোনো কথা বলেই কিছু হবে না। অন্য ভাবে বলতে গেলে, এ্যাডাম তার ভেতরকার একটা সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেকে একাজ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, ওই তাড়না এখন নৈতিক ক্রোধ ও ঘৃণার রূপ নিয়েছে, যদিও ব্যাপারটা আসলে তা নয়, তার উৎস ওই নৈতিক ক্রোধ কিংবা নৈতিক ঘৃণার চাইতেও অনেক গভীরে, এবং শেষ পর্যন্ত তা যুক্তির ওপারে। সে চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পায়চারি করলো, আপাতদৃষ্টিতে পরম উত্তেজনাভরে। এ্যান আমাকে পরে বলেছিলো, তাকে তখন প্রায় উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো, যেন সে এখনই হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়বে। সমস্ত ঘটনাটা যে ঘটলো তাতে যেন সে খুশি। তারপর সে চিঠিটা হাতে নিয়ে তাতে ডাকটিকেট লাগালো।

এ্যানের ভয় হচ্ছিলো সে বুঝি এখুনি বেরিয়ে গিয়ে চিঠিটা ডাকে দেবে। এ্যাডাম ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিঠিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো, যেন ব্যাপারটা ভেবে দেখছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তখুনি বাইরে গেলো না। চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে সে ঘরের মধ্যে আরো দু'চক্কর ঘুরলো, তারপর পিয়ানোর সামনে বসে পাগলের মতো বাজাতে শুরু করলো। ওই বদ্ধ গুমোট জুলাইর রাত্রিতে সে প্রায় দু'ঘণ্টা একটানা পিয়ানো বাজিয়েছিলো, তার মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরেছিলো, এ্যান আমাকে পরে বলেছিলো, সে ওখানে চুপ করে বসেছিলো, ভীত সন্ত্রস্ত, যদিও কিসের ভয় সেটা সে ঠিক বুঝতে পারছিলো না।

বাজানো শেষ করে এ্যাডাম অবশেষে তার ঘর্মাক্ত সাদা মুখ তুলে এ্যানের পানে তাকিয়েছিলো, এ্যান আইসক্রীমটা নিয়ে আসে, আর ওরা দু'জন তখন একটা সানন্দ পারিবারিক পার্টির পরিবেশ গড়ে তোলে। তারপর এ্যান বিদায় নেয়। বাইরে এসে

গাড়িতে উঠে সে তার গাড়ি চালিয়ে নিজের এ্যাপার্টমেন্টে চলে যায়।

এ্যান আমাকে টেলিফোন করেছিলো। সারারাতখোলা একটা ড্রাগস্টোরে আমি ওর সঙ্গে দেখা করি, একটা বুথে টেবিলের দুপাশে বসেছিলাম আমরা দুজন, টেবিলের উপরটা ছিলো কৃত্রিম মার্বেল পাথরের। ওই যে মে মাসের এক সকালে ওর এ্যাপার্টমেন্টে দরজার সামনে ও দাঁড়িয়েছিলো, আমার মুখে চোখে ফুটে ওঠা প্রশ্নের উত্তরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মাথা হেলিয়েছিলো, তার পর এই ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। সেদিন রাতে ফোনে ওর গলা শোনামাত্র আমার বুকের মধ্যে লাফালাফি শুরু হয়ে যায়, ঠিক আগের মতো, পদ্মপুকুরের সেই ব্যাঙের মতো, এবং ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়, যা ঘটে গিয়েছে তার কিছুই যেন ঘটে নি। কিন্তু তা ঘটেছিলো ঠিকই, এবং ট্যাক্সি করে শহরের মাঝখানে সারারাত খোলা ড্রাগস্টোরটির দিকে যেতে যেতে আমার মনের মধ্যে আমি শুধু একটা বিকৃত খিটখিটে সন্তোষের অনুভূতি অনুভব করলাম, এই ভেবে যে ও আমাকে বিশেষ একটা কারণে ডেকে পাঠিয়েছে, আর যে উত্তর সে চায় সেটা দেয়া ওই লোকটার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যখন আমি গাড়ি থেকে নেমে ড্রাগস্টোরের কাঁচের দরজার ওপাশে তাকে দেখলাম, সুন্দর ঋজু শরীর, পরনে হাল্কা-সবুজ বুটিদার পোশাক, নিরাভরণ বাহুর উপর একটা সাদা জ্যাকেট-মতো ঝুলছে, তখন আমার অনুভূতির মধ্য থেকে বিকৃত ও খিটখিটে ভাবটা মিলিয়ে গেলো, নির্ভেজাল খুশির ভাবটাই শুধু জেগে রইলো। আমি এ্যানের মুখের ভাব পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পড়তে পারার আগেই এ্যানের চোখ পড়ে আমার উপর, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। হাসিটা ছিলো পরীক্ষামূলক, তার মধ্যে একটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি মিশে ছিলো, যেন তা বলছে প্লীজ এবং থ্যাঙ্ক ইউ, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা সরল ও পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশ করছে যে শেষ পর্যন্ত শুভ প্রকৃতিই জয়ী হবে। আমি উত্তপ্ত পেভমেন্টের উপর দিয়ে ওই হাসি আর সবুজ বুটিদার পোশাক পরা মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলাম, কাঁচের ওপাশে সে দাঁড়িয়ে আছে শো-কেসে সাজানো মূর্তির মতো, আপনি তার প্রশংসা করতে পারবেন কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারবেন না। তারপর আমি রাস্তা ছেড়ে কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। রাস্তার বাতাস তখন গরম, চিটচিটে, উষ্ণ স্নানাগারের মতো, সেখানে পেট্রলের ধোঁয়ার গন্ধ, তার সঙ্গে এসে মিশেছে নদীর দিক থেকে ভেসে আসা লবণাক্ত আর বিশ্রী রকমের মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ, গ্রীষ্মের নিস্তব্ধ রাতগুলিতে শহরের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে এই গন্ধ। তো, আমি রাস্তা ছেড়ে কাঁচের ওপাশের উজ্জ্বল, মুচমুচে, জীবাণুমুক্ত, শীতল ভুবনে প্রবেশ করলাম, যেখানে আছে ওই হাসি, কারণ গ্রীষ্মের এই রকম উষ্ণ

রজনীতে একটা চমৎকার প্রথম শ্রেণীর রাস্তার মোড়ের ড্রাগস্টোরের চাইতে উজ্জ্বলতর, বেশি মুচমুচে, অধিকতর জীবাণুমুক্ত এবং শীতল কোনো কিছু সারা দুনিয়ায় নেই। যদি সেখানে থাকে এ্যান স্ট্যান্টন, আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটি যদি কাজ করতে থাকে।

হাসিমুখে আমার দিকে সোজা তাকিয়ে এ্যান তার হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি সে হাত ধরলাম, মনে হলো কি ঠাণ্ডা, ছোট আর দৃঢ় ওই হাত, যেন এই প্রথম আমি ব্যাপারটা লক্ষ করলাম, তারপর এ্যানকে বলতে শুনলাম, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সারাক্ষণ তোমাকে ডাকাডাকি করছি। আমি জবাবে বললাম, সে কিছু না, ঠিক আছে, তারপর হাত ছেড়ে দিলাম।

বোধহয় এক মুহূর্তের বেশি আমরা কেউ কোনো কথা না বলে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি নি, কিন্তু মনে হলো একটা দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক বিব্রতকর সময় কেটে গেলো, কি বলবো সে সম্পর্কে যেন দুজনের কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না, তারপর এ্যান বললো, চলো বসা যাক।

আমি পেছনের বসবার জায়গার দিকে অগ্রসর হলাম। চোখের কোণ দিয়ে আমি দেখলাম এ্যান আমার বাহু জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলো, কিন্তু দ্রুত সে নিজেকে নিবৃত্ত করে নেয়, আর ওই ব্যাপারটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটু আগের নির্ভেজাল সন্তোষ আবার গোড়ার সেই বিকৃত ও খিটখিটে সন্তোষে পরিণত হলো। এবং বুথে বসে তার মুখের দিকে যখন আমি তাকালাম তখনও মনের সেই অবস্থা বজায় রইলো। আমি ওর মুখে লক্ষ করলাম টানাপোড়েনের চিহ্ন, ওর সুন্দর হাড়ের উপর চামড়া টানটান। বিগত কোনো এক গ্রীষ্মে আমরা দুজন আমার ছোট্ট গাড়ির ভেতরে বসেছিলাম, ও তার জ্যাকি পাখিমণিকে গুনগুন করে গান শুনিয়েছিলো, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে তার বেচারা জ্যাকি পাখিমণিকে কেউ যেন কখনো কষ্ট দিতে না পারে সে তা দেখবে, তো, তার পর যে বছরগুলি পার হয়ে গেছে সেই বছরগুলি তাদের ছাপ ফেলেছে ওর মুখের উপর। অবশ্য সে তার প্রতিশ্রুতি ঠিকই রক্ষা করেছে, কারণ জ্যাকি পাখিমণি ওই গ্রীষ্মেই, শরৎ আসবার আগেই, অন্যত্র উড়ে চলে গিয়েছিলো, আরো ভালো আবহাওয়ার অঞ্চলে, যেখানে তাকে কেউ কখনো কষ্ট দিতে পারবে না, এবং আর সে ফিরে আসে নি। অন্ততঃ তারপর থেকে আমি আর ওকে কখনো দেখি নি।

আর এখন এ্যান বসে আছে আমার সামনে। আমাদের উভয়ের হাতে কোকাকোলার গ্লাস। এ্যান আমাকে এ্যাডামের এ্যাপার্টমেন্টের ঘটনাটা বললো।

ওর কথা শেষ হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমাকে কি করতে বলো?

তুমি জানো।

ও যেন পদত্যাগ না করে আমাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে, তাই না?

হ্যাঁ।

আমি বললাম, কাজটা কঠিন হবে।

এ্যান সায় দিয়ে মাথা নাড়লো।

আমি আবার বললাম, কাজটা কঠিন হবে, কারণ এ্যাডাম একেবারে পাগলের মতো আচরণ করছে। আমি শুধু একটা জিনিস ওর কাছে প্রমাণ করতে পারি। যদি কফি ওকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করে থাকে তা হলে একটা বিষয় প্রমাণিত হয়, তা এই যে কাজটা এ পর্যন্ত ন্যায়ভিত্তিক চলছে, এবং এ্যাডাম ইচ্ছা করলেই সে অবস্থা বজায় থাকতে পারে। তাছাড়া এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আরেকটা কথাও বোঝা যায়। প্রশাসকের উপরের স্তরে কাউকে নিশ্চয়ই ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিলো কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি। হয়তো টাইনি ডাফির সততারও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এর মধ্যে। কিংবা, আমি বললাম, টাইনি হয়তো চেষ্টা করেও কিছু করতে পারে নি।

এ্যান জিজ্ঞাসা করলো, তুমি চেষ্টা করবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, করবো, তবে খুব বেশি কিছু আশা করো না। আমি ওর কাছে যা প্রমাণ করতে পারবো সেটা ওর মাথা খারাপ না হয়ে গিয়ে থাকলে ও নিজেই বুঝতে পারতো। আসলে ওর মধ্যে আছে একটা বাড়াবাড়ি রকমের অসূয়াপূর্ণ নৈতিক খুঁতখুঁতানি। স্থূল মানুষগুলোর সংস্পর্শেই সে আসতে চায় না। তার ভয় পাছে ওরা তার লর্ড ফন্টলিরয় স্যুট নোংরা করে ফেলে।

এ্যান চটে বলে উঠলো, এ তোমার অন্যায়।

আমি কাঁধ কুঁচকালাম, তারপর বললাম, ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো।

কি করবে?

একটাই করার আছে। আমি গভর্নর স্টার্কের কাছে গিয়ে তাঁকে রাজী করাবো তিনি যেন একজন সরকারী কর্মচারীকে — এ্যাডাম একজন সরকারী কর্মচারী, জানো তো তুমি — ঘুষ দিতে চেষ্টা করার অপরাধে কফিকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করেন, তারপর এ্যাডামকে আদালতে শপথ করে ওই অভিযোগ আনতে হবে। যদি সে শপথ করে ওকথা বলে। তা হলেই পরিস্থিতিটা কি রকম সেটা তার কাছে পরিষ্কার হবে। কর্তা যে তাকে রক্ষা করবেন সেটাও তখন স্পষ্ট হবে। আর — এতক্ষণ আমি এ্যাডামের দিকটাই ভাবছিলাম কিন্তু এখন ঘটনাটার অন্য সম্ভাবনাও আমার সামনে ভেসে উঠলো আর কফিকে অভিযুক্ত করতে পারলে কর্তার কোনো ক্ষতি হবে না, বিশেষ করে সে যদি পশ্চাদপটের আসল লোকের নাম প্রকাশ করে

দেয়।

লারসনের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে সে। আর লারসন অন্তর্হিত হলে ম্যাকমারফিকে নিয়ে ভাবনা করার কিছু থাকবে না। এবং কফির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা হয়তো কঠিন হবে না, বিশেষ করে তুমিও যদি — এই টুকু বলেই আমি হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেলাম।

এ্যান জানতে চাইলো, কি? আমি যদি —

আমি বললাম, কিছু না।

একটা লোক মহানন্দে কোনো সেতুর উপর দিয়ে যেতে যেতে যদি হঠাৎ দেখে যে তার সামনে সেতুটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে যাচ্ছে তখন তার যে অবস্থা হয় আমার অবস্থা ঠিক সেই রকম মনে হলো।

ও আবার জিজ্ঞাসা করলো, আমি যদি কি করি?

আমি ওর স্থির চোখের দিকে তাকালাম, দেখলাম তার শক্ত চোয়াল, বুঝলাম যে কথাটা বলে ফেলাই ভালো। না বলা পর্যন্ত আমি তার হাত থেকে রেহাই পাবো না। তাই বললাম ওকে। বললাম, যদি তুমি সাক্ষী হও।

কোনো রকম দ্বিধা না করে সে বললো, আমি সাক্ষী হবো।

আমি মাথা নাড়ালাম। বললাম, না।

হবো।

না, ওতে কাজ হবে না।

কেন?

হবে না। তুমি তো কিছুই দেখো নি।

আমি ওখানেই তো ছিলাম।

তাতে কিছু হবে না। সেটা হবে শোনা কথার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দেয়া। আদালতে তা গ্রাহ্য হবে না।

সে বললো, সে কথা আমি জানি না। এসব বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু আমি একটা কথা জানি। তুমি এজন্য তোমার মত পাল্টাও নি। কেন মতটা পাল্টালে?

তুমি জীবনে কখনো সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াও নি। একজন নিকৃষ্টমনা সুচতুর উকীল সাক্ষীকে কিরকম হেনস্তা করতে পারে সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।

সে আবার বললো, আমি সাক্ষ্য দেবো।

না।

আমি কিছু মনে করবো না।

শোনো — আমি চোখ বন্ধ করে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে উদ্যত সেতু থেকে জলে ঝাঁপ দিলাম — তুমি যদি মনে করো যে কফির উকীল তোমাকে নাজেহাল করার জন্য তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে না তাহলে বলতে হবে যে তুমিও এ্যাডামের মতোই পাগল হয়ে গেছো। ওই উকীল নিতান্ত অধম আর চতুরের মতো ব্যবহার করবে, নারীর প্রতি দক্ষিণাঞ্চলের যে সৌজন্যের ঐতিহ্য আছে তার ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে তুমি দেখবে না।

তুমি বলতে চাইছো — এটুকু বলেই সে থামলো, আর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝলাম যে এতক্ষণে সে আমার কথার মর্মার্থ ধরতে পেরেছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিক তাই। এখন হয়তো কেউ কিছু জানে না, কিন্তু একবার খেলা শুরু হয়ে গেলে কারো কিছু জানতে বাকী থাকবে না।

সে বললো, আমার তাতে কিছু এসে যাবে না। ওর চিবুকটা একটু উঁচু হলো, আর ওর ঘাড়ের মাংসের উপর কয়েকটা সরু সরু ভাঁজ আমার চোখে পড়লো, খুব ছোট, খুব সূক্ষ্ম, দিনের পর দিন ঠগী সব চাইতে সুন্দর ঘাড়ের চারপাশেও তার মাকড়শার জালের মতো দড়ি পেঁচিয়ে ধীরে ধীরে টানার ফলে অবধারিত ভাবে যে দাগ পড়ে সেই দাগ আমি দেখতে পেলাম। দড়িটা এতো সূক্ষ্ম যে রোজ তা ছিড়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাগগুলি থেকে যায়, আর তারপর একদিন ওই মাকড়শার জালের মতো দড়িও আর ছেঁড়ে না, এবং তখন খেল্ খতম। এ্যান তার চিবুক উঁচু করে তুলে ধরতেই আমি দাগগুলি দেখলাম, তখনই আমার খেয়াল হলো যে আগে এগুলি কখনো দেখি নি, আর এখন থেকে সব সময় এগুলি আমার চোখে পড়বে। হঠাৎ আমার অসম্ভব খারাপ লাগলো, নিজেকে রীতিমত অসুস্থ মনে হলো আমার, কেউ যেন আমার পেটে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরেছে, কিংবা আমি যেন এইমাত্র কারো চরম বিশ্বাসঘাতকতা আবিষ্কার করে ফেলেছি। তারপরই, ভালো করে বুঝে উঠবার আগেই, আমার ওই অনুভূতি রূপান্তরিত হয়ে গেলো ভীষণ ক্রোধে। আমি তীব্র কণ্ঠে বললাম, হ্যাঁ, তোমার কিছু এসে যাবে না, কিন্তু তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছো। তুমি ভুলে যাচ্ছো যে এ্যাডাম সেখানে বসে বসে তার ছোট্ট বোনটির দিকে তাকিয়ে থাকবে।

ওর মুখ মুহূর্তের মধ্যে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেলো।

মুখ নিচু করে সে তার হাতের দিকে তাকালো, হাত দুটি শূন্য কোকাকোলার গ্লাসের চারপাশে শক্ত করে জড়ানো। মুখ এখন এতো নেমে এসেছে যে আমি ওর চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুধু চোখের উপর নেমে আসা আঁখিপল্লব দেখতে

পাচ্ছিলাম।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, এ্যান, এ্যান। তারপর শক্ত মুঠিতে গ্লাস ধরে রাখা ওর হাতের উপর আমি আমার হাত রাখলাম, আর তখনই আমার বুক ছিঁড়ে যেন কথাক'টি বেরিয়ে এলো, কেন, এ্যান, কেন তুমি এটা করলে?

এই একটি প্রশ্ন আমি কখনো করতে চাই নি।সে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো, তারপর মুখ ওই রকম নত রেখেই নিচু গলায় বললো, ও একেবারে আলাদা, জ্যাক। আমি এরকম কাউকে এর আগে দেখি নি। আর ওকে আমি ভলোবাসি। হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমি ওকে ভালোবাসি। হ্যাঁ, বোধহয় এই জন্যই।

আমার মনে হলো এই উত্তর আমার প্রাপ্য ছিলো। এ্যান বললো, তারপর তুমি আমাকে জানালে তুমি আমাকে আমার বাবার ব্যাপারটা জানালে। এরপর তো আর না করার কোনো কারণ থাকলো না। তুমি ওই ব্যাপারটা আমাকে জানাবার পর।

আমার মনে হলো এই উত্তরও আমার প্রাপ্য। সে বললো, ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।

তুমি করবে?

এখন নয়। এখন করলে ওর ক্ষতি হবে। এখন ওর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটালে সেটা তার ক্ষতি করবে। না, এখন নয়।

তুমি ওকে বিয়ে করবে?

সম্ভবতঃ। পরে। ও সিনেটে যাবার পর। সামনের বছর।

আমার মনের একটা অংশ খবরটা লেবেল লাগিয়ে ঠিক জায়গায় তুলে রাখলোঃ সামনের বছর সিনেটে। তার মানে তিনি বুড়ো স্কোগানকে সেখানে ফিরে যেতে দিচ্ছেন না। আশ্চর্য, আমাকে বলেন নি তো। কিন্তু আমার মনের অন্য অংশ, যেখানে সুন্দর, ঠাণ্ডা স্টীলের ফাইলিং ক্যাবিনেটে বর্ণক্রম অনুসারে তথ্যাবলী সাজানো নেই, ফুটন্ত আলকাতরার মতো টগবগ করছিলো। তার ভেতর থেকে একটা বড়ো বুদ্বুদ উপরে উঠে ফেটে গেলো, আর আমি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তো তুমি কি করছো সেটা তুমিই ভালো জানো।

এবার আগের চাইতেও নিচু গলায় ও বললো, তুমি ওকে চেনো না। এতো বছর তুমি ওর সঙ্গে কাটিয়েছো কিন্তু তুমি ওকে একটুও চেনো না। তারপর সে মুখ উঁচু করে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে খুব স্পষ্ট গলায় বললো, আমি দুঃখিত নই, জ্যাক। যতো কিছু ঘটেছে তার কোনো কিছুর জন্যেই আমি দুঃখিত নই।

উত্তপ্ত অন্ধকার রাস্তা ধরে আমি আমার হোটেলের দিকে ফিরে চললাম। উপরে অপূর্ব আকাশ যেন থরথর করে কাঁপছে। সারাদিনের পেট্রোলের ধোঁয়া আর এখন

নদীর দিক থেকে ভেসে আসা রাতের মিষ্টি মিষ্টি জলাভূমির গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকে টেনে নিতে নিতে আমি ভাবলাম, হ্যাঁ, ও কেন এরকম করেছে আমি তা জানি।

অতীতের সব বছরগুলির মধ্যে এর উত্তরটি ছিল। সেইসব বছরের ঘটনার মধ্যে উত্তরটি ছিল, আবার ছিলোও না।

উত্তরটা ছিলো আমার মধ্যে, কারণ আমিই তাকে বলেছিলাম।

হিংস্রভাবে আমি নিজেকে লক্ষ করে বললাম, আমি ওকে সত্য কথা বলেছি, সত্য কথা বলার জন্য তো ও আমাকে দোষ দিতে পারে না।

কিন্তু এই পৃথিবী আর আমার মধ্যে কি কোনো মারাত্মক উপযোগিতা বা যুক্তিযুক্ততা আছে যার জন্য তার কাছে আমাকেই সত্যটা পৌঁছে দিতে হলো? এ প্রশ্নটা আমাকে আমার নিজের কাছে করতে হলো। কিন্তু এর উত্তর সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত হতে পারলাম না। অতএব আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকলাম, মনের ভেতর প্রশ্নটা অন্তহীনভাবে নাড়াচাড়া করলাম, শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা তার সব অর্থ হারিয়ে ফেললো, অবশ হাত থেকে ভারী কিছু খসে পড়ে যাবার মতো আমার মন থেকে তা টুপ করে খসে পড়ে গেলো। যদি জানতে পারতাম তা হলে আমি দায়িত্ব নিতাম, আমার অপরাধের মুখোমুখি হতাম, আমি তৈরি ছিলাম তার জন্য, কিন্তু কে তোমাকে বলে দেবে?

অতএব আমি হাঁটতে থাকলাম। একটু পরে আমার মনে পড়লো, ও বলেছে আমি তাকে কখনো চিনি নি। তাকে মানে উইলি স্টার্ককে, যাকে আমি চিনি বহু বছর ধরে। গ্রাম থেকে আসা কাজিন উইলি, গলায় বড়োদিনের টাই, স্লেডের পুরনো আস্তানার পেছনের ঘরে এসে ঢুকেছিলো। অবশ্যই ওকে আমি চিনি। পুঁথি পড়ার মতো চিনি। ওর সঙ্গে আমার চেনা অনেক কালের।

বড়ো বেশি কালের। আমার মনে হলো বড়ো বেশি কালের চেনা তিনি। হয়তো সময় আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো, কিংবা আমি সময়ের পরিক্রমা লক্ষই করিনি, তাঁর অন্য মুখ আর আমার মধ্যে সব সময় হয়তো কাজিন উইলির সুগোল সরল মুখ ভেসে উঠেছিলো, যার ফলে ওঁর অন্য মুখটি আমি কখনো দেখিই নি। কয়েকটি মুহূর্তের ব্যতিক্রম ছাড়া। যখন তিনি জনতার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দাড়িয়েছেন, তাঁর চুল কপালের উপর এসে ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটি বিস্ফারিত, জনতা গর্জে উঠেছে, আমি আমার নিজের মধ্যে অনুভব করেছি সমুদ্রের কল্লোল, মনে হয়েছে আমিও বুঝি সত্যের একেবারে প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু সব সময় গলায় বড়োদিনের টাই বাঁধা কাজিন উইলির মুখ আবার আমার সামনে ভেসে উঠেছে।

কিন্তু এখন তা হলো না। আমি এখন অন্য মুখটা দেখলাম। বিশাল। বিরাটাকার

দেয়ালচিত্রের চাইতেও বড়ো। সামনের চুল ঝুলে পড়েছে ঘোড়ার কেশরের মতো। প্রশস্ত চোয়াল। ভারী ওষ্ঠযুগল দৃঢ় নিবদ্ধ, ইটের গাঁথুনির মতো। চোখ দুটি জ্বলছে, বিস্ফারিত, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

ভারী মজার, আগে কখনো দেখিনি। না, ঠিক মজার নয়।

সেদিন রাতে আমি কর্তাকে ফোন করে খবরটা জানালাম, আমাকে এ্যান যে বলেছে সেকথা বললাম, তারপর তাঁকে আমার পরামর্শটা দিলাম। এ্যাডাম যদি শপথ করে অভিযোগ দায়ের করে তা হলে কফির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারির কথাও বললাম। তিনি এগিয়ে যেতে বললেন আমাকে। যা প্রয়োজন সব করতে বললেন, এ্যাডামকে হাসপাতালে রাখতেই হবে। অতএব আমি হোটেলে ফিরে গিয়ে পাখা চালিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি, উঠি একেবারে সকাল ছ'টায়, হোটেল কেরাণী ডেকে দেবার পর। সকাল সাতটার মধ্যে আমি এ্যাডামের দোরগোড়ায়, পেটে শুধু এক পেয়ালা কফি পড়েছে, চিবুকে দাড়ি কামাবার সময় সদ্য কেটে যাওয়ার দাগ, চোখে এক রাজ্যের ঘুম, বালির মতো করকর করছে দু'চোখ।

আমি কি করবো ঠিক করে ফেলেছিলাম। কঠিন কাজ, কিন্তু আমার কর্মপদ্ধতি ছিলো আগেভাগেই ঠিকঠাক করা। প্রথমে, ন্যায়নীতির কথা বলে এ্যাডামের সমর্থন আদায় করতে হবে, কফিকে গ্রেফতারের জন্য সে যেন শপথ করে অভিযোগ দায়ের করতে রাজী হয়, আমি যেন ধরেই নিয়েছি যে কফিকে শাস্তি দেবার জন্য সে অস্থির হয়ে আছে, আর কর্তা তার এই উদ্যোগে ভীষণ খুশি। তারপর ধীরে ধীরে আমি তার সামনে আরেকটা বিষয় তুলে ধরবো, আমাকে কাজটা এমনভাবে করতে হবে যেন সেটা সে তার নিজের আবিষ্কার বলেই মনে করে। এ্যানকে সাক্ষী হতে হবে। এই পর্যায়ে আমাকে প্রায় একটা বুদ্ধুর অভিনয় করতে হবে, যেন এই সম্ভাবনার কথা এর আগে আমার মাথাতেই আসেনি। তবে এ্যাডামের মতো মানুষকে নিয়ে এর মধ্যে একটা বিপদের ঝুঁকি ছিলো। সুবিচার ও ন্যায়ের জন্য সে সবকিছু উপেক্ষা করে এ্যানের সাক্ষী দানে সম্মত হয়ে যেতেও পারতো। প্রায় সেই সিদ্ধান্তই নিতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু আদালতকক্ষের একটা রক্তাক্ত চিত্র পরিবেশন করে (যদিও বাস্তবে যা হতো তার অর্ধেকও আমি বলিনি) আমি এই কাজে নিজেকে জড়াতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করি, বলি যে সে একটা অস্বাভাবিক ভাই, এবং শেষ পর্যন্ত একটা অস্পষ্ট ধারণা দিই যে কফিকে আমরা অন্যভাবে নাস্তানাবুদ করবো, দেখবো সে যেন অন্য কাউকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করে — হয়তো আমি এমনভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবো যেন সে আমার কাছেই আসে। এরপর এ্যাডাম কফির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার চিন্তা বাদ দেয়, কিন্তু তার মনে

একটা ধারণা টিকে থাকে যে, সে আর কর্তা একযোগ হয়ে হাসপাতালটাকে নিষ্কলঙ্ক রাখার চেষ্টা করছে।

আমরা ওর এ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুবার মুখে সে টেবিলের উপরে রাখা ডাকে দেয়ার জন্য টিকেট লাগানো চিঠিগুলি হাতে তুলে নেয়। আমি একদম উপরের খামটা আগেই লক্ষ করেছিলাম, কর্তার নাম-ঠিকানা লেখা। সে চিঠিগুলি হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই আমি ওর হাত থেকে ওই চিঠিটা তুলে আমার উজ্জ্বলতম হাসি হেসে বললাম, বাঃ, এর তো আর কোনো দরকার নেই, বলেই চিঠিটা আড়াআড়ি করে ছিঁড়ে টুকরো দুটো আমার পকেটে রেখে দিলাম।

তারপর আমরা দুজন বাইরে গিয়ে ওর গাড়িতে উঠলাম। ওর আপিস পর্যন্ত আমি সারাটা পথ ওর সঙ্গে ছিলাম। সম্ভব হলে ওর উপর চোখ রাখার জন্য আমি সারাদিন ওর সঙ্গে থাকতাম। যাই হোক, ওর মনটাকে স্বচ্ছন্দ রাখার জন্য আমি অনর্গল ওর সঙ্গে কথা বলে যাই। পাখির প্রাণবন্ত উৎফুল্ল কিচিরমিচিরের মতো ছিলো আমার বাক্যস্রোত।

ওইভাবে গ্রীষ্মকালটা এগিয়ে গেলো, ধীরে ধীরে একটা বিরাট ফলের মতো তা স্ফীত হলো এবং সব আবার যেমন ছিলো তেমনি আগের মতো হয়ে উঠলো। আমি দপ্তরে যেতাম, আমার হোটেলে ফিরে আসতাম, কখনো খেতাম, কখনো খেতাম না, তারপর পাখার নিচে শুয়ে অনেক রাত অবধি পড়তাম। একই মুখগুলি দেখতাম আমি, ডাফি, কর্তা, স্যাডি বার্ক, দীর্ঘ কালের চেনা সব মুখ, এত দীর্ঘকাল এবং এত বেশি বার এইসব মুখ আমি দেখেছি যে তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আমার চোখে পড়লো না। কিন্তু এ্যাডাম আর এ্যানের সঙ্গে আমার বেশ কিছুদিন দেখা হলো না। আর লুসি স্টার্ককে আমি দেখি নি অনেক দিন ধরে। ও আর এখন শহরে থাকে না। কর্তা এখনো মাঝে মাঝে ওকে দেখতে গ্রামে যান, লোকের সামনে একটা মুখোশ বজায় রাখার জন্য, খামারবাড়িতে সাদা লেগহর্ন মুরগীগুলি সামনে রেখে ছবি তোলেন। কখনো কখনো টম ওঁর সঙ্গে থাকে, হয়তো লুসিও থাকে, সামনে থাকে সাদা লেগহর্ন মুরগীগুলি, পেছনে তারের বেড়া। ছবির ক্যাপশন দেয়া হয়, গভর্নর স্টার্ক ও তাঁর পরিবার।

হ্যাঁ, কর্তার জন্য ওই ছবিগুলি ছিলো একটা মূলধন। রাজ্যের অর্ধেক লোক জানতো যে অনেক বছর ধরেই কর্তা মেয়েদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে আসছেন, কিন্তু খামারবাড়ির পরিবেশে কর্তার এই পারিবারিক ছবিগুলি ভোটারদের মনে একটা চমৎকার উষ্ণ পরিতৃপ্তির ভাব জাগাতো, তাদের নিজেদেরকে মনে হতো ভারিক্কী, সম্পন্ন এবং পুণ্যবান, ওই সব ছবি তাদের মনে করিয়ে দিতো সুস্বাদু রুটি আর

সুন্দর ঠাণ্ডা দই-এর কথা, আর কখনো সখনো উইঙ্গসের আড়ালে, নাতিদূরে, যদি মেয়েদের কালো লেস বসানো অন্তর্বাসের দ্রুত ঝলকানি চোখে পড়তো কিংবা কড়া সেন্টের গন্ধ নাকে লাগতো তখন তারা বলতো, আঃ ওকে দোষ দিও না, ওদের হাত থেকে সে নিস্তার পায় নি। তার মানে কর্তা সুবিধা লুটছিলেন দুদিক থেকেই, যা শুধু ঈশ্বর-নির্বাচিত, উন্নত স্তরের মানুষের পক্ষেই সম্ভব। ভোটার নিজেও যখন হাত-পা ঝাড়া হয়ে কোনো সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য শহরে যেতো তখন হোটেল পরিচারককে দু'ডলার দিয়ে তার ঘরে একটা মেয়ে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করতো। কিংবা অত শানদার ব্যবস্থা না নিলে, শহরে ট্রাকভর্তি করে তার শুয়োরগুলি নিয়ে আসার পর, কোনো একটা শস্তা ছোট্ট ঘরে দু'ডলার দিয়ে চুটিয়ে ফূর্তি করে নিতো। শানদার হোটেলে হোক কিংবা শস্তা ছোট্ট ঘরে হোক ভোটার ব্যাপারটা বুঝতো, স্ত্রীর তৈরি সুস্বাদু রুটি আর কালো লেস বসানো অন্তর্বাস দুটোই কামনা করতো সে, আর কর্তা যে দুটোই পাচ্ছেন তার জন্য তাঁকে ওরা খুব দোষ দিতো না। কিন্তু তিনি যদি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতেন তা হলে ভোটাররা তাঁর বিরুদ্ধে চলে যেতো। এ্যান এটা ঠিকই ধরেছিলো। এতে কর্তার ক্ষতি হতো। ওটা একটা ভিন্ন ব্যাপার, তার ফলে ভোটার একটা মূল্যবান জিনিস থেকে বঞ্চিত হতো, একটা চমৎকার উষ্ণ পরিতৃপ্তির ভাব থেকে মুরগীর খাঁচার সামনে তার স্থূলাঙ্গী কিংবা ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীসহ যে ছবি তাকে আনন্দ দেয়, তা সে হারাতো।

ইতোমধ্যে, ভোটাররা কর্তার অনেক কাল ধরে মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টির কথা এবং সংশ্লিষ্ট মেয়েদের প্রায় অর্ধেকের নামধাম জানলেও এ্যান স্ট্যান্টনের কথা কেউ জানতো না। স্যাডি টের পায় কিন্তু সেটা অত্যাশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে যতটুকু জানলাম তাতে বুঝলাম যে আর কেউ জানে না, এমন কি তার ফ্যাঁসফেঁসে স্থূল রসবোধ নিয়ে ডাফিও এ খবরটা পায়নি। সম্ভবতঃ সুগার-বয় জানে, তবে তার উপর নির্ভর করা যায়। তার অজানা কিছুই ছিলো না। কর্তা সুগার-বয়ের সামনে কিছু বলতে দ্বিধা করতেন না, যদি কখনো কিছু বলতে চাইতেন। তার মানে হয়তো এই যে অনেক কিছু না-বলা থেকে যেতো। একবার কর্তা তাঁর লাইব্রেরি ঘরে কংগ্রেসম্যান র‍্যান্ডালকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন। কংগ্রেসে মিল্টন-ব্রডারিক বিলটি উত্থাপিত হলে র‍্যান্ডাল কি বলবে, কি করবে, সে সম্পর্কে কর্তা তাকে বিশদভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছিলেন। ওই ঘরে আমি ও সুগার-বয়ও ছিলাম। র‍্যান্ডালকে একটু অস্থির ও চঞ্চলভাবে বারবার সুগার-বয়ের দিকে তাকাতে দেখে কর্তা বলেছিলেন, আরে, সুগার-বয় কিছু জেনে ফেলছে এই ভেবে তোমার ভয় হচ্ছে নাকি? ঠিকই ধরেছো, সুগার-বয় কিছু জেনে ফেলছে। তো, সুগার-বয় অনেক কিছুই জেনে

ফেলেছে। এই স্টেট সম্পর্কে তুমি যা জানো তার চাইতে অনেক বেশি জানে সুগার–বয়। আর তোমাকে আমি যতটুকু বিশ্বাস করি তার চাইতে অনেক বেশি বিশ্বাস করি সুগার–বয়কে। এই যে সুগার–বয়, তুমি আমার ইয়ার, তাই না?

সুগার–বয়ের মুখ খুশির উচ্ছ্বাসে লাল হয়ে উঠেছিলো। সে কিছু বলার জন্য তৈরি হলো, তার ঠোঁট নড়ে উঠলো, মুখ থেকে থুতু ছিটোতে শুরু করলো।

কর্তা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, সুগার–বয় আমার ইয়ার, তাই না, সুগার–বয়? তারপরই তিনি কংগ্রেসম্যানের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর ততক্ষণে সুগার–বয় কোনোরকমে বলতে পেরেছিলো, আমি আপনার ই – ই – ই – ইয়ার, আর আমি কো – কো – কোনো কথা বলি না।

আর স্যাডিও ছিলো নির্ভরযোগ্য। রাগের প্রথম প্রচণ্ড তাড়নায় সে আমাকে বলে ফেলেছিলো, কিন্তু আমি (এক ধরনের নির্মম কৌতুকের সঙ্গে ভেবেছিলাম) ছিলাম, বলতে গেলে, পরিবারের সদস্য। আর কাউকে স্যাডি একথা বলবে না। গোপন কথা বলার মতো কোনো বন্ধু স্যাডি বার্কের ছিলো না, কারণ সে কাউকে বিশ্বাস করতো না। সে কখনো কারো সহানুভূতি চাইতো না, কারণ যে জগতে সে বেড়ে উঠেছিলো সেখানে ওই রকম পরিবেশই ছিলো না। সে মুখ টিপে বসে থাকতো। আর তার ধৈর্য ছিলো বিপুল। সে জানতো যে উইলি স্টার্ক ফিরে আসবে। আর ইতোমধ্যে সে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতো, অন্ততঃ চেষ্টা করতো ক্ষেপিয়ে তুলতে, কারণ তাকে ক্ষেপানো সহজ ছিলো না। সে নিজেও ক্ষেপে উঠতো, এক সময় মনে হতো এখনই বুঝি ওরা একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শেষে তাদের ঝগড়া এমন তালগোল পাকিয়ে যেতো যে এর উৎস কি, প্রেম না ঘৃণা, সেটা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়তো। অবশ্য বছরের পর বছর এরকম চলার পর ওই প্রশ্নটাও বোধহয় অর্থহীন হয়ে পড়েছিলো। স্যাডির কাগজের মতো সাদা দাগ–ভর্তি মুখে কালো কালো চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলতো, তার চুল তালু থেকে লাফিয়ে উঠতো যেন বৈদ্যুতিক স্পর্শ পেয়েছে, হাত দুটি সে বাড়িয়ে দিতো সামনের দিকে যেন নখ দিয়ে কিছু চিরে ফেলতে চাইছে। তার মুখ দিয়ে অনর্গল বাক্যস্রোত নির্গত হতো আর কর্তা তাঁর বিশাল মাথাটি খুব সামান্য এপাশ–ওপাশ নাড়তেন, স্যাডির প্রতিটি ভঙ্গি দেখতেন তাকিয়ে তাকিয়ে, প্রথমে ঘুমঘুম চোখে, তারপর মনোযোগের সঙ্গে, শেষে একসময় সবেগে উঠে দাঁড়াতেন, কপালের উপর তাঁর বড়োবড়ো শিরাগুলি দপ দপ করতো, তিনি ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সজোরে বাম হাতের তালুতে আঘাত করে ফেটে পড়তেন, বলতেন, তুমি জাহান্নামে যাও, স্যাডি, জাহান্নামে যাও।

কিংবা কয়েক সপ্তাহ কোনোরকম হাঙ্গামা–হুজ্জোত ছাড়াই কেটে যেতো।

কর্তার সঙ্গে স্যাডির আচরণে প্রকাশ পেতো একটা বরফশীতল সৌজন্য। কাজের ব্যাপারে এবং কাজের সময়ে ছাড়া সে তাঁর সামনে আসতো না, যখন আসতো তখন তিনি কথা বলতেন আর স্যাডি তাঁর সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো, কালো চোখ দুটি মেলে তাঁকে লক্ষ করতো, সে-চোখের আগুন তখন থাকতো আড়াল করা। যাবতীয় ঝগড়া-ঝাটি সত্ত্বেও স্যাডি জানতো কেমন করে অপেক্ষা করতে হয়। অনেক কাল আগেই সে এই গুণ আয়ত্ত করেছিলো। এই পৃথিবীতে সে যা কিছু পেয়েছে তার প্রতিটির জন্যই তার অপেক্ষা করতে হয়েছিলো।

তো এইভাবে গ্রীষ্মকাল কেটে গেলো এবং আমরা তার মধ্যে বেঁচে রইলাম। তা বেঁচে থাকার একটা ধরণ ছিলো বৈকি সেটা, এবং কিছু কাল এক ধরনের জীবনযাপন করলে অন্য একটা ধরন কখনো ছিলো কিনা কিংবা ভবিষ্যতে আবার হতে পারে কিনা মানুষ সেকথা ভুলে যায়। তখন পরিবর্তন আসলেও প্রথমে তাকে পরিবর্তন বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় সেটা বুঝি একই জিনিসের সম্প্রসারণ এবং পুনরাবৃত্তি।

পরিবর্তনটা এলো টম স্টার্কের মধ্য দিয়ে।

যে উপাদানগুলি উপস্থিত ছিলো তাতে এরকম কিছু যে ঘটবে তা সুনিশ্চিতভাবে বলে দেয়া যেতো। একদিকে ছিলেন কর্তা, আর অন্যদিকে ছিলো ম্যাকমারফি। ম্যাকমারফির সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। কর্তার বিরুদ্ধে তাকে লড়তেই হয়, কারণ কর্তা তার সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনাতেই আসবেন না। আর কর্তা যদি (ব্যাপারটা ক্রমেই আর যদি নয়, বরং কখন-এর প্রশ্ন হয়ে উঠছিলো) একবার ম্যাকমারফিকে চতুর্থ জেলায় ধরাশায়ী করতে পারেন তাহলে সে চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই ওর সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিলো না, এবং হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই সে ব্যবহার করলো।

আর হাতের কাছে যা সে পেলো তা হলো মার্ভিন ফ্রে নামক একজন মানুষ, ইতিপূর্বে অখ্যাত। ফ্রের একটি কন্যা ছিলো, নাম সিবিল, সেও ছিলো অখ্যাত-অবজ্ঞাত, কিন্তু টম স্টার্কের কাছে নয়। ব্যাপারটা ছিলো সরল, কাহিনীর কোনো নতুন মোড় নয়, পাণ্ডুলিপিতে কোনো নতুন লাইন নয়। পুরনো দাওয়াই। সরল। সরল এবং কুৎসিৎ।

লাঞ্ছিত ও অপমানিত পিতা কর্তার সঙ্গে দেখা করে তার অভিযোগ পেশ করলো। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো এক বন্ধুকে, নিঃসন্দেহে সাক্ষী এবং রক্ষাকর্তা রূপে। যখন কর্তার ঘর থেকে বেরুলো তখন তার মুখ সাদা, বিপর্যস্ত অবস্থা, কিন্তু তখনো হাঁটবার মতো জোর আছে পায়ে। বন্ধুর অপর্যাপ্ত সহায়তায় সে কর্তার ঘরের দরজা

থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ কার্পেট পেরিয়ে করিডরের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো। তখন বন্ধুর পদযুগলও তাদের ঋজুতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে।

তারপরই আমার টেবিলের উপরের যন্ত্রটি পাগলের মতো বেজে ওঠে। ছোট লাল বাতিটি জ্বলে উঠে বুঝিয়ে দিলো যে এ আহ্বান কর্তার। আমি সুইচ টিপতেই কর্তার গলা পেলাম, শোনো, এক্ষুণি চলে এসো। ওঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলে আমার উপর দুটো দায়িত্ব অর্পণ করলেন ঃ প্রথম, টম স্টার্ককে খুঁজে বার করে ধরে নিয়ে আসতে হবে আর দ্বিতীয়, মার্ভিন ফ্রে সম্পর্কে তাবৎ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

হাইওয়ে প্যেট্রলের প্রায় অর্ধেক সদস্যের দিনভর প্রচেষ্টার পর টম স্টার্কের খোঁজ পাওয়া গেলো। বিগার্স বে-র একটি মৎস্য শিকারীদের কুটিরে কয়েকজন স্যাঙাত আর তরুণী নিয়ে টম স্ফূর্তি করছিলো। কয়েকটা ভেজা গ্লাস আর কিছু শুকনো মাছ ধরার সরঞ্জাম পাওয়া যায় সেখানে। ওরা যখন টমকে নিয়ে হাজির হলো তখন প্রায় ছ'টা বাজে। আমি সে সময় অভ্যর্থনাকক্ষে ছিলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে সে বললো, হাই, জ্যাক, তারপর কর্তার ঘরের দরজার দিকে মাথা হেলিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ওঁকে আবার নতুন কি কামড়ালো?

আমি বললাম, তিনিই বলবেন।

টমকে কর্তার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম আমি। চমৎকার দেহের গড়ন ওর, পরনে ময়লা সাদা প্যান্ট, পায়ে স্যান্ডেল, গায়ে হাল্কানীল খাটো হাতার সিল্কের স্পোর্ট শার্ট পেশীবহুল শরীরের সঙ্গে প্রায় সেঁটে আছে, তার বাদামী রঙের বাহুর সামনের দিকের মাংসপেশীর উপর দিয়ে উপচে পড়ছে। মাথায় সাদা টুপী, একটু সামনের দিকে ঝোঁকানো তার মাথা, হাঁটার ভঙিতে খুব সামান্য দোলানির আভাস, ঝোলানো হাতদুটি কনুইর কাছে ঈষৎ বাঁকানো। হাত দুটিকে ওই রকম ঝুলে থাকতে দেখে আপনার মনে হবে যেন দুটি অস্ত্র, এইমাত্র খুলে আনা হয়েছে, ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। দরজায় টোকা না দিয়েই সে সোজা কর্তার আপিস ঘরে ঢুকে গেলো। আমি আমার নিজের ঘরে পালিয়ে গেলাম । ঝড়টা শেষ হোক আগে। ব্যাপার যাই হোক না কেন, টম নীরবে নত মস্তকে সবকিছু মাথা পেতে নেবে না, কর্তার কাছ থেকেও না।

আধ ঘণ্টা পরে টম বেরিয়ে এলো। সে এতো জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা বন্ধ করলো যে বিশাল অভ্যর্থনাকক্ষের দেয়ালে লাগানো সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই প্রাক্তন গভর্নরদের ছবিগুলি ঝোড়ো হাওয়ায় শরতের পত্রপল্লবের মতো তির তির করে কেঁপে উঠলো। আমার ঘরের দরজা খোলা ছিলো কিন্তু সে ওদিকে দৃকপাতও

করলো না, লম্বা লম্বা পা ফেলে অভ্যর্থনাকক্ষ পার হয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেলো। কর্তা আমাকে পরে বলেছিলেন যে প্রথমে টম সব কিছু অস্বীকার করে। পরে অবশ্য সমস্তই স্বীকার করে নেয়, সোজা কর্তার চোখে চোখ রেখে, যেন বলতে চাইছে ঃ আপনি কেন এসবের মধ্যে নাক গলাচ্ছেন? টম চলে যাবার কয়েক মিনিট পরে আমি যখন ওঁর ঘরে গেলাম তখন তাঁকে প্রায় বেঁধে রাখার মতো অবস্থা। আইনগত দিক থেকে শুধু একটা ব্যাপারে তিনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করেন। টমের নিজের ভাষ্য অনুযায়ীই টম ছিলো সিবিলের আরো কতিপয় পুরুষ বন্ধুদের একজন। কিন্তু আইনগত দিক বাদ দিলে এ ব্যাপারটাই কর্তাকে আরো বেশি ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো, একটা দলের মধ্যে টমের একজন হওয়ার বিষয়টা। সিবিলের দাবী করা সন্তানের পিতৃত্বের আলোচনায় এতে কিছু সুবিধা হতে পারে, কিন্তু এতে যেন কর্তার অহঙ্কারে চোট লাগলো।

টমকে খুঁজে বার করে নিয়ে আসা হয়েছে। আমার উপর অর্পিত দায়িত্বের একটি আমি পালন করেছি। দ্বিতীয়টি আরেকটু সময় নিলো। মার্ভিন ফ্রে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কাজটি। মনে হলো, সংগ্রহ করার মতো তেমন কিছু নেই। চতুর্থ জেলায় ডুবোয়ভিল নামে একটি মাঝারি আকারের শহরের একমাত্র হোটেলে সে নরসুন্দরের কাজ করে। খুব সৌখিন ধরনের নাপিত, ডোরাকাটা প্যান্টের ভাঁজ সর্বদা নিখুঁত, হাল্কা হয়ে আসা চুল পাট করে আঁচড়ানো, হাত ফোলা ফোলা, যেন রাবারের দস্তানা, প্যান্টের পকেটে ঘোড়দৌড়ের কাগজ, নরম বেঢপ নাকের উপর লাল শিরার দাগ, লাল আঙুরলতার মতো, নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে সেন-সেনের মিষ্টি গন্ধ। ফ্রে বিপত্নীক, দুই কন্যাকে নিয়ে থাকে। এই জাতীয় লোক সম্বন্ধে কাউকে খোঁজ নিয়ে বেশি কিছু বার করতে হয় না। সব প্রায় জানাই আপনার। নিঃসন্দেহে সে একটি অমর আত্মার অধিকারী, ওই আত্মা তার একান্ত নিজস্ব এবং ঈশ্বরের চোখে মহার্ঘ, এবং সে হলো আণবিক শক্তিনিচয়ের সেই অনন্য সমাহার যে মার্ভিন ফ্রে নামে পরিচিত। কিন্তু তার সম্পর্কে সবকিছু আপনার জানা। তার সব কৌতুক আপনি জানেন, কৌতুকটি বলবার আগে নাকী সুরে দুষ্টু ইঙ্গিত দেয়া হি-হি শব্দ করে সে যে-ভূমিকা ফাঁদে তা আপনার জানা, শেষ করার পর সে যেভাবে তার ধূসর জিভ দিয়ে পরম বিলাসিতার সঙ্গে ঠোঁট চাটে তাও আপনার জানা। চুল কাটাতে বা দাড়ি কামাতে এসেছে স্থানীয় ব্যাঙ্কার কিংবা জুয়াখেলার আস্তানার স্থানীয় মালিক কিংবা স্থানীয় জন-প্রতিনিধি, কংগ্রেসম্যান, তাদের মুখে ভাঁপ ওঠা তোয়ালে জড়ানো, সে-মুখ এখন অসাড় মাংসস্তূপের মতো, ফ্রে কিভাবে সেসব মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বিনীত দাসের মতো তাদের তোয়াজ করে তাও আপনার

জানা। হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে সে কিভাবে ঠাট্টা-মশকরা করে, তাদের কাছ থেকে কিভাবে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করে তাও আপনার অজানা নয়। ভুল ঘোড়ার উপর বাজী ধরে আর জুয়ার টেবিলে দুর্ভাগ্যের ফলে সে কিভাবে দেনার জালে জড়িয়ে পড়ে তাও আপনার জানা। সকাল বেলা ঘুম ভাঙার পর সে কিভাবে খাটের কিনারে বসে ঠাণ্ডা মেঝের উপর তার খালি পা নামিয়ে দেয়, মুখ তামার মতো বিস্বাদ, কিভাবে নামহীন হতাশার অনুভূতিতে তার চিত্ত ছেয়ে যায় তাও আপনার জানা। আপনি জানেন যে তার দারিদ্র্য, ভীতি এবং আত্মাভিমানের সমাহার নিয়ে সে তার শেষ অহঙ্কার ও শেষ লজ্জাটুকু বিকিয়ে দেবার জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে। সে নিখুঁতভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে ম্যাকমারফি কর্তৃক ব্যবহৃত হবার জন্য। কিংবা আর কারো দ্বারা।

কিন্তু ম্যাকমারফিই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলো। মার্ভিনের প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় অবশ্য ব্যাপারটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। সেটা ধরা পড়ে কয়েক দিন পর। একদিন ম্যাকমারফির এক অনুচর কর্তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সে তাঁকে জানায় যে ম্যাকমারফি শুনেছে, ফ্রে নামক একটি লোকের সিবিল নামক একটি মেয়ের সঙ্গে টম স্টার্ক একটা লটর-পটর ব্যাপার ঘটিয়েছে, কিন্তু ম্যাকমারফি চিরকাল ফুটবলের অনুরক্ত, টম যেভাবে বল নিয়ে ছোটে সেটা সে ভীষণ ভালোবাসে এবং সে চায় না যে ওইরকম একটি ছেলে অপ্রীতিকর কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু, লোকটি কর্তাকে জানায়, ফ্রে কোনোরকম যুক্তির কথা শুনতেই চায় না। সে টমকে বাধ্য করবে তার কন্যাকে বিয়ে করতে। (এই পর্যায়ে কর্তার মুখ নিশ্চয়ই দেখার মতো হয়েছিলো।) কিন্তু ফ্রে বাস করে ম্যাকমারফির জেলায়, ম্যাকমারফি তাকে অল্পস্বল্প চেনেও, ম্যাকমারফি সম্ভবতঃ ফ্রের মাথায় কিছুটা বুদ্ধি-বিবেচনা ঢোকাতে পারবে। অবশ্য কাজটা করতে গেলে কিছু খরচ পড়বে, কিন্তু কোনো হৈ চৈ হবে না, লোকজন কিছু জানবে না, এবং টমের অবিবাহিত যুবক-পরিচিতি অক্ষুণ্ন থাকবে।

এর জন্য কি মূল্য দিতে হবে? তা সিবিলকে তো কিছু টাকা দিতে হবে। মুখ বন্ধ রাখার টাকা।

অর্থাৎ ম্যাকমারফি এ কাজটা করছে শুধু তার মহান হৃদয় ও উদার স্বভাবের জন্য।

এর জন্য কি মূল্য দিতে হবে? তো ম্যাকমারফি সিনেটর হবার কথা ভাবছিলো।

তা হলে এইটেই কথা।

কিন্তু, এ্যান স্ট্যান্টন আমাকে বলেছে, কর্তা নিজেই সিনেটে যাবার কথা

ভাবছিলেন। বলা যায় সেটা তার পকেটেই আছে। স্টেট তো তাঁর পকেটে রয়েছেই। শুধু ম্যাকমারফি ছাড়া। ম্যাকমারফি আর মার্ভিন ফ্রে। তবু, ম্যাকমারফির সঙ্গে দরাদরি করার মতো মনের অবস্থা তাঁর নয়। দরাদরি তিনি করলেন না, কিন্তু তাকে ঝুলিয়ে রেখে একটু সময় নিলেন।

এই ঝুঁকিটা যে তিনি নিলেন, ঝুলিয়ে রাখতে যে পারলেন তার একটা কারণ ছিলো। মার্ভিন আর ম্যাকমারফির হাতে যদি সমস্ত মাল-মশলা থাকতো, নির্ভুলভাবে থাকতো, তারা যদি কর্তাকে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম হতো, তা হলে এতো ধানাইপানাই না করে ইতিমধ্যেই সেটা করে ফেলতো। তা হলে তারা আর দরকষাকষির মধ্যে যেতোই না। তাদের হাতে কিছু তাস অবশ্যই আছে, কিন্তু সরাসরি ফ্লাশ পাবার মতো অতোটা নেই, আর তাই তাদেরকেও জুয়োখেলায় নামতে হয়েছে। তাদেরকেও অপেক্ষা করতে হচ্ছে, ইতিমধ্যে কর্তা ভাবনা-চিন্তা করতে থাকুন। ওদের আশা ভাবনা-চিন্তা করে তিনি অপ্রীতিকর কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না।

কর্তা যখন তাঁর ভাবনাচিন্তা নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় আমি লুসি স্টার্কের সঙ্গে দেখা করতে যাই। লুসি আমাকে চিঠি দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে। ও কি চায় তা আমি বুঝেছিলাম। টম সম্পর্কে ও কথা বলতে চায়। স্পষ্টতঃই টমের কাছ থেকে ও কিছুই জানতে পারে নি। অন্ততঃ যাকে সে সত্য, নির্ভেজাল পরিপূর্ণ সত্য, বলে মনে করে তা জানতে পারে নি। আর টমের ব্যাপার নিয়ে ও কর্তার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না, কারণ ওই প্রসঙ্গে তারা কখনোই ঐকমত্যে পৌছায় নি। তো এখন লুসি আমাকে প্রশ্ন করবে, আমি তার খামারবাড়ির বসবার ঘরে লাল রঙের পুরু গদীমোড়া সোফায় বসে ঘামতে থাকবো। লুসি এখন ওখানেই থাকে। কিন্তু আমি যাবো। বহু আগে আমি একটা বিষয়ে মন স্থির করে ফেলেছিলাম। লুসি স্টার্ক যদি কখনো আমাকে কিছু করতে বলে তাহলে আমি তা করবো। এর কারণ ঠিক এই নয় যে আমি লুসি স্টার্কের কাছে কোনো কিছুর জন্য নিজেকে ঋণী মনে করতাম, কিংবা ভাবতাম যে কোনো কিছুর জন্য আমার তাকে ক্ষতিপুরণ দিতে হবে , কিংবা কোনো কিছুর জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অন্ততঃ ঋণ যদি আমার কোথাও থাকে তবে সেটা লুসি স্টার্কের কাছে নয়, এবং ক্ষতিপুরণ যদি দিতে হয় তবে সেটা তাকে নয়। ঋণ যদি থাকে তো সেটা আমার নিজের কাছে, এবং আমার নিজের কাছ থেকে। ক্ষতিপুরণের কথা যদি ওঠে তবে সেটা আমি পাবো, এবং দিতেও হবে আমাকেই। আর প্রায়শ্চিত্ত? আমি এমন কোনো অপরাধ করি নি যার জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমার একমাত্র অপরাধ আমি মানুষ, আমি

বাস করি মানুষের জগতে, কিন্তু এর জন্য তো বিশেষ কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। ওই ক্ষেত্রে অপরাধ এবং প্রায়শ্চিত্ত নিখুঁতভাবে মিলে যায়। উভয়েই এক হয়ে ওঠে।

উপসাগরের দিকে যদি আপনি কখনো গিয়ে থাকেন তা হলে এই ধরনের বাড়ি আপনার কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। সাদা ফ্রেম, কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য অনেক দিন আগেই ক্ষয়ে গেছে। একতলা, সামনে চওড়া গ্যালারি, তার চালাটা ধরে রেখেছে সরু কয়েকটা থাম। বাড়ির ছাদ টিনের, তার জোড়ের জায়গাতে মর্চে পড়ার হাল্কা লাল দাগ দেখা যায়। সমস্ত জিনিসটা ইটের থামের উপর উঁচু করে বানানো, নিচে জালিকাটা ঠাণ্ডা ছোট্ট একটা ঘরের মতো, তার সামনে ফুলের বেড, সেখানে এসে জড়ো হয় মুরগীগুলো, ধুলোর মধ্যে হুটোপুটি করে, আর একটা বুড়ো কুকুর গরমের দিনে সেখানে এসে শুয়ে পড়ে ধুঁকতে থাকে। খামারবাড়িটা রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে, তার সামনের মাঠে ঘাস শুকিয়ে তামাটে হয়ে গেছে এই সময়টায়। দুদিকে শানবাঁধানো পথ, সময়ের সঙ্গে বেমানান, ফটকের কাছে এসে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। মহাসড়কের কিনারার মাটি এখানে কাঁচা কাঁচা দেখায়। ফটকের কাছে শানবাঁধানো পথটির দু'পাশে দুটো গোলাকার ফুলের বেড, মোটরগাড়ির পুরানো টায়ার পেতে তার ভেতরের জায়গায় মাটি ফেলে ফুলের বেড বানানো হয়েছে। দুটো বেডেই কিছু জিনিয়া ফুটে আছে, লোমশ কোনো প্রাণীর মতো, ঝলমলে রোদ্দুরে উজ্জ্বল। বাড়ির দুই প্রান্তে দুটি সজীব ওক্ বৃক্ষ, তবে মহান ও বিশাল কিছু নয়। বাড়ি ছাড়িয়ে গেলে তার দুপাশে দেখা যায় মুরগীর ঘর, গোলাঘর, রঙ করা হয় নি। কিন্তু বছর ও দিনের ওই শান্ত সময়ে, প্রায় ঘাসশূন্য মাঠ, পরিচ্ছন্ন ফুলের বেড, সামনে অহঙ্কারী এক টুকরো শান-বাঁধা পথ এবং দুই প্রান্তে দুটি ওক্ গাছ নিয়ে শেষ-গ্রীষ্মের ওই অপরাহ্ণের মাঝখানে চুপচাপ বসে থাকা বাড়িটিকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন একজন সম্ভ্রান্ত, মাঝবয়েসী ভদ্রমহিলা তাঁর পরিষ্কার সূতীর পোশাক পরে, দোল-চেয়ারে বসে, পেটের উপর দু'হাত জড়ো করে বিশ্রাম নিচ্ছেন, পায়ে সাদা মোজার সঙ্গে কালো জুতো, মাথায় ঈষৎ লালচে চুল খোঁপা করে বাঁধা, তাঁর দিনের কাজ সমাপ্ত, ব্যাটাছেলেরা এখন মাঠে, রাতের রান্না আর বিকালের দুধ ছাঁকবার কথা ভাববার সময় এখনো হয় নি।

আমি শান-বাঁধানো পথ দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে গেলাম, যেন ওই সাদা লেগহর্ন মুরগীগুলির ডিমের উপর দিয়ে হাঁটছি।

লুসি আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে গেলো। যেমন ভেবেছিলাম অবিকল সেই রকম। কালো খোদাই করা বাদাম কাঠের আসবাবপত্র, লাল সিল্কের ঢাকনিতে

মোড়া, কয়েকটা ঝালর এখনো ঝুলছে, কালো খোদাই করা বাদাম কাঠের টেবিলের উপর বাইবেল, একটা স্টেরিওস্কোপ, একতাড়া ছবির কার্ড সুন্দর করে তার পাশে রাখা, মেঝেতে ফুলের নকশা করা কার্পেট, যেসব জায়গা খুব বিবর্ণ হয়ে গেছে তার উপর ছোট ছোট কাপড়ের কম্বল পেতে দেয়া হয়েছে, দেয়ালভর্তি বাদাম কাঠের গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো ক্যালভিনীয় মুখের ছবি, স্থির দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। সে-দৃষ্টিতে সামান্যই সহানুভূতির আভাস। ঘরের জানালাগুলি বন্ধ, পর্দা টানা, ঘরের ভেতরের ছায়াছায়া জলো আলোয় আমরা একটুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম, যেন কারো শেষকৃত্যে এসেছি। সিল্কের কাপড়ের উপর চেপে রাখা আমার করতল চিনচিন করে উঠলো।

লুসি সেখানে এমনভাবে বসেছিলো যেন আমি আসিই নি, তার দৃষ্টি আমার পানে নয়, সে মুখ নিচু করে তাকিয়েছিলো কার্পেটের ফুলের নকশার দিকে। আমি স্টার্কদের বাসভবনে যখন ওকে প্রথম দেখি তখন তার মাথায় ছিলো গাঢ় বাদামী রঙের প্রচুর চুল, পরে মেসন সিটির প্রসাধনকর্মী সেই চুল ঘাড়ের কাছ অবধি রেখে, বাকীটা ছেঁটে ফেলে, ইস্ত্রীর সাহায্যে ঢেউ তুলে দিয়েছিলো ওই চুলে, এখন আবার তা নিজের পুরনো দৈর্ঘ ফিরে পেয়েছে। হয়তো তার বাদামী সোনালী চুলের দীপ্তি এখনো আগের মতোই আছে, ঘরের আবছা আলোয় আমি তা দেখতে পাই নি। তবে দোরগোড়ায় ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার সময়েই আমি ওর চুলে কিছু কিছু সাদার ছোঁয়া লক্ষ করেছি। আমার উল্টো দিকে সে লাল কাপড়ে মোড়া ঋজু, খোদাই করা, বাদাম কাঠের চেয়ারে বসেছিলো, সামনে প্রসারিত, এখনো সুন্দর দেখতে, এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে দিয়ে, কোমর আর এখন আগের মতো ছোট নয়, তবে এখনো সোজা, বুক ভরাট, কিন্তু গরমের দিনের হাল্কা নীল পোশাকের নিচে বেঢপ নয়। তার মুখের কোমল স্নিগ্ধ প্রান্তরেখাগুলি আর আগের মতো তরুণীসুলভ নেই। বহুকাল আগে স্টার্কের বাবার ওখানে যখন তাকে এক বিকালে প্রথম দেখি এখন আর তার সেই মুখ নেই। একটু ওজনের আভাস দেখা যাচ্ছে সেখানে, মাংসে সামান্য একটু নিচুমুখি টান, এই জাতীয় মুখের যা অবধারিত প্রাথমিক অভিশাপ এবং অনিবার্য পরিণতি। ওই রকম কোমল স্নিগ্ধ মুখ বিশেষ করে খুব অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ শুভবোধকে গভীরভাবে উজ্জীবিত করে, তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় মাতৃত্বের পবিত্রতার কথা, হ্যাঁ, আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডোনার ছবি আঁকার কথা ভাবতেন তাহলে আপনি সেখানে ওই রকম মুখ বসিয়ে দিতেন। কিন্তু আপনি তো সে-ছবি আঁকছেন না, অতএব ইতোমধ্যে ওরা ওই মুখ তুলে ধরতে চেষ্টা করছে ওদের নানা বিজ্ঞাপনে — ময়দার কেকে,

শিশুর ন্যাপিতে, আটার রুটিতে — সৎ, সুন্দর, স্বাস্থ্যবতী, বিশ্বাসভাজন, সাহসী, কোমল একটি মুখ, যৌবনের আভায় দীপ্তিমান। এই বিশেষ মুখটিতে এখন আর যৌবনের দীপ্তি নেই, কিন্তু কথা বলার জন্য লুসি স্টার্ক যখন মুখ তুললো তখন আমি দেখলাম যে তার গভীর-বাদামী বড়ো বড়ো চোখে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসে নি। কাল এবং নানা উপদ্রব তার মধ্যে আরেকটু গভীরতা এনে দিয়েছে, তাকে একটু ছায়াচ্ছন্ন করেছে, কিন্তু ওই পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়।

ও বললো, টমের ব্যাপারে ডেকেছি।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

লুসি বললো, আমি জানি একটা গোলমাল হয়েছে।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

বলো আমাকে।

আমি শুকনো বাতাস আর বন্ধ ঘরের আসবাবপত্রের পালিশের গন্ধ নাকে টেনে নিলাম। শোভনতা, যত্ন আর পরিমিত আশার গন্ধ। লাল সিল্কের কাপড়ে মোড়া সোফায় আসীন আমি ভারী বিব্রত বোধ করলাম, আমার করতলে ওই সিল্কের কাপড় যেন কাঁটার মতো বিঁধলো।

ও বললো, জ্যাক, আমাকে সত্য কথাটা বলো। সত্য কথাটা আমাকে জানতেই হবে, জ্যাক। তুমি আমাকে সত্য কথাটা বলবে। তুমি সব সময়ই আমাদের ভালো বন্ধু ছিলে, সেই কবে থেকে, কত কাল আগে থেকে, উইলি আর আমার বন্ধু ছিলে তুমি — যখন —

ওর গলার স্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

অতএব আমি ওকে সত্য কথাটা বললাম। মার্ভিন ফ্রে যে দেখা করতে এসেছিলো সেকথাও বললাম।

আমি যখন এসব কথা বলছিলাম তখন লুসি তার কোলের উপর নিজের দুহাত জড়িয়ে রেখেছিলো। তারপর তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো এবং স্থির হয়ে গেলো। সে বললো, ওকে এখন একটা কাজই করতে হবে।

ইয়ে, একটা ব্যবস্থা সম্ভবতঃ করা যাবে —

বাধা দিয়ে লুসি বলে উঠলো, একটাই ঠিক পদক্ষেপ আছে।

আমি অপেক্ষা করে থাকলাম।

সে মেয়েটিকে — বিয়ে করবে। মাথা সোজা উঁচু করে সে কথাটা বললো।

আমি একটু ইতস্তত করলাম, তারপর বললাম, তো — কথাটা হচ্ছে কি — মানে, ওখানে সিবিলের আরো কিছু ছেলেবন্ধু ছিলো, যারাও —

এবার অত্যন্ত নিচু গলায় লুসি বললো, ওহ্, ভগবান! এতো নিচু গলায় যে প্রায় শোনাই গেলো না। আমি আবার দেখলাম কোলের উপর তার হাত একবার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে, আরেকবার খুলছে।

একবার যখন শুরু করেছি তখন আমি আর ইতস্তত করলাম না, বললাম, তাছাড়া আরেকটা দিকও আছে। কিছু রাজনীতিও মিশে আছে এর মধ্যে। ইয়ে, ম্যাকমারফি চায় যে —

আবার লুসি বলে উঠলো, ওহ্ ভগবান, তারপর হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত সে তার বুকের উপর চেপে ধরে প্রায় ফিসফিস করে বললো, ওহ্ ভগবান, রাজনীতি! সে অস্থিরভাবে আমার দিক থেকে সরে অন্যদিকে দু'পা এগিয়ে গেলো, তারপর আবার বললো, রাজনীতি! তারপরই সে সবেগে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, এবার উঁচু গলায়, ওহ্ ভগবান, এর মধ্যেও রাজনীতি!

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ, প্রায় সব জিনিসের মধ্যে যেমন তেমনি এর মধ্যেও।

সে একটা জানালার কাছে গিয়ে আমার আর ঘরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো, পর্দার একটা ফাঁক দিয়ে বাইরের সূর্যালোক-উদ্ভাসিত উত্তপ্ত পৃথিবীর দিকে তাকালো, যেখানে সব কিছু ঘটে।

মিনিটখানেক পর ও বললো, কি বলতে যাচ্ছিলে বলো।

অতএব, সে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকলো, আর আমি তার দিকে না তাকিয়ে যেখানে একটু আগে সে বসেছিলো সেই শূন্য চেয়ারকে লক্ষ্য করে ম্যাকমারফির প্রস্তাব ও বর্তমান পরিস্থিতির কথা তাকে জানালাম।

আমার কণ্ঠস্বর থামলো। তারপর আবার মিনিট খানেকের নীরবতা। শেষে ওই নীরবতা ভঙ্গ করে আমি জানালার কাছ থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুনলাম। এই রকমই বোধহয় হবার ছিলো, জ্যাক। আমি সব সময় ঠিক কাজটিই করতে চেয়েছি, জ্যাক, কিন্তু এই রকমই বোধহয় হবার ছিলো। ওহ্, জ্যাক — জানালার দিক থেকে সে ঘুরে দাঁড়াতে আমি তার পোশাকের খসখস শব্দ শুনলাম।

লুসি বললো, ওহ্, জ্যাক, আমি ঠিক কাজটি করতে চেষ্টা করেছিলাম। আমি আমার ছেলেকে ভালোবেসেছি, আমি চেষ্টা করেছি তাকে ঠিক মতো বড়ো করে তুলতে। আমি আমার স্বামীকে ভালোবেসেছি, আমি চেষ্টা করেছি সুষ্ঠুভাবে আমার কর্তব্য পালন করতে। আর ওরাও আমাকে ভালোবাসে। আমার মনে হয় ওরা আমাকে ভালোবাসে। সবকিছুর পরেও। আমাকে সেটা ভাবতেই হবে, জ্যাক। আমাকে ভাবতেই হবে।

আমি তখন আমার লাল সিল্কের কাপড়ে মোড়া চেয়ারে বসে ঘামছিলাম। ওর বড়ো বড়ো গভীর বাদামী চোখ আমার উপর নিবদ্ধ, তার দৃষ্টিতে একই সঙ্গে মিশে আছে গভীর অনুনয় আর সুদৃঢ় প্রত্যয়।

এবার খুব শান্ত কণ্ঠে সে আবার বললো, আমাকে সেটা ভাবতেই হবে। আর শেষ পর্যন্ত যে সব ঠিক হয়ে যাবে সেটাও ভাবতে হবে আমাকে।

আমি বললাম, শোনো, কর্তা ওদের আপাততঃ ঠেকিয়ে রেখেছেন। উনি ঠিকই একটা পথ খুঁজে বার করবেন। দেখো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

লুসি বললো, ওহ্, আমি সে কথা বলছিলাম না, আমি বলতে চেয়েছিলাম — এটুকু বলেই ও থেমে গেলো।

কিন্তু ও কি বলতে চেয়েছিলো তা আমি বুঝেছিলাম। ওর গলার স্বর এবার আরো নিচু হলো, কিন্তু এখন আরো স্থির, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ফুটে উঠলো সবকিছু ছেড়ে দেয়া একটা সমর্পিত ভঙ্গি। সে বললো, হ্যাঁ, ও একটা পথ খুঁজে বার করবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর আমার ওখানে কালক্ষেপণ করার মানে হয় না। আমি উঠে পড়লাম, খোদাই করা বাদাম কাঠের টেবিলের উপরে রাখা বাইবেল আর স্টেরিওস্কোপের পাশ থেকে আমি আমার পুরনো পানামা হ্যাটটি উদ্ধার করে লুসির দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে আমার হাতের দিকে তাকালো, যেন ওই হাত ওখানে কেন সে বুঝতে পারছে না। তারপর সে আমার দিকে চোখ তুলে প্রায় ফিসফিস করে বললো, একটা বাচ্চা মাত্র। ছোট্ট কচি একটা শিশু। অন্ধকারে ছোট্ট একটা বাচ্চা। জন্মায় নি পর্যন্ত এখনো, কি হয়েছে না হয়েছে তার কিছুই সে জানে না। সে অর্থের কথা জানে না, রাজনীতির কথা জানে না, কারো সিনেটর হবার আকাঙ্ক্ষার কথা জানে না। কোনো কিছুই সে জানে না — কেমন করে তার অস্তিত্ব হলো, সে ওই মেয়েটির কথা জানে না, কিংবা কেন — কিংবা কেন তার বাবা — কেন সে — লুসি চুপ করলো। ও তার বড়ো বড়ো দুটি চোখ আমার মুখের উপর মেলে দাঁড়িয়ে থাকলো। সেই চোখে ছিলো অনুনয়, এবং হয়তো একটা অভিযোগও। তারপর সে বললো, ওহ্, জ্যাক, ও তো ছোট্ট একটা শিশু, তার তো কোনো দোষ নেই।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, তো আমারও তো কোনো দোষ নেই, কিন্তু না, চেঁচিয়ে উঠি নি আমি।

একটু পরে ও বললো, হয়তো আমার নাতি। আমার ছেলের ছেলে।

আরো একটু পরে ঃ আমি খুব ভালোবাসতাম ওকে। এতক্ষণ তার যে হাত দুটি

মুষ্টিবদ্ধ হয়ে বুকের কাছে ধরা ছিলো এবার তা ধীরে ধীরে খুলে গেলো, একটু সামনে প্রসারিত হলো, হাতের তালু উপর দিকে করা, একটু বাঁকানো, কিন্তু কব্জিদুটি এখনো দেহের কাছাকাছি, যেন তাদের প্রত্যাশা খুবই সামান্য কিংবা আশাহীন।

সে লক্ষ করলো যে আমি তার হাতের দিকে তাকিয়ে আছি। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিলো।

আমি বিদায় জানিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

সে বললো, ধন্যবাদ, জ্যাক, কিন্তু আমার সঙ্গে এগিয়ে এলো না আর। আমার তাতে সুবিধাই হলো। এখন আমি যথার্থই নিষ্ক্রমণের পথে।

আমি রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবীতে বেরিয়ে এলাম, অহঙ্কারী ছোট্ট শানবাঁধানো পথটুকু পেরিয়ে এসে আমার গাড়িতে উঠলাম, তারপর চললাম শহর অভিমুখে, যেটা ছিলো, নিঃসন্দেহে, আমার যথার্থ স্থান।

কর্তা ভেবেচিন্তে ঠিকই কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এক, তিনি ভেবে দেখলেন যে মার্ভিন ফ্রের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। তবে সরাসরি নয়, ম্যাকমারফির মাধ্যমেও নয়। সত্যিকার অবস্থাটা ওই মহলে কি সেটা বুঝতে হবে। কিন্তু ম্যাকমারফিও চালাকিতে কম যায় না। সে ফ্রে-কে বিশ্বাস করে নি, কর্তাকেও না, তাই মার্ভিনকে দ্রুত সরিয়ে ফেলেছিলো, কোথায় কেউ তা জানে না। অবশ্য পরে দেখা যায় যে মার্ভিন আর সিবিলকে আরকানস'-র এক খামারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, এমন একটা জায়গায় যেখানে তাদের যাবার ক্ষীণতম ইচ্ছা ছিলো না। সেখানে ঘোড়া বলতে শুধু খচ্চরের দঙ্গল, সেখানে উজ্জ্বলতম আলো আসে বসবার ঘরের টেবিলে রাখা গ্যাসোলিনের প্রেসার ল্যাম্প থেকে, সেখানে কোনো দ্রুতগামী মোটরগাড়ি নেই, সেখানে লোকজন ঘুমুতে যায় রাত সাড়ে আটটায় আর শয্যা ত্যাগ করে প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য মার্ভিনদের সঙ্গীসাথী যে একেবারে ছিলো না তা নয়। ম্যাকমারফি তার এক অনুচরকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে ছিলো। তিন জনে মিলে পোকার কিংবা রামি খেলা যেতো। তবে, আমি পরে জেনেছি, ওই লোকটি দিনের বেলায় সব সময় গাড়ির চাবিটা রাখতো তার প্যান্টের পকেটে আর রাতের বেলায় তার বালিশের তলায়, আর মার্ভিন কিংবা সিবিল বাইরে বেরুলেই সে খামারবাড়ির পেছনের দরজার বাইরে তার মাথার ডার্বি টুপী কাত করে একপাশে বসিয়ে, একটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে, লক্ষ রাখতো কেউ যেন ওই পেছনের পথ দিয়ে দশ মাইল দূরের রেলস্টেশনের দিকে ছুটে পালাবার চেষ্টার মতো কোনো বদমায়েশী না করে। ডাক এলে ওই লোকটিই প্রথমে সব চিঠিপত্র দেখে দিতো, কারণ মার্ভিন আর সিবিলের

ওই ঠিকানায় কোনো চিঠি আসবার কথা নয়। ওরা যে কোথায় আছে তা-ই কারো জানার কথা নয়। আমরাও জানতাম না। আমরা জানি অনেক দিন পর।

দুই, কর্তা বিচারপতি আরউইনের কথা ভেবেছিলেন। ম্যাকমারফি যদি কারো কথায় কান দেয় তাহলে সে ব্যক্তি হলো বিচারপতি আরউইন, তাঁর কাছে ম্যাকমারফি অনেক ঋণী, আর ম্যাকমারফির এখন এত বেশি খুঁটির জোর নেই যে একজনকে সে সহজেই তুচ্ছ করতে পারে। অতএব কর্তা বিচারপতি আরউইনের কথা ভাবলেন।

তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আমি তোমাকে আরউইনের অতীত সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম। কি পেলে?

পেয়েছি কিছু।

কি?

আমি বললাম, কর্তা, আমি আরউইনকে একটা সুযোগ দিতে চাই। যদি তিনি আমার কাছে প্রমাণ করতে পারেন যে ব্যাপারটা মিথ্যা তা হলে আর আমি সেটা প্রকাশ করবো না।

বাঃ, আমি তোমাকে বলেছিলাম —

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমি আরউইনকে একটা সুযোগ দেবো। আমি দু'জনকে কথা দিয়েছি।

কাকে?

তো, একজন হচ্ছি আমি নিজে। আরেকজন, তা সে নামটা আপনি না-ই শুনলেন।

কি বললে? তুমি তোমার নিজেকে কথা দিয়েছো? কর্তা তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই দিয়েছি।

তিনি বললেন, ঠিক আছে। তোমার নিজের পথেই তুমি অগ্রসর হও। তবে ব্যাপারটা যদি সত্য হয় তাহলে আমি কি চাই তুমি জানো। তিনি নীরস মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্য হলেই মঙ্গল।

আমি বললাম, কর্তা, আমার ভয় হচ্ছে সত্যই বোধহয় হবে।

ভয় হচ্ছে?

হ্যাঁ।

তুমি কার হয়ে কাজ করছো? ওর হয়ে, না আমার হয়ে?

আমি বিচরাপতি আরউইনকে মিছিমিছি, চক্রান্ত করে, ফাঁসাতে পারবো না।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে খানিকক্ষণ লক্ষ করে বললেন, শোনো, জ্যাক, আমি তোমাকে সেটা করতে বলছি না। আমি তোমাকে কখনো কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে চক্রান্ত করে তাকে ফাঁসাতে বলি নি। বলেছি?

না।

আমি কারো বিরুদ্ধে তোমাকে ওরকম কাজ কোনোদিন করতে বলি নি। কেন বলি নি জানো?

কেন?

কারণ তার দরকারই হয় না। কাউকে কখনো মিথ্যা করে জড়ানোর দরকার হয় না। কারণ সত্যই সর্বদা যথেষ্ট হয়।

আমি বললাম, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আপনি তো বেশ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

তিনি বললেন, জ্যাক, আমি ছেলেবেলায় একটা প্রেসবাইটেরীয় সানডে স্কুলে পড়াশোনা করেছি। তখনো সে যুগে স্কুলে কিছু ধর্ম শিক্ষা দেয়া হতো। সে শিক্ষার মধ্য থেকে এইটুকু অন্ততঃ এখনো আমার ভেতর টিকে আছে। আর — তিনি হঠাৎ হেসে উঠলেন — আমি দেখেছি যে ওই জ্ঞানটুকু বেশ মূল্যবান।

তো, ওই ভাবেই আমাদের কথোপকথন সমাপ্ত হয়। আমি আমার গাড়িতে উঠে বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এর পথে রওনা হলাম।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পরপর আমি সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। প্রাতরাশ শেষ করি আমি একা একা, কারণ তরুণ একিসকিউটিভ শহরে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন আর আমার মা তার দুপুর পর্যন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সকালটা ছিল চমৎকার, সাধারণতঃ এই সময়ে যেমন গরম হয় ততোটা গরম নয়। সৈকত এখন নির্জন, শুধু কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পোয়াটাক মাইল দূরে সাগরের উজ্জ্বল অগভীর জলে লাফালাফি করছিলো, তাদের সরু পায়ের জন্য মনে হচ্ছিলো কয়েকটা কাদাখোঁচা পাখি যেন নাচানাচি করছে। আমি অলস পায়ে ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় ওরা এক মুহূর্তের জন্য তাদের লাফালাফি, নাচানাচি, হুটোপুটি থামিয়ে আমার দিকে একটা উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমাকে অনুগৃহীত করলো, কিন্তু ওই এক মুহূর্তের জন্যই, কারণ আমি স্পষ্টতঃই নির্বোধ এবং প্রায়-অন্ধ প্রজাতির একজন যারা জুতো আর প্যান্ট পরে উজ্জ্বল অগভীর জলে আপনি দাপাদাপি করতে পারেন না। বালির উপর দিয়েও আপনি হাঁটেন না, সম্ভব হলে, কারণ তাহলে আপনার জুতোর ভেতর বালি ঢুকে যাবে। তবে আমি অন্ততঃ আমার জুতোর ভেতর প্রচুর পরিমাণে বালি ঢোকাতে ঢোকাতে বেলাভূমির উপর দিয়ে

হেঁটে যাচ্ছিলাম। না, এটা না করার মতো অতো বুড়ো হয়ে যাই নি আমি। বেশ সন্তোষের সঙ্গে আমি এটা লক্ষ করলাম, তারপর দেবদারু, ওক, মিমোসা আর মার্টল্‌কুঞ্জের আড়ালে, সমুদ্রসৈকত থেকে অল্প দূরে, টেনিস কোর্টগুলির দিকে এগিয়ে গেলাম। ওখানে ছায়ার মধ্যে কয়েকটা বেঞ্চ আছে, আর আমার হাতে রয়েছে অপঠিত সকালের খবরের কাগজটি। কাগজটা পড়ার পর দিনের পরবর্তী অংশে কি কি ঘটবে সে সম্পর্কে ভাবতে শুরু করবো। কিন্তু আপাততঃ সেসব আমি ভাবতে যাচ্ছি না। এখনো না।

শূন্য টেনিস কোর্টের কাছে একটা বেঞ্চে বসে, সিগারেট ধরিয়ে, আমি কাগজ পড়তে শুরু করলাম। আমি প্রথম পাতাটা, তার প্রতিটি শব্দ, ধর্মগ্রন্থ পাঠরত একজন পাদ্রীর যান্ত্রিক অনুরাগের সঙ্গে পড়ে শেষ করলাম। যে অজস্র খবর আমি জানি, পত্রিকার এই প্রথম পাতায় যার উল্লেখও নেই, সে সম্পর্কে আমি বিন্দুমাত্র ভাবলাম না। যখন তৃতীয় পাতায় এসে পৌঁছেছি তখন কিছু কণ্ঠস্বর আমার কানে প্রবেশ করলো। আমি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি এক জোড়া খেলোয়াড় আসছে, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, ওরা এগিয়ে আসছে কোর্টগুলির অপর দিক থেকে। আমার দিকে অলস দৃষ্টিপাত করে ওরা, দূরবর্তী কোর্টটির দখল নিয়ে, ছোট্ট সাদা বলটা পেটাপেটি করতে শুরু করে দিলো। অলস ভাবে, শুধু মাংসপেশীর জড়তা ভাঙাবার জন্য।

বলের প্রথম দেয়া-নেয়া থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো যে ওরা খেলাটা ভালোই জানে। আর ওদের মাংসপেশীর জড়তা ভাঙাবারও যে বিশেষ দরকার নেই তাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। ছেলেটি মাঝারি উচ্চতার, একটু খাটোও হতে পারে, চওড়া বুক, দীর্ঘ বাহু, কোমরের কাছে বাড়তি কিচ্ছু নেই। মাথার লাল চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, গায়ে শার্টের বদলে গেঞ্জি, তার উপরের দিক দিয়ে ওর বুকের কোঁকড়ানো লাল লোম দেখা যাচ্ছিলো, ত্বকের রঙ বাচ্চাদের মতো গোলাপী, শুধু মুখ আর কাঁধের কাছে জায়গায় জায়গায় বাদামী দাগ। রোদে পুড়ে ওই রকম হয়েছে। ওই দাগের মধ্য দিয়ে তার মুখে দেখা যাচ্ছিলো শুভ্র দাঁতের উজ্জ্বল হাসি আর নীল চোখের দ্যুতিময় আভা। মেয়েটি প্রাণোচ্ছল, রঙ বাদামী, ছোট বাদামী রঙের চুল মাথায়, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলো সেই চুল। বুকের নিচ দিয়ে, বাদামী বাহু আর কাঁধ ঘুরিয়ে, সাদা একটা স্ট্র্যাপ বাঁধা, সাদা জুতো আর মোজার উপর বাদামী পা ঝলসে উঠছিলো, সাদা শর্টস্‌ আর সাদা স্ট্র্যাপের মধ্যবর্তী অংশে তার মেদহীন মসৃণ পেটের একটুখানি দেখা যাচ্ছিলো। দুজনই ছিলো অল্পবয়েসী।

ওরা তাড়াতাড়ি খেলা শুরু করে দিয়েছিলো। আমি খবরের কাগজের উপর

দিয়ে ওদের খেলা দেখছিলাম। লাল-চুলো ছেলেটি সম্ভবতঃ খুব জোর দিয়ে খেলছিলো না, তবু মেয়েটি স্পষ্টতঃই ওর বল বেশ ভালোভাবে ফেরাচ্ছিলো, ওকে কোর্টের সর্বত্র ছুটতে বাধ্য করাচ্ছিলো। ভারী ভালো লাগছিলো মেয়েটিকে দেখতে, এতো হাল্কা-পাতলা আর চটপটে আর গম্ভীর মুখের আর ঝলমলে পায়ের। কিন্তু, আমি স্থির করলাম, এ্যান স্ট্যান্টনের মতো সুশ্রী নয়। এমন কি সাদা খাটো প্যান্টের চাইতে ফুলে ফেঁপে ওঠা সাদা স্কার্টের যে উন্নততর একটা সৌন্দর্য আছে সেকথাও মনে মনে বললাম। কিন্তু শর্টসও সুন্দর। প্রাণোচ্ছল বাদামী মেয়েটিকে শর্টস পরে সুন্দর দেখাচ্ছিলো। আমাকে তা স্বীকার করতেই হবে।

এবং আমাকে এটাও স্বীকার করতে হবে যে ওদের দেখতে দেখতে আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছিলো। এই জন্য যে আমি এ্যান স্ট্যান্টনের সঙ্গে ওই টেনিস কোর্টে নেই। আমি যে ওখানে নেই এটা আমার কাছে মনে হলো একটা ভয়ঙ্কর এবং মৌলিক অন্যায়। ওই লাল-মুখো, ছোট-চুলো ছেলেটা ওখানে কি করছে? ওই মেয়েটিই বা কি করছে ওখানে? অকস্মাৎ আমার আর ওদের ভালো লাগলো না। আমার ইচ্ছা করছিলো ওখানে উঠে গিয়ে ওদের খেলাটা বন্ধ করে দিয়ে বলি, এই যে, তোমরা কি ভাবছো যে তোমরা এখানে চিরদিন এই ভাবে টেনিস খেলে যাবে? কিন্তু, না, তা তো হবে না।

মেয়েটি বলবে, না, না, চিরদিন না।

ছেলেটি বলবে, আরে না, আমরা তো বিকালেই সাঁতার কাটতে যাচ্ছি, তারপর আজ রাতে আমরা —

আমি বাধা দিয়ে বলবো, আহ্, তোমরা বুঝতে পারছো না। আমি জানি তোমরা সাঁতার কাটতে যাবে, তারপর আজ রাতে কোথাও বেড়াতে যাবে, বাড়ি ফিরবার পথে কোনো এক জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি থামাবে। কিন্তু তোমরা কি ভাবছো যে চিরকাল এই রকম চলবে?

ছেলেটি বলবে, বাঃ, তা কেন। আমি তো আগামী সপ্তাহে আমার কলেজে ফিরে যাচ্ছি।

মেয়েটি বলবে, আমিও আমার স্কুলে চলে যাবো, কিন্তু থ্যাংকসগিভিং-এর ছুটিতে আবার এ্যালের সঙ্গে আমার দেখা হবে। তাই না, এ্যাল? আর তুমি আমাকে ফাইনাল খেলা দেখাতে নিয়ে যাবে, যাবে না, এ্যাল?

আমি কি বলতে চাইছি তার কিছুই ওরা বুঝবে না। আমার প্রজ্ঞা থেকে ওদের উপকার করার চেষ্টা নিরর্থক। এমন কি আমার ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণ থেকে যে বিশাল জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তার ভাগও ওদের দেয়ার চেষ্টা করা বৃথা। ওরা

মহান কুঞ্চনের জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানবে না। সে সম্পর্কে ওদের কিছু বলে লাভ নেই, নিজে থেকেই ওদের সেই জ্ঞান আহরণ করতে হবে। আমি বললে ওরা হয়তো বিনয়ের সঙ্গে শুনবে কিন্তু একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। আর মার্টলকুঞ্জ আর উজ্জ্বল সমুদ্রের প্রেক্ষাপটে ওই বাদামী মেয়েটির নৃত্য আর ঝলসে ওঠার দৃশ্য দেখে আমার এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহ হলো, আমি নিজেই কি তাতে বিশ্বাস করি?

কিন্তু না, আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি, কারণ আমি তো ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণ করে ফিরে এসেছি।

আমি প্রথম সেট শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি নি। স্কোর যখন পাঁচ-দুই তখন আমি উঠে পড়ি। মনে হচ্ছিলো মেয়েটি বোধহয় পাঁচ-তিন পর্যন্ত করতে পারবে। কারণ ছোট চুলের ছেলেটি তাকে বল যুগিয়ে দিচ্ছিলো, অবশ্য একেবারে সহজেই ধরা পড়ে যাবার মতো করে নয়, আর মেয়েটি সজোরে তার বল ফিরিয়ে দিতেই সে উদ্ভাসিত মুখে হেসে উঠছিলো।

আমি বাড়ি গিয়ে, কাপড় পাল্টে, কিছুক্ষণ সাঁতার কাটলাম। অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম, উপসাগরের বুকে ভেসে ছিলাম, যে-উপসাগর গাল্ফ্ অব মেক্সিকোর একটা কোণ, যা আবার বিশ্বের বিশাল, লবণাক্ত জলরাশির একটা কোণ মাত্র। তারপর আমি দুপুরের খাবারের আগে আগে বাড়ি ফিরে এলাম।

মা দুপুরের খাবার আমার সঙ্গে খেলেন। খেতে খেতে আমি কেন এই সময় এখানে এসেছি সেকথা বলার জন্য তিনি আমাকে বেশ কয়েকবার সুযোগ করে দেন, কিন্তু মিষ্টির পর্ব না আসা পর্যন্ত আমি বিষয়টা এড়িয়ে যাই। তারপর বিচারপতি আরউইন এখন ল্যান্ডিং-এ আছেন কিনা আমি ওঁকে সেকথা জিজ্ঞাসা করি। গত রাতেই আমি সেকথা জানতে পারতাম কিন্তু এর আগে আমি সে প্রশ্ন করি নি। আমি ব্যাপারটা বিলম্বিত করি।

হ্যাঁ, উনি ল্যান্ডিং-এই আছেন।

মা আর আমি পাশের গ্যালারিতে গিয়ে কফি খেলাম, সিগারেট খেলাম, এবং একটু পরে আমি উপরে গিয়ে বিশ্রাম আর খাবার হজম করার জন্য একটু গড়িয়ে নিলাম। আমি আমার পুরনো ঘরে ঘণ্টাখানেক শুয়ে নিলাম। তারপর আমার মনে হলো যে এবার আমাকে কাজে নেমে পড়তে হবে। আমি আস্তে আস্তে নিচে নেমে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মা বসবার ঘরে বসেছিলেন। তিনি আমাকে ডাক দিলেন। দিনের এই সময়ে তাঁর পক্ষে ওখানে বসে থাকা ছিলো একটা আশ্চর্য ব্যাপার। আমি বুঝলাম যে বেরুবার পথে আমাকে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য। বসবার ঘরে ঢুকে আমি দেয়ালে হেলান

দিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর তিনি কি বলেন তার জন্য অপেক্ষা করলাম।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিচারপতি আরউইনের ওখানে যাচ্ছো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই।

তিনি তাঁর ডান হাতটি উঁচু করে ধরেছিলেন, হাতের পিঠ নিজের দিকে ঘুরিয়ে, আঙ্গুলগুলি ছড়ানো, তাঁর লাল নখের পালিশ দেখছিলেন তিনি। একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন মা, যেন যা দেখলেন তাতে খুশি হন নি, তারপর বললেন, রাজনীতির ব্যাপার বোধহয়।

আমি বললাম, এক রকম তাই।

তিনি বললেন, একটু পরে যাও না কেন? দিনের এই সময়টায় কেউ গেলে তিনি বিরক্ত হন।

আমি যেকথা বলতে যাচ্ছি তা শুনলে দিনে বা রাত্রে, বা যে কোনো সময়ে, তিনি বিরক্ত হবেন।

মুখের সামনে ছড়ানো আঙ্গুলগুলির কথা ভুলে গিয়ে মা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর বললেন, ওঁর শরীর ভালো নয়। তুমি কেন ওঁকে জ্বালাতন করতে চাইছো? এখন ওঁর শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছে না।

আমি অনুভব করলাম যে আমার ভেতরে জেদ চড়ে উঠছে। আমি বললাম, আমি নিরুপায়।

তিনি অসুস্থ।

আমি তার কি করবো?

অন্ততঃ একটু অপেক্ষা তো করতে পারো।

না, আমি অপেক্ষা করবো না। আমার মনে হলো আমার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আমাকে এখনই যেতে হবে, গিয়ে কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে। এই বাধা দেয়া, এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা আমার সিদ্ধান্তকে আরো দৃঢ় করে তুললো। আমাকে ব্যাপারটা জানতেই হবে। তাড়াতাড়ি।

মা বললেন, তুমি না গেলেই আমি খুশি হতাম। এতক্ষণ যে হাতটা তিনি বাতাসের বুকে তুলে রেখেছিলেন, এখন সেই বিস্মৃত হাত তিনি নামিয়ে নিলেন।

আমি নিরুপায়।

অভিযোগভরা কণ্ঠে মা বললেন, কেন যে তুমি এই — এই জিনিষগুলির মধ্যে — জড়িয়ে পড়ো?

বর্তমানের এই জিনিসটার মধ্যে যে জড়িয়ে পড়েছে সে আমি নই।

কি বলতে চাও তুমি?

আরউইনের সঙ্গে কথা বলার পর আমি সেটা জানতে পারবো। আর কিছু না বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে, আরউইন ভবনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। হেঁটেই যাবো আমি, যদিও বাইরে বেশ গরম, তাঁকে হঠাৎ ওই প্রশ্নটি করার আগে বুড়ো অন্ততঃ একটু বাড়তি সময় পাবে।

আমি যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছুলাম বুড়ো তখন দোতলায় শুয়ে ছিলো।

সাদা কোট পরা নিগ্রো ভৃত্যটি তাই বললো আমাকে। কর্তা উপরে শুয়ে আছেন। বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমনভাবে বললো যেন একটা ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়ে গেলো।

আমি বললাম, ঠিক আছে। উনি নিচে না নামা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো। আমন্ত্রণ ছাড়াই আমি জালের দরজাটা খুলে হলঘরের প্রসন্ন ছায়াছায়া ঠাণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করলাম। মনে হলো সেখানে বিরাজ করছে কালের নিখুঁত গভীরতা। হলঘরের আয়না আর বিশাল মজবুত কাঁচগুলি বরফের মতো ঝিকমিক করছিলো। সেখানে আমার প্রতিকৃতি মখমলের মতো কিংবা অতীতের তাবৎ স্মৃতির মতো নিঃশব্দে প্রতিফলিত হলো।

কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যটি আপত্তি করতে আরম্ভ করেছিলো, বিচারপতি — তিনি —

আমি ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শুধু বললাম, আমি লাইব্রেরি ঘরে বসছি। তিনি নিচে নেমে না আসা পর্যন্ত।

আমি ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

ওর চোখের সাদা অংশ দেখাচ্ছিলো খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ ডিমের মতো। তার বিশাল বিষণ্ন মুখ একটু হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছে, তার মধ্য দিয়ে গোলাপী জিভের সামান্যটা দেখা যাচ্ছে। আমি লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। জানালাগুলি বন্ধ, ভেতরটা ছায়াছায়া, উঁচু ছাদ আর তাকভর্তি দেয়ালজুড়ে পাথরের মতো সাঁটা বই-এর সারি সেই ছায়াকে আরো গভীর করেছে, মনে হচ্ছে সেই ছায়া যেন গাঢ় লাল তুর্কী কার্পেটটার উপর মস্ত বড়ো একটা কুকুরের মতো স্থির হয়ে ঘুমিয়ে আছে, তার নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না। আমি একটা প্রশস্ত চামড়ার চেয়ারে বসে, সঙ্গে করে আনা বড়ো ম্যানিলা খামটা চেয়ারের পাশে রেখে, গা এলিয়ে দিলাম। আমার হঠাৎ মনে হলো কোনো গ্যালারিতে পাথরে খোদাই করা চোখ-বন্ধ মূর্তিগুলি যেমন মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকভর্তি ওই বইগুলি যেন তেমনি অর্থহীনভাবে মুখ নিচু করে আমাকে দেখছে। আমি লক্ষ করলাম, আগেও যেমন করেছি, চামড়া বাঁধানো আইনের বইগুলি যেন ঘরের মধ্যে একটা মৃদু পনীরের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর উপরতলায় একটু নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেলো, তারপর বাড়ির

পেছনের দিকে একটা ঘণ্টা বেজে উঠলো টুংটাং করে। অনুমান করলাম যে বিচারপতি তাঁর পরিচারককে ডাকছেন। এর পরই আমি পরিচারকের পায়ের হাল্কা শব্দ শুনলাম হলঘরে, বুঝলাম সে এবার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবে।

মিনিট দশেক পরে বিচারপতি নিচে নামলেন। তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ লাইব্রেরির দরজার দিকে এগিয়ে এলো। দোরগোড়ায় তিনি এক মুহূর্তের জন্য থামলেন, যেন ভেতরের ছায়ায় চোখকে অভ্যস্ত করে নিলেন। দীর্ঘ দেহ, সাদা কোট, গলায় কালো বো-টাই। তারপরই ঘরে ঢুকে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আমার চিরকালের চেনা গলায় বলে উঠলেন, হ্যালো, জ্যাক, তুমি আসায় ভারী খুশি হয়েছি আমি। তুমি যে ল্যান্ডিং-এ আমি জানতাম না। সবে এলে বুঝি?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর করমর্দন করতে করতে সংক্ষেপে বললাম, গত রাতে এসেছি।

তিনি দৃঢ় হাতে আমার হাত নেড়ে, আমাকে আমার চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে, আবার বললেন, তুমি আসায় আমি ভারী খুশি হয়েছি, জ্যাক। আমি ছায়ার মধ্যে দেখলাম তাঁর উঁচু, ক্লান্ত, বাজপাখির মতো তামাটে মাথা, আর তাঁর মুখের প্রসন্ন হাসি। কতক্ষণ এসেছো তুমি? কেন তুমি ওই ব্যাটাচ্ছেলেকে আমাকে তুলে দিতে বলো নি? কেন সারাটা অপরাহ্ন আমাকে এভাবে ঘুমুতে দিলো? অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, জ্যাক।

আমি সায় দিলাম, হ্যাঁ, অনেক দিন।

সত্যিই অনেক দিন। ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিলো মাঝরাতে। তখন কর্তা সঙ্গে ছিলেন। আমার উক্তির পর যে নীরবতা নেমে এলো তাতে আমি বুঝলাম যে ওঁরও সেই সাক্ষাতের কথা মনে পড়েছে। তাঁরও মনে পড়েছে, কিন্তু তাঁর মনে পড়েছে আমার উক্তির পর। তখন আমি বুঝলাম যে তিনি ওই স্মৃতিটা দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে অস্বীকার করছিলেন। তিনি চেয়ারে বসে যেন কিছুই তাঁর মনে পড়ছে না এমনি ভাবে বললেন, তা অনেক দিন পর। কিন্তু পরের বার আর এতো দেরি করো না। তুমি কি এই বুড়ো মানুষটাকে দেখতে কখনোই আসবে না? জানো তো, আমরা বুড়োরা একটু আধটু মনোযোগ পেতে ভালোবাসি।

তিনি হাসলেন, আর তাঁর ওই হাসির সামনে আমি কিছুই বলতে পারলাম না।

একটু পরে তিনি চটপট চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর অস্থিসন্ধিতে কোনো শব্দ হলো বলে মনে হলো না। তিনি বললেন, এই দেখো, তোমাকে যে একটু যত্নআত্তি করবো সেকথা আমি ভুলেই গেছি। তোমার গলা নিশ্চয়ই এ্যান্ডি জ্যাকসনের বারুদের মতো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আসল জিনিসের জন্য সময়টা

বোধহয় একটু বেশি সকাল-সকাল, কিন্তু অল্প একটু জিন আর টনিক নিশ্চয়ই কারো কোনো ক্ষতি করবে না। অন্ততঃ তোমার-আমার না। আমরা হচ্ছি চিরস্থায়ী, অক্ষয়-অজর, তুমি আর আমি, কি বলো?

যতক্ষণে আমি কিছু বলতে সক্ষম হলাম ততক্ষণে তিনি দড়িতে টান দেবার জন্য প্রায় ঘণ্টার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি কোনো রকমে বললাম, না, ধন্যবাদ।

তিনি আমার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে খুব সূক্ষ্ম একটা আশাভঙ্গের ছায়া পড়লো, কিন্তু তারপরই আবার তাঁর হাসি ফিরে এলো, একটা প্রসন্ন, সৎ, খোলামেলা, পুরুষালী হাসি। তিনি বললেন, আহ্ হা, একটুখানি খাও। এতো একটা উৎসব। কতোদিন পর তুমি আমাকে দেখতে এলে!

ঘণ্টার দড়ির দিকে আরেক পা এগুলেন, আর আমি আবার বললাম, না, ধন্যবাদ।

তিনি এক মুহূর্ত আমাকে লক্ষ করলেন। দড়িতে টান দেবার জন্য তিনি তাঁর হাত উঁচু করেছিলেন, সেই হাত এখন নামিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন। তাঁর সমস্ত শরীর যেন একটু শিথিল হয়ে এলো, নাকি সেটা আমার কল্পনা? তারপর তিনি বললেন, এবার তাঁর মুখে যা ফুটলো তাকে ঠিক হাসি বলা যায় না, ঠিক আছে। তাহলে আমি আর একা একা কিছু খাচ্ছি না। তোমার কথাবার্তা থেকেই আমি আমার উজ্জীবন আহরণ করবো। তা, কি ব্যাপার এবার বলো।

বিশেষ কিছু না।

ছায়ার ভেতর আমি তাঁকে লক্ষ করলাম। দেখলাম, কিছু একটা আছে যা তাঁর বুড়ো কাঁধ আর বুড়ো মাথা সমুন্নত রেখেছে। সেটা কি আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম। আমার মনে হলো আমি যা খুঁড়ে পেয়েছি সেটা কি সত্য? তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার খুব ইচ্ছে করতে লাগলো তা যেন সত্য না হয়। আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি যথার্থই সর্বান্তঃকরণে চাইছিলাম যেন তা সত্য না হয়। তারপর হঠাৎ আমার মনে একটা চিন্তা উদয় হলো। আমি তো তাঁর জিন আর টনিক খেয়ে, তাঁর সঙ্গে গল্প করে, তাঁকে কিছু না বলে শহরে ফিরে যেতে পারি, গিয়ে কর্তাকে বলতে পারি যে আমি ভালো করে জেনেছি যে ওই ব্যাপারটা সত্য নয়। কর্তাকে আমার কথা মানতে হবে। একটু হৈ চৈ করবেন, তর্জনগর্জন করবেন, কিন্তু তিনি জানেন যে এই খেলার পরিচালক আমি। তা ছাড়া ইতোমধ্যে আমি মিস লিট্‌লপাফের কাছ থেকে যোগাড় করা কাগজ নষ্ট করে ফেলবো। এটা তো আমি করতে পারি।

কিন্তু আমাকে যে জানতেই হবে। যে মুহূর্তে আমার মনে এখান থেকে চলে

যাবার চিন্তা উদয় হলো সেই মুহূর্তেই আমি জানি যে আমাকে সত্যটা জানতেই হবে। কারণ সত্য বড় সাংঘাতিক জিনিস। পা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেন তো সেটা কিছু না। কিন্তু একটু হেঁটে গেলেন, তখন অনুভব করবেন যে একটা নিম্নটান বা ঘূর্ণির মতো তা আপনাকে টানছে। সে টান এতো ধীর, এতো অচঞ্চল, এতো সূক্ষ্ম হারে ক্রমবর্দ্ধমান যে তা ভালো করে আপনার নজরেই পড়ে না, তারপর এক সময় সেটা বেড়ে ওঠে, প্রচণ্ড ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, আপনাকে টেনে নেয় কালো অন্ধকারের মধ্যে। কারণ সত্যেরও একটা অন্ধকার আছে। ওরা বলে যে ঈশ্বরের প্রসন্নতার মধ্যে পতিত হওয়া নাকি একটা সাংঘাতিক জিনিস। তা আমি সেকথা বিশ্বাস করতে রাজী আছি।

তো, আমি বিচারপতি আরউইনের দিকে তাকালাম, আর অকস্মাৎ ওঁকে আমার ভীষণ ভালো লাগলো। বহু বছরের মধ্যে ওঁকে আমার এতো ভালো লাগে নি। তাঁর বৃদ্ধ স্কন্ধযুগল এতো খাড়া, তাঁর খোলামেলা হাসি এতো খাঁটি। কিন্তু আমি জানতাম সত্যটা আমাকে জানতেই হবে।

তিনি আমাকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। আমার মুখে নিশ্চয়ই এমন কিছু ফুটে উঠেছিলো যা ওই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। আমি তাঁর চোখে চোখ রেখে বললাম, আমি বলেছি যে ব্যাপার বিশেষ কিছু না, তবে একটু কিছু আছে।

বলে ফেলো।

আমি বললাম, আমি কার হয়ে কাজ করি আপনি তো জানেন, জাজ্।

জানি, জ্যাক। কিন্তু এসো, আমরা গল্প করি এখানে বসে, ভুলে যাই ওকথা। আমি স্টার্কের সব কাজকর্ম অনুমোদন করি সেকথা বলতে পারবো না, কিন্তু এখানকার আমার অন্যান্য বন্ধুদের মতো আমি নই। আমি একজন দৃঢ়চিত্ত মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারি, এবং ও সেইরকম একটি মানুষ। এক সময় আমি প্রায় তার পক্ষেই ছিলাম। ও জানালার শার্সিগুলি ভাঙছিলো, বাইরের তাজা হাওয়া ভেতরে ঢুকবার পথ করে দিচ্ছিলো, কিন্তু — তিনি বিষণ্ন মুখে মাথা নেড়ে একটু হেসে বললেন — কিন্তু যখন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িও ভাঙতে আরম্ভ করলো তখন আমি তার সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে উঠতে শুরু করি। আর ওর কিছু কিছু পদ্ধতিও — অতএব — তিনি বাক্যটি আর শেষ না করে সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন।

তাঁর হয়ে আমি বাক্যটি শেষ করলাম ; অতএব, আপনি ম্যাকমারফির সঙ্গে হাত মেলালেন।

তিনি বললেন, জ্যাক, রাজনীতি সব সময়ই একটা বেছে নেবার ব্যাপার, আর ওই বেছে নেবার জিনিসগুলি একটা মানুষ তৈরি করে দেয় না। আর সেই বেছে

নেবার জন্য সব সময় একটা মূল্য দিতে হয়। তুমি সেটা জানো। তুমি একটা জিনিস বেছে নিয়েছো, তার জন্য তোমাকে কি মূল্য দিতে হয়েছে তাও তুমি জানো। একটা মূল্য সব সময়ই দিতে হয়, জ্যাক।

হ্যাঁ, কিন্তু —

আমি তোমার সমালোচনা করছি না, জ্যাক। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। সময়ই দেখিয়ে দেবে আমাদের মধ্যে কে ভুল করেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে, জ্যাক, ওই জিনিসটাকে আমাদের দুজনের মধ্যে আসতে দিও না। সেদিন রাত্রে আমি যদি হঠাৎ রেগে গিয়ে দুর্ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি। অন্তর থেকে। ওর জন্য আমি কষ্ট পেয়েছি।

আমি বললাম, আপনি বলছেন যে আপনি স্ট্যার্কের পদ্ধতি পছন্দ করেন না। তো, আমি আপনাকে ম্যাকমারফির পদ্ধতির কথা বলছি, শুনুন। ও কি করছে সেটা একটু শুনুন — ব্রেক নষ্ট হয়ে যাওয়া ট্রামগাড়ি পাহাড়ী উৎরাই–এর পথে যেভাবে প্রচণ্ডবেগে ছুটতে থাকে আমি সেই ভাবে আমার মুখ ছুটিয়ে দিলাম। ম্যাকমারফি কি করতে যাচ্ছে আমি তাঁকে বললাম।

তিনি নিঃশব্দে সব শুনলেন।

আমি তখন প্রশ্ন করলাম, এই পদ্ধতিটা সুন্দর?

না। তিনি মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, তাই। এটা সুন্দর নয়। আর আপনি এটা বন্ধ করতে পারেন।

আমি?

ম্যাকমারফি আপনার কথা শুনবে। শুনতেই হবে তাকে। তার বন্ধুসংখ্যা এখন আর বেশি নেই, যে ক'জন এখনো আছে আপনি তাদের একজন। তাছাড়া সে জানে যে কর্তা তার পেছনে লেগেছে। নিছক একটা কেলেঙ্কারী করার বেশি কিছু যদি তার হাতে থাকতো তাহলে সে কর্তার সঙ্গে দরকষাকষি না করে তাকে সরাসরি ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করতো। কিন্তু ও জানে যে সেরকম কিছু তার হাতে নেই। আর আমি আপনাকে বলছি, দরকার হলে কর্তা আদালতে মামলা লড়বেন। এই সিবিল ফ্রে একটা শস্তা বাজারের মেয়ে, সহজেই আমরা তা কোর্টে প্রমাণ করতে পারবো। আমরা কোর্টে একদঙ্গল ফুটবল খেলোয়াড় এনে হাজির করবো। ওই মেয়ের বাবার বাড়ির পাশ দিয়ে ৬৯ নম্বর মহাসড়ক ধরে যেসব ট্রাক ড্রাইভার দিনরাত যাওয়া–আসা করে তাদেরও আমরা সাক্ষী মানবো। আপনি যদি ম্যাকমারফির মাথায় কিছু সুবুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে পারেন তাহলে হয়তো চরম মুহূর্তটি যখন আসবে তখন সে কিছুটা আত্মমর্যাদা অন্ততঃ রক্ষা করতে পারবে। অবশ্য,

মনে রাখবেন, আমি কোনো কথা দিচ্ছি না। এই মুহূর্তে না।

কিছুক্ষণের জন্য ঘরের মধ্যে জমে থাকলো শুধু ছায়া আর নীরবতা আর পুরনো পনীরের মতো একটা মৃদু গন্ধ। আর ওদিকে ওই সুশ্রী বয়োবৃদ্ধ মাথার মধ্যে আমি এতক্ষণ যা বলেছি তা ক্রমাগত ঘুরতে লাগলো। তারপর তিনি খুব আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, না।

আমি বললাম, শুনুন, সিবিলকে, ওই বাজে মেয়েটাকে, কিছু টাকাপয়সা দেয়া হবে। আকাশ-প্রমাণ কিছু যদি না ভেবে থাকে তাহলে ওদিকের ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো। অবশ্য ওকে একটা কাগজে সই দিতে হবে। আর, আমি আপনার কাছে লুকাবো না, আমাদের উকীল ওর কয়েকজন ছেলেবন্ধুর কাছ থেকে কয়েকটা এফিডেভিট করিয়ে রাখবে, সেটা আমরা নিজেদের হেফাজতে রেখে দেবো। যদি ওই মেয়ে আবার কখনো দুষ্টুমী করতে চায় তখন ব্যবহার করবো। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। সিবিলের সঙ্গে যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হচ্ছে সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তিনি বললেন, না, কথাটা শুধু সেটা না।

আমি বললাম, জাজ্, আমার গলার স্বরে আমি নিজেই অনুনয়ের সুর লক্ষ করলাম, তাহলে কথাটা কি?

এটা ম্যাকমারফির ব্যাপার। ও হয়তো ভুল করছে। আমার মনে হয় ভুলই করছে। কিন্তু এটা একান্তভাবেই ওর ব্যাপার। আমি নিজেকে এধরনের ব্যাপারে জড়াতে চাই না।

আমি মিনতি করলাম, জাজ্, একটু ভেবে দেখুন। একটু সময় নিয়ে আপনি ব্যাপারটা ভেবে দেখুন।

তিনি মাথা নাড়লেন।

আমি উঠে পড়ে বললাম, আমার যেতে হবে এখন। আপনি একটু ভেবে দেখুন। আমি কাল আসবো, তখন আবার কথা হবে। আপনি তখন আপনার উত্তরটা আমাকে দেবেন।

তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার উপর ফেলে তিনি আবারো মাথা নাড়লেন, তারপর বললেন, অবশ্যই তুমি কাল আসবে, জ্যাক। কাল আসবে, পরশু আসবে। কিন্তু আমার উত্তর আমি তোমাকে এখনই দিচ্ছি।

আমাকে আপনি একটু অনুগ্রহ করবেন, আমি অনুরোধ করছি আপনাকে। এখনই মন ঠিক করবেন না, আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

জ্যাক, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যেন আমার নিজের মন জানি না।

আমার এই সত্তর বছর বয়সে যদি কিছু শিখে থাকি তো সেটা হলো ওই একটা জিনিস। আমি কোনো বিষয়ে মন স্থির করে ফেললে সেটা বুঝতে পারি। তবে তুমি কাল এসো কিন্তু। আর আমরা তখন রাজনীতি আলোচনা করবো না। তিনি হঠাৎ এমন ভঙ্গি করলেন যেন হাত দিয়ে একটা টেবিলের উপরটা ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিচ্ছেন। তারপর কৌতুকভরা গলায় বললেন, জাহান্নামে যাক রাজনীতি!

আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে ওঁর মুখের ওই ঈষৎ বাঁকা, কৌতুকভরা অভিব্যক্তি আর প্রসারিত হাতের ভঙ্গি সত্ত্বেও বুঝলাম যে এইটেই আসল জিনিস। এ আর শুধু জলে একটুখানি পা ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করা নয়, নিম্নটানের ধীর ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণ কিংবা ঘূর্ণির প্রান্তিক টানও এ নয়, এ হলো প্রচণ্ড তীব্র দৌড়, ঘূর্ণাবর্তের একেবারে গভীরে নিমজ্জন। আমার বোঝা উচিত ছিলো যে এরকমটাই হবে।

আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে বললাম, আমি আপনাকে অনুরোধ করেছি, জাজ্। আমি প্রায় ভিক্ষা চেয়েছি আপনার কাছে, জাজ্।

একটা মৃদু প্রশ্নের ভাব ফুটে উঠলো তাঁর মুখে।

আমি আবার বললাম, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমি মিনতি করেছি।

কি বলতে চাও তুমি?

আমি এবারও প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে ফিস ফিস করে বললাম, আপনি কি কখনো লিটলপাফ নামের কোনো লোকের কথা শুনেছেন?

লিটলপাফ? মনে করার চেষ্টায় তাঁর ভ্রূ কুঁচকে এলো।

আমি বললাম, মর্টিমার এল. লিটলপাফ। মনে পড়ছে না?

তাঁর ঘন ঈষৎ লাল ভ্রূযুগলের মাঝখানে কপালের মাংস আরো একটু কুঞ্চিত হয়ে একটা গভীর ঋজু রেখা সৃষ্টি করলো, যেন অদ্ভুত একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। তারপর তিনি মাথা নেড়ে বললেন, না, মনে পড়ছে না।

সত্যিই তাঁর মনে পড়ে নি। আমি সে বিষয়ে সুনিশ্চিত। মর্টিমার এল. লিটলপাফের নামটা পর্যন্ত তাঁর মনে নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমেরিকান ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানীর কথা মনে পড়ে?

অবশ্যই। কেন পড়বে না? আমি দশ বছর ওদের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছি।

তাঁর গলা একটুও কাঁপলো না।

কি করে ওই কাজটা পান মনে আছে?

দাঁড়াও, দেখি — ওঁর দিকে তাকিয়ে আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে তিনি সত্যিই মনে

করতে পারছিলেন না, মনে করার চেষ্টায় তিনি অতীতের স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। তারপর এক সময় সোজা হয়ে বসে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ওই কাজটা পাই জনৈক মিঃ স্যাটারফিল্ডের মাধ্যমে।

কিন্তু এবার তাঁর গলা একটু কেঁপে গেলো। আমি বুঝলাম যে তীর ঠিক মাংসে গিয়ে বিঁধেছে।

দীর্ঘ একটি মিনিট আমি অপেক্ষা করলাম, তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম, তিনিও তাঁর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি নিচু গলায় বললাম, জাজ, আপনি কি আপনার মত পাল্টাবেন না? ম্যাকমারফির ব্যাপারটায়?

তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে বলে দিয়েছি।

আমি ওঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছা করছিলো, এখন তো তাঁর ভেতরে তীরের খোঁচায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে, এই মুহূর্তে তাঁর মাথার মধ্যে কী চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, কেন তিনি এখনো তাঁর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছেন।

আমি এতক্ষণ যে চেয়ারে বসেছিলাম সেদিকে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে মেঝেতে রাখা ম্যানিলা খামটি নিচু হয়ে হাতে তুলে নিলাম, তারপর ওর চেয়ারের কাছে গিয়ে খামটি ওঁর কোলের উপর রেখে দিলাম।

তিনি স্পর্শ না করে খামটির দিকে তাকালেন, তারপর মুখ তুলে আমাকে দেখলেন, তাঁর উজ্জ্বল দু'চোখের দৃষ্টি রাখলেন আমার মুখের উপর, সে দৃষ্টিতে কোনো প্রশ্ন ছিলো না। তারপর একটি কথাও না বলে তিনি খামটি খুলে কাগজগুলি পড়লেন। ঘরে ভালো আলো ছিলো না, কিন্তু তিনি সামনে ঝুঁকে পড়লেন না। একটা একটা করে তিনি পাতা মুখের কাছে তুলে ধরছিলেন। মন দিয়ে পড়লেন তিনি, তারপর শেষ পাতাটি সযত্নে নিজের কোলের উপর নামিয়ে রাখলেন।

স্মৃতিচারণার সুরে তিনি বললেন, লিটলপাফ, তারপর একটু অপেক্ষা করে বললেন, জানো — যেন অবাক হয়েছেন — জানো, ওর নামটা পর্যন্ত আমার মনে পড়ে নি। সত্যি। শপথ করে বলছি। আবার তিনি অপেক্ষা করলেন।

তারপর বললেন, ওর নামটাও যে আমার মনে পড়ে নি এটা তোমার কাছে আশ্চর্য মনে হয় না?

আমি বললাম, সম্ভবতঃ।

তখনো তাঁর গলায় বিস্ময়ের ভাব। বললেন, জানো, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়, মাঝে মাঝে মাসের পর মাস কেটে যায়, আমার — তিনি তাঁর মজবুত মোটা

ডান আঙ্গুল দিয়ে কাগজগুলি আলতোভাবে স্পর্শ করলেন — এর কথা একবারও মনে পড়ে না।

তিনি আবার নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, তুমি জানো, মাঝে মাঝে, এক নাগাড়ে অনেক দিন ধরে, মনে হয় যেন এরকম কিছু ঘটেই নি। আমার ক্ষেত্রে ঘটে নি। হয়তো অন্য কারো ক্ষেত্রে ঘটেছে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে নয়। তারপর আমার মনে পড়ে। তখন, প্রথম মনে পড়ার মুহূর্তে, আমি বলে উঠি, না, না, আমার ক্ষেত্রে এরকম ঘটতেই পারে না।

তিনি মুখ তুলে সোজা আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, কিন্তু ঘটেছিলো।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ঘটেছিলো।

তিনি মাথা নাড়লেন, বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টকর।

আমি বললাম, আমার পক্ষেও।

অন্ততঃ এটুকুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, জ্যাক। ওঁর মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো।

আমি বললাম, এর পরবর্তী চাল কি তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

বোধহয় জানি। তোমার কর্মকর্তা এবার আমার উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করবেন। আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইবেন।

চাপ প্রয়োগই অধিকতর সুন্দর শব্দ।

আমি সুন্দর শব্দ নিয়ে আর মাথা ঘামাই না, জ্যাক। দিনের পর দিন একটা মানুষ শব্দের সঙ্গে বসবাস করে, তারপর হঠাৎ এক সময় সে দেখে যে সে বুড়ো হয়ে গেছে, চারপাশে জিনিসগুলি আছে, শব্দগুলি অর্থহীন হয়ে গেছে।

আমি কাঁধ কুঁচকে বললাম, যেমন ভাবতে চান ভাবুন কিন্তু আমি কি বলতে চাই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

তিনি কাগজগুলি তাঁর তর্জনী দিয়ে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, আচ্ছা, তুমি কি জানো না — তোমার কর্মকর্তার, যিনি নিজেকে আইনজীবী বলে দাবী করেন, তাঁর তো জানা উচিত যে এই জিনিস আদালতে এক মুহূর্তের জন্যও টিকবে না। প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছে। তুমি কোনো সাক্ষী পাবে না, একমাত্র ওই লিটলপাফ মহিলা ছাড়া। তার কানাকড়ি দামও নেই। সবাই আজ মৃত।

আপনি ছাড়া, জাজ্।

এটা আদালতে টিকবে না, জ্যাক।

কিন্তু আপনি তো আদালতে বাস করেন না। আপনি মৃত নন, আপনার বাস এই পৃথিবীতে, আর লোকে আপনাকে একটা বিশেষ ধরনের মানুষ বলে মনে করে।

আপনি তো সেই ধরনের মানুষ নন যে লোকজন অন্য রকম ভাবলে সেটা আপনার সহ্য হবে।

এবার তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, তারা অন্য রকম ভাবতে পারে না। ঈশ্বর জানেন, ওদের অন্য রকম ভাববার কোনো অধিকার নেই। আমি ন্যায়ের স্বার্থে কাজ করেছি, আমি আমার কর্তব্য পালন করে গিয়েছি। আমি —

আমি ওঁর মুখের উপর থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে ওঁর কোলের উপর রাখা কাগজগুলির উপর স্থাপন করলাম। তিনি সেটা লক্ষ করলেন, তারপর তিনিও নিচের দিকে তাকালেন। তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেলো, তিনি কাগজগুলি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলেন, পরীক্ষামূলকভাবে, যেন তাদের বাস্তবতা পরখ করে দেখছেন। তারপর ধীরে ধীরে আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো, আমি এটাও করেছি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই করেছেন।

স্টার্ক জানে?

না, জানেন না। আমি ওঁকে বলেছি যে আপনার সঙ্গে দেখা করার আগে আমি ওঁকে কিছু বলবো না। আমি প্রথমে নিজে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম, জাজ্।

ব্ল্যাকমেলারের পক্ষে তোমার অনভূতি তো বেশ সূক্ষ্ম!

আমরা কাউকে গাল না-ই বা দিলাম, জাজ্। আমি শুধু এইটুকু বলবো যে আপনি একজন ব্ল্যাকমেলারকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন।

তিনি শান্ত স্বরে বললেন, না, জ্যাক, আমি ম্যাকমারফিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি না। হয়তো — তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন — হয়তো আমি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি।

সেটা কি করে করা যায় তা তো আপনি জানেন। আমি স্টার্ককে কোনো দিন বলবো না।

তা, তুমি হয়তো সত্যিই তাকে কোনোদিন বলবে না।

আগের চাইতেও শান্ত গলায় তিনি একথা বললেন। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিলো তিনি হয়তো দেরাজে রাখা পিস্তলের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন- দেরাজের কাছেই ছিলেন তিনি — কিংবা তিনি হয়তো এক্ষুণি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। বয়স হলেও তিনি ঠিক উপেক্ষা করার মতো পাত্র নন।

তিনি হয়তো আমি কি ভাবছি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মাথা নেড়ে হেসে বললেন, না, ঘাবড়িও না। ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করে ছিলাম, দেখুন —

তিনি বললেন, আমি তোমার গায়ে হাত তুলবো না। তারপর একটু ভেবে নিয়ে তিনি যোগ করলেন, তবে তোমাকে আমি থামিয়ে দিতে পারি।

হ্যাঁ, ম্যাকমারফিকে থামিয়ে দিয়ে।

তার চাইতে অনেক সহজে।

কি ভাবে?

আমি — তিনি বলতে আরম্ভ করেন — আমি তোমাকে জানাতে পারি — তোমাকে আমি একটা কথা বলতে পারি — তিনি থামলেন, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাঁটুর উপর থেকে কাগজগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে নিচে পড়ে গেলো। তারপর প্রফুল্ল চিত্তে, সোজা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে তিনি বললেন, কিন্তু বলবো না।

আমাকে কি বলবেন না?

বাদ দাও। তখনও তাঁর মুখে হাসি। তিনি হাতের একটা ভঙ্গি করে সানন্দে বিষয়টাকে উড়িয়ে দিলেন।

আমি এক মুহূর্তের জন্য দোদুল্যমান অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কি হচ্ছে কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। তাঁর পায়ের কাছে তাঁকে ফাঁসিয়ে দেবার মতো কাগজগুলি পড়ে রয়েছে, এই পরিস্থিতিতে তাঁর তো ওইখানে এই রকম সপ্রতিভ, আত্মপ্রত্যয়ী ও হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা নয়।

আমি কাগজগুলি তুলে নেবার জন্য নিচু হলাম। তিনি তাঁর উচ্চতা থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখলেন।

জাজ, আমি কাল আবার আসবো। আপনি একটু ভালো করে ভেবে কাল আপনার মনঃস্থির করুন।

সে তো করা হয়ে গেছে।

আপনি —

না, জ্যাক।

আমি হলঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে বললাম, কাল আসবো।

নিশ্চয়ই আসবে। অবশ্যই আসবে, কিন্তু আমি মন স্থির করে ফেলেছি।

বিদায় না জানিয়েই আমি হলঘরের অপর প্রান্তে চলে গেলাম। সামনের দরজাটা খোলার জন্য হাত উঠিয়েছি এমন সময় আমি শুনলাম তিনি আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমি ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে কয়েক পা অগ্রসর হলাম। তিনি হলঘরে বেরিয়ে এসেছিলেন। আমাকে লক্ষ করে তিনি বললেন, ওই

কৌতূহলোদ্দীপক কাগজগুলি থেকে আমি সত্যিই নতুন একটা জিনিস জানতে পেরেছি। আমার বহু দিনের পুরনো বন্ধু গভর্নর স্ট্যান্টন যে আমাকে রক্ষা করার জন্য তাঁর নিজের সম্মানকে ক্ষুণ্ন করেছিলেন সেকথা জেনেছি আমি। কিন্তু এজন্য আমার আনন্দ বেশি হবে, নাকি দুঃখ, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিমাণ জেনে, কিংবা এর জন্য তাঁর দুঃখের পরিমাণের কথা ভেবে, কি হবো আমি? আনন্দিত, না বেদনার্ত? উনি কোনোদিন আমাকে একথা বলেন নি। ওই খানেই নিহিত তাঁর ঔদার্যের মাত্রা। তাই না? আমাকে কোনো দিন না বলার মধ্যে।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলাম যে হয়তো তাই।

তোমাকে আমি গভর্নর স্ট্যান্টন সম্পর্কে এই কথাটাই জানাতে চেয়েছিলাম।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম, অনুভব করলাম আমার পিঠের উপর তাঁর হলুদ চোখের দৃষ্টি আর প্রশান্ত হাসি, তারপর বেরিয়ে এলাম উজ্জ্বল আলোর মধ্যে।

পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমার মনে হচ্ছিলো রাস্তাটা যেন নরকের অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠেছে। আমি কি করবো ভাবতে লাগলাম। খানিকক্ষণ সাঁতার কাটবো, নাকি এখনই গাড়িতে উঠে শহরে ফিরে যাবো, গিয়ে কর্তাকে বলবো যে বিচারপতি আরউইন অনড়। তারপর স্থির করলাম যে আমি আরেকটা দিন অপেক্ষা করবো। অপেক্ষা করেই দেখি, কে জানে বিচারপতি যদি তাঁর মত পাল্টান। কিন্তু এখন নয়, সাঁতার কাটবো আরো পরে। এখন সাঁতারের জন্যও বড্ড বেশি গরম। আমি এখন বাড়ি ফিরেই স্নান করবো, তারপর সাঁতার কাটার মতো একটু ঠাণ্ডা হয়ে না আসা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকবো।

স্নান করলাম আমি, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম, তারপর ঘুমিয়ে গেলাম।

হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙলো। বিছানায় খাড়া হয়ে বসলাম। চোখ থেকে ঘুমের শেষ রত্তিও উধাও হয়ে গেছে। যে শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো সেটা এখনও আমার কানে বাজছে। আমি জানি সেটা কি। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার। তারপরই আবার সেই শব্দটা হলো। একটা উজ্জ্বল, সুন্দর, উচ্চগ্রামের রূপালী চিৎকার।

আমি এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে ছুটলাম, খেয়াল হলো যে আমি সম্পূর্ণ নগ্নদেহ, তাড়াতাড়ি গায়ে একটা কাপড় জড়িয়ে নিলাম, তারপর দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গেলাম। হলঘরের ওপারে আমার মায়ের ঘর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছিলো, মৃদু গোঙানির মতো। দরজা খোলা। আমি দৌড়ে ভেতরে ঢুকলাম।

মা খাটের এক কিনারে বসে আছেন, পরনে একান্ত কোমল, ঘরোয়া পোশাক, এক হাতে শয্যার পাশে রাখা সাদা টেলিফোনটা ধরে আছেন, উন্মত্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে, তাঁর মুখ থেকে গোঙানির শব্দ নির্গত হচ্ছে। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি হাত থেকে টেলিফোনটা ছেড়ে দিলেন। সেটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেলো। আর তিনি আমার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে চিৎকার করে বলে উঠলেন, তুমি — তুমি — তুমি ওকে মেরে ফেলেছো!

কি? কি বলছো তুমি?

তুমি ওকে মেরে ফেলেছো!

কাকে মেরে ফেলেছি আমি?

তুমি ওকে মেরে ফেলেছো! মা পাগলের মতো হাসতে আরম্ভ করলেন।

আমি এখন তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছি, তাঁর হাসি থামাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তিনি আমাকে আঁচড়ে খামচে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাসি বন্ধ করলেন এবং সেই অবসরে আমি শুনতে পেলাম টেলিফোনটার মৃদু শুষ্ক সঙ্কেতধ্বনি, জানিয়ে দিচ্ছে যে সেটা র‍্যাকের উপর নেই। তারপরই তাঁর হাসি ওই ধ্বনিকে ডুবিয়ে দিলো।

আমি কড়া গলায় বললাম, আঃ, চুপ করো, চুপ করো। এবার হঠাৎ তিনি বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকালেন, যেন এই প্রথম তিনি আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হলেন।

তারপর, এখন আর জোরে নয় কিন্তু তীব্র কণ্ঠে, তিনি বললেন, তুমি ওকে মেরে ফেলেছো।

তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, কাকে?

তোমার বাবাকে। ওহ্, তুমি তাঁকে মেরে ফেলেছো।

তো, এই ভাবেই আমি আবিষ্কার করলাম। আবিষ্কারের মুহূর্তটিতে আমার সমস্ত চেতনা অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। একটা শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি আপনাকে আঘাত করলে আপনি চরকির মতো সম্পূর্ণ ঘুরে যেতে পারেন কিন্তু কিছুই অনুভব করবেন না। প্রথমে না। আর ওই মুহূর্তে আমি অন্য কাজেও ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার মায়ের অবস্থা তখন বেশ খারাপ। ততক্ষণে দোরগোড়ায় গোটা-দুই কৃষ্ণাঙ্গ মুখ এসে হাজির হয়েছিলো, পাচিকা আর একটি কাজের মেয়ে, আমি ধমকে উঠে ওদের ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি ডক্টর ব্ল্যান্ডকে খবর দিতে বললাম। তারপর আমি টিকটিক করা ফোনটা মেঝে থেকে তুলে ঠিক

জায়গায় রেখে দিলাম, যেন নিচতলা থেকে তারা ফোন ব্যবহার করতে পারে, তারপর মাকে রেখে সশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। ওদের সব-দেখা সব-জানা চোখ এই মুহূর্তের ঘটনাপ্রবাহ থেকে একটু অন্তরালে থাকুক।

গোঙানি আর হাসির ফাঁকে ফাঁকে মা কথা বলে চলেছিলেন। তিনি তাঁকে কি রকম ভালোবাসতেন, একমাত্র তাঁকেই যে তিনি সত্যিকার ভালোবেসেছিলেন, আর তাঁকে আমি মেরে ফেলেছি, আমি আমার নিজের পিতাকে হত্যা করেছি। এই জাতীয় অনেক কথা তিনি বলে যাচ্ছিলেন। ডঃ ব্ল্যান্ড যখন এসে পৌছান তখনও তাঁর বাক্যস্রোত অনর্গল প্রবাহিত হচ্ছিলো। ডাক্তার একটা ইঞ্জেকশান দিলেন। মার গোঙানি আর অস্ফুট কথাবার্তা এখন থেমে আসছে। বিছানায় শুয়ে থাকা মায়ের দেহের ওপাশ থেকে ডাক্তার তার ধূসর, সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত প্যাঁচার মতো মুখ তুলে আমাকে লক্ষ করে বললেন, জ্যাক, আমি একজন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি। খুব বিশ্বাসী মহিলা। তুমি আর কাউকে এঘরে আসতে দিও না। বুঝলে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি এ-ও বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনিও আমার মায়ের অসমৃদ্ধ প্রলাপোক্তির অর্থ পরিস্কার বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি বললেন, নার্স না আসা পর্যন্ত তুমি এই ঘরে থাকবে। আমি আবার এসে তোমার মাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখার আগে নার্স যেন কাউকে এঘরে আসতে না দেয়। কাউকেই নয়।

আমি মাথা নেড়ে তাঁকে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

তিনি বিদায় সম্ভাষণ জানাবার পর আমি তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড় করিয়ে বললাম, ডাক্তার, বিচারপতির কি হয়েছে? মা কি বললেন আমি তা ঠিকমতো বুঝতে পারি নি। তাঁর কি স্ট্রোক হয়েছে? তিনি কি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন?

তিনি বললেন, না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি আমার মুখ দেখলেন।

তাহলে কি?

উনি গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। তখনো ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার মুখ দেখছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই সাধারণ দৈনন্দিন গলায় তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে এর পেছনে স্বাস্থ্যগত কারণ আছে। কিছুদিন যাবৎ তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ছিলো। খুব সকর্মক মানুষ — একজন স্পোর্টসম্যান — প্রায়ই — ডাক্তারের গলা আগের চাইতেও শুকনো আর নিস্পৃহ মনে হলো — প্রায়ই ওই ধরনের মানুষ তার শেষ দিনগুলির সীমিত কর্মকাণ্ডের বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে পারে না। হ্যাঁ, আমি সুনিশ্চিত যে এটাই কারণ।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

বিদায় জানিয়ে ডাক্তার, আমার উপর থেকে তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে, হলঘরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

তিনি যখন প্রায় সিঁড়ির কাছে এসে পৌছেছেন আমি তখন ডাকলাম, ডাক্তার, তারপর তাঁর দিকে ছুটে গেলাম।

তাঁর কাছে এসে আমি বললাম, ডাক্তার, উনি কোথায় গুলি করেছেন? মানে, শরীরের কোন্ জায়গায়? মাথায় নয় তো?

সোজা বুকে। তারপর যোগ করলেন, .৩৮ পিস্তল দিয়ে। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ক্ষত।

তারপর তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। আর আমি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম কেমন করে মৃত লোকটির বুক ভেদ করে গুলি চলে গিয়েছিলো, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন একটি ক্ষত, মুখের মধ্যে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয় নি, ভেতরের কোমল ঝিল্লীগুলি ঝলসে যায় নি, মাথার খুলিটা ডিমের খোলের মতো বিস্ফোরিত হয়ে কোনো ভয়ঙ্কর বিশ্রী জঞ্জাল তৈরি করে নি। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি ওই সুন্দর পরিচ্ছন্ন ক্ষতের কথা ভেবে স্বস্তি বোধ করলাম।

আমি নিজের ঘরে গেলাম, কিছু কাপড় তুলে নিলাম, তারপর আবার মায়ের ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। পোশাক পরে আমি চমৎকার বিশাল খাটটির পাশে বসলাম। ওখানে শায়িত লেস-বসানো কাপড় পরা মানুষটিকে মনে হলো কতো ছোটখাটো। বুক শিথিল, মুখ শুকনো, পাংশুবর্ণ। মুখটা একটু খোলা, তার মধ্য দিয়ে ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে। ওই মুখ আমি প্রায় চিনতেই পারছিলাম না। চল্লিশ বছর আগে আরকানস'-র এক কাঠের কারবারের শহরে একটি কোম্পানী কমিসারির সিঁড়িতে ঘন সবুজ পোশাক পরা একটি স্বর্ণকেশী মেয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তার পাশে ছিলো কালো স্যুট পরা মোটাসোটা একটি লোক। করাত দিয়ে কাঠ চেরার তীব্র শব্দে সমস্ত বাতাস ভরে উঠেছিলো, মাথার ভেতরে শিরা ছিড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলো, লাল ধুলো মিশে যাচ্ছিলো কর্তিত গাছের গুঁড়ির হাল্কা সবুজের সঙ্গে আর বসন্তের রোদ যেন বাষ্পের মতো ধোঁয়া হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। বিছানায় শোয়া এই মুখ নিশ্চয়ই সেদিনের সেই মেয়েটির মুখ নয়। বহু বছর আগের সেই দিনগুলিতে যে বুভুক্ষু গালের উজ্জ্বল একটি মুখ মার্টলকুঞ্জের সরু পথে কিংবা গোপন দেবদারু বনে কিংবা শার্সী বন্ধ ছোট্ট ঘরে একটি উষ্ণদৃষ্টির, বাজপাখির মাথার মতো মাথাওয়ালা, মানুষের দিকে মরীয়া হয়ে চরম আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিলো এটা সে মুখ নয়। না, এ মুখ এখন বৃদ্ধ। আমার মন তার জন্য গভীর

দুঃখে পূর্ণ হয়ে গেলো। আমি ঝুঁকে চাদরের উপর শিথিলভাবে পড়ে থাকা তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। আমি ওর হাতটি নিজের হাতে ধরে রেখে পণ্ডিত এটনীর পরিবর্তে যদি তার বন্ধু সেদিন আরকানস'-র ওই ছোট্ট শহরটিতে যেতেন তাহলে ঘটনাবলী কি মোড় নিতো সেকথা কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। না, তাতে খুব বেশি লাভ হতো না, কারণ ওই সময় মন্টি আরউইন ছিলেন এক পঙ্গু রমণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। তাঁর প্রথম স্ত্রী। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি পঙ্গু হয়ে যান, কয়েক বছর শয্যাশায়ী থাকেন, তারপর নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ ক'রে ল্যান্ডিং-এ আমাদের সবার দৃষ্টি ও ভাবনার আড়ালে অন্তর্হিত হন। কোনো সন্দেহ নেই যে মন্টি আরউইন তাঁর পঙ্গু স্ত্রীর প্রতি একটা কর্তব্যের ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, তিনি ওই পঙ্গু স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য মহিলাকে বিয়ে করতে পারেন নি। কোনো সন্দেহ নেই যে সেজন্যই তিনি ওই বুভুক্ষু গালের মেয়েটিকে বিয়ে করেন নি, সেজন্যই তিনি তার বন্ধু পণ্ডিত এটনীর কাছে গিয়ে বলতে পারেন নি, আমি তোমার বউকে ভালোবাসি। সেজন্যই স্বামী সত্যটা জানার পর — নিশ্চয়ই তিনি তা জানতে পেরেছিলেন, জানতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান, বছরের পর বছর বস্তির ছোট্ট ঘরে দিন কাটাতে থাকেন — সেজন্যই আরউইন তখন তাকে বিয়ে করেন নি। তখনো তাঁর স্ত্রী বেঁচে ছিলেন, স্ত্রী পঙ্গু বলে তিনি একটা বক্র সম্মানবোধ থেকে তার সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ বলে মনে করেছিলেন। তারপর আমার মা আবার বিয়ে করেন। নিশ্চয়ই ওই সময় গোপন কামনা-ভালোবাসা-মিলনের সঙ্গে মিশ্রিত ছিলো তিক্ততা আর তীব্র ঝগড়াঝাটি। অবশেষে পঙ্গু মহিলাটি মারা গেলেন। তখন কেন ওঁরা বিয়ে করলেন না? সম্ভবতঃ তাঁর আগের প্রত্যাখ্যানের শাস্তি দেবার জন্যই মা সে সময় রাজী হন নি। কিংবা ততোদিনে তাদের জীবন হয়তো এমন একটা ছকবন্দী হয়ে পড়েছিলো যে সেটা তারা আর ভাঙতে পারেন নি। যাই হোক, তিনি এর পর স্যাভানা থেকে আসা মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, যে-মহিলা তাঁর জন্য কিছুই আনেন নি, না অর্থ, না সুখ। কিন্তু কিছু কাল পর তিনিও মারা যান। তখন কেন ওরা বিয়ে করলেন না?

শেষ পর্যন্ত আমি প্রশ্নটা মন থেকে তাড়িয়ে দিলাম। তখন মনে হয়েছিলো উত্তর সম্ভবতঃ একটাই। যে-ছকের মধ্যে আমরা আছি সেটা যখন আমরা বুঝতে পারি, আমরা নিজেদের জন্য যে-সংজ্ঞা নির্মাণ করে নিয়েছি সেটা যখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হই, তখন বড়ো দেরি হয়ে যায়, তখন আর বাক্স ভেঙে বেরিয়ে আসা যায় না। তখন আমরা খাঁচায় বন্দী কয়েদীর মতো, যে শুতে পারে না, বসতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না, যে বিচারের পরিণতিতে লোকজনের দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে ওর মধ্যে

ঝুলে থাকে, আমরা সেই কয়েদীর মতো নিজেদের তৈরি সংজ্ঞার মধ্যেই শুধু বাঁচতে পারি। অথচ আমাদের যে সংজ্ঞা আমরা তৈরি করেছি সে তো আমরাই। সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের নতুন সত্তা নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু আমাদের সত্তা নতুন একটা সত্তা কেমন করে তৈরি করবে, যখন সেই সত্তাই হলো একমাত্র বস্তু যার মধ্য থেকে নতুন সত্তাটি তৈরি করতে হবে? অন্ততঃ ওই সময়ে আমি এই ভাবেই আমার যুক্তি–তর্ক উত্থাপন করেছিলাম।

কিন্তু যা বলছিলাম। আমি প্রশ্নটা বাতিল করে দিই, তার যে উত্তর দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলাম সেটাও বাতিল করে দিই। আমি শুধু ওঁর শিথিল হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে রাখি, তাঁর বিশীর্ণ মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ভারী নিঃশ্বাস–প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে থাকি, ভাবতে থাকি আমাকে হঠাৎ ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা সেই তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারের মধ্যে অনুভূতির কি রকম একটা উজ্জ্বল, সুন্দর, রূপালী পবিত্রতা জড়িয়ে ছিলো। আমার মনে হলো বছরের পর ধরে যে–আত্মা সমাধিস্থ হয়ে ছিলো তা যেন মুহূর্তের জন্য হলেও নিজেকে মুক্ত করে ওই চিৎকারের মধ্য দিয়ে তার প্রকৃত সত্তাকে প্রকাশ করেছিলো। তাহলে মন্টি আরউইনকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি জীবনে কখনো কাউকে ভালোবাসেন নি। তাই এখন, আমার হাতের মুঠোয় তাঁর হাত ধরে, আমি শুধু তাঁর জন্য করুণাই নয়, এক ধরনের ভালোবাসাও অনুভব করলাম। কারণ তিনি একজনকে ভালোবেসেছিলেন।

কিছুক্ষণ পর নার্স এসে আমাকে ওই ঘর থেকে ছুটি দিলো। তারপর এলেন মিসেস ড্যানিয়েল, বিচারপতি আরউইনের প্রতিবেশী। আমার মাকে দেখতে এলেন তিনি। তিনিই মাকে ফোনে খবরটা দিয়েছিলেন। বিকালে প্রথমে গুলির শব্দ পেয়ে তিনি বিশেষ কিছু ভাবেন নি, পরে আরউইনের নিগ্রো চাকর যখন আঙ্গিনায় বেরিয়ে এসে চিৎকার করতে শুরু করে তখন তিনি ওকে সঙ্গে নিয়ে ওদের বাড়িতে ঢোকেন, দেখেন যে বিচারপতি তাঁর লাইব্রেরি ঘরে একটা বড় চামড়ার চেয়ারে বসে আছেন, কোলের উপর তাঁর পিস্তলটা পড়ে আছে, তাঁর মাথা কাঁধের উপর ঝুলে পড়েছে, সাদা কোটের বাঁ দিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গলগল করে অনেক কথা বলে গেলেন মিসেস ড্যানিয়েল। আমি কেন বিচারপতির ওখানে গিয়েছিলাম সেটা জানবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন তিনি, আমার মায়ের অসুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন (নিঃসন্দেহে টেলিফোনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আর্ত চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন), তারপর বিদায় নিলেন। আমাদের এখানে আসার পথে, বাড়ি বাড়ি থেমে, তিনি সবাইকে তাঁর কাহিনী শুনিয়ে এসেছেন, এবার আরেক বাড়িতে যাবেন, তবে তাঁর মূল কাহিনীর

সঙ্গে নতুন করে যোগ করার মতো কিছু তিনি এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারলেন না।

তরুণ এক্সিকিউটিভ সাতটার দিকে ঘরে ফিরলেন। তিনি বিচারপতির মৃত্যুর খবর আগেই পেয়েছিলেন কিন্তু আমার মায়ের অবস্থার কথা আমাকে তাঁর কাছে বলতে হলো। আমি তাঁকে খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম তিনি যেন আমার মায়ের ঘরে কোনো কারণেই না ঢোকেন। তারপর আমরা দুজন, তিনি আর আমি, পাশের গ্যালারিতে গিয়ে নীরবে এক পাত্র সুরা পান করলাম। তাঁর সঙ্গ মনে হলো একটা ছায়া মাত্র, তাঁর উপস্থিতি আমার মনে কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি করলো না।

দুদিন পর গীর্জাপ্রাঙ্গণে শ্যাওলা–আবৃত ভৌতিক ওক্ গাছটির তলায় বিচারপতি আরউইনকে সমাহিত করা হলো। তার আগে, ওঁর বাড়িতে, আর সবার সঙ্গে আমিও তাঁর কফিনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাই, নিচু হয়ে মৃতের মুখ দেখি। তাঁর খড়্গনাসা মনে হচ্ছিলো কাগজের মতো সরু, প্রায় স্বচ্ছ। তাঁর দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রঙ অন্তর্হিত হয়ে গেছে। গালে যে হাল্কা লালের আভা এখন দেখা যাচ্ছে সেটা মৃতদেহের পেশাদার রূপকারের শৈল্পিক সৃষ্টি। কিন্তু তাঁর হাল্কা হয়ে আসা চুলগুলি যেন কোনো তড়িৎ শক্তির প্রভাবে তাঁর সমুন্নত মাথা থেকে এককভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। লোকজন কফিনের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলো, নিচু হয়ে তাকালো, ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বললো, তারপর ড্রয়িংরুমের এক প্রান্তে গিয়ে, এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য বাইরে থেকে আনা পামগাছের পাশে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো। এইভাবে, যেমন করে পরিষ্কার এক গ্লাস জলের মধ্যে একটা ছোট্ট দাগ পড়লে তা মিলিয়ে যায়, সমাজের জীবনে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি তেমনি অনায়াসে আত্মস্থ হয়ে গেলো । বৈরী কেন্দ্রবিন্দু থেকে ছোট্ট দাগটি হাল্কা হয়ে, প্রসারিত হয়ে, বাইরের দিকে ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো, দাগের কেন্দ্রীয় সত্যকে দূরে সরিয়ে দিলো সেই বিস্তার, শেষ পর্যন্ত তার বিন্দুবিসর্গও আর চোখে পড়লো না।

প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে লাগলো আর আমি গীর্জা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকলাম। যে-গহ্বরে বিচারপতি আরউইন এখন শায়িত সেখানে কোদাল ভর্তি করে বালি আর কালো মাটির চাক ফেলা হতে লাগলো। আমার মনে পড়লো কিভাবে তিনি মর্টিমার এল. লিটলপাফের নাম ভুলে গিয়েছিলেন, ওই নামের যে কেউ কখনো ছিলো সেকথাই তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন, কিন্তু মর্টিমার তাঁর কথা কখনো ভোলে নি। মর্টিমারের মৃত্যুর পর বিশ বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে, কিন্তু সে বিচারপতি আরউইনকে কখনো ভোলে নি। তার বোনের বাক্সে রক্ষিত চিঠিটার কথা সে

ভেবেছে, আর তার মাংসহীন মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠেছে আর সে অপেক্ষা করেছে। বিচারপতি আরউইন মর্টিমার এল. লিটলপাফকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু শেষে মর্টিমার বিচারপতি আরউইনকে হত্যা করলো। বিষয়টিকে দেখার এ একটা দৃষ্টিকোণ। আমি মনের মধ্যে এই দৃষ্টিকোণ একটু নাড়াচাড়া করে দেখলাম, তারপর আমার দায়িত্বের দিকটা নিয়ে একটু ভাবলাম। এটা খুব সহজেই বলা যেতো যে এর মধ্যে আমার কোনো দায়িত্ব ছিলো না, যেমন ছিলো না মর্টিমারের। মর্টিমার বিচারপতি আরউইনকে হত্যা করে, কারণ বিচারপতি আরউইন তাকে হত্যা করেছিলেন, আর আমি বিচারপতি আরউইনকে হত্যা করি, কারণ বিচারপতি আরউইন আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন। ওই আলোকে বিষয়টা দেখলে বলা যায় যে মর্টিমার আর আমি ছিলাম বিচারপতি আরউইনের বিলম্বিত ও অবধারিত আত্ম-বিনাশের দ্বৈত হাতিয়ার মাত্র। কারণ হত্যা করা বা সৃষ্টি করা দুটোই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হতে পারে এবং মৃত্যু, শেষ পর্যন্ত, অপরাধীর আপন হস্ত দ্বারাই সংঘটিত হয়, আর সকল মানুষই আসলে আত্মহননকারী। মানুষ যদি জানতো কি করে বাঁচতে হয়, তাহলে সে কখনো মরতো না।

তারা গর্তটি পূর্ণ করে মাটির উপরটা একটা মসৃণ ঢিবির মতো করে দিলো, তারপর অসম্ভব সবুজ রঙের কৃত্রিম ঘাসের চাদর দিয়ে তা আচ্ছাদিত করলো। ওই গীর্জাপ্রাঙ্গণে ঘন শ্যাওলা, গাছগাছালির শাখাপ্রশাখা, আর পায়ে মাড়ানো অজস্র পত্রপল্লবের জন্য কখনো প্রাকৃতিক ঘাস জন্মাতে পারতো না। তারপর সুশীল জনতাকে অনুসরণ করে আমি গীর্জাপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করলাম, পেছনে পড়ে রইলেন মৃত মানুষটি, শেষকৃত্যকারের শৈল্পিক সৃষ্টিকর্মের ফসল সবুজ ঘাসের নিচে, যার নৈপুণ্যের ফলে আমাদের কোমল অনুভূতিগুলি আহত হলো না, সদ্য খোদাই করা মাটি আমাদের চোখে পড়লো না, যেন কিছুই ঘটে নি, জীবন আর মৃত্যুর সকল তাৎপর্য পড়ে রইলো পর্দার অন্তরালে।

আমি আমার পিতাকে ফেলে রেখে পথ ধরে এগিয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে তাঁকে আমি আমার পিতা বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তার মানে, যে-পণ্ডিত এটর্নীকে এত কাল আমার পিতা বলে মনে করে এসেছি সেই অনুভূতি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে এনেছিলাম। ওই লোকটি যে আমার পিতা নন সেটা ভেবে আমি মনের মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করলাম। আমার সব সময়ই মনে হতো যে তাঁর দুর্বলতার একটা অভিশাপ পড়েছে আমার উপর। অন্ততঃ ওই রকমই আমার মনে হতো। তাঁর ছিলো একটি সুন্দরী, প্রাণবন্ত, তরুণী স্ত্রী, অন্য একটি মানুষ ওই স্ত্রীকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাঁকে একটি পুত্রসন্তান

উপহার দেয়, আর তিনি কি করলেন, নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে গেলেন, তাঁর যা কিছু ছিলো সব ছেড়ে এলেন স্ত্রীর মালিকানায়, আর নিজে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন বস্তির রদ্দি ঘর–বাড়িতে, সেখানে পড়ে রইলেন একটা আহত জন্তুর মতো, নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিঃশেষিত করলেন কিছু অর্থহীন ধর্মীয় পুণ্যবাক্য উচ্চারণ করে আর তাঁর শক্তিকে রূপান্তরিত হতে দিলেন করুণ দুর্বলতায়। তিনি ছিলেন সত্যিকার ভালোমানুষ। কিন্তু তাঁর ভালোত্ব আমাকে কিছুই শেখায় নি, শুধু এইটুকু ছাড়া যে ওই ভালোত্ব দিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না। আমার নতুন পিতা ভালো ছিলেন না। তিনি তাঁর বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, এক স্ত্রীকে প্রতারিত করেছিলেন, অপর একজনকে বধূরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি একটি মানুষকে, যদিও নিজের অজ্ঞাতসারে, মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অনেক ভালো কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বিচারক। তিনি সর্বদা তাঁর মাথা সমুন্নত রেখেছিলেন। জীবনের শেষ অপরাহ্নেও তিনি তাঁর মাথা উঁচু রেখেছিলেন। তিনি বলেন নি, শোনো, জ্যাক, তুমি এটা করতে পারো না — জ্যাক — আমি তোমার বাবা।

তো, আমি ভালো দুর্বল পিতার বদলে পেয়েছি মন্দ শক্তিশালী পিতা। আমার খারাপ লাগছে না। পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বিচারপতির জন্য আমার দুঃখ হচ্ছিলো, কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্য আমার মনে কোনো ক্ষোভ ছিলো না। তবে এর পরই আমার অন্য বৃদ্ধটির কথা মনে পড়লো, নোংরা একটা ঘরে এক জড়বুদ্ধি ব্যায়ামবীরের দিকে তিনি ঝুঁকে পড়ে তার অশ্রুসিক্ত মুখের কাছে এক টুকরো চকোলেট ধরে আছেন, আর তখনই আমার একটি শিশুর কথা মনে পড়লো, আগুনের সামনে সে কার্পেটের উপর বসে আছে, আর একজন মোটাসোটা, কালো কোট পরা মানুষ তাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, এই নাও বাবা, খাওয়ার আগে ছোট্ট এই এক টুকরো, তার বেশি নয়। আর তখন আমি আমার অনুভূতি সম্পর্কে আর সুনিশ্চিত থাকতে পারলাম না।

অতএব আমি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস ত্যাগ করলাম। ওঁদের সম্পর্কে আমার অনুভূতির স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ ওঁদের দুজনকেই আমি হারিয়েছি। বেশির ভাগ মানুষই এক পিতা হারায়, কিন্তু আমার অবস্থা একটু অদ্ভুত, আমি একই সময়ে দুই পিতা হারিয়েছি। আমি খুঁড়ে খুঁড়ে সত্য বার করেছি, আর সত্য সব সময় পিতাকে হত্যা করে, ভালো এবং দুর্বল পিতা অথবা মন্দ এবং শক্তিশালী পিতা, উভয়কেই, আর তখন থাকেন শুধু আপনি একা

আর সত্য, জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার পিতাকে আর কখনো পাবেন না, অবশ্য পিতার কোনো উত্তর জানাই নেই, আর তিনি সে সময় মরে ভূত হয়ে গেছেন।

পরদিন, শহরে ফিরে আসার পর, আমি ল্যান্ডিং থেকে একটা ফোন পেলাম। জনৈক মিঃ পিটাস ফোন করেছেন, দেখা গেলো যে তিনি হলেন বিচারপতির সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর কথা থেকে প্রতীয়মান হলো যে চাকরবাকরদের কিছু ছোটখাট দান বাদ দিয়ে বিচারপতি আমাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করে গেছেন। বহু বছর আগে একটিমাত্র অসাধু কর্মের মাধ্যমে তিনি যে ভূসম্পত্তি রক্ষা করেছিলেন এখন আমিই হলাম তার একমাত্র উত্তরাধিকারী আর বিচারকের অন্যায় কাজের এক নিরপরাধ যন্ত্র হিসাবে আমি তাঁর বুকে পিস্তলের গুলি ছুঁড়েছি।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে একই সঙ্গে এতো উদ্ভট এবং যুক্তিযুক্ত মনে হলো যে ফোন ছেড়ে দেবার পর আমি হো হো করে হেসে উঠি। আমি হাসি প্রায় থামাতেই পারছিলাম না। কিন্তু হাসি থামাবার আগেই আমি টের পেলাম যে আমি মোটেই হাসছিলাম না, বরং হু হু করে কাঁদছিলাম, আর বারবার বলছিলাম, বেচারা, বেচারা। দীর্ঘ শীত ঋতুর পর যেন বরফ গলে যাচ্ছিলো। শীতটা সত্যিই বড়ো বেশি দীর্ঘ ছিলো।

## নবম অধ্যায়

একটা প্রচণ্ড ঝড়, কিংবা সঙ্কটের পর, যখন আঘাতের প্রথম ধাক্কা কেটে যায়, স্নায়ুসমূহ যখন তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর দাপাদাপি থামায়, তখন মানুষ পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতির মধ্যে স্থিতু হয়ে বসে, মনে করে যে আর পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। সে নিজেকে নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়, আর ওই নতুন ভারসাম্যের অবস্থাকে চিরন্তন বলেই মনে করে। বিচারপতি আরউইনের মৃত্যুর পর শহরে ফিরে এসে আমার ওই রকমই মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যে একটা কাহিনী শেষ হয়ে গেছে। অনেক কাল আগে যা আরম্ভ হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে। লেবু চটকে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু স্থির নিশ্চিত বলে যদি কিছু থাকে তা এই যে, কোনো কাহিনীই শেষ হয় না, যখন মনে হয় যে কাহিনী শেষ হয়েছে সেটা আসলে ওই অন্তহীন কাহিনীর অধ্যায়ের শেষ মাত্র, তখনো খেলা শেষ হয় নি, শুধু একটা ইনিংসের সমাপ্তি ঘটেছে, আর খেলা যখন বন্ধ করা হবে সেটা হবে অন্ধকার হয়ে আসার কারণে। কিন্তু তার আগে দিন হবে দীর্ঘ, বড়ো দীর্ঘ।

কর্তা যে ছোট্ট খেলা খেলছিলেন তা শেষ হয় নি। কিন্তু আমি তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে বিচারপতি আরউইনের কাহিনী, যাকে আমি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী বলে ভেবেছিলাম, সেটা আসলে কর্তার বৃহত্তর কাহিনীর একটা অধ্যায় মাত্র। সে কাহিনী এখনো শেষ হয় নি, আর সেটাও বৃহত্তর অন্য এক কাহিনীর একটি অধ্যায় মাত্র।

আমি ঘরে ঢুকতেই কর্তা আমাকে তাঁর টেবিলের ওপাশ থেকে দেখলেন, দেখেই বলে উঠলেন, এই যে হতচ্ছাড়া এসেছেন। আমার কাছ থেকে দিব্যি সটকে পড়েছিলেন তিনি।

আমি কোনো কথা বললাম না।

কর্তা বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে ওকে ভয় দেখিও, কিন্তু ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলতে তো বলি নি।

উনি তো ভয় পান নি।

তবে ওই কাণ্ডটা করলেন কেন?

আমি এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

কিন্তু কাজটা কেন করলেন?

আঃ, বললাম না যে আমি এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

তিনি একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর চেয়ার থেকে উঠে, টেবিল ঘুরে, আমার কাছে এসে আমার কাঁধে তাঁর ভারী হাত রেখে বললেন, আমি দুঃখিত, জ্যাক।

আমি তাঁর হাতের নিচ থেকে সরে এলাম।

তিনি আবার বললেন, আমি দুঃখিত। ও তো এক সময় তোমার বেশ বন্ধু ছিলো, তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি টেবিলের উপর বসে তাঁর প্রশস্ত হাঁটুটা তুলে দু'হাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরলেন।

একটু পরে তিনি চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বললেন, ম্যাকমারফি এখনো রয়েছে।

হ্যাঁ, ম্যাকমারফি এখনো রয়েছে, তবে তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইলে আপনাকে অন্য লোক দেখতে হবে।

এই, তুমি কি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো নাকি?

না, শুধু আমি কয়েকটা জিনিস আর করবো না।

তো, ব্যাপারটা তো সত্যি ছিলো, তাই না?

কোনটা?

বিচারপতি যা করেছিলেন সেই ব্যাপারটা — যাই তিনি করে থাকুন না কেন।

একথা আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। কাজেই আমাকে মাথা নেড়ে বলতে হলো যে, হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি।

তা হলে?

আমার যা বলার তা আমি বলেছি।

কর্তা তাঁর ঝুলে পড়া চুলের নিচ থেকে তন্দ্রাতুর চোখে আমাকে লক্ষ করলেন, তারপর শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, জ্যাক, আমরা অনেক কাল এক সঙ্গে আছি। আমার আশা, শেষ পর্যন্ত এইভাবেই থাকবো। একসঙ্গে। আমরা দুজন, তুমি আর আমি, একত্রে অনেক কাজ করেছি।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

তিনি আমাকে আরো কিছুক্ষণ ভালো করে লক্ষ করে বললেন, কিছু ভেবো না, শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি তিক্ত কণ্ঠে বললাম, হ্যাঁ, আপনি সিনেটর হবেন।

তিনি বললেন, আমি সে কথা বলতে চাই নি। ব্যাপারটা শুধু তা নয়। ইচ্ছা করলে সিনেটর আমি এখনই হতে পারি।

তা হলে আপনি কি বলতে চেয়েছিলেন?

তিনি এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলেন, আমার দিকে তাকালেনও না, তারপর তাঁর বাঁকানো হাঁটু জড়িয়ে ধরা দুটি হাতের উপর চোখ নামিয়ে হঠাৎ বললেন, আঃ, বাদ দাও ওসব। ভুলে যাও এসব কথা। তিনি অকস্মাৎ তাঁর হাটুর উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন, পা নেমে এলো, মেঝের উপর ধপ করে একটা শব্দ হলো, আর তিনি প্রায় লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নামলেন। তারপর বললেন, কিন্তু, না, কেউ যেন না ভোলে, না ভুললেই মঙ্গল, ম্যাকমারফি নয়, অন্য কেউ নয় — আমার যা করবার আমি তা করবোই। দরকার হলে আমি খালি হাতে ওদের হাড় গুঁড়ো করে ফেলবো। তিনি আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন, একটু বাঁকানো, আবেগময়, যেন কিছু একটা এখনই জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছেন।

তারপর টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে প্রায় আপন মনে তিনি বলে উঠলেন, ওই ফ্রে লোকটা। ওই ফ্রে-টা—

ওঁর মুখে একটা চিন্তামগ্ন নীরবতা নেমে এলো। ফ্রে যদি সে মুখ দেখতে পেতো তা হলে সে সানন্দ চিত্তে আরকানস'-র ওই ঠিকানাবিহীন খামার বাড়িতে চিরদিনের জন্য থেকে যেতে রাজি হতো।

তো, কর্তা আর ম্যাকমারফির কাহিনী, যার একটা অংশমাত্র ছিলো বিচারপতি আরউইনের কাহিনী, সামনের দিকে এগিয়ে গেলো, তবে তার মধ্যে আমার কোনো হাত ছিলো না। আমি আমার সরল নির্দোষ ছোট ছোট কাজকর্মে লেগে রইলাম, আমার আপিস ঘরে বসে থাকলাম, আর প্রায় অজান্তে শরৎ এগিয়ে এলো, পৃথিবী তার অক্ষদণ্ডের উপর একটুখানি ঝুঁকলো, আর বিশাল সূর্যের যে প্রত্যক্ষ, ফুলেফেঁপে ওঠা, স্ফটিকস্বচ্ছ, সর্বস্ব পুড়িয়ে দেয়া রশ্মি আমার ছোট্ট অবস্থানটির উপর এসে পড়ছিলো তাকে একটুখানি হটিয়ে দিলো। রাতের বেলায় হাওয়া উঠলে ওক্ গাছের পাতায় শুকনো সরসর শব্দ হতো, শানবাঁধানো পথ আর ট্রাম লাইন ছাড়িয়ে ইক্ষু ক্ষেতের ঘন ইক্ষুদণ্ডগুলি তখন ভারী ছুরি দিয়ে কাটা হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো চাকার গাড়ি মিষ্টি গন্ধময় ইক্ষুদণ্ডে বোঝাই হয়ে রুক্ষ মেঠো পথ পাড়ি দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলেছে, আরো দূরে তুলা উঠিয়ে ফেলার পর শূন্য সমতল কালো একটি তুলার ক্ষেতে একটি নিগ্রো জাফরান রঙা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে

যীশুর সঙ্গে তার দেনা-পাওনার বিষয় নিয়ে বিষণ্ন গলায় এক মনে গান গাইছে। আর ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে, অনুশীলনীর মাঠে, একটি দীর্ঘপদী, বৃষস্কন্ধ তরুণ চামড়ার একটি গোলককে ক্রমাগত আঘাত করে চলছে তার পা দিয়ে, বারবার, আরেকটু দূরে প্রচণ্ড হুটোপুটি চলছে, চিৎকার শোনা যাচ্ছে বহু মানুষের, আর মাঝে মাঝে তীব্র তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ। শনিবারের রাতে স্টেডিয়ামের উজ্জ্বল আলোর নিচে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে একটি গর্জন ঃ টম, টম, টম, টম! কারণ বল তখন টম স্টার্কের হাতে, টম স্টার্ক ছুটে চলেছে, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, পৌঁছে গেছে লাইন পেরিয়ে, আর গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে তখন শুধু টম, টম, টম।

ক্রীড়া সাংবাদিকদের ভাষ্য অনুযায়ী টম এখন তার সর্বোচ্চ ফর্মে, কিন্তু এই সময়টায় সে তার বাবাকে দুর্ভাবনায় ক্লিষ্ট করে ফেলেছিলো। কর্তার মেজাজ তখন তুঙ্গে, দপ্তরের লোকজন পা টিপে টিপে হাঁটে, মেয়েরা ডিক্টেশন নেবার পর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে টাইপরাইটারের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে, রাজ্য সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এক হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে, অন্য হাত দিয়ে প্রায় পথ হাতড়ে হাতড়ে দীর্ঘ বাইরের ঘরটির মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে যায়, দেয়ালের গিল্টি করা ফ্রেম থেকে প্রয়াত গভর্নরদের চিত্রিত চোখ তাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। শুধু কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না স্যাডির মধ্যে। সেলাইরত কোনো রমণী যেভাবে দাঁত দিয়ে কট্ করে সুতো কাটে স্যাডি সেইভাবে তার কাটা কাটা কথা বলে যাচ্ছে, কর্তার দিকে তাকাচ্ছে তার কালো পিপাসার্ত দুচোখ মেলে, যেন ভবিষ্যতের একটা আত্মা মানবের আশাবাদী পরিকল্পনা নিয়ে সুগভীর চিন্তামগ্ন।

ওই সময় একমাত্র খেলার মাঠে কর্তা তাঁর তিক্ত কালো মানসিক পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসতেন। আমি বার দুই ওঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। মাঠে টমের সাফল্যের মুহূর্তে কর্তা পরিবর্তিত মানুষে পরিণত হয়ে যেতেন। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করতো, তিনি সবেগে আমার পিঠে চাপড়ে দিতেন, আমাকে জড়িয়ে ধরতেন ভালুকের মতো। পরদিন সকালে রোববারের কাগজের খেলার পাতা যখন খুলতেন তখনো ওই আনন্দলহরীর খানিকটা তরঙ্গ অবশিষ্ট থাকতো, কিন্তু সেটা পুরো সপ্তাহ পর্যন্ত যেতো না। আর তার বাবাকে সে যে ঝক্কি-ঝামেলার মধ্যে ফেলেছে তাকে প্রশমিত করার ব্যাপারে টমের বিন্দুমাত্র উদ্যোগ দেখা গেলো না। খেলার অনুশীলনীতে ঢিলে দেবার জন্য দু'একবার পিতা-পুত্রের মধ্যে রাগারাগি হয়ে যায়, টমের প্রশিক্ষক বিলি মার্টিনের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া হয়। টম একবার হোটেলের ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলো। এতে তোমাদের কি? সে পা দুটি ফাঁক

করে দাঁড়িয়েছিলো, যেন জাহাজের ডেকে দোলানির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরভর্তি সিগারেটের ধোঁয়া তার মাথার চারপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরছে। সে বলেছিলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বল নিয়ে লাইন অতিক্রম করে যেতে পারছি ততক্ষণ তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ কি? আমি তো কাজটা ঠিকই করছি, তাই না? আর কি চাও তোমরা? তুমি আর মার্টিন আর কি চাও আমার কাছে? আমি স্কোর করছি আর তোমরা এ নিয়ে গর্বভরে প্রচুর গল্প করতে পারছো। তাই তো তোমরা চাও, ঠিক না?

কথাগুলি বলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে টম স্টার্ক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। ততক্ষণে বোধহয় মাথায় রক্ত চড়ে কর্তার সর্বাঙ্গ অসাড় হবার উপক্রম হয়।

পরে কর্তা আমাকে বলেছিলেন, জানো, ছেলেটা আমাকে এইভাবে বললো। আমার উচিত ছিলো তখনই কষে তার গালে একটা চড় দেয়া।

কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি বেশ ধাক্কা খেয়েছেন।

ইতোমধ্যে কর্তা সিবিল ফ্রের ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলেছিলেন। তবে, যেমন বলেছি, তাতে আমি কোনো অংশ নিই নি। কিন্তু যা ঘটেছিলো তা খুবই সরল, এবং এমনটি যে হবে তা আগেই বলে দেয়া যেতো। ম্যাকমারফিকে পথে আনবার দুটি উপায়ই ছিলো ঃ বিচারপতি আরউইনের মাধ্যমে আর গামি লারসনের মাধ্যমে। কর্তা আরউইনকে ভয় দেখিয়ে কাজটা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হন। অতএব এখন গামি লারসনকে তাঁর কিনে নিতে হবে। গামিকে কেনা যাবে, কারণ গামি হলো ব্যবসাদার। শুধুই ব্যবসাদার। আপাদমস্তক। উপযুক্ত দাম পেলে সে সব কিছু বিক্রি করতে পারে, অমর আত্মা কিংবা মায়ের পবিত্র অস্থি, আর তার দীর্ঘদিনের বন্ধু ম্যাকমারফি তো এদুটোর কোনটিই নয়। গামি যদি ম্যাকমারফিকে বলে যে, বাদ দাও, এখন তুমি সিনেটর হতে পারবে না, তা হলে অবশ্যই ম্যাকমারফি সরে দাঁড়াবে, কারণ গামিকে ছাড়া ম্যাকমারফি কিছুই না।

কর্তার আর কোনো বিকল্প পথ ছিলো না। তাঁকে কিনতেই হতো। তিনি ম্যাকমারফির সঙ্গে সরাসরি একটা মীমাংসায় আসতে পারতেন, তাকে এবার সিনেটে যেতে দিতে পারতেন, পরের বারের নির্বাচনের সময় তিনি নিজে যাবেন এই রকম একটা ব্যবস্থা হতে পারতো। কিন্তু এর বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি ছিলো। প্রথমতঃ, সময়টা ঠিক হতো না। কর্তাকে সিনেটর হতে হলে এখনই হতে হবে। পরে তিনি গণ্য হবেন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করা আরো কতিপয় সিনেটরের মধ্যে আরেকজন হিসেবে মাত্র। এখন তিনি গণ্য হবেন একটি বালক-বিস্ময় রূপে, যার মুখে তুবড়িবাজি ফোটে। তাঁর একটা ভবিষ্যত থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, ম্যাকমারফিকে যদি

তিনি এখন দলে টেনে ফায়দা তুলতে দেন তা হলে, বহু লোক, যারা এই মুহূর্তে কর্তার বিরুদ্ধাচরণের চিন্তাতেই নিজেদের ঘরে বসে ঘামতে থাকে, তারা ভাববে, বাঃ, এরকম করে তো দিব্যি পার পাওয়া যায়। তারা তখন ম্যাকমারফির বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে, তাদের সঙ্গে লেনদেন শুরু করবে। হয়তো কারো কারো মাথায় নিজেদেরই নতুন পরিকল্পনা গজিয়ে উঠবে। কিন্তু এ ছাড়াও ম্যাকমারফির সঙ্গে কারবার না করার সপক্ষে আরেকটা তৃতীয় যুক্তি ছিলো। আসলে কর্তার গড়নই ছিলো ওই রকম। ম্যাকমারফির কারণে তিনি যদি একটা আপোষ করতে বাধ্যই হন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন যাতে এর মাধ্যমে ম্যাকমারফির কোনো লাভ না হয়। অতএব তিনি লেন-দেনটা করলেন গামি লারসনের সঙ্গে।

দামটা শস্তা পড়লো না। মুড়ি-মুড়কি নয়। মেডিকেল সেন্টারের কন্ট্রাক্টটা দিতে হলো। লারসন যেন ঠিকাদারিটা পায় সে-ব্যবস্থা করা হবে।

কিন্তু ওই ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে আমাকে কিছু করতে হয় নি। সে কাজটা করেছে ডাফি। প্রথম থেকেই সে এটা চাইছিলো। আমার মনে হয় লারসনের কাছ থেকে টাকার একটা ভাগও সে পেয়েছে। তা সেজন্য ওর উপর আমার কোনো রাগ নেই। এর জন্য ও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। গামি লারসন যেন ঠিকাদারিটা পায় সেজন্য ও কর্তার কাছে হাত কচলে তদ্বির করেছে, কর্তা তার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতেন আর ও ঘামে ভিজে উঠতো। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাটা যে তার ঐকান্তিক চেষ্টার জন্য নয়, বরং একটা দৈব যোগাযোগের ফলে হলো সে দোষ তার নয়। অতএব সে যদি কিছু টাকা পেয়ে থাকে তার জন্য আমি ওর উপর রাগ করি নি।

এই সবই কিন্তু ঘটেছিলো আমার অজান্তে। হয়তো আমার চোখের সামনেই ঘটেছিলো, কিন্তু আসন্ন শরতের ওই দিনগুলিতে আমার মনে হচ্ছিলো, আমি যেন ক্রমেই আমার চারপাশের জগত থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। এই জগত চলুক তার পথে, আমি চলতে থাকবো আমার আপন পথে। বরং বলতে হয়, আমার পথ কোনটা জানলে পর সেই পথেই আমি চলতে থাকবো। একবার মনে মনে ভেবেছিলাম, চলে যাবো আমি এখান থেকে, কর্তাকে গিয়ে বলবো, কর্তা, আমি চললাম, আর ফিরে আসছি না এখানে। এটা করতে পারতাম আমি। খাওয়া-পরার জন্য আমাকে কিছুই করতে হবে না। হয়তো আমি সাংঘাতিক ধনী হবো না, কিন্তু নিঃসন্দেহে একজন সুন্দর, শোভন, ভদ্র রকমের ধনী মানুষ হবো, দক্ষিণের রুচির সঙ্গে মানানসই। এখানে কেউই সাংঘাতিক ধনী হতে চায় না, তার মধ্যে একটা বিশ্রী স্থূলতা আছে। অতএব আমি শোভন ভদ্র ধনী হবো। বিচারকের সম্পত্তির ব্যবস্থাটা

পাকা হয়ে গেলেই। (যদি কখনো হয়, কারণ তার মধ্যে অনেক জটিলতা আছে, আর সব কিছু সিজিলমিছিল হতে বেশ সময় লাগবে।)

আমি এবার ভদ্র শোভন ধনী হবো, কারণ বিচারকের অপরাধের ফসলের উত্তরাধিকারী হয়েছি আমি, যেমন আমি একদিন উত্তরাধিকারী হবো, আমার মায়ের মাধ্যমে, পণ্ডিত এটর্নীর দুর্বলতার ফসলের, কারণ আমার মায়ের সম্পর্কে সত্য কথাটি জানার পর তিনি তাঁর সমস্ত টাকা পয়সা মহিলার হাতে ফেলে দিয়ে সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বিচারপতির অতীত অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের উপর নির্ভর করে আমি এখন স্বচ্ছন্দে দূরে কোথাও চলে যেতে পারি, যাপন করতে পারি একটা সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, নির্দোষ জীবন, বিখ্যাত কোনো সমুদ্র সৈকতে ডোরাকাটা চাঁদোয়ার নিচে, মার্বেলের টেবিলের সামনে বসে, ভারমুথ্ পান করতে করতে সূর্যালোকিত ঢেউখেলানো সুনীল সমুদ্রের শোভা নিরীক্ষণ করতে পারি। সত্যি, আমার উভয় পিতা হারাবার পর থেকে আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন সর্বশেষ বন্ধন-ছিন্ন একটা বেলুনের মতো অনায়াসে ভেসে যেতে পারি। কিন্তু আমাকে চলে যেতে হবে বিচারপতি আরউইনের টাকা নিয়ে। এবং ওই বিশেষ টাকাটা, যা আমার ভ্রমণযাত্রাকে সম্ভব করে তুলতে পারতো, অদ্ভুত শোনালেও, তাই একটা গ্রন্থিবন্ধন হয়ে আমাকে এখানে আটকে রাখলো। ভিন্ন উপমা ব্যবহার করে বলতে পারি, এ যেন নোঙ্গরের সঙ্গে বাঁধা একটা দীর্ঘ রজ্জু, আর নোঙ্গরটা গিয়ে অনেক নিচে সুদূর অতীতের সমুদ্র-গুল্ম আর তার নিঃসরণের মধ্যে শক্ত হয়ে আটকে আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমার ক্ষুদ্র প্রাপ্তি নিয়ে এই রকম অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি হয়তো নেহাৎ বোকামি করছিলাম। হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রে সব প্রাপ্তিই এই রকম। হয়তো প্রশ্রাবাগারের উপর ধার্য ট্যাক্স থেকে প্রাপ্ত টাকা পয়সা পকেটে পুরে, ঝনঝন করে তা নাড়তে নাড়তে, সম্রাট ভেসপাসিয়ান যখন ব্যঙ্গভরে বলেছিলেন ঃ 'পেকুনিয়া নন্ ওলেট', তখন তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন।

শেষ অবধি চলে যাই নি আমি, তবে ঘটনা প্রবাহের বাইরে ছিলাম আমি। আমি আমার দপ্তরে বসে কাজ করতাম কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বসে ট্যাক্স সম্পর্কে নানা বইপুঁথি পড়তাম মনোযোগ সহকারে, কারণ আমাকে একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন কাজ দেয়া হয়েছিলো। একটা ট্যাক্স সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের কাজ। আর ওদিকের অন্য ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি এতোই কম খবর রাখতাম যে ব্যবস্থাটা চূড়ান্ত হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত আমি কিছুই জানতে পারি নি।

একদিন রাতে আমি কর্তার সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁর সরকারী বাসভবনে যাই। আমার ব্রীফকেস ভর্তি প্রচুর নোট আর চার্ট। গিয়ে দেখি যে তিনি একা নন।

পেছনের দিকে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে তাঁর সঙ্গে রয়েছে টাইনি ডাফি, সুগার–বয়, আর কী আশ্চর্য, গামি লারসন। সুগার–বয় ঘরের এক কোণায় কুঁজো হয়ে বসে আছে, শিশু যেভাবে গ্লাস ধরে সেইভাবে দু'হাতে একটা গ্লাস ধরে আছে। গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে সে, প্রতি চুমুকের পর টুক্ করে মাথাটা উপরে তুলছে, জল খাবার সময় ঠিক একটা মুরগী যেরকম করে সেই রকম। সুগার–বয় সুরাপায়ী ছিলো না। বলতো যে, তার ভয় হয়, সুরা পান করলে সে না – না – নার্ভাস হয়ে পড়বে। হাওয়ায় গ্লাস ছুঁড়ে দিলে সে পট পট গুলী করে একটার পর একটা গ্লাস চূর্ণ করে দিতে পারতো। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে এক চুল বাঁচিয়ে সে তার কালো ক্যাডিলাক কঠিন জায়গার মধ্য দিয়ে পার করে আনতে পারতো। নার্ভাস হয়ে এটা করতে না পারলে সেটা সুগার–বয়ের পক্ষে হবে সাংঘাতিক বিপর্যয়। অবশ্য ডাফি ছিলো একজন পাকা সুরাপায়ী। কিন্তু সেদিন রাতে ও মদ খাচ্ছিলো না। সে যে মদ খাবার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলো না তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। বড়ো চামড়ার সোফার সামনের শূন্য জায়গায় সে দাঁড়িয়েছিলো, তার সমস্ত ভঙ্গির মধ্যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠেছিলো, এর সঙ্গে অবশ্য তার চকিত চোখের দৃষ্টিতে মিশেছিলো বিজয়ের একটা উল্লসিত আভা। তার অস্বাচ্ছন্দ্যের একটা কারণ, অন্ততঃ অংশতঃ, এই ছিলো যে কর্তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে পান করছিলেন। আর কর্তা যখন সত্যি সত্যি পান করতেন তখন শোভন সঙ্কোচের যে বেড়াজাল তাঁর জিভকে সচরাচর অর্গলবদ্ধ করে রাখতো তা পুরোপুরি হাট হয়ে খুলে যেতো এবং এই মুহূর্তে তিনি সত্যি সত্যিই পান করছিলেন। মনে হচ্ছিলো তিনদিনব্যাপী ঝড়ের প্রথম চমৎকার রক্তিমাভা দেখা যাচ্ছে, ব্যারোমিটার নেমে যাচ্ছে নির্ভুলভাবে। কর্তা চামড়ার সোফাটায় গা এলিয়ে বসে আছেন, তাঁর পাশে মেঝের উপর ধরা আছে এক জগ জল, একটা বোতল, এক গামলা বরফ। এগুলির পাশেই পড়ে রয়েছে তাঁর কোঁচকানো কোট আর জুতো জোড়া। প্রাণভরে মদ খেতে শুরু করলেই তিনি পা থেকে জুতো খুলে ফেলতেন। এখন তিনি নগ্নপদ সুরামগ্ন। বোতল প্রায় খালি হয়ে এসেছে। মিঃ লারসন সোফা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলো। মধ্যমাকৃতির, মাঝ–বয়েসী, আঁটোসাঁটো, ধূসর চেহারার, ধূসর স্যুট পরিহিত, খুব বাস্তব ধরনের দেখতে একটা মানুষ। সুরা পান করতো না। এক সময় জুয়ার আখড়া চালাতো, তখনই দেখেছে যে সুরা পান করে কোনো লাভ হয় না। গামি ছিলো পুরোপুরি ব্যবসাদার মানুষ। লাভ হবে না এমন কোনো কাজের মধ্যে সে থাকতো না।

আমি ঘরে ঢুকে পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করে নিচ্ছিলাম। কর্তা ততক্ষণে আমার উপর তাঁর লাল হয়ে আসা চোখের দৃষ্টি স্থাপন করে আমাকে লক্ষ করছিলেন কিন্তু

সোফার সম্মুখস্থ শূন্য জায়গাটিতে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি কিছু বলেন নি। টাইনি সেই অরক্ষিত শূন্য জায়গাটির ঠিক মাঝখানে মুখে একটা বিবর্ণ হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। কর্তা এবার তার দিকে নিজের একটা বাহু প্রসারিত করে, তাকে দেখিয়ে, আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দ্যাখো, ও-ই তো লারসনের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে বলেছিলো, আর আমি ওকে কি বলেছিলাম? আমি বলেছিলাম, না, কখনো না। আমি বলেছিলাম, তার আগে আমি জাহান্নামে যাবো। কিন্তু হলোটা কি?

আমি ধরে নিলাম যে এটা একটা কাব্যিক প্রশ্ন, এর উত্তর দরকার হয় না। তাই কিছু বললাম না। আমি বুঝলাম যে আজ আর ট্যাক্স বিল সম্পর্কে আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব আমি যে পথে এসেছিলাম গুটি গুটি পায়ে সেই পথে ফিরে যেতে শুরু করলাম।

কর্তা আমাকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠলেন, কিন্তু হলোটা কি?

আমি বললাম, তা আমি কি করে জানবো? অবশ্য কুশীলবদের দেখে নাটকের প্রকৃতি সম্পর্কে আমার একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছিলো।

কর্তা সবেগে টাইনির দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকে আদেশ করলেন, বলো ওকে। বলো, তোমার নিজেকে কেমন ন্যক্কারজনক সফল চালাক-চতুর মানুষ বলে মনে হচ্ছে সেকথা বলো ওকে!

টাইনির মুখে কোনো কথা সরলো না। দামী দর্জির দোকানে তৈরি কালো কোট, সাদা বর্ডার দেয়া ওয়েস্টকোট, হীরার পিন শোভিত ডাফি কোনোরকমে শীতের প্রত্যূষের মতো একটা মলিন হাসি উপহার দিতে সক্ষম হলো মাত্র।

বলো ওকে!

টাইনি তার ঠোঁট ভিজিয়ে লাজুক বধূর মতো পাশে দাঁড়ানো গামির ভাবলেশহীন ধূসর মুখের দিকে তাকালো কিন্তু তখনও তার মুখে কোনো কথা ফুটলো না।

কর্তা বললেন, ঠিক আছে, আমিই তোমাকে বলছি। গামি লারসন আমার হাসপাতাল বানাবে। টাইনি প্রথম থেকেই এই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলো, এখন সে সফল হয়েছে। সবাই এখন খুশি।

আমি বললাম, খুব ভালো।

হ্যাঁ, কর্তা বললেন, সবাই এখন খুশি, শুধু আমি ছাড়া। নিজের বুকে সজোরে মুষ্ঠাঘাত করে তিনি আবার বললেন, শুধু আমি ছাড়া। কারণ আমিই টাইনিকে বলেছিলাম, না, কখনো না, লারসনের সঙ্গে আমি কোনো লেনদেন করবো না।

টাইনি যখন লারসনকে প্রথম এখানে নিয়ে এসেছিলো তখন আমিই তাকে এর মধ্যে ঢুকতে দিই নি। কারণ আমারই উচিত ছিলো বহুদিন আগেই ওকে এই স্টেট থেকে তাড়িয়ে দেয়া। আর এখন কোথায় সে? এ্যাঁ, এখন সে কোথায়?

আমি গামি লারসনের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। তার ধূসর মুখে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় নি। বহুকাল আগে, গামির সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, যখন ও একটা জুয়ার আস্তানা চালাতো, তখন ও একবার পুলিশের হাতে বেদম মার খেয়েছিলো। এমন মার মেরেছিলো যে ওর মুখের চেহারা হয়েছিলো রান্না করার আগের হ্যামবার্গারের মতো। এখন অবশ্য সম্পূর্ণ সেরে গেছে। ও জানতো যে সেটা সেরে যাবে, তাই সে মার খেয়েছে কিন্তু মুখ খোলে নি, কারণ মুখ বন্ধ করে রাখতে পারলে অবধারিতভাবে তার পুরস্কার জোটে। সে-পুরস্কার শেষ পর্যন্ত জুটেছিলো তার ভাগ্যে। জুয়ার আখড়ার অধিকারী থেকে সে উত্তীর্ণ হয় বিত্তশালী কন্ট্রাক্টারে। এটা সম্ভব হয় কারণ পৌর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যথার্থ যোগাযোগ স্থাপনে সে সক্ষম হয়। এটা সম্ভব হয় কারণ কেমন করে মুখ বন্ধ রাখতে হয় সেটা সে আয়ত্ত করে ফেলেছিলো। এখন কর্তা তার উদ্দেশ্যে যেসব বাক্যবাণ নিক্ষেপ করছিলেন সে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে তা শুনে যাচ্ছিলো। কারণ শেষ পর্যন্ত এতে লাভ হবে। গামির মধ্যে যে একজন পাকা ব্যবসায়ীর সহজাত প্রবণতা ছিলো তাতে কোনো ভুল নেই।

কর্তা বললেন, ঠিক আছে, আমিই বলছি এখন সে কোথায়। ওই যে দ্যাখো, এইখানে, এই ঘরের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। দ্যাখো ওকে। কী সুন্দর, তাই না? সে এইমাত্র কি করেছে জানো? তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে সে বেচে দিয়েছে। সে এইমাত্র ম্যাকমারফিকে বিক্রি করে দিয়েছে।

লারসনের মুখ দেখে মনে হতে পারতো সে বুঝি গীর্জায় দাঁড়িয়ে আছে, পাদ্রীর আশীর্বাদের জন্য অপেক্ষমান।

কর্তা বললেন, কিন্তু সেটা তো কিছুই না। একেবারেই কিছু না। গামির জন্য না।

যার মুখে তখন একটি মাংসপেশীর কুঞ্চনও দেখা যাচ্ছিলো না।

না, গামির জন্য কিছু না। ওর সঙ্গে জুডাস ইস্কারিয়েটের একটাই পার্থক্য আছে, গামি ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রার সঙ্গে সেগুলি রাখার জন্য একটা থলিও আদায় করে নিতো। ওহ্, ঠিক দাম পেলে গামি বেচে দিতে পারে না এমন কোনো জিনিস নেই। সে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে বেচে দিয়েছে, আর আমি — আর আমি — তিনি হিংস্রভাবে নিজের বুকে চাপড় মারলেন, একটা ফাঁপা আওয়াজ হলো, যেন পিপার

গায়ে কেউ আঘাত করেছে — আর আমাকেই কিনতে হলো, হারামজাদারা আমাকেই কিনতে বাধ্য করলো!

তিনি চুপ করলেন, তীব্র চোখে দেখলেন গামিকে, তারপর বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন। অনেকখানি ঢাললেন গ্লাসে, তারপর সামান্য জল মেশালেন তার মধ্যে। এখন আর বরফ নিচ্ছেন না। প্রায় চূড়ান্ত সারবস্তুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে জলও বিদায় নেবে।

এই গোটা দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের কি দাম গামি তা নির্ভুলভাবে জানতো, একেবারে কড়াক্রান্তি পর্যন্ত। সেই জ্ঞানলব্ধ নৈতিক সুনিশ্চিয়তা, প্রশান্তি এবং বিজয়ের অনুভূতির ওপর থেকে গামি সোফায় বসা মানুষটিকে নির্বিকার চিত্তে লক্ষ করলো। তিনি জলের জগ নামিয়ে রাখার পর গামি বললো, গভর্নর, আমাদের কাজের ব্যবস্থা যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি ভাবছিলাম যে এবার আমি উঠবো।

কর্তা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাঁর মোজা পরা পা মেঝেতে নামিয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ, কাজের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু — তিনি এক হাতে গ্লাস ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বিশাল একটা কুকুরের মতো একবার গা ঝাড়া দিলেন, খানিকটা সুরা গ্লাস থেকে চলকে মেঝেতে পড়ে গেলো — কিন্তু, শোনো!

মাথাটা একটু সামনে ঠেলে, মোজা পরা ভারী পদক্ষেপে, তিনি লারসনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

টাইনি ডাফি যে ঠিক তাঁর পথে পড়েছিলো তা নয়, কিন্তু সে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেয় নি কিংবা সম্ভবতঃ যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে সরে যায়নি। যাই হোক, তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কর্তা সম্ভবতঃ তাকে প্রায় ধাক্কা দেন, কিংবা হয়তো সত্যি সত্যি ধাক্কা দেন। আর তারপরই লক্ষ্যবস্তুর দিকে দৃকপাত পর্যন্ত না করে, কর্তা তাঁর গ্লাসভর্তি পানীয় ডাফির মুখে ছুঁড়ে মারেন, এবং হাতের সেই একই ভঙ্গি অব্যাহত রেখে গ্লাসটা মেঝের উপর ছেড়ে দেন। সেটা কার্পেটের উপর পড়ে একবার নেচে উঠলো, কিন্তু ভাঙলো না।

গ্লাসভর্তি পানীয় ডাফির মুখের উপর পড়ার ক্ষণটিতে আমি সেদিকে তাকিয়েছিলাম। তার পিঠার মতো বড়ো মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিলো। তা দেখে বহুদিন আগের দেখা একটি দৃশ্য আমার মনে পড়লো। আপটনের সেই বারবেকিউর অনুষ্ঠানে কর্তা ডাফিকে আতঙ্কিত করে তুলেছিলেন আর সে মঞ্চ থেকে হুড়মুড় করে পড়ে গিয়েছিলো। এবার, বিস্ময়ের ভাবের পরপরই, তার মুখে ক্রোধের বিদ্যুৎছটা ফুটে উঠেছিলো, মুহূর্তের জন্য, কিন্তু তারপর সেখানে দেখা দিলো একটা

বিনীত ব্যথিত অভিব্যক্তি। অনুনয়ভরা কণ্ঠে সে বললো, এ কী কর্তা, এরকম করলেন কেন আপনি? কি জন্যে?

কর্তা ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, কথাটা শুনে ডাফির দিকে ঘুরে তাকালেন, তারপর বললেন, অনেক আগেই আমার এটা করা উচিত ছিলো। অনেক আগেই।

তারপর তিনি লারসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এই সব ঘটনায় লারসন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। সে তার হ্যাট আর কোট তুলে নিয়ে পরিস্থিতি একটু শান্ত হবার জন্য চুপ করে অপেক্ষা করছিলো। কর্তা সোজা ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন, প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে। তারপর লারসনের কোট খামচে ধরে নিজের রক্তোচ্ছ্বাসপূর্ণ মুখ লারসনের ধূসর মুখের খুব কাছে এনে বললেন, হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি — তুমি যদি জানালার একটা ছিটকিনি দিতে ভুলে যাও, যদি কংক্রিটের মধ্যে একটা লোহা কম বসাও, যদি চায়ের চামচের এক চামচ বাড়তি বালি মেশাও, মাত্র একখণ্ড ফাটা মার্বেল পাথর বসাও, তাহলে — তাহলে — এই আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, আমি তোমাকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলবো।

তখনো কর্তা লারসনের কোট খামচে ধরেছিলেন। এবার তিনি তাঁর হাত দুটি সবেগে দু'পাশে ছড়িয়ে দিলেন। লারসনের কোটের একটা বোতাম, সে বোতামগুলো ইতোমধ্যে লাগিয়ে ফেলেছিলো, ছিঁড়ে ছিটকে ঘরের মেঝেতে পড়ে ঘুরতে ঘুরতে চুল্লীর গায়ে গিয়ে লাগলো। ছোট্ট একটা শব্দ হলো।

কর্তা বললেন, কারণ ওটা আমার! শুনতে পাচ্ছো? ওই হাসপাতালটা আমার!

তারপর আর কোনো শব্দ নয়, শুধু ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো।

ডাফি ভেজা রুমাল দিয়ে তার ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে নিয়েছিলো। রুমালটা তখনো তার হাতে ধরা। সে ভীত, আতঙ্কিত মুখে দৃশ্যটা দেখছিলো। কিন্তু সুগার-বয় তার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ প্রদর্শন করছিলো না।

লারসন কিন্তু স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো। কর্তা যখন তার কোট খামচে ধরেছেন তখনও তার চোখের একটি পলক পড়ে নি। এজন্য গামিকে বাহবা দিতেই হবে। সে কেঁপে ওঠে নি। তার ধমনীতে ছিলো বরফ জল। কোনো কিছুতেই সে বিচলিত হতো না — অপমানে না, রাগারাগিতে না, মার খেলেও না, পিটিয়ে তার মুখ হ্যামবার্গার করে দিলেও না। ও যথার্থ ব্যবসাদার। সব জিনিসের মূল্য তার জানা ছিলো।

কর্তার ভারী লাল মুখের নিচে সে দাঁড়িয়ে ছিলো। নিঃসন্দেহে কর্তার মদের গন্ধপূর্ণ গরম নিঃশ্বাস তার মুখের উপর এসে পড়ছিলো। কিন্তু সে চুপ করে অপেক্ষা

করলো। তারপর কর্তা ওর কোট থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নিলেন। তিনি তাঁর হাত হাওয়ার মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন, আঙ্গুলগুলিও ছড়ানো, তারপর তিনি পিছনে সরে এলেন। তিনি পিছন ফিরে ওখান থেকে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, যেন জায়গাটা শূন্য, কেউ ওখানে নেই। তাঁর মোজা পরা পা কোনো শব্দ করলো না, শুধু চলার সময় তাঁর মাথা খুব সামান্য এদিক-ওদিক একটু দুলেছিলো।

তিনি সোফায় বসে তাঁর ছড়ানো দুটি হাঁটুর উপর দুই কনুই রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন, দু'বাহু সামনের দিকে সামান্য ঝুলে আছে, চুল্লীর জ্বলন্ত কয়লার দিকে নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে রইলেন। মনে হলো ঘরে তিনি শুধু একা, আর কেউ নেই।

লারসন একটি কথাও না বলে দরজার কাছে এগিয়ে গেলো, দরজা খুললো, বেরিয়ে গেলো, দরজাটা ঠেলে বন্ধ করলো না সে। টাইনি ডাফিও দরজার দিকে অগ্রসর হলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো ভীষণ হাল্কা সে। জলে-ডোবা মানুষের ফুলে ওঠা মৃতদেহ নবম দিবসে যে রকম হাল্কা হয়ে ধীরে ধীরে উপরের দিকে ভেসে ওঠে ডাফিকে সেই রকম হাল্কা দেখাচ্ছিলো। অনেক সময় খুব মোটা মানুষ পা টিপে হাঁটলে এই রকম অনুভূতির জন্ম হয়। দরজার কাছে পৌঁছে, হাতলে একটা হাত রেখে, ডাফি একবার পেছন ফিরে তাকালো। কর্তার দৃষ্টি তখন অন্যত্র। ডাফির চোখ কর্তার উপর পড়তেই এক মুহূর্তের জন্য তার মুখ রাগে জ্বলে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাবলাম, আরে, ও যে মানুষ দেখছি। তারপর সে লক্ষ করলো যে আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। সে আমার চোখে চোখ রাখলো, তার দৃষ্টিতে একটা নীরব কাতর অনুনয় ফুটে উঠলো, সব কিছুর জন্য সে ক্ষমা চাইছে, আমি যেন তাকে বোঝার চেষ্টা করি, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হই, আমি যেন দেখি যে সবাই বেচারা টাইনি ডাফি সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে, সে তো তার নিজের বিচারবুদ্ধির আলোকে সব সময় ঠিক কাজটি করতেই চেষ্টা করেছে, আর এখন ওরা তার মুখে পানীয় ছুঁড়ে মারছে। তার কি নিজের অধিকার বলতে কিছু নেই? বেচারা টাইনির কি কোনো আবেগ-অনুভূতি নেই?

তারপর সে লারসনের পেছন পেছন রাত্রির মধ্যে মিলিয়ে গেলো। সে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করতে সমর্থ হলো।

আমি কর্তার দিকে তাকালাম। তিনি একটুও নড়েন নি। আমি বললাম, যাক, শেষ অঙ্কটি দেখতে পেয়ে আমি আনন্দিত। কিন্তু এবার যেতে হয়।

আজ রাতে যে ট্যাক্স বিল নিয়ে কোনো কথা হবে না তা সুনিশ্চিত।

দাঁড়াও।

তিনি নিচু হয়ে বোতল তুলে নিয়ে দীর্ঘ এক চুমুক দিলেন। এবার তিনি একেবারে সারবস্তুতে পৌঁছে গেছেন।

তিনি আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন, আমি বলে দিয়েছি ওকে, আমি বলেছি, তুমি যদি জানালার একটা ছিটকিনি দিতে ভুলে যাও, যদি কংক্রিটের মধ্যে একটা লোহা কম বসাও, আমি বলেছি, তুমি যদি —

আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনার কথা শুনেছি।

তুমি যদি চায়ের চামচের এক চামচ বাড়তি বালি মেশাও, তুমি যদি ওই রকম একটা ছোট্ট কাজও করো, তাহলে আমি তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবো, একদম ছিঁড়ে ফেলবো। কর্তা সোফা থেকে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি, বললেন, আমি ওকে ছিঁড়ে ফেলবো। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

আমি সায় দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, তাই তো বলেছেন।

আমি বলেছি যে আমি ছিঁড়ে ফেলবো, আর আমি ঠিকই ছিঁড়ে ফেলবো ওকে।

ঠিক আছে।

আমি ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি — তিনি যতখানি সম্ভব তাঁর দু'বাহু দু'দিকে প্রসারিত করে বললেন, আমি ওদের সবাইকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো। যারাই এর মধ্যে তাদের নোংরা হাত লাগাবে তাদেরকেই আমি শেষ করে ফেলবো। আগে ওরা কাজটা শেষ করুক, তারপর আমি ওদের সবাইকে দেখে নেবো। সত্যি বলছি। ঈশ্বরের শপথ, আমি প্রত্যেকের সর্বনাশ করে ছাড়বো। কারণ ওরা আমাকে এই কাজটা করতে বাধ্য করেছে।

আমি বললাম, এর পেছনে টম স্টার্কেরও কিছু ভূমিকা ছিলো বোধহয়।

এইবার তাঁর মুখ বন্ধ হলো। মদে চূর হয়ে থাকা সত্ত্বেও। তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যে আমার ভয় হলো এখনই বোধহয় আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু আমার দিক থেকে ঘুরে তিনি সোফার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু বসলেন না। ঝুঁকে বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন, হাতের ধাক্কায় বোতলটা পড়ে গেলো, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জড়িত কণ্ঠে বললেন, ও তো বাচ্চা একটা। ছেলেমানুষ।

আমি এর জবাবে কিছু বললাম না। তিনি আরেকবার বোতলটা তুলে নিতে চেষ্টা করলেন। তারপর বিড়বিড় করে আবার বললেন, ও তো বাচ্চা একটা।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

কিন্তু অন্যরা — তিনি ফেটে পড়লেন, আবার দু'হাত দু'পাশে প্রসারিত করে প্রায় চিৎকার করে বললেন, কিন্তু অন্যরা? ওরা আমাকে এই কাজটা করতে বাধ্য করলো। আমি ওদের ছিঁড়ে ফেলবো — ওদের সর্বনাশ করে ছাড়বো আমি!

এই জাতীয় কথা বিড়বিড় করে তিনি আরো কিছুক্ষণ বলে গেলেন, তারপর তাঁর সোফায় ঢলে পড়লেন। সেখানে এলানো অবস্থাতেও তিনি একই সুরে আরো কিছুক্ষণ অস্ফুট কণ্ঠে একই রকম মন্তব্য করলেন, বললেন যে টম স্টার্ক একটা বাচ্চা মাত্র, তারপর ওই একমুখী সংলাপ বন্ধ হয়ে গেলো, আর তারপর শুধু তাঁর ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে থাকলো।

আমি ওখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করলাম। আমার মনে পড়লো তাঁর প্রথম মদে চূর হয়ে যাবার কথা, ঈশ্বর জানেন কতোকাল আগের কথা, আপটনে আমার হোটেলের ঘরে মদ খেয়ে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলেন। সেই অবস্থান থেকে আজ অনেক দূর এসেছেন। এখন আমি ঝুঁকে পড়ে যেমুখ দেখছি তা সে দিনের গাব্দাগোব্দা কাসিন উইলির বালক–মুখ নয়। এখন সব বদলে গেছে। ঈশ্বর জানেন কতো বদলে গেছে।

এতক্ষণ সুগার–বয় এক কোণায় ছায়ার মধ্যে চুপ করে বসেছিলো, তার খাটো পা দুটি মেঝে স্পর্শ করছিলো কি করছিলো না। সে এবার তার চেয়ার থেকে উঠে সোফার কাছে এসে কর্তার দিকে তাকালো। আমি ওকে লক্ষ করে বললাম, একদম মরা মাছের মতো অসাড়।

সুগার–বয় এলিয়ে পড়া বলিষ্ঠ দেহটির উপর চোখ রেখে মাথা নাড়লো। কর্তা চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন। একটা পা সোফা থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলো। সুগার–বয় নিচু হয়ে পা'টা সোফার উপর তুলে ঠিক করে দিলো। তারপর তার চোখ পড়লো মেঝেতে পড়ে থাকা কর্তার কোটের উপর। সে ওটা তুলে মোজা পরা পদযুগলের উপর বিছিয়ে দিলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় কুণ্ঠিতভাবে ব্যাখ্যা করলো, ওঁর ঠা – ঠা – ঠাণ্ডা লা – লা – লাগতে পারে।

আমি আমার ব্রীফকেস আর ওভারকোট হাতে নিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। হত্যাযজ্ঞের দৃশ্যটির প্রতি একবার পেছন ফিরে তাকালাম। সুগার–বয় আবার ছায়ার মধ্যে তার চেয়ারে গিয়ে বসেছে। আমার দৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসু কিছু ছিলো, কারণ সে বললো, আমি এখানে বসে থাকবো, দেখবো যেন কেউ ওঁকে বিরক্ত না করে।

রাতের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আমি ভাবছিলাম এ্যাডাম স্ট্যান্টন যদি হাসপাতালটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে জানতো তাহলে সে কি বলতো

এ্যাডামের প্রসঙ্গ তুললে কর্তা কি বলতেন সেটা আমার জানা ছিলো। তিনি বলতেন, বাঃ, আমি বলেছি যে হাসপাতাল আমি বানাবো, তাই বানাচ্ছি আমি। সেটাই তো আসল কথা। বানাচ্ছি আমি। এ্যাডাম হাসপাতাল চালাক আর তার বিবেককে বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত রাখুক। আর কি চাই ওর? এবং পরে আমি যখন প্রসঙ্গটা উত্থাপন করি কর্তা হুবহু ওই কথাই বলেছিলেন।

রাতের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে আমি ভাবছিলাম এ্যান স্ট্যান্টন যদি ওই ঘরে থাকতো, কর্তাকে মদে অচৈতন্য হয়ে সোফার উপর ওভাবে পড়ে থাকতে দেখতো, তাহলে সে কি বলতো। ভাবনাটা আমাকে এক ধরনের তিক্ত আনন্দ দিলো। উইলি স্টার্ক কী বিশাল বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মানুষ, নিজের অন্বিষ্ট সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, দাম দেবার জন্য সদা প্রস্তুত, এই ভেবে যদি এ্যান তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলে থাকে তাহলে এই মুহূর্তে ওর তাকে দেখা উচিত। সোফার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, যেন একটা ষাঁড়, দড়াদড়ির বাঁধনে শৃঙ্খলিত, হাঁটু ভেঙে পড়ে আছে, নড়তে চড়তে পারছে না, নাকের আংটার জন্য মাথা পর্যন্ত তুলতে অক্ষম। হ্যাঁ, ওঁর এই চেহারা তার দেখা উচিত।

তারপর আমার মনে হলো হয়তো এই দৃশ্য দেখার জন্যই সে অপেক্ষা করছে। মেয়েরা মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, হুল্লুড়ে, ন্যায়নীতিহীন মানুষের চাইতে আর কিছুই বেশি ভালোবাসে না। তারা, মানে মেয়েরা, তাকে ভালোবাসে কারণ তারা হলো বাইবেলে বর্ণিত স্যামসনের কাহিনীর মৌমাছির মতো, মৃত সিংহের কঙ্কালের মধ্যে তারা তাদের মৌচাক বাঁধতে ভালোবাসে।

শক্তিমানের মধ্য থেকেই নিঃসৃত হবে মাধুর্য।

টম স্টার্ক ছেলেমানুষ হতে পারে, কর্তা যেমন বলেছেন, কিন্তু ঘটনা যে পথে গড়াচ্ছিলো তার পেছনে ওর যথেষ্ট অবদান ছিলো। কিন্তু, আমার মনে হয়, টম আজ যা হয়ে উঠেছে তার পেছনে কর্তার অবদানও ছিলো যথেষ্ট। অতএব আমরা এর মধ্যে দেখি নির্ভুল বৃত্তকে, পুত্র-পিতার একটি সম্প্রসারণ মাত্র, আর তাই ওদের পরস্পরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকানোটা আর কিছুই নয়, একটা আয়নার আরেকটা আয়নার দিকে তাকানোর মতো মাত্র। বস্তুতপক্ষে ওরা দুজন দেখতেও ছিলো এক রকম, কাঁধের উপর মাথার একই রকম দৃপ্ত অবস্থান, মাথাটা একই ঢং-এ একটু সামনে ঠেলে দেয়া, একই রকম দ্রুত আকস্মিক অঙ্গভঙ্গি। কর্তাকে আমি যখন বহুকাল আগে প্রথম দেখি টম তারই একটি সংস্করণ, তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, মসৃণ মুখ, আত্মপ্রত্যয়ী, ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করা সংস্করণ। প্রধান পার্থক্য ছিলো এইখানে ঃ অনেককাল আগের ওই দিনগুলিতে কর্তা ছিলেন অনিশ্চয়তায় ভরা,

তিনি না জেনে, হাতড়ে হাতড়ে তার নিজেকে, নিজের বিরাট সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করছিলেন, তার পরনে ছিলো ঢোলা আলাখাল্লা কিংবা চকচকে নীল সার্জের আঁটো স্যুট, নিজের মধ্যে তিনি নিয়তি কিংবা কোনো রোগের মতো একটা অন্ধ নামহীন অপ্রতিরোধ্য ও দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে সযত্নে লালন করে চলছিলেন। আর টমের মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা নেই, সে হাতড়ে হাতড়ে কোনো কিছুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে না, নিজেকে আবিষ্কারের দিকে তো অবশ্যই নয়। কারণ সে জানতো যে সে-ই হচ্ছে সবার নয়নমণি, সবাই তার পেছনে ঘোরে, তাকে চায়। টম স্টার্ক। অল আমেরিকান হিরো। নিখুঁত। তার পরনে ঢোলা আলখাল্লা নেই, তার কোন অঙ্গ বেঢপ নয়। সে মুষ্টিযোদ্ধার ভঙ্গি নিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতো, পায়ে দু'রঙা রাবার সোলের জুতো, গায়ে ধূসর ডোরা-কাটা স্পোর্ট কোট, ঘন বুনোটের সাদা শার্টের উপরের বোতাম খোলা, তামাটে দেখতে গলার নিচে হাতের মুঠির মতো বিরাট একটা গিঁট দিয়ে লাল রঙের উলের টাই হাল্কা করে বাঁধা, একটু একপাশে সরে গেছে যদিও, তার প্রত্যয়ভরা চোখ ধীরে ধীরে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মসৃণ শক্তিশালী বাদামী চোয়াল হাল্কাভাবে চুইংগাম চুষছে। খেলোয়াড়রা কিভাবে গাম চোষে তাতো আপনি জানেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে যে হিরো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা ছিলো না। সে পথ হাতড়ে ফিরছিলো না। টম স্টার্ক কী তা সে ভালো করেই জানতো।

সে যে সত্যিকার ভালো খেলোয়াড় সেটা সে জানতো। কাজেই সব নিয়ম-কানুন সে কঠোরভাবে মানতো না। এমন কি, অনুশীলনের নিয়ম-কানুনগুলিও না। বাবাকে তো সে বলেই দিয়েছিলো যে, সে টিমকে জিতিয়ে দিচ্ছে, কাজেই ওরা অস্থির হচ্ছে কেন? কিন্তু একবার সে বিপদে পড়ে গেলো। থ্যাড মেলন ছিলো দলের বিকল্প ট্যাকল্, আর গাপ নিয়মিত গার্ড। এক শনিবারের রাতে খেলার পর টম থ্যাড মেলন আর গাপ লসন কাছেই এক গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে মদ আর মেয়ে নিয়ে প্রচণ্ড হৈ-হুল্লোড় করে। ব্যাপারটা হয়তো আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে ভালোভাবেই চুকে যেতো যদি না কিছু গেঁয়ো যুবকদের সঙ্গে, যারা ফুটবল সম্পর্কে বিশেষ কিছু খবর রাখতো না কিংবা তাকে বিশেষ দাম দিতো না, টমদের সংঘর্ষ বাঁধতো। ওই যুবকরা তাদের মেয়েদের নিয়ে এই রকম বেলেল্লাপনায় চটে যায়। ওরা গাপ লসনকে বেদম প্রহার করে, তাকে হাসপাতালে যেতে হয়, কয়েক সপ্তাহ সে খেলার মাঠে আসতে পারে নি। টম আর থ্যাড কয়েকটা কিল-ঘুসি খায়, তারপরই জনতা মারামারি থামিয়ে ফেলে। কিন্তু শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যাপারটা কতকটা নাটকীয়ভাবেই কোচ বিলি মার্টিনের কাঁধে এসে পড়ে। কাগজে লেখালেখি হয়। প্রশিক্ষক তখন টম

স্টার্ক আর থ্যাড মেলনকে সাসপেন্ড করলো। এর ফলে পরের শনিবার জর্জিয়ার সঙ্গে খেলার হারজিতের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, কারণ সে বছর জর্জিয়া ছিলো বেশ ভালো আর টম ছিলো স্থানীয় দলের অন্যতম ভরসা।

কর্তা ঘটনাটা যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেন। হাফ-টাইমের সময় জর্জিয়া যখন সাত-শূন্যে এগিয়ে আছে তখনও তিনি ক্ষেপে যান নি, কোনোরকম চেঁচামেচি করেন নি। বাঁশি বাজতেই তিনি উঠে পড়ে আমাকে বললেন, চলো। আমি বুঝলাম যে তিনি খেলোয়াড়দের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম, তারপর দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগলাম। ওদিকে মাঠে তখন ব্যান্ডের বাজনা বেজে চলেছে। ব্যান্ড সূর্যালোককে সঙ্গে নিয়ে (কারণ এখন অপরাহ্নের প্রথম দিকের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিলো, মৌসুম ঠাণ্ডা হয়ে আসছে) মাঠ প্রদক্ষিণ করবে, পিতলের বাদ্যযন্ত্র আর ব্যান্ড-নেতার দণ্ডের উপর সূর্যের আলো ঝকঝক করবে, ব্যান্ডে বেজে উঠবে স্টেটের জন্য গভীর ভালোবাসার বাণী, আমরা কেমন করে তার জন্য লড়াই লড়াই লড়াই করবো, কেমন করে তার জন্য প্রাণ দেবো, সেই তো আমাদের বীর নায়ককুলের জননী ইত্যাদি। আর নায়ককুল তখন ক্লান্ত, তাদের দেহ ঘামে-ময়লায় মাখামাখি, তারা গা এলিয়ে শুয়ে-বসে আছে, হাত-পা মালিশ করে তাদের চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা চলছে।

প্রথমে কর্তা কোনো কথা বললেন না। তিনি ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, আস্তে আস্তে বিশ্রামরত মূর্তিগুলির দিকে ঘুরে ঘুরে তাকালেন। পরিস্থিতিটা আপনাকে মর্গের কথা মনে করিয়ে দিতে পারতো। একটা পিন পড়লেও তার শব্দ শুনতে পেতেন আপনি। সব নিস্তব্ধ, শুধু একবার কেউ যখন সন্তর্পণে তার পা সরাচ্ছিলো তখন তার জুতোর তলার লোহার পাত কংক্রিটের মেঝেতে ঘষটে গিয়ে একটা শব্দ হলো, দু'একবার কেউ তার শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করার সময় একটু শব্দ উঠলো, ব্যস, ওই পর্যন্তই। কোচ বিলি মার্টিন ঘরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলো, গম্ভীর বিমর্ষ চেহারা, মাথায় চেপে বসানো টুপি চোখ পর্যন্ত টেনে নামানো, মুখে না-ধরানো চুরুট। কর্তা একে একে সবার উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন, আর ওদিকে ব্যান্ড প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে, প্রাক্তন ছাত্ররা উঠে দাঁড়িয়ে শরতের সুন্দর আলোয় বুকের উপর টুপি চেপে ধরেছে, তাদের নিজেদেরকে মনে হচ্ছিলো উন্নত এবং নিষ্কলুষ।

কর্তার চোখ জিমি হার্ডউইচের উপর এসে স্থির হলো। জিমি ছিলো দ্বিতীয় সারির প্রান্তিক খেলোয়াড়। একটা বেঞ্চির উপর বসেছিলো সে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ওকে নামানো হয়, কারণ বাঁ প্রান্তের নিয়মিত খেলোয়াড়কে দেখে মনে হচ্ছিলো সে

যেন কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত কোনো বয়স্কা অভিজাত মহিলা। এবার জিমির সামনে বিশাল সুযোগের দরজা খুলে যেতে পারে। সুযোগ এসেওছিলো। একটা পাস্। কিন্তু জিমি বলটা ধরে রাখতে পারে নি। কাজেই এখন কর্তার চোখ স্থির হয়ে আটকে থাকলো জিমির উপর, আর জিমি তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কর্তার দিকে। তারপর, কর্তার চোখ যখন সরে গেলো না তখন জিমি চেঁচিয়ে উঠলো, চুপ করে আছেন কেন? বলে ফেলুন কথাটা। বলুন।

কিন্তু কর্তা কথাটা বললেন না। তিনি কোনো কথাই বললেন না। তিনি শুধু ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে জিমির সামনে দাঁড়ালেন। তারপর খুব ধীরেসুস্থে হাত বাড়িয়ে জিমির কাঁধের উপর তাঁর নিজের ডান হাতটি রাখলেন। তিনি তার কাঁধ চাপড়ে দিলেন না, সেখানে শুধু তাঁর হাতটি ধরে রাখলেন, যেভাবে কেউ কেউ উত্তেজিত ঘোড়াকে শান্ত করে ঠিক সেইভাবে।

এখন তাঁর দৃষ্টি আর জিমির উপর নেই। অন্য সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, শোনো ছেলেরা, আমি এখানে শুধু একটা কথা বলার জন্য এসেছি, আমি জানি যে তোমরা সবাই তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছো।

তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তখনো জিমির কাঁধের উপর তাঁর হাত রাখা, তাঁর কথাটা ওদের মর্মে গিয়ে পৌঁছুবার জন্য একটু অপেক্ষা করলেন। ততক্ষণে জিমির চোখে অশ্রু উথলে উঠেছে।

তারপর কর্তা বললেন, আমি জানি তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। কারণ আমি জানি তোমাদের মধ্যে আসল পদার্থ আছে।

আবার একটু অপেক্ষা করলেন। তারপর জিমির কাঁধের উপর থেকে তাঁর হাত উঠিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে পৌঁছে একটু থামলেন, তারপর আবার গোটা ঘরের উপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, তোমাদের আমি বলতে চাই যে আমি তোমাদের ভুলবো না। এর পর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

জিমি তখন হু হু করে কাঁদতে শুরু করেছে।

আমি কর্তার পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এলাম। সেখানে তখন ব্যান্ডে উচ্চগ্রামের একটা মার্চ সঙ্গীত বেজে চলেছে।

বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই আমাদের ছেলেরা মরীয়া হয়ে খেলতে আরম্ভ করে। তৃতীয় কোয়ার্টারের গোড়ার দিকে ওরা একটা টাচ্ ডাউন করলো, তারপর কিক্ করে পয়েন্ট পেলো। কর্তার মন-মেজাজ এখন বেশ ভালো। চতুর্থ কোয়ার্টারে জর্জিয়া বিপদ এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলো, কিন্তু সেখানে বাধা

পেয়ে তাদের থামতে হলো, তারপর কিক্ করে একটা ফিল্ড গোল পেলো। ওই অবস্থাতেই খেলা দশ-সাতে শেষ হলো।

কিন্তু এখনো চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছুবার সম্ভাবনা আমাদের আছে। যদি মরশুমের বাকী সবগুলি খেলায় জিততে পারি। পরের শনিবার টম স্টার্ক আবার মাঠে ফিরে এলো। কর্তা বিলি মার্টিনকে চাপ দিয়েছিলেন, তাই। সেজন্যই তাকে আবার মাঠে দেখা যায়। আমি জানি, কারণ কর্তা নিজে আমাকে বলেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মার্টিন কিভাবে নেয় ব্যাপারটা?

কর্তা জবাব দিয়েছিলেন, ও নেয় নি। আমি ওর গলার মধ্যে ঠুসে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। এর উত্তরে আমি কিছু বলি নি। আমার মুখের কোনো ভাবান্তর হয়েছিলো কিনা তাও আমি জানি না। কিন্তু কর্তা তাঁর মাথা আমার মুখের কাছে সজোরে ঠেলে এনে বলেছিলেন, দ্যাখো, আমি ওদের সুযোগটা এভাবে হারাতে দিতে পারি না। চূড়ান্ত পর্বে এখনো আমাদের একটা সম্ভাবনা আছে, আর হারামজাদারা সে সুযোগ ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে!

এখনও আমি নির্বাক রইলাম।

কর্তা বললেন, কথাটা টমের নয়। কথাটা চ্যাম্পিয়নশিপের। না, টম নয়। শুধু টমের ব্যাপার হলে আমি একটি কথাও বলতাম না। আর, ও যদি আরেকবার ট্রেনিং-এর নিয়ম ভাঙে তা হলে আমি ওর মাথা মেঝেতে ঠুকে দেবো। আমি নিজের হাতে ওকে ঠ্যাঙাবো। এই তোমাকে বলে রাখলাম আমি।

এবার আমি বললাম, ও বেশ জবরদস্ত যুবক কিন্তু।

কর্তা আবার শপথ করে বললেন যে তিনি তাঁর কথামতো কাজ করবেন। অতএব পরের শনিবার টম স্টার্ককে আবার মাঠে দেখা গেলো। সে বল নিয়ে ছুটলো, সে যেন নিপুণ ব্যালেরিনা নর্তকী আর শক্তিশালী যন্ত্রযানের একটা মিশ্রণ, আর সারা মাঠ আনন্দ-উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, টম, টম, টম, কারণ টম হলো তাদের নয়নমণি, আর স্কোর দাঁড়ালো বিশ ঃ শূন্য। রাজ্যদল আবার চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় ফিরে এসেছে। আর দুটো খেলা মাত্র বাকী। টেক্-এর সঙ্গে তো সহজ ব্যাপার, তারপর থ্যাংকসগিভিং-এর খেলা।

টেক্-এর সঙ্গে কোনো অসুবিধা হলো না। তৃতীয় কোয়ার্টারে রাজ্যদল যখন এগিয়ে, কোচ তখন টমকে মাঠে নামায়, তাকে একটু খেলাবার জন্য। টম দর্শকদের কিছু কেরামতি দেখালো। ঘরোয়া, সুন্দর, তাচ্ছিল্য মেশানো। যেন এ কিছুই না। সে এমনভাবে খেললো যেন ব্যাপারটা কতো সহজ। কিন্তু একবার সাত গজের জন্য তীব্র বেগে তীরের মতো বেরিয়ে যাবার পর প্রতিপক্ষের সেকেন্ডারী তাকে বাধা

দিলো, তাকে সজোরে মাটিতে ফেলে চেপে ধরলো, আর টম এবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো না।

কর্তা বললেন, একটু ক্লান্ত হয়ে গেছে ছেলেটা। কর্তার সঙ্গে গভর্নরের বক্সে বসা টাইনি ডাফি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু এইটুকুতে টমকে দমানো যাবে না।

কর্তা সায় দিয়ে বললেন, অবশ্যই না।

কিন্তু টম উঠলো না। তাকে ওরা ধরাধরি করে মাঠের বাইরে খেলোয়াড়দের ঘরের দিকে নিয়ে গেলো।

কর্তা বললেন, সত্যিই ক্লান্ত হয়ে গেছে ছেলেটা, এমনভাবে বললেন যেন তিনি আবহাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করছেন। তারপর বললেন, দ্যাখো, এ্যাক্সটনকে নামাচ্ছে। এ্যাক্সটন কিন্তু বেশ ভালো। আরেকটা সীজন খেলতে দাও, তারপর দেখবে।

ডাফি বললো, এ্যাক্সটন ভালো কিন্তু সে টম স্টার্ক নয়। আমার খেলোয়াড় হলো ওই টম স্টার্ক।

কর্তা খেলায় মন দিয়ে বললেন, এবার ওরা ঠিক পাস্ দেবে। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম যে তিনি সারাক্ষণ আড়চোখে মাঠ থেকে খেলোয়াড়দের ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়া শোভাযাত্রাটি দেখছিলেন।

লাউডস্পীকারের ঘোষণা ভেসে এলো, স্টার্কের পরিবর্তে এ্যাক্সটন। তারপর চীয়ারলীডার স্টার্কের উদ্দেশে অভিনন্দন ধ্বনি তুললো, সে আর তার সহকারীরা নাচলো, লাফালো, উল্লসিত চিৎকার করলো।

খেলা আবার শুরু হলো। কর্তা যেমন বলেছিলেন ঠিক তাই, একটা পাস্ দিলো। নয় গজ, তারপর প্রথম ডাউন। লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেলো, টেক্-এর বিরুদ্ধে চব্বিশ গজ লাইনে প্রথম ডাউন। তারপরই ঘোষণা হলো, টম স্টার্ক যে আগের খেলায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলো, তার জ্ঞান ফিরে আসার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

ডাফি বললো, সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলো, এ্যাঁ? তারপর কর্তার পিঠ চাপড়ে (জনসমক্ষে সে কর্তার পিঠ চাপড়ে দিতে ভালোবাসতো, সবাইকে দেখাতে চাইতো যে সে আর কর্তা কি রকম বন্ধু) ডাফি বললো, না, না, আমাদের টমকে সংজ্ঞাহীন করা ওদের কম্মো নয়, কি বলেন?

কর্তার মুখ মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে আসে, কিন্তু তিনি কোনো কথা বললেন না।

টাইনি বললো, এখুনি ও উঠে দাঁড়াবে। ওই ছেলে খুব শক্ত। ওকে ঘায়েল করার

সাধ্য ওদের নেই।

কর্তা সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ও খুব শক্ত। তারপর তিনি আবার গভীর মনোযোগ সহকারে খেলা দেখতে লাগলেন।

খেলায় কোনো উত্তেজনা ছিলো না। কিন্তু খেলা যতো বেশি আকর্ষণহীন হতে থাকলো কর্তা যেন ততো বেশি মনোযোগ দিয়ে তা দেখতে লাগলেন, মনে হলো তিনি যেন তাঁর খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেবার জন্য ততোই বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাজ্যদল কসাই-র মেশিনে হ্যামবার্গার বানানোর মত্যে নিয়মিত দ্রুততার সঙ্গে টাচ্‌ডাউনের পর টাচ্‌ডাউন করে গেলো। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে জল যেমন নিচে গড়িয়ে পড়বেই তেমনি রাজ্যদল যে জিতবেই তা সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো, তবু ওরা তিন গজ এগুলেই কর্তা উল্লাসধ্বনি করে উঠছিলেন। এই মাত্র ওরা একটা পাস্‌ পেয়ে ছয় গজ লাইনে পৌঁছুতেই তিনি সানন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন, আর ঠিক তখনই একটি লোক আমাদের বক্সের সামনে এসে দাঁড়ালো। মাথা থেকে টুপি সরিয়ে সে বললো, গভর্ণর স্টার্ক — গভর্ণর স্টার্ক —

কি?

ডাক্তার — খেলোয়াড়দের ঘরে ডাক্তার বলছিলেন — আপনি কি এক মিনিটের জন্য ওখানে যেতে পারবেন?

কর্তা বললেন, ধন্যবাদ, যাবো। এখুনি যাবো। ছেলেরা এই টাচ্‌ডাউনটা করে নিক, তারপরই যাবো। তিনি আবার খেলায় মনোনিবেশ করলেন।

টাইনি বললো, আমি জানি কিছু হয় নি। আমাদের টম অত সহজ পাত্র নয়। সে হলো —

কর্তা ধমক দিলেন ওকে, আঃ, চুপ করো। দেখছো না আমি খেলা দেখছি? তারপর টাচ্‌ডাউনটা হয়ে যাবার পর কর্তা আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, খেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো, এবার যেতে হয়। তুমি সুগার-বয়কে বলো তোমাকে দপ্তরে পৌঁছে দেবে। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করো। সুইনটনকে যদি পাও তাহলে ডেকে নিও। তোমার আর ওর সঙ্গে আমার কাজ আছে। আমি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবো। হয়তো তোমাদের আগেই পৌঁছে যাবো।

কর্তা রেলিং টপকে সবুজ মাঠে লাফ দিয়ে নামলেন, তারপর খেলোয়াড়দের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু যাবার পথে বেঞ্চে বসা ছেলেদের সঙ্গে খানিকটা সহজ রসিকতা করে নিলেন। তারপর তার ভারী, সামনের দিকে ঈষৎ ঠেলে দেয়া, মাথার উপর টুপিটা চেপে বসিয়ে তিনি খেলোয়াড়দের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা বক্সে আর যারা বসেছিলাম তারা শেষ বাঁশির জন্য অপেক্ষা করলাম

না। ভীড় শুরু হবার আগেই আমরা উঠে পড়ে শহর অভিমুখে রওনা হলাম। ডাফি এ্যাথলেটিক ক্লাবে নেমে গেলো, একটু বীয়ার খাবে, বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে শরীরটা ঠিক রাখার খানিক চেষ্টা করবে। আমি চললাম ক্যাপিটল ভবনের দিকে।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলবার আগেই আমি টের পেলাম যে বড়ো রিসেপশান কক্ষে আলো নেই। কাজ শেষ করে টাইপিস্ট আর স্টেনো মেয়েরা বাড়ি চলে গেছে, শনিবার অপরাহ্নের আনন্দ-উল্লাস করবে, ছবি দেখতে যাবে, তাস খেলবে, ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে বাইরে বেরুবে, শস্তা জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয় বসে গরম খাবার খাবে, নাচের আসরে নীল আলোয় স্যাক্সোফোনের ধীর লয়ের সুরেলা বাজনার তালে তালে নাচবে, অনর্গল কথা বলবে, খিল খিল করে হাসবে, ফিসফিস করে আলাপ করবে, চমকে উঠে নিঃশ্বাস ফেলবে, চমৎকার সময় কাটানো বলতে যা বোঝায় সেইরকম সব কিছু করবে ওরা।

এক মুহূর্তের জন্য বিশাল অন্ধকার ঘরে, তার ব্যতিক্রমী নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে, ওই মেয়েরা কি বিশেষ বিশেষ আনন্দ উপভোগ করবে, কোন্ বিশেষ বিশেষ জায়গায় সেই আনন্দ তারা উপভোগ করবে (রেস্তোরাঁয়, নাচঘরে, চলচ্চিত্র, প্রেক্ষাগৃহে,নির্জন স্থানে দাঁড় করানো মোটরগাড়িতে, অন্ধকার গলিপথে), কারা তাদের আনন্দের সঙ্গী হবে (হামবড়া উদ্ধত কলেজ-যুবক, কোনো দোকানের কেরাণী যে ব্যাংকে নয়শো ডলার জমিয়েছে, আশা করছে সামনের বছর নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারবে, তখন বিয়ে করে সংসার পাতবে আর থিতু হয়ে বসবে, মাঝবয়েসী কোনো স্ফূর্তিবাজ লোক, মাথার বিরল কেশ চেপে আঁচড়ানো, প্রশস্ত চাঁদিতে বড়ো বড়ো শিরা দেখা যায়, মুখে শস্তা মদ আর পেপারমিন্ট চুইংগামের গন্ধ) এইসব ভাবতে ভাবতে আমার মনের এক প্রান্তে একটা তাচ্ছিল্যমাখা বিদ্রূপের অনুভূতি জেগে উঠলো।

কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই অনুভূতিটা বদলে গেলো। তবু বিদ্রূপের ভাবটা মনের কিনারে লেগে রইলো, ভেজা কাগজের কিনারায় লেগে থাকা নিভু নিভু অগ্নিশিখার মতো, তবে সে তাচ্ছিল্যভরা বিদ্রূপের পাত্র এখন আমি নিজে। আমি আমার নিজের কাছে জানতে চাইলাম, কোন অধিকারে আমি ওদের বিদ্রূপ করছি? ওই রকম আনন্দ-উল্লাসভরা সময় কি আমিও কাটাই নি? আজ রাতে যদি ওই জাতীয় আনন্দ আমি উপভোগ না করি তার কারণ এই যে আমি সে অবস্থা অতিক্রম করে একটা উচ্চতর আনন্দানুভূতির জগতে প্রবেশ করেছি। কিংবা আমার জীবন থেকে হয়তো কিছু একটা হারিয়ে গেছে। নেই, সেজন্যই পুণ্যবান। বিবমিষা

দেখা দেয়, তাই সুরাপান বন্ধ। সুরাসক্তি দূর করার চিকিৎসার সময় ওরা আপনাকে মদের মধ্যে এমন কিছু দেয় যাতে আপনার বমি পায়, তারপর যথেষ্ট বমি করার পর মদ আপনার কাছে বিস্বাদ লাগে। তখন আপনার অবস্থা হয় পাভলভের কুকুরের মতো, ঘণ্টা শুনলেই তার জিভ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। শুধু আপনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন রকম। মদের গন্ধ নাকে গেলেই, এমন কি তার কথা ভাবলেই, আপনার পেটের ভেতরের সব কিছু উঠে আসতে চায়। কেউ হয়তো আমার আনন্দ-উল্লাসের সময়গুলির মধ্যে ওই রকম একটা পদার্থ মিশিয়ে দিয়েছিলো, তাই আমি আর কোনো আনন্দ-উল্লাস উপভোগ করতে চাই না। অন্ততঃ এখন না। তবে আমার মনের প্রান্তে যে তাচ্ছিল্যভরা বিদ্রূপের ভাব জেগে উঠেছিলো সেটা এখন ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারি। আনন্দ-উল্লাস যে আমার পেটে সয় না সেটা নিয়ে গর্ববোধ করার কিছু নেই।

অতএব আমি এবার আমার অফিস-ঘরে যাবো, অন্ধকারে দু'এক মিনিট বসে থাকবো, তারপর আলো জ্বালিয়ে ট্যাক্স সংক্রান্ত কাগজপত্র বার করে কাজে মগ্ন হয়ে পড়বো। কথাটা ভাবতেই আমি আমার মনের মধ্যে একটা পরিচ্ছন্নতা ও তৃপ্তির বোধ অনুভব করলাম।

কিন্তু ট্যাক্স বিলের কথা ভাবতে ভাবতে আমি যখন বড়ো ঘরটার মধ্য দিয়ে আমার নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম কিংবা মনে হলো যেন শুনলাম, ওদিকের একটা অফিস-ঘর থেকে একটা শব্দ যেন এসে আমার কানে লাগলো। দরজার নিচ দিয়ে কিন্তু কোনো আলো দেখা গেলো না। একটা ঘর থেকেও না। তারপরই আমি আবার শব্দটা শুনলাম। সত্যিকার শব্দ। কোনো সন্দেহ নেই। এই সময় তো কারো ওখানে থাকার কথা নয়। অন্ধকার ঘরে তো নয়ই। আমি পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে আমার ঘর থেকে ওই ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুললাম। খুলেই স্যাডি বার্ককে দেখতে পেলাম। ও টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে। আমি নিশ্চয়ই তার চেয়ার টানার শব্দ শুনেছিলাম। টেবিলের উপর দু'বাহু রাখা, বাঁকানো, ওকে দেখেই আমি বুঝলাম যে সে হাতের উপর মাথা রেখে নিচু হয়েছিলো, এইমাত্র মাথা তুলেছে। স্যাডি কাঁদছিলো না, কিন্তু শনিবারের সন্ধ্যায় সবাই যখন কোথাও না কোথাও আনন্দ-উল্লাস করছে তখন স্যাডি এই নির্জন অফিস-ঘরে টেবিলের উপর হাতে মাথা রেখে চুপ করে বসেছিলো।

আমি বললাম, হ্যালো স্যাডি।

স্যাডি একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। জানালার শার্সী বন্ধ ছিলো,

তার ফাঁক দিয়ে যে সামান্য আলো ঘরে ঢুকছিলো তা শুধু তার পিঠের উপর পড়ছিলো, তাই আমি ওর মুখের ভাব লক্ষ করতে পারলাম না। শুধু তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠতে দেখলাম। স্যাডি জিজ্ঞাসা করলো, কি চাও তুমি এখানে?

কিচ্ছু না।

তোমার এখানে অপেক্ষা করার দরকার নেই।

আমি এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে ওর দিকে তাকালাম। স্যাডি বললো, আমি কি বলেছি শুনেছো?

শুনেছি।

তা আরেকবার শুনতে পারো। তোমার এখানে অপেক্ষা করার দরকার নেই।

আমি উঠবার কোনো উপক্রম না করে জবাব দিলাম, এখানে চুপচাপ বসে বিশ্রাম করতে বেশ ভালো লাগছে আমার, কারণ, স্যাডি, আমাদের মধ্যে অনেক মিল। তোমার আর আমার মধ্যে।

আশা করি কথাটা তুমি প্রশংসাসূচকভাবে বলছো না।

না, এ একটা নিছক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ।

তা এটা তোমাকে আইনস্টাইন বানাচ্ছে না।

তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে তোমার আর আমার মধ্যে তেমন বেশি কিছু মিল নেই, নাকি আমাদের দুজনের মধ্যে মিল এতোই স্পষ্ট যে সেটা আবিষ্কারের জন্য কোনো আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের দরকার হয় না?

স্যাডি ঝাঁঝালো গলায় বললো, আমি যা বলতে চাইছি তা এই যে এতে আমার এক কানাকড়িও যায় আসে না। আর তুমি এখানে বসে থাকো কিংবা না থাকো তাতেও আমার কিচ্ছু যায় আসে না।

আমি চেয়ারে বসে ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে বললাম, আজ শনিবারের রাত। স্ফূর্তি করতে শহরে যাচ্ছো না?

জাহান্নামে যাক তোমাদের এই শহর!

স্যাডি টেবিল হাতড়ে সিগারেট বার করে ধরালো। ম্যাচের আগুনে তার মুখ ছায়ার ভেতর থেকে আলোকিত হয়ে উঠলো। দ্রুত হাত নেড়ে সে দেশলাইর কাঠিটা নিভিয়ে ফেললো, তারপর তার পুরু বঙ্কিম নিচের ঠোঁটের উপর দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লো। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আর তুমিও জাহান্নামে যাও। তার ক্রুদ্ধ অভিশাপভরা দৃষ্টি সমস্ত ঘরটার উপর দিয়ে ঘুরে এলো, যেন সেখানে অনেক মানুষ, অনেক মুখ, তারপর বুকের মধ্য থেকে আরো একরাশ ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে বার করে বললো, ওদের সবাই জাহান্নামে যাক। এই সমস্ত জায়গাটা জাহান্নামে যাক!

ঘর ঘুরে ওর চোখ আমার মুখের উপর স্থির হলো। আমাকে লক্ষ্য করে স্যাডি বললো, আমি চলে যাবো এখান থেকে।

আমি প্রশ্ন করলাম, এখান থেকে?

স্যাডি তার হাত প্রসারিত করে ঘুরিয়ে আনলো, দ্রুতগতির জন্য ওর সিগারেটের মুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো, তারপর বললো, হ্যাঁ, এই জায়গা থেকে, এই শহর থেকে।

যেও না, লেগে থাকো। প্রচুর টাকা করতে পারবে।

টাকা করতে চাইলে অনেক আগেই প্রচুর টাকা করতে পারতাম।

আমি ভাবলাম যে সে কথা সত্য। কিন্তু স্যাডি তা করে নি। অন্ততঃ আমার জানামতে।

হাতের সিগারেট টেবিলের উপরে রাখা ছাইদানিতে পিষে নিভিয়ে সে বললো, হ্যাঁ, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো সে, যেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে, আমি কি বলি দেখছে।

আমি কোনো কথা বললাম না, কিন্তু আমার মাথা নাড়লাম।

তুমি ভাবছো যে আমি যাবো না।

হ্যাঁ, তাই।

ঠিক আছে, দেখে নিও তুমি।

আমি আবার মাথা নেড়ে বললাম, না, তুমি যাবে না। এসব কাজে তোমার একটা প্রতিভা আছে, মাছের যেমন আছে সাঁতার কাটার ক্ষেত্রে। মাছ জলে সাঁতার কাটবে না, এ তো আশা করা যায় না।

সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বললো না। আলো-আঁধারের মধ্যে আমরা মিনিট দুই চুপচাপ বসে থাকলাম, তারপর স্যাডি ধমকে উঠলো, আমার দিকে ওরকম চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থেকো না। তাছাড়া, তোমাকে আমি এখান থেকে চলে যেতে বলি নি? এখান থেকে যাচ্ছো না কেন তুমি? বাড়ি যাচ্ছো না কেন?

আমি আবেগহীন গলায় বললাম, কর্তার জন্য অপেক্ষা করছি। তারপর মনে পড়তেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি শোনো নি?

কি?

টম স্টার্ক।

কারো উচিত মেরে ওর হাড় গুঁড়ো করে দেয়া।

দিয়েছে একজন।

অনেক আগেই দেয়া উচিত ছিলো।

তা আজ বিকালে বেশ ভালো করেই ওরা সে কাজটা করেছে। শেষ খবর যখন পাই তখনো সে অচৈতন্য। ওরা কর্তাকে খেলোয়াড়দের ঘরে ডেকে নিয়ে যায়।

অবস্থা খারাপ? স্যাডি সামনে ঝুঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলো, ওর অবস্থা কি খারাপ?

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো, এর বেশি কিছু আমি জানি না। বোধহয় হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

অবস্থা কতখানি খারাপ তা ওরা বলে নি? কর্তাকে বলে নি? সামনের দিকে ঝুঁকে তীব্র স্বরে প্রশ্ন করলো স্যাডি।

তুমিই তো বললে যে কারো উচিত মেরে ওর হাড় গুঁড়ো করে দেয়া, আর কেউ যখন কাজটা করছে তখন তুমি এমন করছো যেন ওকে ভীষণ ভালোবাসো।

বাঃ, হাসি পাচ্ছে তোমার কথা শুনে।

আমি হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, কর্তার দেরি হচ্ছে। বোধহয় হাসপাতালে গেছেন। অবস্থা মনে হয় ভালো না।

স্যাডি কোনো কথা বললো না, টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকলো, ঠোঁট কামড়ালো, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সোজা র‍্যাকের কাছে গিয়ে কোট পরলো, মাথায় টুপি চাপালো, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। দরজার কাছে গিয়ে সামান্য ইতস্ততঃ করে বললো, আমি যাচ্ছি। দরজায় তালা দেবো। তুমি তোমার নিজের ঘরে গিয়ে বসছো না কেন?

আমি উঠে রিসেপশান হলে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্যাডি সশব্দে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে, আমাকে লক্ষ করে কিছু না বলে, দ্রুতপায়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেলো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের মার্বেলের বারান্দায় তার জুতোর ক্রমক্ষীয়মাণ টক্ টক্ শব্দ শুনলাম।

শব্দটা সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেলে আমি আমার নিজের অফিস-ঘরে এসে জানালার কাছে বসে বাইরের দিকে তাকালাম। তখন কুয়াশা নদীর দিক থেকে বাড়িঘরের ছাদের দিকে একটু একটু করে ভেসে আসছে।

কিন্তু টেলিফোনটা যখন এলো তখন আমার দৃষ্টি বাইরের কুয়াশায় ঢাকা, রোমান্টিক, আলো-আঁধারে ঘেরা শহরের দিকে ছিলো না। আমি তখন সবুজ ঢাকনা দেয়া আলোয় আমার পরিচ্ছন্ন, তৃপ্তিদায়ক সুন্দর ট্যাক্স বিষয়ক কাগজপত্র দেখছিলাম। স্যাডির ফোন। বললো যে সে এখন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে। টম স্টার্ক এখনও সংজ্ঞাহীন। কর্তাও হাসপাতালে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে স্যাডির দেখা হয় নি।

সে শুনেছে যে কর্তা আমার খোঁজ করেছেন।

তাহলে স্যাডি ওখানেই গেছে। জীবাণুমুক্ত ছায়া ছায়া বারান্দায় সন্তর্পণে অপেক্ষা করছে।

আমি আমার পরিচ্ছন্ন, তৃপ্তিদায়ক ট্যাক্স বিষয়ক কাগজপত্র ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। পথের ধারের একটা দোকানে কফি আর হ্যামবার্গার স্যান্ডউইচ খেয়ে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম যে কর্তা একাকী ওয়েটিং রুমে বসে আছেন। মুখ রুক্ষ কঠোর। টম কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে এখন এক্স-রে ঘরে আছে, ডাক্তাররা ঠিক ধরতে পারছেন না। ডঃ স্ট্যান্টন দেখছেন, বাল্টিমোর থেকে বিশেষ বিমানে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শের জন্য আসছেন।

এরপর কর্তা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যাও, লুসিকে নিয়ে এসো। ওর এখানে থাকা দরকার। গ্রামের বাড়িতে ও বোধহয় এখনো কাগজে খবরটা দেখে নি।

আমি বললাম যে আমি যাচ্ছি। আমি দরজার দিকে অগ্রসর হতেই কর্তা বললেন, জ্যাক, ওর কাছে খবরটা আস্তে আস্তে ভেঙ্গো। একটু তৈরি করে নিও আগে।

তাই করবো, বলে আমি বিদায় নিলাম। লুসিকে যদি এই রকম তৈরি করে নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে অবস্থা বেশ খারাপ। মহাসড়ক ধরে এগিয়ে চললাম, শনিবারের রাতে শহরের দিকে আসা উল্টো দিকের গাড়িগুলির আলো এসে পড়তে লাগলো আমার উপর। গাড়ি চালাতে চালাতে আমি ভাবলাম, লুসির কাছে আস্তে আস্তে এই খবর ভাঙার কাজটা খুব আনন্দদায়ক হবে না। পরে, সময়ের সঙ্গে বেমানান শানবাঁধানো পথ দিয়ে স্বল্পালোকিত সাদা বাড়িটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, আবারও আমার সে কথা মনে হলো। আমি কাঠের আসবাবপত্র, লাল ঝালর দেয়া সোফা, স্টেরিওস্কোপের কার্ড প্রভৃতির মাঝখানে বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে খবরটা দেবার জন্য যখন লুসিকে তৈরি করছিলাম তখন আবার মনে হলো যে, না, কাজটা মোটেই আনন্দদায়ক নয়।

কিন্তু লুসি ভেঙে না পড়েই খবরটা নিলো। বোঝা গেলো যে ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেয়েছে, কিন্তু সে ভেঙে পড়ে নি। শুধু অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, ওহ্, ভগবান, ওহ্ ভগবান! তারপর কঠিন বিবর্ণ মুখ তুলে বললো, এক মিনিট দাঁড়াও, আমার কোটটা নিয়ে নিই।

আমার গাড়িতে উঠে আবার শহরের দিকে চললাম। কোনো কথা হলো না আমাদের মধ্যে। একবার শুধু ওকে আবার বলতে শুনলাম, ওহ্ ভগবান, কিন্তু আমাকে উদ্দেশ্য করে সে ওকথা উচ্চারণ করে নি। আমি অনুমান করলাম যে ও

বোধহয় প্রার্থনা করছে। অনেককাল আগে সে একটা ছোট ব্যাপ্টিস্ট কলেজে পড়াশোনা করেছিলো, প্রার্থনার উপরে ওরা বেশ গুরুত্ব দিতো, সম্ভবতঃ সেই অভ্যাস এখনো টিকে আছে।

ওয়েটিং রুমে বসে থাকা কর্তার কাছে যখন তাকে নিয়ে গেলাম তখনও ব্যাপারটা আনন্দদায়ক হলো না। কর্তা একটা লম্বা পিঠের, ফুলের নক্সা করা কাপড়ে ঢাকা, পুরু গদীওয়ালা চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি তাঁর গম্ভীর ভারী মুখ তুলে লুসির দিকে তাকালেন, যেন অপরিচিত কোনো মানুষকে দেখছেন। লুসি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো, তাঁর দিকে না অগ্রসর হয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখান থেকেই প্রশ্ন করলো, কেমন আছে ও?

তার প্রশ্ন শুনে কর্তার চোখে ধক্ করে আলো জ্বলে উঠলো। তিনি সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, এই যে শোনো, ও ঠিক আছে। ঠিক হয়ে যাবে ও। বুঝতে পারছো?

লুসি আবার বললো, কেমন আছে ও? কর্কশ কণ্ঠে কর্তা বললেন, বললাম তো, ঠিক হয়ে যাবে ও।

সে তো তুমি বলছো কিন্তু ডাক্তাররা কি বলছেন?

কর্তার মুখে মুহূর্তের মধ্যে একরাশ রক্ত জমে উঠলো, তাঁর দ্রুত গাঢ় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনলাম আমি। তীব্র কণ্ঠে কর্তা বললেন, এই তো তুমি চেয়েছিলে। তুমি বলেছিলে একথা। তুমি বলেছিলে যে সে বরং তোমার পায়ের কাছে মরে পড়ে থাকুক, সেও ভালো। কিন্তু — ওর দিকে দু'পা এগিয়ে গেলেন কর্তা — কিন্তু ও তোমাকে বোকা বানাবে। ও ঠিক আছে। শুনতে পাচ্ছো? ও ঠিক হয়ে যাবে।

শান্ত গলায় লুসি বললো, ঈশ্বর তাই করুন! কর্তা ফেটে পড়লেন, তাই করুন! তাই করুন! ও ঠিক আছে, এখনই ঠিক আছে। ওই ছেলে খুব শক্ত। ও ঠিক সামলে উঠবে।

লুসি কোনো জবাব দিলো না, তাঁর দিকে তাকালো শুধু। কর্তার মুখের রক্তোচ্ছ্বাস আস্তে আস্তে কমলো, তাঁর সমস্ত কাঠামোটা যেন শিথিল হয়ে মাংসের ভারে ঝুলে পড়লো। একটু পরে লুসি জিজ্ঞাসা করলো, আমি কি ওকে দেখতে পারি?

উত্তর দেবার আগে কর্তা পিছিয়ে গিয়ে ধপ করে তাঁর চেয়ারে বসলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওকে ৩০৫ নম্বর ঘরে নিয়ে যাও। সাদামাটা গলায় নির্দেশ দিলেন তিনি, যেন এখন আর এতে কোনো উৎসাহ নেই, যেন রেলের ওয়েটিংরুমে ট্রেনের সময় সম্পর্কে কোনো যাত্রীর নির্বোধ একটা প্রশ্নের উত্তর

দিচ্ছেন।

আমি ওকে ৩০৫ নম্বর ঘরে নিয়ে গেলাম। সাদা চাদরের তলায় দেহটা কাঠের তক্তার মতো পড়েছিলো, হাঁ করা মুখ দিয়ে ক্লিষ্ট নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। লুসি প্রথমে খাটের কাছে এগিয়ে গেলো না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ওদিকে তাকিয়ে থাকলো। আমার মনে হলো হয়তো পা ভেঙে পড়ে যাবে। আমি আমার বাহু দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, কিন্তু সে ঠিকই তার পায়ের উপর দাঁড়িয়েছিলো। তারপর সে খাটের কাছে গিয়ে ভীরু হাত বাড়িয়ে টমের শরীর স্পর্শ করলো। ঠিক গুলফের উপরে ডান পায়ে সে তার হাতটা রাখলো, সেখানে তার হাত স্থিরভাবে ধরে থাকলো, যেন ওই স্পর্শের মাধ্যমে সে ওখান থেকে কোনো শক্তি টেনে নিচ্ছে কিংবা সেখানে তা সঞ্চারিত করছে। মাথার কাছে দাঁড়ানো নার্স ঝুঁকে পড়ে রোগীর কপালের উপর জমে ওঠা স্বেদবিন্দু একটা কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছিলো। লুসি স্টার্ক খাটের মাথার দিকে দু'পা এগিয়ে এসে নার্সের দিকে তাকিয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিলো। নার্স কাপড়টা তার হাতে দিতে সে টমের কপাল আর ভ্রূর উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম মুছে দেবার কাজটা শেষ করলো। তারপর নার্সকে কাপড়টা ফিরিয়ে দিয়ে নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললো, থ্যাংক ইউ। নার্সের মাঝ-বয়েসী, সাধারণ, অনামা ভালো মুখে এক ধরনের পেশাদারী বোদ্ধার হাসি ফুটে উঠলো, যেন কোনো বাড়ির আরামপ্রদ আটপৌরে বসবার ঘরে হঠাৎ কেউ খুট করে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু লুসির দৃষ্টি ওই মুখের উপর ছিলো না। সে তাকিয়ে ছিলো নিচের দিকে, যার মুখের চোয়াল শিথিল, যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কষ্ট করে। সে মুখে কোনো আলো নেই। কিছুক্ষণ পর নার্স বললো যে ডক্টর স্ট্যান্টনের আসতে কিছুটা সময় লাগবে, তিনি এলেই সে আমাদের খবর দেবে। কাজেই আমরা সেই ঘরে ফিরে গেলাম যেখানে কর্তা ফুলের নক্সার মধ্যে তাঁর বিশাল ভারি মাথা নিয়ে চুপ করে বসেছিলেন।

লুসি ওই রকম নক্সা আঁকা কাপড়ে ঢাকা আরেকটা চেয়ারে এসে বসলো। অপেক্ষমাণ মানুষদের জন্য নির্ধারিত এই কক্ষটি ছিলো বেশ উজ্জ্বল, আরামদায়ক, জানালার তাকে ফুলের পট, চেয়ারগুলি সুন্দর নক্সা করা কাপড়ে মোড়া, দেয়ালে জল-রঙের চিত্রকর্ম স্বাভাবিক কাঠের ফ্রেমে ঝুলছে, চুল্লীতে কৃত্রিম কাঠ। লুসি চেয়ারে বসে আছে, কোলের উপর হাত, মাঝে মাঝে চোখ তুলে কর্তাকে দেখছে, আর আমি দেয়ালের পাশে আরেকটা চেয়ারে বসে ছবির পত্রিকা দেখছি। আমি দেখলাম যে আমাদের এই সুন্দর অন্তরঙ্গ পরিবেশের বাইরে পৃথিবী যেমন ছিলো

এখনো ঠিক তেমনি আছে।

সাড়ে এগারোটার দিকে এ্যাডাম এসে জানালো যে বাল্টিমোর থেকে পরামর্শের জন্য যে ডাক্তারের আসার কথা ছিলো কুয়াশার কারণে তার প্লেন আটকা পড়েছে, কুয়াশা সরে গেলেই তিনি চলে আসবেন।

কুয়াশা! কর্তা লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, কুয়াশা! ওকে এক্ষুণি ফোন করো — বলো যে কুয়াশা থাকুক বা না থাকুক, ও যেন এক্ষুণি আসে।

এ্যাডাম বললো, প্লেন এতো কুয়াশার মধ্যে উড়তে পারে না।

আঃ, ফোন করো ওকে। আমার ছেলে — ওইখানে আমার ছেলে — ওইখানে ছেলেটা —কর্তার গলা ধীরে ধীরে মিইয়ে এলো না, অকস্মাৎ থেমে গেলো, যেন বিশাল ভারি একটা জিনিস আর্ত আওয়াজ তুলে তার অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দিলো। কর্তা তাঁর ক্ষুব্ধ অভিযোগভরা দুটি চোখ এ্যাডামের দিকে তুলে ধরলেন।

এ্যাডাম ঠাণ্ডা গলায় বললো, যখন সম্ভব হবে তখনই ডঃ বার্নহাম আসবেন। এক মুহূর্ত পরে ক্ষোভ আর অভিযোগের মোকাবেলা করে বললো, গভর্নর, আমার মনে হয় আপনার একটু শোয়া দরকার, ভালো হবে তাতে। একটু বিশ্রাম নিন।

ভাঙা গলায় কর্তা বললেন, না, না।

এখানে এভাবে বসে থেকে আপনি কিছু করতে পারছেন না, অযথা শক্তি ক্ষয় করছেন। কারো কোনো উপকার করছেন না আপনি।

উপকার! উপকার! কর্তা তাঁর হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করলেন, যেন কিছু একটা ধরতে চেষ্টা করছেন কিন্তু বস্তুটি তাঁর হাতের মুঠো গলিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এবার এ্যাডাম শান্ত কণ্ঠে প্রায় কোমলভাবে বললো, আমি বলছি, যান, একটু শুয়ে থাকুন গিয়ে। এ্যাডাম এবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লুসির দিকে তাকালো।

লুসি মাথা নাড়লো, প্রায় ফিসফিস করে বললো, না, ডাক্তার। আমিও অপেক্ষা করবো।

এ্যাডাম মাথা হেলিয়ে মেনে নিলো, তারপর বেরিয়ে গেলো। আমি চেয়ার থেকে উঠে তাকে অনুসরণ করলাম।

হলে এ্যাডামকে ধরলাম আমি, জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম অবস্থা?

খারাপ।

কতখানি খারাপ?

অজ্ঞান হয়ে আছে এখনো, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। দেহের প্রান্তগুলি শিথিল। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, রিফ্লেক্সেস, একেবারে নেই। হাতটা ধরলে মনে হয় যেন

মোরব্বা। এক্স-রে করেছি আমরা — খুলির ছবিতে একটা ফ্র্যাকচার ধরা পড়েছে, ঘাড়ের পঞ্চম আর ষষ্ঠ মেরুদণ্ডী অস্থিখণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ একটু সরে গেছে।

কি সব বকছো?

এ্যাডাম আমার ঘাড়ের পেছনের একটা জায়গার উপর তার দু'আঙ্গুল রেখে বললো, এইখানটা।

তার মানে ওর ঘাড় মটকে গেছে?

হ্যাঁ।

আমার ধারণা ছিলো এরকম হলে মানুষ বাঁচে না।

সাধারণতঃ বাঁচে না। আরো একটু উপরে হলে বাঁচে না।

ওর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা আছে?

আছে।

শুধু বাঁচার, না ভালো হয়ে যাবার?

ভালো হয়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। প্রায় ভালো হয়ে যাবার। ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা আছে।

তুমি কি করবে এখন?

এ্যাডাম সোজা আমার চোখে চোখ রাখলো।

ওকে দেখে মনে হলো ওর নিজের মাথায় যেন কেউ প্রচণ্ড আঘাত করেছে। মুখ টান টান, চেহারা বিবর্ণ। বললো, সিদ্ধান্তটা কঠিন। ভাবতে হবে আমাকে। এখন আমি এ নিয়ে কথা বলতে চাই না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে, পিঠ ঋজু ও সোজা করে, বাদামী বরফের মতো উজ্জ্বল পালিশ করা মেঝের উপর পা ফেলে সে হলঘরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলো।

আমি তখন লুসি স্টার্ক যেখানে কর্তার কাছ থেকে একটু দূরে নক্সা করা সোফার কাপড় আর ফুলের পট আর জল-রঙের ছবির মধ্যে চুপ করে বসেছিলো সেখানে ফিরে গেলাম। কোলের উপর রাখা তার হাতের শিরাগুলি নীল দেখাচ্ছিলো, সেই হাতের উপর থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে সে ওপাশে বসা স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলো। তিনি তার চোখে চোখ রাখছিলেন না। চুল্লীতে সাজানো কৃত্রিম কাঠের টুকরোর উত্তাপহীন আলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

রাত একটার পর একজন নার্স এসে খবর দিলো যে কুয়াশা কেটে গেছে, ডঃ বার্নহামের প্লেন রওনা হয়েছে। প্লেন এসে পৌঁছুলেই আমাদের জানানো হবে। তারপর নার্স চলে গেলো।

কর্তা মিনিট দুই চুপ করে বসে থাকলেন, তারপর আমাকে বললেন,

বিমানবন্দরে ফোন করে খবর নাও এখানকার আবহাওয়া কি রকম। ওদের বলে দাও যে আমি বলেছি সুগার–বয় যেন তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে এখানে নিয়ে আসে। মার্ফিকে বলে দাও যে আমি বলেছি তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি মানে তাড়াতাড়ি। বাই গড — বাই গড — কিন্তু শপথবাক্যটা তিনি শেষ করলেন না, বিশেষ কোনো কিছুর উদ্দেশে তিনি তা উচ্চারণ করলেন না।

আমি করিডর পেরিয়ে দোতলার টেলিফোন বুথগুলির কাছে গেলাম। সুগার–বয় আর মার্ফিকে ওই অদ্ভুত নির্দেশটা দিতে হবে। এর কোনো দরকার ছিলো না। সুগার–বয় এমনিতেই ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাবে। আর মার্ফি, মোটর সাইকেল এসকর্ট বাহিনীর লেফটেন্যান্ট, ভালোভাবেই জানে যে তাকে ওখানে ফূর্তি করার জন্য পাঠানো হয় নি। কিন্তু আমি বিমানবন্দরে ফোন করলাম, জানলাম যে আবহাওয়া পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, একটু বাতাস উঠেছে। আমি বললাম ওরা যেন কর্তার নির্দেশটা মার্ফিকে জানিয়ে দেয়।

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়েই দরজার কাছে আমি স্যাডির মুখোমুখি হলাম। সে নিশ্চয়ই লবিতে ঘুরঘুর করছিলো, হয়তো ছায়ার মধ্যে একটা বেঞ্চে চুপ করে,বসেছিলো, কারণ আমি ঢোকার সময় তাকে লক্ষ করি নি।

ওকে হঠাৎ দেখে আমি বললাম, তা তুমি 'কু' বলে আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দিয়ে একবারে দফা রফা করে দিলে না কেন?

আমার কোর্টের হাতা খামচে ধরে সে প্রশ্ন করলো, কেমন অবস্থা?

খারাপ। ঘাড় ভেঙে গেছে।

কোনো আশা আছে?

ডক্টর স্ট্যান্টন বলেছেন যে আছে, তবে তার মুখ হাসিতে ঝলমল করছিলো না।

কি করবে ওরা এখন? অপারেশন?

জনস্ হপকিন্স থেকে এক মহারথী ডাক্তার আসছে, তার সঙ্গে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি এসে পৌঁছুলে, কি করতে হবে সেটা ওরা টস্ করে ঠিক করবে।

ডক্টর স্ট্যান্টনের কথা শুনে তোমার কি মনে হলো? সত্যিই কোনো আশা আছে? তখনো সে আমার কোটের হাতা খামচে ধরেছিলো।

হঠাৎ আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। এক টানে আমি ওর হাতের মুঠি থেকে আমার কোট ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, তা আমি কি করে বলবো?

সে তার হাত নামিয়ে মৃদু কুণ্ঠিত গলায় বললো, যদি তুমি কিছু জানতে পারো – – ইয়ে — ডাক্তার আসার পর তুমি যদি কিছু জানতে পারো — তা হলে আমাকে

জানিও, কেমন?

কিন্তু তুমি বাড়ি যাচ্ছো না? এখানে ভূতের মতো ঘুরছো কেন?

সে মাথা নাড়লো। তখনো তার ভঙ্গি কুণ্ঠিত, বিনীত।

একটু আগে তুমিই তো চেয়েছিলে কেউ যেন মেরে ওর হাড় গুঁড়ো করে দেয়, আর এখন তুমি এখান থেকে যেতে পারছো না, ওর কথা ভেবে তোমার ঘুম হচ্ছে না।

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে স্যাডি বললো, আমি অপেক্ষা করবো।

আমি বললাম, তুমি একটা গাধা।

শোনো, কিছু জানতে পারলেই আমাকে জানিও।

আমি একথার কোনো উত্তর দিলাম না।

আমি সোজা হেঁটে উপরে যে ঘর থেকে এসেছিলাম সেখানে ফিরে গেলাম। ঘরের পরিস্থিতি কিছুই বদলায় নি।

কিছুক্ষণ পর একটি নার্স এসে জানিয়ে গেলো যে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে প্লেন বিমানবন্দরে পৌছে যাবে। আরেকটু পর সে আবার ফিরে এসে বললো যে আমার ফোন আছে।

আমি নার্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে ফোন করেছে?

একজন ভদ্রমহিলা, নাম বললেন না।

আমি অনুমান করলাম কার ফোন। ফোন ধরেই বুঝলাম যে আমার অনুমান ভুল হয় নি। এ্যান স্ট্যান্টনই ফোন করেছে। যতক্ষণ সম্ভব সে চুপ করে থেকেছে কিন্তু আর পারে নি। সে আমার জামা খামচে ধরে নি, কারণ সে কয়েক মাইল দূরে তার এ্যাপার্টমেন্টে, নইলে তার গলার স্বর ওই একই কাজ করছিলো। আমি যা জানতাম তাকে বললাম, বারবার একই প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সে আমাকে ধন্যবাদ দিলো, আমাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইলো, বললো যে পরিস্থিতিটা না জেনে সে স্থির হতে পারছিলো না। সারা সন্ধ্যা বারবার সে আমার হোটেলে ফোন করেছে, ভেবেছে আমি বোধহয় হোটেলে ফিরবো, তারপর শেষে এই হাসপাতালে আমাকে ফোন করেছে। আমি ছাড়া আর কেউ নেই যাকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে। হাসপাতালের লোককে একবার ফোন করে খবর জানতে চেয়েছিলো, ওরা কোনো স্পষ্ট উত্তর দেয় নি। এ্যান বললো, কাজেই দেখতে পাচ্ছো, তোমাকে ফোন করা ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিলো না।

আমি বললাম যে, হ্যাঁ, আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি, তারপর ফোন ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেলাম। ঘরের পরিবেশ একটুও পাল্টায় নি। আর প্রায় চারটা পর্যন্ত তা ছিলো

অপরিবর্তিত। তারপর হঠাৎ কর্তা তাঁর মাথা তুললেন। এতক্ষণ তিনি ফুলের নকশা আঁকা কাপড়ে ঢাকা চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিলেন, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো কৃত্রিম কাষ্ঠখণ্ডগুলির উপর। চুল্লীর কাছে ঝিমুতে থাকা কোনো কুকুর যেভাবে হঠাৎ কিছু শুনে সচেতন হয়ে ওঠে, যে শব্দ আপনার কানে একটুও পৌছায় না, কর্তা সেইভাবে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। তার মানে তিনি ঝিমুচ্ছিলেন না। তিনি ওই শব্দের জন্য কান পেতেছিলেন। এক মুহূর্ত তিনি মাথা উঁচু করে মন দিয়ে শব্দটা শুনলেন, তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কর্কশ গলায় তিনি বললেন, ওই! ওই!

তারপর আমিও শব্দটা পেলাম, এই প্রথম বারের মতো, বহু দূরে মোটর সাইকেল এসকর্টের সাইরেন ধ্বনি। প্লেন এসে গেছে।

কিছু পরে নার্স এসে খবর দিলো যে ডক্টর বার্নহাম আর ডক্টর স্ট্যান্টন এখন পরামর্শ করছেন। কখন তাঁরা মতামত দেবেন সেটা সে বলতে পারছে না।

সাইরেনের ওই প্রথম শব্দ শোনার পর থেকে কর্তা আর আসন গ্রহণ করেন নি। তিনি ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন, মাথা উঁচু, সাইরেনের শব্দের ওঠা-নামা শুনলেন, হলঘরে কখন পদধ্বনি হয় তার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন। তারপর তিনি পায়চারি করতে শুরু করলেন। জানালার কাছে গিয়ে থামলেন, জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের অন্ধকার মাঠের দিকে আর মাঠের ওপারে তাকালেন, যেখানে নিশ্চয়ই কুয়াশার ভেতর রাস্তার নিঃসঙ্গ বাতি জ্বলছে, তারপর আবার চুল্লীর কাছে ফিরে আসলেন, সেখানে পৌছেই সবেগে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, তাঁর পায়ের হ্যাঁচকা টানে কার্পেটটা কুঁচকে যাচ্ছে। তাঁর দুহাত পিঠের কাছে পেছনে জড়ো করে ধরা, মাথা সামনের দিকে ঝোঁকানো, চুল কপালের উপর ঝুলে পড়েছে, মাথাটা যেন মাঝে মাঝে একটু একটু করে দু'দিকে দুলছে।

আমি ছবির ম্যাগাজিনগুলি দেখে চলেছিলাম কিন্তু ওই সংহত, অস্থির অথচ দৃঢ় পায়চারি আমার মনে বহুদিন আগের একটা স্মৃতির অনুরণন জাগিয়ে তুললো। খুব বিরক্ত লাগছিলো আমার, স্মৃতিটা আমি স্পষ্ট করে ধরতে পারছিলাম না। তারপরেই অস্পষ্টতা কেটে গেলো। একটা হালকা দেয়ালের ওপাশে এক গ্রামীণ হোটেল-কক্ষে অবরুদ্ধ পায়চারির অশ্রান্ত শব্দ। হ্যাঁ, তাই।

যখন দরজার বাইরের হাতলে কারো হাত রাখার শব্দ হলো তখনো তিনি পায়চারি করছিলেন কিন্তু শব্দটি হতেই, প্রথমবারের মতো হতেই, তিনি সবেগে মাথা ঘুরিয়ে ওই দিকে চোখ রেখে নিশ্চল হয়ে গেলেন, একটা শিকারী কুকুরের মতো। এ্যাডাম ঘরের ভেতর ওই দৃষ্টির থাবার মধ্যে হেঁটে এলো।

কর্তা তাঁর নিচের ঠোঁট চাটলেন কিন্তু প্রশ্নটাকে সামলালেন।

এ্যাডাম দরজা বন্ধ করে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো, ডাঃ বার্নহাম রোগীকে পরীক্ষা করেছেন, এক্স-রে প্লেটগুলি ভালো করে দেখেছেন। তাঁর আর আমার রোগের নিদান হুবহু মিলে গেছে। সেটা কী আপনি জানেন?

এ্যাডাম থামলো, যেন কিছু উত্তর আশা করছে। কিন্তু কর্তা কোনো কথা বললেন না, কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেলো না তাঁর ভঙ্গিতে, কিন্তু এ্যাডামের মুখের উপর থেকে তিনি তাঁর দৃষ্টির থাবা সরিয়ে নিলেন না।

তখন এ্যাডাম বললো, দুটি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। একটা রক্ষণশীল, অন্যটা চরমপন্থী। রক্ষণশীল গতানুগতিক পন্থা অনুযায়ী রোগীকে এখন একটা ভারি ছাঁচের মধ্যে টানা দিয়ে রাখতে হবে, তারপর পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। চরমপন্থা অনুযায়ী এখনই অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এটা একটা কঠিন সিদ্ধান্তের ব্যাপার, একটা অত্যন্ত টেকনিক্যাল ডিসিশান। সেজন্যই আমি চাই যে আপনি যতোটা সম্ভব পুরোপুরি পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করেন।

এ্যাডাম আবার থামলো কিন্তু এবারও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলো না, তবে কর্তার দৃষ্টি শিথিল হলো না।

এ্যাডাম বলতে থাকলো, এবার তার গলায় শ্রেণীকক্ষের বক্তৃতার সুর শোনা গেলো, একটা এ্যাকাডেমিক ভঙ্গি, এ্যাডাম বললো, এক্স-রের ছবির পাশ থেকে দেখা যায় একটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মেরুদণ্ডীর অস্থিখণ্ডে একটা স্থানচ্যুতি ঘটেছে, কিন্তু এক্স-রে থেকে কোমল পেশীর অবস্থা বোঝার উপায় নেই। কাজেই এই মুহূর্তে ওর মেরুদণ্ডের স্নায়ুর অবস্থা কি সেটা আমরা জানতে পারছি না। অস্ত্রোপচারের পরই শুধু সেটা জানা যাবে। অস্ত্রোপচারের পর যদি দেখা যায় যে সেই স্নায়ু পিষ্ট হয়ে গেছে তাহলে রোগী তার বাকী জীবনের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকবে, কারণ ওই স্নায়ুটির পুনরুজ্জীবনের কোনো শক্তি নেই। কিন্তু এটা সম্ভব যে আমরা দেখবো যে স্থানচ্যুত অস্থির একটা অংশ শুধু ওই স্নায়ুর উপর চাপ দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে একটা ল্যামিনেকটমি করে আমরা ওই চাপ সরিয়ে দিতে পারবো। তার ফলে কতটুকু উপকার হবে সে সম্পর্কে এখনই কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। আমরা হয়তো কিছু কিছু কাজ করার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারবো, হয়তো প্রায় সবটুকুই ফিরিয়ে আনতে পারবো, অবশ্য খুব বেশি আশা করা উচিত হবে না। কিছু কিছু পেশী হয়তো অসাড় থাকবে। বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি?

মনে হলো এবার এ্যাডাম কোনো উত্তর প্রত্যাশা করছিলো না। মুহূর্তের জন্য সে থামলো, তারপর বললো, একটা কথা আমার পরিষ্কার করে বলা দরকার।

অপারেশনটা ব্রেনের খুব কাছে করতে হবে। এর ফলে মৃত্যুও হতে পারে। তা ছাড়া এই অপারেশনে সংক্রমণের সম্ভাবনাও বেশি। ডঃ বার্নহাম আর আমি ব্যাপারটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি এবং আমরা দুজনেই একমত। অপারেশন করার পক্ষে আমি নিজে পুরো দায়িত্ব নিয়ে পরামর্শ দিচ্ছি। কিন্তু আমি আবারো বলছি এটা একটা চরম পন্থা। একটা আউটসাইড চান্স। একটা জুয়াড়ির চান্স।

এ্যাডাম থামলো, আর পরবর্তী নীরবতার মধ্যে কর্তার দু'তিনবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো, কর্কশ ঘর্ষণের শব্দের মতো, তারপর কঠিন গলায় তিনি বললেন, অপারেশন করো।

আউটসাইড চান্সই বেছে নিলেন কর্তা, জুয়াড়ির চান্স। কিন্তু এতে আমি বিস্মিত হই নি।

এ্যাডাম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লুসি স্টার্কের দিকে তাকালো, যেন তার কাছ থেকেও সে একটা সমর্থন চাইছে। লুসি এ্যাডামের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তার স্বামীকে দেখলো। তিনি তখন জানালা দিয়ে বাইরের কালো মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটুক্ষণ লুসি তার স্বামীর শিথিল কাঁধ লক্ষ করলো, তারপর আবার এ্যাডাম স্ট্যান্টনের দিকে চোখ ফেরালো। ধীরে ধীরে সে তার মাথা উপর-নিচে নাড়ালো, কোলের উপর রাখা তার দু'হাত পরস্পরকে পেঁচিয়ে ধরলো, তারপর ফিসফিস করে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

এ্যাডাম বললো, আমরা এখনই অস্ত্রোপচার করবো। আমি আগেই সব প্রস্তত রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। এখনই যে করতেই হবে তা নয়, কিন্তু আমার বিবেচনায় করাই ভালো।

জানালার কাছ থেকে রুক্ষ গলায় কর্তা বললেন, করো। কিন্তু তিনি ফিরে তাকালেন না, ঘর থেকে বেরিয়ে এ্যাডাম স্ট্যান্টন যখন দরজা বন্ধ করলো তখনো না।

আমি আবার আমার ছবির পত্রিকা দেখতে শুরু করলাম কিন্তু এত সতর্কতার সঙ্গে পাতা উল্টালাম যেন ঘরের নিস্তব্ধতা কিছুতেই ভঙ্গ করা চলবে না। ওই নিস্তব্ধতা অটুট থাকলো বহুক্ষণ, আর আমি একটার পর একটা ছবি দেখে যেতে লাগলাম ঃ স্নানের পোশাক পরিহিতা রমণীকুল, রেসের ঘোড়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃশ্য, ঋজু পরিচ্ছন্ন চেহারার যুবকবৃন্দ বিশেষ ধরনের শার্ট পরে আছে কিংবা হাত তুলে অভিবাদন করছে, ছয়টি আলোকচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত গোয়েন্দা কাহিনী যার উত্তর দেয়া রয়েছে পরের পাতায়। কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে আমি ছবিগুলি দেখছিলাম না। তাছাড়া এসব ছবি সর্বদাই একরকম।

তারপর এক সময় লুসি চেয়ার থেকে উঠে কর্তা যেখানে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন সেখানে গেলো। সে তাঁর ডান বাহুর উপর নিজের হাত রাখলো। তিনি ওর দিকে না তাকিয়েই সামান্য সরে গেলেন। কিন্তু লুসি তাঁর হাত ধরে তাঁকে আস্তে আকর্ষণ করলো, তখন মুহূর্তের জন্য একটু বাধা দিয়ে তিনি তাকে অনুসরণ করলেন। লুসি তাঁকে ফুলের নক্সা আঁকা কাপড়ে ঢাকা বড়ো চেয়ারের কাছে টেনে এনে খুব শান্ত গলায় বললো, বসো উইলি, বসে একটু বিশ্রাম করো।

কর্তা প্রায় অবশভাবে বসে পড়লেন আর লুসি ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের আসনে ফিরে গেলো।

এখন কর্তা আর কৃত্রিম কাষ্ঠখণ্ডগুলির উপরে নয়, লুসির উপরে তাঁর চোখ রাখলেন। তিনি অবশেষে বললেন, ও ঠিক হয়ে যাবে।

ঈশ্বর যেন তাই করেন।

দুতিন মিনিট কর্তা চুপ করে থাকলেন। তখনো তাঁর দৃষ্টি লুসির মুখের উপর। তারপর তিনি হিংস্রভাবে বলে উঠলেন, ঠিক হয়ে যাবে ও, হতেই হবে।

লুসি আবার বললো, ঈশ্বর যেন তাই করেন! সে স্থির দৃষ্টিতে কর্তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকলো। অবশেষে কর্তা তাঁর চোখ নামিয়ে নিলেন। ততক্ষণে আমার ওখানে বসে থাকার ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমি উঠে, বাইরে বেরিয়ে, হলের অপর প্রান্তে বসে থাকা ফ্লোর ডেস্কের নার্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, গভর্নর আর তাঁর স্ত্রীর জন্য এখানে কোথাও থেকে কিছু স্যান্ডউইচ আর কফি আনানো যায়?

নার্স যখন জানালো যে সে আনিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছে তখন আমি তাকে বললাম যে সে জিনিসগুলো যেন তার টেবিলে আনিয়ে রাখে, আমি নিজে ওঁদের কাছে নিয়ে যাবো। তারপর আমি লবিতে ঘোরাঘুরি করলাম। স্যাডি তখনো সেখানে ছায়ার মধ্যে ভূতের মতো বসেছিলো। আমি ওকে অপারেশনের খবরটা দিয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম। তারপর কফি আর স্যান্ডউইচ আসার পর ট্রে নিয়ে ওয়েটিংরুমে ফিরে গেলাম।

কিন্তু খাদ্যবস্তু আর কফি আবহাওয়ার বিশেষ কোনো উন্নতিসাধনে সক্ষম হলো না। আমি লুসির পাশে একটা ছোট্ট টেবিল দিয়ে তার উপর একটা প্লেটে একটা স্যান্ডউইচ আর এক পেয়ালা কফি রাখলাম। লুসি ধন্যবাদ জানালো, একটু স্যান্ডউইচ ভেঙে দু'তিনবার মুখে দিলো কিন্তু স্যান্ডউইচের আকৃতি তেমন কমলো বলে মনে হলো না। তবে একটু কফি খেলো সে। আমি কর্তার হাতের কাছেও কিছু

খাবার আর কফি এগিয়ে দিলাম। তিনি তাঁর আত্মমগ্নতার ভেতর থেকে জেগে উঠে মুখ তুলে বললেন, থ্যাংকস্, জ্যাক, কিন্তু খাবার ভানও করলেন না। কফির পেয়ালাটা হাতে তুলে নিলেন অবশ্য, কয়েক মিনিট ধরেও থাকলেন, কিন্তু একটা চুমুকও দিতে দেখলাম না, হাতে ধরেই থাকলেন শুধু।

আমি একটা স্যান্ডউইচ আর এক পেয়ালা কফি খেয়ে যখন দ্বিতীয়বারের মতো আমার পেয়ালায় কফি ঢালছিলাম তখন কর্তা হাত বাড়িয়ে তাঁর পাশের ছোট টেবিলের উপর নিজের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলেন। খানিকটা কফি চলকে পড়ে গেলো।

তিনি ডাকলেন, লুসি — লুসি!

কি?

জানো, আমি কি করবো?

সামনের দিকে ঝুঁকে, লুসির উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে, কর্তা বললেন, আমি নতুন হাসপাতালটা ওর নামে নামকরণ করবো। টমের নামে। নাম দেবো টম স্টার্ক হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র। হ্যাঁ, টমের নামে হবে ওই হাসপাতাল। সেটা হবে —

লুসি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, আর কর্তার কথাও বন্ধ হলো।

লুসি বললো, ওসবে কিচ্ছু এসে যায় না, উইলি। তুমি কেন বুঝতে পারছো না, উইলি? ওসব জিনিসের কোনো মূল্য নেই। একখণ্ড পাথরের উপর কারো নাম উৎকীর্ণ করা। কাগজে কাগজে লেখা। ওহ্, উইলি, টম ছিলো আমার ছোট্ট বাচ্চা, আমাদের আদরের ছোট্ট ছেলে — ওসবে কিচ্ছু এসে যায় না, কিচ্ছু না, তুমি বুঝতে পারছো না, উইলি?

কর্তা আবার তাঁর চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। নীরবতা যেখান থেকে বিদায় নিয়েছিলো আবার সেখানে এসে জাঁকিয়ে বসলো। আমি অভুক্ত খাবার আর প্লেট ইত্যাদি যথাস্থানে রেখে যখন ওই ঘরে ফিরে এলাম তখনো সেখানে নীরবতা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে চলেছে। ফলে সেখান থেকে কেটে পড়ার একটা সুযোগ মিললো আমার। আবার আমি যখন সেখানে ফিরে গেলাম তখন ছ'টা বাজতে বিশ।

ছ'টার সময় এ্যাডাম এলো। পাথরের মতো মুখ, ক্লান্ত, ধূসর। কর্তা উঠে দাঁড়িয়ে এ্যাডামের দিকে তাকালেন, কিন্তু তিনি কোনো শব্দ করলেন না, লুসিও না। তারপর এ্যাডাম বললো, বাঁচবে।

লুসি নিঃশ্বাস ফেলে বললো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কিন্তু কর্তা তখনো এ্যাডামের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

এ্যাডাম সে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে বললো, স্নায়ু পিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

লুসির মুখ থেকে একটা শব্দ বেরুলো, যেন সে কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আমি সেদিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম বুকের উপর তার মাথা নেমে এসেছে।

কর্তার মধ্যে কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না, তারপরই তিনি তাঁর দুটি হাত সবেগে বুক–সমান উঁচু করে তুলে ধরলেন, আঙুলগুলি ছড়ানো, যেন কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, না। না। এ্যাডাম বললো, পিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তারপর যোগ করলো, আমি দুঃখিত, গভর্নর।

এ্যাডাম চলে গেলো।

কর্তা বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়লেন। দরজার দিকে তিনি তাকিয়েই থাকলেন। তাঁর দু'চোখ বিস্ফারিত, কপালে বিন্দু বিন্দু জলকণা। তারপর তিনি এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসলেন আর তাঁর ভেতর থেকে কেউ যেন সাঁড়াশি দিয়ে একটা শব্দ বার করে আনলো। চেয়ারে বসা দেহটির কালো জান্তব গভীরতার মধ্য থেকে কেউ যেন একটা আকৃতিহীন যন্ত্রণাবিদ্ধ শব্দ কাঁচা ছিড়ে বার করে এনেছে। তিনি বললেন, ওহ্। তারপর আবারও, ওহ্।

লুসি স্টার্ক তাঁকে লক্ষ করছিলো। তাঁর দৃষ্টি তখনো দরজার উপর নিবদ্ধ। লুসি নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁর কাছে গেলো। কোনো কথা বললো না সে। তাঁর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধের উপর নিজের হাত রাখলো শুধু।

তারপর আবার ওই শব্দটা হলো, কিন্তু এই শেষবার। তিনি তাঁর আসনে গা এলিয়ে দিলেন, তখনো দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিলো তাঁর। প্রায় তিন চার মিনিট কেটে গেলো এইভাবে। তারপর লুসি ডাকলো, উইলি।

এই প্রথম তিনি মুখ তুলে ওকে দেখলেন।

লুসি বললো, উইলি, এবার যাবার সময় হয়েছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দেয়ালের কাছে একটা চেয়ারের উপর থেকে আমি ওদের কোট তুলে নিয়ে লুসিকে তার কোট পরতে সাহায্য করলাম। সে অন্য কোটটা হাতে নিয়ে কর্তাকে পরতে সাহায্য করলো। আমি বাধা দিলাম না।

দরজার দিকে অগ্রসর হলো ওরা। কর্তা এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু এখনো লুসির হাত কর্তার বাহুর উপর, ওদের দেখলে আপনার মনে হতো যে লুসি খুব নৈপুণ্য আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একজন অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আমি ওদের জন্য দরজা খুলে ধরলাম, তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সুগার–বয়কে গাড়ি ঠিক রাখতে বললাম।

কর্তা যখন গাড়িতে ওঠেন আমি তখন সেখানে ছিলাম। কর্তার পর লুসি উঠলো তাঁর পেছন পেছন। একটু অবাক হলাম আমি, কিন্তু আমার বদলে সুগার-বয় ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবে সেজন্য ক্ষুণ্ণ হলাম না মোটেও। কফি সত্বেও আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না।

এরপর আমি ভেতরে এসে এ্যাডামের অফিসঘরে গেলাম। সে তখন বাড়ি যাবার জন্য বেরুচ্ছিলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাহিনীটা কি?

এ্যাডাম জবাব দিলো, যা বলেছি তাই। মেরুদণ্ডী স্নায়ু পিষ্ট হয়ে গেছে। তার মানে পক্ষাঘাত। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে কিছুকাল সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে অসাড় হয়ে থাকবে, তারপর মাংসপেশীর জোর কিছুটা ফিরে আসবে। কিন্তু ও তার হাত আর পা কোনোদিন ব্যবহার করতে পারবে না। শারীরিক ক্রিয়াকর্মাদি চলবে কিন্তু তার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। একটা শিশুর মতো হয়ে যাবে ও। চামড়া ফেটে ফেটে যাবে, সহজেই শিকার হবে নানা প্রকার সংক্রমণের। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার বেশ সম্ভাবনা থাকবে। সাধরণতঃ তার ফলেই এই জাতীয় রোগীর, কিছু আগে কিংবা পরে, মৃত্যু হয়।

আমি বললাম, আগে হওয়াই বোধহয় ভালো। লুসির কথা ভাবলাম আমি।

ক্লান্ত কণ্ঠে এ্যাডাম বললো, হয়তো তাই। তাকে সত্যিই অবসন্ন দেখাচ্ছিলো। সে কোট পরে ব্যাগ হাতে নিয়ে বললো, তোমাকে কোথাও নামিয়ে দেবো?

আমি বললাম, না, ধন্যবাদ। আমার গাড়ি আছে। তারপর আমার চোখ পড়লো ওর টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনের উপর। আমি বললাম, আমি একটা ফোন করবো, তারপর আমি দরজা বন্ধ করে দেবো। ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

দরজার কাছে গিয়ে ও বললো, গুড নাইট, তারপর চলে গেলো।

আমি ডায়াল করলাম, এ্যানের নম্বর পেলাম, তাকে খবরটা দিলাম। সে বললো, কী ভয়ানক। ফোনের মধ্যে বারবার সে ওই একই কথা বলতে থাকলো। নিচু আচ্ছন্ন গলায় সে তিন-চার বার বললো, কী ভয়ানক, তারপর আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলো।

আমি এবার অফিসঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার আগে আরেকটা কাজ করতে হবে। লবিতে গেলাম আমি। স্যাডি তখনো সেখানে বসেছিলো। তাকে খবরটা দিতে সে মন্তব্য করলো যে খুবই কঠিন অবস্থা। আমি একমত হলাম।

স্যাডি বললো, কর্তার জন্য খুব কঠিন হলো ব্যাপারটা।

আমি বললাম, লুসির জন্যও সাংঘাতিক কঠিন হলো, কারণ শিশুর যাবতীয় পরিচর্যা তো তাকেই করতে হবে। বিনামূল্যে তোমার সহানুভূতির স্যাম্পল বিতরণ করার আগে সে কথা ভুলো না।

নিশ্চয়ই সে চরম ক্লান্ত ছিলো কিংবা অন্য কিছু, কারণ আমার উক্তিতে সে ক্ষেপে ওঠে নি। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম শহরে কোথাও ওকে নামিয়ে দিতে পারি কিনা। ও বললো যে তারও গাড়ি আছে।

তাহলে আমি চললাম! অনন্তকাল ধরে ঘুমুবো। বলে, ওকে লবিতে রেখেই আমি বেরিয়ে এলাম।

যখন আমার গাড়ির কাছে এসে পৌঁছুলাম তখন দেখলাম যে সকালের আকাশে নীল রঙ ঘন হয়ে জমতে শুরু করেছে।

দুর্ঘটনাটা ঘটে শনিবার অপরাহ্নে। অস্ত্রোপচার হয় রোববার প্রত্যুষের ঠিক আগে আগে। চূড়ান্ত বোঝাপড়ার খেলাটা ছিলো সোমবার। থ্যাংকসগিভিং-এর আগের সোমবার। সেদিন একটু একটু করে ঘটনাবলী একটার পর একটা জমে উঠছিলো, তারপর এক সময় প্রচণ্ড গতিতে তা সমাপ্তিতে পৌঁছে গেলো, যেন একটা মস্ত ভারি ওজন কড়কড় শব্দ করে নেমে আসতে আসতে এক সময় হঠাৎ সর্বশেষ বাঁধনটি ছিঁড়ে ঝাঁপ দিলো নিচে। আমার সে দিনের অভিজ্ঞতায় ঘটনাবলীর পেছনের যুক্তিগুলি শুধু অস্পষ্টভাবে আমার চেতনায় ধরা পড়েছিলো, মাঝে মাঝে মুহূর্তের চকিত উদ্ভাসনে, তারপর যখন সেগুলি জমে উঠে চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছুলো তখন যে ছকটি আকার গ্রহণ করতে যাচ্ছিলো আমি সে সম্পর্কে শুধু সামান্য আভাস পাই, তার বেশি নয়, ফলে সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্বপ্নের মতো অবাস্তবতায় মণ্ডিত হয়ে পড়েছিলো। অবশেষে চূড়ান্ত সমাপ্তির পর, সবকিছু যখন শেষ হয়ে গেছে তখন, অনেক পরে, বস্তুতঃপক্ষে আমি যখন ধাঁধার সবগুলো টুকরো একত্র করতে পেরেছি, ছকটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, শুধু তখনই আবার আমার বাস্তবতার বোধ ফিরে আসে। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই, কারণ বাস্তবতার কাজ কোনো একটি ঘটনার ঘটনা হিসেবে নয়, তা হচ্ছে ঘটনাটির অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কের কাজ। এখানে আমরা একটা দৃশ্যতঃ অসম্ভব বিষয়ের সম্মুখীন হই ঃ একটা ঘটনার বাস্তবতা, যা নিজে বাস্তব নয়, যেটা আবার নিজেই বাস্তব নয় সেরকম অন্যান্য ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু এটার অর্থ যে-কথা আমাদের দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করতেই হয় তাই শুধু দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করা ঃ লক্ষ্য বা গতিই আসল। এবং আমরা যখন এটা উপলব্ধি করি তখনই আমরা বাঁচি, কারণ আমাদের স্বরূপতা, আমাদের পরিচয়, এই নীতির উপরই নির্ভরশীল।

সোমবার সকালে আমি বেশ আগে অফিসে উপস্থিত হই। রোববার সারাদিন আমি ঘুমিয়েছি, ঘুম থেকে উঠে একটু খেয়ে, বাজে একটা সিনেমা দেখে, সাড়ে দশটার মধ্যে আবার শুয়ে পড়ি। প্রচুর ঘুমোবার পর যে একটা আধ্যাত্মিক পবিত্রতার অনভূতি হয় সেরকম অনুভূতি নিয়ে আমি অফিসে আসি।

কর্তার দপ্তরে গিয়ে দেখি যে তিনি তখনো আসেন নি। কিন্তু আমি থাকতে থাকতেই একটি মেয়ে একটা বড়ো ট্রে-তে একগাদা টেলিগ্রাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো। মেয়েটি বললো, ওঁর ছেলে যে আহত হয়েছে সেই ব্যাপারে এই সব টেলিগ্রাম। আসছে তো আসছেই।

আমি বললাম, সারাদিন ধরেই আসবে।

ঠিক তাই হবে। রাজ্যের প্রত্যেক নবীন রাজনীতিবিদ, কাউন্টি আদালতভবনের দ্বারপাল, উচ্চাভিলাষী থুতু-চাটা মানুষ, যে রোববারের কাগজে খবরটা দেখে নি সে আজ সোমবারের কাগজে সেটা দেখার পর টেলিগ্রাম পাঠাবে। এই টেলিগ্রাম পাঠানো হলো প্রার্থনার মতো। প্রার্থনার ফলে কি উপকার হয় তা আপনি বলতে পারবেন না কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এর ফলে কখনো কারো কোনো ক্ষতি হয় নি। ওই টেলিগ্রামগুলি একটা সিস্টেমের অংশ। কোনো রাজনীতিবিদের মেয়ের বিয়েতে উপহার দেবার মতো, কিংবা কোনো পুলিশের শেষকৃত্যে ফুল পাঠাবার মতো। ফুলের কথা যখন উঠলো তখন বলি, ফুল কিনতে হবে এ্যান্টোনিও গিয়ুস্তোর ফুলের দোকান থেকে, এটাও সিস্টেমের একটা অংশ। ফুলের দোকানের একটি মেয়ে-কর্মচারী পুলিশের শেষকৃত্যের জন্য ফুলের যেসব অর্ডার আসে একটা বিশেষ নথিতে তার রেকর্ড রাখে। তারপর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান চুকে গেলে টোনি সেই নথি দেখে, নিরন্তর শোকার্ত বন্ধুদের নামের পূর্ণাঙ্গ নথির সঙ্গে ওই নামগুলি মিলিয়ে দেখে, এবং আপনার নাম যদি ওই পূর্ণাঙ্গ নথিতে না থাকে তবে মার্ফির জন্য শেষকৃত্যের নথিতে আপনি চটপট নামটা তুলে ফেলুন, নইলে ভারি বিপদ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। টোনি হলো টাইনি ডাফির বিশেষ বন্ধু।

দপ্তরের মেয়ে-কর্মচারীটি তার স্কার্টের একটি লোভনীয় দোলানি দিয়ে চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে যাবার মুখেই টাইনি ডাফি ঘরে এসে ঢুকলো। তার মুখে ছিলো পেশাদারী সহানুভূতি আর শবদেহের রূপসজ্জাকারীর বেদনার্ত অভিব্যক্তি। কিন্তু যেই সে লক্ষ করলো যে কর্তা ঘরে নেই তখনই সে কিছুটা সহজ ও স্বাভাবিক হলো। দাঁত বার করে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি খবর? কেমন চলছে সব?

আমি জানালাম যে ভালো।

কর্তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

সত্যি, কী কাণ্ড! আবার তার মুখে সহানুভূতি আর বেদনার অভিব্যক্তি ফিরে এলো, যেন ম্যাজিকের মতো। বললো, ভীষণ দুঃখের একটা ঘটনা ঘটে গেলো। রীতিমতো ট্র্যাজিক। ওর মতো ছেলে! ভালো, পরিচ্ছন্ন, নির্ভেজাল। সত্যি ট্র্যাজিক, কোনো ভুল নেই তাতে।

আমি বললাম, আমার উপর তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে না।

সে বললো, কর্তার পক্ষে সহ্য করা শক্ত হবে। ডাফি মাথা নাড়লো।

শোনো, তিনি না আসা পর্যন্ত তোমার এইসব বাক্য একটু থামাও।

কোথায় গেছেন তিনি?

আমি জানি না।

টাইনি বললো, আমি গতকাল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি ম্যানসনে ছিলেন না। ওরা বলতে পারলো না তিনি কোথায় গেছেন, তবে তিনি বাড়িতে ফেরেন নি। কিছুক্ষণের জন্য হাসপাতালে ছিলেন কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে তাঁকে পাই নি। আমি পৌঁছুবার আগেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। হোটেলেও যান নি তিনি।

মনে হচ্ছে যথেষ্ট খোঁজাখুঁজি করেছো।

হ্যাঁ, আমি তাঁকে জানাতে চেয়েছিলাম, আমরা, এই সব লোকজন, কী ভীষণ দুঃখিত হয়েছি।

ঠিক ওই সময় ঘরে ঢুকলো কৃষি কমিশনার ক্যালভিন স্পার্লিং, সঙ্গে আরো দুজন। তাদের মুখেও বসানো ছিলো কৃত্রিম বেদনার অভিব্যক্তি, কিন্তু যেই দেখলো যে কর্তা ঘরে নেই তখুনি তারা সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো, আবার মুখের ভেতরকার গাম চুষতে শুরু করলো। স্পার্লিং বললো, হয়তো আজ তিনি আসবেন না।

টাইনি বললো, আসবেন। এতে দমে যাবার পাত্র তিনি নন। খুব শক্ত মানুষ কর্তা।

আরো জন দুই এসে উপস্থিত হলো, আর তারপর এসে ঢুকলো মরিসে। বহু কাল আগে, হিউ মিলার পদত্যাগ করার পর, সে-ই হিউ মিলারের জায়গায় এটর্নী জেনারেল হয়। ঘরের ভেতর সিগারের ধোঁয়া ভারী হয়ে উঠতে থাকলো।

একবার স্যাডি এসেছিলো। দরজার হাতলে হাত রেখে সে ঘরের ভেতরটা লক্ষ করে।

একজন ডাক দিয়েছিলো, হাই, স্যাডি।

কিন্তু স্যাডি কোনো উত্তর দেয় নি। দৃশ্যটা আরেকবার ভালো করে দেখে নিয়ে সে শুধু বলেছিলো, 'যীসাস ক্রাইস্ট', তারপর চলে গিয়েছিলো। ওর অফিসঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেলাম আমি।

আমি কর্তার টেবিলের পেছনে জানালার কাছে সরে গিয়ে বাইরের প্রাঙ্গণের দিকে তাকালাম। রাতে বৃষ্টি হয়েছিলো। এখন ক্ষীণ সূর্যালোকে ঘাস, ওকের পত্রপল্লব, এমন কি গাছের গায়ে জড়ানো শ্যাওলার উপরও মৃদু ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে, এমনকি বাঁকানো ড্রাইভওয়ে আর হাঁটাপথের ভেজা কংক্রিটের মধ্য থেকেও একটা, প্রায় নজর এড়িয়ে যাবার মতো, ঝিলিমিলি প্রতিফলিত হচ্ছে। গোটা পৃথিবী, যেসব গাছ থেকে সব পাতা ঝরে গিয়েছিলো তাদের নিরাভরণ শাখা-প্রশাখা, বাড়িঘরের ছাদ, স্বয়ং আকাশ পর্যন্ত, ধারণ করেছিলো একটা হাল্কা, শুদ্ধস্নাত, প্রশান্ত চেহারা। কোনো লোক দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর যখন মনে করে যে এখন তার একটু ভালো লাগছে, ভাবে যে এবার বোধহয় সে সম্পূর্ণ সেরে উঠবে, তখন তাকে যেরকম দেখায় সব যেন সেই রকম দেখাচ্ছিলো।

কর্তা যখন এসে ঘরে ঢুকলেন তখন তাঁর চেহারা ঠিক ওই রকম দেখাচ্ছিলো না। তবে তা থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তাঁকে খুব পাংশু দেখাচ্ছিলো না, কিন্তু সচরাচর যেরকম দেখায় তার চাইতে কিছুটা বেশি বিবর্ণ দেখাচ্ছিলো, চোয়ালের হাড়ের কাছে, মনে হলো, মাংস ঈষৎ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। দাড়ি কামাবার সময় দু'এক জায়গায় কেটে গেছে। চোখের নিচে ধূসর দাগ পড়েছে, যেন সেখানকার মাংস থেঁতলে গিয়েছিলো কিন্তু আঘাতটা এখন প্রায় সেরে এসেছে। তবে তাঁর দৃষ্টি ছিলো স্বচ্ছ ও অনাবিল।

তিনি নিঃশব্দে পুরু কার্পেটের উপর পা ফেলে অভ্যর্থনাকক্ষের মধ্য দিয়ে নিজের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেউ তাঁর উপস্থিতি লক্ষ করে নি। তারপর তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওদের কলগুঞ্জন ধীরে ধীরে না মিলিয়ে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ বরফের মতো জমাট বেঁধে গেলো। আর তখন যে দুঃখবেদনার মুখোশ তারা খুলে রেখেছিলো সেটা তাড়াতাড়ি পরে নেবার জন্য একটা নীরব ছোটাছুটি শুরু হলো। মুখোশগুলি পরার পর, যদিও একটু বাঁকা হয়ে থাকলো, ওরা কর্তার চারপাশে ভীড় করে এলো, তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলো। বললো যে তারা কর্তাকে জানাতে চায় তারা কি রকম ব্যথিত হয়েছে। বললো, আমাদের মনের অবস্থা যে কি রকম তা তো আপনি জানেন, কর্তা।

কর্তা খুব শান্ত গলায় বললেন যে, হ্যাঁ, তিনি তা জানেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর ধন্যবাদ।

তিনি তাঁর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন, আর জেটি থেকে একটা জাহাজ যখন প্রথম জলের মধ্যে এগিয়ে যায়, তার চাকা যখন প্রথমবারের মতো ঘুরতে থাকে, তখন জাহাজের সম্মুখভাগ থেকে জল যেভাবে ছিটকে দুপাশে সরে যায় ওরাও কর্তার সামনে থেকে সেভাবে সরে গেলো। কর্তা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রামগুলি হাতে তুলে নিলেন, দেখলেন, তারপর তাঁর হাত থেকে এক এক করে মেঝেতে ঝরে পড়ে যেতে দিলেন সেগুলিকে।

কেউ একজন বলে উঠলো, কর্তা — ওই টেলিগ্রামগুলি — ওই থেকেই বোঝা যায় মানুষ আপনাকে কি চোখে দেখে।

তিনি কিছু বললেন না।

ঠিক তখনই দপ্তরের সেই মেয়েটি আরেক গুচ্ছ টেলিগ্রাম নিয়ে হাজির হলো। সে কর্তার সামনে তার হাতের ট্রে নামিয়ে রাখলো। কর্তা স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখলেন, হলুদ কাগজগুলির উপর তাঁর হাত রাখলেন, তারপর আস্তে সেগুলি ঠেলে দিয়ে শান্ত আবেগহীন গলায় বললেন, এই জঞ্জালগুলি এখান থেকে সরাও।

মেয়েটি জঞ্জালগুলি সরালো।

ততক্ষণে পরিবেশ থেকে সকল ঔজ্জ্বল্য অন্তর্হিত হয়েছে। ওরা একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। টাইনি যখন বেরুচ্ছিলো তখন কর্তা বললেন, টাইনি, এক মিনিট অপেক্ষা করো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

টাইনি ফিরে এলো। অমিও চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু কর্তা আমাকে ডাকলেন, বললেন, তুমি থাকো, আমি চাই যে জিনিসটা তোমারও জানা থাকুক। অতএব আমি দেয়াল-ঘেঁষা একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। টাইনি বসলো কর্তার টেবিলের এক পাশে রাখা সবুজ চামড়ায় মোড়া বড়ো একটা চেয়ারে। সে পায়ের উপর পা তুলে বসলো, তার চওড়া জানু, আর সেই জানু ঢেকে রাখা কাপড়, টান টান হয়ে উঠলো। টাইনি তার লম্বা সিগারেট হোল্ডারে সিগারেট বসিয়ে, সিগারেটটা ধরিয়ে, অপেক্ষা করে থাকলো।

কর্তা তাড়াহুড়া করলেন না। পুরো এক মিনিট তিনি কি যেন ভাবলেন, তারপর টাইনি ডাফির দিকে চোখ তুলে তাকালেন। কিন্তু তারপর কর্তা এগিয়ে গেলেন দ্রুত গতিতে। তিনি বললেন, শোনো, লারসন কোনো কন্ট্রাক্ট পাবে না।

টাইনি যখন নিঃশ্বাস নিতে পারলো তখন কোনোরকমে শুধু বললো, কর্তা — কর্তা — এ আপনি করতে পারেন না, কর্তা।

কর্তা তাঁর গলা না তুলেই বললেন, হ্যাঁ, আমি পারি।

না, পারেন না, কর্তা। সব ঠিক হয়ে গেছে, কর্তা।

বেঠিক করে ফেলো। বেঠিক না করতে পারার মতো দেরি হয় নি।

কর্তা — কর্তা — এবার তার গলা শোনালো কান্নার মতো। ডাফির কড়া মাড় দেয়া সাদা শার্টের উপর সিগারেটের ছাই এসে পড়ছিলো। ডাফি বললো, লারসনকে দেয়া কথা আপনি ভাঙতে পারেন না। ও ভালো লোক, কর্তা। এ আপনি পারেন না। আপনার কথার ওলট-পালট হয় না।

লারসনকে দেয়া কথা আমি ভাঙতে পারি।

না, পারেন না। আপনার মত এভাবে বদলাতে পারেন না। এখন আর পারেন না।

কর্তা হঠাৎ তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টাইনির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আমি অনেক অনেক কিছু বদলাতে পারি।

পরবর্তী নীরবতার মধ্যে কর্তা তাঁর টেবিল ঘুরে এগিয়ে এসে বললেন, ব্যস, এই সব। প্রায় ফিসফিস করে ভরাট গলায় তিনি এটা বললেন, তারপর যোগ করলেন, আর লারসনকে তার যা খুশি তাই করার কথা বলে দিতে পারো।

টাইনি উঠে দাঁড়ালো, কয়েকবার মুখ খুললো, ঠোঁট ভেজালো, মনে হলো কিছু বলবে, কিন্তু কোনোবারই কিছু বললো না, অনেক টাকা দিয়ে ঠিক করানো তার দাঁতের উপর প্রত্যেকবারই তার ধূসর মুখ চেপে বসলো।

কর্তা তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি লারসনকে বলো। লারসন তো তোমার বন্ধু, তুমিই তাকে জানিয়ে দিও। টাইনির বুকে তিনি তাঁর দৃঢ় তর্জনী দিয়ে খোঁচা দিলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, সে তোমার ইয়ার, কথাটা বলার সময় তুমি তার কাঁধের উপর তোমার হাত রাখতে পারো। বলেই কর্তা হাসলেন। আমি এই হাসি প্রত্যাশা করি নি। কিন্তু সে-হাসি ছিলো ঠাণ্ডা, তার মধ্যে চিত্তপ্রফুল্লকারী কিছু ছিলো না। এতক্ষণ যে কথা হলো এই হাসি যেন তার উপর সীলমোহর দেগে দিলো।

টাইনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো না, কোথাও না থেমে সোজা হাঁটতে থাকলো, দীর্ঘ সবুজ কার্পেটের উপরে তার দেহ ছোট হতে হতে এক সময় অদৃশ্য হলো।

কিন্তু কর্তা তার বহির্গমন লক্ষ করছিলেন না। তিনি নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়ে তাঁর নিরাভরণ টেবিলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। একটু পরে তিনি বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

আমি চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসলাম না, টেবিল আর দরজার মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে, তিনি যা বলতে চান, সেটা যাই হোক না কেন, শোনার জন্য অপেক্ষা করলাম। কিন্তু যাই তিনি বলতে চেয়ে থাকুন না কেন, তিনি তা

বললেন না। তিনি শুধু আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন, নিষ্পাপ চোখ, জিজ্ঞাসু চোখ, আর প্রশ্ন করলেন, তারপর?

তিনি আমার কাছ থেকে কি শুনতে চেয়েছিলেন, আমি কি বলবো বলে আশা করেছিলেন, আমি জানি না। সেদিনের পর থেকে এবিষয়ে আমি বহুবার ভেবেছি। যদি উইলি স্টার্ককে আমার কিছু বলার থাকতো, যে–কাজিন–উইলি গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে, এখন গভর্নর হয়েছে, তাকে যদি আমার কিছু বলার থাকতো, তাহলে তখনই ছিলো সেকথা বলার সময়। কিন্তু আমি তা বলিনি। আমি কাঁধ কুঁচকে শুধু বলেছিলাম, তো, টাইনিকে যদি আপনি আরো কিছু কিল–ঘুষি মারেন তাতে কিচ্ছু যাবে–আসবে না। সে তৈরিই হয়েছে ওসব সহ্য করার জন্য। কিন্তু লারসন ভিন্ন জিনিস।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, মনে হলো কিছু বলবেন, কিন্তু প্রশ্নটা তার মুখের উপর থেকে মিলিয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন, কোনো এক জায়গা থেকে তো মানুষকে শুরু করতে হবে।

তিনি এক মুহূর্ত আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন, বাদ দাও।

আমি আমার দপ্তরে ফিরে গেলাম। এই ভাবেই ওই দিনটির শুরু হয়। ট্যাক্স বিলের কিছু আনুষঙ্গিক হিসাবপত্র আমি তখনো শেষবারের মতো পর্যালোচনা করে উঠতে পারি নি। সুইনটন বিলটি সিনেটে উত্থাপন ও পাশ করাবার ব্যবস্থা নেবেন। তিনি শনিবার আমার কাছ থেকে কাগজপত্রগুলি চেয়েছিলেন কিন্তু আমি দিতে পারি নি। শনিবার বিকালে এই বিষয়ে সুইনটন ও কর্তার সঙ্গে আমার আলোচনার কথা ছিলো, কিন্তু শনিবার বিকালের ঘটনাবলী অন্য পথে মোড় নেয়। সোমবার সকালে, আরেকটু বেলা বাড়লে, আমি আমার হিসাবপত্র নিয়ে একটা জটিলতার মধ্যে আটকে পড়ি। আমি বড়ো ঘরটায় ঢুকে কর্তার দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। তাঁর সেক্রেটারী বললো যে তিনি ওদিকে স্যাডি বার্কের ঘরে গেছেন। আমি দেখলাম যে ওই ঘরের দরজা বন্ধ। বড়ো ঘরে আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কর্তার বেরিয়ে আসার জন্য, কিন্তু দরজা বন্ধই থাকলো। একবার দরজার ওপাশ থেকে উঁচু গলার কথা শুনলাম, তারপরই কণ্ঠস্বর নিচুতে নেমে যায়।

একটু পরে আমার ঘরে ফোন বেজে ওঠার শব্দ শুনে আমি সেখানে যাই। সুইনটন ফোন করেছে, বেশ চটে গেছে, কাজগপত্র নিয়ে কেন আমি ওর ওখানে যাই নি? অতএব আমি কাগজপত্র নিয়ে সুইনটনের ওখানে গেলাম, তার সঙ্গে কথা বললাম। প্রায় মিনিট চল্লিশ আমি তার সঙ্গে কাটাই। নিজের দপ্তরে ফিরে এসে দেখলাম যে কর্তা চলে গেছেন। তাঁর সেক্রেটারী বললো, উনি হাসপাতালে গেছেন।

বিকালে আবার অফিসে আসবেন।

আমি স্যাডির ঘরের দিকে তাকালাম, ও হয়তো সুইনটন আর আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে। মেয়েটি আমার দৃষ্টি লক্ষ করে বললো, মিস বার্কও চলে গেছেন।

কোথায় ?

তা বলতে পারবো না, তবে যেরকম ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন তাতে এটুকু বলতে পারি যে যেখানেই যাবার কথা ইতোমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছেন। তারপর সে আমাকে একটা ছোট সবজান্তা নিচু ধরনের গোপন হাসি উপহার দিলো, অধস্তন কর্মচারীরা সচরাচর যেরকম করে, যার অর্থ আমি যা বলেছি তার চাইতে অনেক বেশি জানি। এরপর মেয়েটি তার সত্যি সুন্দর ভুট্টারঙের চুলের মধ্য থেকে সরে আসা একটা কেশগুচ্ছ গুঁজে দেবার জন্য তার গোলগোল লাল নখ বিশিষ্ট সাদা হাত উঁচু করে তুলে ধরলো। ফলে মিঃ বার্ডেনের পরিদর্শনের জন্য তার বুক একটু উত্তোলিত হলো। মেয়েটি তার যূথভ্রষ্ট কেশগুচ্ছটি চুলের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললো, যাবার সময় মিস বার্কের যে চেহারা দেখলাম তাতে যেখানেই তিনি যান না কেন তাকে দেখে ওরা খুব খুশি হবে বলে মনে হয় না। কথাটা বলে মেয়েটি মিষ্টি করে হাসলো, যার অর্থ সে নিজে যেখানেই যাক না কেন সবাই ভীষণ খুশি হবে।

আমি দপ্তরে ফিরে গিয়ে দুপুরের খাবার সময় পর্যন্ত কয়েকটা চিঠি ডিক্টেট করলাম। তারপর ক্যাপিটলের নিচতলার কাফেটেরিয়াতে গিয়ে একটা স্যান্ডউইচ খেলাম। সেখানে খাওয়া একটা হাস্যোজ্জ্বল, স্বাস্থ্যসম্মত, সুপরিচালিত, ঝকঝকে মার্বেলের মর্গে বসে খাওয়ার মতো। ওখানে দেখা হয়ে গেলো সুইনটনের সঙ্গে। তার সাথে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে, ওর কথা শুনে, আমি সিনেটে গেলাম। লাঞ্চের পর আবার সিনেটের অধিবেশন আছে। বিকেল চারটার দিকে একজন বার্তাবহ সেখানে আমার হাতে একটা চিরকুট দিলো। উপর থেকে মেসেজ দিয়েছে। চিরকুটে লেখা ছিলো ঃ মিস স্ট্যান্টন টেলিফোন করে আপনাকে এক্ষুণি তার এ্যাপার্টমেন্টে যেতে বলেছেন। খুব জরুরি।

আমি চিরকুটটা দুমড়ে নিচে ফেলে দিলাম। তারপর আমার কোট আর টুপির জন্য নিজের দপ্তরে গিয়ে ওদের বললাম মিস স্ট্যান্টনকে যেন জানিয়ে দেয় যে আমি রওনা হয়ে গেছি। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি যে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সকালের নির্মল হাল্কা রোদ এখন আর নেই।

টোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এতো দ্রুত এ্যান দরজা খুললো যে আমি বুঝলাম যে সে এতোক্ষণ দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু দরজা খোলার পর আমি যে–

মুখটি দেখলাম সেটা যে এ্যানের, ওকে ওখানে দেখবো আগে জানা না থাকলে আমি প্রথম দৃষ্টিতে সেটা বুঝতেই পারতাম না। সে মুখ সাদা, মরীয়া হয়ে ওঠা, বিধ্বস্ত। দেখলেই বোঝা যায় যে কেঁদেছে, এখন কান্নার ওপারে। এটাও বোঝা যায় যে তার কান্না ছিলো মন্থর, বিরল, যন্ত্রণাময়, দ্রুত অবদমিত।

সে তার দুহাত দিয়ে আমার বাহু আঁকড়ে ধরলো, নইলে যেন পড়ে যাবে। তারপর বললো, জ্যাক ! জ্যাক !

কি হয়েছে? আমি ধাক্কা দিয়ে দরজা বন্ধ করে জানতে চাইলাম।

ওকে খুঁজে বার করতেই হবে — ওকে তোমার খুঁজে বার করতেই হবে — ওকে খুঁজে বার করে তুমি বলো — এ্যান হি হি করে কাঁপতে শুরু করলো যেন ভীষণ শীত করছে তার।

কাকে খুঁজে বার করতে হবে?

তাকে তুমি বলো যে ব্যাপারটা মোটেই ওরকম নয় — ওরা যা বলেছে সেরকম নয় —

আঃ, কে কি বলেছে সেটা বলবে তো !

ওরা বলেছে আমার জন্যই নাকি — আমি যা করেছি সে জন্যই নাকি —

কারা বলেছে?

ওহ্, জ্যাক, তোমার ওকে খুঁজে বার করতেই হবে — ওকে তুমি বলো — আমার কাছে তুমি ওকে নিয়ে আসো, আর —

এবার আমি শক্ত করে ওর দু'কাঁধের উপর আমার হাত রেখে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, এই, স্থির হও ! তোমার আবোল-তাবোল বকুনি একটু থামাও। শান্ত হও আগে।

ও কথা বন্ধ করে আমার হাতের বন্ধনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলো, তাকালো আমার দিকে, ওর মুখ সাদা, বিবর্ণ। থরথর করে কেঁপে উঠলো সে। নিঃশ্বাস হয়ে উঠলো দ্রুত, অগভীর, শুষ্ক।

এক মিনিট পর আমি বললাম, এবার বলো কাকে আমার খুঁজে বার করতে হবে।

এ্যাডাম। এ্যাডামকে।

এখন বলো কেন তাকে খুঁজে বার করতে হবে। কি হয়েছে?

ও এখানে এসে আমাকে বলে যে সবকিছু নাকি আমার জন্যই হয়েছে। আমি যা করেছি সেই জন্য।

কি হয়েছে? তুমি কি করেছো যার জন্য কি হয়েছে?

আমার জন্যই নাকি সে চিকিৎসাকেন্দ্রের পরিচালক হয়েছে। তাই বললো ও। আমি যা করেছি তার জন্য। একথা বললো সে। আরো বললো — ওহ্, জ্যাক, ও বললো —

কি বললো ?

বললো যে বোনের বেশ্যাগিরির দালালি করার জন্য সে বেতন নিতে পারবে না — এই কথা সে বললো আমাকে — আমাকে — ওহ, জাক, আমি ওকে বলতে চেষ্টা করি — আসলে ব্যাপারটা যে কি — কিন্তু সে আমাকে ধাক্কা দেয় আর আমি মেঝেতে পড়ে যাই, তখন সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় — ওকে তোমার খুঁজে বার করতেই হবে, জ্যাক, — ওকে পেতেই হবে — ওকে —

এ্যান আবার একটানা বলতে শুরু করছিলো। আমি তাকে আবার আচ্ছা করে ঝাঁকুনি দিয়ে কড়া গলায় বললাম, থামো। একদম চুপ করো, নইলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আমি তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

ও শান্ত হলো, আমার বাহু আঁকড়ে প্রায় ঝুলে রইলো। তখন আমি বললাম, এবার গোড়া থেকে শুরু করে কি হয়েছে আমাকে ধীরে ধীরে বলো। আমি ওকে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে সেখানে বসিয়ে দিলাম, তারপর বললাম, এবার বলো, কিন্তু শান্তভাবে।

সে একটুক্ষণ মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো, যেন আরম্ভ করতে ভয় পাচ্ছে।

আমি বললাম, বলো আমাকে।

এ্যান আরম্ভ করলো। এ্যাডাম এখানে আসে। তখন প্রায় তিনটা বাজে। ও ঘরে ঢোকামাত্র আমি বুঝতে পারি যে সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে — ইতোমধ্যেই সেদিন আমার নিজস্ব ক্ষেত্রে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো, কিন্তু আমি বুঝলাম যে এবার আরেকটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে — ও আমার বাহু আঁকড়ে ধরে, একটি কথাও না বলে, এক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। আমি ওকে বারবার জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে, কিন্তু সে শুধু আমার বাহু জোরে, আরো জোরে, চেপে ধরলো।

জামার হাতা সরিয়ে এ্যান আমাকে তার বাঁ বাহুর উপর কালশিরার দাগ দেখালো।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম কি হয়েছে, ব্যাপার কি, আর তারপর সে হঠাৎ বলে উঠলো, ব্যাপার কি, ব্যাপার কি, তুমি তো জানো ব্যাপার কি।

এ্যাডাম বললো যে সে একটা টেলিফোন পায়, ফোনে একজন লোক —

একজন লোকই বললো সে, আর কিছু নয়, তাকে বলেছে — তাকে বলেছে আমার সম্পর্কে — আমার সম্পর্কে আর —

সে আর অগ্রসর হতে পারলো না।

তার হয়ে আমি কথাটা সম্পূর্ণ করলাম, বললাম, তোমার আর গভর্নর স্টার্কের সম্পর্কে।

সে মাথা নাড়লো।

ফিসফিস করে সে বললো, কী ভয়ঙ্কর! শব্দটা সে উচ্চারণ করলো আমাকে উদ্দেশ করে নয়, নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে। আবার বললো, কী ভয়ঙ্কর!

আমি আরেকবার তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, আঃ, থামো, বলো তারপর কি হলো।

সে ঘোরের মধ্য থেকে উঠে এসে আমার দিকে তাকালো, তারপর বললো, লোকটা আমার সম্পর্কে ওকে বলে, শুধু এই কারণেই ওকে পরিচালক বানানো হয়, আর এখন গভর্নর ওকে তার পরিচালকের পদ থেকে বরখাস্ত করবেন, কারণ সে একটা খারাপ অপারেশন করে তাঁর ছেলেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছে — তাছাড়া আমাকেও তিনি এবার ছুঁড়ে ফেলে দেবেন — টেলিফোনে লোকটা তাই বলে — এ্যাডাম তাঁর ছেলের যে অবস্থা করেছে সে জন্য — এ্যাডাম লোকটার ফোন পাবার পর সঙ্গে সঙ্গে এখানে ছুটে আসে, কারণ সে কথাটা বিশ্বাস করেছে, আমার সম্পর্কে কথাটা সে বিশ্বাস করেছে —

আমি হিংস্রভাবে বললাম, তা তোমার সম্পর্কে কথাটা তো সত্য, তাই না?

হাতের একটা উদভ্রান্ত ভঙ্গি করে এ্যান বললো, আমাকে ওর জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলো। বিশ্বাস করার আগে আমাকে ওর জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলো।

আমি বললাম, ও তো জড়বুদ্ধি হাবা নয়। বিশ্বাস হবার জন্য ব্যাপারটা তৈরি হয়েই ছিলো। তোমার খুবই সৌভাগ্য যে বহুদিন আগেই সে এটা অনুমান করে নি, কারণ —

সে সজোরে আমার হাত আঁকড়ে ধরলো, তার আঙ্গুল শক্ত হয়ে আমার বাহুতে বসে গেলো, সে তীব্র কণ্ঠে বললো, চুপ! চুপ! কক্ষণো একথা বলবে না তুমি — কারণ ব্যাপারটা মোটেই ওরকম ছিলো না — এ্যাডাম যেভাবে বলেছে মোটেই সেরকম নয় — ওহ, সে সাংঘাতিক সব কথা বলেছে আমার সম্পর্কে — কী অসম্ভব খারাপ কথা যে বলেছে — সে বলেছে যে আর সব কিছুই যদি এত কুৎসিৎ আর কদর্য হয় তাহলে, তাহলে, কেন মানুষ — ওহ, ব্যাপারটা আমি ওকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম — সে যে রকম ভেবেছে মোটেই যে সেরকম কিছু নয় —

কিন্তু ও আমাকে এমন জোরে ধাক্কা দেয় যে আমি পড়ে যাই আর সে বলে যে সে তার বোনের বেশ্যাগিরির দালালি করবে না, কেউ তার সম্পর্কে সে কথা বলতে পারবে না — আর তারপর সে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। তোমার ওকে পেতেই হবে, জ্যাক। ওকে খুঁজে বার করে বলো। ওকে তুমি বলে দাও, জ্যাক।

কি বলবো?

বলবে যে ও যেরকম করে বলেছে ব্যাপারটা সেরকম নয়। ওকে তোমার এটা বলতেই হবে। আমি যা কিছু করেছি তা কেন করেছি, যা সব ঘটেছে তা কেন ঘটেছে, তার কারণ তো তুমি জানো। ওহ্, জ্যাক — সে আমার জামার হাত আঁকড়ে ধরে বললো, ব্যাপারটা মোটেই ওরকম ছিলো না। ওরকম ভীষণ কিছু ছিলো না। আমি চেষ্টা করেছি যেন ভীষণ কিছু, ভয়ঙ্কর কিছু না হয়ে উঠি। আমি ওরকম হই নি, তাই না, জ্যাক? বলো, জ্যাক।

আমি মুখ নিচু করে ওকে দেখলাম, বললাম, না, তুমি ভীষণ হও নি।

কিন্তু ব্যাপারটা তো ঘটেছে। আমার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। আর এখন ও চলে গেছে।

আমি তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, যাবার জন্য তৈরি হয়ে বললাম, আমি ওকে খুঁজে বার করবো।

তাতে কোনো লাভ হবে না।

আমার কথা ও শুনবে।

ওহ্, আমি এ্যাডামের কথা ভাবছিলাম না। আমি —

স্টার্ক?

সে মাথা নাড়লো, তারপর বললো, হ্যাঁ। আমি ওখানে গিয়েছিলাম, শহরের বাইরে যেখানে আমরা মিলিত হতাম, সেখানে। আমাকে ফোন করে বলেছিলো যেতে। আমি যাই, তখন সে আমাকে বলে। ও তার স্ত্রীর কাছে ফিরে যাচ্ছে।

আমি একটা শপথবাক্য উচ্চারণ করলাম। তারপর আত্মসংবরণ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম, বললাম, আমি এ্যাডামকে খুঁজে বার করবো।

সে বললো, করো, খুঁজে বার করো ওকে। ও ছাড়া এখন আমার আর কেউ নেই।

এ্যাপার্টমেন্ট ভবনের দরজা দিয়ে বাইরে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে আসতে আসতে আমি ভাবলাম, ওর জ্যাক বার্ডেনও আছে। অন্ততঃ একজন আজ্ঞাবহ মানুষ হিসাবে। তবে ওই ভাবনার মধ্যে কোনো তিক্ততা ছিলো না। নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই আমার ওকথা মনে পড়ে।

কোনো শহরে পুলিশের সহায়তা ছাড়া কাউকে খুঁজে বার করা একটা কঠিন

কাজ। আমার সাংবাদিকতার জীবনে অনেকবার আমাকে সে চেষ্টা করতে হয়েছে। এর জন্য ভাগ্য এবং সময় লাগে। তবে একটা নিয়ম হলো সুস্পষ্ট এবং স্বাভাবিক জায়গায় সর্বাগ্রে খোঁজ করা। অতএব আমি এ্যাডামের এ্যাপার্টমেন্টে গেলাম। বাড়ির সামনে ওর গাড়ি দেখে ভাবলাম আমার ভাগ্য বোধহয় হয় প্রসন্ন। আমার গাড়িটা দাঁড় করাবার সময় আমি লক্ষ করলাম যে এ্যাডামের গাড়ির চালকের দিকের দরজাটা হাট করে খোলা, পাশ দিয়ে কোনো ট্রাক যাবার সময় ধাক্কা দিতে পারে, আর নিশ্চিতভাবেই আসনটা বৃষ্টির জলে ভিজে যাচ্ছে। আমি পাশ দিয়ে যাবার সময় দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে এ্যাপার্টমেন্টের দালানে প্রবেশ করলাম।

ওর দরজায় আমি জোরে জোরে ধাক্কা দিলাম। কোনো জবাব নেই। কিন্তু তাতে কিছুই বোঝা যায় না। এ্যাডাম ঘরে থাকলেও সে হয়তো, বর্তমান পরিস্থিতিতে, কারো সঙ্গে দেখা করতে চায় না। অতএব আমি দরজার হাতল ঘোরালাম। না, তালা দিয়ে বন্ধ করা। আমি তখন নিচে নেমে এসে নিগ্রো দারোয়ানকে খুঁজে বার করে ওকে একটা আষাঢ়ে গল্প শোনালাম। আমার একটা জিনিস এ্যাডামের বাসায় ফেলে গেছি, সেটা নিতে এসেছি। লোকটা আমাকে এ্যাডামের সঙ্গে বহুবার দেখেছে, কাজেই ও ঢোকার ব্যবস্থা করে দিলো। আমি ঘুরে ঘুরে সর্বত্র খুঁজলাম কিন্তু এ্যাডাম কোথাও নেই। এক সময় ওর টেলিফোনের উপর আমার চোখ পড়লো। আমি ওর অফিসে ফোন করলাম, তারপর হাসপাতালে, তারপর মেডিক্যাল স্কুলের দপ্তরে, তারপর নিজেদের অভ্যস্ত জায়গাগুলিতে, ডাক্তারদের না পাওয়া গেলে যেখানে তাদের পাওয়া যাবে তার ফোন নম্বর যে এক্সচেঞ্জে দিয়ে রাখে সেই এক্সচেঞ্জেও ফোন করলাম। কিন্তু কোথাও এ্যাডামের হদিস মিললো না। কেউ এ্যাডামের কোনো খবর জানে না। কিংবা বলা যায়, এ্যাডামকে কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে প্রত্যেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো, কিন্তু সেই সব ধারণা একেবারেই সঠিক প্রমাণিত হলো না। তার মানে বিশাল এই শহরের যে কোনো জায়গায় সে থাকতে পারে।

আমি আবার পথে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু ওর গাড়ি এখানে কেন? ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হলো আমার কাছে। গাড়িটা এখানে ফেলে গেছে ও। একটা লোক দিনের এই সময়ে বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হেঁটে কোথায় যেতে পারে? রাত্রিতেই বা কোথায় যেতে পারে — কারণ এতক্ষণে সন্ধ্যা নেমেছিলো। আমার পানশালাগুলির কথা মনে পড়লো, কারণ এসব ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বলে যে, একটা মানুষ প্রচণ্ড কোনো শক্ পাবার পর সোজা কোনো পানশালায় চলে যায়, পর পর পাঁচ পাত্র হুইস্কির অর্ডার দেয়, তার উল্টো-দিকের আয়নায় বিবর্ণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটির দিকে শূন্য

দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে একের পর এক পাঁচ গ্লাস সুরাই নিঃশেষে পান করে, আর তারপর সুরা সরবরাহকারী পরিচারকটির সঙ্গে জীবন নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক আলোচনায় লিপ্ত হয়। কিন্তু এ্যাডাম স্ট্যান্টন এরকম করবে বলে আমার মনে হলো না। তবু পানশালাগুলিতে গেলাম আমি।

মানে, অনেকগুলিতে গেলাম। আমাদের এই শহরে এত বিপুলসংখ্যক পানশালা আছে যে পুরো এক জীবনেও সবগুলি ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। আমি প্রথমে স্লেডের ওখানে গেলাম, কপাল খুললো না সেখানে, স্লেডকে বললাম ডঃ স্ট্যান্টন এলে তাকে যেন আটকে রাখে। তারপর একে একে অন্য জায়গাগুলিতে গেলাম ঃ ক্রোমিয়াম, কাঁচের ইট, রঙীন আলো, প্রাচীন বিলাতি ওক কাঠ, দেয়ালে দেয়ালে কমিক ফ্রেস্কো, খেলাধুলা আর শিকারের ছবি, কিংবা তিনজনের অর্কেস্ট্রা দলে সুসজ্জিত সব পানশালা। না, এ্যাডাম কোথাও নেই। সাড়ে সাতটার দিকে এ্যাডামের দপ্তরে ফোন করলাম, তারপর আবার হাসপাতালে। দু'জায়গার এক জায়গাতেও সে নেই। হাসপাতাল থেকে যখন বললো যে এ্যাডাম সেখানে নেই তখন আমি ওদের জানালাম যে আমি গভর্নর স্টার্কের পক্ষ থেকে কথা বলছি, তাঁর ছেলে ওখানে ডঃ স্ট্যান্টনের চিকিৎসাধীন রয়েছে, ওরা কি একটু ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখবে? ওরা জানালো যে সাতটার বেশ আগেই ডঃ স্ট্যান্টনের হাসপাতালে আসার কথা ছিলো, কয়েকটা এক্স-রে প্লেট নিয়ে আরেকজন ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁর এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিলো, কিন্তু তিনি এখনো আসেন নি। তাঁর দপ্তরে কিংবা তাঁর বাসায় কোথাও ওরা তাঁর খোঁজ পায় নি। আমি কি কোনো মেসেজ দেবো? ডঃ স্ট্যান্টন এলেই ওরা তাঁকে সেটা দিয়ে দেবে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ডঃ স্ট্যান্টন যেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, খুব জরুরি। আমি কোথায় থাকবো সে খবর আমি আমার হোটেলে দিয়ে রাখবো।

হোটেলে ফিরে আমি কফি শপে কিছু খেয়ে নিলাম, ডেস্কে বলে রাখলাম আমার কোনো ফোন এলে লোক পাঠিয়ে যেন আমাকে খবর দেয়া হয়, আমি হোটেলেই কোথাও না কোথাও থাকবো। কিন্তু কোনো ফোন এলো না। বিকালের খবরের কাগজগুলি হাতে নিয়ে আমি অলস পায়ে লবিতে গিয়ে বসলাম। ক্রনিকল-এ একটা দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রশাসনের ট্যাক্স বিল রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করে দেবে, এই অঙ্গনের সকল উদ্যোগ ও তৎপরতা ব্যাহত করবে। সিনেটে যে সামান্য সংখ্যক সদস্য সরকারের আনা এই বিলের বিরোধিতা করছেন তাঁদের সাহস ও সুবিবেচনার প্রশংসা করা হয় ওই সম্পাদকীয়তে। সম্পাদকীয়ের উল্টোদিকে একটা কার্টুন ছাপা হয়েছে। তাতে কর্তাকে দেখা যাচ্ছে,

বরং একটা মূর্তি দেখা যাচ্ছে, মাথাটা কর্তার মাথা, ফুলে ওঠা মোটা পেট, বাস্টার ব্রাউন স্যুট পরনে, বিশাল লোমশ জানুর উপরে ছোট প্যান্ট চেপে বসেছে। ওই দানবমূর্তি তার একটি হাঁটুর উপর মস্ত বড়ো একটা পুডিং নিয়ে বসে আছে, পুডিং-এর উপর দিকে গর্ত করে সে তার ভেতর থেকে আঁকুপাঁকু করা একটা ছোট্ট প্রাণী এইমাত্র টেনে তুলে এনেছে। পুডিং-এর গায়ে লেবেল লাগানো রয়েছে ঃ দি স্টেট, আর আঁকুপাঁকু করা ছোট্ট প্রাণীটির গায়ে লেবেল সাঁটা রয়েছে ঃ কঠোর পরিশ্রম করা নাগরিক। কর্তার মাথাওয়ালা মূর্তির মুখ থেকে বেলুনের মতো শব্দের ফুলঝুরি বেরিয়ে আসছে, কমিকস্ট্রিপের শিল্পীরা তাদের চরিত্রের মুখে যেভাবে কথা বসায় সেই ভাবে, এখন এখানে লেখা আছে ঃ ওহ্, আমি কী ভালো ছেলে! কার্টুনের নিচে ক্যাপশন দিয়েছে ঃ লিটল জ্যাক হর্নার।

আমি সম্পাদকীয়টা শেষ পর্যন্ত পড়লাম। তার বক্তব্য হলো আমাদের রাজ্য একটা দরিদ্র রাজ্য, জবরদস্তি করে তার উপর এই রকম বোঝা চাপিয়ে দিলে সে বোঝার ভার বহন করা তার সাধ্যাতীত। এ অবশ্য পুরনো গৎ। যখনই কর্তা এই জাতীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন — আয়কর, ধাতু-উত্তোলনকর, সুরাকর — প্রতিবারই এই একই কথা বলা হয়েছে। টাকার থলিতে হাত লাগলে বড়ো কষ্ট হয়। মানুষ বাবার মৃত্যুশোকও ভুলে যেতে পারে কিন্তু টাকার উপর টান পড়লে সেটা ভুলতে পারে না। তখন তার মুখ দিয়ে অনেক কথা বেরিয়ে আসে।

বিরোধী দল সব সময় চিৎকার করে বলেছে, এটা একটা দরিদ্র স্টেট। কিন্তু কর্তা বলেছেন অন্য কথা। তিনি বলেছেন, এই রাজ্যে বহু গরীব মানুষ বাস করে, হ্যাঁ, সেটা সত্য, কিন্তু এই রাজ্য দরিদ্র রাজ্য নয়। প্রশ্নটা হলো, খাবার যখন পরিবেশন করা হয় তখন কারা তার সিংহভাগ সাবাড় করে? আমি এই ব্যবস্থাটা বদলে দিতে চাই। বঞ্চিত ও ক্ষুধার্ত মানুষ যেন কিছু খাবার পায় আমি সেটা দেখতে চাই।

কর্তা সামনের জনতার দিকে ঝুঁকে দাঁড়াতেন, কপালের উপর তাঁর চুলের গুচ্ছ ঝুলে পড়তো, তাঁর চোখ বিস্ফারিত হতো, তিনি তাঁর ডান হাত উঁচু করে জনতা আর উত্তপ্ত আকাশকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, কি, তোমরা কি আমার সঙ্গে আছো? তোমরা কি বুঝতে পারছো আমার কথা? আর জনতা তখন গর্জে উঠেছে।

বিরোধী দল সব সময় চিৎকার করে বলেছে, ঘুষের জন্য আরো টাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। আর কর্তা, তাঁর শিথিল ভঙ্গিতে সহজভাবে বলেছেন, নিশ্চয়, কিছু ঘুষ তো আছেই, কিন্তু ততোটুকুই, যতোটুকু না হলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ছাড়া চাকাগুলি ঘোরানো যায় না। একটা কথা মনে রেখো। মানুষ এমন কোনো যন্ত্র এখনো

আবিষ্কার করতে পারে নি যার মধ্যে খানিকটা এনার্জি লস্ নেই, কিছু পরিমাণ শক্তির অপচয় নেই। এক চাঙ্গড় কয়লা দিয়ে তুমি যখন একটা বাষ্পীয় ডাইনামো কিংবা একটা রেলগাড়ি চালাও তখন সেই কয়লার চাঙ্গড়ের ভেতরের মোট শক্তির কতোটুকু তুমি সত্যি সত্যি পাও? খুবই সামান্য। তো, এযাবৎ আবিষ্কৃত সর্বোত্তম ডাইনামো কিংবা রেলগাড়ির চাইতে অনেক বেশি ভালো ফল পাচ্ছি আমরা। আমার চারপাশে কিছু লুটেরা–বদমাশ আছে আমি জানি। কিন্তু লুটপাট বা বদমায়েশী খুব বেশি মাত্রায় করবার মতো সাহস তাদের নেই। আমার কড়া নজর রয়েছে তাদের উপর। আর রাজ্যের কিছু উপকার, কিছু ভালাই, কি আমি করছি না? অবশ্যই করছি।

আপনি বলতে পারতেন, এটা হলো ঐতিহাসিক মূল্য দেয়ার প্রশ্ন। সব পরিবর্তনেরই একটা মূল্য আছে। লাভের অংশ থেকে মূল্যটা বাদ দিতে হয়। আমাদের এই রাজ্যে, হয়তো, পরিবর্তন যেভাবে আসছিলো শুধু সেভাবেই আসতে পারতো। আর পরিবর্তন যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আপনি বলতে পারতেন, এটা হলো ইতিহাসের নৈতিক নিরপেক্ষতার তত্ত্ব। একটা প্রক্রিয়া, প্রক্রিয়া হিসাবে, নৈতিক দিক থেকে ভালোও নয়, মন্দও নয়। আমরা ফলের বিচার করতে পারি, কিন্তু প্রক্রিয়ার নয়। নৈতিক দিক থেকে একজন খারাপ কর্মী এমন কাজ করতে পারে যেটা ভালো। নৈতিক দিক থেকে একজন ভালো কর্মী এমন কাজ করতে পারে যার ফল খারাপ। হয়তো ভালো কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে মানুষকে তার আত্মা বিক্রি করতে হয়।

ঐতিহাসিক মূল্যের তত্ত্ব। ইতিহাসের নৈতিক নিরপেক্ষতার তত্ত্ব। এসব হলো শীতল পর্বতচূড়া থেকে উচ্চ ঐতিহাসিক দৃশ্য অবলোকন। হয়তো প্রতিভাই শুধু ওই দৃশ্য দেখতে পায়। যথার্থভাবে দেখতে পায়। হয়তো আপনাকে প্রথমে উচ্চ পর্বতচূড়ায় শৃঙ্খলিত থাকতে হবে, শকুনিরা এসে আপনার যকৃত ও চোখ ঠুকরে ঠুকরে তুলে নেবে, শুধু তখনই আপনি ওই দৃশ্য দেখতে সক্ষম হবেন। হয়তো একটা প্রতিভাই শুধু ওই দৃশ্য দেখতে পায়। হয়তো সেটা দেখে কাজ করতে হলে একজনকে বীর নায়ক হতে হবে।

কিন্তু লবিতে বসে, যে ফোন এলো না সেই ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে, আমি ওই সব চিন্তাভাবনাকে অব্যাহতি দিতে রাজি হলাম। আমি ফিরে গেলাম সম্পাদকীয়টিতে। ওই সম্পাদকীয় একটা ছায়া–মুষ্টিযুদ্ধ মাত্র। ছায়ামুষ্টিযুদ্ধ, কারণ খুব সম্ভব এই মুহূর্তেই ক্যাপিটলে ভোট গোনা শুরু হয়ে গেছে। ম্যাকমারফির সমর্থকদের বক্তৃতাবাজির পর এখন হয়তো ভোট চলছে, আর সেই ভোটের

ফলাফল বদলে দিতে হলে এখান থেকে ডানায় ভর করা উড্ডীন বাহিনীর দরকার হবে।

ন'টার দিকে হোটেলের বেয়ারা খোঁজ করে আমাকে বার করলো কিন্তু এ্যাডামের ফোন নয়। ক্যাপিটল থেকে ফোন এসেছে। কর্তা খবর দিয়েছেন আমি যেন সেখানে যাই। আমি হোটেল ডেস্কে বলে রাখলাম ডঃ স্ট্যান্টন ফোন করলে তাঁকে যেন জানানো হয় যে আমি ক্যাপিটলে গেছি, সেখানে সুইচবোর্ডে আমি বলে রাখবো, ওরা আমাকে ডেকে দেবে। তারপর আমি এ্যানকে খবরটা দিলাম, বরং বলা উচিত, অ-খবরটা দিলাম, অর্থাৎ আমার প্রয়াস যে সফল হয় নি সেটা জানালাম। তার কণ্ঠস্বর শোনালো শান্ত এবং ক্লান্ত। এরপর আমি আমার গাড়ির কাছে গেলাম। ইতোমধ্যে আবার বৃষ্টি হয়েছিলো, কারণ রাস্তার পাশের নর্দমা দিয়ে গলগল করে কালো জলস্রোত ছুটে চলেছে, রাস্তার আলোয় সেই জল তেলের মতো চিকচিক করছে। কিন্তু এখন বৃষ্টি ধরে গেছে।

ক্যাপিটল প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেখলাম যে সমস্ত জায়গাটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। তবে এতে বিস্ময়ের কিছু ছিলো না, অত রাতেও, কারণ তখন আইনসভার অধিবেশন চলছিলো। আমি ভেতরে ঢুকে দেখলাম বেশ লোকজনের ভীড় সেখানে। রাজনীতিবিদ ও আইনসভার সদস্যরা রাতের মতো তাঁদের কাজ শেষ করে এনেছেন। করিডরে এখনো অনেকে জটলা করে আলাপ করছেন, প্রধানতঃ থুতু ফেলার বিশালাকার তামার পাত্রগুলির চারপাশ ঘিরে। তারা ছাড়াও অন্যান্য লোকজন রয়েছে। সাংবাদিক, সাধারণ দর্শক, সেই সব লোক, যারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটার সময় ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকার অনুভূতি পেতে ভালোবাসেন।

আমি ভীড় ঠেলে কর্তার দপ্তরে গিয়ে পৌঁছুলাম। সেখানে ওরা জানালো যে তিনি একজনকে সঙ্গে নিয়ে সিনেট কক্ষে গেছেন।

দপ্তরের মেয়েটিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ট্যাক্স বিল পাশ করাতে কোনো অসুবিধা হয় নি তো?

মেয়েটি জবাব দিলো, বোকার মতো প্রশ্ন করো না।

আমি ওকে বলতে শুরু করেছিলাম যে ও যখন দোলনায় শুয়ে আঙ্গুল চুষছে সেই সময় থেকে আমি এসব ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললাম না। তার বদলে, এ্যাডাম আমাকে ফোন করলে কি করতে হবে সেই নির্দেশ দিয়ে, আমি সিনেটে চলে গেলাম।

প্রথমে আমি কর্তাকে দেখতে পাই নি। তারপর দেখলাম। তিনি একপাশে

দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে দু'জন সিনেটর আর ক্যালভিন স্পার্লিং আর একটু পেছনে, খানিকটা দূরত্বে, আরো কয়েকজন লোক, পরগাছা জাতীয় মানুষ, যারা মহত্ত্বের উত্তাপে তাদের হাত উষ্ণ করে নিচ্ছিলো। কর্তার অন্যপাশে আমি সুগার-বয়কে দেখলাম, অলস ভঙ্গিতে মার্বেলের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে চিনির ডেলা, চুষতে থাকার দরুণ গালদুটি ঈষৎ চুপসে আছে, এই মুহূর্তে চিনির ডেলাটি নিশ্চয়ই গলে গিয়ে অনির্বচনীয় সুধা হয়ে তার কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। কর্তা পেছনে দু'হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মাথা সামনের দিকে ঈষৎ ঝোঁকানো। একজন সিনেটর তাঁকে কি যেন বলছে, তিনি মন দিয়ে তার কথা শুনছেন।

আমি ওদের কাছে গিয়ে একটু পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই কর্তার চোখের উপর আমার চোখ পড়লো, আমি বুঝলাম যে তিনি আমাকে দেখতে পেয়েছেন। তখন আমি সুগার-বয়ের কাছে সরে গিয় তাকে 'হ্যালো' বললাম।

কয়েকবার চেষ্টার পর সে আমার সম্ভাষণের উত্তর দিলো, তারপরই সে তার চিনির ডেলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমিও তার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

চার-পাঁচ মিনিট কেটে গেলো। কর্তা তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে, মাথা সামনের দিকে হেলিয়ে, সিনেটরের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি এই রকম, একটিও কথা না বলে, অনেকক্ষণ মানুষের কথা শুনে যেতে পারতেন, লোকটিকে সুযোগ দিতেন তার ভেতরে যা আছে সব উজাড় করে ঢেলে দেবার জন্য। লোকটার ঝুড়ির তলায় কি আছে সেটা তিনি দেখতে চান। তারপর এক সময় আমি টের পেতাম যে তাঁর ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। লোকটার ঝুড়ির তলায় যা আছে কিংবা কিছুই যে নেই তা তাঁর জানা হয়ে গেছে। এবারও আমি বুঝলাম যে তাঁর ধৈর্য শেষ হয়েছে, যা জানবার তা তাঁর জানা হয়ে গেছে, কারণ আমি হঠাৎ তাঁকে মাথা উঁচু করে সোজা লোকটির চোখের দিকে তাকাতে দেখলাম। এইটেই সঙ্কেত। আমি আর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম না। আমি বুঝতে পারি যে কর্তা এবার যাবার জন্য তৈরি।

তিনি লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, না, এ চলবে না। কথাটা বললেন তিনি বেশ অমায়িক ভঙ্গিতে, উঁচু গলায়, আমিও স্পষ্ট শুনতে পেলাম। লোকটি কিন্তু এতক্ষণ নিচু গলায় কথা বলছিলো, আর খুব তাড়াতাড়ি।

কর্তা আমার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, জ্যাক।

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম।

তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, চলো, উপরে যাওয়া যাক। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

চলুন, বলে আমি দরজার দিকে অগ্রসর হলাম।

কর্তা ওই লোকগুলিকে ফেলে রেখে আমাকে অনুসরণ করে দরজার কাছে আমাকে ধরে ফেললেন। সুগার-বয় তাঁর অন্য পাশে, একটু পেছনে, অবস্থান নিলো।

আমি কর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম ছেলে কেমন আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয় মনে করি। প্রশ্নটা তো হতো কতখানি খারাপ, তা সেকথা জিজ্ঞাসা করার কোনো অর্থ হয় না। অতএব আমরা করিডরের মধ্য দিয়ে বড়ো লবির দিকে এগিয়ে গেলাম। উপরে ওঁর অফিসে যাবার লিফট নেবো সেখান থেকে। করিডরে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন কর্তাকে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলো, কয়েকজন বললো, হাই, বস্, কিন্তু কর্তা তাদের সম্ভাষণের উত্তরে শুধু একটু মাথা নিচু করলেন। অন্যরা কিছুই বললো না, শুধু মাথা ঘুরিয়ে তাঁকে পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখলো। এর মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু ছিলো না। এই করিডর দিয়ে তিনি অন্ততঃ হাজার বার এই ভাবে হেঁটে গেছেন, কেউ কেউ তাঁকে গলা উঁচু করে সম্ভাষণ করেছে, কেউ কেউ চুপ করে থেকে শুধু চোখ মেলে ঝকঝকে মার্বেলের উপর দিয়ে তাঁর চলে যাওয়া লক্ষ করেছে।

আমরা ঠিক গম্বুজের তলায় বড়ো লবিতে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে স্তম্ভের নিচের দিকে রাজনীতিবিদ্‌দের মর্যাদা নিয়ে দণ্ডায়মান মর্মর মূর্তিগুলির গায়ে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছিলো। আমরা পূর্ব দেয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সেখানে একটু ঢোকানো জায়গায় লিফটগুলি আছে। আমরা যখন জেনারেল মোফাটের মূর্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম (তিনি ছিলেন খুব সাহসী একজন যোদ্ধা, ভূ-সম্পত্তির কেনা-বেচায় বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত, এই স্টেটের প্রথম গভর্নর) তখন আমি লক্ষ করি যে একটি লোক স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটি এ্যাডাম স্ট্যান্টন। তার কাপড়জামা ভিজে জবজব করছে, প্যান্ট প্রায় হাঁটু পর্যন্ত মাটি-কাদায় মাখামাখি। পরিত্যক্ত গাড়ির ব্যাপারটা এখন বোঝা গেলো। গাড়ি ওখানে ফেলে রেখে সে বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়েছিলো।

আমি যখন ওকে দেখলাম ঠিক সেই মুহূর্তেই সেও আমাদের দিকে তাকালো। কিন্তু তার দৃষ্টি কর্তার উপর, আমার উপর নয়। আমি ডাকলাম, এ্যাডাম, এ্যাডাম!

সে আমাদের দিকে এক পা এগিয়ে এলো কিন্তু তখনো সে আমার দিকে তাকাচ্ছে না।

তারপরই কর্তা এ্যাডামের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে করমর্দনের উদ্দেশ্যে তার দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কেমন আছো, ডাক্তার?

এক মুহূর্তের জন্য এ্যাডাম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, যেন সে অগ্রসরমান লোকটির হাতে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, কিন্তু পর মুহূর্তেই সে তার হাত বাড়িয়ে দিলো, আর আমি গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললাম, আহ্, ও তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছে, ও এখন তাহলে ঠিক হয়ে গেছে, ঠিক হয়ে গেছে ও!

কিন্তু তারপরই ওর হাতের জিনিসটা আমার চোখে পড়লো। আমি চিনলাম জিনিসটা, কিন্তু আমার মননে ও স্নায়ুতে তার তাৎপর্য ধরা পড়বার আগেই আমি অস্ত্রটির মুখ দিয়ে দুটি হালকা গোলাপী ছোট্ট শিখা বিদ্যুতের মতো পর পর বেরিয়ে আসতে দেখলাম।

আমি গুলীর শব্দ শুনতে পাই নি, কারণ আমার বাঁ দিক থেকে পর পর অতি দ্রুত আরো জোরালো কয়েকটা গুলীর শব্দের নিচে প্রথম শব্দটি হারিয়ে যায়, অন্য শব্দগুলির মধ্যে মিশে যায়। এ্যাডাম টলমল করে এক পা পিছিয়ে গেলো, তখনো তার ডান হাত সামনে মেলা, সে তার তিরস্কার-ভরা প্রেতের মতো চোখ দিয়ে আমাকে স্থির দৃষ্টিতে দেখলো, তারপরই আবার গুলীর শব্দ হলো, আর সে চরকির মতো পাক খেয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

অবিশ্বাস্য নৈঃশব্দের মধ্যে আমি লুটিয়ে পড়া এ্যাডামের দিকে ছুটে গেলাম। তারপরই আমি শুনলাম লবির কোনো একখান থেকে এক মহিলা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছে, বহু মানুষ ছোটাছুটি করছে, চেঁচামেচি করছে। এ্যাডামের শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার বুক গুলীতে গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মরে গেছে এ্যাডাম।

আমি চোখ তুলে দেখলাম সুগার-বয় ধূমায়মান পিস্তল হাতে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকে লিফটের কাছেও আমি একজন হাইওয়ে পেট্রলম্যানকে পিস্তল হাতে দেখলাম।

কিন্তু কর্তাকে দেখলাম না। আহ্, তাহলে ওঁর গায়ে গুলী লাগে নি!

কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম আমি। কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি দেখলাম সুগার-বয় মার্বেলের মেঝের উপর সশব্দে তার হাতের পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে, একটা রুদ্ধশ্বাস জান্তব শব্দ করে, জেনারেল মোফাটের মর্মর মূর্তির ওপাশে ছুটে যাচ্ছে।

আমি এ্যাডামের মাথা মার্বেলের মেঝেতে নামিয়ে মূর্তির ওপাশে এগিয়ে গেলাম। লোকজন এখন ওই জায়গার চারপাশে ভীড় করতে আরম্ভ করেছিলো। আমাকে তাদের ঠেলে সরাতে হলো। কে একজন চিৎকার করে বলছিলো, সরে যান

আপনারা, সরে যান, বাত্যস আসতে দিন! কিন্তু লোকের পর লোক ওদিকে ছুটে আসছিলো, লবির চারপাশ থেকে, করিডর থেকে।

আমি যখন কোনোরকমে ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে তাঁর কাছে পৌছুলাম তখন দেখি যে তিনি মেঝের উপর বসে আছেন, ঘন ঘন ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। বুকের নিচে, মাঝের দিকে, দুহাত দিয়ে শরীরটা চেপে ধরে রেখেছেন। গায়ে গুলী লাগার কোনো চিহ্ন আমার চোখে পড়লো না। কিন্তু তারপরই তাঁর দু'আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে আমি খুব সামান্য একটু রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখলাম। খুবই অল্প পরিমাণে।

সুগার-বয় তাঁর উপর ঝুঁকে পড়েছে, তার মুখচোখ অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছে, তোৎলাচ্ছে সে। শেষ পর্যন্ত সে কোনোরকমে বললো, কর্তা — খু . . . খু . . . খুউব কি ব্যথা করছে — খু . . . খু . . . খুউব ব্য . . . .ব্য. . . ব্যথা করছে কি?

গম্বুজের নিচে ওই লবিতে কর্তা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নি। বস্তুতঃপক্ষে, এর পর বেশ কিছু সময় তিনি বেঁচেছিলেন আর তাঁর মৃত্যু ঘটে পরিষ্কার, সাদা, জীবাণুমুক্ত শয্যায়, বিজ্ঞানের যাবতীয় আশীর্বাদ নিয়ে। দু'দিন ধরে বলা হয় যে তিনি মারা যাবেন না। তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁর দেহে দুটি ছোট .২৫ ক্যালিবার গুলী ঢুকেছে। ছোট খেলনা জাতীয় টার্গেট পিস্তলের গুলী। ছেলেবেলা থেকে এ্যাডাম ওই পিস্তল দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে। ওই গুলী কর্তার দেহে ঢুকেছে, কিন্তু অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। আর তিনি খুব মজবুত শরীরের মানুষ।

অতএব আবার ফুলের টব, জলরঙের ছবি আর ঘরোয়া চুল্লীতে কৃত্রিম কাষ্ঠখণ্ড শোভিত ওয়েটিংরুমে বসে থাকার পালা নতুন করে শুরু হলো। অস্ত্রোপচারের দিন সকালে লুসি স্টার্কের সঙ্গে লুসির এক বোন এসে উপস্থিত হলেন। বসের বাবা, ওল্ডম্যান স্টার্ক, ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছেন, তাঁর পক্ষে মেসন সিটি থেকে আসা সম্ভব হয় নি। দেখলেই বোঝা যায় যে লুসির বোন লুসির চাইতে বয়সে বেশ বড়ো। পরনে গ্রামাঞ্চলের কালো পোশাক, পায়ে উঁচু ফিতা বাঁধা কালো জুতো, দৃঢ়চিত্ত মহিলা, জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন, কারো বিপদের সময়ে সাহায্য করতে পারদর্শী। তার চৌকো করে কাটা নখ আর ঈষৎ রক্তাভ, চৌকোমতো, রুক্ষ চামড়ার হাতের দিকে তাকিয়ে আপনি বুঝতে পারতেন যে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা কি করে করতে হয় তা তিনি জানেন। তিনি যখন হাসপাতালের ওয়েটিংরুমে ঢুকে, ঠিক তাচ্ছিল্যভরা নয় কিন্তু অভ্যস্ত সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে, ঘরের ফুলের পট আর কত্রিম কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে

নিলেন, তখন মনে হলো একজন পাইলট পাইলট-হাউসে উঠে এসেছেন, এবার তাঁর কর্তৃত্বভার হাতে তুলে নেবেন।

ফুলের নক্শা আঁকা কাপড়ে ঢাকা কোমল আসনে নয়, অন্য একটি চেয়ারে ঋজু ও শক্ত হয়ে বসলেন তিনি, কোনোরকম আবেগকে উচ্ছ্বসিত হয়ে চল্কে পড়তে দেবেন না তিনি, একটা অচেনা ঘরে নয়, দিনের এই সময়ে নয়, যে সময় প্রতিদিন তাকে সকালের নাশতা বানিয়ে টেবিলে দিতে হয়, ছেলেমেয়েদের তৈরি করতে হয়, পুরুষদের বাইরে কাজে পাঠাতে হয়। পরে যথার্থ স্থান ও কাল পাওয়া যাবে। আগে এসব শেষ হোক, তারপর তিনি লুসিকে বাড়ি নিয়ে যাবেন, ঘরের পর্দা টেনে তিনি তাকে বিছানায় শুইয়ে দেবেন, সির্কায় ভেজানো কাপড়ের পট্টি বসিয়ে দেবেন তার কপালে, তার খাটের পাশে বসে তার হাত ধরে বলবেন, এবার কাঁদতে চাইলে কাঁদো, বোনটি আমার, কাঁদলে ভালো লাগবে, তারপর চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি তোমার পাশে বসে থাকবো, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না, ছোট্ট বোনটি আমার। কিন্তু এসব পরে হবে। আপাততঃ লুসি মাঝে মাঝেই তার বোনের ক্ষয়ে যাওয়া, পাথরে খোদাই করা, মুখের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো। ওই মুখে বিশেষ সহানুভূতি ছিলো না, কিন্তু মনে হলো লুসি ওই রকম একটি মুখই দেখতে চাইছিলো।

আমি একটা কৌচে বসে সেই পুরনো ছবির পত্রিকাগুলিই দেখছিলাম। আমার নিজেকে এখানে রীতিমতো বেমানান মনে হচ্ছিলো। কিন্তু লুসি আমাকে আসতে বলে। লুসি বলেছিলো, ও চাইতো যে তুমি থাকো।

আমি বলেছিলাম, আমি নিচে লবিতে অপেক্ষা করবো।

লুসি মাথা নেড়েছিলো, বলেছিলো, না, উপরে চলো।

আমি অসুবিধা সৃষ্টি করতে চাই না। তুমি তো বলেছো যে তোমার বোন থাকবেন।

তবু আমি চাই যে তুমিও থাকো।

আর সেজন্যই আমি এখানে। অবশ্য নিচের লবিতে সংবাদশিকারী, রাজনীতিবিদ্ আর ঔৎসুক্য-পিপাসুদের মধ্যে বসে থাকার চাইতে এখানে থাকাই ভালো হয়েছে।

ওরা তেমন সাংঘাতিক দীর্ঘ সময় নিলো না। ওরা জানালো যে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। নার্স এসে যখন এই খবরটা দিলো তখন লুসি মুখে একটা অস্ফুট কান্নার শব্দ করে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। খবরটা শুনে লুসির বোন একটু স্বস্তি পেলেন মনে হলো। তিনি লুসির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন, বললেন, লুসি, উঁচু গলায় নয়

কিন্তু বেশ কঠোর কণ্ঠে। লুসি।

লুসি মুখ তুলে তার বোনের তিরস্কারভরা দৃষ্টি লক্ষ করলো, তারপর বিনীত ভঙ্গিতে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, আমি দুঃখিত, এলি। আমি — আমি —

এলি বললেন, ঈশ্বরকে আমাদের ধন্যবাদ দেয়া দরকার। তিনি চটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মনে হলো, ভুলে যাবার আগে এখনই বেরিয়ে গিয়ে ধন্যবাদটা দিয়ে আসবেন। কিন্তু না, তিনি নার্সের দিকে ঘুরে বললেন, ও কখন তার স্বামীকে দেখতে পারবে?

নার্স বললো, একটু দেরি হবে। ঠিক কখন আমি বলতে পারি না, কিন্তু কিছু সময় লাগবে। আপনারা যদি অপেক্ষা করেন আমি এসে জানিয়ে যাবো। দরজার কাছে গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আপনাদের জন্য কিছু এনে দেবো? লেমোনেড কিংবা কফি?

বোন উত্তর দিলেন, সহৃদয়তা ও বিবেচনাবোধের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমাদের কিছু লাগবে না। সকাল বেলায় দিনের এই সময়ে না।

নার্স চলে গেলো। আমিও ওদের বলে, তাকে অনুসরণ করলাম। ডঃ সিমনস, যিনি অস্ত্রোপচার করেছিলেন, আমি তাঁর ঘরে গেলাম। তাঁকে আমি চিনতাম। এ্যাডামের এক রকম বন্ধু ছিলেন তিনি, এ্যাডামের মতো মানুষের যতটুকু বন্ধু হওয়া যায়, কারণ এ্যাডাম কারো সঙ্গেই তেমন ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে পারতো না। ব্যতিক্রম ছিলাম আমি। তবে আমাকে হিসাবের মধ্যে ধরার দরকার নেই, কারণ আমি ছিলাম তার যৌবনের বন্ধু। ডঃ সিমনসের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো। এ্যাডাম আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো।

ডঃ সিমনস তাঁর টেবিলে বসে বড়ো একটা কার্ডে কি যেন লিখছিলেন। শুকনো, শীর্ণদেহ, ধূসর মতো মানুষ। আমি তাঁকে তাঁর হাতের কাজ শেষ করে নিতে বললাম। তিনি জানালেন যে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ওর সেক্রেটারী তাঁর কাছ থেকে কার্ডটা নিয়ে একটা ফাইলিং ক্যাবিনেটে রাখলো, তখন তিনি আমার প্রতি মনোযোগ দিলেন। আমি গভর্নরের অবস্থার কথা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে।

আপনি বলতে চাইছেন যে বুলেট বার করে এনেছেন?

তিনি হাসলেন, এক ধরনের শীতল হাসি, তারপর জানালেন যে তিনি তার চাইতে বেশি কিছু বলতে চাইছেন। ডঃ সিমনস বললেন, খুব সম্ভব বেঁচে যাবেন। শক্ত মানুষ গভর্নর।

আমি সায় দিলাম, হ্যাঁ, সেকথা সত্য।

ডাক্তার টেবিলের উপর থেকে ছোট একটা খাম তুলে তার মধ্য থেকে নিজের হাতে কিছু ঢেলে নিলেন। তারপর বললেন, তবে যত শক্ত মানুষই হোক না কেন এই খাবার খুব বেশি পরিমাণে হজম করা সম্ভব নয়। তিনি তার হাত খুলে আমাকে দু'টো ছোট ছোট গুলী দেখালেন। .২৫ ক্যালিবারের গুলী বেশ ছোট আমি জানতাম কিন্তু এগুলো মনে হলো তার চাইতেও ছোট ও তুচ্ছ।

আমি একটা গুলী হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলাম। শীসার গুলী, ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেছে। গুলীটি নাড়তে নাড়তে আমার বহুকাল আগের কথা মনে হলো। আমরা তখন ছোট, ল্যান্ডিং-এ আমি আর এ্যাডাম একটা দেবদারু গাছের তক্তায় গুলী ছুঁড়ে প্র্যাকটিস করতাম, মাঝে মাঝে আমরা আমাদের পকেট-ছুরি দিয়ে নরম কাঠের মধ্য থেকে গুলী বার করে আনতাম। কখনো কখনো সে সব গুলী এর চাইতেও বেশি বিকৃত হতে দেখেছি আমি।

ডঃ সিমনস অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে উঠলেন, হারামজাদা!

আমি গুলী দুটো ওকে ফেরত দিয়ে নিচের লবিতে গেলাম। এতক্ষণে লবি প্রায় খালি হয়ে এসেছে। রাজনীতির মানুষরা চলে গেছে। শুধু দু'তিনজন সাংবাদিক তখনো নতুন খবরের জন্য অপেক্ষা করছে।

সেদিন আর নতুন কিছু ঘটে নি। পরের দিনও নয়। মনে হলো কর্তা সেরে উঠছেন। কিন্তু তৃতীয় দিন তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে মোড় নিলো। একটা ইনফেকশান দেখা দিয়েছে আর খুব দ্রুত সেটা ছড়িয়ে পড়ছে। ডঃ সিমনস মুখে বেশি কিছু না বললেও তাঁর চেহারা দেখে আমি বুঝলাম যে কর্তার বাঁচবার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ।

সে দিন রাতে আমি হাসপাতালে পৌঁছে লুসি কেমন আছে খোঁজ নেবার জন্য উপরের ওয়েটিংরুমে গিয়েই খবর পেলাম যে কর্তা আমাকে দেখতে চেয়েছেন। ওরা বললো যে তিনি অনেকখানি সামলে উঠেছেন।

তাঁর অবস্থা বেশ খারাপ দেখলাম আমি। মুখের মাংস শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে, হাড় থেকে যেন মাংস সরিয়ে নেয়া হয়েছে, মনে হলো একটি বৃদ্ধের মুখ দেখছি আমি। মেসন সিটিতে তাঁর বুড়ো বাবার মতো দেখাচ্ছিলো তাঁকে। মুখ কাগজের মতো সাদা।

ওই সাদা মুখে আমি যখন তাঁর চোখ দুটি দেখলাম তখন প্রথমে মনে হলো তার উপর একটা পর্দা পড়েছে, ওই দুটি চোখ কাউকে চিনতে পারছে না। কিন্তু তারপর তাঁর বিছানার দিকে অগ্রসর হতেই সেই চোখের দৃষ্টি আমার উপর পড়লো, তার মধ্যে একটা ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠলো। তাঁর মুখেও একটা কুঞ্চন দেখা দিলো।

বুঝলাম যে হাসির একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা সেটা।

আমি খাটের কাছে সরে এসে বললাম, হ্যালো, বস্। আমিও আমার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার একটা প্রয়াস পেলাম।

কর্তার ডান হাত চাদরের উপর শিথিলভাবে পড়েছিলো। তিনি সেই হাতের তর্জনী ও তার পাশের আঙ্গুলটা তুলে অভিবাদনের সামান্য সূচনা করলেন, তারপরই হাত ছেড়ে দিলেন। মাংসপেশীর যে শক্তি তাঁর মুখে হাসির আভাস ফুটিয়ে তুলেছিলো সেই শক্তিও নিঃশেষিত হয়ে গেলো, মুখ থেকে হাসির আভাসটা মুছে গেলো, মাংস আবার শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো।

আমি খাটের আরো কাছে সরে এসে মুখ নিচু করে তাঁর দিকে তাকালাম, কিছু একটা বলতে চাইলাম। কিন্তু একটা পুরনো স্বপ্ন নিংড়ে শুকনো করে অনেক দিন রোদে ফেলে রাখলে যে অবস্থা হয় আমার মস্তিষ্কও মনে হলো সেরকম হয়ে গেছে।

একটু পরে কর্তা ফিসফিস শব্দের চাইতে সামান্য জোরে বললেন, আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম, জ্যাক।

আমিও আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম, কর্তা।

এর পর তিনি প্রায় এক মিনিট চুপ করে থাকলেন, কিন্তু তাঁর চোখ দুটি ছিলো আমার উপর নিবদ্ধ, আর সে চোখে তখনো মিটমিট করে আলো জ্বলছিলো। তারপর তিনি বললেন, ও কেন একাজটা করলো?

আমি বেশ জোরে বলে উঠলাম, ওহ্, গড্ ড্যাম ইট! আমি বলতে পারবো না, কর্তা।

নার্স চোখের ইঙ্গিতে আমাকে সাবধান করে দিলো।

কর্তা বললেন, আমি তো কখনো ওর কোনো ক্ষতি করি নি।

না, তা করেন নি।

আবার তিনি চুপ করে গেলেন, তাঁর চোখের আলো নিভু নিভু হলো, একটু পরে বললেন, ও ঠিকই ছিলো। ডাক্তার।

আমি সায় দিয়ে মাথা নাড়লাম।

আমি অপেক্ষা করে থাকলাম কিন্তু মনে হলো আর কিছু বলবেন না। তাঁর চোখ এখন ঘরের ছাদের দিকে, নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা তাও আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। অবশেষে তিনি তাঁর চোখ আমার দিকে ফেরালেন, খুব আস্তে আস্তে, আমি যেন কোটরের মধ্যে তাঁর চোখের তারা দুটি ঘোরাবার যন্ত্রণাকাতর শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর হঠাৎ সেই চোখে আবার একটু আলো জ্বলে উঠলো। তিনি বললেন, জ্যাক, সব কিন্তু অন্য রকম হতে পারতো।

আমি আবারও সায় দিয়ে মাথা নাড়লাম।

তিনি আরেকটু শক্তি সঞ্চয় করে নিলেন, মনে হলো বালিশ থেকে মাথাটা উঁচু করে তুলতে খুব চেষ্টা করছেন, ভাঙা গলায় তিনি বললেন, এটা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে।

নার্স এগিয়ে এসে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

আমি বিছানায় শোয়া মানুষটিকে উদ্দেশ করে বললাম, হ্যাঁ।

তিনি আবার বললেন, তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। এটা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

তিনি আমার দিকে তাকালেন। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো এ সেই পুরনো দৃষ্টি, জোরালো, অনুসন্ধানী, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক, মনোযোগ দাবী করা। কিন্তু মুখ দিয়ে যে কথা ফুটলো তা অত্যন্ত দুর্বল শোনালো। ফিসফিস করে তিনি বললেন, এখনও সব অন্য রকম হতে পারতো। যদি এই ঘটনাটা না ঘটতো — তাহলে এখনও — এখনও — সব অন্য রকম হতে পারতো।

এতো দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে শেষ কথাগুলি কোনোরকমে উচ্চারণ করতে পারলেন।

নার্স তখন হাতের ইঙ্গিতে আমাকে চলে যেতে বলছে, বার বার।

আমি ঝুঁকে পড়ে চাদরের উপর থেকে তাঁর হাত নিজের হাতে তুলে নিলাম। হাতটা মনে হলো জেলির মতো। আমি বললাম, চলি, কর্তা। আবার দেখা হবে।

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। এই মুহূর্তে তিনি আমাকে চিনতে পারছিলেন কিনা তাও আমি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

তিনি মারা গেলেন পরদিন সকালে। তখন ভোর হয় হয়। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অগণিত লোক যোগ দেয়, সকল শ্রেণীর মানুষ, রুক্ষ গেঁয়ো চাষীর দল, কাউন্টি আদালত ভবনের চালাক চতুর লোকজন, শহুরে কেতাদুরস্ত ব্যক্তিরা, এমন সব মানুষ যারা ইতিপূর্বে কখনো রাস্তায় বেরিয়ে আসে নি। আর শুধু পুরুষেরা নয়, তাদের স্ত্রীরাও এসেছে। ক্যাপিটল প্রাঙ্গণে লোক ধরে নি, জনতা উপচে পড়েছে চারপাশের রাস্তায়, আর ওদিকে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে, গাছ আর লম্বা লাঠির মাথায় বাঁধা লাউডস্পীকারে–লাউডস্পীকারে অনর্গল শব্দ উচ্চারিত হয়ে চলেছে।

এক সময় ক্যাপিটলের প্রশস্ত সিঁড়ির উপর শবাধার এনে রাখা হলো, শবাধারবাহী শকটে সেটা তোলা হলো, স্টেট পেট্রলম্যান আর অশ্বারোহী পুলিশ

বাহিনী রাস্তা করে দিলো, আর ধীরে ধীরে মিছিল এগিয়ে চললো সমাধিক্ষেত্রের দিকে। সমাধিক্ষেত্রে জনতা ঢেউ-এর মতো ঘাসের উপর দিয়ে সামনে এগিয়ে এলো, পেছনে হটে গেলো, কতো মানুষের কবর মাড়িয়ে দিলো, গাছগাছালি তছনছ করে ফেললো। গোটা দুই কবরের সমাধিফলক উল্টে পড়ে ভেঙে গেলো। ওঁকে সমাহিত করার পরও সমস্ত জায়গা থেকে লোকজনকে সরাতে পুলিশের প্রায় দু'ঘণ্টা লাগে।

এটা ছিলো এক সপ্তাহের মধ্যে আমার দ্বিতীয় শেষকৃত্যে যোগদান। প্রথমটি ছিলো একেবারে অন্য রকম। সেটা ছিলো এ্যাডাম স্ট্যান্টনের শেষকৃত্য। বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এ।

## দশম অধ্যায়

কর্তা নিরাপদে মাটির নিচে শায়িত হবার পর, জমকালো পোশাক পরা নগরপুলিশ, স্টেট পেট্রল ও চকচকে মসৃণ নৃত্যরত ঘোড়ার উপর আসীন অশ্বারোহীবাহিনী ক্ষুব্ধ জনতাকে সমাধিক্ষেত্র থেকে ঠেলে বার করে দেবার পর — কিন্তু পদদলিত ঘাসের মঞ্জরী নতুন করে মাথা তুলবার কিংবা তত্ত্বাবধায়ক উল্টে পড়া সমাধিফলকগুলি মেরামত করার অনেক আগেই — আমি ল্যান্ডিং–এর উদ্দেশে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ি। এর কারণ ছিলো দুটি। প্রথমতঃ, শহরে থাকা আমার জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো। দ্বিতীয়ত ঃ, এ্যান স্ট্যান্টন ছিলো ল্যান্ডিং–এ।

এ্যাডামকে সমাহিত করার পর থেকেই সে ওখানে। সে মৃতদেহের সঙ্গে যায়। ঝকঝকে শবাধারের পেছন পেছন শেষকৃত্য সংস্থার সুন্দর একটি গাড়ি করে সে যায়। তার সঙ্গে ছিলো একজন নার্স, যার উপস্থিতি নিতান্তই বাহুল্য প্রমাণিত হয়, আর কেটি মেনার্ড নামে তার এক পুরনো বন্ধু, যার উপস্থিতিও, নিঃসন্দেহে, বাহুল্য প্রমাণিত হয়। ধীর শোভন বিরক্তিকর গতিতে চলেছিলো ওই ভাড়া করা গাড়ি, প্রায় একশো মাইল, শান বাঁধানো সড়ক থেকে এক একটা মাইল আস্তে আস্তে তুলে নিচ্ছিলো, যেন জীবন্ত মাংসের উপর থেকে অন্তহীন চামড়ার চিলতা উঠিয়ে ফেলছে। ওই গাড়িতে এ্যান যখন বসে ছিলো তখন আমি দেখি নি। কিন্তু ওকে কেমন দেখাচ্ছিলো আমি তা ঠিক জানি, ঋজু, সাদা বিবর্ণ মুখ, টান টান মাংসের নিচে তার মুখের সুন্দর হাড়গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কোলের উপর দুটি হাত শক্ত মুঠো করা। শ্যাওলা জড়ানো ওক্ গাছগুলির নিচে আমি তাকে ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তার পাশে নার্স আর কেটি মেনার্ড ও আরো অনেক মানুষ থাকা সত্ত্বেও — পারিবারিক বন্ধুরা, ইঙ্গিতময় গালগল্প করতে উৎসাহী ঔৎসুক্য–সন্ধানীর দল, সাংবাদিক, শহর থেকে আসা, বাল্টিমোর থেকে আসা, ফিলাডেলফিয়া থেকে আসা নামজাদা ডাক্তাররা — এতো সব মানুষ তার চারপাশে

থাকলেও এ্যানকে দেখাচ্ছিলো সম্পূর্ণ একা, নিঃসঙ্গ। আর ওদিকে কোদাল তার কাজ করে চলেছিলো। তারপর ও যখন সমাধিক্ষেত্র ত্যাগ করে, কারো গায়ে ভর না দিয়ে, তখনো তাকে একই রকম দেখাচ্ছিলো। নার্স আর কেটি মেনার্ড ধীর পদক্ষেপে তার পাশাপাশি আসছিলো। তাদের মুখে ফুটে উঠেছিলো ঈষৎ বিব্রত ও কৃত্রিম ধর্মভাব, শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রধান শোকার্ত ব্যক্তির সঙ্গীদের মুখে যে রকম অভিব্যক্তি সাধারণতঃ ফুটে ওঠে সেই রকম একটি অভিব্যক্তি।

এমনকি, সে যখন সমাধিক্ষেত্রের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছিলো, যখন হঠাৎ এক সাংবাদিক তার ক্যামেরা তুলে ওর একটি ছবি নেয়, তখনো তার মুখের কোনো ভাবান্তর ঘটে নি।

আমি যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছুলাম তখনো ওই ছোট্ট নগণ্য লোকটি দাঁড়িয়েছিলো, এক চোখের উপর টুপী টেনে নামানো, ঘাড়ে ক্যামেরা ঝুলছে, তার ছোট্ট নগণ্য মুখে দাঁত বার করা হাসি। আমার মনে হলো আমি ওকে রাজধানী শহরে দেখেছি, কিন্তু নাও দেখতে পারি, সাংবাদিক স্কুল থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন ওরা সবাই প্রায় একই রকম দেখতে হয়ে যায়। আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, হ্যালো।

সেও হ্যালো বললো।

তোমাকে ছবিটা নিতে দেখলাম আমি।

হ্যাঁ।

শোনো, বাছা, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তা হলে নিশ্চয়ই আবিস্কার করবে যে, হারামজাদা হবার অনেক পথ আছে, তার জন্য সাংবাদিক হবার দরকার করে না।

সে তার ছোট্ট নগণ্য মুখ তুলে বললো, আচ্ছা, তারপর জিজ্ঞাসা করলো, তুমি বার্ডেন, তাই না?

আমি সায় দিয়ে মাথা নাড়লাম।

কি কাণ্ড! তুমি স্টার্কের হয়ে কাজ করো, আর তুমি আমাকে বলছো হারামজাদা!

আমি শুধু ওর দিকে তাকালাম। এ রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি বহুবার হয়েছি। হাজার বার, হাজার জায়গায়। হোটেলের লবিতে, খাবার টেবিলে, ক্লাবে, রাস্তার মোড়ে, শোবার ঘরে আর পেট্রল স্টেশনে। কখনো কখনো তারা ঠিক এই ভাষায় কথা বলে নি, কখনো কখনো তারা কিছুই বলে নি, কিন্তু ব্যাপারটা একই ছিলো। তো, ওদের আমি উচিত শিক্ষা দিয়েছি। কিভাবে হাতের মুঠি বাগিয়ে তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত হানতে হয় সেটা আমার জানা ছিলো। থাকবারই কথা।

প্র্যাকটিস তো কম হয় নি।

কিন্তু এক সময় ক্লান্তি আসে। মনে হয় খুবই সোজা এটা করা, তখন আর মজা পাওয়া যায় না। এতবার একই ব্যাপার ঘটে যে তখন আর আমি ক্ষেপে উঠি না। কিন্তু আসল কারণ এসব নয়। আসলে ওই লোকগুলি যখন একথা বলে তখন তারা ঠিকও বলে না, আবার ভুলও বলে না। যদি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন হতো, তা হলে এনিয়ে চিন্তা করতে হতো না, তখন সোজা আঘাত হানা যেতো। কিন্তু মুশ্কিল হলো, তারা অর্ধেক ঠিক, অর্ধেক ভুল, আর তাই শেষ অবধি অসাড় করে দেয়। একটা থেকে আরেকটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা। ওদের কাছে এটা ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, সে-সময়ই কখনো পাওয়া যায় না, আর ওদের মুখের উপর সেই ভঙ্গিটা লেগেই থাকে। আর তাই শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়াই যেখানে আমি আর ওদের আঘাত করি না, শুধু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, আর সমস্ত ব্যাপারটা মনে হয় স্বপ্ন, কিংবা অনেক কাল আগের হঠাৎ মনে পড়া কোনো ঘটনা, কিংবা ওরা কেউ যেন ঘটনাস্থলে উপস্থিতই নেই।

তাই আমি শুধু ছোট্ট নগণ্য মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আরো লোকজন ছিলো আশেপাশে। ওরা আমাকে দেখছিলো। আশা করছিলো আমি কিছু বলবো। কিংবা কিছু করবো। কিন্তু ওদের দৃষ্টি আমাকে বিচলিত করলো না। আমি ওদের ঘৃণাও করলাম না। আমি আমার ভেতরে এক ধরনের অসাড়তা ও বেদনা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করলাম না, বেদনার চাইতে অসাড়তাই বেশি। আমি ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকলাম, যেভাবে মানুষ আঘাত পাবার পর ব্যথা শুরু হবার জন্য অপেক্ষা করে সেইভাবে। ব্যথাটা শুরু হলে পর আমি ওকে দেখবো। কিন্তু ব্যথা শুরু হলো না, শুধু অসাড়তা জেগে থাকলো। অতএব, আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে যেতে শুরু করলাম। অনেকগুলি চোখ আমাকে অনুসরণ করলো, একজন হেসে উঠেই হাসিটা গিলে ফেললো কারণ এটা শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান। কিন্তু আমাকে এসব স্পর্শ করলো না।

আমার ভেতরকার বেদনা আর অসাড়তা নিয়ে আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললাম। কিন্তু ফটকের কাছের ঘটনা তার জন্ম দেয় নি। ওই বেদনা আর অসাড়তা নিয়েই আমি এখানে এসেছিলাম।

আমি স্ট্যান্টন ভবনের দিকে যাচ্ছিলাম। ও যে এখনই আমাকে দেখতে চাইবে আমি সেটা ভাবি নি, কিন্তু আমি খবরটা দিতে চেয়েছিলাম যে আমি ল্যান্ডিং-এ হোটেলে থাকবো, প্রায় রাত পর্যন্ত। অবশ্য যদি ইতোমধ্যে কর্তার অবস্থা সম্পর্কে কোনো খবর এসে না পৌঁছায় তা হলে।

কিন্তু স্ট্যান্টন ভবনে গিয়ে আমি জানতে পারলাম যে এ্যান কারো সঙ্গেই দেখা করছে না। এই মুহূর্তে কেটি মেনার্ড এবং নার্স আর বাহুল্য নয়। কারণ এ্যান বাড়ি ফিরে বসবার ঘরে ঢুকেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে সব কিছুর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যায়, পিয়ানো, এক এক করে প্রতিটি আসবাবপত্র, চুল্লীর উপরের ছবিটা, সবকিছু সে লক্ষ করে, যেভাবে কোনো মহিলা বাড়িটা নতুন করে সজ্জিত করার আগে, আসবাবপত্রগুলি নতুনভাবে সাজিয়ে রাখার আগে, সব কিছু একবার ভালো করে দেখে নেয়, (এই ব্যাখ্যা কেটি মেনার্ডের), আর তার পরই সে ধপ করে পড়ে যায়। সে দরজার হাতল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে নি, তার পা টলমল করে নি, তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোয় নি। এখন, সব চুকে যাবার পর, সে শুধু পড়ে যায়, সংজ্ঞাহীন হয়ে মেঝের উপর।

আমি যখন ওর ওখানে যাই তখন নার্স উপরতলায় তার দেখাশোনা করছিলো, কেটি মেনার্ড ফোনে ডাক্তারকে ডাকছিলো, জরুরী কাজকর্ম নিজের হাতে তুলে নিচ্ছিলো। আমার সেখানে থাকবার কোনো কারণই ছিলো না। আমি গাড়িতে উঠে শহরে ফিরে আসি।

কিন্তু এখন কর্তাও মৃত, তাই আমি আবার ল্যান্ডিং-এ ফিরে এসেছি। আমার মা আর তার থিওডোর ভ্রমণযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো, তাই বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাড়িটা শূন্য, নিস্তব্ধ, লাস-কাটা ঘরের মতো। তবু গত কয়েকদিন আমাকে যেভাবে হাসপাতাল আর সমাধিক্ষেত্রে ঘুর ঘুর করতে হয়েছে এটা ছিলো সে তুলনায় প্রফুল্লকর। এ বাড়িতে যা মৃত, তার মৃত্যু ঘটে বহু কাল আগে। আর সে ঘটনার সঙ্গে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। অন্যান্য মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গেও আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম। বিচারপতি আরউইনকে ওরা সমাধিস্থ করেছে, এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে করেছে, কর্তাকে করেছে।

কিন্তু আমাদের কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছে। আর যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে এ্যান স্ট্যান্টন একজন। আরেকজন আমি।

অতএব, আমি এখন আবার ল্যান্ডিং-এ, বাইরের গ্যালারিতে আমরা দুজন পাশাপাশি বসে থাকি — আকাশে যখন সূর্য, শরতের শেষ দিকের হাল্কা হলুদ রোদ, বিকালের দিকে উপসাগরের ঝিলমিল করা জলের উপর সূর্যের আলো বাঁকা হয়ে পড়ে, তারপর ওই রোদ শরৎকালীন ধূসর দিগন্তের দিকে দক্ষিণে ছড়িয়ে যায়। আর যখন আকাশে সূর্য থাকে না, যখন হাওয়ার তোড়ে সাগরের জল সৈকতের উপর উপচে উঠে আসে, এমন কি রাস্তা পর্যন্ত, আকাশ যখন মনে হয় ঝড়ো বৃষ্টিপুঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয়, তখন আমরা ভেতরে বসবার ঘরে পাশাপাশি বসে

থাকি। যেখানেই থাকি না কেন, আমরা কেউই খুব বেশি কথা বলি নি ওই দিনগুলিতে, বলার মতো কিছু যে ছিলো না সে জন্য নয়, বরং এই জন্য যে বড়ো বেশি জিনিস বলার ছিলো, আর একবার বলতে শুরু করলে যে চমৎকার ও বিপদজনক ভারসাম্য আমরা অর্জন করেছিলাম তা নষ্ট হয়ে যেতে পারতো। আমরা যেন একটা দোল–তক্তার দুপ্রান্তে দু'জন বসেছিলাম, চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখে, কিন্তু কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট খেলার মাঠে নয়, ঈশ্বর জানেন এমন একটা দোল–তক্তার অন্ধকারের মধ্যে যা অজানা এক ভুবনে আমাদের মতো শিশুদের জন্য ঈশ্বরই তৈরি করে রেখেছেন। আর আমরা যদি একে অন্যের দিকে এক ইঞ্চির ভগ্নাংশও ঝুঁকে পড়তাম তাহলে ওই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতো আর আমরা দুজনই হুশ করে তলিয়ে যেতাম সে অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে ফাঁকি দিয়েছিলাম। আমরা কোনো কথা বলিনি।

আমরা কোনো কথা বলি নি, কিন্তু কোনো কোনো বিকেলে আমি এ্যানকে বই পড়ে শুনিয়েছি। প্রথম দিন বিকালেই আমরা যখন দীর্ঘক্ষণ পাশাপাশি চুপ করে বসেছিলাম, যখন নৈঃশব্দের মধ্যে অনুচ্চারিত হাজারো কথাগুলি ফুলে ফেঁপে উঠছিলো, আর যখন সে নীরবতা আমার অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন আমি উঠে গিয়ে হাতের কাছে প্রথম যে বইটি পাই সেটা থেকেই ওকে পড়ে শোনাতে শুরু করি। বইটি ছিলো এন্টনি ট্রলোপের রচনাবলীর প্রথম খণ্ড। অতি নিরাপদ গ্রন্থ। এন্টনি কখনো ভারসাম্য নষ্ট করেন না।

শেষ–শরতের ওই দিনগুলি এক অদ্ভুতভাবে আমি যখন প্রায় বিশ বছর আগে এ্যানের প্রেমে পড়েছিলাম সেই গ্রীষ্মের দিনগুলির কথা মনে পড়িয়ে দিতে আরম্ভ করে। ওই গ্রীষ্মে চারপাশে লোকজন থাকলেও আমরা দুজন ছিলাম সম্পূর্ণ একা, ভাসমান কোনো দ্বীপে বা মায়াবী কার্পেটের উপর একমাত্র অধিবাসী, প্রেমে পড়ার মানেই যা। এখনও আমরা দুজন সম্পূর্ণ একা, কিন্তু এখনকার ভাসমান দ্বীপ কিংবা মায়াবী কার্পেটটা ভিন্ন ধরনের। ওই গ্রীষ্মে আমাদের মনে হয়েছিলো আমরা যেন এক বিশাল আত্মমগ্ন স্রোতের মধ্যে ধরা পড়েছি, সেই স্রোত তার নিজের গতি এবং সময় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, যে নিশ্চিত প্রতিশ্রুত সুখের দিকে তা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সেই দিকেও তাকে একটুও তাড়া দেয়া যাবে না। এখনও আবার আমাদের মনে হলো আমরা ওই রকম একটা স্রোতের মধ্যে ধরা পড়েছি, এখনো তার বিশাল গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমার কড়ে আঙ্গুলটি পর্যন্ত উত্তোলিত করতে পারবো না, কারণ এই স্রোত তার নিজের গতি এবং সময় সম্পর্কে সম্পূর্ণ

অবহিত। কিন্তু এ কি পরিণতির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তা আমরা জানি না। আর তা নিয়ে আমি বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামালাম না।

তবে এখন মাঝে মাঝে অন্য একটা বিষয় নিয়ে আমি ভাবতাম। যখন ওর পাশে বসে আছি, পড়ছি কিংবা চুপ করে আছি, কিংবা যখন আমি অন্য কোথাও, খাচ্ছি কিংবা রাস্তায় হাঁটছি কিংবা বিছানায় জেগে শুয়ে আছি, তখন। একটা প্রশ্ন, কিন্তু তার উত্তর নেই। এ্যাডাম যে দিন শেষ বারের মতো এ্যানের এ্যাপার্টমেন্টে আসে, প্রায় উন্মাদের মতো অবস্থায় তার ওখানে ছুটে এসে তাকে বলে যে সে তার বোনের বেশ্যাগিরির দালালি করবে না, তখন এ্যান এই ঘটনার কথা আমাকে বলার সময় উল্লেখ করেছিলো যে, একজন লোক টেলিফোনে তার আর গভর্নর স্টার্কের কথা এ্যাডামকে জানায়।

কে সেই লোক?

ঘটনার পরবর্তী প্রথম দিনগুলিতে আমি এটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু পরে প্রশ্নটা আমার মনে জাগে। কিন্তু তখনো, প্রথম দিকে প্রশ্নটা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি। কারণ তখনকার সর্বপ্লাবী বেদনা আর অসাড়তার মধ্যে কোনো কিছুই আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় নি। কিংবা, এভাবে বলা যায়, তখন যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিলো তার সঙ্গে এই প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। যা ঘটেছিলো তা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার পেছনের কারণটা নয়, অন্ততঃ সেই কারণের সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জড়িত নই ততক্ষণ নয়।

কিন্তু প্রশ্নটা বার বার জাগতে থাকে। যখন আমি সচেতনভাবে তার কথা ভাবছি না তখনও আমি হঠাৎ আবিষ্কার করতাম যে সেটা আমার মনের ভেতরকার দেয়ালের তক্তায় তার ইঁদুর-দাঁত দিয়ে কুট কুট করে কেটে চলেছে।

এ্যানকে কিভাবে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করবো বেশ কিছু কাল আমি তা বুঝে উঠতে পারি নি। যে ঘটনাগুলি ঘটে গেছে, সে সম্পর্কে আমি তাকে কোনো দিনই কোনো প্রশ্ন করতে পারবো না। আমরা চিরকাল নীরবতার ষড়যন্ত্রে বন্দী হয়ে বসে থাকবো। ইতিপূর্বে নিজেদের অজান্তেই আমরা আর একটা ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছিলাম, এ্যাডাম স্ট্যান্টন আর উইলি স্টার্ককে আমরা পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ করে দিয়েছিলাম, পরিণামে যা উভয়ের মৃত্যু ডেকে আনে। সেই ষড়যন্ত্রই আমাদেরকে বর্তমান নীরবতার ষড়যন্ত্রে বন্দী করে রাখবে। (যদি কখনো আমরা এই নীরবতার ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন করি তখন হয়তো আমাদের ওই অন্য ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটির মুখোমুখি হতে হবে, আর তখন সেদিকে তাকিয়ে আমরা দেখবো যে আমাদের হাত রক্তরঞ্জিত। অতএব আমি কিছু বললাম না।)

ততদিন পর্যন্ত না, যতদিন আমি না বলে থাকতে পেরেছিলাম।

তারপর একদিন আমি বললাম, এ্যান, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। ওই — ওই — ব্যাপারটা সম্পর্কে। তুমি যদি বলতে না চাও তাহলে আমি এ সম্পর্কে তোমাকে আর একটি কথাও বলবো না।

কোনো উত্তর না দিয়ে ও আমার দিকে তাকালো। কিন্তু আমি ওর চোখে আতঙ্ক ও বেদনা ফুটে উঠতে দেখলাম, কিন্তু তারপরই ওর ভেতরে তখনো যে শক্তি ছিলো তার সাহায্যে সে তা দমন করলো।

তখন আমি এগিয়ে গেলাম, বললাম, আমি সেদিন যখন তোমার ওখানে যাই তুমি আমাকে বলেছিলে যে কে একজন এ্যাডামকে ফোনে জানিয়েছে — জানিয়েছে—

আমি কথাটা বলতে পারছিলাম না। সে-ই বাক্যটা পূর্ণ করে দিলো, বললো, আমার কথা। এ্যান অভিঘাতের জন্য অপেক্ষা করে নি। তার সর্বশক্তি নিয়ে সে তার সামনে বুক পেতে দেয়।

আমি মাথা দোলালাম।

এ্যান প্রশ্ন করলো, তারপর কি?

তাকে কে ফোন করেছিলো সে কি তা বলেছিলো?

এক মিনিট সে ভাবলো। আমি তাকে দেখছিলাম। কেউ যেভাবে মর্গে পাথরের টুকরোর উপরে শায়িত কোনো মৃতদেহের মুখের উরর থেকে চাদর সরিয়ে তার মুখটা দেখে এ্যান যেন সেইভাবে সেদিন তার ঘরে ঝড়ের বেগে এ্যাডামের প্রবেশ করার মুহূর্তটির উপর থেকে চাদর সরিয়ে সেই মুহূর্তটিকে দেখছিলো। তারপর সে মাথা নেড়ে বললো, না, এ্যাডাম তা বলে নি। একটু ইতস্তত করলো এ্যান, তারপর বললো, শুধু বলেছিলো একটি পুরুষকণ্ঠের কথা। হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

অতএব, আবার আমরা আমাদের নীরবতার ষড়যন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করলাম। ইতোমধ্যে আমাদের দোল-তক্তা নড়ে উঠলো, দুলে উঠলো আমাদের নিচে, কালো অন্ধকার উঠে আসলো আমাদের পানে, আর আমরা দুজন কোনরকমে তক্তা আঁকড়ে ধরে টিকে রইলাম।

পরদিন আমি ল্যান্ডিং ছেড়ে এলাম। শেষ বিকালে শহরে পৌঁছে আমি স্যাডি বার্কের বাসায় ফোন করি। কোনো সাড়া নেই। তারপর ক্যাপিটলে ফোন করলাম, যদিও এই সময় সেখানে তার থাকার কথা নয়, তবু করলাম। সেখানেও তার এক্সটেনশনে কেউ সাড়া দিলো না। সারা বিকাল একটু পর পর আমি ওর বাসায় ফোন করছি কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি। পরদিন সকালে আমি ক্যাপিটলে যাই নি,

ওখানকার লোকজনের মুখোমুখি হতে আমার ইচ্ছে হয় নি, ওদের কাউকেই আমি আর কোনোদিন দেখতে চাই না।

তাই ওখানে ফোন করি। তার এক্সটেনশনে কেউ ফোন ধরলো না। তখন আমি সুইচবোর্ডে ফোন করে ওকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে জিজ্ঞাসা করলাম। মিনিট দুই পরে একটি কণ্ঠ বললো, তিনি ক্যাপিটল ভবনে নেই। অসুস্থ। আর কিছু?

আমি আমার ভাবনাগুলি গুছিয়ে নেবার আগেই ওরা ফোন ছেড়ে দিলো। আমি আবার ফোন করলাম, বললাম, আমি জ্যাক বার্ডেন বলছি। আমি —

ওহ্ — মিঃ বার্ডেন — সুইচ বোর্ডের কণ্ঠ শোনালো নৈর্ব্যক্তিক, একটা প্রশ্নের আভাসও ফুটে উঠলো হয়তো।

একটা সময় ছিলো, আর খুব বেশি দিন আগেও নয়, যখন ওই অঞ্চলে জ্যাক বার্ডেনের নামেই অনেক কিছু হতো। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর, এই কণ্ঠস্বরের সুর, আমাকে জানিয়ে দিলো যে জ্যাক বার্ডেন নামটি অর্থহীন, তার উচ্চারণ শুধু নিঃশ্বাসের অপচয়।

এক মুহূর্তের জন্য আমার ভীষণ রাগ হয়। তারপরই আমার মনে পড়লো যে পরিস্থিতি বদলে গেছে।

পরিস্থিতি ওখানে বদলে গিয়েছিলো। আর এই সব জায়গায় পরিস্থিতি যখন বদলায় তখন বদলটা ঘটে অতি দ্রুত এবং শেষ স্তর পর্যন্ত। আর তাই সুইচবোর্ড যখন আপনার নাম উচ্চারণ করে তখন তার মধ্যে একটা ভিন্ন সুর বাজে। পরিস্থিতি যে কতোখানি বদলে গেছে আমার তা স্মরণ হলো। তখন আর আমার মনে কোনো ক্ষোভ রইলো না। আমি ব্যাপারটা নিয়ে মাথাই ঘামালাম না।

কিন্তু আমি মধুরভাবে বললাম, আচ্ছা, মিস বার্কের সঙ্গে কি করে যোগাযোগ করতে পারি তা কি আপনি দয়া করে বলতে পারেন? আমি বিশেষ বাধিত হবো।

ওকে মিনিট দুই সময় দিলাম আমি। খবরটা বার করার জন্য। তারপরই কণ্ঠস্বরটি ভেসে এলো, মিস বার্ক মিলেট স্বাস্থ্যনিবাসে আছেন।

সমাধিক্ষেত্র আর হাসপাতাল। আমি মনে মনে ভাবলাম, আবার সেই বৃত্তের মধ্যে।

কিন্তু মিলেট স্বাস্থ্যকেন্দ্র ওই হাসপাতালের মতো নয়। সেটাকে দেখতে মোটেই হাসপাতালের মতো লাগলো না। শহর থেকে মহাসড়ক ধরে পঁচিশ মাইল যাবার পর অন্য রাস্তায় পড়েই আমি তা আবিষ্কার করলাম। অপূর্ব একটি এ্যাভিনিউ, শতাব্দী-প্রাচীন প্রাণবন্ত ওক্ গাছের শাখাপ্রশাখা দুপাশ থেকে এসে উপরে এক সাথে মিলে চাঁদোয়া তৈরি করেছে, নিচে শ্যাওলা জমে একটা সবুজ জলো গুহার মতো

হয়ে উঠেছে। ওক্ গাছগুলি সমদূরত্বে প্রোথিত, তাদের মধ্যবর্তী স্থানে পাদভূমির উপর ধ্রুপদী মর্মর মূর্তিরাজি দাঁড়িয়ে আছে, পোশাক পরিহিত এবং নিরাভরণ, পুরুষ এবং রমণী, আবহাওয়া আর গাছের এবং পাতা আর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসা লতাগুল্মের ছাপ পড়েছে তাদের উপর, ফলে মনে হচ্ছে সেগুলি যেন নিচের কৃষ্ণ-সবুজ, আঁকড়ে ধরা, মাটি ফুঁড়ে অনুজ্জ্বলভাবে উপরে উঠে এসেছে, আর এখন গরু-ছাগলের মতো তাদের ভারী, ঈষৎ বেদনার্ত, ঔৎসুক্যহীন অবিস্ময় নিয়ে তাদের পাশ দিয়ে যাওয়া লোকজনকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ওই মর্মর চোখের দৃষ্টিই নিশ্চয় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা স্নায়ুবিকারগ্রস্ত নিউরোটিক রোগীর চিকিৎসার প্রথম স্তর। আত্মার ক্ষুদ্র ব্রণ আর শুষ্ক চুলকানির উপর এটা নিশ্চয়ই কালের শীতল স্নিগ্ধ মলম বুলিয়ে দিতো।

তারপর এ্যাভিনিউর শেষে নিউরোটিক মানুষটি স্যানাটোরিয়ামে এসে পৌঁছুতো। সাদা স্তম্ভগুলির ওপাশেই রয়েছে সহৃদয় প্রতিশ্রুত শান্তি। কারণ মিলেট স্যানাটোরিয়াম ছিলো যাকে বলা হয় বিশ্রাম নিকেতন। এক শতাব্দীরও আগে একজন কার্পাস খামার মালিক ও ব্যবসায়ী এটা নির্মাণ করেছিলেন, তার অহমিকা ও ভালোবাসার ফসল, অর্থ তার কাছে কোনো ব্যাপারই ছিলো না, তার এই ভবনের জন্য তিনি প্যারিস থেকে এক জাহাজ বোঝাই কৌলীন্যমণ্ডিত আসবাবপত্র আনিয়েছিলেন, আর তার এ্যাভিনিউর জন্য রোম থেকে প্রায় আরেক জাহাজ বোঝাই মার্বেলের মূর্তি, সম্ভবতঃ তার নিজের মুখ ছিলো নির্মমভাবে খোদাই করা দেবদারু গাছের মতো, তার দেহে স্নায়ু বলতে কিছুই ছিলো না, আর এখন ওই জাতীয় লোকের উত্তরসুরিরা, যারা (গ্র্যান্ট কিংবা কুলিজের প্রশাসনামলে) বিপুল বিত্ত অর্জন করেছে, তাদের মাংসপেশীর নিয়ন্ত্রণহীন যাবতীয় কুঞ্চন ও দাপাদাপি এবং তাদের খাপছাড়া আবেগ ও মানসিক বিকার ও নিরন্তর প্রবহমান ক্ষত নিয়ে এখানে উঁচু ছাদওয়ালা ঘরগুলিতে আসে বিশ্রামের জন্য, মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসকের কণ্ঠস্বর শুনে তারা স্বস্তি খুঁজে পায়, তার বড়ো বড়ো, অচঞ্চল, বাদামী, তরল, অতল চোখের মধ্যে ধীরে ধীরে তারা ডুবে যায়।

স্যাডির সঙ্গে দেখা করার অনুমতির জন্য আমাকে যে এক মিনিটের সাক্ষাৎকার দিতে হয় সেই সময় আমি ওই চোখের মধ্যে প্রায় ডুবে যাচ্ছিলাম। ডাক্তার আমাকে স্যাডির সম্পর্কে বললেন, একটা কঠিন কেস্।

স্যাডি তখন জানালার পাশে আরাম কেদারায় শুয়ে ছিলো। বাইরে দেখা যাচ্ছিলো একখণ্ড মাঠ, ঢালু হয়ে উপসাগরের একটি শাখার দিকে নেমে গেছে। তার ছোট করে ছাঁটা কালো চুল অবিন্যস্ত, মুখ খড়িমাটির মতো সাদা, অপরাহ্নের আলো

পড়ে সেই মুখ এখন প্ল্যাস্টার-অব-প্যারিস দিয়ে তৈরি অজস্র দাগভর্তি মেডুসার মুখোশের মতো দেখাচ্ছিলো। তবে সেই মুখোশ এখন বালিশের উপর পড়ে আছে, আর যে চোখ তার মধ্য থেকে তাকিয়ে আছে তার মালিক ওই মুখোশ। তার মালিক স্যাডি বার্ক নয়। সেখানে কোনো দ্যুতি নেই।

আমি বললাম, হ্যালো, স্যাডি, আশা করি তোমাকে দেখতে এসেছি বলে কিছু মনে করছো না।

স্যাডি তার দ্যুতিহীন চোখ দিয়ে আমাকে একটুক্ষণ দেখলো, তারপর বললো, ঠিক আছে।

অতএব, আমি চেয়ারটা আরেকটু কাছে এনে তাতে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছো তুমি?

সে আমার দিকে মাথা ঘুরিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আমাকে দেখলো। নিভন্ত কাষ্ঠখণ্ডে হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া লাগলে তা যেমন জ্বলে ওঠে তেমনি তার চোখ এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠলো। সে বললো, বেশ ভালো আছি। ভালো থাকবো না কেন, এঁ্যা?

আমি বললাম, ভালো থাকলেই ভালো।

শোনে, আমার কোনো অসুখ হয়েছে বলে আমি এখানে আসি নি। আমি এখানে এসেছি কারণ আমি ক্লান্ত। আমার বিশ্রাম দরকার। ওই হতচ্ছাড়া ডাক্তারকে আমি সেকথাই বলেছি। বলেছি, আমি এখানে এসেছি কারণ আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম নিতে চাই আমাকে নিয়ে আপনার আজেবাজে চিকিৎসা করার দরকার নেই, আপনার সঙ্গে আমার গোপন কথার আদান-প্রদানের কোনো চেষ্টা করবেন না আপনি, আমি স্বপ্নে কখনো দমকলবাহিনীর লাল ইঞ্জিন দেখেছি কিনা সেটা আবিষ্কারের প্রয়াস পাবেন না। যদি আমি একবার আপনার সঙ্গে আমার গোপন কথাগুলির আদান-প্রদান শুরু করি তাহলে আপনার কান পুড়ে যাবে। কিন্তু আমি এখানে এসেছি শুধু বিশ্রাম নেবার জন্য। দয়া করে আমাকে ঘাঁটাবেন না। আমি বলেছি, অনেক জিনিস আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে, অনেক মানুষ আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে, ক্লান্ত করে তোলে, আর, ডাক্তার, আপনিও এর অন্তর্ভুক্ত।

সে একটা বাহুতে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো, আমার দিকে তাকালো, তারপর বললো, আর জ্যাক বার্ডেন, তুমিও এর অন্তর্ভুক্ত।

আমি একথার কোনো জবাব দিলাম না। নড়লামও না। তখন সে আবার শুয়ে পড়লো। ডুব গেলো নিজের মধ্যে।

সিগারেটটা যখন আমার আঙ্গুল প্রায় পুড়িয়ে দিলো তখন আমি নতুন আরেকটা

ধরিয়ে বললাম, স্যাডি, তোমার মনের অবস্থা কি রকম আমি জানি, আর ওই সব কথা আমি তুলতেও চাই না, কিন্তু —

স্যাডি বললো, আমার মনের অবস্থা কি রকম তা তুমি কিচ্ছু জানো না।

হয়তো কিছু ধারণা করতে পারি, কিন্তু এখন আমি এখানে এসেছি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য।

আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ভীষণ পছন্দ করো বলেই এসেছো।

সত্যি করি। দীর্ঘ কাল আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। সব সময় আমাদের সমঝোতা ছিলো চমৎকার। কিন্তু কথাটা তা নয় —

স্যাডি আবার বাহুতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করলো, তারপর বললো, হ্যাঁ, সব কিছুতে আর সবার সঙ্গেই সমঝোতা ছিলো চমৎকার। হা ঈশ্বর — চমৎকার !

স্যাডি আবার শুয়ে পড়ে, আমার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, নিচের উপসাগরের দিকে ঢালু হয়ে যাওয়া মাঠের পানে তাকালো। আমি অপেক্ষা করে রইলাম। উপসাগরের ওপারের ছেঁড়াখোঁড়া সাইপ্রেস গাছগুলির মাথার উপর দিয়ে নির্মল বাতাস চিরে একটা কাককে আমি উড়ে যেতে দেখলাম। তারপর কাকটি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই আমি বললাম, এ্যাডাম স্ট্যান্টন কর্তাকে হত্যা করেছ ঠিকই, কিন্তু আইডিয়াটা নিজে থেকে তার মাথায় আসে নি। কেউ তার মাথায় স্টো ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। এমন একজন কেউ যে এ্যাডাম কি প্রকৃতির মানুষ সেটা জানতো, এ্যাডাম কিভাবে চিকিৎসা কেন্দ্রের কাজটা গ্রহণ করে তার ভেতরকার খবরটা যার জানা ছিলো আর যে জানতো —

স্যাডি আমার কথা শুনছিলো বলে মনে হলো না। ছেঁড়াখোঁড়া সাইপ্রেস গাছগুলির উপর দিয়ে যে নির্মল বাতাসের মধ্যে কাকটি মিলিয়ে গিয়েছিলো সে ওই দিকে তাকিয়ে ছিলো। আমি একটু ইতস্তত করলাম, তারপর ওর মুখ লক্ষ করে আবার বলতে শুরু করলাম, এমন কেউ যে গভর্নর স্টার্ক আর এ্যান স্টানটনের কথা জানতো।

আমি আবার অপেক্ষা করলাম, ওই নামগুলি উচ্চারণ করতে করতে আমি তার মুখ লক্ষ করলাম, কিন্তু সেখানে কোনো ভাবান্তর দেখলাম না। তার মুখ দেখালো শুধু ক্লান্ত, ক্লান্ত, আর আশ্চর্য রকম নিরাসক্ত।

আমি বলে গেলাম, একটা জিনিস আমি আবিষ্কার করি। সেদিন অপরাহ্নে একটি লোক এ্যাডামকে ফোন করে গভর্নর আর তার বোনের সম্পর্কে কথা বলেছিলো। আরো অনেক কথা। তুমি তা অনুমান করতে পারো। এ্যাডাম তক্ষুণি তার বোনের কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, আর সে তা অস্বীকার করে

নি। অস্বীকার করার মতো মানুষ সে নয়। আমার মনে হয়, ওই গোপনীয়তায় সে ভেতরে ভেতরে ভীষণ পীড়িত হয়ে উঠেছিলো, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যে আর গোপন থাকলো না সেজন্য সে হয়তো খুশিই হয়েছিলো।

আমার দিকে না তাকিয়ে স্যাডি বললো, হ্যাঁ, বলে যাও এ্যান স্ট্যান্টন কত মহত, কত উচ্চমনা।

আমি অনুভব করলাম যে আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বললাম, দুঃখিত। আমার মনে হয় আমি আসল প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছি।

আমার মনে হয় তাই।

একটু থেমে থেকে আমি বললাম, যে লোকটা এ্যাডামকে ফোন করেছিলো সে লোকটা কে হতে পারে সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?

মনে হলো স্যাডি প্রশ্নটা মনের ভেতর নেড়েচেড়ে দেখছে। যদি শুনে থাকে। আমি সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে পারলাম না।

কোনো ধারণা আছে তোমার?

আমার কোনো ধারণা নেই।

নেই?

না। তখনো তার মুখ অন্যদিকে ফেরানো। তারপর সে বললো, তাছাড়া আমার সে সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকার দরকার নেই। কারণ, আমি জানি সে লোকটা কে।

কে? আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। কে?

ডাফি।

আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম, আমি জানতাম। আমার বোঝা উচিত ছিলো! এটা তো অনিবার্য ছিলো।

যদি জানতেই তবে আমাকে কেন জ্বালাতন করতে এসেছো?

আমি সুনিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। দরকার ছিলো তার। সঠিকভাবে জানতে চেয়েছিলাম আমি। আমি —

কথা বন্ধ করে আমি নিচু হয়ে অন্যদিকে ফেরানো স্যাডির মুখের পানে তাকালাম। সে-মুখের উপর এখন সূর্যের আলো এসে পড়েছে। আমি বললাম, তুমি বললে যে লোকটা যে ডাফি সেটা তুমি জানো। কেমন করে জানো?

স্যাডি তার মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললো, জাহান্নামে যাও তুমি, জ্যাক বার্ডেন, জাহান্নামে যাও! তারপর আমার উপর চোখ রেখেই, সোজা হয়ে বসে, স্যাডি ফেটে পড়লো, এখন আর তার কণ্ঠস্বর ক্লান্ত নয়, হঠাৎ

সেটা ক্রুদ্ধ ও হিংস্র হয়ে উঠেছে, প্রায় চেঁচিয়ে বললো, তুমি জাহান্নামে যাও, জ্যাক বার্ডেন! কেন এখানে এলে তুমি? কেন তুমি সব সময় সবকিছুর মধ্যে নিজেকে এভাবে জড়াও? আমাকে কেন তুমি একা থাকতে দাও না? কেন কেন, জ্যাক বার্ডেন?

যন্ত্রণাবিকৃত মুখে তার চোখদুটি এখন জ্বলছে, উম্মাদের মতো দেখাচ্ছে, আমি স্থির দৃষ্টিতে সেই চোখের দিকে তাকালাম।

কোমল নিচু গলায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন করে জানো?

জাহান্নামে যাও তুমি, জ্যাক বার্ডেন, জাহান্নামে যাও! একটা স্তোত্রের মতো বলে গেলো সে।

এবার আমি আগের চাইতেও কোমল নিচু গলায়, প্রায় ফিস ফিস করে, তার উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম. কেমন করে জানো?

জাহান্নামে যাও তুমি, জ্যাক বার্ডেন।

কেমন করে জানো?

জানি, কারণ — সে বলতে শুরু করলো, তারপর ইতস্তত করলো, বালিশের উপর সে তার মাথা জ্বরে আক্রান্ত একটি শিশুর মতো অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করলো।

কারণ? আমি তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম।

কারণ, সে বিছানায় শিথিলভাবে এলিয়ে পড়ে বললো, কারণ আমিই তাকে বলেছিলাম, আমিই তাকে কাজটা করতে বলেছিলাম।

তা হলে এই ব্যাপার। এই ঘটেছিলো, আর আমি এটা অনুমান করতে পারি নি। আমার পা ভেঙ্গে এলো। মোটর গাড়ির নিউম্যাটিক জ্যাক যেভাবে গাড়ির ওজনটাকে মেঝের উপর আলগোছে নামিয়ে আনে আমিও সেই ভাবে আবার আমার চেয়ারে বসে পড়লাম। আমি চেয়ারে বসে আছি, স্যাডি বার্ক তার আরাম কেদারায় শুয়ে আছে, আমি তাকে এক দৃষ্টিতে দেখছিলাম, এমনভাবে, যেন তাকে আমি আর কখনো আগে দেখি নি।

এক মিনিট কেটে গেলো, তারপর সে বললো, আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থেকো না। কিন্তু তার কথায় কোনো ঝাঁঝ ছিলো না।

আমি নিশ্চয়ই তখনো তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কারণ সে আবার আগের মতো বলে উঠলো, আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থেকো না।

তারপর আমি আমার ঠোঁট দুটিকে বলতে শুনলাম, যেন আপন মনে বলছে, তুমি তাকে হত্যা করেছো।

তাই, তাই। আমিই তাকে হত্যা করেছি। সে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলো। পাকাপাকি ভাবে। আমি জানি যে এবার পাকাপাকি ভাবে। ওই লুসির জন্য। ওর জন্য আমি এতো কিছু করার পর। আমি ওকে বানিয়েছি। তার পর। আমি ওকে বলেছিলাম যে আমি এর উচিত শাস্তি দেবো। কিন্তু ও শুধু আমার দিকে তাকিয়ে ওর নতুন শেখা ম্লান হাসি হেসেছিলো, যেন যীশু খ্রীস্ট হবার তালিম নিচ্ছে, তারপর আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিলো আমি যেন একটু বুঝতে চেষ্টা করি — বুঝতে — ওহ্ ভগবান — আর তখনই আমি বিদ্যুৎঝলকের মতো উপলব্ধি করি যে আমি ওকে মেরে ফেলবো।

আমি বললাম, তুমি এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে হত্যা করেছো।

অস্ফুট কণ্ঠে সে উচ্চারণ করলো, ওহ্ ভগবান, ওহ্ ভগবান!

আমি আবার বললাম, তুমি এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে হত্যা করেছো।

সে ফিস ফিস করে বললো, ওহ্, আমি উইলিকে হত্যা করেছি। তাকে হত্যা করেছি আমি।

আমি মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম, হ্যাঁ।

ওহ্, ভগবান! সে শুয়ে শুয়ে এক দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

যা জানতে আমি এখানে এসেছিলাম তা আমার জানা হয়ে গেছে, তবু আমি সেখানে বসে থাকলাম। একটা সিগারেট পর্যন্ত ধরালাম না

একটুক্ষণ পরে ও বললো, এদিকে সরে এসো। তোমার চেয়ারটা এখানে টেনে আনো।

আমি আমার চেয়ার তার আরাম কেদারার কাছে টেনে নিয়ে অপেক্ষা করলাম। সে আমার দিকে তাকালো না, কিন্তু অনিশ্চিতভাবে আমার দিকে তার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলো। আমি আমার হাতে তার হাত তুলে নিলাম, ধরে থাকলাম সেই হাত, ও তখনো তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে, আর অপরাহ্নের রোদ নিষ্ঠুরভাবে এসে পড়েছে তার মুখের উপর।

অবশেষে সে বললো, জ্যাক। তখনো সে আমার দিকে তাকাচ্ছে না।

কি?

তোমাকে বলে আমার ভালো লাগছে। আমি জানতাম কাউকে না কাউকে আমার বলতে হবে। কোনো না কোনো এক সময়। আমি জানতাম সে সময়টা আসবে, কিন্তু বলবার জন্য কাউকে আমি পাই নি। তুমি না আসা পর্যন্ত। আর সেজন্যই তুমি আসায় আমি তোমার উপর অতো চটে যাই। তোমাকে দোরগোড়ায় দেখামাত্র আমি বুঝতে পারি যে তোমাকে বলতে হবে। কিন্তু এখন, বলার পর,

আমি খুশি। এখন কেউ জানলেও আমার কিছু এসে যায় না। আমি তোমার ওই স্ট্যান্টন মহিলার মতো মহত ও উচ্চমনা না হতে পারি, কিন্তু তোমাকে যে বলতে পেরেছি সে জন্য আমি খুশি।

এর উত্তরে আমি বেশি কিছু বলার মতো খুঁজে পেলাম না। অতএব, আমি বেশ কিছুক্ষণ সেখানে স্যাডির হাত ধরে চুপ করে বসে থাকলাম। মনে হলো ওই নীরবতা স্যাডির ভালো লাগছে। উপসাগরের তীরে সারি সারি ছেঁড়াখোঁড়া সাইপ্রেস তরুরাজি দাঁড়িয়ে আছে। নিচে জমাট বাঁধা শ্যাওলা, তীরের কাছে শ্যাওলাপড়া জল চিত্র-বিচিত্র, জলাভূমি, জঙ্গল আর অন্ধকারের আভাস ও গন্ধে ভারী। সেদিকে তাকিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম।

টাইনি ডাফি, রাজ্যের বর্তমান গভর্নর, উইলি স্টার্কের হত্যাকারী, এটা আমি জেনেছিলাম। নিজের হাতে পিস্তল ছুঁড়লে যে রকম হতো সেই রকমই হত্যাকারী সে। আমি এটাও জেনেছিলাম যে স্যাডি বার্কই ডাফির হাতে পিস্তল তুলে দেয়, তার হয়ে গুলী তাক করে, অতএব, সেও উইলি স্টার্কের হত্যাকারী। আর এ্যাডাম স্ট্যান্টনেরও। তবে স্যাডি কাজটা করেছে ক্রোধের উম্মত্ততায়। আর টাইনি ডাফি কাজটা করেছে শীতল মস্তিষ্কে এবং, শেষে, স্যাডি বার্কের কাজটা কেমন করে যেন ধুয়েমুছে গেলো। আমার জন্য তার আর কোনো অস্তিত্ব থাকলো না।

অতএব, বাকী থাকলো ডাফি, ডাফিই কাজটা করেছে। এবং, অবাক কাণ্ড, এই উপলব্ধি আমার মনকে গভীর আনন্দ ও স্বস্তিতে ভরে দিলো। ডাফি কাজটা করেছে, এটা যেন সব কিছুকে জমাট বাঁধা বরফের উপরে পড়া সূর্যালোকের মতো নির্মল ও উজ্জ্বল করে তুললো। ওইখানে রয়েছে টাইনি ডাফি, তার হীরার আংটি নিয়ে, আর এইখানে রয়েছি আমি, জ্যাক বার্ডেন। অজ্ঞানতা কিংবা দোদুল্যচিত্ততার কারণে দীর্ঘকাল অসাড় ও নিষ্ক্রিয় থাকার পর আপনি যখন হঠাৎ দেখতে পান যে আপনি আবার কাজ করতে পারছেন তখন নিজেকে যেরকম মুক্ত ও নির্মল মনে হয় আমার সেই রকম অনুভূতি হলো। আমার মনে হলো আমি কাজের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি।

কিন্তু কাজটা যে কি তা আমি তখনো বুঝে উঠতে পারি নি।

আমি যখন আবার স্যাডিকে দেখতে যাই — সে আমাকে আবার যেতে বলেছিলো — তখন ওই বিষয়ে কিছু বলার আগেই সে নিজে থেকেই বললো যে আমি চাইলে সে একটা স্টেটমেন্ট দিতে পারে। আমি বললাম তা হলে চমৎকার হয়, আমি চমৎকার বোধও করলাম, কারণ তখনও আমার নিজেকে নির্মল ও মুক্ত মনে হচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো আমি যেন কাজটির দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, আর

স্যাডি জিনিসটা আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। আমি ওকে ধন্যবাদ দিলাম।

স্যাডি বললো, আমাকে ধন্যবাদ দিও না। আমি আমার নিজের জন্য এটা করছি। ডাফি — ডাফি —

স্যাডি আরাম কেদারায় সোজা হয়ে বসলো, তার চোখে আগের মতো আলো জ্বলে উঠলো, স্যাডি বললো, তুমি জানো ও কি করেছিলো?

আমি কিছু বলবার আগেই স্যাডি বলে চললো — পরে, ঘটনাটা ঘটে যাবার পরে, আমি কিছুই অনুভব করতে পারছিলাম না। কিছুই না। সে রাতের ঘটনা আমি জেনেছিলাম, কিন্তু আমার মনে তার কোনো অভিঘাত পড়ে নি। পর দিন সকালে ডাফি আমার কাছে আসে। একগাল হাসি নিয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে, সে বলেছিলো, সত্যি, মেয়ে, তুমি দেখালে বটে!

তখনো আমার মন অসাড় হয়ে আছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়েও আমার নিজের মধ্যে আমি কিছু অনুভব করলাম না। ডাফি তারপর আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে আমার পিঠ চাপড়ে দিলো, কাঁধের দু'হাড়ের মাঝখানটায় একটু হাত ঘষলো তার, তারপর বললো, তুমি ওর ঘড়ি বন্ধ করে দিয়েছো, আর তোমাকে আমি ভুলবো না, মেয়ে। তুমি আর আমি, সত্যি, আমাদের সমঝোতা চমৎকার। আর তখনই ব্যাপারটা ঘটলো। ঠিক ওই মুহূর্তে। আমার মনে হলো যে ক্যাপিটলে নয়, আমার চোখের সামনে ঠিক ওই মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটলো। আমি ওকে আঁচড়ে খামচে ছুটে সরে গেলাম। আমার এ্যাপার্টমেন্ট থেকে আমি দৌড়ে বেরিয়ে যাই। তিন দিন পর, ও মারা যাবার পর, আমি এখানে ফিরে আসি। আমার আর কোথাও যাবার জায়গা ছিলো না।

আমি বললাম, যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এবার আমরা বোধহয় ডাফির ঘড়ি বন্ধ করে দিতে পারবো।

স্যাডি বললো, আইনের চোখে এটা টিকবে না।

তা টিকবে বলে আমি মনে করি নি। তুমি ওকে যাই বলে থাকো, কিংবা ও তোমাকে যাই বলে থাকুক, তাতে আইনতঃ কিছু প্রমাণিত হয় না। কিন্তু অন্য রাস্তাও তো আছে।

সে একটু ভাবলো, তারপর বললো, যে কোনো রাস্তাই তুমি নাও, আইনের কিংবা আইনের বাইরের, আমার মনে হয় তুমি জানো যে তখন এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বে ওই — সে ইতস্তত করলো, যা বলতে যাচ্ছিলো তা বললো না, উক্তিটি সংশোধন করে নিয়ে বললো — ওই এ্যান স্ট্যান্টন।

আমি বললাম, ও রাজী হবে। আমি জানি ও রাজী হবে।

স্যাডি কাঁধ কুঁচকালো, বললো, তুমি কি চাও তুমি জানো। তোমরা সবাই।

আমি ডাফিকে ধ্বংস করতে চাই।

আমার তাতে পূর্ণ সম্মতি আছে। স্যাডি আবার তার কাঁধ কুঁচকালো, তারপর অকস্মাৎ তাকে আবার ভীষণ ক্লান্ত দেখালো। একটু পরে সে আরেকবার বললো, আমার তাতে পূর্ণ সম্মতি আছে, কিন্তু এই দুনিয়াটা তো অজস্র ডাফিতে পরিপূর্ণ। সারা জীবন ধরে যেন আমি তাদের দেখে আসছি।

আমি বললাম, আপাততঃ একটি ডাফির কথাই ভাবছি।

পুরো এক সপ্তাহ ধরে আমি বিষয়টা নিয়ে ভাবলাম। শেষে যখন মনে হলো যে কোনো প্রশাসনিক নথিপত্রের মাধ্যমেই ব্যাপারটা ভাঙতে হবে, অন্য কোনো পথ নেই, ঠিক তখনই খোদ ডাফির কাছ থেকে আমি একটা পত্র পেলাম। আমি কি একবার ওর সঙ্গে দেখা করবো? আমার সুবিধা মতো সময়ে?

ওই মুহূর্তই আমার সুবিধা মতো সময়। আমি তাকে পেলাম ম্যানসনের লাইব্রেরি ঘরে, বড়ো চামড়ার কৌচে, কর্তা যেখানে বসতেন, রাজার মতো ভঙ্গি করে সে ওখানে বসে আছে, শুয়োরের মতো তার গায়ের পোশাক আঁটো আঁটো। আমাকে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে সে একটু সামনের দিকে এগিয়ে এলো, তার জুতোর চামড়া শব্দ করে উঠলো, কিন্তু তার শরীর দুলে উঠলো নিঃশব্দে জলে-ডোবা মানুষের ফুলে ঢোল হওয়া মৃতদেহের মতো, শেষ অবধি যেটা নদীর কর্দমাক্ত তলদেশ থেকে সব বন্ধন ছিন্ন করে ভাসতে ভাসতে উপরে উঠে আসে। আমরা করমর্দন করলাম, ডাফি হাসলো। সে হাত দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলো, তারপর নিজের আসনে গিয়ে বসলো। আসনটা কঁকিয়ে উঠলো।

সাদা কোট পরা নিগ্রো পরিচারক সুরার ট্রে নিয়ে এলো। আমি একটা গ্লাস তুলে নিলাম, কিন্তু ডাফির এগিয়ে দেয়া সিগার প্রত্যাখান করলাম।

সে বললো, কর্তার ব্যাপারটা বড্ড দুঃখের। আমি সায় দিয়ে মাথা নাড়লাম।

সে বললো, সবাই এখানে কর্তার অনুপস্থিতি বড্ড অনুভব করে। আমি এই উক্তিতেও সায় দিয়ে মাথা নাড়লাম।

সে বললো, কাজকর্ম অবশ্য ঠিক মতোই চলছে। কর্তা যেভাবে চাইতেন ঠিক সেইভাবে। আমি তাতেও সায় দিয়ে মাথা নাড়লাম।

সে বললো, তবু এরা এখানে কর্তার অভাব খুবই অনুভব করছে। আমি সায় দিয়ে মাথা নাড়লাম।

সে বললো, জ্যাক, এরা এখানে তোমার অভাবও খুব অনুভব করে। আমি সবিনয়ে মাথা দুলিয়ে বললাম যে আমিও ওদের অভাব অনুভব করি।

টাইনি ডাফি বললো, হ্যাঁ, আমি সেদিন মনে মনে বলছিলাম, একটু গুছিয়ে বসে নিই আমি, তারপরই জ্যাককে ডেকে আনবো। জ্যাকের মতো মানুষই আমার দরকার। ওর সম্পর্কে কর্তার খুব উঁচু ধারণা ছিলো, আর কর্তা যার কদর করতেন এই টাইনিও তার কদর করবে। হ্যাঁ, আমি মনে মনে তাই বলেছি, জ্যাককে আমি ডেকে আনবো। ওর মতো মানুষই আমার দরকার। কোনো রাখ-ঢাক নেই ওর মধ্যে। পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করার মতো একটা মানুষ। ভয় নেই, লোভ নেই, যা সত্য তা অকপটে বলে। একবার কথা দিলে কখনো তার নড়চড় হয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আমার কথা বলছেন?

অবশ্যই। আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। কর্তার সঙ্গে তোমার ঠিক কি ব্যবস্থা ছিলো আমি জানি না, কিন্তু তুমি যদি আমাকে সেটা স্পষ্ট করে জানাও তাহলে এই তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমি তার উপর আরো দশ পার্সেন্ট বেশি দেবো।

আমি বললাম, আগের ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ ছিলো না।

চমৎকার। এই তো একজন সৎ মানুষের কথার মতো কথা। দেখো, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি জানি কর্তা আর তুমি ছিলে এই রকম।

সে তার দুটি চওড়া, সাদা, চকচকে আঙ্গুল উঁচু করে তুলে ধরলো, পোপের আশীর্বাদ করার ভঙিতে, তারপর বললো, তোমরা দুজন ছিলে এই রকম। ভুল বুঝো না আমাকে, আমি কর্তার সমালোচনা করছি না। আমি যে তোমার মূল্য বুঝি সেটা জানাতে চাই।

আমি নিস্পৃহ গলায় বললাম, ধন্যবাদ।

আমার মনে হলো, ওই নিস্পৃহ সুর শুনে সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, জ্যাক, আমি ওটা বিশ পার্সেন্ট করে দিলাম।

আমি বললাম, যথেষ্ট নয়।

ঠিক বলেছো, জ্যাক, যথেষ্ট নয়। পঁচিশ পার্সেন্ট।

আমি মাথা নাড়লাম। এবার তার মধ্যে ঈষৎ অস্বস্তির ভাব দেখা দিলো, সোফাটা কঁকিয়ে উঠলো একটু, কিন্তু দ্রুত সামলে নিয়ে সহাস্যে সে বললো, ঠিক আছে, জ্যাক, তুমিই বলো কোন অঙ্কটা ঠিক, দেখি কি করা যায়। তুমিই বলো কি হলে যথেষ্ট হবে।

কোনো কিছুতেই যথেষ্ট হবে না।

কি বললে?

আমি বললাম, শুনুন, একটু আগেই আপনি বললেন না যে আমার কথার কখনো নড়চড় হয় না, আমি সব সময় সত্য কথা বলি?

হ্যাঁ, জ্যাক।

তা হলে আমি যদি আপনাকে একটা কথা বলি আপনি বিশ্বাস করবেন?

অবশ্যই, জ্যাক।

তাহলে শুনুন। ঈশ্বর এ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে যতো নোংরা কুৎসিৎ দুর্গন্ধময় প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে আপনি হলেন এক নম্বর।

মুহূর্তের জন্য যে নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে এলো সেটা উপভোগ করার পর আমি সবেগে বলে গেলাম, তুমি ভাবছো তুমি আমাকে কিনে নিতে পারবে। তো তুমি কেন আমাকে কিনতে চাও তা আমি জানি। আমি কতটুকু বা কি জানি তা তুমি জানো না। আমি কর্তার খুব কাছের মানুষ ছিলাম। অনেক কিছু আমি জানি। হাতের তাসে আমি হচ্ছি জোকার। আমার নাম জ্যাক, আমি হচ্ছি পাগলা জ্যাক, কিন্তু আমি একচক্ষুবিশিষ্ট নই। তুমি চালাকি করে আমাকে, শেষ তাসটাকে তোমার হাতে কেটে নিতে চাও, কিন্তু সেটা হবে না, টাইনি। সেটা হবার কোনো উপায় নেই। কেন, তুমি জানো?

সে কর্তৃত্বের ভঙিতে বললো, দেখো, দেখো — তুমি এরকম —

আমি বাধা দিয়ে বললাম, সেটা হবার কোনো উপায় নেই কারণ আমি একটা জিনিস জানি। অনেক কিছুই জানি আমি। আমি জানি যে তুমিই কর্তার হত্যাকারী।

মিথ্যে কথা! সে চেয়ারে নড়ে বসলো, আর চেয়ারটা কঁকিয়ে উঠলো।

না, মিথ্যে কথা নয়। আমার অনুমান নয়। অবশ্য আমার এটা অনুমান করা উচিত ছিলো। স্যাডি বার্ক আমাকে বলে দিয়েছে। সে —

ডাফি বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে, সে-ই এর মধ্যে জড়িত।

আমি বললাম, সে জড়িত ছিলো, কিন্তু এখন আর নেই। সে এখন সব কথা প্রকাশ্যে বলবে। মানুষের জানা কিংবা না-জানায় এখন আর তার কিছু এসে যায় না। সে কোনো কিছুর ভয়েই ভীত নয়।

ভীত হলেই তার মঙ্গল হবে। আমি —

ও ভীত নয়, কারণ ও চরম ক্লান্ত। সব কিছু নিয়ে সে ক্লান্ত। তোমাকে নিয়েও।

আমি ওকে খুন করবো।

টাইনির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

আমি বললাম, তুমি কাউকে খুন করবে না। এবার তোমার হয়ে খুন করার জন্য তুমি কাউকে পাবে না। আর তুমি ভয় পাবে। কর্তাকে খুন করতে তুমি ভয় পেয়েছিলে, না করতেও তুমি ভয় পেয়েছিলে, কিন্তু ভাগ্য তোমাকে সহায়তা করে। কিন্তু ভাগ্যকে তুমি একটু ধাক্কা দিয়েছিলে, আর সত্যি বলছি সেজন্য তোমার

সম্পর্কে আমার খানিকটা শ্রদ্ধাবোধ জন্মায়। এর ফলে আমার চোখ খুলে যায়। চিরকাল আমি ভেবে এসেছি যে তুমি বাস্তব নও, কার্টুনের পাতার একটা ছবিমাত্র। আঙ্গুলে হীরার আংটি শোভিত। তুমি হলে কর্তার বক্সিং প্র্যাকটিসের ব্যাগ, তিনি ঘুষি মারবেন আর তুমি শুধু মলিন হাসি হেসে গা পেতে সেই ঘুষি নেবে। তুমি হলে আমি যে লম্বা কোঁকড়ানো রোমের কুকুরের গল্প শুনেছি সেই পুড্‌ল্‌ কুকুরের মতো। তুমি ওই গল্পটা শুনেছো?

উত্তর দেবার সময় আমি ওকে দিলাম না। মুখ খোলার উপক্রম করতেই আমি বলে চললাম, এক মাতালের একটা পুড্‌ল্‌ ছিলো, সে ওটাকে সব সময় সঙ্গে নিয়ে যেতো, এক পানশালা থেকে অন্য পানশালায়। কেন জানো? খুব ভালোবাসতো বলে? না, ভালোবাসার জন্য নয়, কুকুরটাকে সে সব সময় সঙ্গে নিয়ে যেতো, যেন সে ঘরের মেঝে নোংরা না করে তার গায়ে থুতু ফেলতে পারে। তো, তুমি ছিলে কর্তার পুড্‌ল্‌। এবং তুমি সেই ভূমিকায় খুশি ছিলে। তোমার গায়ে থুতু ফেললে তোমার ভালো লাগতো। তুমি মানুষ ছিলে না, তুমি বাস্তবের জগতের নও। তাই ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু আমি ভুল ভেবেছিলাম, টাইনি। তোমার মধ্যে, তোমার গভীরে, কিছু একটা ছিলো যা তোমাকে মানুষে পরিণত করে। গায়ে থুতু ফেলা তুমি সহ্য করো নি। অর্থের বিনিময়েও নয়।

হাতে অর্ধেক খালি গ্লাস নিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আর এখন, টাইনি, তুমি যে বাস্তব এটা জানার পর তোমার জন্য আমার এক রকম দুঃখই হচ্ছে। তুমি মোটা, হাস্যকর, একটা বুড়ো মানুষ, টাইনি। তোমার হার্টের অবস্থা ভালো নয়, লিভার প্রায় পচে গেছে, তোমার মুখ দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে, মনের ভেতর সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা, একটা বিশাল অন্ধকার ভেতর থেকে পাক খেয়ে উঠে আসছে ক্রমাগত, আর তোমার জন্য আমার প্রায় দুঃখই হচ্ছে। কিন্তু তুমি যদি ফিরে একটা কথা বলো তাহলে হয়তো আর তোমার জন্য আমাকে দুঃখিত হতে হয় না। আর তাই আমি এখন তোমার হুইস্কিটা শেষ করে, গ্লাসে থুতু ফেলে, বিদায় নেবো।

আমি হুইস্কিটা শেষ করে আমার হাতের গ্লাস মেঝেতে ফেলে দিলাম (পুরু কার্পেটের জন্য সেটা ভাঙলো না), তারপর দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। প্রায় যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি তখন একটা অস্ফুট শব্দ শুনে ঘুরে তাকালাম। সোফার কাছ থেকে শব্দটা ভেসে এলো, ওটা — ওটা কোর্টে টিকবে না।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, তা টিকবে না। কিন্তু তবু তোমার দুর্ভাবনার অনেক কিছু থাকবে।

আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম, দরজাটা বন্ধও করলাম না, উজ্জ্বল

ঝাড়বাতির নিচ দিয়ে দীর্ঘ হলঘর পার হয়ে, ব্যস্ত রাত্রির মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

আমি বুক ভরে তাজা নিঃশ্বাস টেনে নিলাম, তরুরাজির মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট নক্ষত্রমালার পানে চোখ তুলে তাকালাম। নিজেকে মনে হলো কোটিপতির মতো। সত্যি, চমৎকার পার করেছি ওই দৃশ্যটা। একেবারে আঁতে গিয়ে ঘা লেগেছে। ভীষণ খুশি খুশি লাগছিলো আমার। আমার দেহের ভেতরে আগুন। আমি ড্রাগননিধনকারী সেন্ট জর্জ। আমি এডউইন বুথ, দর্শককুলের বিপুল করতালির জবাব দিচ্ছি বিনয়ের সঙ্গে মাথা নুইয়ে। আমি যীশু খ্রীস্ট, মন্দিরে, চাবুক হাতে।

আমিই আসল মাল।

আর তারপরই হঠাৎ, তারাভরা আকাশের নিচে, আমার নিজেকে মনে হলো সেই লোকের মতো যে সর্বোত্তম স্যুপ থেকে বাদাম পর্যন্ত পরম আয়েস ভরে আহারপর্ব শেষ করে করোনা করোনা সিগার ধরিয়েছে, নিজেকে যার একজন পুণ্যবান কোটিপতি বলে মনে হচ্ছে, আর তারপরই তার প্রাচীন ক্লান্ত পেটের ভেতর থেকে তার জিভে উঠে এসেছে একটা হলুদ, বিশ্রী, পিত্তিমাখা স্বাদ।

এর তিন দিন পর আমি স্যাডি বার্কের কাছ থেকে একটা রেজিস্ট্রি করা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে !

প্রিয় জ্যাক,

পাছে তুমি মনে করো যে আমি যা বলেছি তা ফিরিয়ে নেবো বা অস্বীকার করবো সেই জন্য যে স্টেটমেন্টের কথা বলেছিলাম সেটা লিখে, সাক্ষীর সই নিয়ে, নোটারিকে দিয়ে পাকা করিয়ে এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। সকল রকম ফাঁক-ফোঁকর যতোটুকু বন্ধ করা যায় আমি তার চেষ্টা করেছি। এখন এটা নিয়ে তুমি যা কিছু করতে চাও করতে পারো। দ্বিধাহীনভাবে একথা বলছি। এখন এটা তোমার শিশু।

আর আমি? আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। এখান থেকে মানে এই বৃদ্ধ-ভবন আর পাগলা-গারদের যুগ্ম আবাস থেকে নয়, এই শহর থেকে, এই রাজ্য থেকে। এ জায়গা আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে, তাই আমি কেটে পড়ছি। অনেক দূর চলে যাবো আমি, অনেক দিনের জন্য, এমন কোনো জায়গায় যেখানে আবহাওয়া হয়তো এর চাইতে ভালো হবে। কিন্তু আমার কাজিন (মিসেস সিল লার্কিন, ২৩৩১ বুশো এ্যাভিনিউ), আমার নিকটতম আত্মীয় বলতে একমাত্র যে মানুষটি আছে, তাকে কোনো এক সময় আমার ঠিকানা জানিয়ে দেবো আমি, আর তুমি যদি কখনো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাও তবে তার প্রযত্নে আমাকে লিখলেই হবে। আমি যেখানেই থাকি তুমি যা বলবে তাই করবো। তুমি যদি আসতে বলো তবে আসবো। আমি চাই না যে তুমি ভাবো আমি পিছিয়ে যাচ্ছি, কথা দিয়ে কথা

রাখছি না। ব্যাপারটা যেই জানুক না কেন আমার তাতে কিছু যায় আসে না। ওই ব্যাপারে তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।

কিন্তু আমার পরামর্শ নিলে তুমি সে ব্যাপারে আর কিছুই করবে না। ডাফির জন্য আমার চিত্তে খুব প্রেম আছে সেজন্য নয়। আমি চাই তুমি গাল দিয়ে তাকে তুলোধুনো করে দাও, সে তার কাপড় নষ্ট করে ফেলুক। কিন্তু আমার পরামর্শ, তুমি বিষয়টা নিয়ে আর এগিও না। প্রথমতঃ আইনের মাধ্যমে এর সাহায্যে তুমি কিছু করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিকভাবে যদি তুমি এটা ব্যবহার করো তাহলে খুব বেশি হলে তুমি ডাফির পুনর্নির্বাচনের পথ বন্ধ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু আমি যেমন জানি তেমনি তুমিও জানো যে সে আর নমিনেশানই পাবে না। ওরা তাকে নমিনেশানই দেবে না, কারণ ওরা জানে যে তাদের মানদণ্ডেও সে একটা কাঠের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্তা তাকে শুধু সঙ্গে রাখতেন, ব্যস, তার বেশি না। ওই ঘটনাটা চাউর করে তুমি বদমাশগুলোর খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। ওরা বরং ডাফিকে দল থেকে ছেঁটে ফেলার একটা অজুহাত পাবে।

ওদের শায়েস্তা করতে চাইলে ওদের কবর বরং ওদের নিজেদেরই খুঁড়তে দাও, আর এখন কর্তার অনুপস্থিতিতে সেকাজ তারা নির্ঘাৎ করবে। কিন্তু, তৃতীয়তঃ এই ঘটনাটা প্রকাশ পেলে তোমার ওই স্ট্যান্টন মহিলা অবধারিতভাবে বিপদে পড়বে। তুমি যেমন বলেছো সে হয়তো সত্যি মহত এবং উচ্চ–মনা, সে হয়তো চাইবে যে তুমি একাজটা করো, কিন্তু করলে তুমি নিজেকে একটা বুদ্ধু প্রমাণিত করবে। ইতোমধ্যে তাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে, আর এখন তোমার যদি বিরাট একটা ধারণা হয়ে থাকে যে তুমি একজন মহান স্কাউটপ্রবর আর ওই মহিলা জোন অব আর্ক, আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে তুমি যদি তাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চাও তাহলে সেটা নির্বুদ্ধিতার চরম হবে। তাকে এসম্পর্কে জানানোই বোকামি হবে। যদি না ইতোমধ্যেই হড়বড় করে বলে ফেলে থাকো। হয়তো বলেই ফেলেছো। আমি বলছি না যে সে আমার বিশেষ বন্ধু, কিন্তু যেমন বলেছি তো সে ইতোমধ্যে বহু কষ্ট পেয়েছে, এবং এবার হয়তো তাকে একটু রেহাই দিতে পারো।

কিন্তু, মনে রেখো, আমি কিছুতেই পিছিয়ে যাবো না। আমি শুধু তোমাকে আমার পরামর্শটা দিচ্ছি। ভালো থেকো। চাঙ্গা থেকো।

তোমার স্যাডি বার্ক

আমি স্যাডির স্টেটমেন্টটা আগাগোড়া পড়লাম। যা বলার সব কিছু এতে বলা হয়েছে, প্রতি পাতায় স্যাডি সই করেছে, সাক্ষীরা সই করেছে। কাগজটা আমি

ভাঁজ করে রাখলাম। আমার কোনো কাজে আসবে না এই কাগজ। স্যাডির দেয়া পরামর্শের জন্য নয়। চিঠিতে সে ঠিক কথাই বলেছে। ডাফি আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের সম্পর্কে যা বলেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে। আমি মনে মনে বললাম, জাহান্নামে যাক ওরা সব। ওদের আমি আর একবিন্দু সহ্য করতে পারছি না।

আমি চিঠিটা আবার দেখলাম। তো, স্যাডি আমাকে মহান স্কাউটপ্রবর বললো। অবশ্য এটা তেমন নতুন খবর নয়। সেদিন রাতে, ডাফির সঙ্গে দেখা করার পর, তারাভরা আকাশের নিচে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, আমি তো নিজেকে আরো খারাপ নামে ডেকেছি। তবু আঘাতটা কোমল একটা জায়গায় লেগেছে। টন টন করে উঠছে ব্যথায়। ব্যথাটা আরো বেশি মনে হচ্ছে কারণ এটা আর গোপন ক্ষত নয়, স্যাডি বার্ক এর হদিস পেয়ে গেছে। আমার ভেতরটা সে দেখে ফেলেছে। পুঁথিপড়ার মতো আমাকে সে পড়ে ফেলেছে।

ব্যাপারটার মধ্যে একটামাত্র বিরল সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম আমি। নিজেকে পড়ার জন্য আমাকে স্যাডির চিঠির অপেক্ষায় থাকতে হয় নি। সেদিন রাতে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, খুব খুশি খুশি যখন আমার মনের অবস্থা, নিজেকে যখন মহান একজন স্কাউটপ্রবর ভাবছি, তখনই হঠাৎ আমার জিভে উঠে এসেছিলো, হলুদ, বিশ্রী পিত্তিমাখা স্বাদ।

কি পড়েছিলাম আমি? আমি পড়েছিলাম ঃ কর্তা ও এ্যাডামের হত্যাকারী ডাফি, এটা জানার পর নিজেকে আমার বিশুদ্ধ ও পবিত্র বলে মনে হয়। যখন ডাফিকে আমি তুলোধুনো করি তখন আমার নিজেকে মনে হয় কোটিপতির মতো, কারণ আমি ভেবেছিলাম যে এর ফলে আমি নিষ্কৃতি পেয়ে গেছি। ডাফি হচ্ছে ভিলেন আর আমি হলাম প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিরো। আমি ডাফিকে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়েছি আর তাই আমার মাথা এখন গৌরবে বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। আর তারপরই হঠাৎ কিছু একটা ঘটে গেলো, এবং আমার জিভে আমি পেলাম একটা বিশ্রী হলুদ স্বাদ।

কি ঘটেছিলো? আমি হঠাৎ নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, ডাফি কেন এতো নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিলো যে আমি তার চাকুরি করবো? আর তখনই আমি হঠাৎ সমাধিক্ষেত্রে দেখা ওই ক্ষুদ্র নগণ্য মুখের সাংবাদিকের চোখ দুটি দেখতে পেলাম, তার চোখ দুটি আমাকে দেখছে, আরো যতো চোখ আমাকে ওই ভাবে বিভিন্ন সময়ে দেখেছে সেই সব চোখ আমি দেখলাম, আর আমি তখনই উপলব্ধি করলাম যে আমি ডাফিকে আমার জায়গায় বলি দিতে চেষ্টা করেছি, তাকে

স্কেপগোট বানাতে চেয়েছি, নিজেকে তার চাইতে আলাদা করে দেখতে চেয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বীরত্বের কোটি টাকার আহার্য আমার জিভে তিক্ত হলুদ স্বাদ এনে দেয়, আমার মনে হয় আমি যেন একটা ষাঁড়, কাদামাটির মধ্যে আটকা পড়েছি, ধরা পড়ে গেছি, জড়িয়ে গেছি আষ্টেপৃষ্ঠে। আমি যে নিজেকে এ্যান স্ট্যান্টনের সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্রের সাক্ষী হিসাবে আবার দেখতে পেলাম, যে-ষড়যন্ত্র উইলি স্টার্ক আর এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দেয়, পরিণামে উভয়ের মৃত্যু ডেকে আনে, ব্যাপারটা শুধু তাই নয়। ব্যাপারটা ছিলো তার চাইতে বেশি কিছু। আমার মনে হলো আমি একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জালে ধরা পড়েছি, যার অর্থও আমার বোধের বাইরে। যেন যে-দৃশ্যে আমি এইমাত্র অংশ নিয়ে এসেছি তা একটা ভয়ঙ্কর কমিক মূকাভিনয় মাত্র, কি উদ্দেশ্যে এই মূকাভিনয় তাও আমি জানি না, আমার দর্শককূলকেও আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি জানি যে তারা ছায়ার আড়াল থেকে অপাঙ্গে আমাকে দেখছে। যেন ওই দৃশ্যে টাইনি ডাফি আমার ভাই-এর মতো ধীরে ধীরে তার ঝিনুক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চোখ টিপলো এবং তখনই দুঃস্বপ্নের সত্যটি আমি উপলব্ধি করলাম ঃ আমরা দুজন পরস্পরের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত, অভিন্ন মাংস, অস্থিমজ্জা আর প্রবহমান রক্ত যেভাবে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য যমজ সন্তানকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করে আমাদের বন্ধন তার চাইতেও নিবিড়, তার চাইতেও মারাত্মক। আমরা চিরদিনের জন্য এক বন্ধনে বাঁধা পড়েছি, নিজেকে ঘৃণা না করে আমি কখনো তাকে ঘৃণা করতে পারবো না কিংবা তাকে না ভালোবেসে আমি নিজেকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারবো না। আমরা দুজন মহাকাশের অচঞ্চল চোখের নিচে এক বন্ধনে বাঁধা পড়েছি, মহান কুঞ্চনের পবিত্র আশীর্বাদ আমাদের এক বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। আর ওই মহান কুঞ্চনকে আমাদের প্রশংসা করতেই হবে।

আমি ওই ষাঁড়ের মতো আঁকুপাঁকু করলাম, টানা-হ্যাঁচড়া করলাম, আর আমার মুখ জ্বালিয়ে দিলো তেতো স্বাদ,' সব কিছু এবং সবার প্রতি আমার ঘৃণা উথলে উঠলো, আমার নিজের প্রতি আর টাইনি ডাফির প্রতি, উইলি স্টার্ক আর এ্যাডাম স্ট্যান্টনের প্রতি। আমি নিরপেক্ষভাবে উচ্চারণ করলাম, জাহান্নামে যাক ওরা সবাই। ওই সময়ে ওদের সবাইকে আমার এক রকম দেখতে লাগছিলো। আর আমার নিজেকে দেখাচ্ছিলো ওদের মতো।

বেশ কিছু দিন এই রকমই চললো।

আমি ল্যান্ডিং-এ ফিরে গেলাম না। এ্যান স্ট্যান্টনকে দেখার কোনো ইচ্ছা হলো না আমার। ও আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলো, সেটা আমি খুললামও না। আমার

টেবিলের উপর পড়ে থাকলো চিঠিটা। রোজ ভোরে আমি দেখতাম। আমার পরিচিত কারো মুখ দেখতে আমার ইচ্ছা হলো না। শহরের এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করলাম আমি, নিজের ঘরে বসে থাকলাম, যেসব পানশালায় কখনো যাই না সেখানে গেলাম, ছবিঘরে গিয়ে সামনের সারিতে বসে সিনেমা দেখলাম। পর্দার বুকে বিশাল ও বিকৃত ছায়াগুলি কতো অঙ্গভঙ্গি করে, মারামারি করে, খামচে ধরে, আঁকড়ে ধরে, ঝুলে থাকে, কতো কথা বলে প্রবল জোরের সঙ্গে, আর সেই সব আমাকে কতো জিনিসের কথা মনে করিয়ে দিলো। আর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলাম পাবলিক লাইব্রেরির সংবাদপত্রের ঘরে, যেখানে বৃদ্ধ আর হাভাতে বাউণ্ডুলে মানুষগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়, পৃথিবীর নানা খবর পড়ে, কিংবা চুপ করে বসে থাকে, ফ্যাসফ্যাস করে নিঃশ্বাস নেয়, আর বড়ো বড়ো জানালার শার্সী বেয়ে বাইরে যে ধূসর বৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হয় সেই দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

লাইব্রেরির সংবাদপত্রের ঘরেই আমি সুগার–বয়কে দেখতে পাই। কিন্তু সুগার–বয়কে ওরকম জায়গায় দেখার সম্ভাবনা ছিলো এতই কম যে আমি প্রথমে আমার চোখকে বিশ্বাস করতে চাই নি। কিন্তু না, ভুল হয় নি আমার। ওর বড়ো–মতো মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, যেন ল্যাকপ্যাকে সরু ঘাড় তার ভার বইতে পারছে না, তার মাথার জায়গায় জায়গায় চুল অকালে পড়ে গেছে, সেখানে করোটির উপর আমি দেখলাম শিশুর মতো পাৎলা আর গোলাপী রঙ–এর ত্বক। পরনে নীল সার্জের পোশাক, হাতের কাছটায় কুঁচকে গেছে, তার খাটো হাতদুটি সে সামনের টেবিলের উপর সামান্তরালভাবে নামিয়ে রেখেছে। খাটো কিন্তু জবরদস্ত হাতদুটিকে মনে হচ্ছিলো কসাইর দোকানে সাজিয়ে রাখা মাংসের চাকের মতো। পালিশ করা ওক্ কাঠের হলুদ টেবিলের উপর তার মোটা মোটা হাত ঈষৎ বাঁকা করে ধরে সুগার–বয় এখন একটা ছবির পত্রিকা দেখছে।

তারপর তার একটা হাত, ডান হাত, খুব দ্রুত একটা ভঙ্গি করে টেবিলের নিচের দিকে নেমে গেলো। এই ভঙ্গি আমার খুব চেনা। মনে হলো হাতটা তার কোটের পাশ–পকেটের কাছে চলে গেলো। তারপর সেই হাত ফিরে এলো একটা চিনির ডেলা নিয়ে, ডেলাটা সে তার মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দিলো। তার হাতের ওই দ্রুত ভঙ্গি আমার মনে একটা স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিলো। আমি মনে মনে ভাবলাম, ও কি এখনো সঙ্গে পিস্তল নিয়ে ঘোরে? আমি ওর বাঁ পাশে নিচের দিকে তাকালাম কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। সুগার–বয় নীল সার্জের যে কোট পরতো তা ছিলো সব সময়ই এক সাইজ বড়ো।

লোকটা যে সুগার-বয় তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু আমি চাই না ওর সঙ্গে আমার দেখা হোক। ও এখন মুখ তুললেই আমাকে দেখবে। একেবারে সোজাসুজি। এখনো ছবির পত্রিকায় মাথা গুঁজে আছে, এই সুযোগে আমি দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। আস্তে আস্তে এক পাশ দিয়ে সরে গিয়ে যখন প্রায় দৃষ্টির বৃত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিলাম ঠিক তখনই সে তার মুখ তুললো, আর আমাদের দুজনের চোখ মিলিত হলো। সে চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

আমি অনিশ্চিতভাবে আমার মাথা নাড়লাম, এর অর্থ এই হতে পারতো যে আমি তাকে চিনতে পেরেছি, শুধুই চিনতে পেরেছি, শীতল ও নিরুৎসাহিত করার মতো চেনা, কিংবা এর অর্থ এটাও হতে পারতো যে তাকে আমি আমার পেছন পেছন হলঘরে আসতে বলেছি, সেখানে আমরা কথা বলতে পারবো। সুগার-বয় দ্বিতীয় অর্থটা গ্রহণ করে আমার পেছন পেছন এলো। আমি দরজার বাইরে না দাঁড়িয়ে হলঘরের মধ্য দিয়ে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেলাম (পাবলিক লাইব্রেরিতে সংবাদপত্রের ঘরগুলি সর্বত্রই দু'তলার মাঝখানে থাকে, পুরুষদের টয়লেটের কাছে), যে সিঁড়ি দিয়ে প্রধান লবি-তে যাওয়া যায়। ভাবলাম এই বাড়তি দূরত্বটা দেখে সে বোধহয় কিছু ইঙ্গিত পাবে। কিন্তু না, পেলো না। সে পায়ের হাল্কা শব্দ তুলে আমার পেছন পেছন এলো, নীল সার্জের প্যান্ট তার পশ্চাদ্দেশের উপর দিয়ে ঢোলা হয়ে ঝুলে রয়েছে, পায়ের নিচের দিকে কালো নরম চামড়ার জুতোর উপর ভাঁজ হয়ে তা নুয়ে পড়েছে।

সে বলতে শুরু করলো, কে – কে – কেমন . . . তার মুখ কুঁচকে গেলো, থুতু ছিটকে পড়লো মুখ থেকে।

আমি বললাম, চলে যাচ্ছে। তুমি কেমন আছো?

ভা — ভা — ভালো।

আমরা পাবলিক লাইব্রেরির স্বল্পালোকিত, মলিন বেসমেন্ট হলে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, সিমেন্টের মেঝেতে আমাদের চারপাশে সিগারেটের টুকরো, পেছন দিকে পুরুষদের টয়লেটের দরজা, বাতাসে শকুনো কাগজ, ধুলো আর ডিসইনফেকটেন্টের গন্ধ। সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে, বাইরে ধূসর আকাশ থেকে একটানা বৃষ্টি পড়ছে। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। দুজনেই বুঝলাম যে আমরা এখানে বৃষ্টির হাত থেকে গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ আমাদের অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই।

সুগার-বয় মেঝেতে পা ঘষলো, চোখ নিচু করে মেঝের দিকে তাকালো, তারপর আবার আমাকে দেখে নিয়ে জোরালো ভঙ্গিতে বললো, আমি কা – কা – জ

পেতাম্, ই – ই – ইচ্ছা করলেই।

আমি নিস্পৃহ গলায় বললাম, অবশ্যই।

আমি কি – কি – কিছুই করতে চাই না। এ — এ – এখনো না।

আবারো আমি বললাম, অবশ্যই।

আমি – আ – আ – আমি কিছু টাকা জ – জ – জমিয়েছি।

অবশ্যই।

আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো, তু – তু – তুমি কাজ করছো?

আমি মাথা নাড়লাম, আত্মপক্ষ সমর্থনে ও যা বলেছে তাই বলতে যাচ্ছিলাম, যে ইচ্ছা করলেই আমিও কাজ পেতাম। ইচ্ছা করলেই আমি টাইনি ডাফির দপ্তরে তার ঘরের পাশেই চমৎকার একটি অফিসঘরে মেহগনির টেবিলের উপর পা তুলে বসতে পারতাম। এক মুহূর্তের জন্য, চকিৎ আত্মবিদ্রূপের মধ্য দিয়ে একথাটা ভাবতেই বিদ্যুতের ঝলক আর বজ্রের গর্জনের মতো আমি অকস্মাৎ উপলব্ধি করলাম ঈশ্বর আমার সামনে কি উপস্থিত করেছেন। ডাফি, আমি মনে মনে বললাম, ডাফি।

আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুগার–বয়।

জনশূন্য হলে তার দিকে ঝুঁকে আমি বললাম, শোনো, কর্তাকে কে মেরেছে তুমি জানো?

সরু ঘাড়ের উপর বড়ো–মতো মাথাটা একদিকে সামান্য ঘুরলো, আমার দিকে তাকালো সে, তার মুখে আবার যন্ত্রণার কুঞ্চন দেখা দিলো। সে বললো, হ্যাঁ – ওই হা – হা – হারামজাদা। আ – আ – আমি ওকে গুলী করে মেরেছি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তুমি স্ট্যান্টনকে গুলী করে মেরেছো —

আর তক্ষুণি একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আঘাতের মতো এ্যাডাম স্ট্যান্টনের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, বহু কাল আগে সে বেঁচে ছিলো আর এখন মৃত, আর তখন আমার সামনে দাঁড়ানো এই বিকৃতদেহ, বিষণ্ন, ক্ষুদ্র প্রাণীটির বিরুদ্ধে আমার চিত্তে প্রচণ্ড ঘৃণা উথলে উঠলো। আমি বললাম, হ্যাঁ, তুমি তাকে গুলী করে মেরেছো।

ঘাড়ের উপর তার মাথা ক্লান্ত ভঙ্গিতে আবার নড়ে উঠলো, আবার সে বললো, আ – আ – আমি ওকে গুলী করে মেরেছি।

আমি বললাম, কিন্তু ধরো, তুমি জানো না, ধরো যে, স্ট্যান্টনের পেছনে আর কেউ আছে, যাকে ভুল বুঝিয়ে তার দ্বারা সে কাজটা করিয়েছে?

ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢোকার জন্য আমি একটু সময় দিলাম, দেখলাম যে তার মুখ কুঁচকে যাচ্ছে কিন্তু তার মধ্য থেকে কোনো শব্দ বেরুচ্ছে না।

আমি তখন আবার বললাম, ধরো, ওই কাজটা কে করেছে তোমাকে যদি আমি বলি, যদি আমি সেটা প্রমাণ করতে পারি — তাহলে তুমি কি করবে?

হঠাৎ তার মুখের কুঞ্চন অন্তর্হিত হলো। ওই মুখ এখন শিশুর মুখের মতো মসৃণ এবং প্রশান্ত। মাঝে মাঝে সাংঘাতিক গাঢ়তা মানুষের মুখে ক্ষণিকের জন্য যে ধরনের প্রশান্তি ও বিশুদ্ধতা এনে দেয় আমি সেই ধরনের শান্তি দেখলাম সুগার-বয়ের মুখে।

আমি জানতে চাইলাম, তাহলে তুমি কি করবে?

সে বললো, আমি হারামজাদাকে খুন করবো। আর কথাটা বলার সময় একটুও তোৎলালো না সে।

আমি বললাম, ওরা তোমাকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবে।

সুগার-বয় বললো, আমি তাকে খু — খু — খুন করবো। খু — খু — খুন করার আগে তো ওরা আমাকে ফাঁ — ফাঁ — ফাঁসীকাঠে ঝোলাতে পারবে না।

আমি ওর দিকে আরেকটু ঝুঁকে ফিস ফিস করে বললাম, শোনো, ওরা তোমাকে কিন্তু ফাঁসীকাঠে ঝোলাবে।

ও মুখ উঁচু করে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, লো — লো — লোকটা কে?

আমি আবার বললাম, তোমাকে ফাঁসী দেবে ওরা। তুমি কি সত্যিই ওকে খুন করবে?

সে বলতে আরম্ভ করলো, লো — লো — লোকটা কে? আমার কোট খামচে ধরলো সে, তারপর বলল, তু — তু — তুমি একটা কিছু জানো, আর তু — তু — তুমি সে কথা আ — আ — আমাকে বলছো না?

কথাটা আমি তাকে বলতে পারতাম। আমি তাকে বলতে পারতাম, ঠিক তিনটার সময় এখানে এসো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো। আমি স্যাডির কাগজটা, আমার ঘরে দেরাজের মধ্যে যেটা পড়ে আছে, সেটা নিয়ে আসতে পারতাম। তার উপর সে এক নজর চোখ বুলিয়ে নিতো। একবার মাত্র। ট্রিগারে আঙ্গুল ছোঁয়াবার মতো হতো ব্যাপারটা।

ওর দু'হাত তখনো আমার কোট আঁকড়ে ধরে আছে। সে বললো, ব — ব - বলো আমাকে।

মাত্র এক নজর দেখা। নিখুঁত। আমি বিকালে এখানে ওর সাথে দেখা করতে পারতাম, দু'জনে একসঙ্গে টয়লেটের সারিতে ঢুকতাম, সে কাগজটার উপর এক

নজর চোখ বুলিয়ে নিতো, আমি ঘরে ফিরে কাগজটা পুড়িয়ে ফেলতাম। যাচ্ছেলে – – আমি ওটা পোড়াতে যাবো কেন? আমি কি করেছি? আমি তো এই তুচ্ছ ক্ষুদে প্রাণীটাকে সাবধান পর্যন্ত করে দিয়েছি যে ওরা তাকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবে। আমাকে জড়াবার মতো কিছু ওরা পাবে না।

ও তখনো আমাকে খামচে ধরে আছে। মিনতি ক'রে, দুর্বল গলায়, ও বললো, ব — ব — বলো আমাকে। এক্ষুণি আ — আ — আমাকে বলো।

খুবই সহজ হবে ব্যাপারটা। খুবই নিখুঁত। এবং এর নিখুঁত গাণিতিক বিদ্রূপের দিকটি, এটা যে ডাফি যা করেছে তার অবিকল দ্বিত্বকরণ হবে, আমার চেতনায় সেটা ধরা পড়তেই সজোরে হেসে উঠতে ইচ্ছা করলো আমার। আমি সুগার-বয়কে বললাম, দাঁড়াও, আমাকে খামচে ধরো না এভাবে। শোনো, আমি —

সে খামচানো বন্ধ করে বিনীতভাবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো।

সে করবে কাজটা। আমি বুঝলাম যে সে কাজটা নির্ঘাৎ করবে। এবং এর মাধ্যমে ডাফির সঙ্গে যে সাংঘাতিক কৌতুক করা যাবে সেটা ভেবে আমি প্রায় জোরে হেসে উঠেছিলাম। আর ডাফির নামটা মনে পড়তেই আমি চোখের সামনে ডাফির মুখ দেখতে পেলাম, বিশাল, চাঁদের মতো, তৈলাক্ত, সে মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, প্রিয় ভ্রাতার সঙ্গে গোপনে একটা কৌতুক উপভোগ করছে যেন, আর আমি তার নাম উচ্চারণ করার জন্য যখন মুখ প্রায় খুলেছি তখনই সে আমার দিকে তাকিয়ে তার চোখ টিপলো। সে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো, অন্তরঙ্গ ভ্রাতার মতো। আর আমি সেখানে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

সুগার-বয়ের মুখ আবার কুঞ্চিত হতে শুরু করেছিলো। আবার সে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলো। আমি নিচু হয়ে তার চোখে চোখ রেখে বললাম, এই, আমি ঠাট্টা করছিলাম।

ওর মুখ দেখালো সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন, তারপরই মনে হলো সেই মুখ পুরোপুরি একটা খুনীর মুখ। সেখানে প্রচণ্ড ক্রোধের কোনো স্ফুলিঙ্গ নেই, শুধু একটা শীতল, নিষ্পাপ খুনের নিশ্চয়তা। যেন ওই নিশ্চয়তার মধ্যে তার মুখ একটা খণ্ড-মুহূর্তে বরফে জমাট বেঁধে গেছে। বহুদিন আগে একটা মানুষ বরফের মধ্যে আটকা পড়ে মরে গেছে, বহু শতাব্দী আগে, সেই বরফযুগে, তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাহাড়ের গুহার ভেতরকার তুষাররাশি ইঞ্চি ইঞ্চি করে সেই মানুষের মুখটিকে এখানে ঠেলে নিয়ে এসেছে, আর এখন হঠাৎ সেই মুখ তার আদিম বিশুদ্ধতা আর খুনে নিষ্পাপতা নিয়ে, তার বরফের সর্বশেষ আচ্ছাদনের ওপাশ থেকে, আপনার

দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সুগার বয়ের মুখের মধ্যে আমি সেই মুখ দেখতে পেলাম।

মনে হলো, আমি ওখানে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি নড়তে পারছিলাম না। আমি নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম যে আমার আর রক্ষা নেই।

তারপর বরফ-মুখটি মিলিয়ে গেলো। সামনে দেখলাম শুধু সুগার বয়ের মুখ, ঘাড়ের তুলনায় মাথাটা একটু বেশি বড়ো। মুখটি বলছে, আ — আ — আমি প্রায় কাজটা ক – ক – করে ফেলেছিলাম।

আমি জিভ দিয়ে আমার শুষ্ক ঠোঁট ভিজিয়ে বললাম, জানি।

তো — তো — তোমার এই রকম ক – ক – করা উচিত হয় নি।

আমি দুঃখিত।

তু – তু – তুমি তো আ – আ – আমার মনের অবস্থা জানো। তো — তো — তোমার এরকম ক – ক – করা উচিত হয় নি।

তোমার মনের অবস্থা আমি জানি। সত্যি আমি দুঃখিত।

ঠি – ঠিক আছে। ভু – ভু – ভুলে যাও একথা। সুগার-বয় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো, আগের চাইতেও যেন ছোট হয়ে গেছে, কেমন জবুথুবু আর নিঃসহায়, যেন একটা খড়ের পুতুল, যার ভেতর থেকে একগাদা খড় ঝরে পড়ে গেছে।

আমি মনোযোগ দিয়ে তাকে লক্ষ করে বললাম, মনে হলো যতোটা তাকে ততোটা আমার নিজেকেও, তুমি সত্যিই কাজটা করতে।

ক – ক – কর্তার ব্যাপার যে।

তোমাকে ওরা ফাঁসীকাঠে ঝোলালেও করতে।

ক – ক – কর্তার মতো মানুষ হয় না। আর ওরা তা – তা – তাকেই খুন করে ফেললো। তাকে খু – খু – খুন করে ফেললো ওরা।

সিমেন্টের মেঝের উপর সে পা ঘষলো, মুখ নিচু করে পায়ের দিকে তাকালো, তারপর তোৎলাতে তোৎলাতে অস্ফুট স্বরে বললো, এতো চমৎকার ক – ক – কথা বলতে পারতেন তিনি। কেউ তা – তা – তার মতো করে ব – ব – বলতে পারতো না। তি – তি তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন, স – স – সবাই যখন চেঁচিয়ে উঠতো, ত – ত – তখন মনে হতো আ – আ – আমার ভেতরে বুঝি কিছু ফেটে যাবে।

সে তার বুকে হাত রাখলো, তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

আমি সায় দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, চমৎকার কথা বলতেন তিনি।

কোনো কথা না বলে আমরা দুজন প্রায় আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। সুগার-বয় আমার দিকে তাকালো, তার পায়ের দিকে দেখলো, তারপর আবার

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, তা – তা – তাহলে চ – চ – চলি এখন।

ও আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো, আমি তার করমর্দন করলাম। বললাম, ভালো থেকো।

সিঁড়ি দিয়ে ও উপরে উঠে গেলো, সিঁড়ির জন্য হাঁটু যেন একটু বেশি বাঁকা করলো, কারণ তার পা ছিলো ছোট ও গাব্দাগোব্দা। বিরাট কালো ক্যাডিলাকটা চালাবার সময় সে সব সময় গোটা দুই বাড়তি কুশান, যে ধরনের কুশান আপনি পিকনিকে কিংবা নৌকায় যাবার সময় সঙ্গে নেন, তার পেছনে বসিয়ে নিতো, যেন পায়ের নাগালের মধ্যে ঠিকমতো ক্লাচ আর ব্রেকটা পায়।

তো, সুগার-বয়ের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আইরিশ টাউন এলাকায় সে জন্মেছিলো। ছোট্ট পুঁচকে দেখতে। বড়ো বড়ো ছেলেগুলো সব সময় তার উপর নির্যাতন চালিয়েছে। ওরা বেস্‌বল খেলতো কিন্তু সে ভালো খেলতে পারতো না, তাকে খেলায় নিতো না ওরা। সারাক্ষণ তাকে খাটাতো শুধু। যাও, ব্যাটটা নিয়ে এসো। যাও, একটা কোক এনে দাও। কিংবা, এই মিনিমুখো, আমাকে একটা চিঠি লিখে দাও। আর সে নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কোনো এক সময় সে কি করতে পারে সেটা সে আবিষ্কার করে। তার ওই বেঁটে হাত দিয়ে সে একটা গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে পারে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে। আর তার অগভীর হাল্কা নীল চোখ দিয়ে সে একটা ·৩৮ পিস্তলের নলের মধ্য দিয়ে জমে বরফ হয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী একটি মুহূর্তের মধ্যে সামনের বস্তুটিকে দেখতে পায় অবিশ্বাস্য স্বচ্ছতার সঙ্গে। অতএব, একদা সে নিজেকে খুঁজে পেলো বিশাল কালো এক ক্যাডিলাকের মধ্যে, তার আঙ্গুলের নিচে থরথর করে কাঁপতে থাকে দুই–টনী মহার্ঘ যন্ত্রপাতি, আর নীল স্টীলের এক ·৩৮ পিস্তলের মধ্যে, তার বাঁ বগলের নিচে একটা টিউমারের মতো যেটা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে চলে। আর কর্তা বসে থাকতেন তার পাশে, যিনি কথা বলতে পারতেন অসম্ভব চমৎকার করে।

আমি তাকে বলছিলাম, ভালো থেকো, কিন্তু কি রকম ভালো থাকবে তা আমি জানতাম। কোনো এক প্রভাতে খবরের কাগজ খুলে আমি দেখবো যে জনৈক রবার্ট (নাকি রজার?) ও'শীন মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। অথবা রাস্তার পাশে ছায়ার মধ্যে গাড়িতে বসা অবস্থায় অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর গুলীতে সে নিহত হয়েছে। সে বসেছিলো তার মালিক–পরিচালিত রাস্তার ধারের একটা হুল্লোড়ে রেস্তোরাঁ আর জুয়ার আস্তানার বাইরে, তার গাড়িতে। কিংবা কোনো এক সকালে সে কোনো সাহায্য ছাড়াই হেঁটে চলেছে ফাঁসীকাঠের দিকে, কারণ একটা হাঙ্গামার সময় মার্ফি নামক জনৈক পুলিশের চাইতে বেশি দ্রুতগতিতে সে তার পিস্তল বার করে তাকে

লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে সক্ষম হয়েছিলো। কিংবা এটা হয়তো বেশি রোমান্টিক হয়ে গেলো। হয়তো সে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে. সবকিছু মরে যাবার পরও, অবশেষে তার স্নায়ুগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে (সুরা, নেশা কিংবা শুধুই সময়ের হাতে), আর সে দিনের পর দিন পাবলিক লাইব্রেরির সংবাদপত্রের ঘরে চুপ করে বসে থাকবে, জানালার শার্সী বেয়ে শীতের ধূসর বৃষ্টি পিছলে নামতে থাকবে, তেল-চিটচিটে জীর্ণ কাপড়জামা পরা একজন শীর্ণ টেকো ছোটখাটো বৃদ্ধ, ছবির পত্রিকার উপর মাথা নিচু করে ঝুঁকে থাকবে।

অতএব আমি হয়তো ডাফি আর কর্তার সম্পর্কে তাকে কিছু না বলে, তাকে সোজা তার লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছুতে না দিয়ে, একটা বুলেটের মাধ্যমে তার সমাপ্তি সুনিশ্চিত না করে তার কোনো উপকার করি নি। সারা জীবন ধরে সুগার বয় যে একটিমাত্র জিনিস অর্জন করেছিলো, যা ছিলো তার প্রকৃত আপন সত্তা, তা থেকে আমি ওকে বঞ্চিত করেছি। ওই জিনিসটি ছাড়া আর সব কিছুই ছিলো অপচয় আর দুর্ঘটনা আর পচা দুর্গন্ধময় বিকৃত সত্য, ছ'সপ্তাহের ছুটিতে বেরিয়ে পড়ার সময় বাসায় আইস-বক্সে আধ-বোতল দুধ ফেলে রেখে গেলে তার যে অবস্থা হয় সেই রকম।

কিংবা হয়তো সুগার-বয়ের এমন একটা কিছু ছিলো যা থেকে তাকে কখনোই বঞ্চিত করা যায় না।

সুগার-বয় চলে যাবার পর, পুরানো কাগজ আর ডিসইনফেকটেন্টের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, আমি এই সব ভাবছিলাম। তারপর আমি সংবাদপত্রের ঘরে ফিরে যাই, চেয়ারে বসি, ছবির পত্রিকার উপর ঝুঁকে পড়ি।

সুগার-বয়ের সঙ্গে লাইব্রেরিতে আমার দেখা হয় ফেব্রুয়ারিতে। আমি যে জীবনধারা বেছে নিয়েছিলাম তাই চালিয়ে গেলাম, আমার চারপাশে লক্ষ্যহীনতা আর অজ্ঞাত পরিচয়ের চাদর জড়িয়ে। কিন্তু সেখানেও একটা পার্থক্যের জন্ম হয়েছে, আমার জীবনের পরিবেশ ও ঘটনাতে না হলেও আমার মনের মধ্যে। এবং অবশেষে, বেশ কয়েক মাস পরে, মে মাসে, সুগার-বয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে আমার মনের মধ্যে যে পার্থক্যের জন্ম হয় তার তাগিদে আমি লুসি স্টার্কের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অন্ততঃ, এখন, ব্যাপারটা আমি সেই আলোকেই দেখছি।

লুসি তখনো খামার বাড়িটায় বাস করছিলো। আমি ওখানে তাকে ফোন করি। তার গলা বেশ স্বাভাবিক শোনা গেলো। আমাকে সে যেতে বললো।

আর তাই আমি আবার সেই ছোট্ট সাদা বাড়ির বসবার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম, বাদাম কাঠের আসবাবপত্র, লাল রেশমি কাপড়ে মোড়া সোফাসেট আর

ফুলের নকশা আঁকা কার্পেট। বহুদিন এই ঘরের কোনো কিছুর পরিবর্তন হয় নি, আরো বহুদিন ধরে বোধহয় হবেও না। কিন্তু লুসির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। একটু মোটা হয়েছে, চুলে আরেকটু সুস্পষ্ট পাক ধরেছে। এই বাড়িটা প্রথম দেখার পর আমার চোখের সামনে যে রকম মহিলার ছবি ভেসে উঠেছিলো লুসি এখন অনেকটা সেই রকম দেখতে হয়েছে — সম্ভ্রান্ত, মধ্যবয়েসী এক মহিলা, পরনে পরিষ্কার ধূসর রঙের সুতির পোশাক, পায়ে সাদা মোজা আর কালো চামড়ার জুতো, বারান্দায় দোলচেয়ারে বসে আছে, দিনের কাজ এখন শেষ হয়ে গেছে, ছেলেরা এখনো মাঠে, রাতের খাবার তৈরি করা কিংবা বিকালের দুধ ছাঁকবার সময় এখনো হয় নি, তাই এখন পেটের উপর দু'হাত জড়ো করে বসে বসে একটু আরাম করছে। এখনো লুসি ঠিক সেই মহিলাতে রূপান্তরিত হয় নি, কিন্তু আরো ছয়-সাত বছর যেতে দিন, ঠিকই হবে।

আমি কার্পেটের বুকে একটা ফুলের উপর চোখ রেখে বসে থাকলাম, কিংবা চোখ তুলে লুসিকে দেখলাম, তারপর আবার তাকালাম ফুলের দিকে, আর লুসির চোখ ঘুরে বেড়ালো ঘরময়, কতকটা আত্মমগ্নভাবে, একজন নিপুণ গৃহকর্ত্রীর চোখ যেভাবে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও ফাঁকি দিয়ে একটু ধুলো জমে আছে কিনা সেটা খুঁজে বার করার জন্য। আমরা পরস্পরের সঙ্গে সারাক্ষণ কথা বলছিলাম কিন্তু ওই আলাপচারিতা ছিলো আড়ষ্ট, একটা কঠিন কাজ, সম্পূর্ণ ফাঁকা।

আপনার সঙ্গে ছুটিতে সমুদ্রসৈকতে কোনো একজনের সঙ্গে দেখা হয়, চমৎকার সময় কাটে আপনার। কিংবা আপনি একটা পার্টিতে গেছেন, গ্লাসের টুং টাং শব্দ হচ্ছে, একজন শব্দের ঝড় তুলে পিয়ানো বাজাচ্ছে, একটা কোণায় অচেনা একজনের সঙ্গে আপনার আলাপ হলো, তার মন যেন আপনার নিজের মনের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণতা এনে দিলো, আপনাদের দুজনের চোখের সামনে যেন নানা আইডিয়ার একটা বিস্ময়কর সম্ভার উন্মোচিত হলো। কিংবা কারো সঙ্গে আপনি একটা তীব্র অথবা অত্যন্ত বেদনাময় অভিজ্ঞতায় একসঙ্গে অংশ নিলেন আর আপনি আবিষ্কার করলেন তার সঙ্গে এক সুগভীর সহমর্মিতা। তখন আপনি সুনিশ্চিতভাবে মনে করলেন যে পরে যখন তার সঙ্গে আবার আপনার দেখা হবে তখন ওই প্রফুল্ল সঙ্গী আপনাকে সেই অতীতের প্রফুল্লতায় অভিষিক্ত করবে, সেই প্রদীপ্ত অচেনা মানুষটি আপনার চিত্তকে তার জড়তা থেকে জাগিয়ে তুলবে, সেই মরমী বন্ধুটি অতীতের ওই সহমর্মিতা দিয়ে আপনাকে সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু ওই প্রফুল্লতা, ওই দীপ্তি, ওই সহমর্মিতার মধ্যে একটা কিছু ঘটে যায়, প্রায় সব সময়ই ঘটে যায়। আপনারা একসঙ্গে অতীতের যে ভাষায় কথা বলেছেন তার স্বতন্ত্র

শব্দগুলি আপনাদের মনে আছে কিন্তু তার ব্যাকরণ আপনারা ভুলে গেছেন। নাচের মুদ্রাগুলি আপনাদের মনে আছে, কিন্তু সেই সঙ্গীত আর এখন বাজে না। আর তাই একটা ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অতএব আমরা দুজন বসে থাকলাম, আর আমাদের চারপাশে মিনিটগুলি, শরতের শান্ত বাতাসে টুপটুপ করে পাতা পড়ার মতো নড়ে উঠলো এবং একটি একটি করে ঝরে পড়লো। খানিক নীরবতার পর লুসি উঠে গেলো, আর আমি একা পড়ে থাকলাম টুপটুপ করে পাতাগুলি ঝরে পড়ার দৃশ্য দেখার জন্য।

কিন্তু লুসি ফিরে এলো একটা ট্রে নিয়ে, তার উপর একটা জগে বরফ-চা, দুটো গ্লাস আর একটা বড়ো কেক। গ্রামাঞ্চলে আপনি কোনো বাড়িতে বেড়াতে গেলে এই ভাবেই আপনাকে আপ্যায়ণ করা হয়, বরফ-চা আর কেক দিয়ে। নিঃসন্দেহে আমার আসার খবর পেয়েই লুসি আজ সকালে এই কেক বানিয়েছে।

তো কেক খাওয়া মানে তবু একটা কিছু করা। মুখভর্তি কেক নিয়ে আপনি কথা বলবেন এটা কেউ প্রত্যাশা করে না।

শেষ পর্যন্ত, অবশ্য, লুসিই কিছু বললো। তার পাশে টেবিলে কেক, একটা মানুষ বসে বসে তার কেক খাচ্ছে, কেকটা যে ভালো হয়েছে এটা সে জানে, বছরের পর বছর রবিবারের অপরাহ্নে অনেক লোক এই ঘরে এই ভাবে বসে কেক খেয়েছে — হয়তো এই সবই শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব করে তুলেছিলো।

লুসি বললো, টমের মৃত্যুর খবর তুমি জানো।

খুব স্বাভাবিক গলায় সে কথাটা বললো। আমি ভারী স্বস্তি পেলাম। বললাম, হ্যাঁ, জানি।

গত ফেব্রুয়ারিতে খবরটা আমি কাগজে দেখেছিলাম। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে আমি যাই নি। আমার মনে হয়েছিলো যথেষ্ট শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছি। লুসিকে আমি কোনো চিঠিও লিখিনি। কি লিখতাম আমি?

ও বললো, নিউমোনিয়া হয়েছিলো।

এ্যাডামের কথা মনে পড়লো আমার। সে বলেছিলো যে এসব ক্ষেত্রে সচরাচর এভাবেই মৃত্যু হয়।

লুসি বললো, খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়। ভুগতে হয় নি বেশি। তিন দিনের মধ্যে মারা যায়।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লুসি বললো, আমি এখন সমর্পিত। ঈশ্বর যা কিছু করেছেন সব আমি এখন মেনে নিয়েছি, জ্যাক। এক একটা সময় আসে যখন

মনে হয় আর বুঝি তুমি কিছু সহ্য করতে পারবে না, তারপর আঘাতটা আসে, এবং তুমি তা সহ্য করতে পারো। ঈশ্বরের সহায়তায় আমি এখন প্রশান্তচিত্তে পুরোপুরি সমর্পিত।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

লুসি বললো, তারপর, ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে শান্তচিত্তে নিজেকে সমর্পণ করার পর ঈশ্বর আমাকে বেঁচে থাকার জন্য একটা জিনিস দিলেন।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে একটা শব্দ করলাম। লুসি হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে পড়লো। আমি ভাবলাম আমাদের সাক্ষাৎপর্ব শেষ হলো। আমিও ঝটপট উঠে পড়ে বিদায় সম্ভাষণ সূচক কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, যাবার জন্য আমি প্রস্তুত এবং ব্যগ্র, এখানে আসাই বোকামি হয়েছে আমার, কিন্তু লুসি হাত বাড়িয়ে আমার বাহু স্পর্শ করলো, বললো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই আমি। সে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, আমার সঙ্গে এসো।

আমি ওর পেছন পেছন ছোট্ট হলঘরটিতে গেলাম, সেটা পার হলাম, তারপর পেছনের একটা ঘরে প্রবেশ করলাম। প্রথমে চোখে পড়ে নি, তারপর দেখলাম জানালার কাঁছে একটা দোলনা, আর সেই দোলনায় শুয়ে আছে একটি শিশু।

লুসি দোলনার ওপাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো, আর ঠিক ওই মুহূর্তেই আমি দেখতে পাই সমস্ত জিনিসটা। আর তখন আমার মুখের চেহারা নিশ্চয়ই দেখবার মতো হয়ে উঠেছিলো। যাই হোক, লুসি বললো, টমের ছেলে। আমার নাতি। এ টমের ছেলে, জ্যাক।

দোলনার উপর ঝুঁকে পড়ে সে শিশুর দেহের নানা জায়গায় হাত বুলালো, মেয়েরা যেমন করে থাকে। তারপর বাচ্চার মাথার নিচে নিজের এক হাত রেখে সে তাকে কোলে তুলে নিলো। সে তাকে দোলালো দু'একবার, তারপর সোজা তার মুখের দিকে তাকালো। শিশু মুখ ফাঁক করে হাই তুললো, চোখ দুটি মিট মিট করে কুঁচকালো, খুললো বড়ো করে, তারপর দোলানী আর চুকচুক শব্দ শুনে ভেজা, গোলাপী, দন্তহীন মাড়ি দেখিয়ে হাসলো, অবিকল বিজ্ঞাপনের ছবির মতো। আর লুসি স্টার্কের মুখে ফুটে উঠলো হুবহু আপনার প্রত্যাশিত অভিব্যক্তি, বর্তমান বিষয়টি সম্পর্কে যা কিছু বলার ছিলো সব বলে দিলো সেই অভিব্যক্তি।

দোলনার পাশ দিয়ে ঘুরে সে আমার কাছে এলো, বাচ্চাকে তুলে ধরলো আমার দেখার জন্য। আমি বললাম, ভারী মিষ্টি বাচ্চা, তারপর আঁকড়ে ধরার জন্য শিশুটির দিকে আমার তর্জনী বাড়িয়ে ধরলাম, যেমনটি একজনের করা উচিত।

লুসি বললো, টমের মতো দেখতে, তাই না?

সাংঘাতিক অসত্য ভাষণ হবে না, মনে মনে তেমন একটা উত্তর ভাবছিলাম আমি, কিন্তু তার আগেই লুসি বলে চললো, কিন্তু তোমাকে এ প্রশ্ন করা নিছক বোকামি। তুমি কেমন করে জানবে? মানে বাচ্চা বয়সে টম কেমন দেখতে ছিলো।

লুসি কথা থামিয়ে আবারো বাচ্চাকে লক্ষ করলো। তারপর আমার চাইতে যেন নিজেকেই বেশি উদ্দেশ্য করে বললো, হ্যাঁ, টমের মতো দেখতে। তারপর সে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি জানি এই বাচ্চা টমের, হতেই হবে টমের, একেবারে টমের মতো দেখতে।

আমি শিশুটিকে খুঁটিয়ে দেখলাম, মাথা নাড়লাম, সায় দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, টমের মতোই দেখতে।

ও বললো, আর আমি কিনা এক সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম বাচ্চাটা যেন টমের না হয়, যেন অন্যায় কাজটা টমের দ্বারা সংঘটিত না হয়।

শিশুটি তার কোলে লাফালো একটুখানি। মোটাসোটা আর সত্যিই সুশ্রী দেখতে। লুসি তাকে উৎসাহব্যঞ্জকভাবে আরেকটু দোলালো, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আর পরে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি বাচ্চাটা যেন টমের হয়। আর আমি এখন জানি যে সে টমেরই সন্তান।

আমি সায় দিয়ে মাথা নাড়লাম।

ও বললো, আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে জানতাম সেকথা। আর তাছাড়া, তোমার কি মনে হয় যে ওই বেচারা মেয়েটা — ওর মা — সে যদি না জানতো যে বাচ্চাটা টমের তাহলে আমার হাতে তাকে এভাবে তুলে দিতো? মেয়েটা যাই করে থাকুক না কেন, ওরা যেসব কথা বলেছে তাও যদি করে থাকে, তবু তোমার কি মনে হয় না যে মা এসব ক্ষেত্রে সব সময় জানতে পারে। মা ঠিকই জানতে পারে।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

লুসি বললো, কিন্তু আমিও জানতাম। আর তাই আমি ওকে চিঠি লিখি। আমি ওর কাছে যাই, বাচ্চাটাকে দেখি। আর তখনই আমি আরো বেশি করে বুঝতে পারি। বাচ্চাটাকে দেখা মাত্র, তাকে কোলে নেয়া মাত্র। ওকে দত্তক নেবার প্রস্তাবে আমি মাকে রাজি করাই।

তুমি ভালোভাবে আইনতঃ সব ব্যবস্থা করেছো তো? শেষে না ও আবার — আমি বলতে গিয়েও থেমে গেলাম, শেষে না ও আবার বছরের পর বছর ধরে তোমার রক্ত চুষে খায়।

কিন্তু আমি কথাটা বলার আগেই, আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম তা একটুও না ধরতে পেরেই, লুসি বললো, ও, হ্যাঁ, আমি ওর কাছে উকীল পাঠাই, তিনি সব

ঠিকঠাক করে দিয়েছেন। কিছু টাকাও আমি ওকে দিয়েছি। বেচারা মেয়েটা এ জায়গা ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যেতে চেয়েছিলো। উইলি খুব বেশি কিছু রেখে যায় নি, যা পেতো প্রায় সবই সে খরচ করে ফেলতো, কিন্তু তবু আমার যতোটা সম্ভব আমি ওকে দিয়েছি। ছয় হাজার ডলার।

আমি মনে মনে ভাবলাম, তো সিবিল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা থেকে ভালোই ফয়দা তুললো।

লুসি ঔদার্যের আধিক্যে মূল্যবান শিশুটিকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ওকে একটু কোলে নিতে চাও?

অবশ্যই।

আমি ওকে কোলে নিলাম, খুব সন্তর্পণে, যেন পিছলে হাত থেকে পড়ে না যায়। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, কত ওজন ওর? প্রশ্নটা করেই আমি উপলব্ধি করলাম যে কোনো একটা কিছু কেনার সময় মানুষের গলায় যে সুর বাজে আমার গলায় সেই সুর বেজে উঠেছে।

লুসি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, পনেরো পাউন্ড তিন আউন্স। তিন মাসের শিশুর পক্ষে বেশ ভালো।

আমি বললাম, অবশ্যই।

লুসি বাচ্চাটাকে আমার কোল থেকে নিজের কোলে নিয়ে দ্রুত একবার নাচালো, তাকে বুকে চেপে ধরে নিজের মাথা একটু নিচু করলো, ওর মুখ শিশুর মাথার উপর নেমে এলো, তারপর সে তাকে দোলনায় শুইয়ে দিলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওর নাম কি?

লুসি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাছে সরে এসে বললো, প্রথমে ভেবেছিলাম টমের নামে নাম রাখবো। বেশ কিছুদিন তাই ভেবেছিলাম। তারপর আমার মাথার মধ্যে নামটা এলো। উইলির নামে নাম রাখবো ওর। ওর নাম উইলি — উইলি স্টার্ক।

আবার আমাকে ছোট হলঘরে নিয়ে এলো লুসি। যে টেবিলের উপর আমার হ্যাট রাখা ছিলো আমরা সেখানে হেঁটে এলাম। লুসি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, যেন হলঘরে পর্যাপ্ত আলো নেই। তারপর বললো, আমি উইলির নামে ওর নাম রেখেছি কারণ —

তখনো সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখছিলো।

— কারণ উইলি ছিলো একজন বড়ো মাপের মানুষ।

আমি সম্ভবতঃ সায় দিয়ে মাথা নেড়েছিলাম।

লুসি মাথা উঁচু করলো, যেন একটা কিছুর মোকাবেলা করছে, তারপর বললো,

ওহ্, সে কিছু কিছু ভুল করেছে, খারাপ ভুল। হয়তো, ওরা যেমন বলে, খারাপ কাজও সে করেছে। কিন্তু ভেতরে — গভীরে —

লুসি নিজের বুকের উপর হাত রেখে বললো, — সে সত্যিই ছিলো খুব বড়ো মাপের একটি মানুষ।

এখন আর সে আমার মুখ দেখছে না, সেখানে কি লেখা আছে সেটা পড়ার চেষ্টা করছে না। ওই মুহূর্তে সে আর আমাকে নিয়ে ব্যস্ত নয়। আমি যেন আর সেখানে উপস্থিত নেই।

সে আবার বললো, প্রায় ফিস ফিস করে, সত্যিই সে ছিলো বড়ো মাপের মানুষ। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে সে বললো, বুঝলে, জ্যাক, আমাকে একথা বিশ্বাস করতেই হবে।

হ্যাঁ, লুসি, তোমাকে সেকথা বিশ্বাস করতে হবে। বেঁচে থাকতে হলে তোমাকে সেকথা বিশ্বাস করতে হবে। আমি জানি তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে সেকথা। করতেই হবে, আমি তা বুঝি। কারণ, বুঝলে, লুসি, আমাকেও যে সেকথা বিশ্বাস করতে হবে। আমাকেও বিশ্বাস করতে হবে যে উইলি স্টার্ক একজন যথার্থই বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন, একজন মহান মানুষ ছিলেন। তাঁর মহত্বের কি হয়েছিলো প্রশ্ন সেটা নয়। একটা বোতল ভেঙে তরল পদার্থ যেভাবে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে তিনি হয়তো সেই ভাবে তাঁর মহত্বকে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কিংবা অন্ধকারের মধ্যে যেভাবে কেউ কাঠখড় লতা পাতা একত্র করে জড়ো ক'রে তাতে আগুন ধরিয়ে একটা বিশাল অগ্নিকুণ্ড বানায়, শেষে সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে শুধু আবার অন্ধকারটুকু থাকে আর দু'একটা মিটমিট করা নিভু নিভু কাষ্ঠখণ্ড, হয়তো সেই রকম তিনিও তাঁর সব মহত্ব একত্র জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো তিনি তাঁর মহত্ব আর অমহত্বের পার্থক্যটুকু ধরতে পারেননি, আর দুটোকে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেছিলেন যে শেষে জিনিসটা হারিয়েই যায়। কিন্তু তাঁর মধ্যে জিনিসটা ছিলো। আমাকে সেকথা বিশ্বাস করতেই হবে।

এবং ওই বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত উপনীত হই বলেই আমি বার্ডেন্‌স্ ল্যান্ডিং-এ ফিরে আসি। যখন আমি পাবলিক লাইব্রেরির নিচ তলার হলঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে সুগার বয়কে উপরে উঠে যেতে দেখি, কিংবা গ্রামের রঙ চটে যাওয়া সাদা বাড়ির হলঘরে লুসি যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো তখনই যে আমি ওই বিশ্বাসে উপনীত হই তা নয়। তবে ওই জিনিসগুলির জন্যই — এবং পরে আরো যেসব নানা ঘটনা ঘটে তার জন্যই — আমি শেষ পর্যন্ত ওই বিশ্বসে উপনীত হই। এবং উইলি যে যথার্থই একজন বড়ো মাপের মানুষ ছিলেন সেই বিশ্বাসে উপনীত হই বলেই

আমি অন্য সব মানুষ সম্পর্কেও, নিজের সম্পর্কেও, উন্নততর ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হই। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ত্রুটির জন্য নিজেকে কড়াভাবে অভিযুক্তও করতে পারি।

আমার মায়ের অনুরোধে গরমের শুরুতে আমি বার্ডেন্‌স্ ল্যান্ডিং-এ ফিরে আসি। তিনি একদিন রাতে আমাকে টেলিফোন করে বললেন, খোকা, আমার ইচ্ছা তুমি এখানে আসো। যতো তাড়াতাড়ি পারো । কাল আসতে পারবে?

আমি তখনো ওখানে ফিরে যেতে চাই নি, তাই কি জন্য তিনি আমাকে যেতে বলছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তিনি সরাসরি কোনো জবাব দিলেন না, বললেন যে আমি গেলে পরে বলবেন।

অতএব আমি গেলাম।

পর দিন শেষ বিকালের দিকে গাড়ি নিয়ে বাড়িতে পৌছে দেখি তিনি বাইরের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে আছেন, আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা পাশের জাল দিয়ে ঘেরা গ্যালারিতে গিয়ে বসলাম। তিনি বিশেষ কিছু বলছিলেন না, আমিও তাঁকে তাড়া দিলাম না।

প্রায় সাতটার দিকেও যখন তরুণ এক্সিকিউটিভকে দেখা গেলো না তখন আমি জানতে চাইলাম তিনি রাতে বাসায় খাবেন কিনা।

মা তাঁর হাতের খালি গ্লাসটা নাড়ালেন, যে অল্প একটু বরফ তলায় পড়েছিলো সেটা গ্লাসের গায়ে লেগে একটা টুং শব্দ হলো, তারপর তিনি বললেন, আমি জানি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাইরে কোথাও ভ্রমণ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে নাকি?

গ্লাসে টুং শব্দ তুলে মা বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে জানালেন, পাঁচদিন হলো ও চলে গেছে। আমি এখান থেকে না চলে যাওয়া পর্যন্ত সে আর ফিরে আসবে না। শোনো —

তিনি তাঁর হাতের গ্লাস টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হলো তিনি যেন একটা জিনিস চূড়ান্তভাবে শেষ করে দিচ্ছেন। তারপর মা বললেন, আমি ওকে ছেড়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম, ওহ্, কী কাণ্ড!

মা আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, যেন কিছু একটা প্রত্যাশা করছেন। কি তা আমি বলতে পারবো না।

আমি আবার বললাম, ওহ্, কী কাণ্ড! তখনো তাঁর পরিবেশিত তথ্যটি আমি ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি নি।

মা নিজের আসনে আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, তুমি অবাক হচ্ছো?

অবশ্যই। খুবই অবাক হচ্ছি।

মা আমাকে মনোযোগ সহকারে দেখলেন। আমি তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে দেখলাম একটা অদ্ভুত অনুভূতির আলোছায়ার খেলা, এতো ক্ষণস্থায়ী ও অস্পষ্ট যে তার কোনো সংজ্ঞা দেয়া যায় না।

আমি আবার বললাম, নিশ্চয়ই আমি খুব অবাক হচ্ছি।

তিনি 'ওহ্' বলে তাঁর চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তাঁকে মনে হলো সেই মানুষের মতো যে গভীর জলে পড়ে গিয়ে একটা দড়ি আঁকড়ে ধরে এক মুহূর্তের জন্য কোনো রকমে ঝুলে ছিলো, তারপর তার হাত থেকে দড়ি ছুটে যায়, আবার সে দড়িটা ধরতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, অবশেষে হাল ছেড়ে দেয়, বুঝতে পারে আর চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। এখন আর তাঁর মুখে অস্পষ্ট কিছু নেই। যেমন বললাম ঠিক সেই রকম হয়েছে তাঁর মুখের অবস্থা। দড়িটা তিনি ধরতে পারেন নি।

আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তিনি উপসাগরের পানে তাকালেন, যেন তাঁর মুখের ভাবটা তিনি আমাকে দেখাতে চাইলেন না। তারপর তিনি বললেন, আমি ভেবেছিলাম — আমি ভেবেছিলাম — তুমি হয়তো অবাক হবে না।

কেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে আমি কিংবা অন্য যে কেউ অবাক হবো না তা আমি বলতে পারবো না। তাঁর বয়সের এক মহিলা বছর চল্লিশের একটি সক্ষম সমর্থ মানুষকে গেঁথে ফেলার পর তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে না চাইলে তো অবাক হবারই কথা। ওই মহিলার যদি প্রচুর অর্থ থাকে এবং লোকটি যদি তরুণ এক্সিকিউটিভের মতো হাবাগঙ্গারাম হয় তবুও। কিন্তু সেকথা তাঁকে আমি বলতে পারতাম না, কাজেই আমি চুপ করে থাকলাম।

উপসাগরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মা বললেন, আমি ভেবেছিলাম — একটু ইতস্তত করলেন, তারপর আবার শুরু করলেন — আমি ভেবেছিলাম, কেন, তা হয়তো তুমি বুঝবে, জ্যাক।

আমি জবাব দিলাম, না, আমি বুঝতে পারছি না।

একটু ক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি, তারপর আবার শুরু করলেন, ঘটনাটা ঘটে গত বছর। যখন ঘটে তখনই আমি বুঝেছিলাম। ওহ্ — তখনই আমি বুঝেছিলাম যে এই রকমই হবে।

কখন কি ঘটে?

যখন তুমি — যখন তুমি — মা চুপ করলেন, যা বলতে যাচ্ছিলেন তা শুধরে

নিয়ে বললেন, যখন মন্টি — মারা যায়।

তারপর তিনি এক ঝটকায় আমার দিকে ঘুরে তাকালেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠলো একটা দিশাহারা ব্যাকুল আবেদন। আবার দড়িটা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছেন তিনি। মা বললেন, জ্যাক — তুমি বুঝতে পারছো না? মন্টি — মন্টিই ছিলো সব।

আমার মনে হলো আমি বুঝতে পেরেছি। তাঁকে বললামও সেকথা। বিচারপতি আরউইনের মৃত্যুর দিনে যে বিশুদ্ধ রূপালী তীক্ষ্ণ চিৎকার আমাকে পাগলের মতো হলঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো এবং পরবর্তী সময়ে ঘটনাটা উপলব্ধি করার পর বিছানায় প্রায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকা আমার মায়ের যে-মুখ আমি দেখি তার কথা আমার মনে পড়লো।

তিনি বললেন, মন্টিই ছিলো সবকিছু। সব সময়। আমি সেকথা বুঝি নি। বহু বছর ধরে ওর আর আমার মধ্যে কিছু ছিলো না, কিছু ঘটে নি। কিন্তু মন্টিই ছিলো সব সময়। সব কিছু। ও মারা যাবার পর আমি সেটা বুঝতে পারি। আমি বুঝতে চাই নি, কিন্তু বুঝতে পারি। তারপর আমি আর পারলাম না। একটা সময় উপস্থিত হলো যখন আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। কিছুতেই পারলাম না।

তারপর হঠাৎ তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, মনে হলো কেউ যেন তাঁকে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে তুলে ফেললো। তিনি বললেন, আমি পারলাম না, কারণ সব কিছুই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো। প্রথম থেকেই সব কিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো।

হাতের রুমালটা তিনি মোচড়ালেন, টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর চিৎকার করে বললেন, ওহ্, জ্যাক, আগাগোড়াই সবকিছু এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো !

মা ছেঁড়া টুকরো টুকরো করা রুমালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গ্যালারি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমি ভেতরের মেঝেতে তাঁর হিলের শব্দ শুনলাম, কিন্তু সে শব্দে এখন আর আগের মতো উজ্জ্বল প্রাণবন্ত বাজনার তাল নেই, সেখানে শোনা গেলো একটা বিপর্যস্ত মরীয়া সুর, তারপর হঠাৎ সেই শব্দ কার্পেটের বুকে স্তিমিত হয়ে এলো।

আমি কিছুক্ষণ গ্যালারিতে অপেক্ষা করে রান্নাঘরে গেলাম। সেখানে বাবুর্চিকে বললাম, মার শরীর বিশেষ ভালো না। একটু পরে তুমি কিংবা জো-বেল তাঁর জন্য একটু স্যুপ, ডিম কিংবা ওই জাতীয় কিছু নিয়ে যেও।

তারপর আমি খাবার ঘরে গিয়ে মোমবাতির আলোর নিচে টেবিলে বসলাম।

খানিক পরে আমার খাবার নিয়ে এলে আমি সামান্য কিছু খেলাম।

ডিনার শেষে জো-বেল আমাকে এসে জানালো যে সে মায়ের জন্য একটা খাবারের ট্রে নিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তিনি সেটা নেন নি। তিনি দরজাই খোলেন নি, ভেতর থেকে বলে দেন যে তাঁর কিছু চাই না।

আমি গ্যালারিতে অনেকক্ষণ বসে থাকি। এক সময় রান্নাঘরের কাজকর্মের শব্দ থেমে গেলো, তার আলো বন্ধ হলো। এতোক্ষণ ওই ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের সবুজ ঘাসের উপর একটুখানি জায়গায় আলো এসে পড়ছিলো, এখন হঠাৎ সে জায়গাটুকুও কালো হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর আমি উপরে গিয়ে আমার মায়ের খবরে দরজার সামনে দাঁড়ালাম। একবার কি দু'বার ভেতরে ঢোকার জন্য দরজায় প্রায় টোকা দিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, ভেতরে গিয়ে আমি কি বলবো তাঁকে? নিজের সম্পর্কে সত্যটি জানার পর, সেটা ভালোই হোক কি মন্দই হোক, মানুষটাকে বলার জন্য কারোই কিছু থাকে না।

তাই আমি বাইরে বেরিয়ে বাগানে গিয়ে কালো ম্যাগনোলিয়া আর মার্টল্ গাছগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি ভাবলাম কেমন করে আমি আমার পিতাকে হত্যা করে আমার মায়ের আত্মাকে ত্রাণ করেছি। তারপর আমার মনে হলো, হয়তো এই প্রক্রিয়ায় আমি আমার পিতার আত্মাকেও ত্রাণ করেছি। ত্রাণ লাভ করার জন্য ওদের উভয়ের যা জানা দরকার ছিলো তা তাঁরা জেনেছিলেন। তারপর আমার মনে হলো কোনো অর্থপূর্ণ জ্ঞানই রক্তের মূল্য ছাড়া লাভ করা যায় না। হয়তো শুধু এই ভাবেই আপনি বলতে পারেন কোনো একটা জ্ঞান অর্থপূর্ণ কিনা, মূল্যবান কিনা, তার জন্য আপনাকে কিছু রক্ত দিতে হয়েছে কিনা সেটা বিবেচনা করার পর।

আমার মা পর দিনে চলে যান। গন্তব্য রেনো। আমি তাঁকে গাড়ি করে স্টেশনে নিয়ে যাই, শান বাঁধানো প্ল্যাটফর্মের উপর তাঁর চমৎকার স্যুটকেস, ব্যাগ, টুপির বাকস ইত্যাদি সুন্দর করে সাজিয়ে ট্রেনের অপেক্ষা করতে থাকি। দিনটা ছিল, গরম ও রৌদ্রোজ্জ্বল, পায়ের তলায় সিমেন্ট তপ্ত এবং খরখরে। রেল স্টেশনে বিদায় জানাবার পূর্বক্ষণে যেশূন্যতা বিরাজ করে সেই শূন্যতার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম।

বেশ কিছুক্ষণ ওই ভাবে আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম, দেবদারু গাছের ওপারে রেল লাইনের উপর দিয়ে উত্তাপে থরথর করে কাঁপা দিগন্তের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকলাম, কখন চোখে পড়বে ধোঁয়ার প্রথম কালো কুণ্ডলী। তারপর অকস্মাৎ

আমার মা বললেন, জ্যাক, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

কি?

আমি থিওডোরকে বাড়িটা দিয়ে দিচ্ছি।

কথাটা শুনে আমি এতো অবাক হই যে প্রথমে কিছু বলতে পারি নি। আমার মনে পড়লো বছরের পর বছর ধরে মা ওই বাড়িটাকে কতো জিনিসে পূর্ণ করে তুলেছিলেন, আসবাবপত্র, রূপা আর কাঁচের জিনিস, বাড়িটা একটা মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছিলো, নিউ অর্লিয়ান্স আর নিউ ইয়র্ক আর লন্ডনের এ্যান্টিক ডিলারদের একটা স্বর্গ হয়ে উঠেছিলো। এইসব জিনিস থেকে যে তাঁকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেটা ভেবে আমি ভারী অবাক হলাম।

আমার নীরবতার ভুল অর্থ করে, ব্যাখ্যা করার সুরে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, শোনো, এর মধ্যে থিওডোরের কোনো দোষ নেই, তা ছাড়া তুমি তো জানো বাড়িটাকে সে কি চোখে দেখে, এটার জন্য সে কি রকম পাগল, এই পাড়ায় বাস করার জন্য সে কি রকম ব্যগ্র। আর আমার মনে হয় না যে তুমি এই বাড়ি চাও। আমি — আমি ভেবেছিলাম, তোমার তো মন্টির বাড়িটা আছে, যদি তুমি ল্যান্ডিং-এ বাস করা স্থির করো তাহলে তুমি হয়তো সেখানেই থাকতে চাইবে, কারণ — কারণ—

আমি ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে তাঁর কথাটা সম্পূর্ণ করে দিলাম, কারণ তিনি ছিলেন আমার পিতা।

মা সহজ সুরে বললেন, হ্যাঁ, কারণ তিনি ছিলেন তোমার পিতা। তাই আমি ঠিক করি —

আমি প্রায় ফেটে পড়লাম, বললাম, আঃ! বাড়িটা তোমার, এটা নিয়ে তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করবে। আমাকে দিলেও আমি ওটা নিতাম না। আজ বিকালেই আমি ওই বাড়ি ছেড়ে দেবো, আর কোনোদিন ওই বাড়িতে পা দেবো না, সত্যি বলছি আমি। আমি ওই বাড়ি চাই না। ওই বাড়ি কিংবা তোমার টাকাপয়সা নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো, আমার সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তোমার টাকাপয়সা আমি চাই না। একথা তো তোমাকে আমি সব সময় বলেছি।

মা বললেন, মাথাব্যথা হবার মতো খুব বেশি টাকাপয়সা থাকবেই না। গত ছয়-সাত বছর কিভাবে কেটেছে তা তো তুমি জানো।

আমি বললাম, কি বললে? অর্থকষ্টের মধ্যে আছো নাকি? যদি দরকার হয় তাহলে আমি কিন্তু —

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, না, অর্থকষ্টে নেই। চলে যাবার মতো যথেষ্ট আছে

এখনো। যদি নিস্তরঙ্গ কোনো জায়গায় চলে যাই, যদি একটু হিসেব করে চলি। প্রথমে ভেবেছিলাম ইউরোপে যাবো, কিন্তু পরে —

আমি বললাম, শোনো, ইউরোপ থেকে দূরেই থাকো। ইউরোপে প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। আর তার খুব বেশি দেরিও নেই। মা বললেন, না, সেখানে যাচ্ছি না আমি। কোনো একটা শস্তা, হৈ-হুল্লোড়হীন, শান্ত জায়গায় যাবো আমি। কোথায় তা এখনো জানি না। ভেবে দেখতে হবে আমাকে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আর ওই বাড়ির ব্যাপারে আমার সম্পর্কে তুমি কোনো দুশ্চিন্তা করো না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে আমি আর কখনো ওই বাড়িতে পা দেবো না।

মা রেল লাইনের উপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন, পূর্বদিকে, সেখানে দেবদারু গাছের ওপারে এখনো ধোঁয়ার আভাস নেই। মা ওই শূন্যতার দিকে তাকিয়ে মিনিট দু'য়েক কি একটা ভাবনায় ডুবে গেলেন, তারপর আমার কথার খেই ধরেই যেন বলে উঠলেন, এই বাড়িতে আমার পা দেয়াই উচিত হয় নি। আমি বিয়ে করি, এই বাড়িতে আমি আসি, আর ও সত্যিই ছিলো একটা ভালো লোক। কিন্তু আমার নিজের জায়গাতেই আমার থাকা উচিত ছিলো। আমার এখানে আসাই ঠিক হয় নি।

এর পক্ষে বা বিপক্ষে আমি কি বলতে পারতাম? তাই আমি চুপ করে রইলাম।

কিন্তু ওই নীরবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি যেন নিজের সঙ্গেই বিষয়টা বোঝাপড়া করলেন, তারপর হঠাৎ মাথা তুলে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তো, আমি তাই করেছি। এবং আমি জানি।

তিনি সুন্দর নীল লিনেনের পোশাকের নিচে তার সুন্দর কাঁধ ঋজু ও শক্ত করে পুরানো দিনের মতো তার মুখ উঁচু করে তুলে ধরলেন, যেন পৃথিবীকে ভারী মূল্যবান একটা উপহার দিচ্ছেন এবং পৃথিবীর উচিত সেজন্য খুশি হয়ে ওঠা।

তাহলে তিনি এখন জানেন। উত্তপ্ত সিমেন্টের উপর, রোদের ঝলকানির ভেতর দাঁড়িয়ে, তিনি যা জেনেছেন তার মধ্যে ডুবে গেলেন।

কিন্তু, না, তিনি ভাবছিলেন তিনি যা জানেন না সেটা নিয়ে। কারণ একটু পরে তিনি আমার দিকে ঘুরে বললেন, খোকা, আমাকে একটা কথা বলো।

কি?

আমাকে এটা জানতেই হবে, খোকা।

কি জানতে হবে?

যখন — যখন সেটা ঘটে — যখন তুমি মন্টির সঙ্গে দেখা করতে যাও —

আমি মনে মনে বললাম, তাহলে এই কথা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম। রোদের ঝলসানি আর সিমেন্টের উত্তপ্ত কম্পনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার নিজেকে মনে হলো বরফের মতো ঠাণ্ডা, আমার দেহের অভ্যন্তরে আমার স্নায়ুগুলি যেন ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে তাকিয়ে মা বললেন, ও কি — ও কি কোনো —

আমি বললাম, তুমি জানতে চাইছো উনি কি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, আর তাই তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন?

মা মাথা নাড়লেন, তারপর সোজা আমার দিকে তাকিয়ে জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে ভালো করে লক্ষ করলাম। আলো তাঁর মুখের সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করছিলো না। আর কোনোদিনই করবে না। কিন্তু তিনি মুখ উঁচু করে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আমি বললাম, না, তিনি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন নি। রাজনীতি নিয়ে আমাদের ঈষৎ বিতর্ক হয়। গুরুতর কিছু নয়। তবে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের কথা বলেছিলেন। শরীর ভালো যাচ্ছিলো না তাঁর। ওটাই ছিলো আসল কথা। তারপর তিনি আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানান। ব্যস্, এই।

মার শরীর একটু শিথিল হলো। এখন যেন জোর করে ঋজু ও শক্ত হবার দরকার নেই।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি বলছো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি।

কোমল নিচু গলায় তিনি বললেন, ওহ্, এবং তারপর নিঃশব্দে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তারপর আবার অপেক্ষা। আর কিছু বলার নেই। এখন তিনি যা জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন, যা জিজ্ঞাসা করতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্ত, শেষ মুহূর্তে, তিনি তা জিজ্ঞাসা করেন।

একটু পরে দিগন্তে ধোঁয়ার আভাস দেখা গেলো। তারপর উজ্জ্বল জলের কোল ঘেঁষে, দূরে, আমরা সেই কালো ধোঁয়াকে দেখলাম আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে। তারপর ঘর্ঘর আর হিস্‌হিস শব্দ করতে করতে ধোঁয়ার কুণ্ডুলী ছড়িয়ে ইঞ্জিনটা আমাদের ছাড়িয়ে একটু সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সাদা কোট পরা একটি কুলী আমার

ম্যায়ের চমৎকার ব্যাগ আর বাক্সগুলি তুলতে শুরু করলো।

আমার দিকে ঘুরে আমার বাহুতে হাত রেখে মা বললেন, আসি, খোকা।

আমি বললাম, এসো।

তিনি আরো কাছে সরে এলেন, আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। তিনি বললেন, চিঠি লিখিস, খোকা। তুই ছাড়া এখন আর আমার কেউ নেই।

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, কেমন থাকো জানিও।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আমি তাঁকে যখন বিদায়ী চুম্বন দিচ্ছি তখন লক্ষ করলাম যে কন্ডাকটর ঘড়ি দেখছে, তারপর পরম অবজ্ঞার সঙ্গে সেটা পকেটে রেখে দিচ্ছে। দ্রুতগামী এই ট্রেন, ছোট্ট গেঁয়ো শহরে মাত্র দেড় মিনিটের জন্য থামে। এই রকম ট্রেনের কন্ডাকটররা ওই রকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই এসব বিরতিকে দেখে। এখনই সে ডাক দেবে ঃ সবাই উঠে পড়ুন, রওনা হচ্ছি আমরা। আমার মনে হলো ডাকটা দিতে সে অনেক সময় নিচ্ছে। এ যেন প্রশস্ত উপত্যকার ওপাশে আপনি একটা লোককে দেখতে পাচ্ছেন, তার হাতের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ধোঁয়া উঠছে, গুলীর শব্দটা পাবার জন্য আপনি অপেক্ষা করছেন, কিংবা দূরে আপনি বিজলীর ঝলকানি দেখেছেন, এখন অপেক্ষা করে আছেন বাজ পড়ার শব্দের জন্য। আমি আমার মায়ের কাঁধ জড়িয়ে তাঁর গালের সঙ্গে আমার গাল লাগিয়ে (তাঁর গাল অশ্রুসিক্ত) কন্ডাকটরের ডাকের জন্য অপেক্ষা করলাম ঃ সবাই উঠে পড়ুন, রওনা হচ্ছি আমরা।

তারপর ডাকটা এলো, মা সরে দাঁড়ালেন, উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে, তারপর গাড়িটা চলতে শুরু করলে আমার উদ্দেশে হাত নাড়লেন, আর কুলী সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো। ট্রেন মাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমি অপসৃয়মান গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছি, এক সময় পশ্চিম দিগন্তে ধোঁয়ার আভাস ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না, আর আমি মনে মনে ভাবলাম, মাকে কি রকম মিথ্যা কথা বললাম! তো এটা হলো তাঁকে আমার বিদায়ী উপহার। এক ধরনের বিয়ের উপহারও বলা যেতে পারে।

পর মুহূর্তে আমার মনে হলো আমি হয়তো আমার নিজেকে বাঁচাবার জন্য এই মিথ্যা কথাটা বলেছি। তারপরই আমি হিংস্রভাবে সজোরে বলে উঠলাম, না, আমার জন্য নয়, আমার জন্য নয়। এবং একথা সত্য। যথার্থই সত্য।

আমি আমার মাকে একটা বিদায়ী উপহার দিয়েছি, যা মিথ্যা, কিন্তু তিনিও আমাকে একটা উপহার দিয়েছেন, যা সত্য। তিনি আমাকে তাঁর একটা নতুন চিত্র উপহার দিয়েছেন, যার অর্থ, পরিণামে, পৃথিবীরই একটা নতুন চিত্র। কিংবা, স্যাডি

বার্ক, লুসি স্টার্ক, উইলি স্টার্ক, সুগার-বয়, এ্যাডাম স্ট্যান্টন এবং আরো বহু মানুষ পৃথিবীর যে নতুন চিত্র আমাকে উপহার দেয়, যার মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা ছিলো, এখন আমার মায়ের চিত্র সেই ফাঁকা জায়গাটা পূর্ণ করে দিয়েছে। তার অর্থ আমার মা আমাকে আমার অতীত ফিরিয়ে দিলেন। আমার যে অতীতকে আমি আগে মনে করেছিলাম কলুষিত এবং ভয়ঙ্কর এখন আমি সে-অতীতকে মেনে নিতে পারলাম। আমি আমার মাকে মেনে নিতে পেরেছিলাম বলেই এখন আমি আমার অতীতকে মেনে নিতে পারলাম। মায়ের সঙ্গে এখন আমার শান্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, আমার নিজের সঙ্গেও।

বহু বছর ধরে আমি আমার মাকে ঘৃণা করে এসেছি একজন হৃদয়হীন মহিলা বলে, যিনি পুরুষের উপর তাঁর প্রভাব ও কর্তৃত্বকেই শুধু ভালোবাসতেন, তারা তাঁকে যে দৈহিক আনন্দ দিতো, তার যে অহঙ্কারকে তৃপ্ত করতো তাকেই শুধু ভালোবাসতেন, যিনি বাস করতেন সূক্ষ্ম হিসাব এবং সহজাত প্রবণতার মাঝখানে এক অদ্ভুত প্রেমহীন দোদুল্যমানতার মধ্যে। আর আমার মা তার নিজের প্রতি আমার ঘৃণা অনুভব করতেন কিন্তু সেই ঘৃণার প্রকৃতি উপলব্ধি করতে না পেরে আমাকে ধরে রাখতে, আমার ঘৃণাকে টুঁটি টিপে মারতে, সম্ভাব্য সব কিছু করেছেন। যে শক্তি তিনি সব পুরুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারতেন আমার ক্ষেত্রেও তিনি তাই করতে চেষ্টা করেন, এবং সেটা আমাকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ক'রে তোলে, কিন্তু একই সঙ্গে আমি তাঁর ভালোবাসার জন্যও লালায়িত হয়ে উঠি, তাঁর ওই শক্তি আমাকে প্রবলভাবে টানতো, কারণ তিনি সত্যিই ছিলেন প্রাণ-ঐশ্বর্যে ভরপুর ও সুন্দর এক মহিলা, যিনি একই সঙ্গে আমাকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করতেন, যাকে আমি ঘৃণা করতাম, আবার যার জন্য আমি গর্বও বোধ করতাম। কিন্তু পরিবর্তনটা এক সময় আসে।

এর প্রথম আভাস পাওয়া যায় বিচারপতি আরউইনের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর যে রূপালী তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার উত্থিত হয় তার মধ্যে। সে চিৎকার অনেক ক'মাস আমার কানে লেগে ছিলো, তারপর এক সময় তা ম্লান হয়ে যায়। সেটা হারিয়ে যায় অতীত আর অতীতের বিকারের মধ্যে। তারপর তিনি একদিন আমাকে বার্ডেন্স ল্যান্ডিং-এ ডাকিয়ে আনেন, আমাকে জানান যে তিনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন। তখন আমি বুঝতে পারি যে তিনি সত্য কথা বলছেন। তাঁর প্রতি আমার সব ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষোভ মিলিয়ে যায়। আমার নিজের প্রতিও এসব আর থাকলো না।

মা যখন আমাকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান তখন, কিংবা পরদিন, আমরা দুজন যখন শান বাঁধানো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করি তখন, কিংবা তারও পরে

আমি যখন সেখানে একা দাঁড়িয়ে ধোঁয়ার শেষ কুণ্ডলীটি পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে যেতে দেখি, তখনও কিন্তু আমি আমার নিজেকে এর কারণটা জিজ্ঞাসা করি নি। তারও পরে আমি যখন সে-রাত্রে যে বাড়ি একদা বিচারপতি আরউইনের ছিলো আর এখন আমার সেই বাড়িতে একাকী বসেছিলাম তখনও আমার নিজেকে সে প্রশ্ন করি নি। ওইদিন বিকালেই আমি আমার মায়ের বাড়ি তালাবন্ধ করে, চাবি বাইরের গ্যালারির নিচে মাদুরের তলায় রেখে, সেখান থেকে চিরকালের জন্য চলে এসেছিলাম।

বিচারপতি আরউইনের বাড়ি ছিলো ধুলো, অব্যবহার আর অবরুদ্ধ বাতাসের গন্ধে পূর্ণ। আমি সবগুলি জানালা খুলে দিয়ে ল্যান্ডিং-এ যাই। সেখানে খাওয়া সেরে ফিরে এসে বাড়ির আলোগুলি জ্বালিয়ে দিলাম। তখন এই বাড়ির দীর্ঘদিনের যে স্মৃতি আমার মনের মধ্যে ছিলো বাড়িটা সেই স্মৃতির খুব কাছাকাছি চলে এলো। কিন্তু এই বাড়িতে বসে জানালা দিয়ে ভেসে আসা রাত্রির ভারী, মিষ্টি, ভেজা গন্ধ নাকে নিয়েও আমি তখনো আমার নিজেকে জিজ্ঞাসা করি নি কেন আমি আমার মনের ভেতর এতো পরিপূর্ণ শান্তি অনুভব করছি। মায়ের কথা ভাবলাম, আর আমার মনের মধ্যে জেগে উঠলো গভীর শান্তি ও স্বস্তির অনুভূতি, আর পৃথিবী সম্পর্কে একটা নতুন বোধ।

কিছুক্ষণ পর আমি উঠে পড়ি, বাড়ি ছেড়ে বাইরে এসে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করি। পরিষ্কার প্রশান্ত রাত। সমুদ্র সৈকতের দিক থেকে জলের মৃদু গুঞ্জনধ্বনিও শোনা যাচ্ছিলো না। তারাভরা আকাশের নিচে উপসাগর ঝলমল করছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে স্ট্যান্টনদের বাড়ির কাছে চলে এলাম। পেছন দিকের বসবার ঘরে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলছে, যেন পড়ার টেবিলের বাতি থেকে। আমি মিনিট দুয়েক বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, তারপর ফটক দিয়ে ঢুকে ভেতরের পথ ধরে এগিয়ে গেলাম।

গ্যালারির জালের দরজায় ছিটকিনি লাগানো ছিলো, কিন্তু তার ভেতরের প্রধান দরজাটা ছিলো খোলা। তার মধ্য দিয়ে আমি হলঘরটা দেখতে পেলাম। হলঘরের মেঝেতে একটা চতুষ্কোণ জায়গায় পেছনের বসবার ঘরে খোলা দরজা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। আমি রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিয়ে অপেক্ষা করলাম।

একটু পরে এ্যান এসে হলঘরের আলোকিত চতুষ্কোণের মধ্যে দাঁড়ালো।

সে জিজ্ঞাসা করলো, কে?

জবাব দিলাম, আমি।

সে হলঘরের মধ্য দিয়ে গ্যালারি পেরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। তারপর

আমি তাকে দরজার কাছে জালের ওপাশে দেখলাম। ক্ষীণদেহ, সাদা পোশাক পরা একটি মূর্তি। হ্যালো বলতে গিয়েও আমি বললাম না। সেও কোনো কথা না বলে জালের দরজাটা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ওই খানে দাঁড়িয়ে সে সব সময় সর্বদা যে-সেন্ট ব্যবহার করতো আমি সেই চেনা গন্ধটা পেলাম, আর আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

আমি বললাম, কথাটা যেন কৌতুকের মতো শোনায় সেই ভাবে বললাম, তুমি আমাকে ঢুকতে দেবে কিনা আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম না।

আমি ছায়ার মধ্যে তার মুখ দেখতে চেষ্টা করলাম কিন্তু একটা পাংশু অস্পষ্টতার আভাস আর চোখের দীপ্তি ছাড়া কিছু দেখা গেলো না।

সে বললো, অবশ্যই ঢুকতে দেবো।

হাসির মতো একটা ভঙ্গি করে আমি বললাম, আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না।

কেন?

যে ব্যবহার আমি করেছি!

আমরা গ্যালারিতে দোলনায় গিয়ে বসলাম। দোলনার শিকলে একটু শব্দ উঠলো কিন্তু আমরা এতো নিশ্চল হয়ে সেখানে বসলাম যে দোলনাটা একচুলও নড়লো না।

এ্যান জিজ্ঞাসা করলো, তা তুমি কি করেছো?

আমি পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট বার করলাম, সেটা ধরিয়ে কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, তারপর ওর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বললাম, আমি কি করেছি? আসলে আমি কি করি নি সেটাই কথা। আমি তোমার চিঠির উত্তর দিই নি।

সে বললো, ওহ্, সেটা কিছু নয়। তারপর একটু ভেবে বললো, যেন আপন মনে, সে তো অনেক দিন আগের ব্যাপার।

আমি বললাম, হ্যাঁ, অনেক দিন আগের ব্যাপার। ছ'-সাত মাস হবে। কিন্তু উত্তর না দেয়ার চাইতেও খারাপ কাজ করেছি আমি। আমি তোমার চিঠি পড়িই নি। চিঠিটা আমি আমার টেবিলের উপর রেখে দিই। সে চিঠি আমি কখনো খুলি নি।

সে একথার উত্তরে কিছু বললো না। আমি সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তার নীরবতা ভাঙলো না।

অবশেষে আমি বললাম, চিঠিটা ভুল সময়ে এসেছিলো, চিঠিটা যখন আসে তখন আমার কাছে সবকিছু এবং সবাইকে, এমন কি এ্যান স্ট্যান্টনকেও, এক রকম মনে হয়েছিলো, এবং কোনো কিছু সম্পর্কেই আমার কণামাত্র উৎসাহ ছিলো না। আমি কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছো?

সে বললো, হ্যাঁ।

আমি বললাম, তুমি ঘোড়ার ডিম বুঝতে পারছো!

শান্ত কণ্ঠে সে বললো, বোধহয় পারছি।

উঁহুঁ, আমি যেভাবে বলতে চাইছি সেভাবে নয়। সেভাবে বুঝতে পারা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বোধহয়।

আমি বললাম, যাই হোক, অবস্থাটা ছিলো ওই রকম। সব কিছু এবং সব মানুষকে আমার মনে হয় এক রকম। কারো জন্য আমার দুঃখবোধ পর্যন্ত হয় নি। আমার নিজের জন্যও নয়।

হিংস্রভাবে সে বললো, আমি তোমাকে কখনো আমার জন্য দুঃখবোধ করতে বলি নি। চিঠিতে কিংবা অন্য কোথাও।

আমি ধীরে ধীরে বললাম, না, তা বোধহয় বলো নি।

সে আবার বললো, আমি কখনো তোমাকে সে কথা বলি নি।

আমি বললাম, আমি জানি।

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, তোমাকে একটা কথা বলার জন্য এখানে এসেছি। আমার মনের অবস্থা এখন আর ওই রকম নেই। একথাটা একজন কাউকে আমার বলতে হতো — জোরে জোরে — কথাটা যে সত্য সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য। কথাটা যথার্থই সত্য।

আমি চুপ করলাম, নীরবে অপেক্ষা করলাম এবং আবার বলতে শুরু করা পর্যন্ত সে-নীরবতা অক্ষুণ্ন রইলো। আমি বললাম, কথাটা আমার মা সম্পর্কে। তুমি তো জানো আমাদের দুজনের সম্পর্ক কি রকম ছিলো। আমরা কিছুতেই মিলেমিশে থাকতে পারতাম না। আমি তাঁকে মনে করতাম —

এ্যান তীব্র কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললো, আহ্, চুপ করো। চুপ করো তুমি। আমি চাই না যে তুমি এভাবে কথা বলো। কেন তোমার মধ্যে এতো তিক্ততা? কেন তুমি এভাবে বলো? উনি তোমার মা, জ্যাক, আর ওই বেচারা বৃদ্ধ — তোমার বাবা!

আমি বললাম, উনি আমার বাবা নন্।

তোমার বাবা নন্?

না।

অন্ধকার গ্যালারিতে নিশ্চল দোলনায় বসে আমি ওকে আরকানস' থেকে আসা হাল্কা রঙের চুল আর বুভুক্ষু গালের মেয়েটি সম্পর্কে যা বলার ছিলো তা বললাম। আমার মা শেষ পর্যন্ত আমাকে কি ফিরিয়ে দিয়েছেন তার কথা আমি তাকে বলতে

চেষ্টা করলাম। তাকে বলতে চেষ্টা করলাম যে অতীত ও অতীতের ভার যদি গ্রহণ করা না যায় তাহলে ভবিষ্যতও থাকে না। অতীতকে গ্রহণ করলে পরই মানুষ ভবিষ্যতের জন্য আশা করতে পারে, কারণ অতীত থেকেই কেবল ভবিষ্যত নির্মাণ করা সম্ভব।

আমি চেষ্টা করলাম ওকে এসব কথা বলতে।

তারপর, দীর্ঘ নীরবতার পর, সে বললো, আমি এটা বিশ্বাস করি, না করলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

এর পর আর আমরা কোনো কথা বলি নি। আমি অন্ধকারের দোলনায় বসে পর পর অনেকগুলি সিগারেট খেলাম। আমাদের চারপাশে গ্রীষ্মের বাতাস ভারী, ভেজা, আর মিষ্টি মিষ্টি। নৈঃশব্দের মধ্যে আমি এ্যানের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে চেষ্টা করলাম। অনেকক্ষণ পর আমি ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে পথে নেমে আমার পিতৃগৃহে ফিরে গেলাম।

এই কাহিনী উইলি স্টার্কের, কিন্তু এই কাহিনী আমারও। এই কাহিনী একজন মানুষের, যে এ-পৃথিবীতে বাস করেছে, যার কাছে দীর্ঘ কাল ধরে পৃথিবীর একটা রূপ ধরা পড়েছিলো, পরে এক সময় যে দেখতে পায় তার অত্যন্ত ভিন্ন একটা রূপ। রূপান্তরটা হঠাৎ ঘটে নি, সবটা একসঙ্গে ঘটে নি। অনেক জিনিস ঘটে যায় এবং মানুষটা বুঝতে পারে নি কখন সে ওই সব ঘটনার জন্য দায়ী, আর কখন দায়ী নয়। বস্তুতঃপক্ষে একটা সময় আসে যখন সে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে কারোই কোনো কিছুর জন্যই বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নেই, কারণ মহান কুঞ্চন ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই।

প্রথমে মনে হয়েছিলো যে ঘটনাগুলি দৈব নির্ধারিত এবং সে-উপলব্ধি থেকেই তার চেতনায় ওই ভয়ঙ্কর ভাবনা জন্ম নেয়, কারণ সেটা তাকে এমন এক স্মৃতি থেকে বঞ্চিত করে যার উপর ভিত্তি করে অবচেতনভাবে গড়ে উঠেছিলো তার সমগ্র জীবন। কিন্তু কিছুদিন পর সে এর মধ্যে একটা স্বস্তি খুঁজে পেলো, কারণ তাহলে তো তাকে আর কোনো কিছুর জন্য অপরাধী করা যায় না, এমন কি সে যে তার সুখকে হেলায় বিসর্জন দিয়েছে, কিংবা তার পিতাকে হত্যা করেছে, কিংবা তার দুই বন্ধুকে পরস্পরের হাতে তুলে দিয়েছে, ঠেলে দিয়েছে তাদের মৃত্যুর কোলে এর কোনো কিছুর জন্যই তো সে অপরাধী নয়।

কিন্তু পরে, অনেক পরে, একদিন সকালে সে আবিষ্কার করলো যে সে আর মহান কুঞ্চনে বিশ্বাস করে না। সে তাতে আর বিশ্বাস করে না, কারণ সে বড়ো বেশি সংখ্যক মানুষকে বাঁচতে এবং মরতে দেখেছে। সে লুসি স্টার্ক আর সুগার-বয় আর

পণ্ডিত এটর্নী আর স্যাডি বার্ক আর এ্যান স্ট্যান্টনকে বাঁচতে দেখেছে। সে দেখেছে যে তাদের বাঁচার সঙ্গে মহান কুঞ্চনের কোনো সম্পর্ক নেই। সে তার বাবাকে মরতে দেখেছে। সে তার বন্ধু এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে মরতে দেখেছে। সে তার বন্ধু উইলি স্টার্ককে মরতে দেখেছে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় সে তাকে বলতে শুনেছে ঃ সব কিছু অন্য রকম হতে পারতো, জ্যাক। তোমাকে একথা বিশ্বাস করতেই হবে।

তার দুই বন্ধু, উইলি স্টার্ক ও এ্যাডাম স্ট্যান্টনকে, সে বাঁচতে ও মরতে দেখেছে। ওরা একে অপরকে হত্যা করেছিলো। ওরা হয়ে উঠেছিলো একে অপরের নির্মম নিয়তি। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে জ্যাক বার্ডেন দেখতে পায় যে এ্যাডাম স্ট্যান্টন, যাকে সে অভিহিত করেছিলো আদর্শ ও ভাবনার মানুষ বলে, আর উইলি স্টার্ক, যাকে সে অভিহিত করেছিলো বাস্তব ও কর্মের মানুষ বলে, এদের নিয়তি হলো পরস্পরকে ধ্বংস করা, এদের নিয়তি হলো একে অন্যকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা, একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, পরস্পরের মতো হতে চাওয়া, কারণ আমাদের যুগের ভয়ঙ্কর বিভক্তির ফলে একে অন্যকে ছাড়া এরা ছিলো খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। কিন্তু জ্যাক বার্ডেন এটাও দেখতে পায় যে তার বন্ধুরা নির্মম নিয়তির শিকার হলেও তাদের বিপর্যয় কোনো মহান কুঞ্চনের দেবত্বের হাত ধরে আসে নি। তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু তারা বেঁচে ছিলো ইচ্ছার দুর্মর যন্ত্রণার মধ্যে। হিউ মিলার (যিনি একদা উইলি স্টার্কের অধীনে এটর্নী জেনারেল ছিলেন এবং অনেক পরে জ্যাক বার্ডেনের বন্ধু হন) ইতিহাসের নিরপেক্ষতার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময় যেমন একদিন বলেছিলেন ঃ ইতিহাস অন্ধ, কিন্তু মানুষ নয়। (মনে হচ্ছে হিউ বোধহয় আবার রাজনীতিতে প্রবেশ করবে, যদি করে তবে আমি তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য তৈরি থাকবো। ওই অঙ্গনে আমার বেশ মূল্যবান অভিজ্ঞতা আছে।)

তো, আমি, জ্যাক বার্ডেন, এখন বাস করছি আমার পিতৃগৃহে। একদিক থেকে এটা বেশ অদ্ভুত, আমার এই খানে বাস করা, কারণ এক সময় সত্যের আবিষ্কার আমাকে আমার অতীত থেকে বঞ্চিত করেছিলো, আমার পিতার মৃত্যু ঘটিয়েছিলো। কিন্তু অবশেষে সত্যই আবার আমার অতীত আমাকে ফিরিয়ে দেয়। আর তাই আমি এখন বাস করি সেই বাড়িতে যা আমার পিতা আমার জন্য রেখে গেছেন। আমার সঙ্গে আছে আমার স্ত্রী এ্যান স্ট্যান্টন আর ওই বৃদ্ধ যিনি একদা আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন। কয়েক মাস আগে আমি যখন মেক্সিকান রেস্তোরাঁর উপরের ঘরটিতে তাঁকে দেখতে যাই তখন তাঁকে অসুস্থ আবিষ্কার করার পর তাঁকে আমার এখানে নিয়ে আসা ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম? (তিনি

কি মনে করেন যে আমি ওর পুত্র? আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না। আর এটাতে কিছু এসে যায় বলেও আমি মনে করি না। কারণ আমরা প্রত্যেকেই তো লক্ষ পিতার সন্তান।)

তিনি খুব দুর্বল হয়ে গেছেন। এখনো মাঝে মাঝে একদান দাবা খেলতে পারেন, যেমন বহুকাল আগে সমুদ্রের একটা লম্বা সাদা বাড়িতে বসে তাঁর বন্ধু মন্টেগু আরউইনের সঙ্গে এক সময় খেলতেন। কিন্তু এখন প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। দিন ভালো থাকলে মাঝে মাঝে রোদে গিয়ে বসেন। এখনো অল্প-স্বল্প বাইবেল পড়েন। নিজের হাতে লিখবার মতো শক্তি আর এখন নেই। তবে যে ধর্ম-পুস্তিকাটি লিখছিলেন তার কিছু কিছু আমাকে বা এ্যানকে মুখে বলেন, আর আমরা লিখে নিই।

গত কাল তিনি ডিক্টেট করেছেন ঃ

যে-ঈশ্বর আগে থাকতেই জানতেন যে মানুষের নিয়তি হচ্ছে পাপ করা সেই ঈশ্বরের পক্ষে মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর সর্বশক্তিমত্তার ভয়ঙ্করসূ চক। কারণ যিনি ক্রুটিহীন তাঁর পক্ষে নিছক ক্রুটিহীন কিছু সৃষ্টি করা হতো নিতান্তই তুচ্ছ এবং অবজ্ঞাজনক সহজ একটা কাজ। সত্যি বলতে গেলে সেটা আর সৃষ্টি হতো না, হতো সম্প্রসারণ। বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে স্বরূপতা, এবং ঈশ্বরের পক্ষে সৃষ্টি করতে হলে, যথার্থ সৃষ্টি করতে হলে, তাঁকে মানুষকে বানাতে হতো ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, আর ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অর্থই হচ্ছে পাপময় হওয়া। অতএব মন্দ তথা কু-র সৃষ্টি হলো ঈশ্বরের গৌরব ও শক্তির সূচক। এটা হতেই হবে, যেন ভালো তথা সু-র সৃষ্টি হতে পারে মানুষের গৌরব ও শক্তির সূচক। ঈশ্বরের সাহায্যে। ঈশ্বরের সাহায্য এবং প্রজ্ঞায়।

শেষ শব্দটি উচ্চারণ করে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, লিখেছো?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে বললেন, এটা সত্য। আমি জানি এটা সত্য। তুমি জানো সেকথা?

আমি মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বললাম। (তাঁর মনকে উদ্বেগমুক্ত রাখার জন্যই আমি তা করি, কিন্তু পরে আমার মনে হলো আমিও হয়তো আমার নিজের ধরনে তিনি যেকথা বলেছেন সেকথা বিশ্বাস করি।)

আমি উত্তর দেবার পরও তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, এই ভাবনাটা আসার পর থেকে আমার আত্মা স্থির হয়ে ছিলো। তিনদিন ধরে এই ভাবনা আমার মনকে অধিকার করে আছে। বলার আগে আমি

তিনদিন ধরে সেটা ধরে রাখি। আমার আত্মার ভেতরে সেটাকে পরীক্ষা করে আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছি।

তাঁর ধর্মপুস্তিকা তিনি শেষ করতে পারবেন না। দৃশ্যতঃই তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। ডাক্তারের ধারণা শীতটা কাটবে না।

তাঁর মৃত্যুর পর আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। প্রথমতঃ এই বাড়ি অনেক টাকায় বন্ধক দেয়া। বিচারপতির মৃত্যুর সময় তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ছিলো খুব জট পাকানো অবস্থায়, এবং শেষে দেখা গেলো যে তিনি মোটেই বিত্তশালী ছিলেন না, বরং দরিদ্রই ছিলেন। আগে, প্রায় পঁচিশ বছর আগে, এই বাড়িটা আরেকবার বন্ধক দেয়া ছিলো। তখন একটা অপরাধের মাধ্যমে বাড়িটা রক্ষা পায়। একজন ভালো মানুষ এটা রক্ষা করার জন্য একটা অপরাধ করেন। এখন যে আমি বাড়িটা রক্ষা করার জন্য কোনো অপরাধ করতে প্রস্তুত নই তার জন্য আমার খুব আত্মসন্তুষ্ট বোধ করার প্রয়োজন নেই। হয়তো বাড়িটা রক্ষা করার জন্য অপরাধ করতে আমার অনীহার কারণ (অপরাধ করার সুযোগ পাবো সেটা ধরে নিয়ে বলছি, যার সম্ভাবনা খুবই কম) আর কিছুই নয়, বাড়িটাকে আমি বিচারপতি আরউইনের মতো ভালোবাসি না। এবং একটা মানুষের জন্য পুণ্য হয়তো আর কিছুই নয়, তার কামনার ত্রুটিমাত্র, ঠিক যেমন তার অপরাধ হতে পারে তার পুণ্যের একটা ক্রিয়ামাত্র।

এবং আমি আমার পিতার অপরাধের কিছু প্রতিকার করার চেষ্টা করেছিলাম বলেও আমার আত্মসন্তুষ্ট বোধ করার কারণ নেই। আমার বাবার ভূ-সম্পত্তি থেকে যে টাকা আমি পাই তা মেমফিসে তার শেয়ালগন্ধী নোংরা ঘরে বসবাসকারী মিস লিটলপাফকে দান করার সিদ্ধান্ত নিই আমি, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি যে ইতোমধ্যে সে মারা গেছে। অতএব পুণ্যকর্ম দ্বারা স্বল্প মূল্যে যে তৃপ্তি আমি পেতে পারতাম তা থেকে আমি বঞ্চিত হলাম। এখন যে তৃপ্তিই আমি পেতে চাই না কেন সেটা আমাকে অর্জন করতে হবে আরো চড়া দাম দিয়ে।

কিন্তু তখনো টাকাটা আমার ছিলো, আর বহু বছর আগে শুরু করা কাস মেস্টার্নের জীবনের উপর আমার বইটি আবার লিখবার সময় আমি সেই টাকায় আমার জীবন নির্বাহ করতে থাকি। কাস মেস্টার্নকে আমি এক সময় বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন সম্ভবতঃ পারি। কাস মেস্টার্নের জীবনী আমি রচনা করছি বিচারপতি আরউইনের বাড়িতে বসে, তাঁর টাকায় কেনা রুটি খেতে খেতে, আর এই ব্যাপারটার মধ্যে হয়তো একটা কৌতুকের দিক আছে। কারণ বিচারপতি আরউইন আর কাস মেস্টার্নের মধ্যে বিশেষ কোনো মিল ছিলো না। (কোনো মেস্টার্নের সঙ্গে

যদি বিচারপতির মিল থাকে তবে সে হলো গিলবার্ট, কাসের [illegible] মাথার ভাই।)
তবে এই কৌতুক আমার কাছে বিশেষ মজাদার মনে হলো না। যে পৃথিবীতে আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করি পরিস্থিতিটা বড়ো বেশি সেই রকম, আর বারংবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তা জীর্ণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিচারপতি আরউইন ছিলেন আমার পিতা, আমি সর্বদা তাঁর কাছ থেকে স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, আর তিনি ছিলেন সত্যিকারএকটা মানুষ, আর আমি তাঁকে যথার্থই ভালোবাসতাম।

এলিস বার্ডেনের মৃত্যুর পর, আমার গ্রন্থটি শেষ হবার পর, এই বাড়িটাকে আমি প্রথম ও তৃতীয় ন্যাশনাল ব্যাংক-কে নিয়ে নিতে দেবো, ওইদিন থেকে আমার কাছে এই বাড়ির কোনো মূল্য থাকবে না, এই বাড়ি হবে ইট-কাঠের একটা সুন্দর সমাহার মাত্র। (এ্যানও, আমার মতোই, এখানে থাকতে চায় না। যে শিশুসদনের ব্যাপারে সে বিশেষ উৎসাহী ছিলো সেই শিশুসদনের জন্য এ্যান তার বাড়িটা দিয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয় ওরা সেটাকে স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করবে। এই কাজটা করার জন্য এ্যানের মনেও খুব বেশি আত্মসন্তুষ্টির ভাব জাগে নি। এ্যাডামের মৃত্যুর পর এই জায়গা তার জন্য আর কোনো আনন্দদায়ক স্থানরূপে বিরাজ করে নি, বরং যন্ত্রণার স্থানে পরিণত হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত এই বাড়ি হলো এ্যাডামের প্রেতাত্মাকে দেয়া তার উপহার, বিনয়ের সঙ্গে প্রদত্ত একটা তুচ্ছ উপহার, কবরে পরিত্যক্ত একমুঠো গম কিংবা একটা চিত্রিত পাত্রের মতো, মৃত ব্যক্তির আত্মা যেন তৃপ্তি পায়, জীবিতকে অস্থির করার জন্য যেন ব্যস্ত না হয়ে ওঠে।)

তো, সে বছরের গ্রীষ্মকালে, ১৯৩৯ সালে, আমরা বার্ডেন্স ল্যান্ডিং ছেড়ে যাই।

সন্দেহ নেই, আবার আমরা একদিন এখানে ফিরে আসবো, এর আবাসিক এলাকার রাস্তা দিয়ে হাঁটবো, মিমোসার ঝাড়ের ওপাশে টেনিস কোর্টে তরুণ-তরুণীদের খেলতে দেখবো, উপসাগরের কূলে বেলাভূমিতে বেড়াবো, সেখানে ডাইভিং ফ্লোটগুলি রোদের আলোয় মৃদু দুলতে থাকবে, আমরা তারপর সেখান থেকে চলে যাবো দেবদারু কুঞ্জের দিকে, যেখানে মাটির উপর অজস্র দেবদারুর পাতা ঘন হয়ে পড়ে থাকার জন্য আমাদের পদধ্বনি শোনা যাবে না। গাছগুলির মধ্য দিয়ে আমরা ধোঁয়ার মতো নিঃশব্দে হেঁটে যাবো। কিন্তু এসব ঘটবে অনেক দিন পর। আপাততঃ আমরা শিগগিরই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো, আমরা চলে যাবো পৃথিবীর কোলাহলের মধ্যে, ইতিহাসের ভেতর থেকে ইতিহাসের ভেতরে, আর কালের ভয়ঙ্কর দায়িত্বের মধ্যে।

শেষ

## অনুবাদক পরিচিতি

কবীর চৌধুরীর জন্ম ১৯২৩ সালে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। স্নাতকোত্তর পড়ালেখা করেছেন ঢাকা, মিনেসোটা এবং সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীর্ঘ দিন ধরে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন, নানা দেশ ঘুরেছেন, নব্বইটির বেশি বই লিখেছেন। প্রধানতঃ অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল জ্যাক লণ্ডনের সীউলফের অনুবাদ সমুদ্রের স্বাদ, স্কট-ফিটজিরাল্ডের গ্রেট গ্যাটসবি, জন স্টাইনবেকের দি গ্রেপস অব র‍্যাথ, ইউজীন ও'নীলের লংডে'জ জার্নি ইন্টু নাইটের অনুবাদ অমা রজনীর পথে এবং স্যামুয়েল বেকেটের ওয়েটিং ফর গডোর অনুবাদ গডোর প্রতীক্ষায়। অনুবাদ এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে সার্বিক অবদানের জন্য কবীর চৌধুরী একুশে পদক এবং বাংলা একাডেমী, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, কাজী মাহবুব-উল্লাহ, অলক্ত ও বঙ্গবন্ধু পুরস্কারসহ বহু সম্মাননা লাভ করেছেন।

# অল দি কিংস মেন

রবার্ট পেন ওয়ারেন